বাংলার ছোটগল্প

বাংলার ছোটগল্প

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGLAR CHHOTO GALPA
Collection of Bengali Short Stories
4th Volume
Edited by
Dr Bijit Ghosh

Price Rs 100/-

প্রচ্ছদ : সুনীল শীল

ISBN 81-7332 376 7

দাম : ১০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস. সি ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন ডাঃ এস. সি ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

'ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো-তোমার
মনেব মন্দিবে।

.

ধবিযা বাখিযো সোহাগে আদবে
আমাব মুখব পাখি-তোমাব
প্রাসাদপ্রাঙ্গণে।

. . . .

আমাব মনেব মোহেব মাধুবী
মাখিযা বাখিয়া দিযো—তোমাব
অঙ্গসৌবভে।'

প্রিয বন্ধু
শাশ্বতী মিত্র বসু-কে

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ চতুর্থ খণ্ড

চতুর্থ খণ্ডের শুরু বাংলা ছোটগল্প ধাবার এক বিশিষ্ট কথাশিল্পী সুশীল জানার অসামান্য নির্মাণ 'সখা' গল্পটি দিয়ে। এক-একজনের একের বেশি গল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বলেই সুশীলবাবুব 'আম্মা', 'খুনী'-র মতো অনন্যসাধারণ গল্পকে নির্বাচনের বাইরেই রাখতে হয়েছে। এই খণ্ড শেষ হয়েছে ঋত্বিক ঘটকের গল্প দিয়ে।

একটি কবে অসাধারণ গল্প নিযেও যাঁদের একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্পকে গ্রহণ করতে পারি নি, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ নবেন্দু ঘোষের 'বাঁকা তলোয়ার', 'বস্ত্রং দেহী', 'ছিন্নমস্তা', 'কল্কি', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'এক পো দুধ', 'মহাশ্বেতা', 'শ্বেতময়ূর', 'টিকিট', 'ধূপকাঠি,' 'ঘব', 'ঝড়', 'কস্মৈ দেবাযঃ', 'অবতরণিকা', 'রস', 'অভিনেত্রী', 'যবনিকা', 'গুণগ্রাহী', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইদু মিঞার মোরগা', 'নায়কের জন্ম', 'হাঁস', 'মর্যাদা', 'বনজোৎস্না', 'টোপ', 'হাড়', 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ', 'তীর্থযাত্রা', 'বীতংস', 'দুঃশাসন', 'অধিকার', 'সুখ', 'বন্দুক', 'রেকর্ড', 'বনক্রচরিত', 'নীলা' প্রভৃতি অসাধাবণ গল্পগুলি।

অমিযভূষণ মজুমদাবেব 'উরুণ্ডী', 'একটি বিপ্লবের মৃত্যু', 'দীপিকাব ঘরে রাত্রি', 'ভূমিকম্প', 'প্রতিবেশী', 'চাঁদবেণে'; বাণী রাযেব 'নার্গিসাস', 'কোনও এক মলি দত্ত', 'সীমেন্টের ছাতার নীচে', সন্তোষকুমাব ঘোষের 'যাত্রাভঙ্গ', 'দুইরাত্রি', 'সত্যসন্ধ', 'কস্তুরীমৃগ', 'পনেব টাকার বৌ', 'একমেব', 'শনি', 'বিষ', 'যাদুঘর', 'কানাকড়ি', 'নিহতের নাম', 'পাখিব বাসা', 'প্রাচীর', 'সে আমাব প্রেম', 'চিনে মাটি', শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিধিলিপি বনাম পুরুষকার', 'বিকল্প', আশুতোষ মুখোপাধ্যাযের 'যৌবন', 'তপ', 'কুমারী মাতা', 'চোখ', 'মৃত্যু', 'কান্না', 'ব্যক্তিত্ব', 'দ্বীপ', 'অভিরতি', সোমেন চন্দের 'দাংগা', 'ইঁদুব', 'বনস্পতি', সলিল চৌধুবীর 'চালচোর', বিমল করের 'শোকসভার পরে', 'বৃদ্ধস্য ভার্যা', 'আত্মজা', 'জানোযাব', 'মৃত ও জীবিত', 'নিষাদ', 'বনবাসী', 'সুখ', 'কলহ', 'মিলনোৎসব', 'কাচঘর' 'জননী', 'পলাশ', 'অশ্বত্থ', 'সুধাময', 'ইঁদুব', 'মানবপুত্র', 'উদ্ভিদ', 'সোপান', ননী ভৌমিকের 'পূর্বক্ষণ', 'কাফেব', 'বাছা', 'অনাবিধ', 'চৈত্রদিন', 'গান্ধাবী'. 'হটাবাহার', 'ধানকানা', সত্যজিৎ বাযেব 'আর্যশেখরেব জন্ম ও মৃত্যু', 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি', 'দুই বন্ধু'; রমাপদ চৌধুবীব 'দিনকাল', 'বডবাজাব', 'ডাউন ট্রেন', 'উদয়াস্ত', 'ভারতবর্ষ', 'দরবারী', 'রেবেকা সারণের কবব', 'মানুষ অমানুষের গল্প', 'মেকি', 'চাবি', 'একটি মনিব্যাগ ও একফালি হাসি', 'স্ত্রৈণ', 'অপরাহ্ণ', 'অঙ্গপালি', গৌরকিশোর ঘোষেব 'আলমাবি', 'তলিয়ে যাওয়ার আগে', 'লোকটা', 'বাঘবন্দী', 'ব্রজদার গল্প', বাণী বসুর 'শতাব্দী এক্সপ্রেস', সমরেশ বসুর 'উত্তাপ', 'আবাদ', 'বিবরমুক্ত', 'নিমাইয়ের দেশত্যাগ', 'পাড়ি', 'সিদ্ধান্ত', 'স্বীকাবোক্তি', 'কিমলিস', 'সুর্চাদেব বারোমাস্যা', 'মাসের প্রথম রবিবার', 'মানুষ রতন', 'ছেঁড়া তমসুক', 'অকাল বসন্ত', 'ধর্ষিতা', 'প্রতিরোধ', 'বিহিত', 'আদাব', 'শহিদের মা'; তৃপ্তি মিত্রের 'পুরনো গন্ধ', 'কী যেন স্টেশনটাব নাম', মহাশ্বেতা দেবীব 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'চড়ক', 'জল', 'দৃশ্যপটে আমিই নাযক', 'জলসত্র', 'বিছন', 'এজাহাব',

'বাঁয়েন', 'আত্তীর', 'কুসুমা', 'কানাই বৈবাগীর মা', 'পিণ্ডদান', 'অপারেশন বসাই টুডু', মিহির আচার্যেব 'হিংস্রতা বর্জন করুন', 'লোহাব ক্ষুর'; ঋত্বিক ঘটকের 'ভূস্বর্গ অঞ্চল', 'সড়ক', 'রূপকথা' প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠক-হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেযে গেছে।

এই খণ্ডেব গল্পের সংখ্যা ৪৬। সময়সীমা ১৯১৬ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত।

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদেব জ্ঞাতার্থে কযেকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠাব একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা**। সেখানে আছে বাংলা **গদ্যেব সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প; ছোটগল্পের আবির্ভাব** ঃ তার **জন্ম** ও **উৎস** সন্ধান, **সংজ্ঞা** ইত্যাদি বিষযেব উপব দীর্ঘ আলোচনা। আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি-সমূহের (ভারতবর্ষেব বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের বাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা-লাভ, স্বাধীনতা-উত্তব ভারতবর্ষেব নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তবে ভেঙেপড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি, **দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু-স্রোত**, সেই মহা-প্রলয়েব সমযেব জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজযী গল্পেব সঙ্গে যে পটভূমিব অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডেব ভূমিকায আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধবাব চেষ্টা কবেছি।

আগস্ট-আন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী **দাঙ্গা** তথা **'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং'** আব ঠিক তাব পবই **তেভাগা আন্দোলন**; পরবর্তীকালে **'নকশাল আন্দোলন', 'জরুবী অবস্থা'**, বাব বাব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলাব গল্পকে দিযেছে নতুন প্রাণ। তাবও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে কবেছি আমি।

আবাব বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল', 'শ্রুতি', 'হাংরি জেনারেশন', 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন', 'এই দশক', 'নিম সাহিত্য-আন্দোলন', 'নতুন বীতিব গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি), লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দাযিত্বহীনতা ও দাযিত্বেব কথা, সর্বোপরি পাঠকেব কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পেব প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণেব সম্ভাব্য কাবণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয পাঠক সেটি একবাব দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকেব শ্রমেব ভাব কিছুটা লাঘব হবে।

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

সখা

সুশীল জানা

"লগর মাঝিব সঙ্গে তোমাব সাদি হবে!" বন্‌শী সকৌতুকে ব'ললে, "তবে যে তুমি হলে মোব সযা। লগর যে মোব সাঙাৎ ছিল।"

মংলা কেমন অন্যমনে বললে, "সে কথার পর চার-পাঁচ বচ্ছর কেটে গেল।"

"লগব এখন কোথায়?"

"সে তো চলে গেল কযলাব খাদে।" মবা গলায় আস্তে আস্তে বলে মংলা, "হঠাৎ একদিন চলে গেল খেপে।"

"তাবপর?"

"তাবপর চাব-পাঁচ বচ্ছব কেটে গেছে।"

"মন খাবাপ কোরোনি হে সযা— সে আসবে।" বন্‌শী লগর মাঝির কথা বলে, "ছোট যখন ছিলাম—মহিষের পাল লিয়ে চবাতে আসতাম জংগলেব ধারে ডাহীতে, সে-ও আসত। মোরা লাচতাম, গাইতাম, বাঁশি বাজাতাম, শালবনে ফুল পাড়তাম মহুয়াব। সে সব দিন মনে পড়ে যাচ্ছে হে সযা।"

মংলা কিন্তু আব কোনো কথা ব'ললো না। চুপ ক'রে রইলো দূবের দিগন্তছোঁযা প্রান্তবের দিকে চেযে। তাব উজ্জ্বল কালো চোখে এই শূন্য পোড়া প্রান্তরের শূন্যতা প্রতিবিম্বিত হয বুঝি কয়েক মুহূর্তেব জন্যে, তাবপব গা-ঝাড়া দিযে উঠে বললো, "সেদিন উড়ে পুড়ে গেছে। জংগল লিয়েছে জমিদাব, গোঙব ডাহী লিয়েছে কাগজে কল, জমিন গেছে, গো-মহিষ গেছে, সুখ গেছে—শান্তি গেছে হে বিদেশী। আমি এখন কাগজকলেব ঘাস কেটে মরি—আব তুমি কিনা গাঁ ছেড়ে আজ লুকিযে আছ মোব ঘরে।"

"হাঁ—আছি। কিন্তু চিরদিন কি লুকিযে থাকব সযা? আবাব ঘুবে আসবে সেদিন।"

"কি জানি বিদেশী।"—

"মোকে তুমি এখনো বিদেশী বলেই ডাকবে সয়া?"

মংলা হেসে ব'ললে, "তুমিতো তাই বলেছিলে একদিন মাঝি।"

"আজ তো একটা সম্পর্ক বেবিযে পড়লো সযা।"

হঠাৎ একটা বিষণ্ণতাব ছোঁয়া লাগে মংলার মুখটায়। তবু মুখে একটু হাসি টেনে এনে ব'ললো—"যাই, গরম জল আনি, তোমার ঘা ধুযে দিতে হবে।"

ঘুরে এল খানিক বাদে মংলা গরম জল নিয়ে—পাযেব ঘা ধুতে বসলো বন্‌শীব।

বন্‌শী নিজের ঘায়েব দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, "শালাদের গুলিটা ভাগ্যে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। না হলে পচে মরতে হত তোমার ঘবে সয়া।"

মংলা কোনো কথা ব'ললো না—মুখ নীচু কবে একমনে জলের ছিটে দিযে ঘা ধুতে লাগল।

বন্‌শী ফের বললে, "সেরে এসেছে—না কি বল?"

মংলা অন্য মনে শুধু বললে, "হুঁ।"

হঠাৎ বন্‌শী মুখ খিঁচিযে আর্তনাদ কবে উঠল, "আস্তে আস্তে—আস্তে হে সয়া।"

মংলা বোধহয নিঃশব্দে একটু ফিক করে হেসে ফেলেছিল। বন্‌শী বললে, "হাসলে যে।"—

"এমনি", মংলা মুখটা আরও গোঁজ করে ঘা ধুতে লাগল।

"এমনি হাসলে?"

মংলা আর কোনো কথা বললে না। এমনি সে হাসেনি ঠিক— ভাবছিল, এই লোকটাকে প্রথম যেদিন সে আবিষ্কাব কবলো তার জ্বালানিব মাচার মধ্যে— সেদিনকেব কথা। ঠ্যাংটা দেখা যাচ্ছিল শুধু—আর এক জাযগা থেকে বক্ত চুঁইযে পড়ছিল মাটিতে। মনে হবে বুঝি— ওই রকম একটা ঠ্যাং কে যেন জ্বালানির মধ্যে কেটে ঢুকিযে দিযে গেছে।

চমকে উঠেছিল—ঠিক ভয পায়নি মংলা, নিঃশব্দে ঘুবে গিযে চাল থেকে টাঙিটা নামিযে ফিরে এসে বলেছিল, "কে ঢুকেছিস বটে— বেরিযে আয, না হলে দিলাম ঠ্যাং কেটে।"

প্রথমে ঠ্যাংটা নড়েও না চড়েও না।

"তবে দিলাম টাঙির কোপ।" মংলা ধমকেছিল। একটা জোযান মবদ বেরিযে এল তাবপব—তাব জাতেব মানুষ, শুধু মাথায় নেই যা ঝাঁকড়া ঝাঁকডা চুল। বেরিযে এল ঠ্যাং ঘষটে ঘষটে। তাবও হাতে টাঙি।

"কে তুই বটে।" মংলা রুখে দাঁড়িয়েছিল।

"চিনবেনি মোকে, আমি বিদেশী।"

"বিদেশী! কুঁন গাযেব লোক বটে হে।"

লোকটা মংলাব কুঁড়েব পেছনেব জংগলটা দেখিযে দিযে বলেছিল, "জংগলেব ওপাব—গির্বধিনি।"

"তো মোব মাচাব মধ্যে ঢুকলি ক্যানে?"

লোকটা অক্লেশে বললে, "রাতটা থাকতাম।"

"আব দিন এখনও শেষ হয়নি। ঢুকেচিস মোব মাচাব মধ্যে।" মংলা বাক্যে কথায ভুলবাব মেযে নয। বাপ মরে যাওযাব পব একাই সে ঘব কবছে। উনিশ কুড়ি বছবেব গাঁট্টা-গোট্টা জোয়ান সাঁওতাল মেযে। ধমকে বলেছিল, "কে তুই বল ঠিক্ ঠিক্।"

"বিদেশীর নাম জেনে কি হবে! বাতটুকুন তো শুধু মাথা গুঁজে থাকতাম"—

"মোব মাচাব মধ্যে ঢুকলি আর নাম বলবিনি! গিরধিনিব লোকত ইদিকে এসেছিস ক্যানে।"

"এই—কাঠ কাটতে।"

"হুঁ।— তোদেব জমিদার জংগল কেড়ে লেযনি?"

"লিযেছে। তাইত বেরিয়ে পড়েছি।"

"তো মোদেবও তো লিয়েছে।"

"তবে চাষের জমিন পাই যদি—"

"জমিন। হোই দ্যাখগা—বাবুই ঘাস। কাগজকলেব মালিক গোচব ডাহী আব ধানী জমি সব কেড়ে লিযে ঘাসেব চাষ কবেছে।"

"মোদেবও তাই।"

"তবে! সব জেনেশুনে ন্যাকামি করছিস্ ক্যানে তবে?"

এত জেরাতেও এতটুকু ঘাবড়াচ্ছে না লোকটা। তার এন্তার মিছে কথা যে বুঝতে পারছিল না মংলা তা নয। তবে মনে মনে নিজেও সে বিব্রত হয়ে পড়ছিল—কি করবে সে এ লোকটাকে নিয়ে।

লোকটা আরও বললে, "আজ বাতটা মোকে থাকতে দিলে ভোর-ভোর আমি চলে যাব। পায়ে ববায দাঁত বসিযে দিযেছে, বড় ব্যথা হচ্ছে।"

"হুঁ। কুথায় ছিল বরা?"

"বনে।"

"বনে! সত্যি কথা বল—কুথায় দেখেছি যেন তোকে। ঠিক দেখেছি মনে হচ্ছে।" মংলা পাকড়াও করেছিল শেষ পর্যন্ত।

লোকটা হেসে বলেছিল, "কুথায় দেখবে আবার মোকে! আমি বিদেশী। তোমার দাওয়ায় পড়ে থাকতে দাও শুধু রাতটা— ভোর-ভোর যেখানে হোক চলে যাব। আমি তোমার জাতের লোক—দুঃখী লোক। মোকে অবিশ্বাস কোরোনি। ভয় কোরোনি।"

"আরে দূর! তোকে আবার ভয়।" ঠোঁট বেঁকিয়ে মংলা বলেছিল, "তবে থাক গে যা—হোই চ্যাটাই পাতা আছে দাওয়ায়।"

"চ্যাটাই-মেটাই মোর দরকার নাই। —হোই জ্বালানীর মাচাং-এ থেকে যাব।"

"হুঁ। লুকাতে চাস? তুই ঠিক চোরাই, হাঁড়িয়া চোলাই করতিস, আর পুলিস তাই তোকে তাড়া করেছে।"

"তাই যদি হয়। জেতের লোককে পুলিসে ধরিয়ে দিবি?"

নাঃ— লোকটা অসম্ভব।— তাকে আপাদমস্তক একবার যাচাই করে দেখেছিল মংলা চোখ কুঁচকে। তারপর বলেছিল— "নাঃ, পুলিস বড় হারাম। মোদের বন্‌শী মাঝিকে ধরবে বলে তল্লাট টুঁড়ে ফেলেছে।"

"বন্‌শী মাঝিটা আবার কে হে?"

"দূর ভূত কোথাকার। তার নামও শুনিস নাই?" মংলা অবাক হয়ে বলেছিল, "সে বড় ভালো চ্যাংড়া হে।"

"তবে ভালো। আমি বিদেশী— মোর অত কথায় কাজ কি।"

"কাজ কি।" মংলা রুখে বলেছিল, "এই যে মোদের বন কেড়ে লিলে, ডাহী জমিন সব কেড়ে লিলে, মোদের মরদগুলান বিদেশে পালালো – তা ঘুরোৎ চাস না?"

"চাই তো। কিন্তু দেয় কে।"

"বন্‌শী মাঝি বলে—সব আবার ঘুরোৎ হবে। মোরা লড়াই করে কেড়ে লেব।"

"তো লে কেড়ে।" লোকটি বলেছিল গা ছেড়ে, "আমি কী না বলেছি?"

তার এই গা-ছাড়া জবাবে মংলা আবার গাল দিয়েছিল, "বিদেশী ভূত!"

রাতের বেলা সেই বিদেশী ভূতটাকে বাইরের ঘুপটি দাওয়ায় একটা চ্যাটাই পেতে শুতে দিয়েছিল মংলা। নিজে শুয়েছিল কুঁড়ের ভেতরে বাঁশের দরোজায় ভালো করে খিল এঁটে। কে জানে, বিদেশী শয়তানটার মনে কি আছে!

হঠাৎ ঘোর রাত্তির বেলা বন্ধ দরোজায় ঘা। আর চাপা গলায় ডাক ঃ

"আহে--আহে –আহে"—

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় লেগেছিল বৈকি মংলার— কে জানে কি মতলবে ডাকছে লোকটা। দম বন্ধ করে বলেছিল—"শয়তানির মতলব থাকলে কেটে ফেলাব একেবারে।"

লোকটা ককিয়ে বলেছিল — "না গো—একটু জল দিতে পারো? ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

হাতে টাঙি নিয়ে দরজা খুলেছিল মংলা। দেখে— লোকটা হুঁ-হুঁ করছে। জিজ্ঞেস করেছিল, "কি হল তোর।"

"জ্বর। বড় তেষ্টা। আর মোর জখম পা-টা যেন খসে যাচ্ছে হে।"

দেখতে দেখতে পা-টা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। অতএব ভোর-ভোর যে-বিদেশীর চলে যাওয়ার কথা, তা আর হলো না। অধিকন্তু লোকটার ফাই-ফরমাস খাটতে হল মংলাকে। সেদিন ঘাস কাটতে যাওয়া হলোনা আর। লোকটা বললে, "যাবে একবার পিয়ারডোবা গাঁয়ে— মোর কুটুম আছে, গুরাই মাঝি। তাকে বলবে যেয়ে শুধু— তোর মামাত ভাইয়ের অসুখ। দেখবে—ই খবর আর কারুকে দিবেনি কিন্তুক।"

কি করে মংলা আর—যেতে হলো। বিদেশী লোক বিপদে পড়ে গেছে। লোকটার কি রহস্য আছে কে জানে ; তবে আছেই কিছু!

খবর দেওয়ার পর গুরাই মাঝি আর একটি ছোকরা এলো রাতের অন্ধকারে ঘুপটি মেরে। দেখে মংলা তো আগুন। বললে, "কি রকম লোক বটে হে তোমরা। খবর দিলাম সকালে -এলে রাতের বেলা। ইদিকে কাহিল হয়ে পড়েছে তোমাদের রুগী।"

বিদেশী বললে, "চেঁচাও নি হে।"—

মংলা গর্ গর্ করতে করতে চলে গিয়েছিল। তারপর ফিস্-ফাস্ গুজ-গাজ কথা ওদের হলো অনেকক্ষণ ধরে। খানিক বাদে চলে গেল দুজন—রুগী রইল পড়ে যেমন যেখানে ছিল। লোক দুজন চলে যেতেই ছুটে এসেছিল বিদেশীর সামনে মংলা—রাগে নয়, শ্রদ্ধায়—আনন্দে, মর্মজ্বালায় জ্বলে।

"এতক্ষণ বলোনি কেন মোকে—বলোনি কেন! যদি বিপদ হত!"

"কি বলবো হে?"

"তুমি বন্শী মাঝি!"

"কে বললে?"

"এই যে আমি আড়ি পেতে শুনলাম।"

এবাব বিদেশী চুপ।

"সারাদিন তোমাকে আমি দাওয়ায় ফেলে রাখলাম।" অনুশোচনায় এবার যেন কান্না পেয়েছিল মংলার। বললে, "চলো ঘবের ভেতরে।" ঘরের ভেতরে শোযার জায়গা করে দিয়ে বন্শীকে শুইয়ে দিল মংলা। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মাথা নীচু কবে—কি যেন ভাবল একটু। বললো আস্তে আস্তে, "মোকে ক্ষ্যামা কব।"

বন্শী কাৎবে বললে, "এদিকে পা-টা মোর খসে গেল।"

মংলা আবাব বললে, "কাল থেকে মোর ঘবে তোমাব অনেক কষ্ট গেছে।"

"ও সব কিছু না হে।"

"দেখি তোমাব পা?" মংলা এতক্ষণে পাযেব ঘা-টা দেখতে দেখতে বললে, "বন্দুকের গুলি লেগেছিল কাল।"

"কি কবে জানলে হে?"

"শুনেছি। সবাই জানে। বন্শী মাঝিকে কাল জংগল ঘেবাও কবে পুলিস ধবতে গেছল—পাবেনি। কোথায নাকি পালিয়ে গেছে।" মংলা আবিষ্ট ভাবে বললে, "কিন্তু সে যে মোব ঘরে।"—

"মোব কথা কারুকে আর বলোনি তো?"

"না। আমি ভাবলাম, হোক বিদেশী—জেতের লোক ত। লোকে জানলে হযতো কোন বিপদ আপদ হয়ে যেতে পাবে। থাকবে তো একটা বাত মোটে— তো থাক। তাই বলিনি।"

"খুব বুদ্ধি তোমার হে।"

"আমি যাই এখন—বেতেব বেলা ঘাযের পাতা খুঁজে পাই কোথায দেখি আবাব।"

"বাতে থাক না।"

"উঁ হুঁ — খাবাপ হতে পাবে, ঘাযেব ভেতবে বস ঢুকিযে দিযে ওপবে পাতা বসিযে দিলে ভেতবে যদি কিছু থাকে ত সব ঠেলে বেবিয়ে আসবে। ফুলা কমে যাবে, দবদ থাকবেনি। আমি যাই।"—

সেই বিদেশী—বন্শী মাঝি। দ্বিতীয দিনে বাতে শোবাব ব্যবস্থা উল্টে গেল। বন্শীকে ঘবে দিযে দরজা আগলে শুলো মংলা, পাশে টাঙি। শুলো বটে—ঘুম হল না সারা বাত। বাইবের প্রতিটি শব্দে চমকে উঠতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে।

বন্শী বলেছিল একবাব, "বাইবে শুলে যে তুমি!"

"হাঁ, কেউ এলে বইলাম আমি। তুমি ততোক্ষণে ঘবেব দেযাল ভেঙে চলে যেতে পারবে বনেব দিকে।"

বনশী মাঝিব এত কাণ্ডে হাসবে না মংলা। ঘা এখন সেরে আসছে— আব কদিন বাদে দিব্যি চলে বেড়াতে পাববে। খোঁড়া হযে যাওযাব বিপদ কেটে গেছে। প্রথম দিনেই পাতা বেঁধে দিলে এত কাণ্ড হত না। ঘা পচে বিষিযে উঠতো না। কিন্তু প্রথম দিন লোকটা মাচা থেকে ঘষটে ঘষটে বাব হযে এসে বললে কিনা, 'বিদেশী।'

ঘা ধুয়ে নতুন করে তাতে কী একটা বুনো পাতা বসিয়ে দিয়ে উঠলো মংলা। বললে, "পা এবার সেরে উঠেছে মাঝি—কিন্তু খবরদার বাইরে বেরিয়োনি।"

কৌতুক করে বন্‌শী বল্‌লে, "কোথায় যাব আর সয়া, অমন শুইয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে। মংলার ই ঘরের কোণ ছেড়ে কোথাও যেতে আর মন নাই মোর।"

"মনে রইলো মাঝি"—বলে নিজের একটা আবেগ চাপবার জন্যে তাড়াতাড়ি উছলানো মুখটাকে ঘুরিয়ে নিল মংলা অন্যদিকে। আস্তে আস্তে বললে, "এবার যাই আমি ঘাস কাটতে, দেরি হলে পয়সা কাটবে চোরগুলান।"

দিনের শেষে মংলা সেদিন যখন ঘুরে এল তখন খোঁপায় তার কৃষ্ণচূড়ার এক থোকা ফুল গোঁজা। এসে দাঁড়ালো বন্‌শীর সামনে—সারা দিনের ক্লান্ত মুখটাও যেন মিষ্টি হাসিতে ভরে আছে। শুধোলে, "বাইরে বেরোযনি ত বিদেশী?"

কৌতুক করে বন্‌শী বললে, "হ্যাঁ—ঘুরে এলাম তোমাদের গাঁয়ের বস্‌তি।"

মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠল মংলার মুখ।

বন্‌শী হাসলো।

মংলা বললে, "তুমি ত জান না মাঝি, তোমাকে ধরবার জন্য দু'কুড়ি দশ টাকা দেবে বলে সরকার ঢোল দিয়েছে। যদি কেউ—" মংলা ভয়ে থেমে গেল।

বন্‌শী বললে, "বলো কি গো সয়া! তবে তুমি খপর দিয়ে এসো সরকারকে, তারপর ওই দু'কুড়ি দশ টাকা নিয়ে চলে যাও সাঙাতের কাছে রেলগাড়িতে চেপে।"

"ই কথা তুমি বললে মাঝি" মংলা ভারি চোখ তুলে তাকালো এক দৃষ্টে বন্‌শীর দিকে।

বন্‌শী হেসে উঠলো। বললে, —"আচ্ছা মোর কথা নয় ঘুরোং দাও। যেওনি তুমি। কিন্তু সয়া, মাথায় ফুল দিয়েছ। মুখ-চোখ যেন কেমনধারা। আজ ঠিক মোর স্যাঙাতের কথা মনে পড়েছে তোমার।"

মুখ-চোখ ভারি হয়ে উঠলো মংলার—বন্‌শীর সামনে যেন দাঁড়াতে আর সে পারছিল না। যাওয়ার সময় বলে গেল শুধু, "সে মোর কাছে মরে গেছে।"

ডেকে আর হালকা কথা বলতে সাহস হলো না বন্‌শীর। মংলা বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারে। তারপর খোঁপার ফুলগুলো টেনে কি ভেবে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সহসা কেন তার মনে হলো—ফুলের তার আর দরকার নেই।

দাঁড়িয়েছিল যে এক ভাবে, এমন সময় সন্ধ্যের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল এক সাঁওতাল আধবুড়ো। বললে, "বলো বন্ মাঝিকে—পিয়াশাল থেকে এসেছি।"

মংলা বললে, "চলে যাও ঘরের ভিতরে।"

কিছুক্ষণ বাদে আবার একটি লোক বেরিয়ে এল, বনের ভিতর থেকে ঘুপটি মেরে বললে, "শালবোনি থেকে এসেছি—বন্ মাঝিকে বলো।"

এমনি করে লোক এল আরও কয়েকজন। গোদা, পিয়াশাল, শালবোনি, পিযারডোবা, কালি পাথরি, চন্দ্রকোনা, জমায়েত হলো এসে একে একে। এমনি হয় এক-একদিন। বিরাট এক পাহাড়ী জংগলের কিনারা ঘিরে আদিবাসী এলাকা—লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত, দরিদ্র। গর্ গর্ করছে আরণ্যক জীবন—আগুন জ্বলে ওঠার আগে গুমরে-মরা ধোঁয়ার মত। সেই অসন্তুষ্ট ঘূর্ণাবেগ ধোঁয়ার তালে যেন ঘর ভরে যায় মংলার। সেদিন অনেক কী সব শলাপরামর্শ করে ওরা চলে গেল একে একে রাত যখন গভীর হলো!

মংলা এতক্ষণ বসেছিল দাওয়ার এক কোণে। এসব কথার মাঝখানে বন্‌শী মাঝি তাকে ডাকে না, বরং কথার ছলে যেন সরিয়ে দেয়। হয়তো কোন গোপন কথা হয়। রাগ হয়, অভিমান হয় মংলার -- তারই ঘরে লুকিয়ে থেকে বন্‌শী মাঝি তাকে বিশ্বাস করে না!

সেদিন সবাই চলে যাবার পর মংলা উঠি উঠি করছিল ঘরের ভেতরে যাবে বলে -- এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ধপ্ ধপ্ করে খোঁড়া পা টেনে স্বয়ং বন্‌শী মাঝিই এসে হাজির বাইরের দাওয়ায়।

"সয়া।"—

মংলা তাড়াতাড়ি তার সামনে ছুটে এসে দাঁড়ালো।

বন্‌শী মাঝি দু'টো হাত মুঠো করে ধরল তা'র। ব'লে উঠলো—"তুমিই হলে মোর খাঁটি সয়া। মুখ ফুটে বলতে হয় না কিছু—প্রাণের কথা আপনি বুঝে লাও।"

"কি হলো মাঝি?" মংলা ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাকালো তার মুখের দিকে।

"কি হলো সয়া? এত কাণ্ড করছো তলায় তলায়—বলোনি ত মোকে একদিনও।"

"কি করলাম মাঝি।"

"এর মধ্যে একদিন চন্দ্রকোনা গেছলে?"

"গেছলাম মাঝি!"

"সেখানে বলে এসেছ—ও গাঁয়ের তোমরাও যাবে জংগলে দখল নিতে?"

"হ্যাঁ মাঝি।"

"এর মধ্যে কবে ঘাস কাটার মজুরি বাড়ানোর জন্যে দু-দিন কাজ বন্ধ করেছিলে নাকি?"

"করেছিলাম মাঝি।"

"সবাই তোমার কথা শোনে?"

"কথাটা যে সকলের মাঝি।"

"এসব কথা নিয়ে মোর সঙ্গে তো শলাপরামর্শ করোনি কোনদিন।"

"তোমাদের শলাপরামর্শে মোকেও তো ডাকনি কোনদিন মাঝি।"

"মোর ঘাট হয়েছে সয়া। আর একটা কথা, আমি তোমার ঘরে আছি—এখানে তোমাদের সবাই কি তা জানে?"

"তা জানে না।"

"কি বলেছ তাদের?"

"বলেছি— ফেরার। বলেছি—লুকিয়ে আছে। আর বলেছি—চিরকাল কি সে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবে—দিনের আলোর মুখ কি দেখবে নি?"

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলো বন্‌শী মাঝি। অন্ধকারেও যে উদ্দীপ্ত আবেগ ঢাকা পড়ে না সেই স্ফুরিত আবেগ কেঁপে উঠতে শুনলো তার গলায়, ঝলকে উঠতে দেখলো তার চোখে। এই মেয়েটা কোথায় কোন গাঁয়ে গাঁয়ে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছে একা, গেছে চন্দ্রকোনার মাতব্বরদের কাছে লুকিয়ে, একজোট করেছে তাদের মেয়ে মরদকে, অথচ কিছুই জানায়নি তাকে। মেয়েটাকে হঠাৎ মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে করে বন্‌শীর।

বন্‌শী মংলার কথার জের টেনে আস্তে আস্তে বললে, "ঠিক— অন্ধকার চিরদিন থাকবেনি সয়া—সবাই মোরা আলোর মুখ দেখবো।" তারপর হঠাৎ চোখ পড়লো বনশীর, মংলার খোঁপায় কৃষ্ণচূড়ার থোকাটা তো নেই! বন্‌শী বলে উঠলো, "তোমার মাথার ফুল গেল কোথায় সয়া?"

মেয়েটা কেঁপে উঠলো যেন সহসা। বললে, "ফেলে দিয়েছি।"

"কেন সয়া। বহুদিন পরে ফুল দিয়েছিলে—আমি এসে দেখিনি আর কোনদিন।"

মংলা কোন জবাব দিল না সে কথার। বন্‌শীর কোমরটা শক্ত করে ধরে বললে, "চল— ঘরে চল মাঝি। কাঁধে ভর দিয়ে চল মোর। লাঠি ছেড়ে হাঁটা তোমার উচিত হয় নি।"

বন্‌শী বললে, "সকলের মুখে তোমার কথা শুনে লাঠির কথা ভুলে গেলাম সয়া। মনে হলো—লাফ দিয়ে আজ ছুটে যেতে পারি।"

"চুপ করো মাঝি।"—

মংলার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বন্‌শী বললে, "না হে সয়া—কথা বলতে দাও। তোমার দিকে চেয়ে কথা বলতে দাও আজ। চুপ ত অনেক দিনই করে ছিলাম। বাপ-ঠাকুরদাদা পাথরের চাঙা কেটে কেটে ধানের জমি করেছিল— সেখানে মোরা আজ উটবন্দী চাষী। উঠ বললে যা চলে কোথায় যাবি। বনের লোক মোরা বনে ছিলাম। কাঠ কাটতাম—ফুল পাড়তাম

মহুযাব, খেতাম তাই বেচে। তাও কেড়ে কুড়ে ব্যবসা করছে খোট্টা জমিদাব। গোচর ডাহীতে গোরু মোষ চরাতাম—তাও কেড়ে নিয়ে বাবুই ঘাসেব চাষ করলো কাগজ কলের মালিক আর পাশে খুলে দিল গোরু ধবা খোঁয়াড়। গোরু ধবে ধবে সব নীলাম করে নিলে। চুপ কবে ফৌত হযে গেল গবিব বাপ ঠাকুবদাদা। আর কত চুপ কবে থাকবো বল সয়া?"—

জংগলেব মানুষ কথা কয়ে উঠেছে। আশ্চর্য সেই দীপ্তিতে ঝকমক কবে ওদের চোখ।

শাল মহুযাব জংগল ঘেঁষে একটা মরা গাঁয়ের কোণ দেখে যেখানে একদিন গা ঢাকা দিতে এসেছিল বন্‌শী— দেখতে দেখতে সে জায়গাটা নতুন এক প্রাণস্পর্শে যেন নড়েচড়ে উঠলো। অবণ্যেব লুকানো আগুন ধুঁইয়ে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে নিঃশব্দ অসন্তোষেব মাঝখানে।

তারপর সে আগুন জ্বলে উঠলো একদিন। কাজে বেরোবাব আগে মংলা বন্‌শীব পায়েব ঘা ধুতে বসেছিল—এমন সময় একটি মেয়ে ছুটে এলো হাউ মাউ কবে।

"মোদেব গোরু চালান কবে দিলে শয়তানবা গো দিদি—সব কটা গোরু।"

মংলা চকিতে মুখ তুলে তাকালো মেয়েটাব দিকে।

"ঘাসে মুখ দেয নাই—কিছু না।" মেয়েটি হাত কচলাতে কচলাতে অসহ্য গলায় বললে, "চবাতে যাচ্ছিলাম—জবরদস্তি ধবে খোঁয়াড়ে নিয়ে গেল হাসতে হাসতে।"

চোখে চোখে তাকাল মংলা আব বন্‌শী, নীরবেই বুঝলে ওরা—এ জববদস্তির মানে কী। এ গাঁয়ের বস্তি উজাড় কবে চলে গেল সব কটা গোরু। মোটা মুনাফা লুটবে ঘাস-ক্ষেতের খোট্টা মালিক, মুনাফা লুটবে সরকারী খোঁয়াড়, শুধু ভিটে মাটি চাটি হয়ে যাবে এ গাঁযেব মানুষগুলোব। চালান হয়ে যাবে গোরুগুলো কোথায়।

তারপর সেগুলো শহর কারখানায় বিকোবে গোস্ত হযে।

মংলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বন্‌শীর ঘায়ের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে, "ঘা প্রায় সেবেই এসেছে মাঝি—কিন্তু হাঁটাব লোভে ঘরের বার হয়ে প'ড়ো না যেন। আমি যাচ্ছি— সাবধানে থাকবে। বেশি হাঁটাহাঁটি"—বলে বন্‌শীর স্তব্ধ শুকনো চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেল মেয়েটা। সেখানে নিঃশব্দ ভর্ৎসনা। চকিতে মুখ ঘুরিযে ছুটে বেরিয়ে গেল মংলা।

"মোদেব মবদগুলান কোথায়?"

বাচ্চা সাঁওতাল মেযেটা কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাজে চলে গেল।"

"চল কোথায় দেখি।"

এদিকে বন্‌শী বসে বইলো কান পেতে। ওর চোখে চাপা ঔৎসুক্য। অনেকক্ষণ পবে শুনতে পেল সে একটা হল্লা— গোলমাল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে এসে দাঁড়ালো বন্‌শী। দূর থেকে শুধু হল্লাটাই শোনা যায—এখানকাব নিঃশব্দ আকাশের শূন্যতা শিউরে উঠছে তাতে ক্ষণে ক্ষণে। আর কিছু বোঝবার উপায় নেই। বন্‌শী খোঁড়া পা টেনে টেনে অস্থিবভাবে পায়চারী করতে লাগলো শুধু। এক সময় গোধূলি নামল অবণ্যপ্রান্তে। বন্‌শী সাগ্রহে চোখ মেলে আছে ঘব-মুখো গোরু ভঁইসেব ডাক শোনবাব জন্য। কিন্তু চমকে উঠলো সে ধোঁয়ার তাল দেখে। সেগুলো পাকিযে পাকিয়ে উঠছে আকাশে—তারপর শোনা গেল হাওযায গোরু মহিষেব বুকফাটা আর্তনাদ, আব মানুষেব হল্লা। বাঁশ ফাটাব শব্দ।

এমন সময় মংলা এলো ছুটতে ছুটতে —সারা দিনের ক্লান্ত কঠিন মুখ ধুলি-ধূসব। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "শয়তানগুলান খোঁয়াড়ে আগুন লাগিয়ে দিলে মাঝি। মোবা সবাই গোরুর জন্যে ক্ষেতের কাজ বন্ধ কবে বসেছিলাম। ওরা আগুন লাগিয়ে দিলে।" ক্ষোভে, ব্যর্থতায় যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো ওব শুকনো চোখ থেকে।

বন্‌শী তাকিয়ে আছে নীরবে স্তব্ধ চোখে।

মংলা বললে, "এবাব তুমি পালাও মাঝি। হাবামিবা পুলিস ডাকবে। পালাও তুমি—না হলে ধরা পড়ে যাবে।"

"চলে যাবো বলছ?"

"হ্যাঁ আজই পালাও।"

"তাই ভালো। চলে যাই তবে জংগলের ওপার।"

"কিন্তু তোমার পা যে এখনও ভালো করে সারেনি মাঝি।"—

"ও ঠিক আছে সয়া। চলে যেতে পারব। ভাবছি শুধু, তোমাদের বনের ধারের মাত্‌লা নদীটা পার হবো কি করে। অথচ জংগলের ভেতর দিয়ে গেলেই ভালো হয।"

মংলা বললে, "কলার মান্দাস করে দেব—ভেবোনি মাঝি।"

চললো পালাবার তোড়জোড়। সন্ধ্যের অন্ধকারে কলাগাছ কেটে ভেলা তৈরী করে লুকিয়ে রেখে এলো মংলা ঝাঁটি বনের ভেতরে। বন্‌শীর নির্দেশ মতো বাঁশের মোটা একটা লাঠি কেটে রাখলে। কযেকজনকে পাহারায় রাখলে দূরে দূরে। বন্‌শীর সঙ্গে দেওয়ার জন্যে বাঁধলো ছোট ছোট গুটি দুই পুঁটলি। আজ সারা সন্ধ্যেটা কেবলি মনে হতে লাগলো তার— একটি লোক আজ চলে যাবে এতদিন যে ছিল তার ঘরে।

রাত যখন গভীর হলো তখন ডাকলো মংলা, "মাঝি।"

গলার স্বরটা বড় ভারি লাগে নিজেরই কানে। বন্‌শী মুখ তুলে তাকালো। মনে হল — মেয়েটা পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। অনেক কাজ করেছে হয়তো।

পুঁটলি দুটোর দিকে চেয়ে বন্‌শী বললে, "ই সব কি সযা?"

"দুটো মুড়ি চিড়ে—আর ওটায় আছে গুড়, পাটালি, নারকোল। রাস্তায় খাবে।"

"ই সব করেছ আবার!"

"বনেই যে দুদিন কেটে যাবে মাঝি।"

"তোমার দেওযা শুধু এই লাঠিটা ধরে আমি হেঁটে যেতে পারতাম সারা বন।" বলে বন্‌শী লাঠিটা তুলে নিল।

মংলা পুঁটলি দুটো লাঠিতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো—তাকালো শুকনো চোখে বন্‌শীর দিকে কয়েক মুহূর্ত। ফিস ফিস করে বললে, "যাও মাঝি।"

বন্‌শী পুঁটলি-বাঁধা লাঠিটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, "যাই তবে সযা। দিনের আলোয দেখতে আসব আবার—দিন যেদিন আসবে। আজ পালাচ্ছি অন্ধকারে। ভেবোনি তুমি। আমি জানি সাঙাৎ ভোর একদিন আসবেই— মোদের জংগল যেদিন ঘুরিয়ে নেবো, জমিন যেদিন মোদের হবে। সেদিন কেউ ছেড়ে যাবেনি আর গাঁয়ের মাটি।"

একদৃষ্টে গভীর কালো চোখ দুটো মেলে চেয়ে রইলো মংলা। পাথর কুঁদো মুখে ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলো একবার — কিন্তু কিছু বললে না।

বন্‌শী দাওযা থেকে নেমে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল।

সেই দিকে শুকনো চোখ মেলে চেয়ে ছিল মংলা। হঠাৎ মনে পড়লো, তাইতো— সেই যে বিদেশীর হাতে টাঙিটা ছিল একদিন, সেটা তো দেওযা হলো না।—

সামনের চালেই গোঁজা ছিল সেটা। তাড়াতাড়ি সেটা পেড়ে নিয়ে ছুটলো সে বনের দিকে। সামনে বন্‌শী যাচ্ছে।

পেছন থেকে ডাকলো মংলা, "মাঝি।"

বন্‌শী ঘুরে দাঁড়াল।

মংলা বললে, "তোমার টাঙি।"—

"টাঙি!" বন্‌শী বললে, "থাক সযা ওটা তোমার কাছে। তোমার ছেলে হলে তার হাতে দিয়ে বোলো মোর কথা। বোলো মোর সাঙাৎকে।" এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো মংলা।

তারপর টাঙিটা নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলো ঘরে। এসে কুঁড়ের ঝাঁপ বন্ধ করে হু হু করে কাঁদতে লাগলো উপুড় হয়ে। কেন যে কাঁদলো মেয়েটা—শুধু সেই জানে।

শ্যামরায়ের মৃত্যু

নবেন্দু ঘোষ

শ্যামবাযেব মন্দির। মন্দিবেব গা বেযে হৃষ্টপুষ্ট অশ্বত্থের চাবা বেরিয়ে এসেছে, চুন সুবকি খসে পড়ে পড়ে মন্দিরের প্রাচীনত্ব তথা আভিজাত্যকে দিনেব পব দিন বাড়িয়ে তুলছে। খুব বড় নয, মাঝারি আকাবের মন্দিরটি। আকৃতির চেয়ে মাহাত্ম্যই বেশী তার।

বিগ্রহ শ্যামরায়ের। কিশোর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন—পরিধানে বাখাল বেশ। মন্দিরের ভিতবকাব অবস্থাও তার বাহ্যিকআকৃতির মতোই। শ্যামরাযেব সিংহাসনের পঞ্জরে উইপোকাবা দলে দলে বাসা বেঁধেছে, তাঁর পোশাক-পবিচ্ছদ আর আসবাব-পত্রে মলিনত্বের ছায়া।

কিন্তু মাহাত্ম্য আছে শ্যামবাযেব। প্রায় একশ বছর আগে বর্তমান পূজাবীর প্রপিতামহ বাসুদেব ভট্টাচার্য একদিন স্বপ্নঘোবে দেখেছিলেন ঐ শ্যামরায়কে— দেখেছিলেন যে শ্যামবায যেন তাঁকে বলছেন, "বড় কষ্টে আছি বাসুদেব। তোমার রাঙা বিলেব নাম সুন্দব হলেও তা আমাব থাকবার জায়গা নয় , জল, কাদা, সাপ-খোপের মধ্যে কি কবে থাকি বল্‌ত? আমায় শিগগিব শিগগিব উদ্ধাব কর্।"

শ্যামবাযকে পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধাব করে বাসুদেব ভট্টাচার্য রাতাবাতি দেশবিদেশে সিদ্ধপুরুষ বলে খ্যাতিলাভ করলেন। সে খ্যাতিব সংবাদ ঐ এলাকাব, মানে লক্ষ্মীপুরেব জমিদার শিবেশ্বর রাযেব কানে পৌঁছাল। বাসুদেব ভট্টাচার্যকে নিষ্কর ভূমিদান কবে শ্যামবাযেব জন্য তিনি একটি মন্দিব তৈবি কবে দিলেন। যে মন্দিবেব বলিবেখা ভেদ করে আজ হৃষ্টপুষ্ট অশ্বত্থেব চাবা বেবিযে এসেছে, ওইটিই সেই মন্দিব। দেশ-দেশান্তবে ছড়িয়ে গেল শ্যামবাযেব কথা। এলো অগণন ভক্তেব দল। এলো অসংখ্য অনুগ্রহ-লোভীব দল। কত লোকের দুবাবোগ্য ব্যাধি সাবল, কত মানুষেব মোকদ্দমায জযলাভ হলো, কত নাবীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচল শ্যামবাযেব কৃপায। কৃতজ্ঞ ভক্তেব দল পবিবর্তে নানা অর্ঘ্য দিল—ঘি, দুধ, ফল, মিষ্টি, দক্ষিণা। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায তুমুল কীর্তনেব বোল উঠত শ্যামবাযেব মন্দিব প্রাঙ্গণে— চোখেব জল ফেলে ভক্তেবা লাফাত, নযতো ঝিম মেরে বসে থাকত। কষ্টিপাথবেব শ্যামবায বহু ভক্তেব কৃতজ্ঞতাকে স্বীকাব কবে নিয়ে পবিতৃপ্তিব হাসি হাসতেন। কিন্তু সেদিন আর নেই। একশ' বছব আগেকাব ইতিহাস এখন ঝাপসা হয়ে এসেছে।

মড়ক এসেছিল। শ্যামবায বর্তমান থাকতেও মৃত্যু বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়েছিল তাঁব গ্রাম্য ভক্তেবা। বেশীব ভাগই মাবা গেল, যাবা বাঁচল তাবা শেষে গ্রাম ছেড়ে পালালো। নির্জন গ্রাম্য মন্দিবে শ্যামবায একা পড়ে বইলেন, আব বইলেন তাঁর সেবক বলরাম ভট্টাচার্য— বাসুদেবেব ছেলে-- বর্তমান পূজাবী জনার্দনেব পিতা।

তখন থেকেই একটু ভাঁটা পড়ল ভক্ত স্রোতে।

তারপর একটা ব্যাপাব ঘটল। দশ মাইল দূরে যে মহানগরীটা ছিল তা ক্রমশ রাহুর মতো গ্রাস করে চললো অন্যান্য গ্রাম এবং অবশেষে লক্ষ্মীপুরেব প্রান্তে এসে থামল।

তাবপব ইতিহাসেব ঘূর্ণমান চাকাব সঙ্গে এলো নূতন নূতন লোক, গড়ে উঠল বড় বড় অট্টালিকা, নির্মিত হলো বড় বড় ফ্যাক্টবী আর জুটমিল। দামী অর্ঘ্যের স্তূপ কমে এলো বটে,

কিন্তু নূতন ভক্ত জুটল শ্যামরায়ের। কুলি, মজুব, চোব, দালাল। কিছু দেয় না, শ্যামরাযেব কাছে তারা শুধু নিবন্তব চায। শ্যামরাযেব চোখেব তাবা স্তিমিত হযে এলো। গাযে জমল ধূলোর আস্তরণ, বেনাবসী চেলির গায়ে পচন ধবল, ভোগবাগেব দৈব আভিজাত্য কমে এলো। সিংহাসনের গা টিপলে এখন মচ মচ কবে ভেঙ্গে যায, মন্দিবের গা থেকে ঝপ ঝপ কবে চুন-সুবকি খসে পড়ে, প্রাযান্ধকাব মন্দিরাভ্যন্তবে সংস্কাবহীনতাব চাপা ও ভ্যাপসা গন্ধ অনবরত থম থম কবে।

কিন্তু ভূমিকা থাক।

মন্দির থেকে দু'শো গজ দূববর্তী যে পাটকলটাব চিম্‌নী বেয়ে গল্ গল্ কবে ধোঁযা বেরুচ্ছে তার মালিক নাগবমলজী একদিন তাব অফিসঘবে দ্রুত ও উত্তেজিতভাবে পাযচাবি কবছিল।

বাহুব মতো এই মহানগবীটা যখন দূরে ছিল—তখনকার কথা—পঞ্চাশ বছর আগেকাব কথা বলছি। নাগবমলেব বাবা সাগবমল আব তার বাবা সুবযমলেব কাহিনী। সে কাহিনী সবাই জানে। তিল থেকে তাল আব প্রবালকীট থেকে প্রবালদ্বীপ তৈবি করাব কাহিনী। ধান-চাল আর পাটের মহাজন থেকে অজস্র জোত, অসংখ্য অট্টালিকা ও বহু জুটমিলেব মালিক হওয়ার অতি দীর্ঘ কাহিনী। জটিল মস্তিষ্কেব জট-পাকানো বুদ্ধি, সর্বগ্রাসী লোভেব বহুদূব প্রসাবিত বাহু আব জালিয়াতির কাহিনীকে সবিস্তারে বলে ইতিহাসের নিবস ও শুকনো স্বাদ পেযে লাভ কি? তার চেয়ে কাহিনীতেই ফিরে আসি।

মিলেব ম্যানেজাব বাঙালী বাবু। অবিকল সাহেবদেব মতো মেজাজ তাব, তামাটে চেহাবাতেও সাহেবী চেকনাই। নাম মিঃ বাসু।

বাসু বললো, "যুগ বদলেছে নাগবমলজী, মজুবদেব তেজ দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে।"

নাগরমল হাসল, "যুগ বদলেছে—তা বটে"—

বাসু বললো, "মিলেব মজুররা আজকাল একজোট হযেছে—দিনরাত দল পাকিয়ে ফুসফাস্ কবে"—

"হুঁ"—নাগরমল মাথা নাড়ল, পাগড়িটাকে খুলে টেবিলের উপব বাখল, তাবপবে পকেট থেকে রুমাল বার করে টাকের ঘাম মুছে বললো, "মিঃ বাসু"—

"বলুন"—

"যুগ বদলায তা মানি, কিন্তু তাই বলে নিষ্ক্রিয হয়ে বসে থাকলে কি চলবে?"

"আজ্ঞে না"—

"মজুর-কুলি ছোটলোকদেব দল আজ মাথায চড়তে চাইলেই কি মাথাটাকে নীচু কবে দিতে হবে?"

"Certainly not"—

"তবে হুঁশিয়ার হোন, খোঁজ নিন কে এদেব দলের সর্দাব"—

"তা আমি জানি"—

"কে সে? কি নাম তার?"

"ত্রিলোচন দাস।"

"সেই কানা লোকটা, তাই না?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

নাগরমল চুপ করে ভাবল খানিকক্ষণ, তাব ধবধবে সাদা ললাটদেশে কালসাপের মতো মোটা মোটা কতকগুলো দুর্বোধ্য রেখা আত্মপ্রকাশ কবল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বইল নাগরমল।

ঘরের মধ্যে দ্রুতবেগে ফ্যান ঘুরছে, টেবিলেব উপরকার কাগজগুলো সশব্দে নড়ছে, দেওয়ালের বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে, মিঃ বাসুব টার্কিশ সিগারেটেব ধোঁযা ক্ষীণদেহ সরীসৃপের মতো ঘরের শূন্যতার্ম ভেসে বেড়াচ্ছে।

"মিঃ বাসু"—

'ইয়েস্ প্লীজ্?"

"খবর নিন, আরও ভালভাবে খবর নিন, খবর নিন ত্রিলোচনের দুর্বলতা কোথায়—কোথায় আঘাত করলে এক মুহূর্তে কামিয়াব হওয়া যাবে।"

আবার টাক মুছল নাগরমল, ললাটের কালসাপগুলো হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেল, তার মুখে দেখা দিল প্রশান্ত হাসি— সে বললো, "ঘাবড়াবেন না বাসুবাবু, হিম্মৎ চাই—তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বসন্ত হয়, মারীগুটিকায় আচ্ছন্ন মুখমণ্ডলে মৃত্যুর ঘোষণা। শ্যামরায়ের ওখানে অর্ঘ্য পড়ে।

কলেরা হয়, তরল, বিবর্ণ ভেদবমির মাঝে অসহায়ভাবে কাৎরায় ওরা। শ্যামরায়ের উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয়। শ্যামরায়, রক্ষা কর।

দারিদ্র্য, মৃত্যু, ব্যাধি, দুঃখ। শ্যামরায়, বাঁচাও, মঙ্গল কর, রক্ষা কর।

জনার্দন ভট্টাচার্য শ্যামরায়ের চরণামৃত বিতরণ করেন, তুলসীচন্দন আর পবিত্র বস্ত্র দিয়ে আশীর্বাদ করেন, "শ্যামরায় তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন, শ্যামরায় আমার জাগ্রত দেবতা।"

ত্রিলোচন—কানা ত্রিলোচন। ডান চোখটা তার বসন্তের ঘায়ে বসে গেছে, মুখমণ্ডলে আহত শ্বাপদের হিংসা। বা চোখের তারাটাকে বড় বড় করে উত্তেজিত কণ্ঠে সে সবাইকে বলে, "শ্যামরায়, শ্যামরায় বাঁচাবে তোদের, ওরে বোকারা, আমার কথা শোন্—বেচারী ঠাকুর দেবতারা মানুষের কিছু করতে পারে না —আমাদের দুঃখ দূর করার ভার আমাদেরি হাতে"—

সব কাজে সবাই মাথা নীচু করে যে-ত্রিলোচনের কাছে, তার মুখে একথা শুনে লোকেরা রাগ করতে পারে না, কেবল হাসে। পাগল, ত্রিলোচনটা পাগল, দশজনের কথা ভেবে ভেবে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, দশজনের কথাই ভাবে ত্রিলোচন। দিনরাত।

ম্যানেজার বাসু সেদিন মঙ্গলকে ধরে মারল।

ত্রিলোচন গিয়ে সামনে দাঁড়াল, বললো, "খবরদার ম্যানেজারবাবু—ওসব চলবে না।"

"হোয়াট্?" বাসু গর্জন করে এগিয়ে এলো। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ত্রিলোচনের পেছনে আরও একশ'জন এসে দাঁড়িয়েছে। একচক্ষু ত্রিলোচন যেন একটা সেনাপতির চেয়ে কম নয়। তার পশ্চাদ্বর্তী বাকী সবাই যেন এক-একজন সৈনিক। তাদের চোখে শাণিত ইঙ্গিত, অনর্থের সঙ্কেত।

বাসু পিছিয়ে গেল।

যখন খাটুনীর ঘণ্টা বাড়ল তখন তার অনুপাতে মজুরী বাড়ল না।

মজুরেরা তাকাল ত্রিলোচনের দিকে। একটা চোখ না থাকলেই বা কি? একটা চোখ দিয়েই অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায় ত্রিলোচন।

ত্রিলোচন বললো, "শালারা ভেবেছে যে তোদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়"—

"তাহলে কি হবে?"

"কি হবে তা কি জানিস না হতভাগারা? কাজ বন্ধ কর—ধর্মঘট"—

ত্রিলোচনের একটা কথায় যন্ত্রের গান বন্ধ হয়ে গেল।

সেই ত্রিলোচন যদি ভগবানকে না মানে, যদি সে শ্যামরায়ের মতো জাগ্রত দেবতাকে উপহাস করে, তাহলে কি ভাববে লোকেরা? পাগল, পাগল আমাদের ত্রিলোচন দাস।

খবর এলো।

আর একটু হলে নাগরমল লাফিয়ে উঠত, কিন্তু সে নিজেকে সামনে নিল।

সে বললো, "কাজ হয়েছে বাসুবাবু— কেল্লা মেরে দিয়েছি।"

বাসু বুঝতে পারলা না, ডান চোখের ভ্রূ তুলে প্রশ্ন করল, "মানে?"

"মানে আপনি যান আর জিতেনকে পাঠিয়ে দিন।"

"আচ্ছা। কিন্তু আমি বলছিলাম কি জানেন?"

"কি?"

"ত্রিলোচনকে ববখাস্ত কবলে কেমন হয?"

"আপনি পাগল মিঃ বাসু। আবও ধর্মঘট চান? না না, যা বললাম তাই করুন গে।"

জিতেন এলো। সাহেবদের পোষা বুলডগেব মতো দেখতে। খায়-দায় বসে থাকে, দবকাব হলে মনিবের ইঙ্গিতে শত্রুর টুঁটি লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ে।

জিতেন অনেকক্ষণ ধবে নাগরমলেব কাছে বসে রইল। অনেক কথা শুনল।

কথা শেষ হলে হেসে বললো, "শেঠজী —নির্ভাবনায় থাকুন।"

জনার্দন ভট্টাচার্য শ্যামবাযের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিলেন।

"শোন—শোন আমাব জাগ্রত শ্যামেব কীর্তি"—

পিতা বলবাম ভট্টাচার্যেব সময়কাব কাহিনী। প্রতিদিন নৈশভোগেব পবে শ্যামবাযকে শোযাতেন তিনি—রীতিমত তাকিয়া বালিশ, লেপ তোষকেব মাঝে।

তখন শীতকাল—একদিন একটা ভুল কবে বসলেন বলরাম। পারিবাবিক কাবণে মনটা বিক্ষুব্ধ ছিল বলে তাড়াহুড়ো করে শ্যামরাযকে শুইযে তিনি বাড়ি ফিবলেন। খানিকবাদে শুয়ে পড়লেন, ঘুমোলেন। ঘুমেব ঘোবে হঠাৎ যেন লাঠির ঘা খেলেন তিনি। স্বপ্ন দেখলেন যে, শ্যামবায যেন তাঁর গোরু-খেদানো লাঠি দিযে তাঁকে মাবছেন আব বলছেন—"লেপটা গাযে না দিযেই শুইযে এসেছিস তুই, আমায় খাতির কবতে বুঝি তোব ভালো লাগে না? অত সহজে নিষ্কৃতি পাবি না —খা লাঠির ঘা— কেমন, শিক্ষা হযেছে?" উত্তেজিত ক্রোধান্ধ শ্যামবাযকে তখন যেন আব চেনাই যায না।

ধডমড়িযে উঠে বসলেন বলরাম। সবিস্ময়ে দেখলেন যে দেহেব উপব লাঠিব ঘাযে কাল্‌চে কাল্‌চে দাগ পডেছে—স্বপ্ন মিথ্যা নয। তিনি মন্দিবেব দিকে দৌডে গেলেন। সত্যি, শ্যামবাযের অভিযোগ মিথ্যা নয়।

কাহিনী শেষ হলো। বিমুগ্ধ মজুরেবা নির্বাক হযে বসে বইল। এমন জাগ্রত দেবতা এই শ্যামবায!

ত্রিলোচন হেসে বললো, 'যত্ত সব গাঁজাখুরি গল্প বলছ ঠাকুব—মানুষগুলোর মাথা তো খেযেইছ আবাব তাদেব হাডগুলোকেও চিবোচ্ছ মাইবি"—

জিতেন বলে উঠল, "ছিঃ ছিঃ, এমন পাপকথা বলো না"—

অন্যান্য মজুরেবাও আজ একটু ক্ষুণ্ণ হলো।

জিতেন বলে চললো, "ঠাকুব দেবতা, ওঁদের নিয়ে অমন কথা বলতে নেই, আর অমন কথা শোনাও মহাপাপ"—ললাটে হাত তুলে সে শ্যামরায়কে প্রণাম জানাল।

জনার্দন বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি ত্রিলোচন, অতটা নাস্তিক হওযা ভালো না।"

অন্যান্য মজুরেরাও শ্যামরাযেব উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

ত্রিলোচন উঠে দাঁড়াল, একটা বিড়ি ধরিয়ে সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো, "তোরা যত সব জানোযাবের দল— তোদের বোঝাবে কোন্ শালা? যাঃ মরগে—চুলোয় যা হতভাগারা"—

সে চলে গেল।

জিতেন বললো, 'এতটা ভালো না মাইরি, সত্যি বলছি—এটা বাড়াবাড়ি। তুই সবাব সর্দার কিন্তু তাই বলে ঠাকুর দেবতাকে গেরাহ্যি করবি না—তা কি হয়?"

জনার্দন সায় দিলেন, "ঠিক— কথা বলেছ"—

মজুরেরা স্তব্ধ হয়ে রইল। সত্যি, ত্রিলোচন বড় অন্যায় কথা বলে, ওর এতটা বাড়াবাড়ি ভালো না। হলেই বা সর্দার, সব কিছুতে সর্দারী কি সহ্য করা যায়?

ব্যাপারটা একদিন আরও বেড়ে গেল।

কলেরা—বস্তিতে কলেরা দেখা দিয়েছে। আর্ত কোলাহলটা ক্রমশ এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে সংক্রামিত হচ্ছে তখন।

শ্যামরায়ের ওখানে গিয়ে সবাই ভিড় করল।

"ঠাকুর, চন্নামেরত দাও—বাঁচাও"—

সহ্য হয় না ত্রিলোচনের।

"চন্নামেরত! চন্নামেরত'তে কলেরা সারবে? ওরে পাগলেরা—বরং চল ডাক্তার ডাকিগে"—

জনার্দন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রাচীন পূজারীবংশের বংশধরের মুখে ক্রোধ ঘনিয়ে এলো. তাঁর উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে অকস্মাৎ একটা রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে গেল।

ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "সাবধান, সাবধান ত্রিলোচন—নাস্তিকতারও সীমা আছে"—

মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ মজুরদের চোখেও বিরক্তি ঘনিয়ে এলো। তার সঙ্গে ক্রোধ।

জিতেন বললো, "তোমার বাড়াবাড়ি কিন্তু আমরা আর সইব না ত্রিলোচন"—

এক চোখ পাকিয়ে ত্রিলোচন হেসে বললো, "কি করবি? মারবি? মার—কিন্তু যা সত্যি তা বলতে আমি ডরাইনারে শালা। আবার বলছি শোন্, বুদ্ধির মোড় ফেরা— দেব্‌তা ফেব্‌তাতে কিচ্ছু হবে না।"

জনার্দন এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, উত্তেজনার আতিশয্যে তাঁর দেহ থেকে উত্তরীয়টা খসে পড়ল, আগুনের মতো টক্‌টকে রঙের ঋজু দেহটাকে কঠিন করে তুলে তিনি বললেন, "শ্যামরায়, আমার জাগ্রত ঠাকুর শ্যামরায়কে তুই বিশ্বাস করিস না।?"

ত্রিলোচনও যেন গরম হয়ে উঠেছে, দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচিয়ে, ভেংচি কেটে সে বললো, "জাগ্রত না কচু, পাথরকে তেলচন্দন আর খাবার দিলেই জাগ্রত হয়ে গেল আর কি!"

"খবরদার"— জিতেন লাফিয়ে এগিয়ে এলো।

হঠাৎ যেন বীভৎস হয়ে উঠল ত্রিলোচন, " তোমাদের জন্যই তো দেশটা উচ্ছন্নে গেল ঠাকুর—কি আফিংই যে খাইয়েছ এই জানোয়ারগুলোকে —উঃ"—

"খবরদার"—অনুগ্রহপ্রার্থী ভক্ত মজুরেরাও চেঁচিয়ে উঠল।

"তবেরে শালা"—আচমকা জিতেন এবং আরও দু'তিনজন এসে ত্রিলোচনের উপর লাফিয়ে পড়ল। মাটির উপর আছড়ে পড়ল সে, আর আক্রমণকারীরা অজস্র কিলচড় বর্ষণ করে চললো তার উপর।

জনার্দন বললেন, "থাম, থাম।" মজুরদের ক্ষিপ্ততা দেখে হঠাৎ তাঁর ভয় হলো, ত্রিলোচনের উপর একটু সহানুভূতির উদ্রেক হলো।

শেষ পর্যন্ত থামল বটে ওরা, কিন্তু তখন ত্রিলোচনের দু'কশ বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে, বসন্তের দাগে বিকৃত মুখমণ্ডলে ও চোখের তারাতে একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে।

ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল, আততায়ী বন্ধুদের দিকে দৃষ্টিপাত করে মৃদুকণ্ঠে সে হেসে বললো, "শেষ পর্যন্ত মারলি আমাকে, এ্যাঁ? আমায় মারলি?"

কেউ জবাব দিল না।

টলতে টলতে চলে গেল ত্রিলোচন। আড়ালে গেল সে। যেন পরম একটা লজ্জার হাত থেকে সে আত্মরক্ষা করতে চায়, যেন একটা পশুর মতো একা একা সে নিজের ক্ষতকে লেহন করতে চায়। হঠাৎ মুষড়ে পড়ল, শক্তিহীন হয়ে পড়ল ত্রিলোচন—আকাশের বিদ্যুৎ যেন হঠাৎ তাকে অসাড় করে ফেলেছে।

কিন্তু তবু ব্যাপারটা থামে না, মজুরদের শক্তি কমে না। ত্রিলোচন সরে গেছে, তার প্রতাপের ফণা আজকাল আর নেই, তাকে আর আজকাল কেউ আমল দেয় না। তবু নাগরমলের প্রাণে স্বস্তি নেই—মজুরেরা দমে নাই।

কিন্তু কেন?

"বাসুবাবু"—

"ইয়েস প্লীজ্?"

"আরো ব্যাপার আছে—খবর লিন—খবর লিন—দেখুন, এখন ওদের কে উসকানি দিচ্ছে।"

তর্জনীর আঘাতে টার্কিশ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে মিঃ বাসু বললো, "আচ্ছা।"

নাগরমল—কোটি কোটি টাকার মালিক নাগরমল। কুবেরের মতোই যার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার আর ভুঁড়ি। সেই নাগরমলের বিরুদ্ধে কে উস্‌কাচ্ছে মজুরদের? ত্রিলোচনের শূন্যস্থান কে পূরণ করল?

নাগরমল অতিরিক্ত ভাতা দিচ্ছে না, কাজে 'নাগা' হলে মাইনে কাটে সে। তার এই জুলুমের বিরুদ্ধে মজুরেরা রুখে দাঁড়াল। কি করে সম্ভব হলো তা? আজ তো ত্রিলোচন নেই, সে আজকাল আহত পশুর মতো শুধু আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু আছেন জনার্দন ভট্টাচার্য। জাগ্রত শ্যামরায়ের একনিষ্ঠ পূজারী—যাঁর আগুনের মতো টক্‌টকে দেহবর্ণে দেবতার জ্যোতিঃশিখা, মাথার কেশে যাঁর অনেক জ্ঞানের শুভ্রতা।

"ঠাকুর—বড অত্যাচার হচ্ছে"—

"কি অত্যাচার? কার?"

"মালিকের।"

"কি হলো?" জনার্দন বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

মজুরেরা সব নিবেদন করল।

জনার্দন প্রথমে শ্যামরায়ের দিকে তাকালেন, তারপরে তাকালেন ভক্তদের দিকে, বললেন, "এর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াও, লড়াই কর তোমরা—শ্যামরায় তোমাদের সহায় হবেন।"

নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল মজুরেরা, তাদের চোখগুলো জ্বলে উঠল।

কিন্তু আড়ালে ত্রিলোচন বিকৃত হাসি হাসল। পণ্ডিতও আজ তার পথ ধরেছে, কিন্তু শ্যামরায়ের দোহাই কেন? কেন, কেন ঐ পাথরটার দোহাই? পাথর—হ্যাঁ, পাথরই তো। তার চোখ দিয়ে এবার আগুন ঠিকরে বেরোয়। মনে পড়ে নিজের জীবনের কথা। স্ত্রী, পুত্র, সংসার, আশা—সব ছিল ত্রিলোচনের। একচক্ষু ত্রিলোচনের দুটো চোখই ছিল। আর—আর সে এককালে পাথরেও দেবতাকে খুঁজত। কিন্তু দেবতাকে ডেকেও যখন স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, সংসার হাওয়ায় মিলালো, আশা শুধু ছাই হলো, দু'চোখের একটা গলে গেল, তখন থেকেই ত্রিলোচনের জ্ঞান হলো। একচোখেই সে পূর্ণ দৃষ্টি পেল। ভুল ভেবেছিল সে, এত দিন মিথ্যে সে বাতাসে প্রার্থনা ভাসিয়েছে, মিথ্যে সে লবণাক্ত অশ্রুরাশি বর্ষণ করেছে। ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুরদৃষ্ট—পাথরের মূর্তি কোনটাতেই কাজে লাগে না। পাথর পাথরই আর কিছু নয়। অতএব? কেন ঐ পাথরটার দোহাই?

ত্রিলোচন না বুঝলেও নাগরমল বুঝল সেকথা। বুঝল যে নেতৃত্ব নয়, ব্যক্তিত্ব নয়—এখন একটা পাথরের মূর্তিই ওদের উস্‌কাচ্ছে। হঠাৎ বুদ্ধির জগতে বিদ্যুতের মতো একটা কথা ঝলসে উঠল।

"বাসুবাবু।"

"বলুন।"

"শহরের সেরা ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকুন।"

"কেন?"

"কাজ আছে।"

"কিন্তু শেঠজী—একটা কথা আছে। মজুরেরা যে আবার বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে—স্ট্রাইক করবে বলে শাসাচ্ছে"—

"কোনও ভাবনা নেই, আপনি ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকুন আর চারদিকে রাষ্ট্র করে দিন যে ঐ শ্যামরায়ের মন্দিরের কাছেই বিরাট একটা মন্দির গড়ব আমি।"

"মন্দির! মানে টেম্পল?" বাসুর গলায় টার্কিশ সিগারেটের ধোঁয়া যেন আটকে গেল।

"হ্যাঁ, মন্দির। কেন, আপনি কি ঠাকুর-দেব্‌তা মানেন না?"

"নিশ্চয়ই, Sure—মানি বইকি।"

"তবে যান—"

সবাই শুনল সেকথা। কোটি কোটি টাকার পাহাড়ের উপর যে নাগরমল বসে আছে, সে যদি আজ চার লাখ টাকা দিয়ে একটা মন্দির গড়ে তোলে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

কিন্তু তবু আশ্চর্য হয় মজুরেরা। নাগরমল লোকটার তো ভক্তি আছে! কোটি কোটি টাকা থাকলেই বা দেবতার জন্য লাখ লাখ টাকা ক'জন খরচ করে? এটা কম কথা নয়। শুধু আশ্চর্য নয়, মুগ্ধ হয়ে যায় মজুরেরা।

কিন্তু কোন্ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করবে নাগরমল? কেউ তা জানে না।

শুধু নাগরমল জানে সেকথা।

সন্ধ্যার পরে জনার্দন এসে নাগরমলের কাছে হাজির হলেন। নাগরমল তাঁর পদধূলি মাথায় নিল, বিনয়াবতার হয়ে বললো, "বসুন পণ্ডিতজী—"

জনার্দন প্রশ্ন করলেন, "কি জন্যে ডেকেছেন শেঠজী?"

ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে নাগরমল বললো, " খোলাখুলি বলব পণ্ডিতজী?"

"বলুন।"

"আমি মন্দির করছি, জানেন?"

"শুনেছি—খুব সাধু সঙ্কল্প আপনার।"

"আমি এ মন্দিরে আপনার শ্যামরায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।"

"পাগল!" জনার্দন সহাস্যে উঠে দাঁড়ালেন। পৃথিবীতে আজ কেউ নেই জনার্দনের। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, ঐশ্বর্য—সব কিছুই আজ ঐ শ্যামরায়! একের পর একটা করে পার্থিব সম্বন্ধ যতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ততই জনার্দন বুঝতে পেরেছেন যে, এই বিরাট বিশ্ব-জগতে একমাত্র শ্যামরায় ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। সেই শ্যামরায়কে তিনি অন্যের হাতে সঁপে দেবেন। পাগল।

নাগরমল গম্ভীরকণ্ঠে বললো, "উঠবেন না, বসুন—কথাটা উড়িয়ে দেবেন না। আপনার মন্দির প্রাচীন, আমার নূতন মন্দিরে নববেশে শ্যামরায় বিরাজ করবেন, আর আপনিই তাঁর পূজারী হবেন—"

"না।"

"কিন্তু কেন?"

"বড়লোকেব প্রাসাদে গেলেই দেবতার মাহাত্ম্য বাড়ে না। তাছাড়া শ্যামবায় আমার— আমাব বুকের পাঁজরা—"

"কিন্তু আপনার জীর্ণ মন্দিব—"

"জীর্ণতাই তো তাব মাহাত্ম্য—"

নাগরমল হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, "পণ্ডিতজী—"

"কি?" জনার্দনের চোখ জ্বলজ্বল কবছে।

"টাকা দেব আপনাকে—"

"চাই না—"

"হাজার—পাঁচ হাজাব—"

"না।"

"দশ হাজার—"

জনার্দন হাসলেন, "টাকা দিয়ে ভগবানকে কেনা যায়? না আব না, আমি চললাম শেঠজী—"

আর কোনো কথা না বলে, কোনো উত্তবেব প্রত্যাশা না কবে জনার্দন ভট্টাচার্য ঘব থেকে বেবিয়ে গেলেন। নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ কবে দেযালঘড়িব টিক টিক শব্দটা শোনা যেতে লাগল, একটা অর্বাচীনের খিক খিক হাসিব মতো।

জনার্দনেব গমন-পথেব দিকে তাকিযে থাকতে থাকতে নাগরমলেব ধবধবে সাদা ললাটদেশে আঁকাবাঁকা কালসাপদেব দেখা গেল। একটা ক্রূব বীভৎসতায হঠাৎ তাব মুখমণ্ডলটা ভযানক হয়ে উঠল।

বিলেত-ফেবত ইঞ্জিনিযাব এসেছে। এসেছে সব ওস্তাদ কাবিগবেবা। জযপুব থেকে পাথব এসেছে, বাঙলা বোম্বাই থেকে শিল্পীবা। নাগবমলের বিবাট মন্দিব যেন মানুষদেব ভক্তি-অনলে ইন্ধন জোগায।

তাই হলো। ছ'মাসেব মধ্যে বিবাট মন্দিব গড়ে উঠল। শ্বেতপাথব আব কষ্টিপাথবেব মেঝে, প্রাচীবগাত্রে পৌরাণিক দেবদেবীদেব অপূর্ব চিত্রকাহিনী। চন্দনকাঠ, সোনা আব রূপো দিয়ে বিগ্রহেব সিংহাসন নির্মিত হলো, দেবতাব পবিচ্ছদেব জন্য এলো দামী দামী বেশম। মনে হলো যে বৈকুণ্ঠেব বিষ্ণুকেও বুঝি টলানো যাবে।

মনেব বিদ্রোহ দমিত হয়। অভ্রভেদী মন্দিবেব ধোঁযাটে চূড়াকে দেখে ভয হয, ভক্তি হয, দেবতাব অপ্রতিহত ক্ষমতাব কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নাগবমলেব উপর রাগটা যেন কমে আসতে চায।

আড়ালে ত্রিলোচন মনে মনে গর্জায়। অন্ধ, ওরা অন্ধ। আফিংয়ের নেশায আচ্ছন্ন, সম্মোহিত হযে আছে ওবা। ওবা অসহায়, নিজেদের অপবিসীম ক্ষমতাব কথা জানে না বলেই ওবা অমনভাবে মাথা খোঁড়ে।

রাত হযেছে তখন। শ্যামবাযেব পূজা, আরতি, ভোগ, শযান সব শেষ কবে জনার্দন বাড়ি ফিরছিলেন। একশ' বছরেব শ্যামরাযের মনভোলানো হাসিটা তখনো তাঁব চোখের সামনে ভাসছিল।

এমনি সময়ে কালো যবনিকা নেমে এল।

অন্ধকারের মাঝখান থেকে সজোরে একটা রামদা এসে তাঁর ঘাড়ে পড়ল। কোনো কিছু ভাববাব আগে, 'শ্যামরায়' বলে ডাকবাব আগেই জনার্দন ভট্টাচার্যের মাথাটা তিনহাত দূবে ছিটকে পড়ল। মাটিতে ইট পড়লে যেমন শব্দ হয় রাম দত্তদেব বাগানে তেমনি একটা শব্দই শুধু শোনা গেল আব লাল রক্তের মদির গন্ধে বাতের অন্ধকাব বিহ্বল হযে উঠল। আর কিছু নয়।

তারপরেই হঠাৎ একদিন এক অপূর্ব কাহিনী শোনা গেল।

শ্যামরায়েব মন্দিরকে এখন যাবা দেখা-শোনা করছিল নাগরমল তাদের ডেকে পাঠাল।

দীনভক্তের মতো নম্রভাবে, বিনীতকণ্ঠে সে তাদেব এক বিচিত্র স্বপ্নকথা বললো। কাল রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে। দেখেছে যে শ্যামরায়—জাগ্রত দেবতা শ্যামরায় যেন তাকে করুণকণ্ঠে মিনতি কবে বলছেন, "আমায় নিয়ে যা নাগব—আমায এ ভাঙ্গা মন্দির থেকে উদ্ধার কব—সবাইকে বল্"—

"আপনাবা এবার আমায় কি করতে বলেন?" মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল নাগরমল। একমুহূর্ত চুপ করে রইল ওবা, তাবপরেই সবাই সম্মিলিতকণ্ঠে বলে উঠল, "নিয়ে যান, শ্যামবাযকে আপনার মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত করুন শেঠজী—"

নাগবমলেব কণ্ঠে আবেগ, চোখে জল। সে বললো, "আমি ধন্য হলাম। তবে ও মন্দিবকেও সারিয়ে দেব আমি, নূতন মূর্তিব প্রতিষ্ঠা করব ওখানকার শূন্য সিংহাসনে — যে টাকা লাগে—আমি, আমি দেব তা।"

সারা শহবে ছড়িয়ে পড়ল এই দিব্য কাহিনী।

প্রেতের মতো ঘুবে বেড়াচ্ছিল যে ত্রিলোচন তার কানেও একথা গেল। মুহূর্তে সে আজ শ্যামবাযেব ক্ষমতাকে উপলব্ধি কবল—কি অদ্ভুত সে ক্ষমতা।

থুথু ফেলে সে গাল দিয়ে বললো, "শালা—প্যাঁচার বাচ্চা"—

তাবপবে একদিন মহাসমাবোহে নাগবমলেব মন্দিবে শ্যামবাযের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। সেদিন পাটকল বন্ধ বইল, মজুবেবা ছুটি পেল।

আঃ, কি অপৰূপ দেখাচ্ছে শ্যামবাযকে।

তখন সন্ধ্যারতি হচ্ছিল। শ্যামবায়েব বয়স হযেছে—একশ' বছব— তবু বার্ধক্যবিহীন প্রস্তবেব মাঝে অনন্তকালেব কৈশোরকে যেন শিল্পী অমব কবে তুলেছে। সোনা, ৰূপো, জবি, বং আব আলোব উৎসব। কে এককোণে ধ্রুপদ গাইছিল—তার সঙ্গে একজন ঝাঁপতালে পাখোয়াজ বাজাচ্ছে— সেই গুৰু গুৰু শব্দে মন্দিব যেন মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে। বহু বছবেব বুভুক্ষু শ্যামরায তাঁর কোটিপতি ভক্তেব অর্ঘ্যেব দিকে তাকিযে আছেন—তাঁর রসনায জল এসেছে, তাঁর পবিপুষ্ট ও ধনুকেব মতো বাঁকা ঠোঁটেব কোণে চঞ্চল কিশোরেব দুষ্টামিভবা হাসি। অপৰূপ!

ত্রিলোচন জ্বলে পুড়ে মবে। কি কবে ওদেব জাগানো যায?

দিনেব পর দিন কাটে।

কি কবে, কি কবে ওদেব জাগানো যায?

আবার সেই এক ইতিহাস। ব্যাধি, মড়ক, দারিদ্র্য। শ্যামরায বাঁচাও, বক্ষা কবো। চবণামৃত আব তুলসী-চন্দন। প্রস্তবেব আশীর্বাদ। আফিং খেযে ঝিমোয় সবাই। আর সেই অবসরে নাগরমলেব ভুঁড়ি বাড়ে, ধীবে ধীবে বসিযে বসিযে সে হতভাগাদেব গলা কাটে। আজ আর ভয় নেই—আজ নাগরমল সেই শ্যামরায়ের পূজাবী— যে জাগ্রত মজুরদেব অনাহাব থেকে বাঁচান, মৃত্যু থেকে বক্ষা কবেন, দাবিদ্র্য থেকে উদ্ধাব করেন।

অসহায়ভাবে ছট্‌ফট্ করে ত্রিলোচন। কি কবা যায, কি করা যায়? কি করে ওদেব জাগানো যায?

আগুন।

শেষরাতে কোলাহল ধ্বনিত হলো।

ছুটে এলো শত শত মজুর।

"আগুন—শ্যামবায়ের নতুন মন্দিরে আগুন লেগেছে—"

"কেরোসিন তেল আব পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়েছে কেউ—"

"দমকল ডাকো— ফোন করো—"

"শ্যামবাযকে উদ্ধার কব।"

এমনি সময়ে ছুটে এলো ত্রিলোচন। তাব একচোখ উত্তেজনায জ্বলছে, সে কাঁপছে।

"যাচ্ছি—আমি উদ্ধার কবছি শ্যামবায়কে—"

কাউকে কিছু বলাব সুযোগ না দিয়ে অগ্নিকুণ্ডেব ভিতরে ছুটে গেল সে। শ্যামবাযের প্রকোষ্ঠের শালকাঠেব দবজাটা তখন পুড়ে গেছে, আগুন বিস্তৃত হযেছে ভিতবেব দিকে, স্পর্শ করেছে সিংহাসনকে।

ভয়াবহ বীভৎসতায় কুটিল হয়ে উঠেছে ত্রিলোচনেব মুখমণ্ডল। দুটো হাত বাড়িয়ে সে শ্যামবাযকে তুলে নিল।

মৃদু, মোলায়েম কণ্ঠে সে বললো, "একশ" বছব বযেস হযেছে তোমাব—আর বেঁচে লাভ নেই শ্যামরায—"

শ্বেতপাথবেব মেঝেব উপব কষ্টিপাথবেব কিশোব মূর্তিটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আগুনের ঝাপ্‌টা এসে চামড়ায লাগছে, পড়ছে ফোস্কা, তবু হাসল ত্রিলোচন। আঃ, আজ সে তৃপ্ত।

সমস্ত মন্দিবে তখন দীপান্বিতা উৎসব শুরু হযেছে, কাঠেব দবজা জানালাব চটাচট্ শব্দ শোনা যায। শ্যামরাযেব সোনা রূপো দিযে মোড়া চন্দনকাঠের সিংহাসনটা তখন কাগজেব মতো দাউ দাউ কবে জ্বলছে। বাতাসে চন্দনেব একটা সুতীব্র সুঘ্রাণ।

লেলিহান হযে উঠেছে—ক্ষুধার্ত বাক্ষসেব মতো চমৎকার আহার্য পেযে সেই অগ্নিবাশি যেন পরিতৃপ্তিব বাক্ষসী নিঃশ্বাস ফেলছে। আঃ—আঃ। ধোঁয়া উড়ছে, আগুনেব সর্প-জিহ্বা বাতাসকে লেহন কবছে—ত্রস্ত, ব্যস্ত, ভয়ার্ত মজুবেবা দৌড়াদৌড়ি করছে।

বেরিয়ে এলো ত্রিলোচন। জামা কাপড় পুড়ে গেছে, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায দগ্‌দগে ঘা আব ফোস্কা নিযে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো ত্রিলোচন।

মজুরেরা সবাই ছুটে এলো কাছে।

"পাবলাম না—ভাইসব, পারলাম না—" বিচিত্র হাসি হেসে বললো ত্রিলোচন।

সবাই তাকাল ত্রিলোচনেব দিকে। তাকে দেখে তাদের ভয় হয, ভক্তি হয। শ্যামরাযকে উদ্ধাব করা গেল না! হঠাৎ ওরা দুর্বলবোধ কবে। এবাব? এবার কি হবে?

"ত্রিলোচন—কি কবি তবে?"

"কিছু না—শুধু দেখ্— দেখ্ কি চমৎকাব আগুন জ্বলছে—"

স্থিব হয়ে দাঁড়াল সে। ঘা, ফোস্কা—কিছু যায় আসে না। সেই ভীতিজনক আগুনেব আলো এসে তার মুখের ওপর পড়েছে, বসন্তেব দাগে বিকৃত মুখমণ্ডলের উপর এক বিচিত্র বীভৎস হাসির রেশ। আগুনের অপরূপ দীপ্তির দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। পুড়ুক, শ্যামরায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হোক। মিষ্টি চেহারার অন্তরালে পাথরের মতো নিষ্ঠুর ও নির্লিপ্ত মন যে শ্যামরায়ের তার অনেক বযস হয়েছে—শ্যামবায় মরুক। দেবতারা সব রক্তবীজের মতো—মরেও মরে না। দেবতারা না মরুক, অন্তত শ্যামবাযের মতো দেবতারা মরুক। শ্যামরায়কে আব নয়। নূতন দেবতা চাই এবাব—যাঁকে টাকা দিয়ে কেনা যাবে না, যাঁকে বিশ্বাস করার জন্য বুদ্ধি ও মানবত্বকে বলি দিতে হবে না।

এক চোখ—মাত্র একটা চোখ ত্রিলোচনের। ডান চোখটা তার বসন্তের ঘায়ে গলে গেছে, গায়ে তার ঘা আর ফোস্কা, তবু তার মুখে আজ পরিতৃপ্ত শ্বাপদের উল্লাস। একটা চোখ—মাত্র বাঁ চোখটা আছে তার। আর সেই বাঁ চোখের উপর সেই অগ্নিলীলার আলো এসে পড়েছে—ঝক্‌ঝক্ করছে সেটা—অনির্বাণ সূর্যকান্ত মণির মতো।

বিকল্প

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

তিনজনের ছোট্ট সংসারে কোন অশান্তি ছিল না। সুধা, তার বাবা হরগোবিন্দ আর সুধার ছোট ভাই হাবুল—তিনজনে মিলে শহরের সীমান্তে যে একটুখানি সংসার রচনা করেছিল তাতে অভাব অনটন অসুবিধে অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু অশান্তির কথা কারও মনে হয় নি। সরু গলির মধ্যে পুরনো দোতলা ভাড়াটে বাড়ি। তার একতলায় একখানি মাত্র ঘর তিনজনের ভাগে জুটেছে। এই ঘরখানির মধ্যেই রান্না খাওয়া শোওয়া সব। আবার এই ঘরে ব'সেই হাবুল তার স্কুলের পড়া পড়ে। অসুবিধে খুবই হ'ত। সুধা মাঝে মাঝে হরগোবিন্দকে বলত, "বাবা, আর একটা ভাল বাড়ি দেখ। এই একখানা ঘরে কি চলে?"

হবগোবিন্দ বলতেন, 'তা ঠিক। তোদের ভারি কষ্ট হচ্ছে। বাড়িটা বদলাতে হবে।"

কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যে বদলানো আর হয়ে ওঠে নি। অবশ্য ভাল বাড়ির খোঁজ অনেকবারই এসেছে। দুখানা ঘর আর রান্নাঘর, বাথরুম সমেত ফ্লাটের খবর কয়েকবারই নিয়ে এসেছে হাবুল। হরগোবিন্দ চাটুয্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িও দেখে এসেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাড়া, সেলামি আর অ্যাডভান্সের অঙ্ক শুনে আর এগোন নি। পুরনো বাসায় ফিরে এসে ছেলে-মেয়েকে বলেছেন, "দূর মিছিমিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট করা। তার চেয়ে এই কুড়ি টাকার ঘর আমাদের ঢের ভাল। আর এর চেয়ে বেশি জায়গায় আমাদের হবেই বা কি?'

সুধা হেসে বলত, 'আমি, জানতুম বাবা। তুমি এ ঘর ছেড়ে কোথাও নড়বে না।'

হরগোবিন্দ জবাব দিতেন, 'নড়ব রে নড়ব। আগে দায়মুক্ত হই, তারপর অন্য দিকে তাকাব। এখন কি আমার বাজে খরচ করবার সময় আছে?'

বাবার কথার মানে যে কি তা ভাইবোন দুজনেই বুঝতে পারত। হাবুল পড়তে পড়তে দিদির দিকে একবার তাকিয়ে মুখ মুচকে হেসে ফের বইয়ে মন দিত।

সুধা লজ্জিত হয়ে বলত, 'বাবা আমি বুঝি তোমার একটা দায়? তুমি কেবলই ওই এক কথা বল।'

হরগোবিন্দ বলতেন, 'দায়ই তো। পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়। কিন্তু তোকে বিদায় দিয়ে কি ক'রে যে আমি থাকব তাই ভাবি।'

সুধা একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলত, 'আমাকে বিদায় দেওয়ার কথা তোমাকে অত ভাবতে হবে না। আমি চ'লে গেলে তোমাদের চলবে কি ক'রে? হাবুল তো এখনও কত ছোট। ও কি তোমার যত্ন-আত্তি করতে পারবে? ও বড় হোক, বিয়ে-থা করুক, তারপর—'

হরগোবিন্দ হাসতেন, 'পাগলী। ততদিনে তুই যে একেবারে বুড়ী হয়ে যাবি।'

সুধা বলত, 'তা হ'লে তো ভাবনাই চুকে গেল। চিরকালের জন্যে তোমার বুড়ীমা হয়ে তোমাব কাছে থেকে যাব। আমাকে কাছছাড়া করবার কথা তুমি আর তখন ভাবতেই পারবে না।'

কিন্তু ওই একটিমাত্র কথা ছাড়া হরগোবিন্দের আর কোন ভাবনাই যেন নেই। দিনের বেশির ভাগ সময় অফিসের কাজে কাটে। বাকি সময়টুকু সুধার বিয়ের চিন্তা, চেষ্টা আর আলোচনা নিয়েই থাকেন হরগোবিন্দ।

পাড়ায় কৃপণ ব'লে বদনাম আছে তাঁর। কোন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জন্যে চাঁদা চাইতে গেলে সিকি-আধুলির বেশি তাঁর হাত দিযে গলে না। নিজের জামা কাপড় জীর্ণ হয়, ময়লা হয় ; সে সম্বন্ধে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু ছেলের পোশাক আর মেয়ের শাড়ি গয়না কিনে দেওয়ার দিকে দারুণ ঝোঁক। ফুরসৎ পেলেই মেয়েকে নিয়ে স্যাকরার দোকানে যান। পুরনো গয়না ভেঙে নতুন ডিজাইনের ফরমায়েস দেন। বছরে দু-চারখানা ক'রে নতুন গয়না না গড়ালে হরগোবিন্দের তৃপ্তি হয় না। সুধা প্রায়ই আপত্তি করে, 'এত গয়না কেন করছ বাবা?'

হরগোবিন্দ জবাব দেন, 'সব তো এক সঙ্গে করতে পারব না, আস্তে আস্তে ক'রে রাখি। তোর মার তো কিছুই পেলিনে।'

প্রায় বছর তিনেক যক্ষ্মায় ভুগে সুধার মা নির্মলা মারা গেছেন। সেও বছর দশেক হ'ল। তখন মাইনে বেশি ছিল না হরগোবিন্দের। স্ত্রীর ওষুধ-পথ্যেব খরচ জোগাতে তাঁর গায়ের গয়না থেকে শুরু ক'রে নিজের ঘড়ি বোতাম পর্যন্ত গেছে। আরও প্রায় সাত-আট শ'টাকা দেনা হয়েছিল। কষ্ট করে থেকে বিলাস-ব্যসন ত্যাগ ক'রে সব দেনাদায় শোধ দিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছেন হরগোবিন্দ। তাঁব মত একজন দেড় শো টাকার কেরানীর পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বেব কথা নয়। সুধাকে ভাল ঘরে-বরে দেবেন—এখন এই তাঁর একমাত্র সাধ। সেই সাধ মেটাবার জন্যে তিনি অসাধ্য সাধন করছেন। অফিসের চাকরিব পরে একটি পার্টটাইম কাজ নিয়েছেন। সংসার খরচের জন্যে যা লাগে মেয়ের হাতে তুলে দেন, বাকী টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখেন। গযনাও অল্প স্বল্প মেয়ের গায়ে থাকে। পাছে হারিয়ে যায কি চুবি যায, সেই আশঙ্কায বিদেশী ব্যাঙ্কে বেশি ভাড়া দিয়ে বাকীগুলি নিরাপদে রাখেন হরগোবিন্দ।

মাঝে মাঝে হাবলু সুধাকে বলে, 'দিদি, বাবা তোকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।'

সুধা হেসে জবাব দেয়, 'ভারি হিংসুটে তো তুই। কিসে প্রমাণ পেলি? বাটখারায় ওজন ক'রে দেখেছিস?'

হাবলু বলে, 'দেখেছি বই কি। আমাব যেখানে এক পো, তোর সেখানে এক সের। তোব বিয়েব জন্যেই তো বাবা কেবল টাকা জমাচ্ছেন।'

সুধা বলে, 'ও, তোর বুঝি সেই দুঃখ! তোর বিয়ের জন্যেও আব একজনের বাবা এব চেয়ে বেশি টাকা জমিয়ে তুলছে তা জানিস?'

টাকাও জমে, গয়নাও জমে। বিয়েই শুধু হয় না সুধার। তিন-চাব বছর ধ'রে এত সম্বন্ধ এল গেল, কিন্তু হরগোবিন্দের মোটে পছন্দই হয় না। যে ছেলের রূপ আছে তার বিদ্যা কম, যার বিদ্যা আছে তার আবার বিদ্যা বিক্রির সামর্থ্য কম, যার অর্থ আছে তার আবার কুল নেই; এমনি বাছাই করতে করতে সুধার বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেল।

সুধার মাসীমা থাকেন বউবাজারে। তিনি প্রায়ই এসে হরগোবিন্দকে তিরস্কার ক'রে যান, 'জামাইবাবু, এ করছেন কি? দেখে শুনে মেয়ের এবার বিয়ে দিন। বয়স হয়ে গেছে: এখন বেশি বাছবিচার করা কি ভাল?'

হরগোবিন্দ জবাব দেন, 'কি করব বল কমলা? তোমার মত চার-পাঁচটি তো নয়, আমার ওই একটি মাত্রই মেয়ে। বাছবিচার একেবারে ছেড়ে দিলে কি চলে? তা ছাড়া হিন্দুব ঘর। একবার ভুলভ্রান্তি হ'লে তো আর শোধরাবার জো নেই।'

সুধাও বাপের পক্ষ টেনে কথা বলে। তারও বিয়েতে ভারি অমত। হাবুল আরও বড় হোক, স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকুক, নিজের শরীরের আর জিনিসপত্রেব যত্ন নিতে শিখুক, তাবপব বিয়ে করবে সুধা। এখন দিদিকে না হ'লে হাবুলের যে একদিনও চলে না।

মেয়ের এই যুক্তিতর্কে মনে মনে খুশিই হন হরগোবিন্দ। শুধু বাইবের চেহারাই নয়, হৃদয়টাও মায়ের মতই পেয়েছে সুধা। ভারি কোমল মন, স্নেহভরা বুক। হবগোবিন্দ অফিসে বেরুবার আগে লন্ড্রি থেকে ধুইযে আসা শার্টে যখন বোতাম পবাতে বসে সুধা, কি উপুড় হয়ে তাঁর পায়ের জুতা ব্রাশ করতে থাকে, দেয়ালে টাঙানো নির্মলার প্রথম যৌবনের ফোটোর সঙ্গে মেয়েকে মিলিয়ে দেখেন হরগোবিন্দ। আকৃতি-প্রকৃতিতে ঠিক একেবারে দ্বিতীয় নির্মলা। তেমনি পিঠভবা কালো চুলের রাশ, তেমনি শ্যামলা গায়ের বঙ, আর ঠিক তেমনি নাক চোখ ঠোঁটের চিবুকের ছাঁদ। সুধার মাযের সঙ্গে তাব যে এত মিল আছে, তা ওর মাসী মেসো স্বীকার করতে চায না। কিন্তু নির্মলাকে কি হরগোবিন্দেব চেযে তাবা বেশি দেখেছে, না, বেশি জেনেছে?

শুধু বাপকেই নয়, ভাইকেও ভাবি যত্ন কবে সুধা। হরগোবিন্দের মনে হয, নির্মলা বেঁচে থাকলেও যেন হাবুলেব এত বেশি যত্ন হ'ত না। এই সেদিন পর্যন্ত গামছা দিয়ে ভিজে মাথা মুছে তাব টেরি কেটে দিয়েছে সুধা। আজকাল হাবুল দিদিব চেয়ে ইঞ্চি দুই লম্বা হযে গেছে ব'লে সুধার পক্ষে ভাইয়েব মাথা আঁচড়ে দেওযাব সুবিধে হয না। কিন্তু এখনও নাওযাব খাওযাব সব ব্যাপাবেই হাবুল দিদিব ওপব নির্ভরশীল। থার্ড ক্লাসে পড়লে হবে কি, বয়স চোদ্দ উতবে পনেরোয পডলেই বা কি হবে, স্বভাবে এখনও হাবুল প্রায় আট-দশ বছরেব বালক। যেমন অগোছালো, তেমন অন্যমনস্ক। ওব বইপত্তর খাতা-কলম কোথায থাকে, স্কুলেব সময় সব খোঁজ পড়ে। অফিসে যাওয়ার সময হরগোবিন্দ যেমন ব্যস্ত হতে থাকেন— সুধা, সুধা, হাবুলও তেমনি স্কুলে যাওযার সময ডাকে— দিদি, দিদি।

বান্না বেখে, কি হাতেব অন্য কাজ ফেলে সুধাকে তৎক্ষণাৎ উঠে আসতে হয। বিয়ের কথায ও যে হাবুলের নাবালকত্বেব দোহাই দেয তা একেবারে অযথা বলা চলে না।

হরগোবিন্দও সন্তানবৎসল কম নন। ঠিকে-ঝি যেদিন কাজ কামাই কবে তিনি নিজের হাতে বালতিতে ক'বে জল টানেন, মেযেব উনুন ধরিয়ে দেন।

সুধা আপত্তি ক'বে বলে, "আচ্ছা বাবা, তুমি যদি এসব কববে তো আমি আছি কি জন্যে? দু বালতি জল কি আমি তুলতে পাবি না?' হবগোবিন্দ মাথা নেড়ে বলেন, 'না পার না। জল তুলতে গিযে তোমাব মোমেব মত তুলতুলে হাতে যদি কড়া প'ডে যায় তোমার শ্বশুব শাশুড়ী কি আমাকে খোঁটা দিতে ছাড়বেন? আর শুধু কি শ্বশুর শাশুড়ী? তাঁদের সুপুত্রটিও আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন না।' সুধা লজ্জিত হযে মুখ নীচু ক'বে বলে, 'কি যে বল বাবা!'

উনুন ছাড়াও একটি স্টোভ আছে ঘরে। কিন্তু পারতপক্ষে সেটা সুধাকে হরগোবিন্দ ধবাতে দেন না। যদি কোন বিপত্তি ঘটে। যদি কোন খুঁত হযে যায় মেয়ের, তা হ'লে কি বক্ষা আছে! প্রথম প্রথম ঘবের মেঝেয ঢালা বিছানা ক'বে ছেলেমেয়েকে নিযে একসঙ্গেই শুতেন হবগোবিন্দ। এক পাশে তিনি, মাঝখানে হাবুল, আর একপাশে সুধা। কিন্তু একদিন ঘুমের ঘোবে 'গোল' 'গোল' ক'বে দিদিব গাযে লাথি ছুঁড়ল হাবুল। সুধা না ঠেকালে হাবুলেব কপালে যে সেদিন কি হ'ত তা বলা যায না। মেয়ের জন্যে ছেলেকে মাবতে পারলেন না হবগোবিন্দ, কিন্তু আচ্ছা ক'রে বকুনি লাগালেন। তাবপব ছোট একখানা তক্তপোশ কিনে এনে সুধাব আলাদা বিছানাব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তাব কোনও আপত্তি শুনলেন না। কেবলই বলতে লাগলেন, যদি চোখেমুখে লেগে যেত তা হ'লে কি হ'ত।

সুধা বললে, 'ম'রে যেতাম একেবাবে। আমার কি এমনই মোমেব শবীর যে, একটা টোকা পর্যন্ত সইতে পারি না!'

হরগোবিন্দ বললেন, 'কেন সইবি? মেযে হযে যখন জন্মেছিস জীবনভোব কত কি সইতে হবে। কিন্তু আমাব কাছে যতদিন আছিস, একটু আঁচড়ও তোর গাযে আমি লাগতে দেব না।'

তক্তপোশে শোয সুধা। আর নীচে হাবুলকে নিয়ে থাকেন হবগোবিন্দ। কিন্তু হরগোবিন্দ ঘুমোন না। শুয়ে শুযে মেযের সঙ্গে গল্প করতে থাকেন। তাঁর সেই প্রথম জীবনেব গল্প. প্রথম যৌবনেব গল্প। স্কুল-কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, সাঁতার, শিকাব, দেশভ্রমণ, আব দুঃসাহসিকতাব কাহিনী। সুধার মায়েব কথাও ওঠে। মেযেব কাছে কিছুই গোপন কবেন না হবগোবিন্দ। মেযে এখন তাঁর বান্ধবীব মত। নির্মলার সেই প্রথম বয়সেব মান-অভিমান, শাড়ি-গযনার আবদাব, খুঁটিনাটি নিযে কলহ-মিলনের কাহিনী। এসব গল্প সুধা বহুবাব শুনেছে। কিন্তু কোন কথা ব'লে বাবাকে একবাবও বাধা দেয না। তারপর অতীত থেকে ভবিষ্যতে চলে যান হবগোবিন্দ। সুধার ভাবী ঘর-সংসারের চিত্র আঁকেন। মেয়েব শ্বশুর-বাড়িতে কত ছলে কতবাব ক'রে যাবেন, শ্রদ্ধাভাজন হযেও জামাইযেব সঙ্গে কি রকম বন্ধুব মত ব্যবহাব করবেন, বছবে কবার ক'বে মেযে-জামাইকে নিয়ে কলকাতার বাইরে সমুদ্র কি পাহাড়েব ধাবে বেড়াতে বেরুবেন, তার জল্পনাকল্পনা চলে। জামাই পেশায় কি হবে—ডাক্তার না উকিল, প্রফেসাব না ইঞ্জিনিয়ার, সে সম্বন্ধে মেযেব মতামত জিজ্ঞেস করেন হরগোবিন্দ। তার গাযের বঙ, চোখ-মুখেব গড়ন, শবীরেব দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও মেয়ের মত নিতে ছাড়েন না।

হবগোবিন্দের এত জিজ্ঞাসাব, এত জল্পনা-কল্পনাব উত্তরে সুধা সংক্ষেপে বলে, 'তোমাব পছন্দেই আমার পছন্দ বাবা। তুমি যেমন চাইবে তেমনি হবে।'

ছেলে-মেয়ে নিযে হবগোবিন্দ বেশ ছিলেন। তাঁদের এই ছোট্ট সংসাবে আত্মীযস্বজন বন্ধুবান্ধব কারুবই বিশেষ কোন স্থান ছিল না। যেন বাইবেব জগতেব কাউকে দিযে তেমন কোন প্রয়োজন নেই হবগোবিন্দেব। কিংবা যেটুকু প্রযোজন আছে সেটুকু শুধু বাইবেবই প্রয়োজন। কাগজেব হকার, দুধওযালা, কযলাওযালা, মুদী আব ট্রামবাসেব কণ্ডাক্টাবেব মতই স্বজনবন্ধু পাড়াপড়শীব সঙ্গে ব্যবহার কবতেন হবগোবিন্দ। তাঁবা কেউ এলে দু মিনিট যেতে না যেতেই তিনি তাঁদেব বুঝিযে দিতেন, তৃতীয কি চতুর্থ মিনিটে তাঁদের ঘবে আগন্তুকেব আর থাকবার দবকার নেই। হরগোবিন্দেব ঘনিষ্ঠ আত্মীযদেব মধ্যে সবচেয়ে যাঁবা কাছে থাকেন—তাঁব শ্যালিকা কমলা আর ভাযরাভাই মণিময় চক্রবর্তী—তাঁবা পর্যন্ত এসে অস্বস্তি বোধ করতেন। বেশিক্ষণ টিকতে পাবতেন না। কমলা বোনপো-বোনঝিকে মাঝে মাঝে নিযে নিজের কাছে রাখতে চাইতেন, কিন্তু 'আজ নয, কাল' ব'লে একটা-না-একটা অজুহাতে হরগোবিন্দ প্রায়ই তাঁর অনুরোধ এড়িয়ে যেতেন। ইদানীং অভিমানে কমলা আব তাদেব নেওযাব কথা মুখে আনতেন না।

ছুটিছাটাব দিনে হরগোবিন্দ নিজেই মাঝে মাঝে ছেলে-মেয়েকে নিযে বেড়াতে বেরুতেন। কোনদিন আত্মীযস্বজনদের বাড়ি, কোনদিন চিড়িযাখানা, যাদুঘব, কোনদিন বা গঙ্গাব ধাব দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। বছবে একবার ক'বে সিনেমা আর একবাব ক'রে সার্কাস বরাদ্দ ছিল সুধা-হাবুলের জন্যে। হরগোবিন্দ নিজেই ওদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন। তাদেব মাঝখানে আর কেউ আসুক আর কেউ থাকুক, তা তিনি বড় একটা পছন্দ কবতেন না।

তবু চতুর্থ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল।

ডাক্তার নয, উকিল নয, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার কিছু নয, সে নেহাতই সাধারণ একজন প্রাইভেট টিউটর, নাম ইন্দুভূষণ দাস। তার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ, বঙ কালো, আকার মাঝারি. চোখ ছোট, নাক চ্যাপ্টা। সুপুরুষ তাকে কিছুতেই বলা চলে না, বরং স্বভাব এত শান্ত আব নিরীহ যে পুরুষ বলতেও দ্বিধা হয।

থার্ড ক্লাস থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে প্রমোশন পেল বটে হাবুল, কিন্তু কোন বিষযেই নম্বব ভাল পেল না। ইংবেজীতে টেনে-টুনে পাশ কবেছে, অঙ্কে পাশের নম্বব পর্যন্ত পায নি।

সুধা বলল, "বাবা, আমাকে না হয সেকেণ্ড ক্লাস থেকেই পড়া ছাড়িয়ে এনে ঘরে বসিযে বেখেছ, হাবুলকে তো আব তা পাববে না। ওকে পড়াতেই হবে। কিন্তু শুধু স্কুলের ওপব যদি ভবসা কব, ওব কিচ্ছু হবে না তা ব'লে দিচ্ছি।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'তা হ'লে কি করতে হবে?'

সুধা বলল, 'প্রাইভেট টিউটর রাখ।'

হরগোবিন্দ বললে, 'ওরে বাবা, সে যে বহু টাকার ধাক্কা।'

সুধা বলল, 'হোক। ও যদি মানুষ না হয়, টাকা দিয়ে করবে কি? তোমার দেখবার যখন সময় নেই, মাস্টার একজন না রাখলে চলবে না।'

প্রথম খোঁজ পড়ল পাকা দাড়িওয়ালা অভিজ্ঞ শিক্ষকের, কিন্তু তাদের দক্ষিণা অনেক। চল্লিশ-পঞ্চাশের কমে কেউ সব বিষয়ে পড়িয়ে যেতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত দরকষাকষি ক'রে কুড়ি টাকায় ইন্দুভূষণকে পাওয়া গেল। সে শ্যামবাজারের একটা মেসে থাকে। ওদিকেরই কোন একটা হাই-স্কুলে পড়ায় আর টিউশনি করে। বেলগাছিয়ার এদিকে আরও দু-এক বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে সুনাম কিনেছে। হরগোবিন্দের দু'তিনজন প্রতিবেশী তার জন্য সুপারিশ করলেন।

হরগোবিন্দ ইন্দুভূষণকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, ''আপতত কুড়ি টাকা ক'রেই দেব। তারপর ছেলের রেজাল্ট যদি ভাল হয় তখন আলাদা বকশিস আছে। মিথ্যে বলছিনে, তখন যা চাইবেন—'

ঘরের এক কোণে ব'সে তরকারি কুটছিল সুধা, বাবার কথা শুনে ভারি লজ্জা পেল! ছি-ছি, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কি অমন ক'রে কথা বলতে হয়।

ইন্দুভূষণ হেসে বলল, 'ও যদি ভাল রেজাল্ট করে, সেই তো আমার সবচেয়ে বড় বকশিস হরগোবিন্দবাবু।'

বঁটি থেকে চোখ তুলে ইন্দুভূষণের দিকে তাকাল সুধা। তার ঠোঁটে তখন একটু হাসি লেগে রয়েছে। সুধার মনে হ'ল, এমন শান্ত সুন্দর হাসি সে জীবনে আর কারও মুখে দেখে নি। তা'ছাড়া পাল্টা জবাবটাও ভারি চমৎকার লাগল। এমন কথা যে-কোন পেশাদার শিক্ষকই হয়তো বলেন, বলতেন। কিন্তু সুধার মনে হ'ল, এমন অন্তর দিয়ে কেউ বলতে পারতেন না।

পরদিন থেকে রোজ সন্ধ্যায় ইন্দুভূষণ হাবুলকে পড়াতে আসে। সুধা নিজের খাটের ওপর ফরসা চাদর পেতে শিক্ষক-ছাত্রের বসবার আসন করে দেয়। ইন্দুভূষণ হাবুলকে একমনে পড়াতে থাকে। ঘরে যেন আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এতটা মনোযোগ সুধার কেন যেন ভাল লাগে না। ডালে সম্বরা দিতে দিতে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'রান্নার গন্ধে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

ইন্দুভূষণ হাবুলের অঙ্কের ভুল বার করে দিয়ে সুধার দিকে তাকায়, 'আমাকে বলছেন?'

সুধা হেসে বলে, 'নয়তো কাকে? আপনি কি ভেবেছেন হাবুলের সঙ্গে এতক্ষণ ভদ্রতা করছিলাম?'

ইন্দুভূষণও না হেসে পারে না ; বলে 'ও! ভদ্রতা! তা হলে তো ভদ্রতা করে আমাকেও জবাব দিতে হয়—না, না, মোটেই কষ্ট হচ্ছে না, ভারি চমৎকার লাগছে।'

সুধা হাসিমুখে বলে, 'আর যদি ভদ্রতা বাদ দিয়ে বলেন, তাহলে?'

ইন্দুভূষণ জবাব দেয়, 'তা হলেও আমার বক্তব্যটা বদলায় না। আপনি মোটেই উদ্বিগ্ন হবেন না। রান্নার গন্ধ আমার সত্যিই খুব ভাল লাগে।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন। এমন জায়গায় বসে কেউ পড়াতে পারে?'

ইন্দুভূষণ একটু চুপ করে থেকে বলে, 'না ঠাট্টা নয়। আপনাকে রাঁধতে দেখে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন পড়াতুম না, পড়তুম। বাবা ছিলেন ওষুধের ক্যান্‌ভাসার। বাইরে বাইরে ঘুরতেন। মার ওপর ছিল সব ভার। তিনি জোর করে টেনে নিয়ে রান্নাঘরে বসাতেন। হলুদ-মাখা হাতে কালো শ্লেটের ওপর অঙ্ক লিখে দিতেন। অনেক দিন পরে ঠিক সেই রান্নার ঝাঁজ, রান্নার গন্ধ আজ পেলাম এখানে।'

শুনতে শুনতে সুধার গা কেন যেন সিরসির ক'রে ওঠে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার মা এখন কোথায় আছেন?'

ইন্দুভূষণ জবাব দেয়, 'আমার স্মৃতিতে।'

'আর বাবা?'

'বছর পাঁচেক হল তিনিও চলে গেছেন।'

সুধা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কড়ার মধ্যে অনড় হয়ে থাকে খুন্তি। একটু বাদে ফেব সে জিজ্ঞাসা করে, 'আর কে কে আছেন আপনার? ভাই বোন?'

ইন্দুভূষণ বলে, 'কেউ না।'

সুধা যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে, 'কেউ না! কেউ না-থাকলে মানুষ থাকে কি করে? আমারও মা নেই, কিন্তু বাবা আছেন, ভাই আছে। আর আপনাব সত্যিই কেউ নেই?'

ইন্দুভূষণ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে সুধার সেই মমতাভরা করুণা-ভরা কালো বড় বড় চোখ দুটির দিকে অবাক হয়ে একটুকাল তাকিয়ে থাকে। তারপব চোখ ফিবিয়ে নিয়ে ছাত্রকে বলে, 'হাবুল, এবার রেকারিংয়ের অঙ্কটা কর তো।'

এমনি করে আস্তে আস্তে আলাপ জমে, আলাপ এগোয়।

একদিন সুধা বলে, ''আপনি তো রোজ শুধু রান্নার গন্ধ নিয়েই যান। আজ আপনাকে খেয়ে যেতে হবে।'

ইন্দুভূষণ আপত্তি করে, 'না, না।' তারপর একটু হেসে বলে, 'ঘ্রাণেই তো রোজ অর্ধভোজন হয়ে যায়।'

সুধা বলে, 'কিন্তু দু-একদিন পূর্ণভোজনও হতে পাবে। তাতে আপনাব জাত যাবে না।'

ইন্দুভূষণ বলে, 'আমাদেব জাতের জন্যে তো ভয নেই।'

সুধা বলে, 'আমাদের জাতের জন্যেই বুঝি ভয! আপনি ভাববেন না, অত বাছবিচাব আমবা করি নে। তা হ'লে কি আব এ ভাবে থাকতে পাবি?'

পড়ানো হয়ে গেলে ইন্দুভূষণকে খেতে বসতে হয়। আয়োজনে পরিবেশনে খুবই যত্ন নেয সুধা। দু-একটা নতুন তরকারি রাঁধে। যেন কোন উৎসবের দিন এসেছে। এ ধবনের নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ মাসে দু-তিন দিন লেগেই থাকে।

একদিন অফিসে বেরুবার সময় হবগোবিন্দ ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবলেন, ''কি রে হাবুল, মাস্টাবমশাই কেমন পড়াচ্ছে তোকে?'

হাবুল বললে, 'ভালই পড়াচ্ছেন বাবা।'

হবগোবিন্দ বললেন, ''আচ্ছা, তুই আমার জন্যে একটা সিগারেট নিযে আয় তো।'

হাবুল বেরিয়ে গেলে মেয়েকে বললেন, 'সুধা, তোকে একটা কথা বলি।'

'বল।'

হবগোবিন্দ বললেন, 'মাস্টার যাতে ফাঁকি না দেয, যতক্ষণ থাকে যাতে মন দিয়ে পড়ায় তুইই তা দেখবি। কিন্তু তুই নিজে নিজেই নাকি তার সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করিস?'

বাপেব শাসনে সুধার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'এ নালিশ তোমাব কাছে কে করেছে বাবা? হাবুল?'

'হাবুল কেন করবে? সে করলে কোন দোষের হত না। কলতলার অন্য ভাড়াটেবা সব আলোচনা করছিল, তাই কানে গেল।'

সুধা বললে, 'এর আগে অন্য কারও কথা তো তুমি কানে তুলতে না বাবা।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'এখনও তুলি নে। তবে জানিস তো, বাড়িটায় যত সব বাজে লোকের আড্ডা। তা ছাড়া আমার ঘরে আর তো কোন মেয়েছেলে নেই। তাই আমাদের একটু সাবধান হয়ে চলাই ভাল।'

'বেশ তুমি যদি বল, তাই চলব বাবা।'

'হ্যাঁ, তাই চলিস্। আর অত খাওয়ানো-দাওয়ানোরই বা দরকার কি। কোন উপলক্ষ-টুপলক্ষ হলে বললি, সে এক কথা'।

সুধা বলল, 'বেশ।'

কলতলায়, বাথরুমে, বাড়ির আরো সব ভাড়াটের ঘরে ইন্দুভূষণের সঙ্গে তার এই ঘনিষ্ঠতা নিয়ে যে ফিসফিস গুজগুজ শুরু হয়েছে, তা সুধারও কানে গেছে। তারই প্রায় সমবয়সী কোণের ঘরের রেণু সেদিন গায়ে পড়ে হেসে বলেছে, 'কি ভাই, মাস্টারমশাই শুধু হাবুলকে পড়ান, না তোমাকেও পড়ান?'

সুধা গম্ভীরভাবে জবাব দিয়েছে, 'আমাকেও পড়ান।'

দোতলার সরকারদের ছোট বউ সুলতা কাছেই ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ও মা, তাই বল। তা কোন্ ক্লাসের পড়া পড়ান তোমাকে— বি. এ ক্লাসের বুঝি?' বলতে বলতে হেসে রেণুর গায়ে গড়িয়ে পড়েছিল সুলতা।

সুধা কোন কথা না ব'লে জল নিয়ে ঘরে চ'লে এসেছে।

কিন্তু শুধু বউ-ঝিরাই নয়, এ বাড়ির পাঁচঘর ভাড়াটের নানাবয়সী পুরুষরা পর্যন্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে উঠেছে। সুধা যাদের কাকাবাবু আর মেসোমশাই বলে সেই প্রৌঢ় কম্পাউণ্ডার পঞ্চানন সরকার, পোস্ট-অফিসের কেরানী হীরালাল গাঙ্গুলি, রেল-অফিসের বীরেশ্বর মিত্র, সুধা যাদের নামের সঙ্গে দাদা যোগ করে ডাকে, সেই বাসু, রণজিৎ আর সুরেন সকলেরই কানে গেছে, চোখে পড়েছে বিষয়টা। তাদের ভাবভঙ্গি, হাসি আর তাকাবার ধরন দেখলেই সুধা টের পায়, সকলেই যেন কিছু একটা মনে মনে আন্দাজ করেছে।

এতদিন হরগোবিন্দকে সবাই বলত দাম্ভিক, অমিশুক, অসামাজিক। সুধাকেও তাই বলত। বেশিরকম দেমাকী, অহংকারী। তারপর সকলেই তাদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকত। সুধা আজও সেই উদাসীনই রয়েছে, কিন্তু অন্য সবাই যেন আগের মত আর দূরে স'রে থাকতে পারছে না। বাবা আর ভাই ছাড়া তৃতীয় আর একটি পুরুষের সঙ্গে সুধার সামান্য আলাপ হয়েছে বলে এই গোটা বাড়িটা যেন তার ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইছে। শুধু যে তারাই সুধার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে তাই নয়, সুধাও তাদের সম্বন্ধে অচেতন থাকতে পারছে না। এ বাড়িতে যে এতগুলি লোক থাকে তা কি সুধাই এতদিন টের পেয়েছে! শুধু এ বাড়িটাই বা কেন, তাদের গলির আরও দু-তিনখানা বাড়ির মেয়ে-পুরুষে পর্যন্ত জেনে ফেলেছে কথাটা। ইন্দু মাস্টার সম্বন্ধে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার ধরন দেখেই সুধা তা বুঝতে পেরেছে। যেন প্রাইভেট টিউটর আর কারও বাড়িতে আসে না, তার সঙ্গে বাড়ির আর কোন মেয়ে কি বউ কথা বলে না, যেন এ পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের এই সর্বপ্রথম আলাপ হয়েছে।

কিন্তু অন্য কারও বাঁকা কটাক্ষে, খোঁচা দেওয়া কথায় সুধার কিছু এসে যায় না। বাবা যে তাকে আরও একদিন সতর্ক করে দিলেন, তাতেই সুধার মনে একটু লাগল।

হরগোবিন্দ বললেন, 'সুধা, একটু সাবধান হয়ে চলিস্। তোর ঘরে তো মা নেই, আর কাজকর্ম ফেলে বেশিক্ষণ ঘরে বসে থাকা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। তোর নিজেকেই বুঝে সমঝে চলতে হবে।'

সুধার ভারি দুঃখ হল, মনে মনে ঠিক করল ইন্দুভূষণের সঙ্গে সে আর কোন কথা বলবে না। চায়ের কাপটি পর্যন্ত হাবুলকে দিয়ে দেওয়াবে।

কিন্তু সঙ্কল্প রাখা গেল না। সুধা কথা না বললে কি হবে, আজ অন্যপক্ষ থেকে কথা শুরু হ'ল। হাবুলকে এক প্যাসেজ ট্রানস্লেশন করতে দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ইন্দুভূষণ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আজ বড় গম্ভীর হয়ে রয়েছেন যে? শরীর খারাপ করেছে নাকি?'

শেষের কথাটুকুতে ভারি মমতা প্রকাশ পেল ইন্দুভূষণের। সে নিজে থেকে সহজে আগে আলাপ করে না। আজ করল। এটাও ভারি নতুন লাগল সুধার, ভারি ভাল লাগল। বাড়িসুদ্ধ লোকের বিরূপতা ইন্দুভূষণের ওই এক ফোঁটা দরদে যেন সব ধুয়ে মুছে গেছে।

প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে সুধা বলে ফেললে, 'মানুষের শবীরটাই বুঝি সব?'

সুধাব অভিযোগের ভঙ্গিতে ইন্দুভূষণ মৃদু হাসল, ''ও, আপনি বুঝি মন খাবাপ করার কথা বলছেন। সত্যি মন খারাপ হওয়াটা শরীর খারাপ হওয়ার চেয়ে ঢের কষ্টের।'

মন খারাপ হওযার কথা শুনতেও এত ভাল লাগে।

সুধা হেসে বলল, 'আপনি কি করে জানলেন? আপনারও মাঝে মাঝে মন খাবাপ হয নাকি?'

'হয় বৈকি।'

'তখন কি করেন?'

'চুপচাপ বসে থাকি, না হয় বই পড়ি। আচ্ছা, আপনি কি কেবলই রান্নাবান্না ঘবসংসার নিয়ে থাকেন, বইটই পড়েন না?'

'পড়ি বই কি, হাতের কাছে যা পাই তাই পড়ি।'

ইন্দুভূষণ হাসল, 'আপনি বুঝি প্রতিজ্ঞা করেছেন, হাতের কাছে যা পাবেন শুধু তাই পড়বেন?'

সুধা মুখ তুলে একবার তাকাল, তারপর চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'কেউ যদি খুঁজে পেতে এনে দেয় তাও পড়তে পারি'।

ইন্দুভূষণ যেন শুধু এইটুকুর অপেক্ষায় ছিল। তারপর থেকে প্রায় রোজ সে বই আনতে লাগল। সব গল্প-উপন্যাস নয়। জীবন-চরিত, ভ্রমণ-কাহিনীও আছে। কিন্তু সুধার গল্প-উপন্যাস ছাড়া আব কিছুতে মন ওঠে না।

আস্তে আস্তে সুধার কাছে আর এক জগতের দ্বার খুলে যেতে লাগল। সে জগৎ এই ভাড়াটে বাড়ির লোকজনের মত অনুদার নয়, প্রতিকূল নয়, সে জগৎ বড় মনোরম আর মধুর। এর আগে কে জানত পৃথিবীতে এত ভাল ভাল বই আছে। আর সে সব বইয়ের লেখকেরা সুধারই মনের কথা চুরি ক'রে নিয়ে লিখেছে। এর আগে কে জানত তাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট পুকুরটার ধারে যে দুটো নারকেলগাছ রয়েছে তাদের পাতাগুলি সবুজ, বোসেদের বাড়ির ছাদে সাদা সাদা চন্দ্রমল্লিকার টবগুলি এত সুন্দর। তারও ওপরে অগুণিত তারাভরা আরও সুন্দর আকাশ কি চোখে পড়েছে এর আগে।

মাঝে মাঝে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে এই রাস্তায় ফুল ফিবি করতে আসে, তার নাম সুখন। ওর নামটি যে এত ভাল, এমন ধ্বনিময়, অর্থময়, কই, এর আগে তো সুধার খেয়াল হয় নি। তার কাছ থেকে প্রায়ই চার আনা ছ' আনার ফুল কিনে নেয় সুধা। কোনদিন সাদা বেল কি রজনীগন্ধা। কোনদিন বা রক্তগোলাপ। কোনদিন সে ফুলে ফুলদানি সাজায়, কোনদিন নিজের খোঁপায় গোঁজে।

হরগোবিন্দের কিছুই চোখ এড়ায় না। মনে মনে ভাবেন, আজকালকার মেয়েগুলির লজ্জা-শরম বড় কম। একদিন স্পষ্ট করেই বললেন, 'মিছিমিছি ফুলের পেছনে এত পয়সা নষ্ট করিস কেন সুধা?''

সুধা জবাব দেয়, 'কই ফুল তো বেশি কিনি নে বাবা।'

হরগোবিন্দ ভিজে গামছা দিয়ে গা রগড়াতে রগড়াতে বলেন, 'এতেও তোর বেশি কেনা হয় না। তুই কি বাগানসুদ্ধ কিনতে চাস? হ্যাঁ, আর এক কথা। গয়না যদি পরতে ইচ্ছা হয়, বল্, ভল্ট থেকে সব নিয়ে আসি। ওসব ফুলের সাজ-টাজ ভাল না। ভদ্রলোকের মেয়েরা ও ভাবে সাজে না। ও সব করে—', রূঢ় কথাটা পালটে নিয়ে হরগোবিন্দ বলেন, 'ইয়েরা।'

সুধা হয় নিরুত্তর থাকে, না হয় অন্য কথা পড়ে। মনে মনে খুবই রাগ হয় তার। বাবা যেন আজকাল কি রকম হয়ে যাচ্ছেন। সে খোঁপায় ফুলের মালা জড়াল কি না জড়াল তা

কেন বাবা দেখতে আসবেন। সংসারের কাজ-কর্ম কি সেবাযত্নের যদি কোন ত্রুটি হয় তবেই তিনি রাগ করবেন। মেয়ের সাজসজ্জার দিকে কেন তাঁর চোখ পড়বে।

কিন্তু হরগোবিন্দ পছন্দ না করলে কি হয়, ইন্দুভূষণ যে ফুল খুব ভালবাসে তা সুধার বুঝতে বাকি নেই। সে প্রশংসা-ভরা চোখে সুধার ফুলদানির দিকে তাকায়, ছাত্রকে জ্যামিতির উপপাদ্য বোঝাতে বোঝাতে এক-একবার খোঁপার গোলাপটির দিকে অপলকে চেয়ে থাকে।

সুধা সন্ধ্যার আগেই রান্নার পাট চুকিয়ে দিয়ে টুল পেতে বোনার কাজ নিয়ে বসে, না ইন্দুভূষণের এনে-দেওয়া গল্পের বই পড়তে থাকে।

হরগোবিন্দ এক-একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে সুধাকে অমন ইন্দ্রাণীর মত বসে থাকতে দেখে গম্ভীর হয়ে যান। মেয়েকে কাজের ফরমায়েস করে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দেন। তারপর ইন্দুভূষণের দিকে চেয়ে বলেন, 'কি মাস্টার, পড়ানো-টড়ানো কেমন চলছে?'

ইন্দুভূষণ সংক্ষেপে বলে, 'ভাল।'

'হুঁ, কি রকম ভাল, ছেলের পরীক্ষার ফল দেখলেই তা টের পাব।'

ইন্দুভূষণ হেসে বলে, 'বেশ তো, দেখবেন।'

ওর এই নিশ্চিন্ত হাসিতে ভিতরে ভিতরে হরগোবিন্দ কেমন যেন একটা অপমান বোধ করেন। মনে মনে ভাবেন, এত জোর ও কোত্থেকে পায়! ও কি বোঝে না হরগোবিন্দ সব টের পেয়েছেন! বামন হয়ে যদি চাঁদে হাত দেওয়ার স্পর্ধা হয়ে থাকে হরগোবিন্দ যে কোন মুহূর্তে সেই হাত মুচড়ে ভেঙে ফেলতে পারেন। মিটমিটে শয়তান ছোকরা। কি করে সুধার সঙ্গে কথা বলবে সেই ছল খোঁজে। সুধা যখন হরগোবিন্দের সঙ্গে কথা বলে, ও কান খাড়া করে থাকে , সুধা যখন ওকে কিছু বলে, ও যেন হাতে স্বর্গ পায়।

যে কোন সময় হরগোবিন্দ ওকে তাড়িয়ে দিতে পারেন, বলতে পারেন, তোমার পড়ানো ভাল হচ্ছে না মাস্টার, তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না।

কিন্তু এইটুকু অপমানে যেন বড় লঘু শাস্তি হয়ে যায়। হরগোবিন্দের ইচ্ছা আরও কঠিন শাস্তি দেন ওকে। শূদ্র হয়ে বামুনের মেয়ের দিকে তাকাবার গুরু দণ্ড। না, কাজ থেকে ওকে ছাড়িয়ে দেবেন না হরগোবিন্দ। কাজে বহাল রেখেই ওকে অপমান করবেন। ওর চোখের সামনে সুধার বিয়ে দিয়ে দেবেন। বিয়ের দিন নিমন্ত্রণ করে এনে চাকরের মত ফাই-ফরমায়েস খাটাবেন। সুধা শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে ওর আরও পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে টিউটরের চাকরিতে বহাল রাখবেন। তারপর ছোকরা খালি ঘরে কি ভাবে ছটফট করে দেখবেন চেয়ে চেয়ে। তার আগে মশা মেরে হাত নষ্ট করে লাভ নেই।

শত্রুনির্যাতনের সহজ পথ হরগোবিন্দের মনঃপূত নয়। অফিসে যারা তাঁর বিরুদ্ধে ক্লিক করে তাদেরও তিনি এমনি বহু দিন ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জব্দ করেন। তাতে শত্রুকে শাস্তি দেওয়ার সুখানুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। যে লজেন্স্ চুষে খাওয়ার জন্যে, তা তিনি চিবিয়ে খেতে চান না। বরানগরে মুখুয্যেদের সঙ্গে যে সম্বন্ধটা চলছিল তা তিনি পাকা করে ফেললেন। ছেলেটি এ. জি. বেঙ্গলে চাকরি করে। নিজস্ব বাড়ি আছে শহরে। তার বাবা মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেছেন। ছেলে নিজেও এসে দেখবে কি না জিজ্ঞাসা করায় বলেছেন, 'ওসব বেয়াড়াপনা আমাদের ফ্যামিলিতে নেই মশাই। ছেলে আগে দেখবে কি! দেখবে সেই শুভদৃষ্টির সময়।' সুধার ঠিকুজী নিয়ে মুখুজ্যে মশাই কুলপুরোহিত দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জেনেছেন একেবারে রাজযোটক। এমন মিল আর কোন কনের ঠিকুজীতে পান নি। সুধার মত এমন সুলক্ষণ আর কোন মেয়ের মধ্যে মেলে নি। ঠিকুজী আর মেয়ের মুখশ্রী দেখেই এগিয়েছেন মুখুয্যে মশাই। নইলে হরগোবিন্দের সামাজিক অবস্থা বিচার করলে এতদূর অগ্রসর হওয়ার কারণ ছিল না।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরের মেঝেয় যখন বাবা আর হাবুলের জন্যে বিছানা পাতবার উদ্যোগ করছিল সুধা, হরগোবিন্দ তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বললেন,

'বরানগরের সম্বন্ধটাই ঠিক করলাম সুধা। বেশি বড়লোকের পেছনে ছুটোছুটি করে লাভ নেই। নিজের শক্তিসামর্থ্যে যা কুলোয় তাই করা ভাল। দেখেশুনে মনে হল ওরা আমাদের মতই গেরস্থ। ঠাকুর-দেবতা ধর্ম-কর্ম মানে। আমাদের সঙ্গে বেশ মিলবে। পাকা দেখার দিন ঠিক করার আগে তোর মাসীকে একবার খবর দিতে হবে। শত হলেও এসব কাজ মেয়েছেলে না হ'লে —'

হাবুলের জন্যে একটি আর হরগোবিন্দের জন্য জোড়বালিশ পেতে দিয়ে সদ্য সাবান-কাচা পরিষ্কার ঢাকনি সেই বালিশের ওপর বিছিয়ে দিল সুধা। ছোট ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললে, 'বসে বসে ঝিমুচ্ছিস কেন হাবুল, এবার শুয়ে পড।'

তারপর ফের বিছানার চারদিকে চাদর গুঁজে দিতে লাগল।

হরগোবিন্দ বললেন, 'আমার কথার জবাব দিচ্ছিস নে যে?'

সুধা বললে, 'জবাব দেওয়ার আর কি আছে? ওসব বিয়ে-টিয়ের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই।'

'গিয়ে কাজ নেই মানে? কেন, সম্বন্ধ কি তোর পছন্দ হচ্ছে না? ছেলেটির ফোটো তো আমি তোকে দেখিয়েছি। বেশ সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। আমার অফিসের বন্ধুরাও এ সম্বন্ধের বেশ তারিফ করল।'

সুধা বললে, 'সে জন্যে নয় বাবা। আমি কোনদিন বিয়ে করব না। আমি তোমার কাছেই থাকব।'

হরগোবিন্দ সস্নেহে বললেন, 'তাই কি হয় রে পাগলী! তুই চলে যাবি ভেবে আমারও কি কষ্ট হয় না? খুবই হয়। কিন্তু হলে কি করব! এই তো সংসারের নিয়ম। মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতেই হবে। সেই পরই তার আপন। সেই ঘরে গিয়ে তুই যদি স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে থাকতে পারিস সুধা, আমার তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি।'

সুধা বাবার মশারি টাঙিয়ে দিতে দিতে বললে, 'তুমি এবার শুতে যাও বাবা।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'যাচ্ছি রে যাচ্ছি। আমার কথার জবাব দে। তা হলে বরানগরের- '

সুধা বললে, 'না বাবা। আমি ও-ধরনের সুখশান্তি চাই নে।'

সিগারেটের টুকরোটা জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে হরগোবিন্দ তক্তপোশ ছেড়ে উঠে এসেছিলেন, সেই অবসরে আলো নিবিয়ে নিজের মশারিটা ফেলে দিয়ে সুধা নিজেই শুয়ে পড়ল যেন সব আলোচনায় এতেই ছেদ পড়ে যাবে।

মেয়ের এই অভব্যতা দেখে মনে মনে ভাবি চটলেন হরগোবিন্দ। এত স্পর্ধা ওর হ'ল কোত্থেকে! অবশ্য বিয়ের নামে সুধা এর আগেও আপত্তি করত। কিন্তু সে আপত্তির সুর ছিল অন্য ধরনের, এখনকার মত এমন একগুঁয়ে স্বভাব তো তখন ছিল না সুধার! এমন উদ্ধত ভঙ্গিও তখন দেখা যায় নি।

হরগোবিন্দ শুতে গেলেন না। মেয়ের মশারির কাছে দাঁড়িয়ে গলা যথাসাধ্য নরম করে বললেন, 'তুই না চাইলেই তো আমি না চেয়ে পারি নে। বাপ হয়ে নিজের স্বার্থের জন্য তোকে চিরকাল আইবুড়ো করে রাখব, তোর জীবনটাকে নিষ্ফল ক'রে দেব— এ কথা যে আমি ভাবতেও পারি নে সুধা। তোর কিসে অমত তাই বল্, বরানগরের ওই সম্বন্ধ যদি তোর পছন্দ না হয়, ভবানীপুরের সেই ওভারসীয়ার ছেলেটিরই তা হলে ফের খোঁজ করি।'

সুধা মশারির ভেতর থেকে বললে, 'না বাবা, তোমার আর কোন খোঁজখবর করতে হবে না।'

হরগোবিন্দ ধৈর্য হারিয়ে হঠাৎ বলে ফেললেন, 'তার মানে? তুমি নিজেই বুঝি খোঁজ-খবর করে রেখেছ? গুণবতী মেয়ে কিনা! বেশ, কাকে পছন্দ করেছ তুমিই বল।'

সুধা চুপ ক'রে রইল।

হরগোবিন্দ বললেন, 'বলে ফেল। আজই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বলি, তার নাম-ধাম তো আমাকে জানাবি, না কি?'

সুধা বললে, 'তুমি শুয়ে পড় বাবা। চেঁচামেচিতে হাবুলের ঘুম ভেঙে যাবে।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'ভাঙে ভাঙুক। আমি সব জানতে চাই। তুই সব আমাকে খুলে না বললে আমি কিছুতেই আজ ঘুমোতে পারব না।'

সুধা মৃদুস্বরে বললে, 'তোমার সে সব কথা জেনে দরকার নেই বাবা।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'জেনেও দরকার নেই। আমাকে না জানিয়ে শুনিয়েই বুঝি তুই বিয়ে করবি?'

সুধা বললে, 'না বাবা, তা কোনদিনই করব না। আমি কোনদিনই জীবনে বিয়ে করব না। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।'

হরগোবিন্দ চটে উঠে বললেন, 'বিয়ে করবি কেন, দিনরাত সেই মাস্টাবেব সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করবি। নিন্দেয় পাড়া ভরে গেল। কাকে পছন্দ করেছিস তাই শুনি?'

সুধা তেমনি মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, 'তোমার শুনে লাভ নেই বাবা। তাব সঙ্গে তুমি কোনদিন আমার বিযে দেবে না। আর তোমার অমতে আমিও তাকে বিয়ে কবব না। যেমনি আছি তেমনিই থাকব।'

দাঁতে দাঁত ঘষলেন হরগোবিন্দ, বললেন, 'থাকা না-থাকা বুঝি তোমার ইচ্ছে? হাবামজাদী! ওই হতভাগা মাস্টার ছোকরাকে তুমি সব সমর্পণ কবে বসেছ। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।'

সুধা শান্তভাবে বলল, 'বুঝতে তুমি অনেক আগেই পেবেছ বাবা। বাতদুপুরে আব চেঁচামেচি করো না—বাড়িসুদ্ধ লোক সব শুনতে পাচ্ছে। তুমি যাও, শুয়ে ঘুমোও গিয়ে।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'হ্যাঁ, ঘুমোব। ঘুমোবাব তুমি কত ব্যবস্থা কবে বেখেছ!'

সুধা কোন কথা না বলে পাশ ফিবল। যেন গভীর ঘুম পেযেছে তাব।

হবগোবিন্দ ফিরে এসে নিজেব বিছানায ঢুকলেন। হাবুল ঘুমেব ঘোবে পাশবালিশ ভেবে বাপকে জড়িযে ধবল। বছব চোদ্দ-পনের হ'ল বযস। কিন্তু এই বযসেও ওর মুখ থেকে লালা পড়ে। সেই লালা লাগল হবগোবিন্দেব গাযে। কিন্তু তাঁব মনে মোটেই বাৎসল্যবস উদ্রিক্ত হ'ল না। ঘৃণা বিরক্তি আব বিদ্বেষে তিনি ঠেলে দূবে সরিযে দিলেন ছেলেকে। সব শত্রু, সব শত্রু। অল্পবয়সে সুধাও তো এমনি কবে তাঁকে জড়িয়ে ধবত। তাঁব বুকেব সঙ্গে মিশে না থাকলে, তাঁব বুকেব মধ্যে মুখ গুঁজে না থাকলে সুধাব ঘুম আসত না। সুধাব মা নির্মলা হাসত, কি পাজী আব হিংসুটে মেয়ে দেখেছ? হবগোবিন্দের সেই বুকেব সুধা আজ বিষ হয়ে গেছে।

একটা মশা কি করে যেন ঢুকেছে মশাবিব মধ্যে। গুণ গুণ কবে অনেকক্ষণ ধরে বিবক্ত কবছে কানেব কাছে। হবগোবিন্দ সোজা হযে উঠে বসলেন। তারপব সেই অন্ধকাবেই দু হাতেব তালুতে প্রচণ্ড শব্দ ক'বে স্তব্ধ কবে দিলেন সেই গুণগুণানি। মনে মনে হাসলেন হবগোবিন্দ। তাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ।

ভোব-ভোব সমযে ডেকে তুললেন ছেলেকে, 'এই ওঠ্ ওঠ্। কত আব ঘুমবি?'

হাবুল বললে, 'আর একটু পবে উঠব বাবা।'

'না, ওঠ্। সকালে ওঠা ভাল।'

হাতমুখ ধোযার পর হাবুলকে বললেন, 'চল, বেড়িযে আসি। সকালের হাওয়া গাযে লাগলে শরীর ভাল থাকে।'

পুকুর ছাড়িয়ে ছোট্ট মাঠ। সেই মাঠে নেমে হঠাৎ ছেলের হাতখানা নিজেব মুঠিব মধ্যে তুলে নিলেন হরগোবিন্দ।

হাবুল ভয়ে আঁতকে উঠল , বলল, 'আমার কোন দোষ নেই, আমাকে মেরো না। আমি দিদিকে গোড়াতেই বারণ করেছিলাম।'

হরগোবিন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। পরনে হাফপ্যাণ্ট, ছিপছিপে রোগা চেহাবা। গায়ের রঙ খুব ফবসা। মাথাব চুলগুলি কটা আব কোঁকড়ানো। ছেলেটার চোখ দুটো ঠিক ওব মাব মত বড় বড় হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে স্নেহের পবিবর্তে নির্মম কৌতুক আর কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল হরগোবিন্দের। মৃদু হেসে বললেন, 'আমি জানি, তোর কোন দোষ নেই। তুই খুবই ভাল ছেলে। আমাকে সব খুলে বল্। ভয় নেই, সুধা কিছু জানতে পাববে না।'

হাবুল তবু বলতে চায় না। কেবল আমতা আমতা করে। কিন্তু ঝানু উকিলেব মত জেরা করে সব বেব ক'বে নিলেন হবগোবিন্দ। বই এনে দেওয়াব আর ফিবিয়ে দেওযাব সময় কি করে টুকরো চিঠিব আদান-প্রদান চলেছে দুইজনের মধ্যে, কবে সহপাঠিনী সখীব সঙ্গে দেখা কবার নাম ক'রে দেশবন্ধু পার্কে সুধা সাক্ষাৎ করেছে ইন্দু মাস্টাবের সঙ্গে। কবে একদিন ম্যাটিনি শোতে ওরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, হাবুলের যাওযার কথা ছিল সেই সঙ্গে, কিন্তু হঠাৎ ওরা তাকে আর এক বন্ধুব সঙ্গে চিড়িয়াখানায নতুন বাঘ দেখতে পাঠিযে দিযেছিল। হাবুল কিছুই গোপন করল না, গোপন করতে পারল না।

ফেরবার সময় মোড়েব দোকান থেকে এক ঠোঙা কচুবি, জিলিপি আর হালুয়া কিনে নিলেন হরগোবিন্দ। এসব খাবাবেব ওপর হাবুলের দাকণ লোভ। কিন্তু কোনদিন তিনি ছেলেমেয়েকে এগুলি খেতে দেন না। আজ দিলেন।

হাবুল কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ কবলে, 'ওসব কেন নিচ্ছ বাবা?'

হবগোবিন্দ বললেন, 'খা একদিন। এসব তো তোবা ভালবাসিস।'

হাবুলেব মনে হল মুখে ও-কথা বলছেন বটে বাবা, কিন্তু চোখ দুটো সদ্য-ধ'বে-আনা চিডিযাখানাব সেই বাঘের মতই জ্বলজ্বল কবছে। ভযে ভযে বাপের পিছনে পিছনে সে বাড়িতে ঢুকল। না জানি কি কাণ্ড ঘটে চা খাওয়ার সময।

কিন্তু হরগোবিন্দ সুধাকে কিচ্ছু বললেন না। শুধু চা আব খাবার খেতে খেতে মেযের দিকে বার কয়েক চোখ তুলে তাকালেন। সেই চোখেব দিকে চেযে সুধা একবাব শুধু শিউবে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় বাব আর ভয় পেল না। তাব দু চোখ থেকেও ঘৃণা আব বিদ্বেষ আগুনের হলকাব মত বাপেব ওপর ঝবে পডতে লাগল। বাপ আর মেযেব মধ্যে যেন কোনদিন কোন মধুর সম্পর্ক ছিল না, স্নেহ আব শ্রদ্ধার স্বাদ যেন কেউ কোনদিন পায নি। দুজনে যেন দুজনের শত্রু হযেই জন্মেছে।

হবগোবিন্দ মুখে কিছুই বললেন না, মেযের কাছে কোন কৈফিযত চাইলেন না। অন্য দিনেব মতই বাজার করলেন, ফিরে এসে দাড়ি কামালেন, নাওযা-খাওযা শেষ কবে অফিসেব জন্য তৈবি হলেন। সুধা অন্য দিনের মতই ঘবেব কাজকর্ম ও রান্নাবান্না সারল, ঠাঁই ক'রে বাপ আব ভাইকে ভাত বেড়ে দিল। তবু হাবুলেব মনে হতে লাগল আজকার দিনটা আলাদা। কেমন যেন থমথমে ভয়-ভয ভাব তাকে সাবাদিন আচ্ছন্ন করে রাখল। খেযেদেয়ে স্কুলে যাওয়ার পরেও বাবার জ্বলন্ত চোখ আর দিদিব নিবন্ত মুখেব কথা হাবুলেব বাব বার মনে পড়তে লাগল।

হরগোবিন্দ বলে গিয়েছিলেন, অফিস থেকে তাঁর ফিরতে অনেক রাত হবে। কিন্তু দেখা গেল অন্য দিনের চেয়ে অনেক সকাল সকাল, সন্ধ্যার বেশ একটু আগেই ফিরে এলেন তিনি। সুধা বাবাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে একটু বিস্মিত হ'ল। কিন্তু কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না, কি কোন কারণ জিজ্ঞাসা করল না, নিঃশব্দে চা করল, খাবারের প্লেট হরগোবিন্দেব সামনে ধরে দিল, কিন্তু অন্য দিনের মত কোন কথা বলল না। হরগোবিন্দ ভেবেছিলেন মেয়ে ক্ষমা চাইবে, ভিত্তিহীন কৈফিযৎ দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে সব কিছুই হ'ল না। মৌনতার মধ্যে সুধাব যে বেপরোয়া ভাব ফুটে বেরুল তাতে ভিতরে

ভিতরে হরগোবিন্দ জ্বলতে লাগলেন। এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, হাবুল ফিরল না?' সুধা বললে, 'খেলতে গেছে, ফিরবে এখনি।'

খানিক বাদেই হাবুল ফিরে এল। বাবাকে দেখে চমকেও গেল একটু। কিন্তু হরগোবিন্দ সংক্ষেপে শান্তভাবে বললেন, 'পড়তে বস।'

আর তার একটু পরেই এল ইন্দুভূষণ। হাতে এক ডজন রজনীগন্ধা। দিনকয়েক আগে সুধার খালি ফুলদানি লক্ষ্য করে ইন্দুভূষণ বলেছিল, 'কি, ফুলের সখ মিটে গেল নাকি? আজকাল যে আর ফুল দেখি নে!'

সুধা জবাব দিয়েছিল, 'সখ মিটবে কেন? কিন্তু কদিন ধরে সুখন এ পাড়ায় আসে না, ফুলও রাখতে পারি নে। বোধ হয় অসুখ-বিসুখ হয়েছে ওর?' ইন্দুভূষণ হেসে বলেছিল, 'যদি আপত্তি না থাকে সুখনের অসুখ না সারা পর্যন্ত তার কাজটা আমিও নিতে পারি।'

সেই ফুল আজ নিয়ে এল ইন্দুভূষণ। কিন্তু ঘরের ভিতরে হরগোবিন্দকে দেখে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তার আসার সময় সাধারণত তিনি থাকেন না। প্রায়ই ইন্দুভূষণের বেরোবার মুখে তিনি ঘরে ঢোকেন। তা ছাড়া সুধার মুখ আজ বড়ই গম্ভীর, আর বিষণ্ণ। কেউ কোন কথা বলছে না দেখে ইন্দুভূষণ বললে, 'হাবুল, ফুলগুলি তুলে রাখ।'

হরগোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি রাখছি। বাঃ, চমৎকার মোটা-মোটা ডাঁটাগুলি তো! এ ফুল বোধ হয় ধারে কাছে পাওয়া যায় না, কি বলেন মাস্টারমশাই?' ইন্দুভূষণ লজ্জিত হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে এনেছি।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'ভারি চমৎকার ফুল।'

ইন্দুভূষণ হাবুলকে পড়াতে শুরু করল। আর সেই ফাঁকে হরগোবিন্দ উঠে একবার বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন আলাপ করলেন।

ইন্দুভূষণ সুধার দিকে চেয়ে বলল, 'কি ব্যাপার? আজ যে এমন—'

সুধা ভাইকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল। তার মানে আজ হাবুলও বে-দলী হয়েছে। আরও সাবধান আরও সতর্ক হবার প্রয়োজন হয়েছে সুধা আর ইন্দুভূষণের।

খানিকক্ষণ বাদে হরগোবিন্দ ফিরে এসে নিজের জায়গায় তেমনি স্থির হয়ে বসলেন। ইন্দুভূষণ অন্য দিনের তুলনায় আজ কিছুক্ষণ বেশি সময় নিয়ে বেশি যত্ন করে পড়াল ছাত্রকে। তারপর পরের দিনের জন্যে অঙ্ক আর ট্রানস্লেশনের টাস্‌ক্ দিয়ে বিদায় নিয়ে বেরোতে হরগোবিন্দ এলেন পিছনে পিছনে, 'মাস্টার, চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

সুধা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার দোরের কাছে এসে দাড়িয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'ওঁকে যা বলবার আমার সামনে বল বাবা। ওঁকে তুমি কিছুতেই অপমান করতে পারবে না।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'অপমান করব কেন? শুধু দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নেব। কি মাস্টার, তোমার কি ভয় হচ্ছে?'

ইন্দুভূষণ একবার সুধার দিকে তাকাল, তারপর হরগোবিন্দের দিকে চেয়ে বলল, 'না, ভয় কিসের, চলুন।'

পুকুর ছাড়িয়ে সেই ছোট্ট মাঠ। মাঠ পেরিয়ে নির্জন সরু অন্ধকার গলি। সেই গলির মুখে হরগোবিন্দ হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন। তারপর ইন্দুভূষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'মাস্টার, তোমার পেশাটা কি সত্যি করে বল তো? ছেলে-পড়ানো না মেয়ে-বখানো?'

ভয়ে ইন্দুভূষণের বুক কাঁপছিল, কিন্তু মুখের বড়াই অত সহজে ছাড়ল না, 'আপনার ও-ধরনের কথার জবাব দিতে আমি প্রস্তুত নই।'

'আচ্ছা, আমরা তোমাকে প্রস্তুত করে নিচ্ছি।' —বলে জনাকয়েক ছায়ামূর্তি মাঠের ভিতর থেকে এগিয়ে এল। এদের কাউকে কাউকে চিনতে পারল ইন্দুভূষণ। এরা সুধার সেই প্রতিবেশী দাদার দল। একই বাড়ির ভাড়াটে।

ইন্দুভূষণ ভয় পেয়ে বলল, 'কি মতলব আপনাদের? মারবেন নাকি?'

একজন বলল, 'না না না, আমরা শুধু জবাবটুকু বের ক'রে নেব।'

আর একজন উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বলল, 'টিউব টিপে শুধু পেস্টটুকু বের করে নেব দাদা।'

হরগোবিন্দ তাদের সঙ্গে আসছিলেন। একজন বলল, 'মেসোমশাই, আপনাকে আর আসতে হবে না। আমরা আপনাকে ঠিক সময়ে খবর দিয়ে আসব।'

খবর পাওয়া গেল সপ্তাহ খানেক বাদে। হাসপাতালে জ্বরবিকারে মৃত্যু হয়েছে ইন্দুভূষণের। প্রথমে দিন কয়েক মেসেই পড়ে ছিল। আহত অবস্থায় কারা যেন মেসবাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল তাকে। প্রথমে মেসের লোকেরা তেমন গ্রাহ্য করে নি। তারপরে অবস্থা খারাপ হওয়ায় কয়েকজনে তাকে হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে ভরতি ক'রে দিয়ে আসে।

সুধা সাত দিন ধরেই ছটফট করছিল। কিন্তু হরগোবিন্দ কড়া পাহারা বসিয়েছিলেন দোরগোড়ায়। কেউ তাকে ঘর থেকে বেরোতে দেয় নি। খবরটা সকলেই চাপতে চেষ্টা করেছিল। তবু চাপা রইল না। বাড়ির ছেলেদের ফিসফিসানির ভিতর দিয়ে সে খবর সুধার কাছে ভেসে এল।

সুধা কাঁদল না, চেঁচামেচি করল না, শুধু দিন দুই বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রইল। শুকনো কালো একরাশ চুল পিঠের ওপরে ছড়ানো। তার ফাঁকে সুন্দর তনুদেহ থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

হরগোবিন্দ পাশে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'সুধা!'

সুধা কোন জবাব দিল না।

হরগোবিন্দ মেয়ের পিঠে আস্তে আস্তে হাতখানা রাখলেন। সুধা কোন সাড়া দিল না।

হরগোবিন্দ বললেন, 'সুধা, তুই আমাকে বিশ্বাস কর্, এতটা যে হবে আমি ভাবতেই পারি নি। আমরা ওকে শাস্তি দিতেই চেয়েছিলাম, সরিয়ে দিতে চাইনি।'

সুধা কোন মন্তব্য করল না।

তৃতীয় দিনে সুধা ফের উঠে দাঁড়াল। আবার সংসারের কাজে হাত দিল, ভাইয়ের স্কুল আর বাপের অফিসের রান্না রাঁধতে বসল। ওপর থেকে সবই ঠিক আগের মতই চলতে লাগল, কিন্তু ভিতর থেকে কোন কিছুই আর আগের মত রইল না। একটি মেয়ে রাঁধে বাড়ে, ঘর গুছোয়, বিছানা পাতে —সবই করে। হরগোবিন্দ চেয়ে চেয়ে দেখেন। এ যেন তাঁর চির-আদরের সুধা নয়, তারই একখানা অবিকল পাথরের প্রতিমূর্তি। সেই মূর্তির চোখ আছে, তাতে পলক নেই, সে মূর্তির অপরূপ দুটি সুন্দর রক্তাভ ঠোঁট আছে, কিন্তু তাতে স্নেহ-মমতা-প্রীতি-শ্রদ্ধার চিহ্নমাত্র নেই।

এই পাথর আর বরফের দেশে হাবুল বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। তার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। শুধু খাওয়া আর শোওয়ার সময় ছাড়া সারাটা দিন বাইরে বাইরে থাকে। কিন্তু হরগোবিন্দকে তার চেয়ে বেশিক্ষণ থাকতে হয়। মেয়ের ভাবভঙ্গি দেখে এখনও তাঁর গায়ে জ্বালা ধরে, মনে রাগ হয় ; কিন্তু রাগ প্রকাশ করতে কোথায় যেন বাধে। আস্তে আস্তে সব দাহ প্রদাহ, সব উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এক সীমাহীন শীতল সমুদ্রের মধ্যে তাঁরা দুজনে যেন জনপ্রাণীহীন তৃণশস্যহীন দুই দ্বীপ। শুধু দূর থেকে একজনকে আর একজনের চোখে পড়ে। পারাপার হবার মত মাঝখানে কোন সেতু নেই, খেয়া নেই।

একদিন হরগোবিন্দের চোখে পড়ল, সুধা বেশভূষা সব ছেড়ে দিয়েছে। কালোপেড়ে শাড়ি পরে। হাতে দুগাছি চুড়ি ছাড়া আর কোথাও কোন গয়না নেই। সোনার গয়নাও নয়, ফুলের গয়নাও নয়। আর একদিন খাওয়ার সময় লক্ষ্য করলেন, সুধা শুধু ডাল-তরকারি দিয়ে খেয়ে উঠছে। মাছ-মাংস ছুঁয়েও দেখছে না। সব বাপ আর ভাইকে দিয়ে দিচ্ছে।

হরগোবিন্দ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'মাছ খেলি নে কেন সুধা?'

সুধা বললে, 'খেতে ইচ্ছে করে না।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'কিন্তু কেন ইচ্ছে করে না শুনি? তুই কি বিধবা? তোদের কি বিয়ে হয়েছিল?'

সুধা বলল, 'মন্ত্রপড়া বিয়েটাই কি সব?'

হরগোবিন্দ বললেন, 'ছি ছি ছি! বাপের সামনে এ কথা বলতে তোর লজ্জা হল না?'

সুধা নির্বিকারভাবে বলল, 'তুমি শুনতে চাইলে, তাই বললাম। জিজ্ঞেস করতে তোমারও তো লজ্জা হয় নি বাবা!'

হরগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তোর সব কথা মিথ্যে সুধা। কেবল জেদ করে এসব কথা বলছিস। এমনি ক'রে আমার ওপর শোধ নিতে চাচ্ছিস। কিন্তু তুই আমাকে দিনরাত পুড়িয়ে মারছিস কেন? তোর যদি সন্দেহ হয়ে থাকে, তুই এর চেয়ে থানা-পুলিশ কর, আইন-আদালত কর্, সে অনেক ভাল।'

একটু যেন হাসি ফুটল সুধার মুখে। সুধা বলল, 'সে সব যারা করতে পারত তেমন আত্মীয়স্বজন তাঁর কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছি আমি। কিন্তু আমি যে তোমার মেয়ে! তুমি খুন করে এ'লে তোমার সেই হাত আমি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেব। সে হাতে শিকল পরাব কেন? আমি যে তোমার মেয়ে।'

হরগোবিন্দ আর্তনাদ করে উঠলেন, 'তুই আমার কেউ নস্, কেউ নস্। তুই আমার শত্রু, চিরজন্মের শত্রু।'

কিছুদিন চুপচাপ থাকবার পর হরগোবিন্দই ফের এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেন, মৃত সম্পর্ককে আবার যেন উজ্জীবিত করে তুলতে চান। নিজের থেকেই কথা আরম্ভ করেন হরগোবিন্দ। রাত্রে শুয়ে শুয়ে আগের মতই পুরনো দিনের কথা তোলেন। সুধার মায়ের গল্প, মামাবাড়ির গল্প। কিন্তু বাপের স্মৃতিকথায় সুধার আর কোন আগ্রহ নেই। হরগোবিন্দ কথা বলে যান। তক্তপোশ থেকে সুধার কোন সাড়া মেলে না।

হরগোবিন্দ বলেন, 'ও সুধা, ঘুমোলি নাকি?'

সুধা অতি সংক্ষেপে জবাব দেয়, 'হুঁ'।

মাছধরার গল্প, নৌকাডুবির গল্প, বিদেশ বিভুঁইয়ের নানা রকম দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুরু করেন হরগোবিন্দ। যে সব কাহিনী সুধা উৎকর্ণ হয়ে রুদ্ধশ্বাসে শুনত, আজ আর সে সব গল্পে তার কৌতূহল নেই। হাসির গল্পে সুধা আর হাসে না, ভূতের গল্পে ভয় পায় না, ঘর সংসারের আলোচনায় কোন উৎসাহ আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিছুতেই সেই আগের মত আলাপ জমাতে পারেন না হরগোবিন্দ।

সেদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন তিনি। তিনখানা সিনেমার টিকিট একেবারে কিনে নিয়ে এসেছেন।

হরগোবিন্দ বললেন, 'চল যাই সুধা, কতদিন ছবি দেখি নে। মধুমালতীর মত এমন চমৎকার বই শিগগির আর আসে নি। কথায় কথায় গান। তুই তো গান ভালবাসিস্।'

ছেলেকে ইশারা করেন হরগোবিন্দ। হাবুল ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'চল না দিদি।'

সুধা জবাব দেয়, 'আমাকে বিরক্ত করিস নে হাবুল। তোদের ইচ্ছে হয় তোরা যা।'

অনুরোধ উপরোধ ছেড়ে হরগোবিন্দ ফের রাগারাগি শুরু করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষ পর্যন্ত টিকিট তিনখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন তিনি।

যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, লেক কি গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবেও আর কান দেয় না সুধা। বলে, 'তোমরা যাও।'

আর একদিন ভরি তিনেক ওজনের একগাছি হার নিয়ে এলেন হরগোবিন্দ। ধানের ছড়ার ডিজাইন। নতুন উঠেছে। বললেন, 'পরে দেখ্ সুধা, তোকে ভারি চমৎকার মানাবে।'

সুধা বাপের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'কেন মিছিমিছি টাকাগুলি নষ্ট করলে বাবা! আমি তো ওসব ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছি!' দাঁত কিড়মিড় করতে থাকেন হরগোবিন্দ। কিন্তু কোন ফল হয় না। বাপের স্নেহের যেমন প্রত্যাশা করে না সুধা তেমনি শাসনকেও ভয় করে না আর। নিষ্ফল আক্রোশে হরগোবিন্দ মাঝে মাঝে আগুনের মত জ্বলে ওঠেন, আবার গভীর নৈরাশ্যে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যান।

একদিন বউবাজার থেকে সুধার মাসী কমলা এল খোঁজ নিতে। সুধাকে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক সাধাসাধি করল। কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে কমলা হরগোবিন্দকে তিরস্কার করে বলল, 'জামাইবাবু, আপনিই বা কি ধারার মানুষ! এমন হাত-পা কোলে করে বসে আছেন কেন? জোর করে বিয়ে দিন মেয়েটার। যেমন ক'রে হোক, যার সঙ্গে হোক, বিয়ে দিন।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'সেই বরানগরের মুখুয্যেরা তো পিছিয়ে গেল।'

কমলা বলল, 'যাবে না? ভাংচি দেওয়ার লোকের অভাব আছে এখানে? ভাল চান তো এই বাড়ি ছাড়ুন, পাড়া ছাড়ুন। কলকাতা শহরে কি আর জায়গা নেই?'

কমলা শুধু রূপবতীই নয়, বুদ্ধিমতীও। ভেবেচিন্তে তার পরামর্শ নেওয়াই ঠিক করলেন হরগোবিন্দ। উত্তর ছেড়ে চলে গেলেন দক্ষিণে। কালীঘাটের সদানন্দ রোডে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন। দুখানা শোবার ঘর। রান্নাঘর, বাথরুম সব আলাদা। মেয়ে জামাই এসে মাঝে মাঝে যদি বাস করে, কোন অসুবিধে হবে না।

বাড়ি বদলানোর ব্যাপারে সুধা কোন আপত্তি করল না, কিন্তু বিয়ের কথায় ফের বেঁকে বসল।

সুধা বলল, 'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পার, সরিয়ে দিতে পার, কিন্তু জোর করে বিয়ে তুমি আমার কিছুতেই দিতে পারবে না। তা হলে চরম কেলেঙ্কারি হবে।'

মেয়ের মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন হরগোবিন্দ। ওকে বিশ্বাস নেই, ও এখন সব করতে পারে।

আবার কিছুদিন চুপ করে রইলেন হরগোবিন্দ। চুপ করে রইল সুধা। দুজনের মাঝখানে শব্দহীন দুঃসহ শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল।

সুধাকে এখন আর বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হয় না। সে আলাদা ঘর পেয়েছে। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে মেয়ের সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেন হরগোবিন্দ। দেখবার মত কিছু নেই। দামী কোন আসবাবপত্র সে ঘরে রাখতে দেয় নি সুধা। এমন কি, একখানা তক্তপোশ পর্যন্ত না। ঘরের এক কোণে দেওয়ালের ধারে বিছানা গুটানো। ডান দিকে ছোট একটি বইয়ের শেলফ। বইগুলি না খুলেও হরগোবিন্দ বুঝতে পারেন এগুলি তার দেওয়া, যে শত্রু ম'রেও মরে নি। তাকের ওপরে একটি শূন্য ফুলদানি। সেদিন ফিরে এসে হরগোবিন্দ রজনীগন্ধাগুলি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর ফুলদানিতে আর কোন ফুল রাখে নি সুধা।

আবার একদিন মেয়েকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন হরগোবিন্দ, বললেন 'সুধা, আমি তোর বাপ।'

সুধা বলল, 'কি বলছ বল।'

হরগোবিন্দ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমাকে কি তুই ক্ষমা করতে পারিস নে?'

সুধা মুখ নীচু করে বলল, 'ওসব কথা থাক্ বাবা।'

এর পর হরগোবিন্দ কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

আরও কিছুক্ষণ ব'সে থেকে সুধা এক সময় উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

ছোট টেবিলটিতে বসে হাবুল নিজের মনে পড়ছিল। আজকাল ও একা-একাই পড়ে। নিজের মনেই থাকে। বাড়ির এই নিঃসঙ্গ একক জীবনে হাবুলও এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাবা আর দিদির মাঝখানে সে আর যোজক নয়, সেও যেন স্বতন্ত্র তৃতীয় একটি দ্বীপ।

ছেলের দিকে হরগোবিন্দ অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। আরও লম্বা হয়েছে। কিন্তু রোগাটে ভাবটি যায় নি। দেখলে কেমন যেন মায়া হয়। হরগোবিন্দ বললেন, 'হাবুল, শোন।'

হাবুল বলল, 'কি বাবা?' হরগোবিন্দ বললেন 'আয়, আমার কাছে আয়।'

হাবুল বিস্মিত হয়ে উঠে এল। বাবা অনেক দিন হল এমন করে ডাকেন না। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। হরগোবিন্দ হঠাৎ তক্তপোশ ছেড়ে উঠে এসে ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, 'হাবুল, আমার হাবুল—'

হাবুল কিছুক্ষণ আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অতিকষ্টে দম ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও। বড্ড লাগছে। ব্যথা পাচ্ছি।'

হরগোবিন্দ যেন চমকে উঠলেন, ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুইও ব্যথা পাচ্ছিস? আচ্ছা যা।'

হাবুল ফের গিয়ে পড়তে বসল। হরগোবিন্দ পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু জানালাটা আর খুললেন না। খুললেই সুধাকে দেখা যাবে। দেয়ালের কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উৎকর্ণ হয়ে যেন কিছু একটা শুনতে চাইছেন তিনি। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। শুধু নিজের দীর্ঘশ্বাসের শব্দই কানে ভেসে এল।

পরদিন সকাল সকাল অফিসে বেরুলেন হরগোবিন্দ। একই টেবিলে বসে কাজ করেন সুরেন সমাদ্দার। হরগোবিন্দের সহকর্মী সমবয়সী, খুব সামাজিক আর সদালাপী মানুষ। চারদিকের খোঁজখবর রাখেন। সাধ্যমত উপকার করেন সহকর্মীদের। অবিবাহিত ছেলের জন্যে মেয়ে খুঁজে দেন, মেয়ের জন্য ছেলে। মনিবদের জন্যে ঝি আর ঠাকুর-চাকরের খোঁজ আনেন, কর্মপ্রার্থী বেয়ারাদের মনিব জুটিয়ে দেন। এতদিন তাঁর কাছে মুখ খোলেন নি হরগোবিন্দ, আজ মন খুললেন।

ফাইল-পত্র ভাগ ক'রে নিতে নিতে বললেন, 'ভাই সুরেন, আমার একটা কাজ ক'রে দেবে?'

সুরেনবাবু বললেন, 'কি কাজ?'

'একটি ছেলে দেখে দেবে আমাকে?'

'কি রকম ছেলে?'

'বামুনের ছেলে হলেই ভাল হয়। অন্য জাত হ'লেও—'

'অন্য জাত হবে কেন? তুমি বামুন, তোমাকে বামুনের ছেলেই দেব। বামুনের অভাব আছে নাকি? তারপর?'

'ছেলেটি এম. এ পাস হলেই ভাল হয়, বি. এ. পাস হলেও ক্ষতি নেই।'

সুরেনবাবু বললেন, 'কেন, এম. এ পাস ছেলের অভাব আছে নাকি? তারপর?'

হরগোবিন্দ বললেন, 'কাজ-কর্ম যা করে করুক। খেয়ে দেয়ে থাকতে পারলেই হল।'

সুরেনবাবু হেসে বললেন, 'বিলক্ষণ! তারপর? কার জন্যে হে? নিজের মেয়ের জন্যে নাকি? আরে ভাই, খুলেই বল না জামাই চাই একটি। আছে আমার হাতে। জামাই করতে চাও তো বল।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'না ভাই, জামাই নয়, জামাই নয়।'

সুরেনবাবু বললেন, 'তবে?'

হরগোবিন্দ বন্ধুর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'একজন প্রাইভেট টিউটর—ছেলের জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটর।'

আলোক অন্বেষা

শওকত ওসমান

চোখেব উপর একটু আলতো হাত বুলাতে পারলেও যেন এখন কিছুটা যন্ত্রণাব উপশম হতো।

অসহ্য অস্থিরতা ভেতরে ভেতরে এত ঘুরপাক রত যে, সালামৎ আলি ঠিক হদিস কবতে পারছিল না। এই মুহূর্তে যথা-প্রতিষেধ তার জন্যে কী আছে। হঠাৎ-ই মনে পড়ল অমন করস্পর্শের কথা, যদিও সচেতন ভাবে কিছু নয়।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া হিসেবে হাত তুলতে গিয়ে সালামৎ নিদারুণ ভাবে অনুভব করলে, তাব যো নেই।

হাতকড়ার শাসন ধমকে সব ঠাণ্ডা করে দিলে।

কিন্তু সালামৎ সহজে পেছপা হয় না। মাথা নিয়ে গেল সে নিজেব হাতের চেটোব মধ্যে। সেখানে দুই ফেটি-বাঁধা চোখ ঘষতে লাগল।

হঠাৎ তাব এমন নতমুখ পাঞ্জাবী প্রহরীর চোখ এড়ায নি। সে ব্যাপাবটা দেখেই চুপ করে যেতে পাবত। কিন্তু তা দূবের কথা, বরং উল্টো গালাগাল ছুঁড়লে, "এই শালা, বাঙালীকা বাচ্চা।"

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সালামৎ আলি। কিন্তু কান তো খোলা। তাব বুঝতে দেরী হয না, শান্ত্রর চোখ তার দিকে ঠিকই আছে। কিন্তু মাথা খসে পড়ছে, যে-মাথা কবতালুর মধ্যে বন্দী, তবু কিছু সোয়াস্তি পাচ্ছিল।

সালামৎ আলি তখন হঠাৎ পবিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, তার চোখ এমনি ফেটি-বাঁধা।

পৃথিবী কেমন দেখতে? নিজেকে সে জিজ্ঞেস কবে বসে। তাবপব জবাব নিজেই দিতে এগোয। বহু অতীত তখন হুড়াহুড়ি ধাক্কা দিতে থাকে তার মনের ভাসমান সমতলে জাযগাব জন্যে। এই গুঁতোগুতি অনেকক্ষণ চলে।

ওদিকে চোখেব যন্ত্রণাও চেপে বসছে। তবু হাতড়ে-ফেবা দৃষ্টি ফেটিব মধ্যেই ছবি আঁকতে থাকে। অজস্র বুদ্‌বুদ, অজস্র বঙেব স্রোত কেবল অক্ষিপটেব ভেতর দিয়ে হুহু ঢুকে যাচ্ছে, গন্তব্যহীন যাত্রায়।

কিন্তু সে তো এক ঠিকানায় এসে পৌছেছে।

কোন্ জাযগায তাকে মিলিটারিরা এখন আস্তানা দিয়েছে? তাব একটা হদিস কবা যেত। তবু কিছু শান্তি। ঢাকা শহবে তাব জন্ম সেই একান্ন সনে। কুড়ি বছরে এই ছোট শহব জরীপে কিছু বাদ নেই তাব। একটা জাযগাব নাম পেলে সে যেন সব যন্ত্রণা ভুলে যেত। শান্তিনগব, মালিবাগ, শাঁখাবিপট্টি, ইসলামপুব, বমনাব কোন এলাকা? এ জাযগা ধানমণ্ডিব নয়াবাদ অভিজাত-পল্লীর কাছাকাছি কোথাও হোতে পাবে না। বন্দীশিবিব আব কোথাও নিশ্চয। শহবেব মাঝখানে এত লোক ধবে বাখবে, অন্যান্য মানুষকে ভয় দেখাতে, এমনও হোতে পাবে। কিন্তু হাতড়ে কিছু হেঁটে যেতে পাবলে সে বুঝতে পাবত, তার আস্তানাব হদিস কী? মেঝে পাকা। আর কিছু বোঝাব উপায নেই। কাবণ, ঠায় বসে অথবা দাঁড়িযে থাকা। কড়া হুকুম। এদিক

ওদিক করলে সাইকেলের চেন-পেটা কববে। দু'বার শাস্তির রোলার তার দেহের উপর দিয়ে ঘষড়ে ঘষড়ে কিছু কাপড়, কিছু রক্ত, কিছু ছাল নিয়ে গেছে।

আর তাগদ বেশী নেই।

আটচল্লিশ ঘণ্টা একটা দানা পড়ে নি পেটে। তার জন্যে কোন আফশোষ নেই। একবাব দেখতে পেত সে পৃথিবী কেমন, তা হোলেই ক্ষুৎপিপাসা সব মিটে যেত।

বাইবের জগৎ শব্দ দিয়ে চেনা যায়। এখানে শব্দ বড সীমাবদ্ধ। জীপের যাতায়াত, স্টার্ট্-ধ্বনি আব ভারী বুটের আওযাজ, কালেভদ্রে কথাবার্তা। এখানে যা মনুষ্যকণ্ঠ উচ্চারিত হয়, তা শুধু হুকুম। আর কিছু না।

নিকটে আশেপাশে লোক থাকলে, তাদের চলাফেরা কথাবার্তা না হোক নিঃশ্বাসের বাতাস অন্তত কিছু জানান দিযে যেত। 'সেদিক' পর্যন্ত শূন্য। শান্ত্রীব সঙ্গে একটা যোগাযোগ হোতে পারত আহারের ব্যবস্থা থাকলে, তাও নেই।

অবিশ্যি ক্ষুধা যা প্রথম কযেক ঘণ্টার মধ্যে সালামৎ আলি একবার অনুভব করেছিল। তারপর তাব দেহ-যন্ত্রের আর কোন চাহিদা নেই। কেবল চোখ বেয়াড়া জিদ্দী ছেলেব মত বায়না নিযে মেতে আছে ঃ আলো, এতটুকু আলো দাও। অতি ঝাপসা। হিম-প্রত্যূষের কুযাশা-লেপা ক্ষীণতম আলো যা চোখ তেড়ে ধবতে হয়, এমন আলো।

এই প্রার্থনাব জবাবে কিন্তু অন্ধকার কেবল ধেযে আসে, ঘনীভূত হয়—শেষে পুরু কালো পর্দাব মত সামনে ঝুলে থাকে, আর নড়ে না। এমন ঘনত্বের ধাক্কায় সালামৎ আলি মূর্ছা যেতে যেতে আবার সামলে নিত। অত সহজে নয়। একদিকেব ঘাড় কাৎ করে কিছু বিশ্রাম। তার পবে আবার অন্য ঘাড়ে আশ্রয়।

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টাব হেবফের।

তাব জীবনে এখন শুধু বর্তমান আছে। মনে হয়, অতীত মুছে গেছে। অতীতের তাই ধর্ম। কিন্তু তাব মবা দেহ, বকুলফুলের মত শুকিযে গেলেও সহজে সৌবভ হারায় না। বর্তমানে অতীত আব পূর্বেব কলেবরে নেই। স্মৃতি যখন কসাযের চাপট এবং যাব উপর আঘাত হানে কুঁচি কুঁচি কবে ছাড়ে আস্ত হাড, তখন চোখ বুঁজে, নিঃশ্বাস বন্ধ কবে রেহাই পেতে চাইলেও অসুবিধার মাত্রা শুধু বাড়ে। তাব চেযে খামখা চীৎকাব দাও না কেন? ডুকবে কান্না বা গোঙানি যন্ত্রণা লাঘব করে এই ক্ষেত্রে। কিন্তু কান্না পুরুষ মানুষের অলঙ্কাব নয়। সালামৎ আলি তাই সাইকেলেব চেন-পেটা হওযার সময় নিঃশব্দে কাৎবেছে। পেশী, মুখেব বা যন্ত্রণাসিত অন্য অঙ্গেব, সঙ্কুচিত করেছে বার বাব, কিন্তু শব্দেব ভুবনে ধবা দেয নি।

এখন সঙ্গীরা অনুপস্থিত, কিন্তু ধরা পড়ার সময তাব কাছে ছিল। তিন চাব জন। এমনি পথে তাদেব সঙ্গে আলাপ। আব বিপদ তো পথেই তাদেব উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। সবাই একে একে সবে গেছে। তা আব চোখে দেখা হয় নি, কারণ ফেটি বাঁধা। অনুভব কবতে হয়েছে সালামৎকে। অপবাধ এখানে সাধারণ সংজ্ঞায় চালু নয়—মার খেযেছিল। বেদম মার। তখন গোঙাতে শুরু কবেছিল। বিদ্রূপ করে উঠেছিল পাঞ্জাবী-প্রহরী 'এই শালা বাঙালী কা বাচ্চা আওবৎ কা তবেহ্ বোতা হ্যায় . না-মরদ, বুজদীল (ভীরু) .. ।" সেই জন্যে সালামৎ চুপ করে আছে? না। সে জানে, শত্রু যেখানে জন্তুব অধম, সেখানে মানুষের মত ব্যবহার অনুচিত, অসঙ্গত। জন্তুকে পিটে শায়েস্তা কবতে হয়। আর অন্য কোন বাস্তা সেখানে বন্ধ, তার তো সে যো নেই। তাব হাত বাঁধা। কাছাকাছি প্রহরী আসে না। এলে একটা লাথি অন্তত দিত। তারপব যা হয হোক। একবাব সালামৎ আলিব মনে হয়েছিল, খুব কাছে পাঞ্জাবী নেকড়েটা, তাব কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু কিছু তো দেখতে পাচ্ছে না সে। লাথি যদি ফস্কে যায, খামখা হেনস্থা ডেকে এনে লাভ কি? সেই জন্যেই তো আলোর জন্যে যত প্রার্থনা। একটু আলো, চোখ ঈষৎ ফেটিমুক্ত হোক, সে তো ধৃতবাষ্ট্র নয। আলিঙ্গনেব

মধ্যে শত অসুবের শক্তি জমাট। সালামৎ আলি তবু ভেবেছিল, একবাব জাপটে ধবব, তাবপর কয়েকটা ঘুষি। হাত ঠুঁটো, তা হিসেবের মধ্যে ধবে নি। নিছক প্রতিশোধপবাযণতা মগজ ঘুলিয়ে দেয়।

চোখেব কোটবে পেশীগুলো তড়পে উঠল, প্রথমে ধিকিধিকি, তাবপব হঠাৎ দ্রুত কম্পন শুরু হয় চাবিদিকে। কন্ধকাটা ভূত প্রেত ঢের বেশী সুখী। সালামৎ আলিব মনে কথাটা খেলে গেল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। তাকে কিছু ভাবতে হয নি।

এখন দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সে খুলি চুবমাব করে ফেলতে পারত।

কিন্তু কোথায দেওযাল? প্রাচীবের এত ভয মানুষের, যদিও আততায়ীব আশঙ্কায সে নিজের চারদিকে অমন কঠিন বেষ্টনী গড়ে তুলতে বাধ্য হয। আজব ধাঁধাঁ অস্তিত্বেব। যা বিষ, তাই আবাব বিষ-হর। মাত্রা, সময়, স্থান, পবিবেশেব নক্‌শা অনুযাযী মূল্য বিচাবে সব হেরফের হয়ে যায।

আশেপাশে কোন দেওযাল আছে কী? শান্ত্রীকে জিজ্ঞেস কবা যায। কিন্তু প্রশ্নেব কোন বালাই ছিল না। পিপাসায একসময় ছাতি ফাটাব উপক্রম, তবু পানি চায নি সে প্রহবীর কাছ থেকে। গ্রামে এক খাল পার হওযাব সমযে সে স্রোতে মুখ ডুবিযে দেওযার সুযোগ পেয়েছিল। সেই একবার মাত্র পিপাসাব মোকাবিলায জযী। এখনও জযী। কাবণ আব পানির দরকাব হয় নি।

ক্ষুধাব মত পিপাসাও নেই। সব কামনা এখন আলোব জন্যে।

পৃথিবীকে দেখতে চাই একবার। কাবণ, জন্মভূমি বাংলাদেশকে শেষবাব না দেখলে মৃত্যু অর্থহীন থেকে যাবে। তাই ত আলোকপ্রার্থী আমি। হে পূষণ, তোমাব সপ্ত অশ্ববাহিত রথের ঘর্ঘব আর আমি শুনতে পাই না কেন?

সালামৎ আলি আবৃত্তির আকারে উচ্চাবণ করতে গেলে, গ্রীবায খস্‌খস্‌, যেহেতু নীবস, খুক খুক কাশি এসে যায় সহসা। কিন্তু প্রাণেব প্রতিধ্বনি-মুখে কে হাত চাপা দিতে পাবে? আলো, আলো নয়। তবঙ্গের সঙ্গী। একে অপবের বিকল্প না হলেও, আলো ছাড়া আব কোন ঢেউ দেখা অসম্ভব। তাই ত এত প্রার্থনা, হে জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি, একবাব স্পর্শ দিয়ে যাও। ভক্তের নিবেদন শোনো. ।

মুখের পেশী বিকৃত হতে লাগল সালামৎ আলিব। এইবাব মাথা বুঝি খসে মাটিতে পডবে। হ্যাণ্ডকাফেব উপব সে কপাল রেখে স্থিব দাঁড়িয়ে বইল। একবাব ঠেস দেওযাব ইচ্ছায় সে একটু হেলেছে কি, তখনই সোজা হযে পডল আবাব। এখানে দেওযাল নেই, থাম নেই, হয়ত গরাদ নেই, যাব উপর হাত বেখে মাথা রেখে কয়েদীবা চিবদিন সব অভিলাষ পবিপূর্ণ ভাবমূর্তি রূপে বেখে গেছে পৃথিবীব সব দেশে।

সালামৎ আলির হুঁশ আবাব সহজ ভাবে ফিবে আসে।

এই এক বিচিত্র শত্রু। নিপীড়নের ফন্দি ফিকির নয়, তাব বর্বরতম পন্থা পর্যন্ত আবিষ্কাব কবেছে। শরীরের সহন-ক্ষমতা অনেক দূব যায়, যদি অনুপ্রেরণা নয, কেবল ছোটখাট অবলম্বন মেলে দুঃসহ যন্ত্রণার সময়। কয়েদখানার জানালাব শিক, উদাহরণত, এই ধবনেব সামগ্রী।

কিন্তু এখানে কিছু নেই। মরুভূমিব মধ্যে একচিলতে মেঘ পথভ্রান্তের শক্তি যোগাতে পারে। সালামৎ আলির অনুভূতি তাই হাতড়ে বেড়ায়, যদি কোথাও কিছু পাওয়া যায়।

একবার চোখমুখ কুঁচকে সে দমকা নিঃশ্বাস নিলে। বুকেব পাঁজরে ফিক ব্যথা এসে জুটল, হাত দিযে সংবাহনের কাজ এখানে অল্প উপকাবী। কিন্তু ঠুটো অবস্থায় সে কী করবে? তাই হাতকড়া নিয়েই দুই হাত বুকের উপর রাখলে। দম আটকে আসে থেকে থেকে। সালামৎ আলি গলার ভেতর ঘড় ঘড় একটা আওযাজ তুললে, জবাই ছাগলেব ক্ষেত্রে যেমন ঘটে। এই গুমবানি অনেকখানি সোযাস্তি। কিন্তু শত্রু তাব অসহাযতা দেখে

আনন্দ পাবে, তা হয় না। আবার গ্রীবাদেশ শব্দহীন। বন্ধ চক্ষু তেড়ে তেড়ে ফেটির কিনারা ছোঁয় মাত্র এবং ব্যথায় আরো নেতিয়ে পড়ে। সালামৎ আলির বক্ষস্পন্দন পর্যন্ত অতি ঢিমে হয়ে যায়। মাথার ভেতর চক্কর লাগে। সালামৎ ভাবলে, বোধ হয় মৃত্যু সন্নিকট। কিন্তু এই চিন্তা এক জায়গায় আট্‌কা থাকতে পারে না, বরং হঠাৎ উবে যায়।

স্মৃতির পঙ্গপাল মগজের চারপাশ ছেয়ে বসে পড়ে।

বিশ্বাসঘাতকতা তাকে জল্লাদের হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘাগী মুসলিম লীগারের মুখটা সে দেখতে পেলে। ফিচেল ছুঁচোলো মুখ, কৃশ চেহারা, তাই আবার বেঁটে-খাটো এই শুয়োরের বাচ্চা আবার তার প্রভুদের কায়দায় নামের শেষে বিক্রমপুরী জুড়েছিল। ধূর্তামি ওর চোখেমুখে স্পষ্ট। চিরকুমার। সমাজের জন্য জীবন বিকিয়ে দিতে পারত খুব সহজে। মহৎ নামে পরিচিত হোত। কিন্তু সব সময় সে সমাজ-বিরোধীদের দোসর। ছোকরাবাজ রূপে প্রসিদ্ধ ছিল সে বিক্রমপুর এলাকে। আজও খসলৎ বর্তমান আছে। এই বয়সে, ষাটের ঊর্ধ্বে, এখনও বিক্রমপুরী কারো ক্ষতিসাধন, বিশেষত দেশের ক্ষতিসাধন করবে, বাংলাদেশে যখন কসাইয়ের দোকান তা ভাবা যায় নি। কিন্তু সে-ই পাঞ্জাবী প্রভুদের আমন্ত্রণ দিয়ে এনেছিল এই অঞ্চলে।

ইসলাম পার্টির ধর্মধ্বজী দালালগুলো সঙ্গে জুটেছিল। নচেৎ অমন অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে তার খোঁজে রাত্রে পঞ্চনদবাসী মিলিটারি হাজির হতে পারে, তা অবিশ্বাস্য।

কত মুখের মিছিল দ্রুত শূন্যতার রাস্তা অতিক্রম করে। মানুষের আধিপত্য সেখানে প্রধান নয়। বাড়ির পোষা কুকুরটা, অস্বাভাবিক শব্দ তুলে তার অনুগমনে কতো দূরে এসেছিল। এক সিপাই গুলি করে তার প্রভুবিচ্ছেদের বেদনা আর স্থায়ী হতে দেয় নি। নভোচারী রুশ সারমেয় লাইকার নামে সেও কুকুরের নাম রেখেছিল। একটা জন্তুমুখ এই অন্ধকার, এই আলো— এমন ছাড়াছাড়া খাদ আর পথের পালাক্রম সান্নিধ্যের মত— ভেসে উঠতে লাগল, যেমন নদীতে স্নানের সময় তার অভ্যেস ছিল। কুকুরের মধ্যেও মানবিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। আর তার সঙ্গী দশজন পাঞ্জাবী সিপাই, এগুলো মুসলমান মুসলমান .. কুকুরের কাছাকাছি কোন কালেও যেতে পারবে না।

চীৎকার দিতে গিয়ে ঢোক গিললে সালামৎ আলি। মগজ এখন বড় পরিষ্কার। কিন্তু চিরকালের করুণাপরায়ণ মন এবং যার জন্যে সে রাজনীতির ভেতর ঢুকেছিল, হঠাৎ চিন্তার মোড় ফিরিয়ে নিলে আপন স্বভাবের বেগে। এ গুলোর আর অপরাধ কতটুকু। এই কুকুরদের মনিবগুলো বসে আছে ইসলামাবাদ শহরে— সেগুলোই আসল জন্তু। নিজের মনে হেসে উঠল সালামৎ আলি এই সময়। রাজধানীর নাম ইসলামাবাদ। ইসলামকে যারা বরবাদ করেছে গত পঞ্চাশ বছর ধরে এবং যার ঝোপের আড়াল থেকে নিজেদের অর্থলালসা, কামলালসা, আয়েস আরামের ঘৃণ্য প্রবৃত্তির রোলার নির্দয় গতি চালু রেখেছে, তারাই শুধু এমন কৌতুক বিতরণে সক্ষম। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাঝে মাঝে কী আশ্চর্য ভাবে না ঘটে। আজ যেখানে ইসলামাবাদ শহর গড়ে উঠছে তার নাম পাটোয়ার ভ্যালি। এই অধিত্যকা বিশ বছর আগে ডাকাতদের আস্তানা ছিল। বড় ডাকাতরা ছোটদের ভাগিয়ে দিলে। এদের তুলনায় যদিও তারা ছিল দেবদূত বা ফেরেস্তা। তারা একটা দুটো গেরস্থ লুট করে ক্ষান্ত দিত। এরা একটি জাতির সম্পদ লুণ্ঠন নয় শুধু তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে হত্যা তাণ্ডবে মেতেছে, সেখানে বর্বরতায় নাদির শাহ, চেঙ্গিজ খান, বা হিটলার দুগ্ধপোষ্য শিশু। বাংলাদেশের অধিবাসীদের হাড়ের উপর ষোল শ কোটি টাকার শহরের পত্তন। তারই প্রতিবাদের খেসারৎ দিচ্ছি নিজের জীবন যৌবন দিয়ে ...। সালামৎ আলির মনে হ'ল মাথার ভেতর কি যেন সিদ্ধি ঘোঁট ঘোঁট পাকাচ্ছে। আর ত' মাথা কোথাও রাখতে পারব না। এখনই হয়ত মুখ থুবড়ে পড়ব। কিছু ধরা দরকার। শূন্যতায় হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উপায় পর্যন্ত নেই। আলো

দাও, আমাকে একটু আলো দাও যেন বাংলার মুখ আমি দেখতে পাই আব একবাব। আর একটি বার। এমন চীৎকার ভেতরে নিষ্ক্রমণ-পথের জন্য মাথা কুটছিল।

আর্তনাদ দ্বাবা শক্রকে অনুবোধ কবব?

সালামৎ আলি এটুকু ভাবতে পাবলে হাজার যন্ত্রণার মধ্যেও। কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যাদেব জীবন তারা অত সহজে নিজেব ইচ্ছার বশবর্তী হয় না। না, জন্তুব কাছে মানুষ কিছু চাইতে পাবে—এ অস্বাভাবিক। মানুষেব ইচ্ছা আদেশরূপে জন্তুব কাছে যায়। এখানে তেমন ব্যবস্থা যখন নেই, নিঃশব্দতাই পবম সঙ্গী।

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পাবব?

নিজেব কাছে প্রশ্ন এবাব সোজাসুজি কবে বসে সালামৎ আলি। কিন্তু জবাবেব জন্য অপেক্ষা কবে না। কাবণ অনেক ছাযাছবি সে যেন চক্ষুসংলগ্ন ফেটিব সমতলে দেখতে পায ধেয়ে ধেয়ে আসছে, আছড়ে পড়ছে, ভেঙে চুরমাব, এবং আবাব খণ্ড খণ্ড দিগ্বিদিক বেবিযে যাচ্ছে অতি দ্রুতবেগে, তখন সবই যেন অনুপ্রবাহ এবং স্রোতেব মত তাব অভিঘাত, সামনে যা পড়ে টেনে নিয়ে যায। হযত হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত সালামৎ আলি। কিন্তু কযেকটি গুজবে-যাওয়া ঘটনাব গুঞ্জবন কানেব কাছে শুধু শব্দমূর্তি বেখে গেল না, আবাব ছবি হযে উঠল। সর্বপ্রাচীন ছায়াচিত্রেব ধারায নির্বাক।

সামাজিক কাজকর্মেব মধ্যে একটি সহপাঠিনী তাব কাছে বেশ ঘন ঘন যাতাযাত কবেছিল। সালামৎ আলি সহকর্মীব মর্যাদা দিযেছিল তাকে। পাবস্পবিক শ্রদ্ধা যেখানে একমাত্র যোগ সেতু। তাবপর ধাপে ধাপে বৃহত্তর সমাজ জগতেব এলাকায নিজেব জাযগা কবে নিযেছিল সালামৎ আলি। ফলে, কাজ অনেক বেশি। এ-জেলা সে-জেলা, এ-মহকুমা সে-মহকুমা ছুটোছুটি, পার্টিব কর্মী সম্মেলন ইত্যাদিব চাকায বাঁধা জীবনে ফুবসৎ ছিল না। মাত্র গত সপ্তাহে সহপাঠিনী তাব কাছে খোলাখুলি হৃদয উন্মোচন কবেছিল পত্রযোগে। কাজেব ভিড়ে সাক্ষাতেব যো ছিল না। তাব মধ্যে হঠাৎ দেশেব উপব হানাদাবদেব হামলা-জনিত সঙ্কট। কে কোথায় যে ছিটকে পড়ল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বসে গেল। নিজেব ব্যক্তিত্বের প্রতি তাকিযে ফল্গু আনন্দেব বেশ সহ মৃদু হেসেছিল সালামৎ আলি। একটি মুখ তাকে আজ বাববাব ব্যথিত কবে এই ভেবে যে, সে প্রলযকালেব চূড়ায আসীন, কিন্তু শেষ চীৎকার দেওযাব সময অতিবাহিত। ইথাবে কোন বাণী কম্পন আব থাকবে না। বস্তু পিণ্ডেব সঙ্গে সেও জড়ে পবিণত হবে। হিমবাহ পাহাড়ী তরুবৃন্দ সব ভেতরে গুড়িযে দিযে ববফ আবৃত কবে চলে গেল কোন গিবিখাদে সমাহিত হতে।

এত অন্ধকাব কেন পৃথিবী জুড়ে? আমাকে আলো দাও, অতি অস্পষ্ট আলো, যাব কাছে জোনাকি মনে হলে প্রদীপ। শুধু নিমেষেব জন্য। বাংলার মুখ তাব সাহায্যেই দেখা হযে যাবে। বুকেব ছবি যত ক্ষীণ বশ্মিই হোক চোখেব সামনে, দৃশ্যকাব্য রূপে গীত হযে উঠবে হাজাব যাত্রাব হিল্লোলিত স্পন্দনে। এক ফোঁটা আলো পাঠাও, হে মার্তণ্ড দেব, তোমাব অন্তহীন তেজভাণ্ডাব থেকে। এই তমসার অবসান ঘটুক। এক ফোঁটা আলো ।

চোখ তেড়ে কালো ফেটিব মধ্যে তাকাতে গেলে সালামৎ আলিব মনে হল, মস্তিষ্কেব ভেতবে কোথায যেন কি ছিঁড়ে গেছে এবং তাব পক্ষে আব এক মুহূর্ত দাঁড়িযে থাকা অসম্ভব। কিন্তু যদি চোখ মেলে চাইতে পাবত, অনন্তকাল দাঁড়িযে থাকা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য কিছু ছিল না।

কিন্তু কে দেবে তাকে আলো?

অনুরোধ কবব শান্ত্রীদেব? ঘৃণায চোখমুখ কুঁচকে এলেও অসহ্য লাগছিল সালামৎ আলির কাছে শাবীবিক যন্ত্রণাব ধাক্কা, যা পথে কতবার না অকাবণ শাস্তি মাবফৎ পুরস্কাব পাওয়া। না, আর দাঁড়িযে থাকা অসম্ভব। কী হবে যদি এতটুকু মেহেববানী গ্রহণ কবা যায? অতি সামান্য দয়া। একবাব আমাব চোখটা খুলে দাও। এই মিনতি কি জন্তুব কাছে পবাজয স্বীকাব?

এই জবাবের পূর্বে সালামৎ আলির মৃত ক্ষুৎপিপাসার্ত, প্রহৃত গোটা দেহ জুড়ে এমন তাণ্ডব শুরু হল তার কোন খেয়ালই ছিল না যখন সে চীৎকার দিয়ে উঠল, এই সেপাহী, জারা মেহেরবানী—।

—কিয়া মাংতা—?

— মেরা আঁখ কা পট্টি খোল দিজিয়ে।

—কিঁউ।..

—তকলীফ কা ওয়াজেহ সে নিহি। মাঁই জারা দুনিয়াকো দেখনে মাংতা।

থোড়া রোশনাই। কষ্টের জন্য নয়। আমি দুনিযাটা একটু দেখে নিতে চাই। একটু আলো।

— রোশনাই। —আচ্ছা—আফসার সে পুছে।

বুটের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

আবার বুটের আওয়াজ নিকটবর্তী।

উর্দু জবান দম্ভ ঘোষণা করলে, "এই কয়েদী চলো। তোমকা রোশনাই মেলে উস্‌কা বন্দোবস্ত করে।' (তুমি আলো পাও তার বন্দোবস্ত করি।)"

—মেহেরবানী।

– মেরা সাথ আও। এই বশি পাকড়ো। বাঙালী কা বাচ্চা ইধাব উধাব করেগা তো পেট মে কিবীচ ঘুঁসা দুংগা।

--চালিয়ে।

বন্ধ চক্ষু সময় আন্দাজেব বিশেষ বাগড়া। সালামৎ আলি ঠাউব কবতে পাবে না, কতক্ষণ সময় গেল। তবে সে সহজে ধবে ফেলে, কোন দালানেব এক বাবান্দা থেকে আর এক বারান্দা, কবিডব থেকে কবিডরে, যেখানে সিঁড়ি—সুতরাং তলা--এক বা দুই বা তিন তলা পাব হচ্ছে।

হযত দশ পনব মিনিট।

সালামৎ তাব হদিস দিতে পারবে না, কিন্তু তাব পাযে কোন জড়তা ছিল না। প্রতীক্ষিত আশা যখন হাতে, কাছে আসে আসে, তখন দ্রুততার গুণ্ডা যে-কোন মানুষকে উদ্বিগ্ন ব্যস্ততায কাবু করে ফেলে। সালামৎ আলি তার কোন ব্যতিক্রম নয়। সজীবতা ফিবে এসেছিল তাব দুই পায়ে, যদিও লুঙিব তলায ঠিক হাঁটুর নীচে সাইকেল চেনের পটাপট আঘাতে শুধু লুঙি নয় চামড়া পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল দগদগে ঘাযেব পরিণতি সহ। জ্বালা ধবে বৈকি ওই সব জায়গায় চলাকালীন লুঙিব ঘষড়ানিব চোটে। সালামৎ আলি কিন্তু যেন সব যন্ত্রণার ঊর্ধ্বলোকবিহারী। আর একটু পরেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তারপর আসন্ন নয় অবধারিত মৃত্যুব প্রতীক্ষা। কারণ, এ পর্যন্ত এমন জন্তুদেব কবল থেকে কেউ আর ফিরে আসে নি, দান্তে বর্ণিত দোজখ দরজাব সাইনবোর্ড এরা গোটা বাংলাদেশের উপর টাঙিয়ে দিযেছে। 'সর্ব আশা পরিত্যাগ কবিযা আসিও যাহারা প্রবেশার্থী।'

—রোকো। সহসা শাস্ত্রী হেঁকে উঠল।

থামলে সালামৎ আলি।

একটা দরজা খোলার শব্দ। কিছু কিছু ফিসফাস রব।

সিপাই তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে, সালামৎ আলি তা পরিষ্কার টের পায়। হাতে, হ্যাণ্ডকাফ যথারীতি মজুদ।

— তোম রোশনাই মাংতা?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আব তোমরা ফেটি খোল্ দেতা।

ব্যাকুলতা সালামৎ আলির আঙুলগুলো মৃদু কাঁপিয়ে দিয়ে গেল, যেন সকালের হাওযা।

—আচ্ছা, আব রেডি হো যাও।

সিপাইয়ের কণ্ঠস্বর।

—ঠিক হ্যায়।

খুব স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলে সালামৎ আলি।

একটানে সালামৎ আলির চোখের ফেটি খুলে গেল। আগ্রহী অধীর বন্ধ চক্ষুব ফেটি উন্মোচন মাত্র তাব মনে হ'ল যেন জ্বলন্ত তীর অক্ষিপটে এসে বিঁধল। মাথায় বোঁ বোঁ চক্কব অতি দ্রুত এবং ক্রমশ বেগবর্ধিত হুঁশের বনিয়াদ ভেঙে খানখান করে ফেলছে।

মূর্খ বেদ-উপনিষদের ঋষিবৃন্দ, যাঁরা লিখেছিলেন, ''অন্ধকার থেকে আমাকে আলোব দিকে নিয়ে যাও, তমসো মা জ্যোতির্গময।''

প্রায় অচেতন তবু একেবারে মূর্ছিত, চেয়াব থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়াব আগে সালামৎ আলি চেতনার স্বাক্ষর পাঠ করে ফেললে নিমেষেই। জাযগাটা টর্চাব চেম্বাব বা নির্যাতন কক্ষ। স্থানীয় ভাষায় ধোলাইখানা। তার মাথার উপর পাঁচশ পাওযারেব বালব জ্বলছে। যা হেঁকে হেঁকে বলছে—'দুশমনের কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করো না, হয তাদেব ধ্বংস করো অথবা ধ্বংস হও।'

মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্যাব,

আমার এই খাতা শেষ পর্যন্ত আপনি পড়বেন কি না জানি না। কাবণ, আপনি দেখেছেন যে আমি একটি প্রশ্নেবও উত্তব লিখি নি, আগাগোড়া এই চিঠিটাই লিখেছি আপনাকে। আপনি হযতো লাইন কয়েক পড়েই ভ্রুকুটি করবেন, একটা জিবো বসিযে দেবেন, তাবপব ননসেন্স রাইটিঙের জন্য আমাব নামে ইউভার্সিটিতে একটা বিপোর্ট পাঠাবেন। জিবো দিন, বিপোর্ট করুন, সেজন্যে ভাবছি না। হযতো বা ধৈর্য ধবে লেখাটা আপনি পড়েও ফেলতে পাবেন, এই আশাতেই আপনাব কাছে এই নিবেদন পেশ কবছি।

দু একটা প্রশ্নের জবাব হয়তো দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে পাশমার্ক পাওযা দূবে থাক, কুডিব ঘরেও পৌছুত না। তাই ও চেষ্টা আর কবব না। তা ছাড়া আজ সন্ধ্যার পবেই তো আমি পাশ ফেলেব বাইবে চলে যাব। কলকাতাব আশপাশ দিযে যে অসংখ্য ট্রেন আসে যায, তাদেবই কাবো চাকাব তলায শেষ হিসেব মিটিয়ে দেব আমাব। এই খাতা যখন আপনি দেখবেন, তখন ট্রেনে কাটা-পড়া অপবিচিত যুবকেব মৃত্যুব ছোট্ট আব পুবোনো সংবাদটুকু আপনাব স্মৃতি থেকেও মুছে গেছে।

আপনাব অধ্যাপক-বিবেক এইখানে এসে একবাব থমকে দাঁড়াবে। বলবেন, ছিঃ—ছিঃ, পবীক্ষায পাশ না কবতে পেবে আত্মহত্যা! এব চাইতে অধম কাপুরুষতা কি কল্পনাও কবা চলে? দেশেব তরুণদেব যদি এইটুকুও নৈতিক বল না থাকে—তা হলে বাঙালী কোথায দাঁড়াবে---জাতির ভবিষ্যৎ কী।

বিশ্বাস করুন স্যাব, এ সব কথাই আমি জানি। আবো বিশ্বাস করুন, আমিও বাঁচতে চেযেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমাবই হাতেব ছোঁযায সাঁওতাল পরগনায বান-ডাকানো খ্যাপা পাহাড়ী নদী বিশাল ক্যাচ্‌মেন্ট এবিযাব মধ্যে থমকে দাঁড়াবে, আমি সুইচ্ টিপলে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকেব হাজার হাজার আলোয ঝলমল কবে উঠবে বিহার-পশ্চিম বাংলাব সেবা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট—ব্লাস্ট ফার্নেসেব রক্তিম আভায় আমিই গলিত ইস্পাতে আগামী ভাবতবর্ষের ভিত্তি রচনা কবে দেব। স্যাব, আত্মহত্যা আমি করতে চাই নি।

আমাব চাবদিকে ছেলেবা দ্রুত বেগে পবীক্ষাব খাতা লিখে চলছে, তাদের অনেকেই আমাব মতো এখনো স্বপ্ন দেখছে এবং কিছুদিন পরে ক্রশ-লিস্টে অনেকেরই সে স্বপ্ন খান-খান হয়ে যাবে। তবু ওদেব মধ্যেও কেউ কেউ হযতো জীবনে কৃতী হবে—ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের আশার মশাল জ্বালিযে নেবে হাতে। ওবা ভাগ্যবান—এগিয়ে চলুক। আমার মতো যে অসংখ্যেরা এমনি কবে হাবিয়ে যাবে, কিংবা বেঁচেও বেঁচে থাকবে না, তাদেব কথা কোনো পঞ্চবার্ষিকী সাফল্যেব খতিযানে লেখা থাকবে না। আমি আপনাকে চিনি না, কখনো দেখি নি, কোনদিন দেখব না, কিন্তু এটুকু জানি, আপনি অধ্যাপক। ছাত্রদেব কাছাকাছি

আপনাকে থাকতে হয, তাদেব জীবনেব ঢেউ আপনাকে ছোঁয, হয়তো তাদেব আপনি ভালোও বাসেন। তাই শেষ পর্যন্ত আপনি পড়ুন বা না-ই পড়ুন, আমাদেব কথা আপনাকে ছাড়া আব কাকে বলব।

স্যাব, স্বপ্ন যখন দেখেছিলাম তখন এই কথাটাই ভুলে গিযেছিলাম যে আমি মেদিনীপুবেব এক অখ্যাত গ্রামেব চাষীর ছেলে। কিন্তু আমার বাবা চাষী হলেও দিল্লি-আলো-কবা নেতাদেব কাকব চাইতে তাঁব দেশপ্রেম এতটুকুও কম ছিল না। আমার জন্ম হয়েছিল উনিশশো বেযাল্লিশেব সেপ্টেম্ববেব মাঝ বাতে এক জঙ্গলের ভেতর। কাবণ, তখন মিলিটাবীবা আমাদেব গ্রাম জ্বালিযে দিচ্ছিল আব জাতীয পতাকা আঁকড়ে ধবে বুলেটবেঁধ বুক নিযে আমাব বাবা লুটিযে পড়েছিলেন এক ধানক্ষেতেব ভেতব।

বাবাব ইচ্ছে ছিল, ছেলে হলে তাব নাম রাখবেন স্বাধীনকুমার। সেই আগুনজ্বলা প্রলযেব রাতে বাবাব রক্তেব আশীর্বাদ নিয়ে স্বাধীন আকাশেব তলাতেই আমি জন্মেছিলাম। কাবণ, মিলিটাবীর সমস্ত তাণ্ডব সত্ত্বেও দেশেব একটি মানুষের মনও সেদিন পবাধীন ছিল না।

কিন্তু এ-সব ইতিহাস থাক স্যাব। আপনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে থাকেন, তাহলে এবাব আপনাব নিশ্চযই ধৈর্যচ্যুতি হবে—আমার বংশপবিচয শোনবাব কী মাথাব্যথা আছে আপনাব। তা ছাড়া এমনিতেও আমি তো তিন ঘণ্টাব বেশি সময পাব না—এতে খাতা কেড়ে নেবে। তাই সংক্ষেপেই বলতে চেষ্টা কবি।

চাষীব ছেলে, চাষবাস কবে কোন মতে বাঁচতে পাবতাম, কিংবা আকাল এলে অনেককে যেমন না খেযে বা অখাদ্য খেযে মবে, তেমনি কবে মবে যেতে পারতাম। কিন্তু আমাব বরাত খাবাপ— কাকা আমাকে গ্রামেব মাইনাব স্কুলে ভর্তি কবে দিলেন আব— আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি একটা স্কলাবশিপও পেযে গেলাম।

স্যাব, সেই স্কলাবশিপই আমাব কাল হল। আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু কবলাম। মা আমাকে বুকে টেনে চোখেব জলে ভাসিযে দিলেন। বাবাব জন্যে মা-কে কাঁদতে দেখলাম এই প্রথমবাব। তাবপব দু-চোখ ভবা আলো নিযে কাকাব সঙ্গে রওনা হলাম আট মাইল দূবেব বড়গঞ্জেব হাই স্কুলে ভর্তি হতে।

হোস্টেলে থাকবাব পযসা ছিল না। জাযগা পেলাম এক ধান-চালেব আড়তদাব সামন্তদেব বাড়িতে। সামন্তবা দূব সম্পর্কে আমাদেব আত্মীয হত— কিন্তু গবীব চাষীব সঙ্গে সে আত্মীযতা তাবা স্বীকাব কবত না। আসল সম্পর্ক ছিল জোতদাব আব প্রজাব, মহাজন আব খাতকেব। কাকাই হাতে পাযে ধবে ওদেব ওখানে আমাব থাকাব ব্যবস্থা কবে দিলেন। হাই স্কুলে ভর্তি হলাম, ফ্রীও পেলাম।

স্যাব, সামন্তদেব ঘবে লক্ষ্মী বাঁধা। দুটো লবী, তিনটে মোকাম। কিন্তু ব্যবসা যাবা কবে, তাবা কোনদিন পাই পযসাও বাজে খবচ হতে দেয না। পাঁচশো টাকা দান কবে পঁচিশ হাজাব টাকাব আখেব গুছিযে নেয। আমাকেও খেতে থাকতে দিত বটে, কিন্তু তাব দামও আদায কবে নিত।

এই খাতা দেখেই বুঝতে পাবছেন আমাব হাতেব লেখা খাবাপ নয, তাব ওপরে অঙ্কে আমার মাথা ছিল, মাইনাব পবীক্ষায অঙ্কে একশোব ভেতব একশো পেযেছিলাম। ওবাও সুযোগ ছাড়ল না। প্রথম-প্রথম আমাকে দিযে চিঠিপত্র লেখাত, তাবপব খাতা লেখাত, তাবও পবে হিসেব কষাত। সকালে দু ঘণ্টা এ আমাব বাঁধা কাজ দাঁড়িযে গেল।

পড়বাব সময পেতাম বাত আটটাব পবে।

তা-ও কি ভালো করে পড়াব যো ছিল?

আড়তের লাগাও একখানা ছোট ঘরে আমি থাকতাম আর থাকত ওদের এক মুহুরী। মুহুরীর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। শুকনো চামচিকের মতো চেহারা— দুটো অদ্ভুত বড়ো-বড়ো জ্বলজ্বলে চোখ। আমি পড়তে বসলেই সে হুঁকো ধরিয়ে আরম্ভ করত।

আমার তখন বয়স কত আর? বারোর বেশি নয়। তামাক টানতে টানতে, জ্বলজ্বলে চোখদুটোতে আরো জ্বালিয়ে তুলে বিশ্রী ফ্যাঁসফেঁসে গলায় যে-সব গল্প শোনাত, সে সবের মানে তখন আমি ভালো করে বুঝি নি, পরে বুঝেছিলাম। অকথ্য, অশ্লীল সমস্ত ব্যাপার। কত ভাবে, কত মেয়ের সর্বনাশ সে করেছে তারই বিবরণ।

আমার ভালোমন্দ কিছুই বোধগম্য হত না। ভারী বিরক্তি লাগত।

—চুপ করুন, আমায় একটু পড়তে দিন।

—আরে থাম্ বাপু, থাম্! চাষার ছেলে বিদ্যাসাগর হবে--হুঁ! তার চেয়ে হুঁকোটা ধর্—তামাক খাওয়াটা শিখে নে।

মুহুরী যদি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল তো দপ করে লণ্ঠনটা গেল নিবে। সামন্তদের বাড়ি থেকে যেটুকু কেরোসিন তেল বরাদ্দ হত রাত ন'টার পরে আর আলো জ্বলবার কথা নয়। স্কলারশিপের যে সামান্য ক'টা টাকা পেতাম, তাতে নানা টুকটাক খরচ চালিয়ে আর তেল কেনবার পয়সা জুটত না।

তবু এর মধ্যেও ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়ে ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠেছিলাম। তারপরেই দেখা দিল বইয়ের সমস্যা। দেখলাম স্কুলফাইন্যালের বই কেনা প্রায় সত্তর-আশী টাকার ধাক্কা। কাকা খোরাকীর ধান বেচে ক'টা টাকা পাঠালেন। সামন্তেরা দশ টাকা সাহায্য করল। হেডমাস্টার দয়া করে তিনখানা স্কুল কপি দিলেন। তবু অর্ধেক বইও হল না।

আর সামন্তদের দশ টাকার ঋণ শুধতে হল খাতার পর খাতা লিখে।

স্যার, মহিনারে স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আমি তুচ্ছ সাধারণ ছাত্রদের দলে নই, আমার মধ্যে শক্তি আছে, তারই জোরে - আমি স্বাধীনকুমার—স্বাধীন গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াব। যে ভারতবর্ষের জন্যে আমার বাবা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন সেই ভারতবর্ষে আমি আমার সত্যিকারের কাজের জায়গা খুঁজে পাব। কিন্তু না পারলাম ঠিকমতো পড়াশুনো করতে, না হল ভালোভাবে পরীক্ষা দেওয়া। রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল, থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছি।

হেডমাস্টার থেকে আরম্ভ করে সবাই একবাক্যে ছি-ছি করতে লাগলেন। সামন্তদের যে ছেলেটা তিনবার বি-এ ফেল করে এখন নদীর ধারে ধারে বন্দুক কাঁধে কাদা খোঁচা শিকার করে বেড়ায়, সে বললে, পাশ করেছে এই ওর ভাগ্যি! কত ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে স্কুল ফাইন্যালে মার খেয়ে যায়।

দুদিন ঘরে মুখ লুকিয়ে পড়ে রইলাম। উঠলাম না খেলাম না। আর তারই ভেতর মা-র চোখের জল টপটপ করে পড়তে লাগল আমার কপালে।

—ওঠ্ বাবা ওঠ্। আবার মন দিয়ে লেখাপড়া কর। তুই জীবনে ঠিকই বড় হতে পারবি। তোর মতো কত দুঃখী ছেলে একেবারেই পাশ করতে পারে নি--তাদের কথাও ভেবে দেখ্।

স্যার, আবার বুক বাঁধলাম। এবার চলে এলাম কলকাতায়। কী করব, ওই সামন্তদের কাছ থেকেই চিঠি নিয়ে এলাম। সরকারেরা সামন্তদের কুটুম—বড়বাজারে তারা তামাকের ব্যবসা করে। সেইখানেই জায়গা হল।

ওই এক কাজ। দোকানের ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে, দরকার হলে তাগাদায় বেরুতে হবে। তবু মনে হল, কলকাতা-কলকাতা। কত বড় জীবন এখানে—কত সুযোগ। বড়-বড়

কলেজ, নামজাদা সব দিকপাল অধ্যাপক সেই সব কলেজে একবার পা দিলে, নামকরা প্রোফেসারদের জ্ঞানের একটুখানি ছোঁয়া পেলেই আমার মনের ভেতর হাজার আলো ঝলমল করে উঠবে। সারা পৃথিবীর প্রাণের ঢেউ এই কলকাতায় এসে ভেঙে পড়েছে—তার সঙ্গে একবার প্রাণ মেলাতে পারলে আমি রাতারাতি খোলা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াব —প্রথম বর্ষার জল পেয়ে মরা চারাগাছ যেমন নতুন পাতা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

গেলাম কলেজে—সঙ্গে আবার ক'টা খোরাকির ধান বেচা টাকা। জানি, এরজন্য সংসারে সবাইকে হয়তো বেশ কদিন আধপেটা খেতে হবে, হয়তো উপোস দিতে হবে। কিন্তু যদি ভালো করতে পারি পরীক্ষায়, যদি মানুষ হতে পারি, যদি—

বিরাট বাড়ি কলেজের, তাতে রথের মেলার ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে যদি বা অফিসে পৌঁছুতে পারলাম, শুনলাম, থার্ড ডিভিশন? আই. এস-সিতে সীট? হবে না।

একটা-দুটো নয় স্যার, ছটা কলেজ থেকে ফেরৎ দিলে। শেষে ওরই মধ্যে একটু অকুলীন একটা কলেজে জায়গা হল। ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। যদি কিছু কনসেশন পাই।

—কনসেশন? ভাইস-প্রিন্সিপালের চোখ আকাশে উঠল, থার্ড ডিভিশন!

—স্যার—

—আই এস-সিতে এমনিই আমরা কনসেশন দিই না, তার ওপরে থার্ড ডিভিশন

— স্যার, গরিবের ছেলে--

—সব বাঙালীর ছেলেই গরিব। সে ভাবে দেখতে গেলে কলেজশুদ্ধ ছাত্রকেই ফ্রী স্টুডেন্টশিপ দিতে হয়।

—স্যার, একেবারে চাষীর ঘরের ছেলে আমি—

ভাইস-প্রিন্সিপাল দারুণ বিরক্ত হলেন তা হলে কলেজে পড়তে এলে কেন? চাষবাস দেখলেই পারতে। হায়ার এডুকেশন তোমাদের জন্যে নয়। গো-- গো—ডোন্ট ডিস্টার্ব মী—

কনসেশন হল না। পথে ফিরে আসতে আসতে সামন্তদের সেই মুহুরীর কথা মনে পড়তে লাগল: চাষার ছেলে বিদ্যাসাগর হবে- হেঁঃ।

স্যার, তখনি হয়তো আমার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। এক মাঠ রোদের ভেতর, আগুন পোড়া দিচ্ছে, তাঁর কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা পড়ছে-- সেইখানে নিজের জায়গায় গেলেই আমার ভালো হত, শহরের এই অপমানের চাবুক এমন করে আমার গায়ে পড়ত না। কিন্তু স্যার, আশা আমি ছাড়তে পারলাম না। কেমন জেদ চেপে গেল, মনে হল, এর শেষ দেখে ছাড়ব।

সরকারদের তামাকের দোকানের এক ধারে থাকি। সামন্তদের সঙ্গে কত তফাৎ। সেখানে ছোট একটা আটচালার ঘরে থাকতে হত বটে, কিন্তু বাইরে আকাশ ছিল, আলো ছিল স্নানের জন্যে মস্ত একটা দীঘির কালো গহীন জল ছিল—বাতাসে বৃত্তবো-ভাঁটি-চাঁপা-বকুলের গন্ধ ছিল। কিন্তু এখানে বড়বাজারের গলি। বেলা বারোটায় সারি সারি দোকানে ইলেক্ট্রিকের আলো জ্বলছে। তিনহাত রাস্তার দুধার দিয়ে আকাশছোঁয়া স্যাঁতালাগা বাড়ি—বাতাস নেই, গায়ে গায়ে ধাক্কা দিয়ে হাজারো লোকের রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত আসা-যাওয়া, গুমোট গরম, লাইন বাঁধা দোকান থেকে তামাক আর গুড়ের গন্ধ— আর কান-ফাটানো কোলাহল।

এরই মধ্যে এক কোণায় একটা তক্তোপোশে থাকি। সারারাত ইঁদুর চরে, দিনে-দুপুরে আরশোলার উৎপাত। সরকারেরা কলেজের মাইনেটা চালাত—আর দিত পাঁচ টাকা হাত

খবচ। তাব বদলে সকালে-বিকালে কাজে বেরুতে হত—তাগাদায যেতে হত। জোগাড়-যন্তব কবে একটা টিউশন জুটিয়ে নেব তাবও জো ছিল না! বই? আই এস-সিব সব বই কিনতে কত টাকা লাগে সে আমি আজও জানি না। স্যাব, আপনিও বোধহয় জানেন না। আপনাদেব সময় যে বই আপনাবা পাঁচটাকায পেতেন এখন তা বারো টাকার নিচে নয। দু-একখানা পুবোনো এডিশন ফুটপাথ থেকে কিনেছিলাম—তাতে সিলেবাসেব অর্ধেকও পাওয়া যেত না।

পডাশুনো? খেতে যেতে হত সবকাবদেব বৌবাজারেব বাডিতে। সেখান থেকে খেযে ফিবতে দশটাব আগে নয। তাবপব একটা হলদে ঘোলাটে বাল্ব জ্বেলে যখন পড়তে বসতাম, তখন দু-চোখ যেন ছিঁড়ে পডত, খাতাব নোটগুলিকে একবাশ দুর্বোধ্য হিজিবিজি বলে মনে হত। কখন ঘুমিযে পডতাম জানি না, সাবাবাত গাযেব ওপব দিযে ইঁদুব আব আবশোলাবা দৌডে বেডাত।

আব কলেজে? ঘেঁষাঘেঁষি ভিড। এক-একটা বেঞ্চে সাত-আটজনকে ঠাসাঠাসি কবে বসতে হয, যেখানে পাঁচজনেব বসবাব জাযগা হওযা উচিত। নোট নিতে হলে খাতা বাখবাব জাযগা মেলে না ল্যাবোবেটবিব অবস্থা আবো চমৎকাব। পনেবো জনেব মতো ছেলে যেখানে কাজ কবতে পাবে— সেখানে পঞ্চাশ জনকে কাজ কবতে দেওয়া হয।

ভাবী বৈজ্ঞানিক। স্বাধীন ভাবতেব ইতিহাস যাবা গড়বে—এই তাদেব লেখাপডা শেখানোব চেহাবা।

তবু স্যাব, চেষ্টাব ক্রটি কবি নি। দু-চাব জনেব কথা বলছি না—আমাদের মতো তুচ্ছ সাধাবণ ছাত্র কলেজে লেখাপডা শিখতেই এসেছিল। কেন তাবা পাবে না, কেন যে তাবা ফেল করে -

একটা ঘটনা বলি, স্যাব। আজ এ অবস্থাতেও আমাব হাসি পায কথাটা ভাবলে।

কলেজেব ফাউণ্ডেশন ডে। ঘটা কবে সভা, পতাকা উত্তোলন, বক্তৃতা। সব চেযে ভালো বক্তৃতা দিযেছিলেন ভাইস প্রিন্সিপাল। বলতে বলতে তাঁব চোখে জল এসে গিযেছিল।

—আমবা একটা স্টাটিস্‌টিক্স নিযে দেখেছি—কলেজেব টেন পাবসেণ্ট ছেলে মোটামুটি সব বই কিনতে পারে, টুয়েণ্টি পার্সেণ্ট কিছু-কিছু কিনতে পারে, বাকী সেভেণ্টি পার্সেণ্ট একখানা বইও কিনতে পাবে না। এ অবস্থায কী শিক্ষা আমবা দেব—কাদের বা দেব। এব যদি প্রতিকাব না কবা যায, তা হলে শেষ পর্যন্ত দেশ কোথায গিয়ে দাড়াবে!

প্রতিকাব অবশ্য ভাইস-প্রিন্সিপাল ভেবেই বেখেছিলেন। বলে দিযেছিলেন, কলেজ এডুকেশন গবিব ছাত্রদেব জন্যে নয।

স্যাব, সেকেণ্ড আওযাবেব বেল পডল। আব বেশিক্ষণ আমি লিখতে পাবব না। আপনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে থাকেন, তা হলে আপনাব উদাবতাব উপবও আব উৎপাত কবা চলে না। সংক্ষেপেই আমাব কথাগুলো এবার শেষ কবি।

আমাব মা লেখাপড়া জানেন না। আঁকাবাঁকা হরফে তাঁব জবানিতে কাকা চিঠি লিখতেন।

'তুমি বড়ো হও বাবা— দেশেব দশেব একজন হও। তোমাব বাবা যে নাম রেখে গেছেন সে নামেব সম্মান রেখো তুমি। স্বাধীন ভাবতের কর্মী হতে হবে তোমায়— সে কথা তুমি ভুলো না।'

ভুলি নি—একদিনের জন্যেও না। কিন্তু স্বাধীন ভাবত তো আমার দাযিত্ব তুলে নিলে না,—আমার শিক্ষার পথ খুলে দিলে না। সেই তামাকের দোকানে চাকরি করে—ক্লাসেব নামে সেই অর্থহীন হট্টগোলেব ভেতবে, ভাপ্‌সা গরম আব কোলাহলে-ভরা বড়বাজারের গলিব সেই ঘবটিতে, হলদে ইলেকট্রিকেব আলোয় আমাব চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে

যেত—মাথার মধ্যে এক-একটা রক্তের ঢেউ ফেটে পড়ত থেকে থেকে। মনে হত এখান থেকে ছুটে পালাই, ঝাঁপিয়ে পড়ি কোনো পুরোনো দীঘির গহীন কালো জলের ভেতর, বুক ভরে টেনে নিই চাঁপা-ভাঁটিফুল-নাগকেশরের গন্ধ, কোনো বর্ষার কাজলা মেঘকে হাত বাড়িয়ে ডাকি আর বলি : আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে—

কিন্তু কলকাতায় দীঘির সেই কালো ঠাণ্ডা জল কোথাও নেই, সেই নাগকেশর সোদাল ফুলের গন্ধ, আমাদের দেশের বাড়িতে ভরপেট খোরাকির ধান নেই, মানুষের আগুনজ্বালা বুকের ভেতর কোনোখানে এক পশলা বৃষ্টি নেই।

কোথায় যাব, কোথায় পালাব!

আশা ছাড়ব না! আমি বাঁচব, আমি বড় হবো। আমি নইলে নতুন ব্লাস্ট ফার্নেসে আগুন জ্বলবে না, হাইড্রো-ইলেকট্রিকের বিদ্যুৎ ছুটবে না—অটোমিক রিসার্চের কাজ বাকী পড়ে থাকবে, রিফাইনারির পেট্রোলিয়াম পেট্রোল-কেরোসিন—ব্লু অয়েল—প্যারাফিনে নব নব রূপ লাভ করবে না! সেই ময়দানবের মন্ত্র আমায় জোর করে কেড়ে নিতেই হবে। আমি যে স্বাধীন ভারতের বৈজ্ঞানিক।

স্যার, সবই স্বপ্ন! বাঙলাদেশের কলেজে-কলেজে আমার মতো অসংখ্য ছাত্র স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে আছে—স্বপ্নের ঘোরেই চলে বেড়াচ্ছে। তারপর একদিন স্বপ্ন ভাঙে। দেখতে পায়—

স্যার, পড়াশুনো কিছুই হল না। কখন পড়ব, কোথায় বই পাব? সামান্য বই কিংবা নোট জোগাড় করতে পারি, হলদে বাল্বটার ঘোলাটে আলোয় তাদের কোনো অর্থই থাকে না, এক সার পোকার মতো তারা চোখের সামনে কিলবিল করে নড়তে থাকে। তারপর কখন স্নায়ুগুলো ভেঙে পড়ে— সব চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তামাক চিটে গুড় আর ইঁদুর—আরশোলা—ড্যাম্পের গন্ধভরা ঘরে ভোরের আলোয় যখন জেগে উঠি তখন যেন মাথায় বিশ মন ভার চেপে আছে। তারপর আটটা না বাজতেই হিসেবের খাতা।

অ্যানুয়ালের খাতা দেখা হয় না। মাইনে দেওয়া থাকলেই ঝাঁক ধরে প্রমোশন। প্রিটেস্ট দিলাম না। কী পড়ে দেব? তারপর এগিয়ে এল টেস্ট।

স্যার, এইখানে নিজের অপরাধের কথা কবুল করি। টেস্ট যখন কাছিয়ে এল তখন মনের মধ্যে সারাক্ষণ সবটা অনিভন্ত চিতা যেন জ্বলতে লাগল আমার। বই --মাত্র কয়েকটা বই যদি আমার থাকত তা হলে ফার্স্ট ডিভিশন না পাই --অন্তত সেকেণ্ড ডিভিশন আমি পেতামই, আর ম্যাথমেটিক্সে একটা লেটার।

রাগ করবেন না স্যার, আমার মনের অবস্থা বুঝে দেখুন। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। তারপর—

তারপর—আমি কলেজ থেকে ক্লাসমেটদের বই চুরি করতে আরম্ভ করলাম।

আপনি কী ভাবছেন আমার সম্বন্ধে? ভাবুন। আমিই কি একথা বিশ্বাস করতে পারি যে শেষ পর্যন্ত আমি চোর হয়ে গেলাম? আমার বাবা রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছেন, তাঁর ছেলে হয়ে শেষকালে চুরি করলাম আমি?

স্যার, যদি পারেন—বিচার করবার আগে একবার ভেবে দেখবেন কেন ছেলেরা বই চুরি করে, কেন পরীক্ষার পাতায় নকল করে, কেন প্রশ্ন কঠিন মনে হলে অমন হিংস্র অশোভন ভাবে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসে? এগুলো অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়। এ জিনিস কখনো হওয়া উচিৎ নয়—কেউ এসব সমর্থনও করবে না। তবু কেন হয়? কেন ছেলেরা এমন করে ভুলের বিকৃত পথে পা বাড়ায়? একটা পাশফেলের ওপর কতখানি আসে যায়, কখনো কি তা চিন্তা করেছেন?

চুরিকরা বই নিয়ে কোনো মতে হিঁচড়ে টেস্টে তরে গেলাম। মাইনে দেওয়া ছিল, টেস্ট না দিলেও অ্যালাউ করে দিত কিন্তু তারপর? ফী দিতে হবে পরীক্ষার। এবং অনেক টাকা।

দেশের অবস্থা খারাপ—কাকার চিঠিতে জানলাম, এর মধ্যেই পেটভাতের ভাবনা দেখা দিয়েছে—নতুন ধান উঠতে না উঠতেই। মা-র লক্ষ্মীর ঝাঁপির সিঁদুরমাখা শেষ টাকাটা পর্যন্ত গেছে—হয়তো গরু বিক্রী করে সামান্য কিছু পাঠানো যাবে।

লিখে দিলাম, গরু বেচতে হবে না, আমিই যেমন করে পারি জোগাড় করব।

কিন্তু কোথায় যোগাড় করব? স্টুডেন্টস্ এইড ফাণ্ড থেকে পনেরো টাকা সাহায্য দিলে। তারপর?

সরকার-কর্তা আমায় ডেকে পাঠালো। বললে, পরীক্ষার ফীয়ের জন্যে ভাবনা কি—আমিই পঞ্চাশ টাকা দেব তোমায়।

এত দয়া!

স্যার, এতদিনে বুঝেছি, দয়া শুধু দয়াই নয়, ওর পেছনে আর একটা ভয়ঙ্কর দাবি থাকে। পৃথিবীতে দয়ার দাম দিতে হয় সাংঘাতিক ভাবে।

ফী দেওয়া হয়ে গেল। তারপর—তারপর এই দু-মাস ধরে দয়ার ঋণ শোধ করেছি।

বিশ্বাস করবেন স্যার? অঙ্ক—ফিজিক্স—কেমেস্ট্রী—বাংলা—ইংরেজি কিছু পড়তে পারি নি। পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে রাত জেগে জেগে, ছিঁড়েপড়া চোখ আর মাথায় বিশ মন পাথরের ভার নিয়ে আমি সরকার কর্তার খাতা তৈরি করেছি।

কিসের খাতা? ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার খাতা। গোপন খাতা। পঞ্চাশ টাকার দায় প্রত্যেকটি স্নায়ু দিয়ে, প্রতিবিন্দু রক্ত দিয়ে আমাকে মেটাতে হয়েছে। এর পরেও পড়ব? আমি তো অতি মানুষ নই।

তবু পরীক্ষা দিতে এসে ছিলাম। তবু আশা ছাড়ি নি। ভেবেছিলাম একটা মিরাক্ল ঘটে যাবে, এই চুরি করে হাত পাকিয়েছি, নকল করবার জন্যে বইয়ের পাতাও ছিঁড়ে এনেছিলাম, কিন্তু মিরাক্ল তো ঘটলো না। জামার তলা থেকে কিছুতেই এক টুকরো কাগজ আমি বার করতে পারলাম না। ফার্স্ট পেপার, সেকেণ্ড পেপার, থার্ড পেপার—আমার চোখের সামনে সব নেচে বেড়াতে লাগল। শুধু সরকার কোম্পানির জাল হিসেবের খাতা ঘূরপাক খেতে লাগাল মাথার ভেতরে, প্রত্যেক ছত্রে আর ইনভিজিলেটারের মুখ এক একটা জমা খরচের পাতার মতো দেখালো।

এই বাংলার খাতা আমার শেষ খাতা।

স্যার, ওয়ার্নিং পড়ল। আর পাঁচ মিনিট পরেই খাতা কেড়ে নেবে। আমার কথাও শেষ হয়ে এল। আজ সন্ধ্যের পরেই যে কোনো একটা ট্রেনের চাকার তলায় আমার সব মনের ভার নামিয়ে দেব।

আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম স্যার—আমি স্বাধীনকুমার, স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্যে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কেন আমি বাঁচতে পারলাম না, আমার মতো হাজার-হাজার ছাত্রের পক্ষ থেকে সেই প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে গেলাম। জবাবটা আপনি ভেবে দেখবেন।

কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করছি? না স্যার—না। এ আমার পরাজয় নয়—আমার প্রতিবাদ। বেয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে এক প্রলয়ের রাত্রে আমার বাবা দেশের মাটিতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার রক্তও দেশের লক্ষ-লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্যে তেমনি একটা ইতিহাসের সূচনা রেখে যাবে। সে ইতিহাস কবে গড়ে উঠবে আমি জানি না। আপনি জানেন স্যার, আপনি বলতে পারেন? প্রণাম।

পুকুরের মুক্তো

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সুরমা আইচ। দু-তিনদিন হয নিবাপদে ভীমরতি পাব হয়েছেন। বাহাত্তুরে ধবাব কথা তাঁব সম্বন্ধে বলা পুবনো হবে। এখন, নাকি, তাঁর নিদ্রাযোগ, তাঁব স্বেচ্ছায় চলাফেরা, বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ কবা, যা খায তাই নাকি অমৃত। অন্যদিকে তাঁকে ভীমবতি, বুদ্ধিভ্রংশ ধবেছে বললে, বলেইতো তার তেমন আত্মীযস্বজন যাবা ভালো সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাবও যেন বা যুক্তিই থাকে, দুই-ই লোকাযত দর্শন।

সুবমাকে ঠাকুমা বলাই সঙ্গত হতো, কিন্তু এখনও সন্দেহ হয, তাব মধ্যে কিছু পবিমাণে সুরমাতত্ত্ব থেকে গেছে, বলে নামটা উল্লেখ কবাবও যুক্তি আছে।

সুবমা ফবসা, বেশ ফবসাই, ববং লালমিশ্রিত সাদা বং, বিশেষ তাঁব গাল, গণ্ড, আব হাতদুখানা যেন এই বঙে আঁকা। তাঁব বাহুব অথবা পাযেব যতটুকু চোখে পড়ে তাতে ববং হলুদে সাদা মিশানো। কপাল যা বেশ ছোটই এখনও, তা ঘিবে বোনেটেব ফ্রিলেব মতো সাদা চুল, এখনকাব অপ্রচলিত অ্যালবার্ট কাযদায উঁচু হয়ে আছে। সুবমা ষাট, পঁযষট্টি পর্যন্ত খুবই মোটা হয়ে গিযেছিলেন। তাব পবেব এই বারো তেবো বছরে মেদ মাংস থেকে অনেকটা মুক্ত, যদিও এখনও মনে হয, হয়তো বা বং-কবা মাখনে তৈবি শবীবে কোথাও হাড় নেই। বিশেষ কোলেব কাছে একেব উপরে অন্যটিকে শুইযে বাখা ছোট ছোট দুধে আলতা হাত দুটোকে যদি দেখা যায়। কিন্তু মোটা মানুষ শবীবেব বোঝা কমিযে আনলে, পবে চামড়াটা আলগা থেকে যায।

এখন তার পরনে থ্রিকোয়ার্টাব হাতা, সাদায সমুদ্রনীল ডোবাব নাইট গাউন জাতীয পোশাক। সমুদ্রনীলটায বেগুনিব ছায়া আছে। সত্তবে পৌঁছানোব পব থেকেই সুবমা শাড়ি ব্লাউজ প্রায ছেড়ে দিয়েছেন। এই গাউনজাতীয পোশাকগুলোয ঝামেলা কম। দিনেবাতে বাব দুতিন বদলে নিলেই হলো। গাযে কাপড় থাকছে কিনা, আঁচলটা ঠিকমতো আছে কিনা ব্লাউজে শাড়িতে ম্যাচ কবছে কিনা, শাঁখা পবতে ভুলেছেন কিনা, এসব ভাবতে হয না। সে যাই হোক সাদা কেশবে ঘেবা লাল-সাদা মাখনে তৈবি মুখ, যাব একেব বেশি চিবুক, যাব কোলে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হাত দুটি যাতে মাখন যেন গলে যাবে, তাতে বারো বছবেব ডাযেটিং কবার ফলে ত্বকে কিছু আলগা ভাঁজ হওযাতে হাল্কা-হলুদেব দাগও আছে। কিন্তু ডাযেটিং এ কত কমে? সুরমা গত বারো বছরে ভাত ছেড়েছেন, চিনি ছেড়েছেন। সপ্তাহে তিন-চারবাব পঁচিশ ত্রিশ গ্রাম চালের ভাত, দু-চাব টুকবো কাঁটা ছাড়া মাছ-ফ্রাই। আব বাকি সময়ে শাক-সবজি আব দুধ, আব ফল।

সুবমার এই এক সুবিধা, তিনি সাধারণেব চাইতে, বাঙালিনীব হিসাবে, কয়েক ইঞ্চি বেশি। পঞ্চাশ পর্যন্ত, ইঞ্চি আড়াই তিন গোড়ালির জুতো পরতেনই। তাঁকে সাধাবণ বাঙালি পুরুষদেব মতোই লম্বা দেখা যেতো। ডাযেটিং-এ, আর গড়নের এই বাড়তি ইঞ্চি কযেকটির ফলে তাঁকে এখন মোটা না-মনে হযে, দোহারা মনে হয, আর এ ব্যাপারে তাব গাউনের লম্বা স্ট্রাইপগুলোও সাহায্য করে।

এটা সুরমা আইচের লাইব্রেরি ঘর কাম লিভিংরুম। কালো টেবিলটা তাঁর বাঁ হাতের কনুই-এর কাছে। তাঁর মুখটা, জানলা দিয়ে যে হাল্কা হলুদ রোদ, তা থেকে সরিয়ে নেযার জন্যেই এভাবে বসা। চোখে সোনা ফ্রেমের চশমা। টেবিলের উপরে অ্যালুমিনিযামের কিছুটা বড়আকারের তকলি। এভাবে বসায তাঁর পিঠের দিকে দেয়ালে লম্বাটে ধরনের ফ্রেমে একটা রঙিন ফটো। সেকালে, কালার্ড ফিল্মে ছবি তোলার সুবিধা হওয়ার আগে, এরকম সাদা কালো ফটোকে এনলার্জ করার সময়ে, ফটোর গাযে রং দেয়ার চেষ্টা করা হতো। ফটোটা চরকা-নিরত মহাত্মা গান্ধীর। ফটোতে মহাত্মার ডাইনে বাঁযে যত জমি উপরে আর নিচে সে তুলনায জমি কম। অর্থাৎ ফটোতে বা পোরট্রেটে যেমন হয় তার উল্টো।

এই ঘরে এবং কখনও কখনও ড্রযিং রুমেও সুরমা তকলিতে সুতো কেটে থাকেন, বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ১৯২৬-এর সুতো কাটা ও মন কাটা নিয়ে প্রবন্ধ পড়ার পরেও। যখন এই ঘরে তা করেন, তখন তো তার পিঠের দিকে চরকা-নিরত মহাত্মাই। আর সুতো কাটাও বটে। তা কিন্তু তুলো থেকে নয। তিব্বতী উল থেকে। আর সেই পশমী সুতো থেকে ডোলমা কোমরে বাঁধা তাঁতের স্কার্ফ, জামার কাপড় ইত্যাদি বুনে থাকে। তা, সে তো ১৯৬০-এর পরে বাপ মা ভাই খুইয়ে আসা এই তিব্বতী মেয়েটা আশ্রয় নেয়ার পর। সেই কুড়ি একুশের মেয়েটাকে শোকে তাপে অনাহারে শুকিয়ে চৌদ্দ পনেরোর মতো দেখাতো। সেই ষাট থেকে এই প্রায ত্রিশ বছর। তাঁত বোনে, প্রার্থনা করে, কেযার-টেকার কম্প্যানিযান। বাংলা বলে, গোর্খালি জানে। ইংরেজিও, কিছু না বললে চলে না। তুলো থেকে পশমে যাওযাটা ১৯৫৫-তে ঘটেছিল। এখনও তিব্বতী উলই বটে, তা কিন্তু নামে। ১৯৬২ থেকে উলটা আসছে লাদাখ থেকে, কারণ তখন থেকে চুম্বি দিয়ে তিব্বতী উল আর কালিম্পঙ এ স্মাগলড্‌ও হচ্ছে না। সে যাই হোক, এটা এরকম ব্যাপার, এই ১৯৮৮-র গ্রীষ্মেও তকলিতে সুতো কাটা চলেছে, আর তখন মহাত্মার ফটোটা থাকে ব্যাক গ্রাউন্ডে। কেই বা জানে তা হয? বোধ হয়, এই বাড়িটায যারা থাকে, তাদের কথা ছেড়ে দিলে দুজন মাত্র মানুষ এই সাতশ কোটি মানুষের মধ্যে— বাসবী সেন আর মাধবী মিত্র জানে, দুজনই মাত্র।

আর তার কারণও আছে। গত ষোল সতের বছরে কমই, খুবই কম সুরমা আইচ কালিম্পঙ-এ থেকে এমন কি শিলিগুড়িতেও নেমেছেন। ১৯৭১-ই শেষ বছর, যখন মাসখানেকের জন্য কলকাতায ছিলেন। আর বছরখানেক আগে শেষবার তিনি তাঁর এই বাড়ি থেকে বেরিযেছিলেন। তা, কিন্তু যোগাযোগের ফলে, আর তা মাধবী মিত্রের প্রথম সন্তান খুকুর সদ্যোজাত মুখ দেখতে। এই ১৯৭১, অবশ্যই, অন্যদিক দিয়েও মনে রাখার মতো। এসময থেকেই ডিম মাংস বাদ দেযা, খাদ্যে চিনি চাল কমিয়ে আনা, ফল আর শাকসবজি বাড়ানো। আর সেই বছরেই তাঁর এই বাড়ির এক-তৃতীযাংশ জমি প্রথম বিক্রি করা। বাগানটার এবং উপবনের পুব দিকটা ছাঁটা হযেছিল, ফলে আট দশটা কমলা আর আপেলের গাছ গিয়েছে। কারণ ব্যাঙ্ক তার বাড়ি করার সময়ে কমলার বা আপেলের দুঃখে ব্যথিত হয না। সুরমা ব্যথিত হযেছিলেন। দুতিন বছর সে দিকে তাকাতে পারেন নি। এখন আবার সেদিকে ব্যাঙ্কের দোতলা বাড়িটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। অবশ্যই, একেবারে ভোলা যায না বছর পাঁচেক আগে, বাড়িটার দ্বিতীয় এক-তৃতীযাংশ জমি বিক্রি করার সময়ে, নতুন ক্ষয়া-ক্ষয়া বোধের তলায় পুরনো দুঃখটা গুরগুর করে উঠেছিল। জানলা দিয়ে দেখতে গিয়ে পুব দিকের শেষ আপেল গাছটার গায়ে ডোলমার বাঁধা সাদা প্রার্থনা পতাকা দেখতে পেলেন সুরমা। পতাকাটা আপদকে রুখতে থাকে। কিন্তু তা হলেই বা কি হবে? বছর পাঁচেক আগে সে সময়ে দ্বিতীয় তৃতীয়াংশ বিক্রি করাটাও যুক্তিযুক্ত ছিল। কে এসে থাকবে কালিম্পঙে? অত বড় বাগানওয়ালা বাড়িতে তদারক করে? একা ডোলমা কত পারে? তা ছাড়া জমিটা বিক্রি করার টাকা ফিকসড্ ডিপোজিট করায় তার সুদে বাড়ি বাকি অংশের তদারক হচ্ছে, সংসারও, আগে যেমন ছিলো, সেই স্ট্যাণ্ডার্ডে থেকে যাচ্ছে।

কে এসে থাকবে কালিম্পঙ-এ ? তা ছাড়া, তখন ৮১-৮২-তে বিক্রি করে ভালোই হয়েছে। এখন এই গোর্খা ন্যাশনাল ফ্রন্ট-পর্বে কে আর জমি কিনছে বাড়ি করতে ? বাড়িটাড়ি করার মধ্যে ফ্যাশানের ঝোঁকও থাকে। বাঙালির কাছে কালিম্পঙকে ফ্যাশনে এনেছিল রবীন্দ্রনাথের বাড়ি। রবীন্দ্রনাথের পরেও ফ্যাশানটা কিছুদিন ছিল বৈকি ? নতুবা ৪৮-৪৯-এ ইংরেজ প্ল্যাণ্টার্সদের এ ক্লাবটাকে শস্তায় পাওয়া গেলেও শস্তাটাই একমাত্র যুক্তি ছিল না, সুরমা আইচের তা কেনার। বলবে, অনেকটা জমি সঙ্গে ছিল ? তা হলে, বলতে হয়, ১৯৩৯-৪০ থেকেই কেন সুরমা, খোলা বাতাসে দম নেয়ার ইচ্ছা হলেই, দার্জিলিং, কার্শিয়াং-এ, অথবা মধুপুরেও না গিয়ে, কালিম্পঙ-এ আসতো, এখন, অবশ্য, কালিম্পঙ আর ফ্যাশানে নেই। সুরমা আইচের মতোই ?

এখন সুরমা জানেন, মানুষের কাজকর্মের মূলে একটাই পরিষ্কার কারণ থাকে না, বরং কারণগুচ্ছ থাকে, যার এক একটিকে এক এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, আসল কারণ মনে হয়। সব ব্যাপারেই তাই।

কে এসে বাড়ি করবে, কে এসে থাকবে কালিম্পঙে, যখন তা আউট অফ ফ্যাশন ? আর যখন চারপাশের গোলমাল অস্থির করে তুলেছে ? যখন সুরমা ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে বলা যেতো, শিলিগুড়িতে নামার পথটা বিপজ্জনক বলেই তাঁরা গর্তে বন্দী ? হোলড্ আপ্।

সুরমারই প্রথম সন্তান, বড় ছেলে, যার এবার পঞ্চান্ন হলো, যে রাইটার্সে থাকে রিটায়ারমেন্টের হিসাব আর প্রেশারকে খাতির করতে চলতে হয়। এবার যার পৌত্র জন্মেছে, যাকে ছোটমেয়ের বিয়ে দেয়ার উদ্যোগ করতে হচ্ছে, যে বালিগঞ্জের পৈতৃক বাড়িতে থাকে, আর সল্টলেকেও জমি নিয়েছে একটা নতুন ধরনের বাড়ি করতে, সেও দম নিতে বরং পুরী ভুবনেশ্বর, তেমনি পুরনো মধুপুরও পছন্দ করে, না কি দারর্জিলিং-কালিম্পঙে কলকাতার সেই গণ্ডির—সেই পুরনো মুখগুলোকেই বেশি করে দেখা যায় বলেই বড় পুত্রবধূর আপত্তি ?

এক সুরমার কন্যা বাসবী সেনের কিছু মায়া থাকলেও থাকতে পারে সুরমার এই বাড়িটায়। সেও পঞ্চাশেই প্রায়। সরকারি কলেজে জিওগ্রাফির প্রফেসর। এটা তার কর্তব্যও হয়তো, যে সে তার মাকে দেখতে কোন কোন পুজোর ছুটিতে শেষ দিকে কালিম্পঙ-এ আসে। অন্যান্য ছুটিতে অবশ্যই তাকে স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে অন্যান্য জায়গায়, পরিবারের অন্যদের পছন্দমতো, বাতাস নিতে হয়। কিন্তু এবারের আসাটা একটু অন্যরকমই হয়েছে। তার পরিবারের কেউ কেউ এই আন্দোলন আর গোলমালের ভয় দেখিয়েছিল। আর তার যুক্তিও কি নেই ? কিন্তু বাসবী সেন, বোধ হয়, আন্দোলনটার সাময়িক ভাটাকে থিতোনা জল মনে করে কালিম্পঙ-এ এসেছিল। সেরকম সে তার পরিবারকে বুঝিয়ে থাকবে। কিন্তু ভাটাকে থিতানো জল মনে করলে ভুলই হয়। সে এখানে আসার দিন দশেকের মধ্যে আবার জোয়ারই তো এখন। ডাক ছাড়ছে।

অবশ্যই, বলা যায়, বাসবী সেনের সঙ্গে এই বাড়িটার পরিচয়, তার যদি ঊনপঞ্চাশ হয়ে থাকে এখন, অন্তত চুয়াল্লিশ বছরের। সেই ১৯৪৪-৪৫ থেকেই তো, যদিও সত্তরের দশকের শেষ থেকে যোগাযোগটা ক্রমশ কমে আসছে। কেননা মিস্টার সেন বছর পঞ্চাশে পৌঁছে যেতে না যেতে, সংসারটা, বাজার-হাট করা, হিসাব রাখা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, মিস্টার সেনকে ডাক্তার দেখানো, বাৎসরিক ভ্রমণ, সবই বাসবীর হাতে এসে পড়েছে। উপরন্তু সরকারি কলেজে ক্লাস নেয়া, পরীক্ষার খাতা দেখা, এসবও।

আন্দোলনের ভাটাকে থিতোনো জল মনে করাই নয়, সঙ্গে আবার কন্যা ও দৌহিত্রীকে নিয়ে আসাও, সাতাশ আটাশের মাধবী মিত্র আর এক বছরের খুকুকে সঙ্গে আনা। এমন নয় বাসবী 'চল চল' বলেছিলো। মাধবী তার অ্যালায়েড সার্ভিসেসের চাকরি, যা নাকি একোলজি ও অ্যান্টিপলিউশন বিভাগে, মাসখানেকের ছুটি নিয়ে কোথাও যাবো যাবো করছিল। বাসবী কালিম্পঙ-এই যাচ্ছে শুনে বলেছিল, আমিও যাই না কেন ?

কেন? এখনও এসব অঞ্চলে পলিউশন কলকাতা থেকে কম? অথবা আটাত্তরেব কাছে এলে কেউ দর্শনীয় হয়ে ওঠে? নাকি মানুষ-মানুষীর মধ্যে আর্কিওলজিব একটা স্পৃহা থেকেই যায়? অথবা, বলা কি ভালো, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দিশেহারা জাতিগুলো শিকড় খুঁজতে পুবনোকে খুঁড়তে খুঁড়তে এখন তাকে ফ্যাশানেবল করেছে? যদিও হয়তো আর্কিওলজি কখনও কখনও অ্যান্টিইকোলজি। কেননা নালন্দার মতো কিছুকে মাটির তলা থেকে মুক্ত করে, ঘাম চেঁছে, বন উড়িয়ে দিয়ে যা সূর্যের আলোতে প্রকাশ করা হয়, তা এক মরুভূমি ও সিবাজ মাত্র, যা পুবনো ইঁটের ধুলো উড়ায় বাতাসে বাতাসে। আব পেট্রোল ও ডিজেলেব অটোমোবাইল সেই পলিউশনকে বাড়াতে থাকে।

তা বলে, অবশ্য, মাধবী সুবমাকে মহেঞ্জোদবো মনে কবে না। ববং সেই ১৯০৯-১০ থেকে এই '৮৮ নাকি সেডিমেন্ট পড়ে পড়ে বুজে আসা চিন্তা? যা এখনও প্রাণেব আশ্রয়? সূর্যের আলো ধবে, ছোট ছোট ঢেউ ওঠে?

তা তো বটেই। যেমন মাধবী ভাবতে পাবে, ১৯৫০ থেকে এম এল সি অথবা এম এল এ. একবার মন্ত্রীও দু'তিন বছবেব জন্য, তাবপব ১৯৬৩ থেকে ১৯৮৮— এই পঁচিশ বছব এখানে, এই বাড়িতে, এই কিছু পবিমাণে লিকেনযুক্ত গাছে ঢাকা হেজেব আড়ালে গ্রে-বঙে বং-কবা বাড়িতে। কে আব খোঁজ নিতে আসছে সেই একসময়েব এম এল এ, এম এল সি, মন্ত্রীবও? একটা করে পর্যায় পাব হওযা, বলা হবে? পঁচিশ বছব ভুলে যাওযাব পক্ষে যথেষ্ট সময। ষাটেব দশকে যাবা জন্মেছে, কলকাতায অথবা অন্য কোন জেলায, পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক, তারা কি নামই শুনেছে, যে মনে বাখাব কথা উঠবে? কেমন লাগে না ভাবলে? নাকি হাসি পাবে? এই ভ্যানিটি, এই অসাবতা, মানুষেব ইচ্ছাব দেখে। সে সময়ে এম এল সি, পবে এম এল এ, পবে মন্ত্রীও, এসব বলে দেয তাবও আগে, সেই কতদিন আগে থেকে, আন্দোলন ইত্যাদিতে যুক্ত হওযা, শক্ত হযে দাঁড়ানো এসবও থাকে। তাবপবে এই পঁচিশ বছব। বোধ হয জার্নালিস্টবা, যাবা এসব ব্যাপাবে খবব-টবর বাখে, আচমকা জিজ্ঞাসা করলে, মাথা নেড়ে, চোখ বিষণ্ণ কবে, জিভে টাকবায চুক চুক কবে, বলে বসবে, 'আহা, ঠিক মনে হচ্ছে না, বোধহয আশিব গোড়াতেই—'। সবজান্তা হযে জানে না, তাব চেয়ে মৃত্যু হয়েছে এবকম আন্দাজ ছড়ানো ভালো।

জানলাব পর্দা দিযে আলোটা হলুদ ছাযা হযে পড়ছে, কেননা, পর্দাটা চিকনেব কাজ কবা ল্যাভেন্ডার বং মসলিন। সেই ছাযায চিকনের কাজ পত্রলেখাব মতো। সুবমাব শবীবেব বাঁ দিকটায সেই বোদ। মুখটা ডানদিকে ঘোবানো থাকায চশমায আলো পড়ছে না, আব সেই হলদে ছায়া, যা টেবলটাব উপব দিযে একটা লম্বা ত্রিভুজ, তাব এ-পাশে সুরমাব সেই লালচে সাদা বং আব সাদায সমুদ্রনীলের স্ট্রাইপ গাউন, সেই ত্রিভুজটাব সহযোগিতাতেই বেশ স্পষ্ট। চেয়াবটা হুইল চেযাবেব গড়নে। এয়ার-বাসের মতোই কল টিপে পিঠটাকে নামিযে দিয়ে আবামকেদাবা কবা যায়। সন্দেহ হয়, চাকা লাগিয়ে নেয়ার বন্দোবস্তও আছে।

সুরমার ডানদিকেজানলাগুলো থেকে কিছু পিছিয়ে বসে বাসবী সেন। লিল্যাক উল দিযে কিছু বুনছে। সে, তার এই প্রিয় পঞ্চাশ বছরে, নবম আলো পছন্দ কবে। বিবোধী পক্ষ বলতে পাবে, পঞ্চাশের যে আঁকিবুকি মুখে তা ইতিমধ্যে উজ্জ্বল আলোতে ধবা পড়ে যায়, কারণ সে হালকা মেক আপ ব্যবহাব করে, যেহেতু সে অধ্যাপিকা। সে নিজে, কিন্তু, তাব অতি-পড়ুযা চোখ দুটোকে উজ্জ্বলতা থেকে আড়ালে রাখতে চায়, পোলারযেড হলেও চশমাব কাচে গ্রেয়াব-লাগা সে ভালো মনে করে না। বেশ ফর্সাই সে, আর তার সাদায়-বাদামী বুটি শাড়ি এখন ঢিলে-ঢালা করে পরা। বেশি জড়িয়ে পবলেই ববং ক্লাইম্যাকটারিক প্রসূত বিবর্ণস্থূলতা চোখে পড়াব সম্ভাবনা। সে তো কিছু ভাবছেই, ঠোঁট দুটো নড়ছে অতি মৃদুভাবে। সে ভাবনা, একবার এক বছর হতে চলে দৌহিত্রী যে এখন দোলনায় ঘুমাচ্ছে তার্কে নিযে, অন্যবার এরকম চারপাশের

এই আন্দোলন যে রকম বেড়ে উঠলো. নাকি বামপন্থীদের মতো একদিনেব বনধ্ নয়, একনাগাড়ে একশ দিনের বনধ্, একশ দিনে তিন মার বেশি হয়ে যায়, কি করে বা মাধবী আব তাব খুকুকে নিয়ে নামা যাবে? ব্রেকফাস্টের পবে, এবকম সময়ে, এমন থিব হয়ে বসলে. মাঝে মাঝে তার ছোট ছোট হাই ওঠে, আর তাকে হাতের পিঠ ঠোঁটের সামনে রাখতে হয়।

আবও ডাইনে আরও পিছিয়ে মাধবী. সেখানে অন্য দেয়ালের জানলা দিয়ে আলো। তিনজনের চেযারের অবস্থানকে যোগ কবলে বরং এক বিষমকোণী ত্রিভুজ হতে পাবে। সে আগেব দিনের কাগজটাকে পড়ছে। আগেব দিনের বলতে কিন্তু ঠিক আগের দিনেব ভোব ভোব সময়ে কলকাতার ফুটপাতে বেরোনো কাগজ নয়। আগের দিনে তাদেব হাতে পৌঁছানো কাগজ। কলকাতায বেরোনোব পবে তিনি চাবদিন হয়ে যাচ্ছে কাগজটা তাদেব হাতে পৌঁছাতে। মন্দের ভালো, ডাক আনাব যে বাস শিলিগুড়ি যাওয়া আসা কবে, তাব ড্রাইভাব শিলিগুড়ি থেকে কাগজটাকে এনে দেয়। আব ডোলমা সেই বাসের ড্রাইভাবেব বাড়ি থেকে কাগজটাকে নিয়ে আসে। একটা সুবিধা তো বটেই. খববগুলো পুরনো হয়ে আসে বলে স্নায়ুতে ধাক্কাটা কম দেয।

অবশ্য কাগজে এখানকার কথা যা লিখছে তার অনেকটাই শিলিগুড়িতে পাওয়া গুজব, আব নতুবা পুলিশ যেটুকু বলেছে। আব তা ছাড়া, কাগজে কখনই তাব অ্যান্টি-পলিউশন ডিপার্টমেন্টেব সম্বন্ধে কোন সংবাদ থাকবে না, যাতে তার আশু উৎকণ্ঠাকে বাড়ায কিংবা কমায। সে ইতিমধ্যে পনেরো দিনেব ছুটি বাড়ানোব দবখাস্ত পাঠিয়েছে। কর্তাবা প্রশ্ন কবতেই পারে, কালিম্পঙে যাওয়াটা এসময়ে যথেষ্ট বিবেচনার কাজ হয়েছে কি? সে কাগজটাকে মুড়লো, আব ভাবলো. দেখা যাক, আজ আবাব কোন তাবিখেব কাগজ আসে. আসে কিনা।

সে ববং ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকালো। কেমন লাগে না ভাবতে, সেই কতদিন আগে এই কাঠেব দোলনাটা নাকি তাব জন্য যোগাড় হযেছিল? অন্তত ছাব্বিশ সাতাশ বছব আগে। হ্যা, তাব মেয়ে তাব থেকে ঠিক সাতাশ বছবেব ছোট। সে দিক দিয়ে সে নিজে ববং তাব মাযেব কাছাকাছি। বাইশ বছবেব ছোট হতে পারে সে। তখন তো, তাব মা নিজেই বলেছে, এম এ পবীক্ষার ফল বেবোচ্ছে মাত্র। সে জিজ্ঞাসা কবেছিল. সে অবস্থাব পবীক্ষা দিলে কি করে? আব এসবই সেইবকম আলোচনাব সময়ে, যখন হঠাৎ মা মেয়েতে খুব খোলাখুলি পবামর্শ দেযাব মতো এক অবকাশ হয। বাসবী বলেছিল . তুই তো কনফার্মড হয়েছিলি চাকবিতে, এখন আব তা হলে—ত্রিশ বছবেব এ পাবেই কিন্তু প্রথমটা ভালো। মানুষ হয়ে যায় ঠিকই। সে দিক দিয়ে বরং তার মা আর তাব মাব বযসের তফাৎ সব চাইতে বেশি। প্রায় ত্রিশ বছব।

আব তারপরে, দেখো, তাবও দশ বছব বাদে সেই এম এল সি হওযা-টওযা। আব তা প্রমাণ করে, ছেলেমেয়ে হওয়া-টওয়া, আন্দোলন, পার্টিব কাজ এসবেব ফাঁক-ফোকরে। মাধবী ভাবলো, দিদিমাকে একবাব দেখে নিয়ে. দেখলে কিন্তু তুলনা দিতে ইচ্ছা কবে। কি বলবে? বাইবে উত্তুঙ্গ গরম আন্দোলনেব, কাগজে উত্তুঙ্গ গরম সরকারেব বিবৃতির। কে দেশপ্রেমিক বেশি, তা ভোটারদের কাছে প্রমাণ কবতে একদল আর এক দলকে কিছু বলতে বাকি রাখছে না। অথচ, দেখো, রোদের ওই ত্রিভুজটাব পাশে, কিছুই কিছু নয। অথবা, বোধহয়, ওঁব সেই ডায়েরির মতো। মলাটটা সোনালি রং খদ্দবের কাপড়ের, কিন্তু ধুলো পড়ে পড়ে তাব জ্বলে-যাওয়া বং ময়লাটে, ধূসর। কি রকম কাগজ ছিলো কে জানে। এখন বযসে হলদেটে। ৩৯-৪০ দু'বছরের ডায়েরি। কি নেই তাতে? রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মত, মহাত্মা গান্ধীব ত্রিশের দশকের আন্দোলন-সম্বন্ধে মত, বাজারেব হিসাব, নিজেব পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা, কোন একটা পারিবারিক ঘটনা যা যেন স্নায়ুকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছিল, একটা ট্র্যাজেডির মতো যার পদসঞ্চার, যা অবশ্য এখন মনে পড়তেই চায় না,—এককথায় ভুলে-যাওয়া ডায়েরির বিবর্ণ মলাটেব মধ্যে একটা উষ্ণ সতেজ, জীবন চিরস্থায়ী অপরিবর্তনশীল হয়ে থেকে গিয়েছে। অথচ যার

জীবন তো বদলেছেই। প্রমাণও দেখা যায়, ভাবলো, মাধবী সেই আন্দোলন, তার কেন্দ্রের কাছে যাওয়া। এম এল এ মন্ত্রী ইত্যাদি হওয়া, একটা স্থিরচিত্রের মতো যার এপারে গত পঁচিশ বছর ধরে জীবনটা বদলেছে, হয়তো তার রেকর্ড রাখা হয় নি। কিংবা, বলবে কি জীবনটাই একটা স্রোত, যার মূল প্রবাহ বয়েই চলেছে, বয়েই চলেছে, তার এ-বাঁক ও-বাঁকের থেকে পছন্দ-করা কোন বাঁকের চিত্র হতে পারে সেই ডায়েরির সুরমা?— যেন অলিখিত উপন্যাসের এক চরিত্র যার কাছে নিজের মত, নিজের পছন্দ অপছন্দের খুঁটিনাটি, ব্লাউজের কাপড়ের রং আর টেকশ্চার, কোন এক মাসিমার অতি হাল্কা অসূয়া ধরা পড়ার ঘটনাটাও একান্তভাবে নিজের জন্য লিপিতে বন্ধ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ? যেন, সেই সবই আসল জীবন, যার বাইরে যা সব ঘটছে, সমাজে, রাজনীতিতে, সবই সেই জীবনের পটভূমি, ব্যাকড্রপ। অথচ বাইরের সেই সব ঘটনা যা সমাজের আর রাজনীতিতে ঘটতে থাকে, তারই সাড়ম্বর ইতিহাস লিখে রাখে অন্য অনেকে। অন্য তুলনাও নেয়া যেতে পারে। জীবনটা যদি সমকেন্দ্রিক কতগুলো বড় থেকে ছোট বৃত্ত হয়ে থাকে, তবে সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, রাজনীতি। বড় বড় বৃত্ত থেকে ক্রমশ ব্যক্তিগত ছোট বৃত্ত, যার কেন্দ্রের একেবারে কাছে ঘনিষ্ঠ বৃত্তটি তো নিজের শরীর, অন্তত মেয়েদের পক্ষে,আর শরীরজাত ছেলেমেয়ে। আর একটি ছায়াও যেন সেখানে ভাসতে থাকে। সেটা অবশ্যই সেই ছেলে কিংবা মেয়ের জনক। সেই ৩৯-৪০'এর ডায়েরি যদি কেন্দ্রের কাছাকাছি কয়েকটি বৃত্ত হয়ে থাকে, যাতে যেমন ধরো রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির সম্বন্ধে একেবারে ব্যক্তিগত মত, তবে একটা অ্যাফেয়ারই যেন তার কেন্দ্রের কাছে ভাসতে থাকে যেন ডায়েরি-লেখিকার শরীরে ছায়া ফেলে ফেলে।

কিন্তু ডোলমা কাগজ নিয়ে এলো। আর তা দেখে বাসবী বেলা এগারোটার চা করতে উঠল। মাধবী কাগজটাকে হাতে নিয়ে তার দিদিমা সুরমার দিকে হেঁটে গেলো। সুরমা কাগজের বড় বড় অক্ষরে হেডলাইন তার সাব হেড পড়ে নেবেন নিজে নিজে, পরে চা এলে মাধবী পড়ে শোনাবে ছোট অক্ষরে যা কিছু ছাপা। কখনও কখনও সুরমা তাঁর উলের তকলি হাতে নেবেন সংবাদ শুনতে শুনতে। এমনকি কোন কোন দিন ডোলমাও এসে কাঠের মেঝেতে বসে যায়। বাসবী, সে তো তখন কাছেই, তার সেই লিল্যাক উল বুনতে বুনতে কান পাতে। তারও কি চোখকে আরাম দিতে লোভ হয় ইতিমধ্যে। হতে পারে। মাধবী দেখেছে বাসবী প্রয়োজন না হলেও, পিঠের নিচে কুশন গুঁজে দিলে থ্যাঙ্কস বলে। এ ব্যবস্থা অবশ্যই বাসবী আর মাধবী এখানে আছে বলে। তা না থাকলে ডোলমাই পড়ে শোনায় সংবাদ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে, কাজেই খুঁটিয়ে পড়া হয় কি?

দাদির দিকে যেতে যেতে কাগজে চোখ পড়লো মাধবীর। প্রথম পাতার খবরই তো। একটা হাল্কা লাইনের বক্স করে। বক্সের চারিদিকে কালো গরম অক্ষরে প্রধানমন্ত্রীর সিরিয়া ভ্রমণ, আই পি কে এফের প্রথম দলের লঙ্কা থেকে সরে আসা, এস পি পি সি'র হুঙ্কার, জি এন এল এফের নেতাদের বক্তব্য। বক্সের মধ্যে ছোট হেডিং ১৪৪ ধারা জারি বিদ্যাসাগর কলোনির পুকুরে। বক্সটাই যেন পুকুর যাতে মুক্তো-মতি। মাধবী হেসে ফেললো। তার চারদিকের উত্তাপের মধ্যে বক্স পুকুরটা ঠাণ্ডা বটে।

ক'দিন থেকেই সংবাদটা। দু'দিন আগে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার এক হোমরা চোমরা বলেছিল, সেই পুকুরের মুক্তো জেনুইন, খাঁটি মুক্তা। তার আগের দিনের খবরে পুকুরের ঝিনুকে মুক্তোর গল্প আর ছবি কাগজে দেখে বেশ হাসাহাসি হয়েছিল। জিওলজিক্যাল সার্ভের সেই অফিসারের বিবৃতি পড়েও প্রথমে হাসাহাসির পর, বেশ একটা বৈজ্ঞানিক ধরনের আলোচনাও হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক কথাবার্তাই, কিন্তু হালকা মেজাজে। আর্টিফিশিয়াল রুবির মতো, আমেরিকান ডায়মন্ডের মতো, মুক্তো বলে ভুল হয় এমন পুঁতি-মুক্তো আছে, যার হাত, গলা, কানের সেট তিন চারশ'তেই পাওয়া যায়। জাপানি কালচার্ড মুক্তা আছে। ঝিনুকের

জলে কেমিকাল ছেড়ে ঝিনুকের ভিতরে একরকম মুক্তা তৈরি হয়ে থাকে। এটাই কালচার্ড। একে কি জেনুইন বলবে না? কেননা, এটা তো ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে না। তা যদি না বলো, শরীরের বাইরে ফার্টিলাইজ্‌ড করা ওভাম প্লেস করে যা, তাকে কি জেনুইন মানুষ বলবে না? হাসতে হাসতে হঠাৎ অবাক হয়ে গভীর কিছু অনুভব করতে হয় যেন। মানুষ মুক্তার কেমিক্যাল গঠন জানার আগেও সমুদ্রে মুক্তা হতো। তাকেই কি একমাত্র জেনুইন মুক্তা বলা হবে! অন্যদিকে দেখো, তারা, দিদিমা, মা, মেয়ে, তিনজনেরই সন্তান থাকায়, ইশাবা মাত্রেই অনুভব করেছিল ঝিনুক ও মেয়ে মানুষে একটা মিল আছে।

ডোলমার সাহায্যে বেলা এগারোটার চা নিয়ে ফিরলো বাসবী অধ্যাপিকা।

চা পর্যন্ত এটা ওটা গল্প চলবে। ডোলমা পাত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে গেলে, লাঞ্চ পর্যন্ত তকলি, লিল্যাক উল বোনা, আব কাগজ পড়ে শোনানো। বাসবীও শোনে মাধবীর কাগজ পড়া। তার হাতের কাঁটা দুটো চলতেই থাকে। এটা তেমন ব্যাপাবই। পিঠ এখনও দুর্বল হযনি, কিন্তু মাধবী লক্ষ্য কবেছে, পিঠেব কাছে কুশন গুঁজে দিলে খুশিই হয, থ্যাঙ্কস্ বলে, এই ক্লাইম্যাকটেবিকেব মুখে!

চা ভিজতে ভিজতেই কাগজেব কথা উঠে পড়লো কিন্তু।

মাধবী হাসতে হাসতে বললো, — দেখো, কাণ্ড, একশ চুয়াল্লিশ পর্যন্ত জারি কবতে হচ্ছে।

কোথায? এখানে, পাহাড়ে, তা তো আছেই। —সুবমা মুখ তুললেন।

—বিদ্দেসাগবে।

কি সাগর? ও। কেন? সেখানে কি পুকুব বুজিয়ে বাড়ি তৈবি কবছে কোন মেয়ব, না ভেড়ি দখল হচ্ছে, —আচ্ছা, মানু, তোর কি মনে হয এটা ববিঠাকুবকে আবিষ্কাব কবাব মতো? ফ্ল্যাগ ট্যাগ নিযে জুলুস মোর্চা করে বিদ্যাসাগবকেও আবিষ্কাব কবা নয তো? বাসবী হেসে বললো,—এটা তোমাব রাজনৈতিক বিদ্বেষ, মা, বামফ্রন্ট এই মুক্তা আবিষ্কাব কবাচ্ছে না।

মাধবী বললো, —দাদি, তোমার কি মনে হয, পরে বলা হবে, বামফ্রন্টেব আমলেই পশ্চিমবঙ্গেব পুকুরে মুক্তো হলো?

হাসি চেপে সুবমা বললেন,—সিম্বলিজমের ব্যাপার নয তো? কেউ কেউ হযতো বোঝাতে চাইছে সেই কালের পেটে একটা মুক্তা জন্মেছিল, সে বিদ্যাসাগব।

বিউটি, দাদি। কি অ্যালার্ট তোমাব মাথা এখনও। আবাব বিযে দেয়া যায়।

যায় বুঝি? তোব মেয়ের বাপের সঙ্গে?

চা নাড়তে নাড়তেই টেবিলের কাগজটায় চোখ পড়লো বাসবীর। সে বললো, — শুধু একশ, চুয়াল্লিশ নয। ওই দেখ আজও জি এস আই-এর আর এক মত। এই বোধ হয় হাইআব অফিসাব বলছে, পুকুবেব মুক্তোকেও জেনুইন বলতে হবে। এগুলোব দামি হওযাও যুক্তিযুক্ত হবে।

সুরমা বললেন,— আগে একদিন বলেছিল, ওই জি এস আই-ই, বড়জোব বারো চোদ্দ টাকা দাম হতে পারে।

বাসবী হাসিমুখে বললো, —হয়তো ভিড় দূরে রাখতে বলেছিল। তাতে ঠেকেনি বলে একশ' চুয়াল্লিশ।

সে চা ছেঁকে প্রথম কাপটা সুরমাকে এগিয়ে দিলো, মাধবীর কাপে দুটো কিউব, নিজের কাপে একটা কিউব দিয়ে, নাড়তে নাড়তে ডোলমাকে, টি-পট দেখিয়ে বললো, —আমাদের আর লাগবে না, তুমি তোমারটা করে নাও।

দু একবার কাপে চুমুক দিয়ে সুরমা বাসবীকে বললেন,—আচ্ছা, বাবী, মুক্তো হারটা কি এবার তোর গলায় কখনও দেখেছি? আজকাল কি এখনও পরছিস না? এখন তো তোর পঞ্চাশ হয়— সোনার বদলে ওই একটা পরলেই সব গহনার কাজ হয়ে যায়।

বাসবী হাসলো। বয়স তার পঞ্চাশে পৌঁছাচ্ছে বটে, তাব গাল এখনও লাল হয়, কোন কোন হাসিতে। একটা ছাড়া অন্য দাঁতগুলো সমান, সুন্দর, সাদা। সে বললো, —অত চকচকে অমন একটা কি প'রে থাকা যায়? ওটা পরে ক্লাসে যাওয়া যায় না, কারণ ওর জন্যই অন্য রকমের পোশাক পরতে হয় যা ক্লাশে চোখে লাগবে। পরে পথে ঘাটে বেরোনো যায় না, পাছে জেনুইন ভেবে হামলা করে। নেমন্তন্ন পার্টিতে পরলে লোকে ভাবতে পারে এক সাধারণ প্রফেসর, নিশ্চয়ই আসল মুক্তো নয। খেলো হতে হয না?

তোব নিজের কি সন্দেহ আছে? যাচাই করে দেখলে পারিস। বাবী, জামাই ওটাকে খেলো ভাবেনি তো?

বাসবী বললো,— তোমার জামাই বলেন, তাব শ্বশুর তত বড় অ্যাডভোকেট ছিলেন না যে একটি সুন্দরী মেয়ে জন্মেছিল বলেই মেয়েব মাকে তেমন নিখুঁত জেনুইন মুক্তোহার উপহার দেবেন। হিসেবি লোক ছিলেন। একটা হাবে অত টাকা না আটকে স্ত্রীকে বরং কোম্পানিব কাগজ কিনে দিতেন। স্যাকবার কাছে নিযে গেলে, সে যদি বলে নকল—

এই সময়েই মাধবী দুইয়ে দুইযে পাঁচ কবে ফেললো, সে এক মুহূর্ত আপন মনে হাসলো, সঙ্গে সঙ্গে বললো, —রসো। চা শেষ কবে ফেলো না। একটা মজাব জিনিস পেযেছি। মনেই ছিলো না সকালে বলতে।

হেসে সুবমা বললেন, — তোব মনে থাকবে কি? সব সমযে ভাবছিস, কখন রাস্তা খুলবে, আব নাতজামাইযের কাছে যাবি।

মাধবী বললো,—আহা! আব চাকবিটা বুঝি কিছু নয। বসো আনছি।

মাধবী সেই লিভিংরুম থেকে তাব শোবাব ঘবে গেলো। এই শোবাব ঘবটাকে, যা এই লিভিং কমেরই একটা চওডা ঝুল বাবান্দা ছিলো, এবাব মাধবী পছন্দ কবেছে পুবের আলোব লোভে। শোবাব ঘবেব একটা আলমারি সে গোছাচ্ছিল, কালই, ইঁদুব তাড়াতে। তাতে সে একটা কাসকেট পেযেছে। দেখলেই মনে হয কোন নেকলেসেব হবে। নীল ভেলভেট ধুলোয বিবর্ণ, কিন্তু ফ্রেমেব ক্রোমিযাম বেশ উজ্জ্বল। অকেজো বলে ফেলে দিতে গিযে মাধবীর মনে পড়েছিল। এ বাড়িতে দু'-একবাব কোন কাসকেট নিয়ে কথা হতে শুনেছি। অবশ্য কাসকেট একটা বাড়িতে কতই থাকতে পাবে! কিন্তু এই কাসকেটটাব ছিমছাম শক্তপোক্ত গডন তার সেই স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হযেছিল। কিছুক্ষণ পবে তার মনে পড়েছিল, দিদিমা সুরমাব প্রায পঞ্চাশ বছরেব পুবনো এক ডায়েবিতে একটা কাসকেটেব কথা আছে। ডায়েবিতে বাংলায সি কে টি বলেই উল্লেখ, একবাব বোধহয কাসকেট শব্দটা ইংবেজিতে ব্যবহাব হয়েছে। তাব তখন এবকম মনে হযেছিল, এটাই কি সেই ডাযেরির কাসকেট? এখন তো মুক্তোহাবের কথা হচ্ছে। তা, বোধহয়, হয না, এটা কখনও কোন মুক্তোহাবেব কাসকেট ছিল?

মাধবী দু-এক মিনিটেই কাসকেটটাকে নিয়ে ফিবে, টেবিলে বেখে সেটাকে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললো, —দাদি, দেখো, এটাব কথাই কি তোমাব ডায়েরিতে। তা আব হতে হয় না।

কোনটার কথা? ডায়েবিতে? কি আছে তাতে?

বাহ, তোমার স্মৃতিকে জাগিয়ে দেব?

বাসবী চায়ে চুমুক দিয়ে মাধবীর দিকে তাকিযে যেন অবাক হলো। কিছু না বলে, যেন কি বলা যায় ভাবলো।

· মাধবী বললো, — সোজা কথায়, শিলিগুড়ি স্টেশনে কালিম্পঙেব সেকালে সেই ছোট গাড়িতে বসেছিলে তুমি। তখন সেই লম্বা, রোগা, রক্তহীন ফর্সা বাঙালি সি কে টি সাহেব তাকিঝুঁকি করতে করতে তোমার কামরাতেই উঠে পড়েছিল।

বাসবী হাত বাড়িয়ে কাসকেটটা নিলো। বললো, —আরে! এটা কোথায় পেলি, এতদিন পরে?

মাধবী বললো,—বারান্দাব ঘরের আলমারিতে।

কাণ্ড! বাসবী সলজ্জভাবে হাসলো,— তা হলে এখানে ছেড়ে গিয়েই আব মনে কবতে পারিনি। হারিয়ে গিয়েছে ভেবেছিলাম।

সুবমা বললেন, —ও সেই সি কে টি?

মাধবী হেসে বললো,— তোমাকে মনে কবিয়ে দিচ্ছি সি কে টি'তে কাসকেটই হয না শুধু, কাবো নামও হতে পারে ববং।

সুবমা বললেন, — সে সম্ভবত এক স্বদেশী ডাকাত ছিল।

কাসকেটটা কি লুটের মাল ছিল?

লুটের হতে পারে, নিজেব মায়েব বাক্স থেকে সরানোও হতে পাবে। আসলে স্টেশনে অত পুলিশ দেখে ভড়কে গিযে ভেবেছিল, তাব খোঁজেই পুলিশ। অথচ বলেছিল, কাসকেটটাব জন্য গুণ্ডাবা তাড়া কবেছে।

মাধবী বললো,- — সে আমি পড়েছি। কাসকেটটাকে তোমাব হ্যান্ড ব্যাগে কিছুক্ষণ বাখতে বলেছিল আর তুমি কিছু বলার আগেই সে নিজের ঝোলা থেকে কাসকেটটাকে তোমাব সিটেব নিচে ঢুকিযে দিযে নেমে গিযেছিল। আব তুমি—সুবমা বললেন, কত আব বুদ্ধি হবে? সাতাশ আটাশ বছরের এক যুবক তো। ভেবেছিল ওটা সঙ্গে থাকলে বামাল সমেত ধবা পডলে কোন যুক্তিতে খালাস পাবে না। আব আমি ধরা পডলে পুলিশকে বলতে পারবো নেকলেসটা আমাবই।

মাধবী বললো, —তুমিও, দাদি, তখন আটাশ ঊনত্রিশের যুবতী। তাকে বযসেব দরুন অত বোকা খোকা বোঝাতে হবে না। ধবা পড়োনি ভাগ্য। সে কি আব কখনও খোঁজ করেনি? না কি তোমাকেই আব খুঁজে পাযনি। কাসকেটটাকে তুমি হ্যাণ্ড ব্যাগে বেখে নিপাত্তা?

বা, তা হবে কেন? অত দামী। যাব জন্য স্বদেশীদের জেলে যাওযাব বিক্স নেযা। চোখ রেখে রেখে ঠিকই এসেছিল।

তুমি বুঝি বলেছিলে গাড়িতেই পড়ে আছে সেটা।

সুরমা বললেন, — অত সবে কি হবে তোব? এটা সে কাসকেট নয। সে কাসকেটটা গাড়িতেই পড়েছিল। আচ্ছা, বাবী, জামাই কি এখনও ভাবেন, ওটা কালচার্ড, জাপানি?

কি কাণ্ড দাদি? মোপাসাঁর মুক্তোর চাইতেও ঘোরালো দেখছি। সে সব মুক্তোওযালাবা থাকে বড়লোক। আর সেই লম্বা ফর্সা স্বদেশী ডাকাত—নিজেব আদর্শকেও ভুলে গেল?

আচ্ছা, দাদি, তুমি নিজে কখনও যাচাই করেছ জেনুইন কিনা?

কখন আব কবলাম!

মাধবী বললো,— দেখ, তোমার নাতজামাইও বলেছে, তোমাব অধ্যাপক মা কি কবে কিনবে? তুমিই বা কি করে কিনবে, যদি জেনুইন মুক্তো হয়ে থাকে। তুমি তো মাত্র দু-এক বছব প্রতিমন্ত্রী ছিলে। তাছাড়া, ওটা মুক্ত সত্যিকারের হলে মা বিযেব বাতেই দিতো। খুকু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতো না। বিযেব রাতেই তো কনে সাজায।

সুরমা হেসে বললেন,— তুই তা হলে ওটা মাধুকে দিয়েছিস, বাবী? ভালো করেছিস। তাহলে তোর কখনও কখনও মনে হয়েছিল মুক্তোগুলো খাঁটি। নতুন কাসকেট বানিবে দিয়েছিস।

মাধবী বললো, — তোমার মেযের বুদ্ধি কি আর কম? নতুন কাসকেটটা টকটকে লাল ভেলভেটের।

আচ্ছা, দাদি, শুধু খুব লম্বা আর খুব ফর্সা বলেই তো নয়। হযতো দশ হাজারে এক লম্বা আর ফর্সা। তা কিন্তু স্বদেশী ডাকাতের পক্ষে ভালো নয়। পুলিশ সহজে চেনে। কিন্তু তেমন ফর্সা আর লম্বা বলেই তো নয়। স্বদেশী ডাকাত বলেও। আব বোধহয় খদ্দরপরা তোমাকে

একবাব দেখেই নিজের দামী কাসকেটটাকে তোমার ব্যাগে ভবে দিতে বিশ্বাস কবেছিল বলে। তখন তো বড় মামা বছর পাঁচেকেব। কিন্তু দাদি, দেশেব কাজ করতে গিয়ে অন্যদিকে মন দেয়া কি এক বকমেব পাপ নয়? বাসবীব মুখটা লাল হলো। নতুন কবে অবাক হলো যেন সে। বললো, আচ্ছা মা, জেনুইন নাই হলো, পঞ্চাশ বছব হলো তো আমাদেবই কাছেই। আচ্ছা, মা, দাদা আব ভাই বলতো, তুমি আমাকে বেশি ভালোবাসো। আচ্ছা, মা. বাবা যাকে তোমাব স্যাটেলাইট বলতেন—

স্যাটেলাইট বলা কি ভালো! অনেকেই মত বদলেছিল. অনেকেই সবে এসে অহিংস হয়েছিল। পবে সভুবে এসে কো-অপাবেটিভের ম্যানেজিং ডাইবেকটর হয়েছিল। বছব দু-এক আগে কে যেন বলছিল বাব পাঁচ সাত আগে স্ট্রোকে—একটু উদাস হলো সুবমা।

হ্যাঁ, দাদি, তোমার কি মনে হয়, এখন আব যাচাই করাব দবকাব নেই? মানে তুমি, মা, আমি, পবে খুকু--। আচ্ছা দাদি, তোমার কি পবামর্শ? হাবটা কি লকাবে বাখবো নাকি বিক্রি কবে খুকুব নামে ফিক্স ডিপোজিট করবো। অ্যাসেট ডিক্লাবেশনে ফ্যাসাদ আছে—লাখ টাকাব হাব তো। নাকি তত দামী লুকিযেই বাখতে হয। কি কাণ্ড অথচ দেখো, মাকে জেনুইন বলবে আব কাকে বলবে না। একই ব্যাপাব নয কি? সেই ঝিনুকের ভালাব মধ্যে যথোপযুক্ত। কেমিক্যাল। জাপানিবা বুঝে শুনে ক্ষেপে ঝুকে কেমিক্যাল মেশালে তা কালচার্ড আব কৃত্রিম। আব অকূল সমুদ্রে হঠাৎ কোন ঝিনুক এক মুহূর্তেব যোগাযোগে তেমন কেমিক্যাল জেনুইন মুক্ত কবে? অথচ পরে যেন মনেই থাকে না, মনেই থাকে না।

মাধবী হাসলো। চা শেষ কবলো। উঠে দাঁডালো। তাব মুখে আলো পডলো। তাব মুখ আব ঠোঁট দেখে মনে হলো, তাব পিপাসা পেযেছে, যেন সূর্যেব সেই আলো থেকে কোন কেমিকাল পেতে চেষ্টা কবছে তাঁব ঠোঁট দুটো। ঠিক তখনই দূরে কোথায আগুন যেন, জানলা দিযে ধোঁযাব গন্ধেব বাতাস, দমকলেব ঘণ্টা একবাব বাইফেলেব টাবাবাবাও শোনা গেলো।

অধ্যাপিকা বাসবী বললো,—কি ডোলমা? গোলমালটা কার সঙ্গে, কাব সঙ্গে?

ডোলমা কাঠেব মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালো। জানলা দিয়ে দেখতে গিয়ে আপেল গাছটাব গাযে বাঁধা বাঁশেব মাথায সাদা প্রার্থনা পতাকাটা তাব চোখে পড়লো। সেটা পতপত কবে উড়ে অমঙ্গলই যে দূর করছে। সে হাসলো। চাযেব সরঞ্জাম জড়ো কবলো ট্রেতে। ধীবে ধীবে, যেমন কবে।

সে ভাবলো: সে তো মেমসাহেব যে এক সমযে মন্ত্রী টন্ত্রি ছিলো তা জানে। আব এঁবা এখন যা বললো। সে ভাবলো, অনেক বড় কালের সমুদ্রে যেতে যেতে একবাব ডুবতে হয, আবাব নতুন কবে ভেসে চলতে হয। কিন্তু দেখো, মেমসাহেবের এবাবই শেষ যাওযা। আব ফিবে আসতে হবে না জন্মাতে। নিশ্চযই।

সুরমা বললেন, —কি খবব আজ? তিনি হাত বাড়িযে তকলি আব উল নিলেন। মাধবী বসে কাগজটাকে হাতে নিলো। বললো, অনেক খবব। এদিকে, দেখো, এ-পক্ষ ও-পক্ষকে দোষ দিচ্ছে, ও-পক্ষ এ-পক্ষকে—এই আন্দোলন আর গোলমাল নিযে। ডানদিকে স্বর্ণমন্দিবেব চাবদিকে নব্বই ফুট সড়ক। আর ডান দিকেই মাঝামাঝি বক্স কবে বিদ্দেসাগবেব মুক্তো।

. সুবমা বললেন, মুক্তোটাকে শেষ পর্যন্ত দামী বলছে? পড়, শুনি। তিনি হাসলেন।

বাসবী কোলের উপরে সেই লিল্যাক উলটা নিযে বুনতে শুরু করলো। এরকম হয, সেই লিল্যাক রং-এর আভা তার গলায় চিবুকে পডতে লাগলো।·

লুক্রেশিয়া

বাণী রায়

গতকল্য রাত্রে গড়িয়াহাট রোডে একটি খানার পার্শ্বে একটি সুন্দর সুবেশ যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রহারজনিত ক্ষতের চিহ্ন ছিল। যুবকটিকে অবিলম্বে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

*   *   *

"গড়িয়াহাট রোডে যে যুবকটিকে আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার নাম শ্রীযুত প্রবীর গুহ বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুত গুহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। প্রকাশ, শ্রীযুত গুহ গতকল্য অপরাহ্নে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে তিনি গুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার পকেটের টাকা, ঘড়ি ও হাতের হীরার আংটি প্রভৃতি কিছুই অপহৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ আততায়ীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া প্রহারে অচৈতন্য করিয়াছিল, কিন্তু কোন ভয় পাইয়া তাহারা তাঁহার টাকাকড়ি প্রভৃতি অপহরণ না করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কলিকাতার সি আই ডি পুলিস এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।"

সংবাদপত্রে এই সংবাদটিতে কলিকাতায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। কর্নেল প্রশান্ত গুহর একমাত্র পুত্র প্রবীর গুহকে কে না চেনে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক, জনপ্রিয়, কমনীয়মূর্তি প্রবীর গুহ কলিকাতা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত, মনস্বী ছাত্র প্রবীর গুহের এই আকস্মিক বিপদে ছাত্রছাত্রী মহলে সাড়া পড়িয়া গেল।

পুলিস বহুদিন অপরাধীর অন্বেষণ করিল। প্রবীর গুহ আরোগ্য লাভ করিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তটি চিরদিনের জন্য অকর্মণ্য হইয়া গেল। তাহার ছাত্রজীবন শেষ হইল নিরাশার অন্ধকারে। তাহার উদ্ধত লেখনী মূক হইল কলম ধরিবার অসামর্থ্য। শোকাচ্ছন্ন মাতাপিতার সহিত সে কার্সিয়াঙে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরাইতে গেল। প্রায় এক বৎসর যাবৎ সে সেইখানেই আছে।

পুলিসের নিকট জবানবন্দীতে প্রবীর গুহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, নিমন্ত্রণ শেষ করিয়া রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সে গড়িয়াহাট রোড দিয়া একাকী ফিরিতেছিল। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অন্ধকারের মধ্যে একজন মুখোশপরা লোক সহসা তাহাকে আক্রমণ করে; তাহার পর আর তাহার কিছু মনে নাই। আততায়ীর চেহারা সম্বন্ধে প্রবীর গুহ কিছুই বলিতে পারে নাই।

এই আক্রমণের প্রকৃত ঘটনা এবং আক্রমণকারীর প্রকৃত পরিচয় জগতে তিনটি ব্যক্তি মাত্র জানে—প্রবীর গুহ নিজে, মালিনী সেন এবং আমি।

জানি, এখনও প্রবীর গুহর দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়, তাহার প্রতিভার অপমৃত্যুর জন্য অজানা সেই দুর্বৃত্তকে অভিশাপ দেওয়া হয়, ইংরেজ শাসনের নিন্দা করা হয়—পথচারী ব্যক্তির জীবন এখনও নিরাপদ নয় বলিয়া।

আমি জানি, প্রবীরকে নিষ্ঠুরভাবে কে প্রহাব করিয়াছিল এবং কেন। আমি জানি, কেন প্রবীর গুহ লক্ষপতি পিতার পুত্র হইয়াও পুলিসের নিকট প্রকৃত ঘটনা বলে নাই। আমি জানি, কেন মালিনী সেনেব গর্বিত মস্তক আজ অবনত, কেন প্রবীর গুহের নামে তাহাব নয়নে বহ্নি জ্বলিয়া ওঠে।

আমি অমর সোম—বিশ্ববিদ্যালয়েব, ইংবেজী বিভাগে পঞ্চবার্ষিকী শ্রেণীব ছাত্র, মালিনী আমাব সহপাঠিনী এবং প্রতিবেশিনী।

মালিনীর পিতা পাটনায জজিযতি হইতে বিরাম লইযা, হিন্দুস্থান পার্কে আমাদেব পাশেব বাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। মালিনীব এক ভ্রাতা অধ্যাপক, অন্য ভ্রাতা ব্যারিস্টাব। বাহিব হইতে আই এ পাস করিযা আসিযা মালিনী আশুতোষ কলেজ হইতে বি এ পাস কবে।

আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ পড়ি। আমাব ইংবেজীতে অনার্স ছিল, মালিনীবও তাই। পাশাপাশি বাড়ি, উভয পবিবাবে সৌহার্দ্য। মালিনীব সহিত আমাব সখ্য হইতে বিলম্ব হইল না।

আজ মালিনী আমাব কে জিজ্ঞাসা কবিলে আমাব উত্তব দেওযা কঠিন হইবে, কিন্তু মালিনী আমাব কে নয় তাহাব উত্তবও আমাব জানা নাই।

মালিনী বাংলাব বাহিবে মানুষ। সমস্ত প্রকৃতিতে তাই তাহাব একটা উন্মত্ত বন্যতা। অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে সে বাড়িযা উঠিযাছে অতিমুক্ত লতাটিব মত। বাঙালিনীব ভীরু নম্রতা তাহাব মধ্যে নাই, আছে অগ্নি, আছে দীপ্তি। তাহাব ক্ষীণ শ্যাম দেহে আকর্ণবিশ্রান্ত কিন্তু অনতিপ্রশস্ত নযনে, বক্র বক্ত অধবে আছে অনল —যাহা পুরুষ-চিত্তকে দগ্ধ কবে জ্বালা দেয।

মালিনী কবিচিত্ত। তাহাদেব বাগানে বসিয়া কতদিন তাহাকে দেশী বিদেশী কাব্য পড়িযা শুনাইযাছি। আমাকে সে চিবদিন সঙ্গদান কবিযাছে, কিন্তু আমাব নীবব প্রেম সে গ্রহণ কবে নাই। বর্ষণমত্ত সন্ধ্যায তাহাব অবাধ্য অলক উড়িযা আমাকে স্পর্শ কবিযাছে, বৌদ্র প্রসন্ন দিনে সে আবাম ভ্রমণে আমাকে সঙ্গী কবিযাছে, আকুল নিশীথে আমাব সুবে সুব মিশাইযা সে গান গাহিযাছে, কিন্তু আমাব ভালবাসায তিলেকেব জন্য সে ধবা দেয নাই। তাহাব অনল অন্য শিখাকে খুঁজিযা মবিত, আমি তাহাকে কেবল শীতল জলই যোগাইযাছি।

বি. এ পবীক্ষাব ফল বাহির হইবাব পব মালিনী আমাদেব বাড়ি আসিল, তাহাব চঞ্চল চবণছন্দে গৃহ মুখব হইযা উঠিল।

কি, একা একা ব'সে কবিতাব বই পড়ছ? বাবাঃ শেলীব কবিতা এখনও পড় তুমি! আমাবও ন্যাকামিব ছড়া ভাল লাগে না। খালি ঘ্যানঘ্যানানি! বিকৃত ক্রন্দনেব সুবে মালিনী আবৃত্তি কবিল—

Oh lift me as a wave. a leaf a cloud
I fall upon the thorns of life–I bleed

খিল্ খিল করিযা হাসিযা মালিনী আমাব পাশে কাউচে লুটাইযা পড়িল।

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিলাম। মালিনী আমার হাত হইতে বই কাড়িযা লইল।

চল, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওযা যাক। অনার্সে তুমি আমি কেউই তেমন ভাল কবিনি। এবারে গোড়া থেকেই ভাল ক'রে পড়ব—তুমি হবে ফার্স্ট, আব আমি সেকেণ্ড , না, আমি ফার্স্ট, তুমি সেকেণ্ড? —মালিনী আমার চুলেব উপর হাত রাখিল।

তাহাব স্পর্শেব উন্মাদ আকর্ষণ প্রাণপণে সংবরণ কবিতে করিতে আমি উত্তর দিলাম, তুমিই ফার্স্ট, আমি সেকেণ্ড।

এই গেল আমাদেব বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবেশেব ইতিহাস।

মাসখানেক পব। বিকাল চারিটায মালিনী এবং আমি বিশ্ববিদ্যালয হইতে একত্রে বাড়ি ফিবিতেছিলাম, মালিনীব ব্যারিস্টাব দাদাব গাড়িতে আমবা ফিবিতেছিলাম—পথে, কোর্ট হইতে তাহাব দাদাকে তুলিয়া লইতে হইবে।

সেনেট হলেব পাশ দিযা আসিতে হঠাৎ আমাকে ঠেলা দিয়া আকুল স্ববে মালিনী বলিযা উঠিল, অমব, ও কে?

চাহিযা দেখি, গাড়িব চলাব পথ কবিতে লোহাব গেটে একটি হস্ত স্থাপন করিযা প্রবীব গুহ দাঁড়াইযা। শিশুর মত স্ফুরিত ও সুগঠিত তাহাব অধবোষ্ঠে জ্বলন্ত সিগাবেট। প্রশস্ত ললাটে প্রতিভাব জ্যোতি, দীর্ঘ সাবসগ্রীবা একটু পশ্চাতে হেলানো। নাবীসুলভ কমনীয মুখে ঈষৎ বিবক্তি ও অপাব আত্মমর্যাদাব ছাপ। সাধাবণেব সহিত তাহাব কোন সংযোগ নাই, যেন থাকিতেও পাবে না।

মালিনীব উত্তেজিত, মুগ্ধ মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিযা বলিলাম, ওব কথাই তো তোমাকে বলছিলাম সেদিন। ওই হচ্ছে প্রবীব গুহ—গতবাবে ইংবেজী অনার্সে ফার্স্ট হযেছে। আমাদেব কাগজটাব সম্পাদক আব সেমিনাবেব সেক্রেটাবি।

ওই প্রবীব গুহ! ভাবী সুন্দব লেখে কিন্তু, অমন জোবালো লেখা কমই পড়েছি। আব লেখাব সঙ্গে চেহাবাবও মিল আছে, তাই না?

প্রবীব গুহ তাকাইল না, সোজাসুজি কোন নাবীব দিকে সবলদৃষ্টিতে দেখা তাহাব জন্মগত অনভ্যাস। তবে মালিনীকে সে পূর্বেই দেখিযাছিল জানি! দেখিবাব বস্তু কোন কিছুতে, বিশেষত স্ত্রীজাতিতে থাকিলে, তাহা তাহাব বুদ্ধিপ্রখব দৃষ্টি এড়ায না।

গাড়ি জনযানবহুল পথে আসিল। প্রবীবেব উন্নত, কমনীযমূর্তিব দিকে চাহিযা অর্ধস্ববে, কপোত-গুঞ্জনেব মত মালিনী আবৃত্তি কবিল—

সন্ধ্যাবাগে ঝিলিমিলি ঝিলমেব স্রোতখানি বাঁকা
আঁধাবে মলিন হ'ল যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোযাব।

আত্মবিস্মৃত হাসি তাহাব মুখে, নযনে স্বপ্নেব ছাযা।

মালিনীব স্বপ্নালস হাসি আমাব চিত্তেদহন আনিল। তাহাকে পবিহাস কবিযা সতর্ক কবিলাম। চেহাবাটা বাঁকা তলোযাবেব মতই, কিন্তু চবিত্র? সাবধান মালিনী, প্রবীব গুহেব নৈতিক চবিত্রে শিথিলতা আছে। কোন মেযেই ওব হাত এড়ায না।

মালিনীব বক্র অধবে শাণিত হাসি ঝলকিয়া উঠিল। প্রতিভাব সঙ্গে চবিত্রেব যোগ থাকে না, অমব। চাঁদ কলঙ্কী ব'লেই সুন্দব। আব — লোকে তো অনেকই বলে। এদেশে তিলকে তাল ক'বে তোলাব প্রথা আছে, আমি জানি।

এত সুন্দব কি দেখলে তুমি, মালিনী? তুমি তো কোন পুরুষকে সুন্দব দেখ না? — অজ্ঞাতে হযতো একটা নিঃশ্বাস পড়িল।

তোমাব চেযে বেশি সুন্দব হযতো প্রবীব গুহকে কেউ বলবে না। কিন্তু আমি দেখছি ওব ব্যক্তিত্বকে, ওব প্রতিভাকে , চেহারা তাব আধাব মাত্র। কি আশ্চর্য!

তাহার দিন দুই পরে বিতর্ক-সভায় প্রবীব গুহ নোয়েল কাওয়ার্ড সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ কবিল। কুশাগ্র বুদ্ধি তাহার, তীক্ষ্ণ বচন-বিন্যাস। প্রতিপক্ষের কলরব ভেদ করিয়া তাহার উদাত্ত কণ্ঠ বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিযা ফেরে , তাহার যুক্তি অসীম জ্ঞানেব পরিচয় দেয়। সমুখেব আসনেই মালিনী, রক্তপদ্ম-বর্ণের শাড়ী তাহার রূপকে মুখবতর করিয়া তুলিয়াছে। চঞ্চল দৃষ্টি তাহার বাবংবাব প্রবীরেব স্থিব প্রদীপ্ত দৃষ্টিব সহিত মিলিত হইতেছিল।

তাহার পরের দিনই মেয়েদেব বসিবার ঘবেব সামনে দেখিলাম, প্রবীর ও মালিনী অন্তবঙ্গ ভাবে আলাপ করিতেছে। প্রবীরেব পদ্মপলাশ নেত্রে ব্যাধের কটাক্ষ, মালিনীর নযনে আত্মসমর্পণের অসহাযতা।

সহসা মনে হইল, বিশ্ববিদ্যালয় যেন তিমিরগুণ্ঠনে ঢাকিযা গেল, যেন আমাব চারিপাশে শত শত অলিন্দ স্থপতিশিল্পের নিদর্শনরূপে আমাকে বেড়িয়া ধবিল। সম্মুখে খবস্রোতা টাইবার, তাহাব তীরে উচ্চ গিবিশ্রেণীব উপবে আভাস-স্বপ্নেব মত জাগিযা উঠিল বোম নগবী। কত যুগান্তেব বিস্মৃতি ভেদ কবিযা আমাব জন্মান্তবেব প্রিযা যেন অশান্ত ক্রন্দনে আমাকে ডাকিতেছে-- 'লুক্রেশিযা।' ডাকিতে গিযা চমকিযা উঠিলাম, আমি —আমি তো 'কোলাটিনাস' নহি, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীব ছাত্র অমব সোম। আমাব নির্যাতিতা, 'লুক্রেশিযা' তাহাব বিষাদম্লান দৃষ্টি, অসহ্য যন্ত্রণাব অভিব্যক্তি লইযা ক্ষণতবে দেখা দিযা সবিযা গিযাছে। আমাব সহপাঠিনী মালিনী শুধু ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীব শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্রবীব গুহব সহিত বিশ্রম্ভালাপ কবিতেছে। আমাব 'বোম' বিশ্ববিদ্যালযেব প্রাচীবেব গাযে মিলাইয়া গিযাছে। কুযাসাস্তিমিত অতীতেব পটে টাইবাবের স্রোত ঝিলিক দিযা আবাব বিস্মৃতিব তমিস্রায অন্তর্হিত হইল। আমি তো 'কোলাটিনাস' নহি, তবে কিসেব প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ? আমাব হস্ত কেন আপনি মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, সমগ্র শবীব আহত ব্যাঘ্রেব মত কাহাব উপব সবোষে ঝাঁপাইযা পড়িতে চায?

মনে মনে হাসিলাম। বাত্রিজাগবণ ও কাব্যচর্চাব মাত্রা কমাইতে হইবে। মালিনীব নিকটে গিযা দাঁড়াইলাম, প্রবীব গুহ তখন চলিযা গিযাছে।

কি কথা হচ্ছিল তোমাদেব? বেশ তো আলাপ হযে গেছে দেখছি।— প্রশ্ন কবিলাম।

মালিনী উত্তব দিল, একটা চ্যাবিটি পার্ফবম্যান্স হবে তাই গান দিতে বলছিলেন।

কোন মন্তব্য প্রকাশ কবিলাম না। প্রবীব গুহেব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, আভাসে জানি, নাবীদেহেব প্রতি তাহাব দুর্বাব লোভ। কুমাবীব কোমল অধব তাহাব লেখনীকে প্রেবণা যোগায, পবিত্রতাব নীতিশাস্ত্রে তাহাব আস্থা নাই। সে প্রতাবক নহে, কিন্তু সে শিকাবী। সে তাহাব লক্ষ্যকে জানাইযা দেয যে শবসন্ধান চলিতেছে। হৃদযহীন সে নহে, অতি-আধুনিক মাত্র।

ধীবে ধীবে অজ্ঞাতে আমাব মুখ হইতে বাহিব হইল—

> If Collatine, thine honour lay in me,
> From me by strong assault it is bereft

কি বলছ অমব?— মালিনী জিজ্ঞাসা কবিল।

বলছি—। আবাব অজ্ঞানেব মত শুনিলাম আমিই বলিতেছি—

> Yet die I will not till my Collatine
> Have heard the cause of my untimely death
> That he may vow in that sad hour of mine
> Revenge on him that made me stop my breath

কোথা থেকে বলছ অমব? কোলাটাইন নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে।— মালিনীব চক্ষুতে নিবিড়তা নামিযা আসিল। সুদূর আকাশে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, ললাট কুঞ্চিত করিয়া সে নামটা স্মবণ কবিবাব চেষ্টা কবিল।

লঘুকণ্ঠে বলিলাম, শেক্সপীযরের লুক্রেশিয়ার আক্ষেপ বলছি, বুঝলে? যখন প্রবীর গুহেব সঙ্গে কথা বলছিলে, কেন জানি না, কেবলই তোমাকে লুক্রেশিযা ব'লে ভুল করছিলাম।

স্বামী কোলাটিনাস বাইবে। নির্জন ঘরে লুক্রেশিয়াকে সেক্সটাস আক্রমণ করেছে তার সর্বনাশেব জন্যে। কোলাটিনাস অবশ্য প্রতিশোধ নিয়েছিল।

মালিনী হাসিয়া উঠিল। পাথরের মালা যেন মেঝেতে ছিঁড়িয়া পডিল, এমনই রাগিণীময় তাহার হাস্য। একটি কৃশকায় ছাত্র চলিতে চলিতে ফিবিয়া চাহিল। একজন ছাত্রী বিবক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত কবিল।

অদ্ভুত কল্পনা তোমার! আমি বোমান সুন্দবীই বটে! আচ্ছা, প্রবীবকে কি মনে হ'ল?

সেক্সটাস।

তীব্র দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা হানিযা চাপা গলায মালিনী বলিল, ছিঃ!

ছয মাস পবে।

মালিনীব গৃহে সান্ধ্যভোজন। উপলক্ষ্য কিছু নহে, নিমন্ত্রিতেব সংখ্যাও মুষ্টিমেয়।

প্রবীর বসিযা ছিল বাঁকানো সেটিতে অলস ভঙ্গিতে। হাতে তাহাব ধূমাযমান সিগাবেট। সিগাবেটেব নীলাভ ধোঁযা উজ্জ্বল হীরক-অঙ্গুবীযকে অস্পষ্ট কবিয়া ফেলিযাছে। বঙ্কিম অধরোষ্ঠে ইস্পাতেব মত ধারালো কৌতুকেব হাস্য। চোখে নবম, প্রেমজড়িত আদবেব দৃষ্টি। সকলের সম্মুখে যাহা মুখে আসে না, তাহা যেন দৃষ্টিব সহিত সে মালিনীকে নিবেদন করিতেছিল। প্রতিটি কটাক্ষ যেন তাহাব এক একটি চুম্বন।

মালিনী আমাব পাশে বড সোফায বসিয়া ফুলেব পাপডি ছিডিতেছিল। আজও সে পবিয়াছে রক্ত-গোলাপ বঙেব বেশমী শাডি। কালো চুলে জডানো তাহাব গোলাপেব মালা, হাতে লাল গালাব জবি-জডানো চুডি, কানে গলায লাল প্রবালেব গহনা। এ যেন জ্বলন্ত বহ্নি-শিখা, উদগ্র-কামনায জ্বলিতেছে কাহাকেও আলিঙ্গন কবিবাব নিমিত্ত।

আব ওই যে স্তিমিত-গৌব তরুণ পুরুষ শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে অর্দ্ধশযান, যাহাব ললাটে বিদ্যুতের আলো প্রতিফলিত হইতেছে, অলস তন্দ্রাব ছাযা বমণী-সুলভ আঁখিপল্লবে বাসা বাঁধিযাছে, যাহাব সবল দীর্ঘ তনু প্রেম ও কামনায প্রোজ্জ্বল—সেও এই একই অগ্নি। আগ্নেযগিবিব ভস্ম-আববণে সে প্রসুপ্ত। তাহাকে চেনা যায না , অথচ তাহাবই অগ্নি উদগীবণে একদিন ধ্বংস আসে—কত পম্পিযাই তাহাব লাভাস্রোতে ভাসিযা যায। একই বহ্নি উভযকে আকর্ষণ কবিতেছে প্রবল বেগে, শুধু তাহাব রূপ বিভিন্ন। সর্বনাশা এই মোহ, কে কাহাকে গ্রাস কবিতে পাবিবে ঠিক নাই।

আমাব অবশ দেহে মালিনীব বক্ত-অঞ্চল বহুবাব লাগিতেছে। তাহাব চপল বাহু কতবাব আমাকে ছুঁইযা গেল। কতবাব আমার কাধে সে করাঙ্গুলি স্থাপন কবিযা আমাব চোখেব উপব নত হইয়া হাসিল। কি অন্ধ আকর্ষণ তাহার দিকে আমাকে অহবহ টানে। প্রতিটি রক্তকণিকা তাহাকে খুঁজিযা ব্যর্থ প্রতীক্ষায মন্থব হইযা যায। পুরুষেব বুভুক্ষু যৌবন নিযত তাহাকে প্রার্থনা কবে। মনে হয, কত দিন হইতে চিনি তাহাকে। কত নীল সমুদ্রেব পাশে পাশে তাহাব আঁখি আমাকে সঙ্কেতে ডাকিয়াছে। কত দুর্বাব বণক্ষেত্রে তাহাব মুখেব ছবি আমাব শত্রু-বক্ত-স্নাত হস্তে বল যোগাইযাছে। আমি তাহাকে চিনি। জন্মজন্মান্তর হইতে তাহাব সহিত আমার যোগাযোগ। কিন্তু এ জন্মে অমব সোম বৃথাই মালিনী সেনকে চাহিযা মবে। মালিনী জনাবণ্যে তাহাব সে চেনা মুখখানি ভুলিযা গিযাছে।

যাই বল মালিনী, ছেলেমেযেতে বন্ধুত্ব আমি বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে 'আবাহনে' একটা কবিতা লিখেছিলাম আমি বছরখানেক আগে। আর নিছক নিবামিষ বন্ধুত্বেব প্রযোজন কি? যদি মনে দোলা লাগে, লাগুক। কারও কোনও ক্ষতি তো হচ্ছে না। সুখ পেলে কেন ছেড়ে দেব? —হাতের সিগারেটের দিকে চাহিয়া প্রবীর চিন্তিতভাবে বলিল।

মালিনী হাসিল। মনে হইল সে যেন ধরিয়া লইয়াছে, প্রবীরের উচ্ছৃঙ্খল কথাবার্তার সহিত তাহাব চরিত্রের কোন যোগ নাই। অধিকাংশ শিল্পীর মত প্রবীবও আত্মপ্রতারক। উন্নতমনা, সংযমী প্রেমিক তাহাব মধ্যে চিবজাগ্রত। মুখেব কথায় প্রবীব অন্তরকে গোপন কবিতেছে।

মনে হইল চীৎকার করিয়া বলি, মালিনী, মালিনী! এত তেজ, এত বুদ্ধি নিয়ে তুমি ভুল ক'ব না। প্রবীব গুহব খেলাই এই। সে যা মনে কবে, হাসির ছলে অন্য পক্ষকে পূর্বেই তা জানিযে দেয়। অপব পক্ষ যদি সেটাকে পবিহাস বা মুখেব কথা মাত্র মনে কবে, তবে দোষ প্রবীবেব নয়।

প্রবীব চুম্বনেব ভঙ্গিতে অধব অগ্রসর কবিযা সিগাবেট ধবিল। মৃদু টান দিযা আবার বলিতে লাগিল, বিবাহেব প্রযোজন নেই, নিরামিষ বন্ধুত্বেবও প্রযোজন নেই। জগৎটা কেবল দেখে যাও। আনন্দ, আনন্দই সাব। জীবন ক্ষণিকেব। তাই বলি মালিনী, পুরুষেব বন্ধুত্বে বিশ্বাস ক'ব না। কাবণ —

Friendship's cool water
Any moment can change into wine

মালিনীব দিকে তাকাইযা বুঝিতে পাবিলাম, বন্ধুত্বেব শীতল পানীয তাহাব কাছে বহু পূর্বেই সুবায রূপান্তবিত হইয়া গিয়াছে।

সকলকে বিদায় দিয়া মালিনী বাগানে আমাব পাশে আসিযা দাঁডাইল। চৈত্রেব বাত্রি, আকাশে ভবা জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না তাহাব বক্র অধবে, তীক্ষ্ণ নযনে, কালো চুলে।

প্রবীবকে নিযে একটু বাডিযেছ মালিনী। এখনও সাবধান হও। প্রবীব ভাল ছেলে নয।

মালিনীব দীপ্ত সৌন্দর্য জ্বলিযা উঠিল। ভাল কি মন্দ, তা নিযে লোকেব মাথা-ব্যথা কেন? ভাল ছেলে দেখে দেখে আমাব অসহ্য হযেছে। আমি শিশু নই অমব, মনে বেখো।

মবিযা হইযা বলিতে লাগিলাম, প্রবীবদেব বাডি অত্যন্ত সেকেলে। আব তুমি তো জান, ও বিবাহে বিশ্বাস কবে না। এখন তো দূবেব কথা, কোন দিনই হযতো বিযে কববে না। মালিনী বিপদে পডবে তুমিই, কাবণ তুমি ওকে যতটা ভালবেসে ফেলেছ, ও তোমাকে তা বাসেনি।

আহতা সর্পীব মত মালিনী দেহ আকুঞ্চিত কবিল, সুর্মালাঞ্ছিত ছুবিব ফলকেব মত সঙ্কীর্ণ তাহাব চক্ষু সর্পীর দৃষ্টিতে আমাব প্রতি চাহিযা বহিল। সে চোখে ঘৃণা ও দম্ভ।

কি পাগলেব মত বকছ অমব? বিযেব প্রশ্ন ওঠে না এখানে। প্রবীবকে আমি হযতো ভালবেসেছি , না জেনে অস্বীকাব কবব না। কিন্তু আমি জানি, আমাব ভালবাসাব ও যোগ্য। লোকে ওকে বোঝে না, ওব প্রতিভাব মূল্য মিনমিনে বাংলাদেশ দিতে পাবে না। তোমবা, তথাকথিত শুদ্ধ শান্ত ভাল ছেলেবা, ওব মুখেব কথা, বাইরের ব্যবহাব দেখে ভুল কব। বড সুন্দব মন প্রবীবের। আমি ওকে ঠিক চিনেছি। সমস্ত সামাজিক বন্ধন, সংস্কারের ওপবে প্রবীব গুহ। অসাধাবণ ওব ব্যক্তিত্ব।

নদীব ধ্বংসমুখী তীবে দাঁডাইযা আছে আমাব প্রিযা। তাহাকে বক্ষা কবিবাব ক্ষমতা নাই আমাব। অদৃশ্য বিপদ তাহাকে গ্রাস কবিবাব জন্য অগ্রসব হইতেছে। সবল শিশুব মত নিজেব পবিত্র নির্ভবশীল মন দিযা সে বিশ্বেব বিচাব কবিতে চায।

আবাব তাহাব দিকে চাহিযা বলিলাম, তুমি প্রবীবকে বোঝনি মালিনী, যতই তোমাব বুদ্ধি থাক বা দীপ্তি থাক। চিবকাল বাংলাব বাইরে তুমি মানুষ, সবল খোলা জীবন তোমার, মানুষের জটিলতা-কুটিলতার সঙ্গে তোমাব পরিচয় নেই। মালিনী, তুমি সৎ মেয়ে, অসৎ পুরুষের কামনা বোঝা তোমাব সাধ্যের বাইবে। প্রতিভা আছে প্রবীবের, কিন্তু সে প্রেমিক নয়, কামুক।

অমর, অনেকক্ষণ তোমাব ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা সহ্য কবেছি, আব নয। মনে বেখো, প্রবীর আমাব বিশেষ বন্ধু, তাকে অপমান কবাব অধিকাব তোমাব নেই। আমাব সঙ্গে প্রবীবেরও বন্ধুত্ব আছে, তোমাবও তাই। কিন্তু সে তো কখনও আমাকে উপদেশ দিতে আসে না?— মালিনী সম্মুখের গাছ হইতে দুইটি ফুল ছিঁডিযা সবোষে কুটি কুটি কবিযা ছড়াইয়া ফেলিল।

যন্ত্রণায় আমাব মুখ নীল হইয়া গেল। চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো মালিনীব অর্ধচন্দ্র ললাটে নিজেব ছায়া দেখিতেছিল। শিথিল তাহাব কেশবন্ধন, আঁখিতটে বিপুল শ্রান্তি। বক্র বক্তিম অধবে তাহাব চাঁদেব আলো। আজ যেন সে অধব তত বক্র, তত উদ্ধত নয। যেন অন্য অধব তাহাকে নিজেব বলে নত কবিয়াছে। তাহাব অধবেব দিকে দষ্টি বাখিযা অতি কষ্টে আবাব বলিলাম, উপদেশ দিচ্ছি না মালিনী, বন্ধুত্বেব দাবীতে সাবধান ক'বে দিচ্ছি। তোমাব ভাবালু কবিমন এ পৃথিবীতে চলে না। প্রবীব তোমাব মত নয। তুমি যা, বাইবে সে তারই ভাণ মাত্র। কিন্তু ও কি মালিনী, ও কি তোমাব ঠোঁটে— প্রবীব কি — ? মালিনী, মালিনী, উত্তর দাও।

আহত পশুর মত বেদনায আমাব স্বব নির্জন বাত্রিতে বীভৎস শুনাইল।

গর্বিতা বাণীব ভঙ্গিতে মালিনী গ্রীবা বক্র কবিল। —হ্যাঁ। যা অনুমান কবেছ সত্যি। প্রবীব আমাকে চুম্বন কবেছে' তাতে কি হযেছে? আমি তো তাকে ভালবাসি।

তাহাব পব প্রায পনেরো দিন মালিনীদেব বাড়ি যাই নাই, কথাবার্তাও হয নাই। ক্লাসে দেখি, সম্রাজ্ঞীব মত মালিনী নির্দিষ্ট স্থানটিতে আসিযা বসে, কোন দিকে না চাহিযা ক্লাসেব শেষে চলিযা যায়। আব মাঝে মাঝে দেখি, বিকালে তাহার গাড়িতে প্রবীব ওঠে।

সন্ধ্যাব ছাযা টাইবাবেব তীবে তীবে নামিযা আসিযাছে। কুঞ্চিত কেশ মেষপালকেবা অঙ্কুশহস্তে দুগ্ধফেনেব মত শুভ্র মেষকুলকে গৃহে লইযা যাইতেছে। দবে উচ্চ পর্বতবক্ষে মিনাব গম্বুজ মাথা তুলিযা বহিযাছে। গোধূলির মুমূর্ষু আলো বোমকে স্বর্ণফলকে মুড়িযা তুলিযাছে। স্বপ্নকুহেলিমণ্ডিত প্রাসাদগৃহে সুপ্তা সুন্দবী। কত যুগেব অন্ধকাব বিস্মৃতি যেন দূবে সবিয়া গেল, মনেব গহন অতল হইতে নিদ্রিত অনুভূতি আবাব জাগিযা উঠিল। আবাব প্রতিশোধেব অনল দেহে উল্লাসে নাচিযা উঠিল। সেক্সটাসেব কণ্ঠ লক্ষ কবিযা লোলুপ অসি উদ্যত হইতে চায।

নিকদ্ধ কামনাভাবে দেহ মুখ। লুক্রেশিয়াব ঘুমন্ত অধবে সেক্সটাসেব অধব। লুক্রেশিযাব দেহবল্লবীব উপবে সেক্সটাসেব কঠিন দেহ নামিযা আসিতেছে ধীবে -- অতি ধীবে।

বদ্ধকণ্ঠে স্বব আসিল না, চমকিয়া জাগিযা দেখিলাম, শয্যা ঘর্মাক্ত। প্রবীব গুহ তাহাব কাগজেব জন্য একটি কবিতা চাহিয়াছে, তাহাই লিখিতে সন্ধ্যায অবসন্ন দেহে ঘুমাইযা পডিযাছি। স্বপ্নের স্পর্শ তখন যেন চোখে লাগিযা আছে। তখন যেন কানে লুক্রেশিয়াব আর্ত হাহাকাব ভাসিযা আসিতেছে। কত দূব শতাব্দীর পাবে বসিয়া সে যেন আহ্বান কবিতেছে। তাহাব হৃদযমথিত করুণ বোদন আকাশে বাতাসে ভাসিয়া আমাকে ডাকিতেছে, কোলাটিনাস। কোলাটিনাস।

এ ডাক না শোনা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার চিত্ততন্ত্রী এই এক সুবে বাঁধা যুগ যুগ হইতে। জানি, আমাকে যাইতে হইবে।

ক্ষিপ্রহস্তে বেশভূষা সারিয়া লইলাম। মালিনীব বাড়ি সন্ধ্যের পর পৌঁছিলাম। বাহিরেব ঘরে মালিনীর অধ্যাপক দাদা ও ব্যারিষ্টার দাদা উচ্চ স্বরে আলোচনায় রত। মালিনী মাতৃহীনা। তাহার বড় বউদিদি রাস্তার দিকের জানালা ধরিযা দাঁড়াইয়া আছেন।

সাদব আহ্বান চিবদিনই মালিনীব বাড়িতে পাই। প্রশ্নেব উত্তরে শুনিলাম, মালিনী কলেজ হইতে এখনও বাড়ি ফেরে নাই, সঙ্গে গাড়িতে আছে কেবল প্রবীব গুহ। অধ্যাপক বলিতেছেন, এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না আমাব। স্ত্রীশিক্ষাব নামে স্বেচ্ছাচাবিতা। ব্যারিষ্টার আমাব দিকে চাহিয়া চোখ টিপিযা কহিলেন, এ তোমাব বেশি বলা হচ্ছে দাদা। কলেজের বন্ধু, ভদ্রঘবেব ছেলে। তাব সঙ্গে বেডাতে গেছে তাতে ক্ষতি কি? মেযেদেব কি এতই ঠুনকো মনে কব— এতই দুর্বল? আব মালিনী সে জাতেব মেযে নয। নিজেব ভাব সে নিজে নিতে জানে।

আমাব দিকে চাহিয়া অধ্যাপক চুপ কবিলেন। হায! তাঁহাবা মনে কবেন, মালিনীব ববমাল্য একদিন আমাব কণ্ঠেই পৌছিবে।

বাত্রি আটটা বাজিযা গেল। যে যাহাব কাজে চলিযা গেলেন আমাবই প্রতীক্ষা শুধু শেষ হইল না।

অবশেষে গভীব বাত্রে এক গাড়ি আসিয়া থামিল। দেখিলাম, এক ছাযামূর্তি নামিযা অসংলগ্ন দ্রুত পদে পিছনেব দ্বাব দিযা অন্দবেব দিকে অগ্রসব হইল। তাহাব সম্মুখে গিযা দাঁড়াইলাম, মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলাম, মালিনী।

সহসা তাহার ক্ষীণ দুই বাহু আমাব কণ্ঠে বেষ্টন কবিযা ধবিল, আমাব বক্ষে মুখ লুকাইযা মালিনী কাঁদিযা উঠিল। দেবতাব মন্দিবে পূজাবীব মত সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায দুই হাতে আমি সেই চিবপ্রিয মুখখানি তুলিযা দেখিলাম।

চক্ষু তাহাব আবক্ত, অধব বিশুষ্ক ও স্ফীত। কববীব বন্ধন অর্ধেক খুলিযা চুল জটাতে পবিণত হইযাছে। শাড়িব স্থানে স্থানে কাদা, গাযেব জামা ছিন্ন, সমস্ত শবীব তাহাব যেন কেহ দুমড়াইযা মুচডাইযা ফেলিযা দিযাছে। আমাব নিকটে মালিনী কম্পিত ভগ্নস্বরে সমস্ত কাহিনী বলিযা গেল। সে ও প্রবীব বেড়াইতে গিযাছিল লেকে, ফিবিবার পথে প্রবীব তাহাকে গড়িযাহাটাব নির্জনতম কোণে তাহাদেব একটা বাগান-বাড়ি দেখাইতে লইযা যায। তাহাব উদ্দেশ্য মালিনী বুঝে নাই, মালিনী তাহাকে বিশ্বাস কবে। গাড়ি অনেক দূবে ছিল, বাগানবাড়ি নির্জন। বসিবাব ঘবে প্রবীব তাহাকে লইযা প্রেমাভিনয আবম্ভ কবে। মালিনী প্রথমে তাহাকে প্রশ্রয়ই দিযাছিল, কিন্তু শেষে প্রবীবেব কামনাব মাত্রা দেখিযা পলাযন কবিতে চেষ্টা কবে। কিন্তু পলাইতে সমর্থ হয নাই। কুমাবী-জীবনেব চবম অসম্মান তাহাব হইয়া গিযাছে।

সর্বশবীব মালিনীব থবথব করিযা কাঁপিতেছিল, নিদাকণ শ্রান্তিতে আত্মগ্লানিতে সে অবসন্ন। শিশুব মত তাহাকে বক্ষে তুলিয়া তাহাব শযনকক্ষে লইযা গেলাম, সস্নেহে শয্যায শোযাইযা দিলাম। চক্ষের অশ্রু মুছাইয়া দিযা বলিলাম, ডাক্তাব ডাকি?

না অমব, না। আমাব লজ্জাব কথা তুমি ছাড়া আব কেউ যেন না জানে। উঃ, লোক-জানাজানি হবে ব'লে কুকুবটাকে শিক্ষাও দিতে পাবব না, এই আমার ক্ষোভ।— নিরুপায় ক্রোধে মালিনী শুভ্র মুক্তাদন্ত দিয়া বিছানাব চাদবখানা ছিন্ন কবিতে লাগিল।

লোক-জানাজানি হবে না, তাকে শিক্ষাও তুমি দিতে পাববে মালিনী। আমি এখনই যাচ্ছি। এখনও তো সে গড়িয়াহাটাব বাগান-বাড়িতে আছে বলছিলে না? —অসহ্য হৃদয়াবেগ দমন করিয়া শান্তস্বরে বলিতে পারিলাম।

তুমি যাবে? তুমি যাবে অমব?— উত্তেজনায মালিনী শয্যাব উপর উঠিযা বসিল, দুই হাতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যাও। আমি, আমি যেমন কষ্ট পেযেছি, সেই কষ্ট সেটাকে দিতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর অমব, এর শাস্তি তুমি দেবে তাকে? দয়া ক'বে ছেড়ে দেবে না? মাটিতে তার মাথা লুটিয়ে দিযে সেই মুখ তোমার জুতো দিয়ে

থেঁতলে দিও। যে হাতে ঘৃণা প্রবৃত্তিতে আমাকে ধরেছে, সেই হাত তার জন্মেব মত ভেঙে দিও। তুমি ঠিকই বলেছিলে, ভাল সে আমাকে বাসেনি। আজ স্পষ্টই বলেছিল।

আমি দ্বারেব দিকে অগ্রসর হইলাম। আবার শতাব্দীর বিস্মরণের পরপার হইতে সেই গীতি বাজিয়া উঠিল—

Revenge on him, that made me stop my breath!

দরজার বাহিরে আসিতেই কিন্তু পশ্চাৎ হইতে আহ্বান আসিল দুর্বল ভগ্নস্ববে, অমর!

দেহ তখন আমাব বোমান বীরের বীর্যে উদ্বেল, তিলমাত্র বিলম্ব সহ্য হয না। কিন্তু যে কণ্ঠেব একটি মাত্র আহ্বান আমাকে মৃত্যুব তীর হইতেও ফিবাইতে পারে সেই কণ্ঠের আহ্বানে আবার ফিরিলাম।

বালিশে মুখ লুকাইযা, অস্পষ্ট স্বরে মালিনী কহিল, কিন্তু, তাকে প্রাণে মেবো না অমর।

প্রবীব গুহের সহিত দেখা হইযাছিল, সেই বাত্রে গড়িযাহাটের বাস্তায। বাত্রি তখন প্রায সাড়ে এগাবোটা, আমি অপেক্ষা করিযা ছিলাম পথেব পাশে।

প্রবীর আমাকে চিনিয়াছিল, কাবণ আমি মুখে কোনও মুখোস ধারণ কবি নাই, এবং তাহাকে আক্রমণ করিবাব পূর্বে প্রস্তুত হইবাব সময দিয়া আক্রমণেব কারণ খুলিযা বলিয়াছিলাম। তাহার পরেব ঘটনা সকলেই জানিযাছে। প্রবীব শক্তিশালী. নিজেকে রক্ষাব চেষ্টাও তাহাব প্রশংসাব যোগ্য। কিন্তু আমি, আমি তো তখন শুধু বিংশ শতাব্দীব অমর সোম ছিলাম না, আমি তখন কোলাটিনাস।

প্রবীর আমাব নাম পুলিসের নিকট কবে নাই, ইহাও তাহাব অনন্যসাধাবণ বুদ্ধি ও প্রতিভাব পবিচয।

মালিনী আজও বাঁচিযা আছে—আমিও আছি। লুক্রেশিযার পবিণতি তাহাব হয নাই। কিন্তু সে আমাব কাছে আজ মৃতা। সে অন্যোপভুক্তা বলিয়া আমি দূবে সবিযা যাই নাই— অমৃত কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। কিন্তু আমাব যাহা জানিবার, তাহা সেই চবম অবমাননাব সময়ে তাহাব মুখ হইতেই শুনিযাছি। তাহার যন্ত্রণা আমি ভুলিতে পাবিযাছি, ভুলিতে পাবি নাই কেবল তাহাব মুখেব একটি কথা—তাকে প্রাণে মেরো না অমব।

রোমেব প্রাচীন গাথায ও মহাকবি শেক্সপীয়বেব কাব্যে একটি ভুল ছিল, আমাব জীবনে তাহার সংশোধন হইযা গিযাছে।

আমাব লুক্রেশিয়া আজীবন সেক্সটাসে আসক্তা।

মেহেরজানের মা

মিরজা আবদুল হাই

রেল ইস্টিশানে হাটের ভিড়। সবগুলো গাড়ীতেই লোক ঠাসা, তবুও একটা পাওযা গেল একেবারে খালি। বেশ সাফ সুতরা। গদি মোড়া। মাথার উপর বন্ বন্ করে পাংখা ঘোরে। তারই ভেতর ছোট্ট একটা কুঠরি। আযনায় মুখ দেখা যায়। কল থেকে টিপটিপ করে পানি পড়ে। তারই ভেতর ধাক্কা দিয়ে রকীবাকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে জমিলা বেরিয়ে গেল।

রকীবার পেটে-পিঠে, শাড়ীর নিচে, চটের থলিতে সুপারি বাঁধা, হাতে মবিলের টিন। দেযাল ধরে দাঁড়িযে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। আযনার ভেতর দিয়ে নিজের পেটের দিকে নজর পড়তে মনে হল যেন আট ন'মাস। মেরাজান যখন পেটে এসেছিল, তখনকার কথা রকীবার মনে পড়ল। অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। বুকের দুরু দুরু ভাব ছাপিযে কেমন যেন একটা সরম-বাংগা অনুভূতি তার মনের অতলে শিহরণ জাগাল।

দশটার গাড়ী ঝক ঝক করে এগিয়ে চলেছে। মানুষের হালে বেঁচে থাকার জন্য এই নতুন জীবিকার পথে নেমে পড়া। শুধু আজকের জন্য বেঁচে থাকা, কালের ভরসা কাল। গরীবের শুধু দিনের দিন বাঁচ, ভবিষ্যৎ তো শুধু বড়লোকের। রকীবার অন্তরলোকের চিড় খাওযা ভাবনা।

রকীবার বুকে হাতুড়ি পেটার আওযাজ। প্রাপ্তির হিসাব পাঁচটার গাড়ীতে নাভারনে ফিরলে। এখন শুধু ভয, মারধর আর জেল-ফাটকের ভয।

জমিলারই মুখে শুনা, সব বেটাই না কি দু'পযসা করে খাচ্ছে—তা সাহেব সুবা-ই হোক, আর মজুর ভিখিরী-ই হোক। মনকে যুক্তি দেখায় রকীবা।

বেনাপোলে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে। থামার কিছু পরেই জমিলা বলে, নেমে একটু হাঁটাহাঁটি কর।

রকীবা বলে—ভয করে, যদি ধরে।

ধরবার হলে কি আর আমি নামতাম? আর ধরলেই বা কি? ওষুধ জানা আছে। চার আনা, আট আনা, বড় জোর এক টাকাই নিল। আর তাই বা নেবে কেন, খেপে খেপে যে পেট ভরাই, তাই বা কি এমনি নাকি। ধরবে কোন খানকীর পুত!

প্রতি মুহূর্তেই রকীবা ভাবে এই বুঝি একটা বিপত্তি বাধে। গাড়ী থেমেছে তো থেমেই আছে। নড়বার নাম করে না। ধরা যদি পড়ে তো কি হবে? খুব নাকি মারধর করে। কিন্তু কতজনকে মারধর করবে। জমিলাই দেখিয়ে দিয়েছে—ওরা সবাই। জমিলার মত প্রৌঢ়া তো আছে-ই, বুড়া বুড়ি, ছেলে মেয়ে যোয়ান অগুণতি। এদের ভরসাই বা কম কিসের।

গাড়ী ছাড়বার আগেই জমিলা বলে দিল—দেখ, ঘাটে ঘাটে গাড়ী থামবে, আমাদের দরকার মতই থামবে। এখান থেকে ছাড়বার পর, পয়লা দু'বারে নামবি না, তার পরের বার, বুঝলি?

রকীবা মাথা নাড়ে। এত বড় কলের গাড়ী যা গাঁয়েব পিসিডেন্ট কিম্বা থানাব বড়বাবুও নাকি থামাতে পাবে না, তাকে নিজেদের কথামত থামাতে চালাতে পারে যাবা নিজেকে তাদেরই একজন ভেবে বকীবা গর্ব অনুভব কবতে লাগল।

তৃতীয় বাব গাডী থামার সঙ্গে সঙ্গে বকীবা হাতে কবে নেমে পড়ে।

ফাঁকা মাঠ। অনেকগুলি নানা বয়সের মেয়ে-পুরুষ নেমে ত্রস্ত পাযে মাঠের দিকে দৌড়াল। বকীবা দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। জমিলা তার কনুই চেপে ধবে বলে—দৌড়া, দাঁড়ালে চলবে না। বনগাঁযে জিনিস বেচাকেনার কারবারটা নির্ঝঞ্ঝাট নয। ভোগান্তি অনেক। যাদেব মহাজন সঙ্গে—তাদেব তো পোযাবাবো। আব যাওযা-আসাব হাঙ্গামা যতটুকু বকীবা আঁচ করে রেখেছিল—আসলে তাব সিকিও নয। ভয শুধু মনেই।

পাঁচটাব গাডীতে বকীবা যখন ফিরে এল, তখন তাব কোমবে গোঁজা কিছুটা খুচবা পয়সা, আর টিনে ভর্তি সেব চা'ব সরিষার তেল। সেবে কমসে কম টাকা, দেড় টাকা পাবে। বকীবা শুধু হিসাব কবে। আঙ্গুলের আঁকে আঁকে গুণতে গিযে তালগোল পাকিযে ফেলে।

ঘরে ফিরবার সময রকীবা যেন আব হাঁটতে পাবে না। অভূতপূর্ব একটা উত্তেজনা। দুয়ারে দুয়াবে ভিক্ষা করে বেড়ানো বা শুধু পেটে ভাতে বাত দিন গৃহস্থেব বাডী খাটনি, পান থেকে চুন খসলে অকথ্য অত্যাচার, সব কিছু যেন অনেকদিন আগেকাব দেখা দুঃস্বপ্নেব মত মনে হতে লাগল। হাওলাদাব বাডীব সেই কল্‌কী সেকাব ঘাটা পিঠে অনুভব কবতে চেষ্টা কবল। না, জ্বালা আব আছে বলে মনে হয না। দু' একদিন পবই সে মেবাজানেব জন্য একখানা দশহাত শাড়ী কিনে আনবে। একটুকবা তেনা পবে থাকে মেয়েটা। ভাল কবে পরলে নয হাতে হবাব নয। আব যা বাডন্ত গড়ন। পাডাব বদ ছোকবাবা এখন থেকেই বদনজব দেবাব তালে আছে। বুকে বুকে আগলিযে বাখে বকীবা। মান ইজ্জতই যদি না বাখা যায় তবে দুনিযাব থেকে কি লাভ!

বজলটাকে নিযেও চিন্তা কম নয। মযলা একটুকবা নেংটি পবে সারাদিন টো টো কবে ঘুরে বেড়ায। ঘবে থাকলে রকীবাব প্রাণে শান্তি থাকে। মেবাকে দেখবাব একটা লোক থাকে। হোক না দুধেব ছেলে। খোদাতালা যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, বজলেব জন্যও একটা লাল শার্ট আব একটা পেন্ট। পেটেব দায়ে মেবাকেও ঘবে বাখা যায় না। লোকজনেব বাড়ীতে এটা সেটা কাজকর্ম কবতে হয। বাঁধাধবা কিছু নয, তবু বকীবাব ভয কাটে না। গাঁয়ের ড্যাকবাগুলোব যা বকম-সকম।

মেহেবজানেব শাডী হযেছে। মাথায নাবিকেল তেল লেগেছে। বজলেব পেন্ট শার্ট সব কিছু।

দিন গড়িযে চলে। ধুঁকে ধুঁকে বাঁচার দিন নয, পেট ভবা, বেশ হাসিখুশীব দ্রুত চলমান দিন।

দিন কয়েক যেতেই বকীবা একদিন কালেব পিছন ফিবে তাকায। নিজেব কাছেই বিস্ময়কব মনে হয়। ভাল কবে যেন বুঝে উঠতে পারে না। কি করে বজল ও মেবা দুজনেই মায়েব সংগে কারবারে নেমে পড়েছে। নেহাৎ যেন একটা গতানুগতিক ব্যাপার। তাব প্রথম দিনেব অভিযানের মত এদের আসার কোন বৈচিত্র্য নেই। মনে রাখবার কিছু নয়।

তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের সংগে ভিড়ে গেছে। ঠিকা কাজে হাঙ্গামা যেমন কম, লাভও সেই অনুপাতে কম। তাই বা মন্দ কি, ঝক্কি যত মহাজনের ঘাড়ে।

ন'দশ বছরের বজল। ভয়ানক চটপটে। টিন হাতে সরিষার তেল আনাটা যেন তাব ধাতে সয় না। দু'এক দিন টিন নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপবই বাদ দিয়েছে, হয়তো মহাজনের নির্দেশে। ফিরবাব পথে লবণ নিয়ে আসে। দ্বিতীয় বা মধ্যম শ্রেণীব বেঞ্চেব তলায—সেব

কয়েক লবণ বিছিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। ধরা পড়বার প্রশ্নই উঠে না। যাযত শুধু মালই যাবে। গাড়ী যখন চলে বজল তখন গাড়ীব তলায়, একটা লোহাব রডেব উপর অনেকগুলি বন্ধু-বান্ধবের সংগে বিড়ি টানে। লাল পাট সিল্কের একটা রুমাল গলায বাঁধা, হাতে পিতলেব একটা আংটি। কানে আধপোড়া বিড়ি। রকীবা যখন প্রথম শুনল যে বজল গাড়ীব তলায বসে চলাফেরা কবে, ভয়ে তখন সে প্রায় কঁকিয়ে উঠেছিল। বলা যায় না কখন কি হয়। বজল মায়ের কাছে কসম কবেছে—গাড়ীব ভিতর বসেই সে যাওযা আসা করবে। কিন্তু গাড়ী যখন চলে তখন গাড়ীর নিচটা দেখবার সুযোগ থাকে না বলেই রকীবা ভাবে মা অন্তপ্রাণ ছেলে নিশ্চযই মাযেব কথা বাখছে। মেহেরজানকে বকীবা চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা কবে, কিন্তু সম্ভব আব হয কই। বেনাপোলে গাড়ী থামলেই বকীবা মেযেব খবব কবে। বকীবা প্রাযই স্মরণ কবিযে দেয—দেখিস, ঐ ছোড়াগুলির সংগে মিশবি না কিন্তু, বুঝলি?

মেবা বুঝেছে বলে মাথা হেলায়।

আব শোন, ঐ যে সেপাইগুলো, তা বেনাপোলেবই হোক, আব বনগাঁযেবই, বুঝলি, সব বেটাই বদমাসের ধাড়ী। এ লাইনে সব শেয়ালেব এক রা। খববদাব। বলে দিলাম।

উঠতি বযসেব মেবাজান বুঝে সব কিছুই।

সবসপুব ধবা সোজা কথা নয। তা ছাড়া, বৃষ্টি পডলে, বাত্রে ঘবে ঘুমানো যায না। ঝব ঝব করে পানি পড়ে।

মেবা বলে, এখন আব সে বকম অভাব নেই, ঘরটাকে মেবামত কব।

সময কোথায়? লোক লাগালে দু' তিন দিন কামাই দিতে হয। বকীবা নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দেয।

সন্ধ্যাব দিকে আর বকীবা ঘব থেকে বের হয় না। মাঝে মোল্লা পাডাব মজিদ আসে। অবস্থা মন্দ নয। টিংটিঙ চেহাবা। শেযালের মত পিটপিটে ধূর্ত চোখ। সারা গাযে পাঁচডা না'কি, লোকে বলে খাবাপ ব্যাবাম। কোন জন্মের কুটুম্বিতা নেই, ঘেন্নাই কবেছে হয়ত, এতদিন, এখন বলে—চাচি আছ কেমন? আর আডচোখে মেহেবজানের দিকে তাকায়।

বকীবাব হুকুম আছে—ঐ ছোকরা মজিদ এলে, খববদাব বলে দিলাম— ঘোমটা তুলবি না।

মেবা ঠোঁট বাঁকিযে বলে, তা এই ঘেয়োটাকে ঘরে ঢুকতে দিস কেন? মেয়ে ও ছেলের হাত ধরে, রকীবা নাভারনেব তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় এসে উঠল। তালেব মিয়ার-ই কাজ কবে সে। এই লাইনে যারা কাজ করে, তারা অনেকেই থাকে মহাজনের আশ্রয়ে। কেউবা ইস্টিশনে, প্লাটফবমে, কিংবা কোন দোকানের বারান্দায, রকীবাই ছিল দূবে। গরীব বলেই শুধু গ্রামে এত লোকেব মাঝে নিজের ভিটায় থেকেও ছিল নির্বান্ধব। এদের মাঝে এসে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চারিদিকে শ'য় শ'য় যেন আপনার লোক। জমিলা, নন্দ, নিখিলের মা, জৈতুন এবা সবাই যেন কতকালের আত্মীয়। ব্যবসাযীরা নাকি মিলেমিশে থাকতে পারে না অথচ আশ্চর্য, এরা সকলে একই কারবার করে কিন্তু অভিন্ন আত্মা। সুখে দুঃখে খবর করে, লাইনে কোন্ দিন কোন্ অফিসার চলে, কোথায কিভাবে টিপলে কি ফল পাওয়া যায় সবাই সবাইকে বলে। দিল খুলে আলাপ আলোচনা করে। আশে পাশে সারা রাতেই প্রায় বাতি জ্বলে। খোলা বারান্দায়ও যেন ভয় নেই আর। গাড়ী ধরারও নেই তাড়াহুড়া।

বয়স যেন আর তাল সামলাতে পারছে না। মেরার শরীরের গড়ন বয়সকে পিছনে ফেলেই এগিয়ে চলেছে।

বেনাপোলে বনগাঁয়ে লাল করে পান খায় মেরাজান। রকীবার একদিন চোখে পড়ে গেল। দু'জন সেপাই মেরাজানের খুব কাছাকছি দাঁড়িয়ে। একজন বনগাঁয়ের আব অন্যজন বেনাপোলের। প্রায় সব সেপাইরই মুখ চিনে রকীবা। এদেব কাছে পাকিস্তান হিন্দুস্থান সব

এক। একজন সেপাই সরে গেলে পরে রকীবা জোর পায়ে এগিয়ে গিয়ে খপ করে মেরাজানের চুলেব মুঠি ধরল।

মেরাজান চমকে উঠল।

হিড় হিড় করে লোহার বেড়াটাব কাছে টেনে এনে রকীবা চাপা গর্জন কবে উঠল—হারামজাদী, এই সেপাই ষণ্ডা দুটোব সংগে কি কবছিলি?

মুখেব উপর কোন দিন মেবা উত্তব দেয় না, কিন্তু আজ দিল—তোব সব তাতেই সন্দ'। এত লোকের মাঝে চুল ধবে টানাটানি কবিস না বলছি।

বকীবা কিছুটা থতমত খেয়ে গেল।

মেহেবজান ততক্ষণে সামলিয়ে নিয়েছে।

—বুড়ি হয়ে গেছিস, তাল মান টের পাস না। এদেব সঙ্গে খাতিব রাখতে হয।

— তোব খাতিব ধুযে পানি খা গে, যা। হাজাব বার কবে মানা কবেছি, হাবামজাদীব কানে যায় না। ওই ড্যাকবা হাত বাড়িযে তোকে কি দিচ্ছিল?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেবা বোধ হয় উত্তর ঠিক করল। —বাঃ বে, ও আবার কি দেবে! পান কিনেছিলাম, ওবাই বলল পান খাওযাতে। তাই দিয়ে দিলাম একটা। আমিই ত দিলাম। পুলিশের লোক আবাব কাউকে কিছু দেয় নাকি কোন দিন?

—কাজ নেই বাপু পান খাওযানোব। একটু বুঝে সুঝে চলিস— বকীবা দবদ মিশিযে বলে।

মাঝে মাঝে, মাসে দু' মাসে, অনেকগুলি সেপাই আব বর্ডাব পুলিশেব বড সাহেবেবা এসে হানা দেয। ধবপাকড় হয, মাবধব লাগে, কিন্তু কপালগুণে বকীবাব কিছু হযনি। একদিন ব্যবস্থাটা হল বড় কড়া বকমেব। অন্যান্য দিন আগে থেকেই কিছুটা আভাস পাওযা যেত কিন্তু সে দিন হঠাৎ যেন পৌষেব আকাশে মেঘ ডেকে উঠল। গাড়ীব পেছন দিযে নামতেই, লোহাব বেড়াব অপর পাশেব জংগল থেকে অনেকগুলি সেপাই মাথা তুলে দাঁড়াল। ক'জন বেড়া টপকিয়ে প্লাটফবমেব ভেতর এসে পড়ল। হাতে লাঠি। যাকে ধবে তাকে দু'এক ঘা লাগায। হুলস্থুল ব্যাপাব। বকীবা স্তম্ভিতের মত পেটে বাঁধা সুপাবীব থলেটাব উপব হাত বেখে এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ নজবে পড়ল একজন সেপাই বজলকে দৌড়িযে ধববাব চেষ্টা কবছে। বজল লাফ দিল। তাব পা-টা লোহার পাতের মাথা চোখা বেড়াব উপরটা অল্প স্পর্শ কবল মাত্র। বকীবাব বুকটা ধড়াস কবে উঠল, বজল ততক্ষণে বেড়াব অপব পাশে জংগলের মাঝে তালগোল পাকিযে পড়ে গেছে। হতভম্ব বকীবা পাগলেব মত বেড়াব দিকে দৌড়াল। পবক্ষণেই তাব পিঠের উপব লাঠির একটা প্রচণ্ড আঘাত।

সেদিন আর রকীবাব বনগাঁ যাওযা হল না। সুপাবী, তেলেব টিন, ট্যাকে যা কিছু ছিল সর্বস্ব দিয়ে তবে নিস্তার। বকীবার মাথা টন টন কবছে। পিঠে জ্বালা আব ব্যথা। হাত দিলে টেব পাওয়া যায় পিঠেব চামড়া যেন বাইন মাছের মত হয়ে ফুলে উঠেছে। প্লাটফরমেব উপরই সে আঁচল বিছিযে শুযে পড়ল।

ফিবতি গাড়ীতে যারা বেনাপোলে নামল তাদের দেখে রকীবাব মনে হল কেউই কমেনি। অন্যান্য দিনের মত পুবা দলটাই ফিরে এসেছে। এদেব সংগেই মেবা ও বজল গাড়ী থেকে নামল।

রকীবা ছুটে গিয়ে বজলকে বুকে জড়িয়ে ধবল। পিঠে মাথায় হাত বুলিযে বলে—কোথাও লাগেনিত রে?

কানের আধপোড়া বিড়িটা ধরাতে ধরাতে বজল জওয়াব দিল—দূর, লাগবে কেন? দেখেছিলি না কি—আমার লাফ দেওয়াটা? বাবা, কত পেট্রিস করে শিখেছি। পুলিশের বাবাব সাধ্য আছে ধরবে!

নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফিল্মী কায়দায় ভংগী করে বজল।

ছেলের বীরত্বে রকীবাও যেন কিছুটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

মেবা মায়ের কাছে এগিয়ে এসে পান চিবাতে চিবাতে বলে, — দেখি মা তোর কোথায় লাগল?

পরম স্নেহে মায়ের পিঠে বা হাতটা বুলায় মেবাজান।

বকীবা চুপ কবে থাকে।

কিছুক্ষণ পব, মেরা আঙ্গুলের ডগা হতে বাড়তি চুনটুকু দাঁতে কেটে নিয়ে ঠোঁটটাকে একটু বাঁকিয়ে বলে—মা, তোবও যেমন, বললে তো শুনবি না। বলেছিলাম না, খাতিবে কাজ হয। দেখলি, ধরতে পাবল আমাকে? ফিক ফিক করে মেরা আত্মপ্রসাদে হেসে ওঠে।

বাগ কবে বকীবা—ঝাড়ু মারি অমন খাতিবেব মুখে। মুখপুড়ী, দাঁত সিটকাবী না বলছি।

তেবছা কবে হেসে মেবা বলে—তা হলে পড়ে পড়ে মাব খা'। যেমন আক্কেল।

বাড়ন্ত শবীবে একটা ঝাকানি দিয়ে মেবা টিন হাতে সরে পড়ে।

তালেব মিযা মহাজনেব বারান্দায শুযে শুযে বকীবা পিঠেব ব্যথার কোঁকায় আব ইস্টিশনের দিকে চায়। ঘুম আসে না। বজল পাশে শুযে নাক ডাকায। মেবাজান আজ আব ফিরেনি। সেই যে বেনাপোলে দেখল, ফেবাব আব পাত্তা নেই। জমিলা, জৈতুন এদেব প্রায় সকলেব কাছেই বকীবা খবব নিয়েছে কিন্তু সঠিক খোঁজ কেউই দিতে পাবেনি। যে ব্যাপাবীব ঠিকায মেবা কাজ কবে তার লোকজনেব কাছেও খবব নিযেছে। মেবা নাকি নন্দব কাছেই বেনাপোলে মাল সমঝিযে দিয়ে কোথায সবে পড়েছে। নন্দকেও খুঁজে পায়নি বকীবা। সে নাকি কিছুটা বাড়তি লবণ এনেছিল। তাই নিযে একেবাবে যশোব চলে গিযেছে। নাভাবনের কাজটা ঠিকমতই সেবে দিযে গেছে। বেশ লেখাপডা জানা ছেলে নন্দ, কিন্তু কেমন যেন পাগলাটে পাগলাটে।

বাত যতই বাড়তে লাগল, পিঠেব বাথা ছাপিযে ততই মেবাজানের জন্য বকীবার দুশ্চিন্তা বাডতে লাগল। যদি খাবাপ লোকেব পাল্লায পড়ে থাকে? কাস্টমেব অফিসারগুলি একদিক থেকে মন্দ নয়। এদের নিযে বড মাথা ঘামায় না। তাবা আছে তাদেব তালে। গাড়ী শুধু তল্লাশীই কবে। কি যে পায তারাই জানে। খুব ভাল লোক কি না তাই বা কে বলতে পাবে? সন্দেহ জাগে বকীবাব মনে। ব্যাপাবীব দালালদেব সংগে হযত যোগসাজস আছে, তাই বা কবে না। কিন্তু ঐ যে সেপাইগুলি, তা বনগাঁযেবই হোক আব বেনাপোলেরই হোক, ভালোব ভালো আব খাবাপেব খাবাপ। দু' দেশেব হিন্দু মুসলমানে এত যে মারামারি কাটাকাটি, এদেব কাছে কিছু নয়। কেমন মিলঝিল। খাও দাও আব ফুর্তি কব, মাঝে মাঝে শুধু খববদাবী আব পযসা কুড়ানো। কোন্ মেয়েব গতবটা একটু ভাল তাই খোঁজ নেওযা; তা এপাবেই হোক আর ওপারেই হোক। অবশ্য সাড়ে সতেবোয়া একদিন বড় সাহেবরা এলে তোডজোড কবে লাঠির কেবদানী দেখানো। এদেব বিশ্বাস করা যায না। বদমাযেশের হাড্ডি সব। বিয়ে শাদী একটা মেবার না দিলে, মান-ইজ্জত আর রাখা যাবে না। বিয়ের কথা মনে পড়ায় বকীবাব মনে অনেকটা স্বস্তি জাগে। দু'একদিন কথাটা কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনাও করেছিল, কিন্তু এক নন্দ ছাড়া সবাই বলে, আবও বড় হোক। নন্দ ছেলেটা লেখাপড়া জানে বলে মনে হয়, বড় বড় কথা বলে। বোধ হয় বই পুঁথির শেখা কথা। একদিন নিজেই সে বলেছিল— চাচি, তোর মেহেরকে বিযে দে। হিন্দু মুসলমান যাই হোক, ছেলে একটা হলেই হল। আমাদের আবার জাত বেজাত কি? আগের কালে হিন্দুদের কাজ দিয়ে জাত ঠিকহত। কিছু দিন পর দেখবি—বনগাঁয়ে বেনাপোলের আমরা সবাই একজাত হয়ে গেছি। আমার ছেলে বা নাতির নাম হবে অমুক চন্দ্র স্মাগলাব। এমনি সব পাগলাটে কথা। সব কথা গুছিয়ে

রকীবার মনে পড়ে না। কিন্তু যে যাই বলুক, মেয়ের শাদী নিয়ে কথা—জাত বেজাতের প্রশ্ন আসে বৈকি। জাত ধর্ম তো আর দেশ থেকে উঠে যায়নি। এখনও চন্দ সুরুজ উঠে। রকীবা ভাবে, নন্দর সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে কাল আরেকবার আলোচনা করবে।

রাত তিনটার গাড়ীর ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রকীবা উঠে ইস্টিশনের দিকে পা বাড়াল। এই গাড়ীতেও মেরা আসতে পারে।

আসুক হারামজাদী আজ। এত রাত বাইরে থাকা বের করছি। রকীবা মনে মনে গরজায়।

মেরা সত্যি সত্যি গাড়ী থেকে নামল। ঢুলু ঢুলু চোখ, শ্লথ গতি, কেমন যেন খোঁড়ার মত পা টেনে টেনে প্লাটফরমের বাইরে বেরিয়ে এল। রকীবা একটু অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। মেরা বাইরে আসতেই খপ্ করে খোপাটা চেপে ধরে চাপা গলায় গর্জিয়ে উঠল।

—হারামজাদী, বল— খোপাটা চেপে ধরে চাপা গলায় গর্জিয়ে উঠল।

হারামজাদী,বল, কোথায় ছিলি?

মেরা বোধ হয় এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতই ছিল, ভড়কাল না। বরঞ্চ বেশ তিক্ত গলায়ই জবাব দিল— যেখানেই থাকি, তোর কি?

রকীবার মাথায় যেন খুন চড়ল। চটপট পিঠে মাথায় কিল-চড় চালাতে শুরু করল।

হারামজাদী খান্‌কী, মান-ইজ্জত আর রাখলি না।

মেরা ফোঁপাচ্ছিল, ঘোঁৎ করে উঠল—ও বড় ইজ্জতওয়ালার চোরাই কারবার করেন—আবার মান।

কথা কইস না হারামজাদী, সারাদিন ছিনালী করে আবার তেজ দেখায়। খবরদার আমাকে আর মা বলে ডাকবি না। বারান্দায় আর উঠবি তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

থপ্ থপ্ করে পা ফেলে নিজের জায়গায় গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ল। মেয়ের চরিত্রহীনতার অপমানে সারা অঙ্গে যেন সে বিছুটির জ্বালা অনুভব করছে। এমন মেয়ে পেটে ধরেছিল বলে তার নিজের সত্তাটাই যেন অপবিত্রতার গ্লানিতে কালো হয়ে উঠেছে।

অনেকক্ষণ পর টের পেল মেরা এসে ছোট ভাইয়ের কাছে শুয়ে পড়েছে। রকীবা চোখ মেলল না। একটা বোবা করুণা অবসাদের আকারে তাকে চেপে ধরে ঝিম লাগিয়ে দিয়েছে। সে নড়তেও পারল না। একখানা হাত রকীবার পিঠে পড়ল। ফোলা জায়গাটায় মেরা হাত বুলাচ্ছে। কাঁচের চুড়িগুলি টুনটান করে বাজে। রকীবা নির্জীবের মতই চুপ করে রইল।

এই মা, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

রকীবা চুপ।

খুব লেগেছিল, না-রে?

রকীবা উঃ করে শব্দ করল।

জানিস মা, ওই যে কপালে মোটা আচিলওলা সাদেক আর বনগ্রামের সুরেন্দ্র,—তারা বলেছে, আমাদের কোন ভয় নেই। বিপদে আপদে তারাই দেখবে।

পেট্রলের মধ্যে জ্বলন্ত দেয়াশলাইর কাঠি ফেলে দিলে যেভাবে দপ করে জ্বলে উঠে, রকীবার মগজও যেন সেইভাবে জ্বলে উঠল। অন্ধকারে হাত নাড়ার সময় একটা আধপোড়া চেলার গায়ে হাত লেগেছিল—নিঃশব্দে তাই তুলে দমাদম মেরাজানের উপর চালাতে লাগল। চিৎকার করে মেরা অন্ধকারের ভিতর মিশে গেল। ঘুমন্ত বজলের উপরও দুই এক ঘা পড়েছিল, সেও কেঁদে উঠল। রকীবা সুর তুলে অশ্রাব্য ভাষায় মেরার উদ্দেশ্যে গাল পাড়তে লাগল। সোরগোলে লোকজন উঠে পড়েছিল, তারা এসে জোট পাকাল। রকীবাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল।

বাকী রাতটুকু রকীবা আর ঘুমাতে পারল না। বজলকে বুকের মাঝে চেপে ধরে পড়ে রইল। চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। কিসের দুঃখ তার। রকীবা নিজের মনকেই প্রশ্ন করে। যে মেয়ে মান-ইজ্জতের ধার ধারে না, তার সংগে কিসের সম্পর্ক? সে যেখানে খুশী যাক, রকীবা আর তার মুখ দেখবে না। মেয়ের ইজ্জত বন্ধক দিয়ে পয়সা রোজগার করবার আগে যেন তার মরণ হয়। মেরাজান তার মেয়ে নয় ঃ কোন খান্‌কীর মেয়ে হয়ত ভুল করে তার পেটে এসে জাযগা নিয়েছিল কে জানে। ভোরের দিকে রকীবার চোখ দুটা জড়িয়ে এল।

চলন্তি গাড়ীতে বসে, প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে সুখ-দুঃখের কথা হয়। একদিন জমিলা বলে—মেরাকে কি সত্যি বিদায় করে দিলি নাকি? এই লাইনে এসব ধরলে চলে না। হাজার হোক পেটের মেয়ে তো। বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া ধন। গুম হয়ে থাকে রকীবা কিছুক্ষণ, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে—একটা কথা এতদিন তোকে বলিনি বু', মেবা আমাব পেটের মেয়ে নয়। বিন্নাব ঝোপে কুড়িযে পেযেছিলাম।

শেষেব কথাগুলি খুব কষ্টে উচ্চাবণ করে বকীবা। গাড়ী চলাব খট খট শব্দে গলার আওযাজেব বিকৃতি হযত জমিলা ধবতে পাবেনি। শাড়ীব আঁচল দিয়ে বকীবা দু' চোখ চেপে ধবে। এক গাড়ী লোক। পাযে পায়ে ঠাসা। একটা কঁকিযে উঠাব শব্দ জমিলাব কানে যেতেই সে ব্যগ্র হযে প্রশ্ন কবল—কি হল বকীবা। আঁচলেব মধ্যেই মুখ বেখে রকীবা জবাব দিল—কিছু না, চোখে কযলা পড়েছে।

তালেব মিযা মহাজনের বাবান্দায শুযে বাতেব আঁধাবে বজলকে বুকে চেপে ধরে বকীবা চোখেব পানি ফেলে। আঁচল আব চাপা দিতে হয না। মেবা গেছে—যাক। বজল ওব সোনামাণিক। ঘুমন্ত বজলেব মুখটা নিজেব বুকেব উপব চেপে ধবে। যেন কোলেব শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

একদিন বেনাপোলেব ডিস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে গাড়ীটা থামতেই হৈ হৈ একটা বব উঠল। একটি ছেলে কাটা পড়েছে। নীচেব বডে বসে আরেকটি ছেলের সংগে বিড়ি নিয়ে ঝগড়া কবছিল। ফল যা হবাব হয়েছে। এতগুলি লোকেব মুখে মুখে ছেলেটার পরিচয় তালগোল পাকিয়ে হোঁচট খেতে খেতে বকীবাব কানে যখন পৌঁছল তখন গাড়ী আবাব চলতে শুরু করে দিয়েছে। শফিক, মনীন্দ্র, না হয বজল। এই তিনজনের মধ্যেই একজন। ঘটনা ঘটেছে দুই দেশেব সীমানাব পাথবটার কাছে। তেলেব টিনটা হাতে নিয়ে রকীবা পাথবেব মত দাঁড়িযে বইল। যে যাব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে উঠে পড়ল। চলন্ত গাড়ী থেকে কয়েকটি কণ্ঠ চিৎকাব কবে উঠল—ও রকীবা, তাড়াতাড়ি উঠে আয। জলদি কর।

বকীবা পাথব।

গাড়ীটা যখন অনেকখানি এগিযে গেল, রকীবা তখন হাতেব টিনটা সেখানেই ফেলে উর্ধশ্বাসে লাইন ধরে বনগাঁযেব দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল।

শুধু রক্ত আর রক্ত!

মানুষ বলে চিনবার যো নেই। থেতলিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বীভৎস আকার ধারণ করেছে। মনীন্দ্রেরও হতে পারে, শফিকেরও হতে পারে। হঠাৎ নজরে পড়ল একখানা অক্ষুণ্ণ হাত আর সেই হাতের আঙ্গুলে পিতলের আংটি। রকীবা আর কিছুই টের পায়নি, শুধু সমস্ত রেললাইনটা যেন ঘুরতে ঘুরতে একটা রক্তের বন্যার মত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

পাশের গ্রামের একটা পড়ো দালানের দাওয়ায় অসুস্থ অবস্থায় ক'দিন পড়ে ছিল রকীবা। হয়ত কোন সহৃদয় গ্রামবাসী লাইন থেকে উঠিয়ে এনেছে। টের পায়নি।

রকীবা ভাবে—মেরাজান খবর পেলে নিশ্চয়ই ছুটে আসতো, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনেব গলাটা টিপে ধরে ভাবনাটার দম বন্ধ করে মাবতে চায়। না, না, মেহেবজান বলে কেউ তাব কোন দিন ছিলই না। ধুঁকে ধুঁকে মরবে—সেও ভাল।

এই ক'দিনেই যেন বয়স তার দশ পনর বৎসর বেড়ে গিয়েছে। পিঠটা বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। ভর না দিয়ে ভাল কবে চলতে পারে না। বাস্তাব পাশ থেকে একটা বাঁশের টুকবা কুড়িয়ে তাতেই ভর দিয়ে রকীবা কোণাকোণি পথে ভিক্ষা করে তিনদিনে সরসপুরে এসে পৌঁছল।

নিজের ঘরটাব শুধু ভিটির চিহ্ন আছে আর কিছুই নেই, শুধু একটা পোতা। ক্লান্ত বকীবা পোতাব উপর বসে পড়ে বজলের মৃত্যুর পব এই প্রথম চোখেব পানি ফেলল।

কাজ পাবার আশায় বাড়ী বাড়ী ঘুবে রকীবা। যেখানেই যায সেখানেই প্রশ্ন হয—আঁচল দিয়ে চোখ মুছে রকীবা উত্তর দেয—মবে গেছে।

আহা-হা, কি কবে ম'ল?

গাড়ীতে কাটা পড়ে।

সবাই আহা-হা করে, কিন্তু চাকবি দেয় না কেউই। হযত বা সাত কলস পানি আব দুটা ঘব লেপানোব বদলে দেয় আধ থালা পান্তাভাত।

প্রথম দিনেই বেনাপোলে চোখে পড়ল মেবাকে। চেনা যায না যেন। নূতন লাল সবুজ চেকশাড়ী ব্লাউজ। একপোচ পাউডাবও হয়ত লাগিযেছে পুষ্ট মুখেব উপব। চোখ ফিবানো যায় না। রকীবা চোবেব মত সন্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চায—বিদ্রোহ-কবা মনটা হযত পাহাবা দিচ্ছে। কখন ধবা পড়ে যায কে জানে।

পুবানো পবিচিতবা ছেঁকে ধবে।

ছিলি কোথায এ্যাদ্দিন?

এমন হলো কি করে?

রকীবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জওয়াব দেয়—যাব কোন চুলায! অসুখ কবেছিল।

গাড়ীটা ছাড়ছে না। কাস্টমের চেকিং শেষ হযে গিয়েছে, তবু কেন দেবী কবছে কে জানে।

রকীবা প্লাটফবমের পেছন দিকে— বেলিং-এব কাছে একটা নুড়িপাথবেব স্তূপেব উপর একা একা বসে সুপাবী চিবাচ্ছিল। পিছন থেকে মেরা এসে তাব পিঠে হাত বাখল।

বকীবা নিরুদ্বিগ্নভাবে মাথা ঘুরাল।

এ্যাই মা।

প্রকম্পিত করুণ অথচ মিষ্টি দুটা শব্দ। বহু বছবেব পবিচিত।

অন্তরেব নিরুদ্ধ মণিকোঠার গলা টিপে বাখা অন্ধ মাতৃত্বটা যেন সশব্দে ঝলকিযে উঠে আত্মপ্রকাশ কবল।

মেরা!

কিন্তু পরমুহূর্তেই ঝটতি বেগে উঠে দাঁড়িয়ে ফেটে পড়ল—ছিনালীর আব জাযগা পাস না! মা ডাক গিয়ে যে বেবুশ্যে তোকে পেটে ধরেছিল, তাকে। কোথাকার কোন আস্তাকুঁড়েব ময়লা—আমাকে বলে কিনা মা!

রকীবা একটা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে সামনের দিকে হন হন কবে এগিয়ে গেল।

দু'একজন ব্যাপারটা দেখে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। পিছু ধাওয়া করে রকীবাকে জেরা শুরু করল। সে একটি প্রশ্নেরও জওয়াব দিল না। রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দশটার গাড়ীতে যাওয়া আর পাঁচটার গাড়ীতে ফিরে আসা। জীবন সংস্থানের দুরূহ পরিক্রমা।

শরীরে যথেষ্ট বল হয়েছে। আর কিছু না হোক, দু'মুঠা ভাত তো পেট ভরে খাওয়া যায়।

আজকাল সকলেব মুখে মুখে একটা কথা ঘুরে ফিরছে। সেপাইরা নাকি গুলি করে চোরাকাববাব বন্ধ করবে। কাগজে নাকি লিখেছে। কেউ বলে গুলি কবে ধরবে। নানা মুখে নানা কথা। তবে গুলি যে করবে এই সত্যটুকু সবার মুখেই এক — শুধু সময়ের তফাৎ। মহাজনেবা বলে— করুক দেখি, কত গুলি কবতে পাবে। বন্দুকেব নলেব মুখেও ছিপি আঁটা যায়, বুঝলি? চান্দির ছিপি। তোরা কিচ্ছু ঘাবড়াবি না।

বকীবাব ভয় হয়, গুলির ভয়। কিন্তু পবমুহূর্তেই ভাবে —করুক না গুলি। চুইয়ে চুইযে তো রক্ত পড়বে না—বজলের মত হয়ত লহমাব মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। তা ছাড়া এত শ'তে বিশতে যদি ভয় না পায, তবে সেই বা পাবে কেন! গুজবটা উঠাব পর থেকে কমেছে নাকি কেউ। না লাইন ছেড়ে দিয়েছে?

কিন্তু সত্যই একদিন ঝামেলা বাধল। বেনাপোলে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গেই ধুম ধুম কবে শব্দ হল। লোকজনেব চিৎকারে প্লাটফরম মুখরিত হযে উঠল। ছেলে মেয়ে বুড়া বুডী যোয়ান সকলেই প্রাণ হাতে কবে বিশৃঙ্খলভাবে ছুটাছুটি কবছে। হাটের মধ্যে একটা পাগলা মহিষ ঢুকে পড়লে যে বিক্ষিপ্ততাব সৃষ্টি হয় তেমনি যেন একটা কিছু হযেছে। বকীবা গার্ডেব গাড়ীর সঙ্গে লাগানো একটা কামবায় ছিল। মাটিতে নেমে হতভম্বেব মত গাড়ীটাব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িযে বইল। সন্ত্রস্ত চিৎকাব কলববেব মাঝে গুলি গুলি শব্দেব কাটা আওযাজ। বকীবাব বুকে আত্মবক্ষাব আকুল মত্ততা, চোখে মৃত্যুভযেব বিভ্রান্তি।

বেলিং যেখানে শেষ হযেছে সেদিকে সেপাই সান্ত্রী যেন অপেক্ষাকৃত কম। লোকজনও যেন সেদিকে দৌড়াচ্ছে না। এই কি সুযোগ। ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালনে হঠাৎ বকীবাব নজবে পডল ইস্টিশনেব প্লাটফবমেব একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মেবাজান এক সেপাইব সঙ্গে হেসে হেসে কি আলাপ করছে। মুহূর্তে বকীবাব মনে পড়ল মেবাব সেই কথাগুলি— "তারা বলেছে, বিপদে আপদে তাবা দেখবে, আমাদেব কোন ভয নেই।"

না, না, মবণ— সেও ভাল। পেটেব মেযেব যৌবন বেচে বেঁচে থাকতে চাই না।

ধুম ধুম কবে আরও কটা শব্দ হল। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পড়ে গেল। এমনিই কি সব লাল হযে যাবে। সীমানাব পাথরেব কাছে লাইন স্লিপাব, পাথবের মত। বকীবা হাতেব টিন ফেলে দিযে উর্ধ্বশ্বাসে বেলিং-এব শেষ মাথা পাব হযে পাশের ঝোপেব দিকে দৌডাল। এক জাযগায হোঁচট খেযে সে পড়ে গেল। না উঠে এই জায়গায লুকিযে থাকলেও হয। কথাটা মনে পড়তেই দেখল একজন সেপাই তাবই দিকে ধাওযা কবেছে, হাতে লাঠি না বন্দুক কে জানে। বকীবা মবিবাঁচি কবে দৌডাতে লাগল। পরনের কাপড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, কাঁটায লেগে অনেক জায়গায রক্ত ঝবছে— সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কয়েক পা যেতেই ঝোপের ভেতব থেকে আরেকজন সেপাই তার দিকে ঝাঁপিযে পড়ার মত এগিয়ে এল। লহমাব মধ্যে বকীবা চিনতে পারল—কপালে সেই মোটা আঁচিল—কি নাম যেন তাব! হাতে কি বন্দুক?

রকীবা রুদ্ধনিশ্বাসে অতি কষ্টে যেন চিৎকার করে উঠল, "আমি, আমি মেরাজানের মা। চিনতে পারছ না!"

ছেদ

আবু রুশ্‌দ

আর পারা যায় না। নঈমা নিত্য গঞ্জনা দেয় ঃ নিজের বউ ছেলেকে খাওযাবার মুরোদ নেই, মরদ হয়ে জন্মেছিলে কেন?

মরদ হযে জন্মালেই যে সব সময বউ ছেলেকে খাওযাবার মুরোদ হ্য এই ধারণা নঈমা কোথা থেকে পেলো সে-ই শুধু জানে। তবে কেরাণীর চাকুরী করে নজমুল যে বউ ছেলেকে যথেষ্ট পরিমাণে খাওযাতে পারে না এটা ঠিক।

দশ বছর হল তাদের বিয়ে হযেছে— ছেলেমেয়ে হয়েছে চারটি। প্রথম ছেলেটা নঈমার বাপের বাড়ীতে হযেছিল। ছেলা হওযার সব কিছু খরচ তাঁরাই করেছিলেন। পরের তিনটির জন্য সেখান থেকে তেমন সাড়া না পাওয়ার দরুন দাইযেরই শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। শেষের তিন বারের কোন বারই নঈমা একসঙ্গে দশ বার দিনের বেশী বিছানায থাকতে পারেনি। দরকার হলেও বা ইচ্ছে করলেও সংসারের ঝামেলা তা হতে দেযনি।

অথচ, এখানেই খোদার বহুমতের আভাস, নঈমার শরীরটা এখনও অটুট। এমন কি কোথাও একটু ভাঁজ পড়েনি। কি করে কম খেযে নিত্য অভাবের সঙ্গে যুঝে নঈমা তার শরীরটা এখনও ঠিক রেখেছে নজমুল তা বুঝতে পারে না।

অবশ্য নঈমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় ইউনিভার্সিটিতে এম এ পড়ে—মাঝে মাঝে বিস্কুট-লজেন্স নিযে আসে। সেগুলি তো বাচ্চারাই খায। আর নঈমাও যদি চুপি চুপি সেগুলোতে ভাগ বসিয়ে থাকে, তবে শুধু তাতেই তো তার দেহে এত পুষ্টি আসবার কথা নয়।

নিজের দেহ সম্বন্ধে, এই এত অভাবের সংসারের মধ্যে নঈমা বেশ সচেতন। বাজার খরচা থাকুক বা না থাকুক তার নারকেল তেল চাই-ই। নঈমাকে মাথার চুল শুকনো রাখতে নজমুল খুব কম দেখেছে।

একবার সপ্তাহখানেক এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। সেবার বড় ছেলে খালেদ, বযস যখন তার বছর চারেক হবে, শীতে প্রায় সারাদিন শুধু একটা ছেঁড়া গেঞ্জী পরে থাকবার দরুন, কঠিন অসুখে পড়েছিল।

প্রথম তারা চালিয়েছিল হোমিওপ্যাথি—পয়সা কম লাগে বলে। তবে রোগের যখন তাতে কোন উপশম হল না তখন বাধ্য হয়ে এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার তারা আনিয়েছিল, বহু কষ্টে ধার জোগাড় করে।

ডাক্তার বললো নিউমোনিয়া। তবে সময় মত ধরা পড়াতে ভয়ের কিছু নেই।

সেবার একসঙ্গে সাতদিন নঈমা মাথায় তেল দেবার কথা ভাবতে পারেনি। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছেলের সেবা করেছিল। চুলে তখন তার বেশ জট ধরে ছিল বটে, তবে সেবার তা মা হিসেবে তাকে দেখতে নজমুলের চোখে আরও যেন ভাল লেগেছিল।

এক রাতে খালেদের অবস্থা খুব খারাপের দিকে গিয়েছিল। ডাক্তার আবার ডাকা হল, ইনজেকশন দেওয়া হল, ওষুধ আনা হল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রায় সারারাত জেগে অসুস্থ ছেলের সমস্ত খুঁটিনাটি প্রয়োজনের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল।

নঈমা তাকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিতে বলেছিল—সারারাত জেগে শরীর যদি আবার ভেঙে পড়ে তবে আর এক মুসিবত।

—ঘুমোনো তোমারই বেশী দরকার। নইলে একা মানুষ এত ঝামেলা পোহাবে কি করে? স্বামীর কথা শুনে নঈমা হঠাৎ রেগে উঠেছিল ঃ নিজের ছেলের সেবা করা ঝামেলা নাকি?

—তাই বললাম বুঝি, সংসারের কাজও তো আছে। জবাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে নঈমা হঠাৎ স্বামীর খুব কাছে সরে এসে ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে কম্পিত স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ ছেলে আমার বাঁচবে তো।

স্ত্রীকে বাঁ হাতে বেষ্টন করে নজমুল গভীর আশ্বাসের স্বরে অভয় দিয়েছিল ঃ আরে বাঁচবে না কেন, আজকাল নিউমোনিয়াতে লোক কি আর সহজে মরে? কত ভালো ওষুধ বেরিয়েছে।

ছেলে ভাল হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সে নৈকট্যবোধ আর বেশী দিন থাকেনি। আবার সেই দিনের পর দিন অভাব। ছোট মেয়েটা একেবারে দুধ পায় না, মেজছেলের কামিজটা এত জায়গায় ছিঁড়েছে যে আর তালি দিয়েও পরবার উপায় নেই। নঈমার নিজের পরনের শাড়ী দুটোয় এসে দাঁড়িয়েছে—তার একটা আবার ছিঁড়ি ছিঁড়ি করছে।

অবিরত অভাবের এই ফিরিস্তি শুনে নজমুল এক একবার খেপে উঠতো ঃ পয়সা কি আমায় চুরি করতে বলো?

—তা আমি কি জানি, নঈমা উল্টো ঝেঁঝে উঠতো, তবে পয়সা কামাই করা তো মেয়েদের কাজ নয়।

—না ই বা কেন? শুধু পুরুষের ওপরই সমস্ত ঝক্কি পড়বে কেন, তুমি কিছু আয় করতে পার না? শেষের দিকে নিজের অজান্তেই নজমুলের গলার আওয়াজ একটু বেঁকে গিয়েছিল।

—কিভাবে আয় করবো! পথ বাৎলে দাও না।

—কেন, সেলাই-টেলাই তো করতে পার।

—ওবে আমার মরদ রে, সেলাইয়ের দশটা কল যেন আমায় কিনে দিয়েছে! শরম হয় না নিজের দোষ অন্যের কাঁধে চাপাতে?

তার ভেতরটা তেতো হয়ে উঠলেও এর কোন জবাব নজমুল দিতে পারতো না—তাই চুপ করে যেতো। তবে এই যে চুপ করে যেতে হয় এটাতেই সব চেয়ে বেশী দাহন। মরদ হয়ে জন্মালেও সত্যি তার মুরোদ নেই।

একদিন দূরাত্মীয়টা এসে প্রস্তাব করে ঃ চলুন দুলাভাই, আপাকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখে আসি। 'মহল' ছবিটা নাকি বেশ ভাল হয়েছে।

সিনেমা দেখবার সখ থাকলেও সে নিজে গেলে সমস্ত খরচটা বাধ্য হয়ে তাকেই দিতে হবে, এ-কথা মনে হওয়াতে নজমুল কথাটা একটু কৌশলের সঙ্গে ঘুরিয়ে নেয় ঃ না ভাই, সিনেমা দেখা কি আমাদের পোষায়, তোমার আপা যেতে চাইলে তাকে নিয়ে যাও।

আর, নজমুল কিছুটা আহত হয়ে লক্ষ্য করে, নঈমাও সহজে রাজী হয়ে যায়। কিছুটা সেজেগুজে ক্যাম্বিশের জুতো পরে রিক্সায় চড়ে দু'জনে সিনেমা দেখতে বেরিয়ে গেল—বাচ্চাদের তদারকের ভার নজমুলের ওপর ছেড়ে দিয়ে।

রাত নটায় সিনেমা থেকে ফিরে এলে নঈমাকে নজমুল বললো ঃ এভাবে যে সিনেমা যাও লোকে জানতে পারলে কি বলবে?

মধুর সরলতার সঙ্গে নঈমা জবাব দিলো ঃ ভাইয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাব তাতে দোষের কি আছে? তোমার মনটা দেখছি বড় ছোট। তারপর স্বামীকে কিছুটা প্রবোধ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললো, সত্যি 'মহল'-এ মধুবালাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে!

তাতেও নজমুল ঠিক প্রবোধ মানে না। ভাবে ঃ সে যখন নঈমাকে ছেড়ে সিনেমা দেখে না, বন্ধুরা দেখাতে চাইলেও, তখন নঈমা তাকে ছেড়ে সিনেমা দেখতে গেল কি করে! তাও পরপুরুষের সঙ্গে!

ভোরে উঠে নজমুল দেখে মেজ ছেলে বিছানা ভিজিয়েছে। ভোরের যে হাওয়া মনকে কিছুটা সতেজ করতে পারতো, প্রস্রাবের কটু গন্ধ তার সঙ্গে মিশে নজমুলের মেজাজটাকেই বিগড়ে দিলো। এ রকম প্রায় রোজই হয়। তবে গতরাতের কথা ভেবে মনটা আর সব দিনের চেয়ে একটু বেশী খিঁচিয়ে থাকে।

চিড়ে আর এক কাপ কম-দুধের, কম-চিনির, ধোঁয়ার বিস্বাদ চা খেয়ে, ভাঙা পাক-ঘর থেকে এখনও অবিরত আসা ধোঁয়া পান করে নজমুল নিজের সংসারের দিকে একবার চেয়ে দেখে।

দু'ছেলেই উদম হয়ে ঘুরছে, বড় মেয়েটির পরনে একটা ছেঁড়া জাঙ্গিয়া। ভিজে কাঁথা শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বেলা ন'টার রোদ কাঁথার আর্দ্রতা সদ্য শুষতে আরম্ভ করেছে বলেই গন্ধটা তার এখন আরও কটু। ভিজে পুরনো নোংরা কাঁথার কাপড় এখন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে।

এই তা হলে তার মাসে তিরিশ দিনের কাহিনী।

ওদিকে নঈমা আবার তাড়া দিচ্ছে ঃ খুব যে রোদ পোহাতে বসলে, বাজার করতে যেতে হবে না? ওদিকে অফিসে খেয়ে না যেতে পারলে তো আমার চৌদ্দ গুষ্ঠী উদ্ধার করবে।

মিথ্যে মিথ্যে গঞ্জনা, অভাবের দৈনন্দিন নিষ্করুণ পীড়ন, দিনে দিনে একটু একটু করে ক্ষয়ে যাওয়া। না, এ আর চলবে না। যেমন করেই হোক এ জীবন বদলাতে হবে। পরে যা ঘটুক, কুচ পরওয়া নেই। মুহূর্তে নজমুল নিজের মন ঠিক করে ফেলে।

ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের কেরানী বলে সুবিধে অনেক। প্রথম যেদিন সে দু'টাকা ঘুষ নেয় নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, যে হাতে টাকাটা নিলো তাতে কয়েকটা আধা-লাল, আধা-কাল কেঁচো ঢুকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরে তাদের পিচ্ছিল দেহ থেকে একটু একটু করে রস নিঃসৃত করে সমস্ত হাতটাকে দুর্গন্ধে ভরে দিয়েছে।

কিন্তু অফিস থেকে ফেরবার সময় বাবু বাজারের কাছ থেকে নঈমার জন্য সেদিন কিছু বেলফুল নিতে ভোলেনি।

নঈমা তাজ্জব হয়ে গেছলো। কবে যে এর আগে নজমুল তার জন্য ফুল এনেছিল, নঈমা সে কথা এখন আর মনে করতে পারে না। তবে তা নিয়ে এখন নজমুলকে গঞ্জনা দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। স্বামীকে নিয়ে এখনও নঈমার মনে কিছুটা সাধ আছে। নিজের অটুট দেহসুষমা সম্বন্ধে সে সংসারের হাজার দীনতার মধ্যেও সচেতন না হয়ে পারে না। স্বামীর তরফ থেকে আজকাল তেমন সাড়া পাওয়া যায় না বলেই ইউনিভার্সিটিতে-পড়া সেই ছোকরা আত্মীয়ের ওপর নঈমা সেটা পরখ করে মনে মনে খুশী হতো।

অথচ পরপুরুষকে নিয়ে অসতীত্বের কোন চিন্তা তার মধ্যে নেই। শুধু নজমুল যদি তাকে মাঝে মাঝে কাছে ডাকতো, কিছুটা আদর করতো, কখনও কখনও চুলের ফিতা বা অন্য কোন চুটকি উপহার এনে দিতো, তবে তার নিজের মেজাজ এতটা খিটখিটে কখনও হতো না।

আজকে রাতে শুধু কয়েকটা বেলফুল—বড় জোর সব মিলে দু'আনা দাম হবে—নঈমার নিজের চুলে বেঁধেছে। তাতেই মনে কি অঘটন ঘটে যাচ্ছে।

বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা কামরাটা ফুলের গন্ধে ভরে গেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে, অনেক দিন পরে কামনা-কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে নঈমা কয়েকটা গিনির মত উজ্জ্বল তারা

দেখতে পায়। মনটা তাতে এমন ভরে যায়। সাধ হয়, নজমুলকে নিয়ে আসমানের অঙ্গনে তারা দু'জনে ঘুরে আসে, তারাব ছোঁওযা নিজেদের মধ্যে নিয়ে।

ওদিকে নজমুলও খুশী হয় অনেকদিন পরে নঈমাকে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়ে। রাতের গোপনতায বেলফুল কতটা মাদকতা সৃষ্টি করতে পারে সেটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাব ঘুষ নেবার কথা মনে পড়ে যায—সঙ্গে সঙ্গে সেই কেঁচোর ছবি।

নঈমা লক্ষ্য করে সংসাবের ছোটখাট অভাব এক এক করে সব দূব হয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের সার্টপ্যাণ্ট এলো, মেয়েদের ফ্রক। নজমুলের একটা নতুন ঠাণ্ডা সুট, তার নিজের তিন চারটে শাড়ী।

তাতে নঈমা কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচলেও কৌতূহলও তাব মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে। একদিন নজমুলকে জিজ্ঞেস করেই বসে ঃ আজকাল এত পযসা আসে কোত্থেকে?

—আমরাও দবকাব হলে কিছু পযসা আয কবতে পারি গো। নজমুল অনেকটা দুর্বল কণ্ঠে বলে।

—আয়টা কিভাবে হয় তাই বল না কেন। নঈমা আবো পবিষ্কাব জবাব চায।

—টুইশানি কবি আব গেট-এ ওযার্ড-এ মাঝে মাঝে টাকা পাই। নজমুলেব নিজেব কানেই নিজেব কথাগুলো বড ফাঁকা শোনায।

সংসাবে সদ্য-আসা সচ্ছলতা লক্ষ্য কবে বড ছেলে মায়েব উপস্থিতিতে একদিন বাপেব কাছে এসে দাঁড়ায। পাড়ায তাবা একটি ক্রিকেট টিম কবেছে। তবে 'ব্যাট' এ পর্যন্ত জোগাড় হযনি। তাব খেলাব সাথীবা তাকে ধবেছে বাপকে বলে একটা ক্রিকেট 'ব্যাট'-এব টাকা জোগাড় কবতে পাবি কিনা। প্রথমে মাকে বলেছিলো। নঈমা জবাব দিযেছিলো ঃ তোব বাপকে বলতে পাবিস না?

তাই সাহস করে ছেলে বাপেব কাছে এসে প্রত্যাশাব ভঙ্গীতে দাঁডায কিন্তু আসল কথাটা মুখ ফুটে আর বলতে পাবে না।

নজমুল ছেলেকে অভয় দেয ঃ কি, তোমাব মতলব কি?

ছেলেব দ্বিধা দেখে মা সে কথাটি জানিযে দেয।

নিজেব ছেলেব প্রতি নজমুল সহসা গভীব মমতা বোধ কবে। বড় সুবোধ, নম্র তার এই ছেলে। কখনও তেমন কিছু আবদাব কবেনা। আজ শুধু ক্রিকেট ব্যাট-এব জন্য বাপেব কাছে আবদার কবতে এসে দ্বিধায কেমন জডসড হযে গেছে।

সারা ঢাকায় ছেলেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলাব ধুম পডে গেছে। যাদের বাপের অবস্থা ভাল, হাফ সার্ট হাফ প্যাণ্ট পবে পায়ে প্যাড লাগিয়ে হাটন কম্পটন-এর নাম উচ্চাবণ কবে বেশ অভিজাত ধরনে এই খেলার অনুশীলন কবে।

আর তার নিজের ছেলে বেচারা এ পর্যন্ত একটা ক্রিকেট ব্যাট জোগাড কবে উঠতে পারেনি!

নজমুল যখন তাকে সাতটি টাকা গুণে দিল, ছেলের মুখে সে কি পূর্ণতার হাসি। নির্ভেজাল সুখ বলে যদি কিছু থাকে, এই রকমেই শুধু তা অনুভব করা যায়। সাফল্যের উজ্জ্বল হাসিতে তার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে নজমুল পিতৃত্বের গাঢ আনন্দ যেমন নিজের মধ্যে অনুভব করে, নিজের হারানো কৈশোরের কথা মনে করে তেমনি বেদনায় মন তাব ভরে যায়।

নঈমাও আবদার জানায় ঃ স্যাকরাকে একবার ডাক দাওনা। সালেহার (বড় মেয়ের নাম) জন্য দুটা সোনার চুড়ি গড়াই।

তার কোন পরিষ্কার জবাব না দিয়ে কিছুটা রহস্যের ভঙ্গীতে নজমুল জিজ্ঞেস করে ঃ আর তোমার নিজের জন্য?

থাক অত সোহাগে কাজ নেই—পরিমিত ধরনে ঝামটা নিয়ে নঈমা বলে—আমি চার ছেলের মা, আমার এখন চুড়ি পরবার সখ নেই। তারপর কিছুক্ষণ থেমে—তার চেয়ে বরং এক কাজ কর, আমাকে আট আউন্স ভাল উল আর একটা ভাল প্যাটার্নের বই এনে দিয়ো। সামনে শীতের জন্য তোমার একটা সোয়েটার বুনে দেবো।

তাহলে ঘুষ খাওযাটা একেবারে বিফল যাচ্ছে না দেখছি। মনে মনে নজমুল ভাবে, বউ ছেলে এখন কতটা আপন মনে হয়।

ধরা পড়ল আচানক। শেষের দিকে উপরি নেওয়া নজমুলেব এতটা গায়ে সযে গেছলো যে, এ ব্যাপারে আব কোন সাবধানতা সে দরকার মনে করতো না।

সারা অফিসে মস্ত হৈ চৈ। যারা ঘুষ নিতোনা তাদের সংখ্যা অবশ্য খুব কম। তারা বেশী কিছু বক্র মন্তব্য করেনি—ঘুষ যারা হরদম খেয়ে আসছে তাদের মুখেই নীতিবাকোব খৈ ছোটে একেবারে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমাদের মুখে একেবাবে চুনকালি দিলো!

—একেবাবে ভিজে বিড়ালটি বাবা, বাইবে থেকে মনে হয় খুব যেন সাধু পুরুষ।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি সহকর্মী বফিক করে—যে দু'তিনবার নজমুলেব কাছে ধাব চেয়ে পাযনি। হয়ত সে-ই পুলিশে খবব দিয়েছিল।

পবদিনই নজমুলকে সাসপেণ্ড কবা হয।

এটা এক ধাক্কা বটে। হয়ত পরে ধবাধবি কবে নজমুল খালাস পেযে যেতে পাবে কিন্তু এই যে সে ঘুষ নেয এটা সাবা অফিসের লোক জানতে পাবলে সে লজ্জা সে ঢাকবে কি কবে?

নঈমাব কাছ থেকে এই বিপর্যযেব কথা বেশ কযেকদিন লুকিযে বেখেছিল। তবে তিন চাবদিন উপবি উপরি অফিসে যেতে না দেখে নঈমা তাকে একদিন শঙ্কিত স্ববে জিজ্ঞেস কবলো ঃ আজকাল অফিসে যাও না যে বড়?

— অনেক ছুটি জমা আছে. না নিলে পচে যাবে।

অবশ্য সে জবাব বেশীদিন কার্যকবী হযনি। মাসের প্রথমে নজমুল শুধু পঞ্চাশ টাকা নঈমাব হাতে এনে দিল তখন তাব জবাবদিহি কবতে গিযে নজমুলকে বলতে হযেছিল যে অফিসেব বড়কর্তাব সঙ্গে তার ঝগড়া হওযাতে তাকে সাসপেণ্ড কবেছে। সে তাব বড়কর্তাব বিরুদ্ধে মামলা করবে।

সে কথা শুনে নঈমা জ্বলে উঠলো একেবাবে ঃ মামলা কববে না ঠেঙা কববে। ফুটো কলসী তুমি, তোমার মুরোদ কত, এই দশ বছবে সেটা কি আমি টের পাইনি, এখন কাচ্চাবাচ্চাদেব নিয়ে না খেয়ে মরো।

নজমুলও আব রাগ সামলাতে পারেনি। ঠাস করে নঈমাব গালে এক চড বসিযে দিযে বললো ঃ তোমার কি ভাবনা, তোমার তো নাগর আছে, সেই কাচ্চাবাচ্চাদের খাওযাবে।

বাগে আর অপমানে নঈমার মুখটা তখন দেখবার মত—তার দৃষ্টি যেন আগুনের হল্‌কা।

কথা আর চাপা থাকল না। নজমুল ও নঈমার পরিচিত সকলেই জানতে পারলো নজমুল ঘুষ নিয়ে ধরা পড়েছে। যতদিন জানাজানি হয়নি ততদিন পরিচিতদের কাছ থেকে কিছু ধার নিয়ে নজমুল কোনমতে সংসারের খরচ জুগিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে একেবারে গুম-হয়ে-যাওয়া নঈমা নিজে আধা-উপোস করে আর সকলকে দু'বেলা অন্ততঃ ভরপেট খাইয়েছে।

নজমুল লক্ষ্য করে, ইদানীং ইউনিভার্সিটির সেই ছোকরা আত্মীয় আবার বেশ আনাগোনা আরম্ভ করে দিয়েছে।

সমস্ত বাসার আবহাওয়া কেমন যেন স্তব্ধ ও ভারী হয়ে উঠেছে। নঈমা তার সঙ্গে আজকাল আর কথাই বলে না—নজমুল যেন খবিস নাপাক এক জীব। স্ত্রীর কোন কোমলতাই তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। বড় ছেলেটাও যে বাপের কাছে মাঝে মাঝে আবদার

করতো—তাব দিকে আব একেবারে ঘেঁষে না। বাপের দিকে মুখ তুলে চাইতেও তার যেন বড় বাধে। কখনও চোখাচোখি হয়ে গেলে তখনই চোখ নামিয়ে নেয়। নিশ্চয়ই ছেলেটা কারও কাছে বাপের কীর্তিব কথা শুনেছে।

সহসা নজমুল আবিষ্কাব কবে এক এক করে তাব সমস্ত আশ্রয় তার কাছ থেকে সবে যাচ্ছে। বউ এখন বেগানা আওরতেব মত মনে হয়। নিজের বলে আব যেন মনে হয় না।

যাক্‌গে, শালার—যা হবার হবে। দবকার হলে, এই অবলম্বনহীনতা থেকে নিজেকে কি ভাবে বাঁচাতে হয়, তা নজমুল জানে।

ধারও এখন আব কারুব কাছ থেকে পাওযা যায না। সব কিছু জানতে পেরে নঈমার বাবা খবব পাঠিযেছেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে নঈমা যেন দেশে চলে আসে—দু' বেলা দু'মুঠো খাওযা সেখানে জুটে যাবে। নিজেই এসে তিনি তাদেব নিযে যেতেন তবে সে পথ জামাই আব রাখেনি।

নঈমা উল্টো খবব পাঠিয়েছিল ঃ বিপদেব সময স্বামীকে একা ফেলে বেখে সে বাপেব বাড়ী যাবে কি কবে?

আজকাল ভাত-ডালের সঙ্গে আলুভর্তাও আব নঈমা জোগাতে পারে না। এবি মধ্যে বিয়েব সময়কাব আংটিটা তার গেছে।

ভাত খেতে বসে নজমুল কিন্তু মন্তব্য কবতে ছাড়ে না ঃ নিজেব জন্য বুঝি মাছ তবকাবী রেখে দেওযা হযেছে, আমি বাইবে গেলে সেই ছোকরার সঙ্গে বসে খাবে!

নঈমা চিলবিলিযে উঠে বলেছিলো ঃ এবার থেকে নিজেব ভাত নিজে রেঁধে খায যেন। চুবি কবে ধবা পড়ে আবাব তেজ দেখো না। ওব জন্য ভাত আমি আর রাঁধতে পারব না।

তার জবাবে ক্ষিপ্ত হয়ে নঈমাব দিকে বাসন-পেয়ালা ছুঁড়ে মেবে খালি পেটে নজমুল উঠে যায। বাসন-পেযালা নঈমাব হাতখানেকেব ভেতব এসে কর্কশ এক শব্দ কবে মাটিতে পড়ে যায়। ডালেব ছিটায নঈমাব শাড়ীতে ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া হলুদ-দাগ বসে যায।

তাবপর দু'দিন নজমুল বলতে গেলে বাড়ীমুখোই হয়নি—খায়ওনি। কিছুটা বাগ, কিছুটা হতাশা, নিজেব প্রতি অশেষ কারুণ্য— সব মিলে তাব মনে বেশ একটা ঘোরের সৃষ্টি কবেছিল। তবে খিদেব জ্বালায সেটা বেশীক্ষণ টিকতে পায়নি। দু'আনার চিনাবাদাম আব তার সঙ্গে গলা-ভবা পানি খেযে নজমুলের পেটেব ভেতরটা কেমন যেন কবতে লাগল।

অদ্ভুত জিনিষ এই খিদে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নাড়ী পর্যন্ত একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে। মাথায কেমন যেন ঝিমঝিম ভাব। চাবিদিকে চোখ-আঁধার-কবা শূন্যতা।

পেটে যে দু'দিন ধরে দানা পড়েনি—এব বাইরে নজমুলের কাছে আব কোনও সত্য নেই। ছেলেমেযেদেব খাওয়া জুটেছে কিনা সে সম্বন্ধে এখন তার, বাপ হযেও, আগ্রহ নেই। কি করে নিজেব পেটের খিদে মেটানো যায় সেটাই নজমুলের কাছে এখন একমাত্র চিন্তা।

নঈমাকে বললে নিশ্চয়ই সে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু নঈমা, তাব স্ত্রী, তার এতদিনকাব সাথী, তাকে সে যে কথা বলেছে তার পরে তার কাছ থেকে পুরুষ হয়ে, স্বামী হয়ে, চাওয়ার গ্লানি সে সইবে কি করে।

নঈমাকে সে কি বলেছে খিদের তাড়নায় নজমুলের অবশ্য সে কথা মনে থাকে না।

আচ্ছা সেই ইউনিভার্সিটিতে-পড়া ছোকবাটার বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে দেখা যাক কিছু টাকা ধার পাওয়া যায় কিনা।

সেই আশায় তাহেরবাগ থেকে বকসী বাজারের দিকে নজমুল হাঁটতে আরম্ভ করে দেয়। প্রথম কয়েক মিনিট ক্লান্তির ভাব তেমন ধরা পড়েনা, তবে টয়েনবি সার্কুলার রোড-এ পড়তেই পদক্ষেপ অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আসে। জিন্নাহ্ এভিন্যুর কাছাকাছি আসতেই

পেছন থেকে দুই-রিক্সাকে ছাড়িয়ে-আশা একটি দ্রুত ধাবমান মোটর গাড়ীর হর্নের শব্দে হকচকিয়ে নজমুল প্রায় তাল সামলাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাল সামলে দেখে তার বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আব হাত-পা'র ভাঁজে ভাঁজে কাঁপুনি।

—খুব বেঁচে গেছি, বাবা। পেটের খিদের কথাও ভুলে গিয়ে নজমুল নিজেব মনে আওড়ায়। জিন্নাহ্ এভিন্যুর পবিপাটি লেবাসের দিকে চেয়ে খিদের খোঁচা যখন আবাব প্রবল হয় তখন আর্তনাদের ধরনে নজমুল নিজেকে জিজ্ঞেস করে ঃ কি থেকে বাঁচলাম?

কার্জন হলের কাছে এসে নজমুলেব আব হাঁটবার উদ্যম থাকে না। কম্পাউণ্ডেব ভেতব গিয়ে এক পাশে ঘাসের ওপর চুপটি করে বসে কিছুটা জিবিয়ে নেয। সমস্ত নাড়ী যখন ক্ষুধাব জ্বালায টনটন কবে উঠছে তখন গাছের ওপর বোদেব খেলা নজমুলের চোখে পড়ে। তারপব সযত্নে-রোপিত তৃণেব ঘন শ্যামলিমার সঙ্গে স্তবকে-স্তবকে উন্মোচিত, হলদে, লাল, গেরুযা বঙ-এর কিবণ-দীপ্ত মিতালী হঠাৎ যেন নজমুলেব চেতনা জাগিয়ে তোলে। মনে হয়, মাটির সমস্ত নির্যাস তৃণ ও ফুল টেনে নিযে বোদ আব আকাশকে উপহাব দিচ্ছে। এ-চিন্তাটা অদ্ভুত লাগে, অত্যন্ত অন্তবঙ্গ মনে হয়—অনেকটা তাব নিজেব নাড়ীব জ্বালাব মত।

ভদ্রলোক নজমুলেব আসাতে খুশী হননি। কামরায ঢুকেই সেটা নজমুল যেমন বুঝতে পারল তেমনি কোণের ছোট টেবিলে সাদা প্লেটের ওপব মুন্সীগঞ্জ-কলাব হলদে নবম কাঁদি দেখে দৃষ্টি তাব সেখানে একেবাবে আটকা পড়ে গেল। বুঝতে পাবলো না কিছুক্ষণ ঃ কলা চাইবে, না টাকা।

তবে দু'দিনেব ওপব খালিপেটে কলা খাওযার কথা ভাবতে গিযে ভেতব থেকে সহসা বমিব ভাবটা প্রবল হয়ে ওঠে। তাই চট্ কবে টাকাই চেযে বসলো ঃ পনেবোটা টাকা যদি দেন, সামনে মাসে শোধ কবে দেবো।

ভদ্রলোক তাব দিকে একবাব সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন, পবে বললেন শীতল বৈষয়িক ভঙ্গীতে ঃ পাগল হয়েছেন, মাসেব শেষে অত টাকা পাব কোথা?

জবাবটা আগে থেকেই নজমুল অনুমান কবে বেখেছিল—পাগল বিশেষণটা ছাড়া—অতএব খুব বেশী হতাশ সে বোধ করে না। আব কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়।

বেরিযে আসবে এমন সময পেছন থেকে ভদ্রলোকেব গলা শুনতে পায ঃ পাঁচ টাকা হলে নিয়ে যেতে পাবেন, আপনাকে আব শুধতে হবে না।

শেষের কথাটাই অনিশ্চয়তা বাধাল। শুধতে যখন হবে না, নেওযাই যাক না কেন। পব মুহূর্তে ভাবে ঃ এতে কি আব বেইজ্জতিব বোঝা কমবে, আব এইভাবে গবমিল দিযে চলবেই বা ক'দিন?

বাইবে বেরিয়ে দেখে, রাস্তার মাঝখানে এক মবা কুকুব পড়ে আছে। মুখ থেৎলে শুধু মাড়িটাই আলগা হযে খসে পড়েনি, নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বেবিযে এসেছে। চোখে জিজ্ঞাসাব দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে দু'একটা দাঁড়কাক সেদিকে এক পা এগুচ্ছে, এক পা পিছুচ্ছে।

এখন খিদের চেয়ে নিস্তেজ, নির্জীব ভাবটাই বড় হয়ে উঠেছে। গতিময় জীবনেব প্রাণস্পন্দন চাবিদিকে দেখেও মনে তেমন কোন অনুভূতি জাগে না। একটি ছোট মেযে এক দোতলা বাসার জানালা দিয়ে তাব দিকে চেয়ে ভাবী মিষ্টি ধবনে হাসছে। নজমুলেব প্রতিক্রিয়া হয় অদ্ভুত ঃ দুর শালী। হঠাৎ রাগে নজমুলের সমস্ত সত্তায যেন আগুন ধরে যায় ঃ বউটা মাগী, বাচ্চাগুলো কার কে জানে, আব সব বেটা দাগাবাজ, খল। এইভাবে বেঁচে থাকা! থু থু থু থু থু!

বাসার ধারে মুদীর দোকানের কাছে এসে নজমুল টলমলে মাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। বাগ বেশীক্ষণ থাকেনি, কারণ খালিপেটে রাগ করতে গেলে মাথা তা বেশীক্ষণ বহন করতে

পারে না। কিছু মুড়ী মুড়কী কিনতে পারলে বেশ হতো। পেট তাতে কিছুটা স্বস্তি পাবে। পকেট হাতড়িয়ে দেখে সেখানকার ভাঁজে কেমন করে যেন একটা আধুলি রযে গেছে। মুড়কীর সঙ্গে আরো কিছু কিনে বাসায ফেবে।

খালি তকতপোষেই নজমুল গা এলিয়ে দেয়। খিদে এখন অনেকটা সয়ে গেছে। পেটে আর সে কামড়-খাওয়া ভাব নেই। শুধু নিঃসাড় অবশতা। ক্রমে ক্রমে গিলে-খাওযা শূন্যতা।

কামরার বাইরে পরিচিত এক গুঞ্জন শুনে শেষবাবেব মত উদ্যম সংগ্রহ কবে নজমুল কান খাড়া করে থাকে। সেই ছোকবা আবাব এসেছে।

নঈমা বলছে আদরের ধরনে ঃ এতদিন পবে মনে হল।

ছেলেটি বলে ঃ এইত তিনদিন আগেই এলাম।

— আরে তাইত, এত ভুলো মন হযে গেছে ভাই। (ভাই আব কেন, নজমুল বিড় বিড করে) কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পব ছেলেটি আবাব বলে ঃ এই কুড়িটা টাকা ভাই পাঠিযে দিলেন।

নজমুল ভাবে ঃ রঙ্গটা বেশ জমেছে।

এবার নঈমা যা বললো তাব জন্য নজমুলেব মন ঠিক প্রস্তুত ছিল না ঃ বড উপকাব কবলে ভাই, তোমাব ভাই বোধ হয় আমাব উপব বাগ কবে দু'দিন না খেয়ে আছেন। নঈমাব গলাব স্ববে খেদহবণ মমতা। মন আবাব জেগে উঠতে চায, ছেলেদের মুখ মনে পড়ে, সেই ছোট মেযেব মিষ্টি হাসি চোখেব সামনে ভাসতে থাকে। নঈমা, নঈমা .

আর্ত অনুভব কি যেন হাতড়ে বেড়ায। কি যেন ফিবে পেতে চায।

শেষ বাবেব মত নাড়ী নিঃসাডতায কুঁকড়ে ওঠে। একবাব খেযাল হয কিছুটা মুড়কী খেযে নেয —তাতে হযত চেতনাব নতুন দু'এক তন্ত্রী বেজে উঠবে। তবে বাদুড়েব মত ডানা ঝাপ্টে কালো হতাশা দ্রুত আসে, আব তাব তড়িৎ তাডনায হাতটি যায 'র‍্যাটম' এব প্যাকেট এ।

এখন বাকী থাকলো কোনমতে এক গ্লাস পানি জোগাড কবা। তাবপর পানিব সঙ্গে র‍্যাটম' এর সমন্বয় ঘটাতে যেটুকু দ্বিধা যেটুকু জ্বালা।

হালাল

অরুণ চৌধুরী

মসজিদে ফজ্বেব আজান তখনও পড়েনি।

পুব আকাশেব ধূসর গাযে জাযগায় জাযগায কমলালেবুব বঙ-ছোঁযানো সরু সরু ফাটল ধবেছিল। আকাশেব বাকি আধখানা তখনও কিছুটা আঁধাবে মাখামাখি হযে আছে। চাচা ভাতিজায় হাল, লাঙল আর বলদ দুজোড়া নিযে মাঠেব উদ্দেশ্যে সড়ক ধবে অনেকটা উত্তব-পশ্চিম দিক ব'লে বওনা হল।

পশ্চিমে মাঝারি সাইজের একটা নিচু আবাদি পাঁথাব আব তার পরেই দক্ষিণ প্রবাহিনী রত্না, পুবে নবীনগবেব মূল বসতি, মাঝখানে এই সড়ক। সড়কটি স্বল্পপবিসব হলেও মোটেই অখ্যাত নয। নবীনগরের পুবে মাইল তিনেক তফাত দিযে যে চওড়া ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড বাস্তাটা বরাবব উত্তবে জেলার সদর অভিমুখে চলে গিয়েছে, এই সড়কটি সেই রাস্তা থেকেই সুন্দবদিঘিব হাটের পাশ দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে মুখ করে বের হযে আরো দু'তিনটে গ্রামেব মধ্যে দিয়ে এসে এই গ্রামে ঢুকে অনেকটা ধনুকের মত একটুখানি বেঁকে গাঁযের প্রাইমাবী স্কুলেব গা ঘেঁষে পুবে গোরস্থানটা বেখে, পশ্চিমে রেখে জুম্মাঘরখানা, বলতে গেলে আপতাবেব আঙিনাব উপব দিয়েই পুব-দক্ষিণ মুখ কবে ববাবর মাইল তিন-চার এগিযে আবাব মিশেছে সেই ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড বাস্তায় বোশেনাবাদ বন্দরের কাছাকাছি গিয়ে। এ বাস্তাটা যদিও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেবই বটে, তবু পাকিস্তান হবার বহুকাল আগে ইংরেজ আমলের কোন এক আকালেব সমযে টেষ্ট বিলিফ হিসেবে বাঁধা হয়েছিল বলে এ অঞ্চলেব লোকে ছ'সাত মাইল দীর্ঘ এই সড়কটিকে বিলিফ সড়ক নামেই ভাল বুঝে থাকে।

রশিখানেক রাস্তা না হাঁটতেই বলদগুলো সব লেজ উঁচিযে এক দফা পাযখানা পেসাব করল। থামতে হ'ল বলে বিবক্তই বোধ করছিল আপতাব। যাই হোক, সন্তর্পণে গোবর, চোনা প্রভৃতি ডিঙিয়ে কেবলই তারা আবাব হাঁটা সুরু কববে, এমন সমযে দূবে আঙুল দেখিযে মাহ্তাব একটু আশ্চর্য হযে জিজ্ঞাসা কবল — উডা কে যায় চাচা?

আপতাবও থমকে দাঁড়াল। সত্যিই তো! উলটো দিক থেকে গোরস্থানের পাশ দিয়ে সড়ক ধরে কে একটা লোক আসছিল। কুয়াশা ছিল বলে এতক্ষণে ভাল মালুম পাওয়া যায়নি। আরো রশিখানেক এগিযে জুম্মাঘরেব পুরানো দালানটার কাছাকাছি গিয়ে ঠিক যেখানটায তারা হাতেব ডানে পুব দিকে একটা পাঁথারের মধ্যে নেমে যাবে সেই মোড়েব মাথা অবধি হন হন করে এসে বুড়ো বটগাছটা বাঁয়ে রেখে সড়ক থেকে ডানদিকে নেমে জুম্মাঘরের পেছনে আখের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম দিকে লোকটা কোথায় যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল। খুব সম্ভব শিমুলতলা ঘাটে রত্না পার হয়ে সে ওপারে যাবে।

— মানুষটা কে, তা তো চিনতে পারলাম না বাহে? ... আপতাব তার কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটা ঢোক গিলে বলল — একখানা সাদা কাপড় দিযা মুখখানা ঢাকা আছিল না?

—মুইও তো ঐ দেখলাম মাহ্তাব সায় দিল — কিন্তু চলনটা যেন কিসমতের মতই মনে হইল।

— কিসমত চৌকিদার !..... আপতাবের ভ্রু দুটো একটু কুঁচকে উঠল — তা হইতে পারে। কিন্তু কিসমত এই ফজরে চোরেব মত কোনঠে যায় ?

আপতাবের মাথায় একটা দুশ্চিন্তা ঢুকে গেল।

চাচা ভাতিজায় তৎপরতার সাথে মাঠে লাঙল জুড়লো। আপতাব আলি আর মাহ্‌তাব আলী, চাচা আর ভাতিজা। আশপাশের আট-দশটা গ্রামে অবশ্য তারা আপতাব ডাক্তার আর মাহ্‌তাব মাষ্টার বলেই বেশী পরিচিত।

আপতাবের স্ত্রী যে বছব মারা গিয়েছিলেন, সেই বছবেই বড় ভাই আলতাব আলি অসহায় স্ত্রী এবং শিশুপুত্র মাহ্‌তাবকে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। সেই থেকে নিঃসন্তান আপতাব মাহ্‌তাবকেই ছেলেব মত মানুষ করেছে। ভাবীকেও একদিনের জন্যে উপেক্ষা অবহেলা কবেনি। বাড়ির দুই বউ বেঁচে থাকাকালে, চাষবাস, রান্নাবান্না আলাদাই হত। পবে রান্নাবান্না একসাথেই সুরু হল। এখন তারা ষোল আনাই একান্নবর্তী পবিবার।

কাজে মন দিলেও কিসমত চৌকিদাবের কথাটাই কিন্তু আপতাবেব মাথাব মধ্যে নানাবকম ভাবে ঘুরঘুর করছিল। থানাটা হচ্ছে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডেব বড বাস্তাব ধাবে, সুন্দবদিঘির হাট ছাড়িয়ে আরো মাইল চাবেক উত্তরে। ইউনিয়ন বোর্ডেব অফিসও সুন্দবদিঘির হাটেব উপরেই। কিসমত থানায় গেলে সাধাবণত সুন্দরদিঘির হাট দিয়ে বোর্ডেব অফিস হযেই গিযে থাকে। তাছাড়া আজ সাপ্তাহিক হাজিরার দিনও নয়। রত্নাব এপাবে নবীনগর পলিমাটির বাবো মাসেব তেবো ফসলের গাঁ, কিন্তু ওপাবটা লাল উষব খিযাবী মাটি। শিমুলতলার ঘাট পাব হলেই ওপাবে সাঁওতালদেব ছোট একটি বসতি, নাম তাব আঁধাবকোঠা। আঁধারকোঠা পাব হলেই শুরু হল শাল-পলাশ-মহুয়ার ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গলেব ধাব ঘেঁষে ঘেঁষে একটা সরু পাযে-হাঁটা পথ একটু এঁকেবেঁকে প্রায উত্তবমুখে চলে ববাবব গিযে পেছনে দিযে থানাব কাছাকাছি বড বাস্তায় মিশেছে। এই পথে থানায গেলে প্রায মাইল দুই কম হাঁটতে হয়, সময়ও লাগে কিছু কম। কিন্তু পথটা খুব চালু পথ নয। তবে, প্রতিপক্ষেব নজব এড়িয়ে থানা, আদালত, মামলা, কবালা কবতে হলে ঠেকা বেঠেকায লোকে এই পথেই যাওযা আসা কবে থাকে।

লাঙল চালাতে চালাতে জমিব এক মাথায গিয়ে মোড় ঘুববাব জন্য একটা বলদেব বাশ টেনে অন্যটাকে খেদাতে খেদাতে হঠাৎ আপতাব জিজ্ঞাসা কবল — কাল বাতে কাব বাডি হইতে বাহিব হইছিস, কিসমত কি তা টের পাইছে, হ'?

— কে জানে? .. ঠোঁট উলটিযে মাহ্‌তাব বলে — বাহিব হইবাব সময়ে তো মানুষেব নাগাল পাই নাই।

বলল বটে, কিন্তু মাহ্‌তাবও নিশ্চিন্ত ছিল না। কিসমতেব অভিসন্ধিটা কি? গত কয়েক দিনে যে সব উড়ো কথা তাব কানে এসেছে সেগুলোব সাথে ব্যাপারটাকে মিলিযে বুঝবাব চেষ্টা করছিল মাহ্‌তাব। ভাবছিল ভোর রাতে কাপড়ে মুখ ঢেকে চোরা-পথে কিসমত গেল কোথায়! থানায় গেল কি?

কথা বলতে বলতে দুজনেরই হালের মুঠোটা একটু শিথিল হয়ে এসেছিল। লাঙ্গলের ফালটিকে মাটির মধ্যে তাক্ মতো ডুবিয়ে ধরে গভীরভাবে তারা আবার কাজে মন দিল।

সর্ষে বুনবার জন্য জমিটা চাষ দিয়ে এই বেলার মধ্যেই তৈরি করে ফেলতে হবে। তাই তারা বড় উদ্‌বিগ্ন। পাড়ার জুম্মাঘরে এষার নামাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবার পথে সেরাতে আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আপতাবের মনে হয়েছিল যে চাঁদখানা আধাআধি প্রায় ভরে এসেছে। দিন চার-পাঁচেকের মাথায় সম্ভবত ওটা পুবো হয়ে উঠে পূর্ণিমা দেখা দেবে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে। এলোমেলো বাতাসও বইছে কখনও কখনও। ভাবগতিক দেখে প্রৌঢ় আপতাবের খনার বচনের কথাটা মনে পড়ে গেল। আশঙ্কা হল,

পূর্ণিমা নাগাদ অবশ্যই বেশ কিছু পানি বর্ষাবে। জমিটা তৈরি করে আজকালের মধ্যেই সর্ষেটা বুনে দিতে পারলে ভাল হয়। সর্ষে বোনা আর বৃষ্টি নামার মধ্যে চারা গজানোর জন্য যদি চারটে দিনও হাতে পাওয়া যায় তবে আবাদের খুবই উপকার হবে।

রাতেই কথাটা আপতার তার ভাতিজাকে বলে পাঠিয়েছিল।

দিন পনেরো আগে সুন্দরদিঘির হাটে একদিন এক পুলিশ কনস্টেবল ডালা-কুলো বিক্রি করা নিম্নবর্ণের একটি গরীব হিন্দু বিধবাকে হাত ধরে টেনে, লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল তার ডালা-কুলো যা কিছু ছিল। এই বেআদবীর জন্য হাটুরে মানুষের কাছে লোকটা বেদম মার খেয়েছিল সেদিন। পুলিশ পিটানোর এই ঘটনাটি ঘটবার পর থেকে মাহ্‌তাব আজকাল রাতে আর বাড়ি থাকে না। কারণ মাহ্‌তাবকেই এই হাঙ্গামার নেতা বলে থানা থেকে কয়েক দফায় খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। তাই রাতে এপাড়া ওপাড়া এ গ্রাম সে-গ্রাম কারো না কারো বাড়িতে সে থাকে। সকাল বেলায় এদিক-ওদিক সন্ধান নিয়ে দেখে-শুনে নিজ বাড়িতে ফেরে। যুবসংঘ মত গাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলটাতেও প্রায়দিনই লুকিয়ে চুরিয়ে এক চক্কর মেরে সে পড়িয়ে আসে। বাড়িতে যথাসম্ভব খুব কম সময়ই থাকে। দিনভর সংসারের কাজের ফাঁকে ফাকে সন্দেহজনক লোকের চোখ এড়িয়ে খবরের কাগজ হাতে মানুষের সাথে আলাপ আলোচনা মিটিং মজলিশ সবই সে করে। আবার রাতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

চাচার কাছ থেকে লোক মারফৎ খবর পেয়ে রাত থাকতে থাকতেই মাহ্‌তাব সেদিন বাড়ি ফিরেছে। তিনটে চাষ আগেই দেওয়া ছিল। দুপুরের আগেই যদি আর এক দফা চাষ দেওয়া যায় তবে বিকেল নাগাদ মই দিয়ে সর্ষের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। সুতরাং এত তাড়াহুড়ো।

হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে স্বভাবতই সেদিন আপতারদের অনেক বেলা হয়ে গেল। বাড়ি ফিরেই আপতার দেখে বাইরের আঙ্গিনায় কাঁঠালতলায় বাঁশের মাচার উপরে তার জন্যে একটি রুগী বসে অপেক্ষা করছে। অগত্যা, লাঙ্গল জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে বলদগুলোকে একটা গাছের ছায়ায় বেঁধে রেখে আপতার ডাক্তারকে আপাতত রুগীর দিকে মন দিতে হল।

স্কুলের বেলা অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ঝটপট স্নান খাওয়া সেরে মাহ্‌তাবও স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

রাতের শিশিরে ভেজা বিলিয়ের সড়কের ধুলো ততক্ষণে রোদের তাপে শুকিয়ে এলোমেলো বাতাসে উড়তে শুরু করে দিয়েছে। পাঁথারে পাঁথারে ফুলে রের হওয়া ধানের শীষগুলো যেন সেই বাতাসের ছোঁয়ায় আহ্লাদে হেলেদুলে নাচছিল। কার্তিক মাসের ছোট বেলা, তাই এরই মধ্যে গাঁয়ের ছেলে মেয়েরা বই শ্লেট খাতা পেনসিলের দপ্তর বগলে স্কুলের সামনে ছোট্ট মাঠে এসে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। স্কুল মানে অবশ্য খড় দিয়ে ছাওয়া জানালা দরজাবিহীন একখানা মাটির ঘর মাত্র।

ছেলে-মেয়েরা জটলা পাকিয়ে কি নিয়ে যেন বাকবিতণ্ডা হৈ হল্লা করছিল। এমন সময়ে পরিচিত একটা পায়ের শব্দে সকলের মধ্যে অস্ফুট একটা সাড়া পড়ে গেল — মাষ্টার! মাষ্টার!

এই ছেলেপেলেরা! মাঠের মধ্যে বসি কিসের মিটিং করোছেন হে? হাতের মুঠোয় ভাঁজ-করা খবরের কাগজটা দিয়ে মাহ্‌তাব মাষ্টার একটা ছেলের পিঠে আস্তে করে একটা আঘাত করল।

সকলেই মাষ্টারকে খবরটা দেবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। ছোট্ট রোকেয়া উত্তেজিতভাবে ছুটে মাষ্টারের কাছে গিয়ে কচি গলায় চিৎকার করে বলে উঠল — মাষ্টার, তুমি জব্বর বাঁচি গেছেন।

মাহ্‌তাব নিচু হয়ে মাটিতে আলগোছে বসে হাসিমুখে আদর করে রোকেয়ার কচি হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে — কেন ময়না?

জটলাটা যখন চলছিল রোকেয়া তখন একান্ত নিবিষ্ট মনে ওদের আলোচনা শুনছিল। কি সে বুঝেছিল, সে-ই জানে। এখন চোখ বড় বড় করে উত্তেজিতভাবে বললে — নুরুল আমীন তোমাকে ধরতে আইছিল।

— নাজিমুদ্দিনও সঙ্গে ছিল... আর একটি ছোট্ট ছেলে সম্ভবত তার নিজেরও কিছু একটা বলা দরকার মনে করে রোকেয়ার চোখের দিকে চোখ রেখে, সমর্থন পাবার আশায় ঘাড় বাঁকিয়ে অনেকটা আন্দাজেই বললে — কেন রোকেয়া, পিছনে সাইকেলে টোপ মাথায় দেওয়া উডা নাজিমুদ্দিন নয়? সবাই হো হো করে এক দফা হেসে উঠল।

মাহ্‌তাব জিজ্ঞাসুভাবে লতিফের দিকে তাকাল — কি বাহে?

আলম বলে উঠল — দারোগা তিন-চারজন সিপাই সাথে এই ঠাঁই আইছিল। তোমার কথা পুছ করলে।

— কোন্‌টা দারোগা তোরা চিনেন, হ' —?

— দারোগা কোন্‌টা, হামরা কেমন চিনি না। রোশেনাবাদে ভাষাণীর মিটিং-এ যাঁই বক্তৃতা খাতায় লিখি নিলে, তাঁই দারোগা নয়। অনুযোগের সুরে লতিফ জবাবটা দিল।

দারোগা তাহলে সঙ্গেই ছিল বটে। মাহ্‌তাব জিজ্ঞাসা করল — কোন্ দিক বুলি ওরা গেল রে?

— মোর সন্দো হয়, কিসমত চৌকিদারের বাড়ি বুঝি গেছে। ক'দিন ধরি কিসমত খুব হাঁটাহাঁটি করোছে একটি ছেলে মাহ্‌তাবের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল — তোমাকে ধরি দিতে পারিলে কিসমত বুলে পঁচিশ টাকা বখশিশ পাইবে, হ'?

কথাটা মাহ্‌তাবের কানেও এসেছে। মাসকয়েক আগে আঁধারকোঠা অঞ্চলের সাঁওতালদের হয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তাদের কাছে একটা ডেপুটেশন নিয়ে গিয়েছিল সে। তারপর থেকে, সাঁওতালদের সাথে ফরেস্ট গার্ডদের অহরহ যে সব হাঙ্গামা লেগে থাকে, সেই সব হাঙ্গামার সাথে তার নামটাকে জড়ানোর চেষ্টা থানাওয়ালারা বরাবর করে আসছে। গত মাসে হাটে জবরদস্তি তোলা আদায়ের ব্যাপার নিয়ে যে হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছিল তার সাথেও তার নামটা জড়ানো হয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি পুলিশ পিটানোর ঘটনায় তাকেই প্রধান আসামী করে খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে। এখন সব মিলিয়ে তাকে একটা বিপজ্জনক লোক আখ্যা দিয়ে, ধরবার জন্য বেপরোয়া চেষ্টা থানা থেকেঅবশ্যই হতে পারে। কিন্তু পঁচিশ টাকা বখশিশ সম্পর্কে থানা থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কথা সে জানে না। তবে কথাটা ছড়িয়েছে বটে।

— কতক্ষণ হইল ওরা গেছে রে? জিজ্ঞাসা করল মাহ্‌তাব।

— এই তো। কেবলই গেল ওরা। পাড়ার ভিতর দিযা আইছেন, তাই ওরা তোমার নাগাল পায় নাই। বিলিফ সড়ক ধরিযা আসিলে ওরা তোমাকে আটক করি ফেলাইতো।

দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল মাহ্‌তাব। কিসমতই বোধ হয় ব্যাপারটাকে তাহলে এতখানি পাকিয়ে তুলেছে। ক'দিন আগে স্কুলের সেক্রেটারী হাযাত মাহমুদ তালুকদার তাকে ডেকে কিসমত সম্পর্কে একটুখানি হুঁশিয়ারও করে দিয়েছিল। কিসমত নাকি কোথাও কোথাও বলেছে যে হাজার হলেও সে হচ্ছে গিয়ে চৌকিদার, বলতে গেলে খাস গবরমেণ্টেরই লোক। কাজেই গবরমেণ্টের দিকেই টেনে তাকে কাজ করতে হবে। চৌকিদারী করতে গিয়ে চৌকিদারী নিয়মকানুন ষোলো আনা না মানলে চলবেই বা কেন? এ-ছাড়া, কিসমত যে দু-এক জায়গায় মাহ্‌তাবের খোঁজও করেছে, সে কথাও মাহ্‌তাবের কানে এসেছে।

মাহ্‌তাবের মুখের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে অনেকেই ব্যাপারটার গভীরতা আন্দাজ করল।

— তোমার নসীবে আজ এই ঠাঁই আর থাকা নাই মাষ্টার।...মুরুব্বীর মত আলম বললো — ওরা বোধ হয় ফের ঘুরি আসিবে।

মাহ্‌তাব ভাবছিল, কি এখন করা উচিত। এমন সময় স্কুলের পেছন দিকে আখের ক্ষেতটা একটুখানি নড়ে উঠলো।

সড়ক থেকে নেমে, নির্জন গোরস্থানটা ঘুরে পায়ে-হাঁটা সরু পথটা এঁকে-বেঁকে ঠিক যেখানে গিয়ে পাড়ায় ঠেকেছে, সেখানে একটা পাতাঝরা কৃষ্ণচূড়া গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিরাট অথচ নিঃস্ব গাছটার নিচে ছোট ছোট দুটি ভাঙা ঘর এমন নীরবে মুখোমুখি খাড়া হযে আছে যে, মনে হয় যেন কেবলই মাত্র একটা নযা চাল চালবাব পরে দাবার ছক সামনে দুটি খেলোযাড় গভীর চিন্তায় বিভোর হয়ে রযেছে। বাইবের দিক থেকে আঙিনাটিকে আড়াল করবাব চেষ্টা করছে ততোধিক জীর্ণ একখানা কঞ্চির বেড়া। সবটা মিলে এই শ্রীহীন প্রায় বে-আব্রু আস্তানাটাই হচ্ছে কিসমত চৌকিদারের বাড়ি।

কিসমত কিছুক্ষণ হল মাত্র বাড়ি ফিবেছে। খুব ভোরে সে আজ বাড়ি থেকে বেব হয়েছিল। কোন্ সময়ে অজান্তে পাশ থেকে শুট কবে উঠে যে লোকটা পালিযেছে তা ঘুমেব ঘোরে বউ রহিমা টের পায়নি। যতবাবই সকাল থেকে কথাটা সে ভাবছিল ততবাবই দপ্ করে রহিমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠছিল। অবশ্য বিশেষ কোনও প্রযোজন দেখা দিলে, সময় হোক, অসময় হোক, চৌকিদাবকে থানায ছুটতে হবেই। কিন্তু একটিবাব বলেও যাবেনা, এ কেমনতর কথা!

বাড়ি ফিববাব পথে, কোথায় যেন জলকাদা ঘেঁটে গোটা আষ্টেক শিঙ্গি আব চাব পাঁচটা সরু সরু কৈ মাছ গামছায় কবে বেঁধে এনেছিল কিসমত। ঘবেব চালে লট্‌কানো খালুইটা নামিয়ে মাছগুলো তাতে রেখে সেটা যখন বহিমাব সামনে সে এগিযে দিল তখন বহিমা আড়চোখে চেয়ে তা দেখল বটে, তবে কিছুই বলল না। কিন্তু গুন্ গুন্ কবে গান কবতে কবতে খুব যত্নেব সাথে হাত পা কাঁধ নাক মুখ থেকে কাদাব দাগগুলো পবিষ্কার কবে মুছে গা ধুযে একটুখানি পরিপাটি হবার উদ্দেশ্যে মাথায দেবাব জন্যে নিতান্ত সাদা মনে বহিমাব কাছে গিযে যেই সে হাতের তালু পেতে দিযে একটু তেল চাইল, অমনি বহিমা যেন তেলে বেগুনেই জ্বলে উঠল —· লজ্জা-সরম বুলি কি কিচ্ছুই মানুষেব থাকা লাগে না?

— মানুষেব তো লাগেই। কিন্তু চৌকিদাবেব তা লাগে না। মহা দার্শনিকের মত কথাটা বলে হাতখানা নিজ স্বল্পাযতন কালো দাড়ির গুচ্ছটুকুতে বেখে কিসমত বহিমাব মুখেব দিকে চোখ তুলে চাইলো — কিন্তু সে কথা কেন?

সে কথা কেন। . .. অতল বিস্ময়ে এবং ভয়ঙ্কব রাগে বহিমাব গোলগাল ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠলো — মুইও চৌকিদারের বেটি আছিনু। কিন্তু মোর বাপ ভাইযে চাষ-আবাদ ছাড়িযা তোমাব মত কেবল দারোগা-সিপাইয়েব পাছে পাছে দৌড়ায নাই। কাল বাতেই আধপেটা খাইছেন। জানেন, চাউল ঘরে নাই। কিন্তু তাব ব্যবস্থা কি কবছেন শুনি?

— ওহ্, এই কথা .... কিসমত যেন কিছুটা আশ্বস্ত হল। তবু প্রসাধনের এমন মৌকাটা টুটে যাওয়ায় তার যেন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

— কথা কন না কেন? ....রহিমা আবাব সাপের মত ফণা ধরে ফোঁস কবে উঠলো। মনে হল, নাকের ছোট্ট রুপোর নাকফুলটা বুঝি তার ছিট্‌কে পালিযে যাবে।

কার্ত্তিক মাসের দিন। পাঁথারের ধান কেবলই মাত্র ফুলে বেরুচ্ছে। সুতরাং বক্তব্য বিশেষ কিছু আর যে ছিল তা নয়। বেলা যথেষ্টই হয়েছিল, পেটে ভুখও ছিল বেশ। ভাত যে রান্না হয় নি তাও অস্পষ্ট নয়। তবু রহিমার মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভাটি-বয়সী কিসমতের কেন যে নির্লজ্জের মত একটু রসালাপের ইচ্ছে জাগলো, তা সেই জানে। সে বলে ফেললো — মোর কি? এমনি তো পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়। তার উপর উসকা খুসকা চুল মাথায় গাজীব বাঁশের মত নাচন দেখি মানুষে তোর ভাতারকেই পাগলা বাউড়া বুলি ক্ষেপাইবে।

ঢোলকের বাজনার সাথে সাথে গাজীর বাঁশের সেই ধিনিকি-ধিনিকি নাচনের ছবিটা চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠায় রহিমা প্রথমটায় ফিক্ করে হেসে ফেললো বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই তাব

চেহারাটা অন্য রকম হয়ে গেল — ভাত দিতে পার না, তাঁই ভাতার! একটা বেটা-পুত থাকিলে, বোধ করি মোর এতখানি অবহেলা হইত না হায় .... পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ঝাঁঝ রহিমার চোখেমুখে ফুটে বের হল।

এক্ষুণি যে প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠবে সেটা স্থির বুঝে পালানোর জন্য ছটফট করছিল কিসমত, এমন সময়ে মুস্কিলটার আসান এল সম্পূর্ণ অন্য একটা পথ বেয়ে।

কিসমতের ভাঙা ঘর দুখানার মধ্যে ঢেঁকিঘরের বেড়াটা এখনও তবু কিছুটা ভাল আছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ বিদ্যুতের মত চকিতে রহিমা ছুটে গিয়ে সেই ঘরের ভেতরেই ঢুকে পড়লো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের পথের উপর থেকে সাইকেলের কিট কিট শব্দের সাথে অনেকগুলো জুতোর ভারি মস্ মস্ আওয়াজ কানে ভেসে এল, কারা যেন কিসমতের নাম ধরেই হাঁক দিল।

আব্রু রক্ষার জন্য মোতায়েন আঙিনার এই কৃপণসার বৃদ্ধ বেড়াটা সুযোগ পেলেই রহিমার সাথে এরকম মর্মান্তিক রসিকতা না করে ছাড়ে না। সে তার খাটো এবং জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া পরনের শাড়িখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে ঢেঁকি ঘরের মধ্যে অগত্যা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটুখানি পান-সুপারীর আয়োজন কিসমত এ পর্যন্ত করেই উঠতে পারে নি, তাই উপরওয়ালার উপস্থিতিতে সম্বর্ধনার জন্য সে যেন হঠাৎ যাদুমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

ঘরে একখানা বসবার মোড়া ও চলনসই মাদুর আছে। কিন্তু সেগুলো তার মনে ধরল না। হন্তদন্ত হয়ে গায়ে নীলপোষাকটা চাপিয়ে বেল্ট কষতে কষতে মেহ্‌মানদের বসবার জন্য পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে খান দুই ভাঙা চেয়ার ও একখানা বেঞ্চ টানাটানি করে এনে বাড়ির সম্মুখে পথের উপর মহা এক হুলস্থূল সে বাধিয়ে দিল। দারোগা সাহেবের সেখানে বসবার কারণ বা রুচি কোনটাই ছিল না। সুতরাং তিনি ধমক দিয়ে শিগগির বের হবার জন্য কিসমতকে প্রচণ্ড এক তাড়া লাগালেন। কিন্তু কিসমত চৌকিদারের সৌজন্যবোধও যেমন তুখোড় হয়ে উঠল, সাহেবকে খেদমত করবার সঙ্কল্পও যেন তেমনই অটল হয়ে দেখা দিল। ধমক খেয়েও কুকুর যেমন লেজ নাড়ায় অনেকটা সেই রকমই, হাত কচলাতে কচলাতে সে হি হি করে হাসতে লাগল — সামান্য একটা গুয়াপানের আয়োজন, উডার অনুমতি না দিলে স্যার, সেডা কেমন হয়! তার চোখ দুটো কুকুরের মতই মিনতি প্রার্থনায় করুণ হয়ে উঠলো।

দারোগা সাহেবের পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল, তবু সংযতভাবে তিনি যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীর চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলের মাথায় অযথাই একটা চাঁটি মেরে কিসমত তাকে বললো — যান্ তো বাপ আলাবক্‌সো, বাড়ি হইতে পানবাটা ধরি আন দেখি . .মুখের কথা মুখেই শেষ না হতে অবশ্য সে নিজেই বিঘে খানেক তফাতে আলবক্সের বাড়ির দিকে ছুটলো পান-সুপারী সংগ্রহের জন্যে।

অনুরোধে ঢেঁকি সবাইকেই গিলতে হয়, দারোগা সাহেবও রেহাই পেলেন না।

পানটা মুখে দিয়ে ম্যাচের কাঠি ঠুকে দারোগা সাহেব সিগারেটটা ধরাতে না ধরাতেই অবশ্য, বাড়ির ভেতরের উদ্দেশ্যে চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি যথাস্থানে ফেরৎ দেবার নির্দেশ দিতে দিতে পাগড়ী মাথায় বল্লম হাতে বিদ্যুৎগতিতে এসে সম্মুখে খাড়া হল কিসমত। কিন্তু দারোগা সাহেব তখন মনে মনে এত অস্থির বোধ করছিলেন যে তার এই তৎপরতার প্রতি কোনও তারিফসূচক মন্তব্য করা তো দূরের কথা, অধৈর্যের সাথে তিনি প্রায় মুখ ভেংচিয়ে উঠলেন — চলো, চলো! বড্ড লেট করিয়ে দিলে হে!

কিসমতই সকলের আগে কদম বাড়াল।

— কোন দিকে যাচ্ছো!.... বিরক্ত হলেন দারোগা।

— স্যার .... মুখ কাঁচুমাচু করে কিসমত বল্লে — স্কুলের সেক্রেটারির বাড়ি স্যার।

ফেরার লোককে বাড়িতে খোঁজাখুজি করে বিশেষ কোনও ফয়দা হবে না। দারোগা সাহেব মনে মনে সায় দিলেন, লোকটার বুদ্ধি আছে বটে। সেক্রেটারিটাকে একটা জোর ধাঁতানি দিতে হবে, বেটা কমিউনিষ্ট পুষছেন! মুখে জিজ্ঞাসা করলেন — কি নাম হে লোকটার?

— হেত মামুন স্যাব।

— হেত মামুন! ব্যঙ্গ করে বল্লেন দারোগা — সে আবার কোন বামুনেব বেটা হে?

কবিরাজ স্যাব . বল্লমখানা দুই পায়ের ফাঁকের মাঝখানে কায়দা মাফিক চেপে ধরে অকারণেই মাথার পাগড়ীটা একবার খুলে ফেলে আবার সেটা যুতসইভাবে মাথায় বাঁধতে বাঁধতে অনেকটা চৌকিদারি ভাষাতেই কিসমত বললে — হামার গাঁয়েবই স্যাব। সাত নম্বব সুন্দরদিঘির বোর্ডের অধীন মৃত জান মাহমুদ তালুকদারেব বেটা।

টুপি, সাইকেল, বুট, বল্লম সমেত সমস্ত দলটা নড়েচড়ে উঠল মৃত জান মাহমুদ তালুকদাবেব ছেলে কবিরাজ হায়াত মাহ্মুদ তালুকদাবের বাড়ির উদ্দেশ্যে। কিন্তু ততক্ষণে সাদা, কালো, লাল, খযেরী প্রায আধ ডজন কুকুরও ঘেউ ঘেউ কবতে করতে এসে জুটে গিয়েছে। কিসমত একলাই এতক্ষণ যা কিছু হাঁক-ডাক কবছিল। ভাবে মনে হচ্ছিল, গাঁযেব লোকেব নিস্পৃহতাব ফলে তার উপরওয়ালার যথেষ্ট সমাদব হচ্ছিল না বলে কিছুটা সে অতৃপ্তি বোধ কবছিল। এখন কুকুরের চিৎকাবে দ্বিগুণ উৎসাহে কখনও বল্লমের ভয় দেখিয়ে কখনও বা মাটি থেকে ঢিল কুড়িযে নিয়ে তাই ছুঁড়ে হৈ-হৈ করে কুকুব তাড়াতে তাড়াতে সত্যিই গাম্ভীব বাঁশেব নাচনের মতই পাড়াময় সোবগোল তুলে সমস্ত দলটিকে সে পথ দেখিযে নিযে চললো।

হোমিওপ্যাথি ঔষধেব হাতবাক্সটা ঘাঁটাঘাঁটি কবে কয়েক পুবিযা ব্রাইযোনিযা দিযে ব গীকে বিদায কবে গোযাল ঘবেব সামনে সবেমাত্র চাড়িতে ঘাসেব সাথে খইল মেখে দিয়ে গরুব খাবাব বাবস্থা কবেছিল আপতাব। এমন সময চাপা গলায় মাহ্তাবেব মা দেওবকে ডাকলেন — মিযা। শুনি যান জলদি।

যেতে অবশ্য হল না। বুড়ি নিজেই খড়ম ঠক্ঠক্ কবতে কবতে গোযাল ঘবেব দিকে এগিযে এলেন। পব মুহূর্তেই কাঁধে গামছা ফেলে আপতাব বাড়িব পেছনে জঙ্গলেব মধ্য দিয়ে চোবা পথে বাইবে বেব হযে গেলেন।

মিনিট দশেক বাদে আপতাব যখন কতকটা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিবছিল তখন বাড়িব সামনে বিলিফ সড়কেব ধাবে কদম গাছেব তলায দাবোগা পুলিসেব দলটাব সাথে তাব দেখা হযে গেল।

— মাহ্তাব বাড়ি আছে, হ'? চক্ষুলজ্জাহীন কিসমতই প্রথম কথাটা জিজ্ঞেস কবল।

দালাল কিসমতেব মুণ্ডুটা চিবিযে খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল আপতাবেব। কিন্তু সেও যেন তাকে বৃথাই খুঁজে হযবান হযেছে এমনই অসহাযেব ভঙ্গীতে অনাযাসে সে বলে ফেলল — বাড়িতেই তো আছিল মাতাব। কোন্ দিক বুলি বা গেছে তা আল্লাই জানে।

— আল্লা জানে! তুমি জান না? কটমট কবে তাকাল কালো চাপ-দাড়িওযালা কনস্টেবলটি।

আপতাবেব কান দুটো লাল হযে উঠল।

— ইস্কুল যায না সে? বেশ ডাঁটেব সাথেই জিজ্ঞাসা করলেন দাবোগা সাহেব। দাবোগা সাহেব মোটামুটি একটা খবব ঠিকই পেয়েছিলেন যে মাহ্তাব মাষ্টার স্কুলে প্রায নিযমিতই এসে থাকে।

— যায তো। কিন্তু ইস্কুল বুঝি আজ ছুটি নাকি .. আম্তা আম্তা করে বলল আপতাব।

— কেন, তোমাব বাপেব আজ ফতেযাব তারিখ নাকি .... বিদ্রূপের সাথে ভ্রুকুটি কবলেন দারোগা।

— তবে বুঝি ইস্কুল খোলাই আছে।

একে তো মেয়ে-মরদ, বুড়ো-বাচ্চা সমস্ত গ্রামবাসীর নিষ্ক্রিয় অথচ কৌতূহলী চাহনি পরিবেষ্টিত হয়ে একপাল অসভ্য কুকুর পেছনে নিয়ে গোটা গ্রামখানা এভাবে সঙ সেজে ঘুরে বেড়াতে বেজায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তাতে অল্পের জন্যই মাহ্তাবকে বাড়িতে

পাওয়া গেল না স্থিব বুঝতে পেবে দাবোগা সাহেব এবারে রেগে একেবারে গুম হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু ইন্ধন যোগানোব উদ্দেশ্যে ফর্সাপানা বেঁটে পশ্চিমা পুলিসটি কিসমতকে বকাবকি করে বলল — তুমি একটা বুড়বক্ আছো কিসমত। সমুচা মাটি কবে দিলে তুমি।

কাজের মধ্যে কোন গোলমাল হয়ে গেলে উপবওযালাবা যে অধস্তনকেই দায়ী করে থাকে এটা সমস্ত স্তরের অধস্তনদেরই জানা কথা। সুতরাং কিসমত তাতে কিছুমাত্র দমল না। উৎসাহের সাথে চোখ টিপে অবলীলাক্রমে বলল — না সিপাইজী, এইডা ভাল হইছে। চাইব-চাইবডা সাইকেল আছে আমাদের, ইস্কুল ছাঁদিয়া ধবা যাইবে .. স্কুলের চারিদিক থেকে ঘেবাও করে ছেঁদে. সাইকেল দাবড়িযে হুইসেল বাজিয়ে মাহ্‌তাব মাষ্টাবকে ধবে বেঁধে আনবাব চৌকিদারী বোমাঞ্চে সে তখন বেশ মশগুল হযে উঠেছে। বাড়ি থেকে মামুলিভাবে ধরা পড়ে গ্রেপ্তার হয়ে গেলে মাহ্‌তাব তার মানুষ শিকারেব এমন মজাটা অনাযাসেই মাটি করে দিতে পাবতো।

কিন্তু দাবোগা সাহেবের মেজাজ এব আগে স্কুলেব সেক্রেটাবী হাযাত মাহমুদ কবিবাজেব বাড়িতেই বিগড়ে গিযেছিল, তিনি চাপা বিবক্তির কিসমতের দিকে চেযে বললেন — বড্ড বক্‌বক্ কব হে তুমি।

তবে বেশ বুঝা গেল, দাবোগা সাহেবও উপস্থিত কর্তব্য ঠিক কি হবে তা স্থিব কবতে পাবছিলেন না। তিনি ভেবে এসেছিলেন আচমকা স্কুলটায হানা দিযে অতি স্বচ্ছন্দে টুক কবে মাহ্‌তাব মাষ্টাবকে তুলে নিযে চলে যাবেন। কিন্তু ব্যাপাবটা তাব ধাবপাশ দিযেও গেল না দেখে হতাশ হযে পড়েছিলেন।

—বাড়ি তল্লাসী কবা হইবে কি? অতি বিনীতভাবে নিবেদন কবল কিসমত — যদি ঘবে লুকাযে থাকে।

কিসমতেব চোখ দুটি আবিষ্কাবেব সম্ভাবনায বেড়ালেব চোখেব মত জ্বলজ্বল কবে উঠল।

কিন্তু না। এখানে আর দেবি না করে সমস্ত দলটা আবাব স্কুলেব দিকে ফিবে যাওয়াই স্থিব কবল।

স্কুলে যখন আবাব তারা গিযে পৌঁছল তখন স্কুলটা একেবাবেই ফাঁকা। একমাত্র কালজামেব গাছটা তাদেব ব্যঙ্গ কববার জন্য সেখানে একা একা দাঁড়িযেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকাবটা তখন কেবলই বেশ জমে উঠেচে। আঁধারকোঠাব জঙ্গলেব মধ্যে একটি মেটে কুটিবেব আঙিনায মহুযা গাছেব তলায একখানা দড়ি দিযে বোনা বাঁশের নিচু খাটিয়ায বসে তিন-চাব জন লোক পবিবেষ্টিত হযে গল্প শুনতে শুনতে আখ চিবোচ্ছিল মাহ্‌তাব। বছর বিশেকেব একটি তরুণী হাত পা নেড়ে কি যেন বলছিল। তাব কালো মিষ্টি চেহারাখানা তখন সন্ধ্যাব আঁধারে মহুযা গাছের ছায়ায একেবাবেই প্রায় মিলিয়ে গিযেছিল। শুধু তাব খোঁপার বুনো ফুলেব ধবধবে সেই গুচ্ছটি তখনও মুগ্ধ মাহ্‌তাবের চোখ দুটোকে ফাঁকি দিতে পারেনি। আকাশে চাঁদটা উঠবার অপেক্ষায় সে রয়েছে। চাঁদটা উঠলেই, শিমুলতলার ঘাটে রত্না পার হয়ে মাহ্‌তাব আবার নবীনগরেই ফিরে যাবে।

দুপুরবেলায স্কুল ছুটি দিয়ে আখেব ক্ষেতের ভেতর দিযে পথ খুঁজে খুঁজে বত্না পাব হয়ে মাহ্‌তাব পালিয়ে এসেছিল এখানে। এপারে আশ্রয় অবশ্য সুলভ কিন্তু খাদ্য বড়ই দুর্লভ। সাঁওতাল বাড়িতে খাওয়া দাওয়া মুসলমান সমাজে নিষেধ। কিন্তু সেটাও মাহ্‌তাবের কাছে বড় কথা নয়। প্রয়োজনবোধে সমাজের পাঁচজনে জানতে না পারে এমনভাবে লুকোচুরি করে সাঁওতাল বাড়িতে খেতে তার আপত্তি নাই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, খাবে যে সে খাদ্য কোথায়? নবীনগরে এ সময়টা যদি সিকি ভাগ লোকের অর্ধাহার অনাহার শুরু হয়ে থাকে, এপারে প্রায় ষোল আনা লোকেরই সেই অবস্থা। বেশীর ভাগ লোক এখন খাবার জন্য মাটি

খুঁড়ে বুনো আলু সংগ্রহ করছে। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এই যে, সবচেয়ে বেয়াড়া ধরনের ওলের চেয়েও এ আলু বহুগুণে হিংস্র। তবে পেটের ভুখা কত অপাঙ্‌ক্তেয় জিনিসকে তার প্যাঁচে প্যাঁচে জড়িয়ে দিনে দিনে যে মানুষের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে তুলেছে, সভ্যতার ইতিহাসই তার সাক্ষী হয়ে আছে। এখানকার সাঁওতালেরা বন-জঙ্গলের মধ্যে থেকে খুঁজে খুঁজে মাটি খুঁড়ে বুনো আলু তুলে, পারলে দু-এক দিন তা ঘরে রাখে। তারপর সেগুলো ফালি ফালি করে কেটে একটা ঝাঁকায় করে রত্নার স্রোতে ডুবিয়ে রেখে আসে। দু-এক দিন বাদে আলুর বিষাক্ত কষগুলো যখন সব ঝরে গিয়ে স্রোতে ধুয়ে চলে যায় তখন সেগুলো রোদে শুকিয়ে ঘরে তুলে নেয়। এর পর তা সিদ্ধ করে যেমন খুশি খাওয়া চলে।

আঁধারকোঠার সাঁওতালেরা তো তবু যা হোক একটা বিকল্প ব্যবস্থা বের করেছে। কিন্তু নবীনগরে আবার তা চলে না। এক সময়ে সাঁওতালেরাও যখন বুনো আলু খেত না তখন এগুলো ছিল শূয়োরের খোরাক। শাস্ত্রীয় বিধির চুলচেরা বিচারে এই বুনো আলুকে 'হারাম' অর্থাৎ অবৈধ খাদ্য হিসাবে গণ্য করা চলে কি চলে না তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। তবে একটা অবাঞ্ছিত স্মৃতি এর সাথে জড়িত থাকায় আজো তা 'শূয়োরে আলু' নামে অভিহিত হয়ে নিছক সংস্কারবশেই 'হারাম' হয়ে আছে। আজো ঐ নবীনগরের মুসলমান সমাজে বৈধ পবিত্র খাদ্য হিসাবে পাঙ্‌তেয় হয়ে উঠতে পারেনি।

যাই হোক, টুইলা সর্দারের মেয়ে সুখ্‌মীকেই রত্নার ওপারে পাঠানো হয়েছিল সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে আনতে। সেই সুখ্‌মীই তার সংগৃহীত বিবরণ এতক্ষণ ধরে মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাখিল করছিল। সুখ্‌মী যেমন সাহসী তেমনই বুদ্ধিমতী। সে এক বোঝা জ্বালানী কাঠ মাথায় করে বিক্রির ছলে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে সুন্দরদিঘির হাট পর্যন্ত বেড়িয়ে দেখে এসেছে। দারোগা-পুলিশ কেউ কোথাও নেই। শুধু সুন্দরদিঘির হাটখোলার কাছে বোর্ডের অফিসের বারান্দায় কিসমত চৌকিদারকে শুকনো মুখে বসে থাকতে দেখেছে সুখ্‌মী। থানা পর্যন্তও যেতে পারতো সে। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সন্ধ্যার মুখে ফিরবার সময়ে পথের পাশে ক্ষেতভরা আখ দেখে সুখ্‌মীর মনে পড়ে গেল মাষ্টারের ক্ষুধার্ত মুখখানার কথা। তাই সে দুটো ভাল দেখে আখও ভেঙে নিয়ে এসেছে।

আখ চিবোতে চিবোতে মুগ্ধ হয়ে কাহিনীটা শুনছিল মাহ্‌তাব। ছেলেমানুষী ঢঙ-এর কথাগুলো বেশ লাগছিল তার। সুখ্‌মী অবশেষে বললো — তুমার কুছু ডর নেই মাষ্টার। পুলিশ-ফুলিস তল্লাটের মধ্যে কই নেই। বাপ-মায়ের বেটা বাপ-মায়ের কাছে যাও। ঘরে যাইয়ে কুছু খাও। জবর ভুখ লাগছে তুমার।

বুকখানা ভরে উঠলো মাহ্‌তাবের। সুখ্‌মীর দরদ মাখানো কথাগুলোয় কি রকম যেন একটা জাদু আছে!

টুইলা সর্দার উপস্থিত ছিল সেখানে। সেও সুখ্‌মীর কথাতেই সায় দিল।

আজই যখন একটা হামলা হয়ে গেল, তখন দু-একদিন যে আপাতত ওঁরা হানা দেবে না তা মাহ্‌তাবও আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু সে ভাবছিল অন্য কথা। ভোর রাতে রত্না পার হয়ে চোরাপথে কিসমতই যে থানায় গিয়ে সংবাদ দিয়ে দারোগা-পুলিশ ডেকে নিয়ে এসেছে এ বিষয়ে মাহ্‌তাবের মনে আর কোনও সন্দেহ নাই। এখন কথা হচ্ছে, গাঁয়ের ভেতরে থেকে লোকটা যদি এরকম শয়তানি শুরু করে তবে কয়দিনই বা এভাবে পালিয়ে পালিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে।

আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছিল। আখ চিবোতে চিবোতেই মাহ্‌তাব রওনা দিল। মনে মনে ঠিক করল সে যে দুই-একদিনের মধ্যেই রোশেনাবাদের সহকর্মীদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে একটা শলাপরামর্শ করবে।

টুইলা সর্দার আর তার সম্বন্ধী ঝলুক মাঝি মাহ্‌তাবকে খানিকদূর এগিয়ে দিল। সুখ্‌মীও প্রায় রত্নার ধার পর্যন্তই নিঃশব্দে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল।

শিমুলতলা ঘাটেব কাছাকাছি এসে ওকে বিদায় দিয়ে মাহ্‌তাব আস্তে আস্তে জলের ধারে নেমে এল। একটা বুনো ফুলের সৌবভে নদীব ধাবটা মৌ মৌ কবছিল। কেন যেন বড় ভাল লাগছিল মাহ্‌তাবেব।

রত্না ছোট হলেও তেজী। বনেব ভেতব দিয়ে প্রবাহিত এ নদীর বুকে লুকিয়ে আছে অজস্র ছোট ছোট ঝবা। পাতাল ফুঁড়ে সেই ঝবাগুলোব মুখ দিয়ে অনবরত ঝিবঝিব করে বেব হয়ে আসছে জলের ধাবা। তাই অগভীর হলেও কোন সময়েই এ শুকিয়ে যায় না। এখন তো কার্তিক মাস। চৈত-বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মেও এক হাঁটু জলে টেব পাওয়া যায় তার তীব্র পাহাড়ী স্রোতেব মেজাজ। বত্নাব বুকে চাঁদখানা গলে গলে ছলকে ছলকে ভেসে যাচ্ছিল। মাহ্‌তাব সেই চাঁদনী-মাখা জলে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে নেমে পড়ল।

ওপাবে গিয়ে জল ছেড়ে তীরে উঠতে যাবে মাহ্‌তাব এমন সময়ে তার নজরে পড়ল সামান্য একটু উজানে জলের একেবারে ধারে কে একটা লোক চুপচাপ বসে রয়েছে। হঠাৎ এমন মিঠে মেজাজটা তার ভয়ঙ্কর বকম বিগড়ে গেল। কতখানি স্পর্ধা! এ বাতে কে এখানে গোয়েন্দাগিরি কবতে এসেছে রে!

হাঁক ছাড়ল মাহ্‌তাব— কে রে মানুষ উডা!

জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, লোকটা পড়ি মবি কবে ছুট দিল। কিন্তু জোয়ান মাহ্‌তাবের তখন জেদ চেপে গিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে সে পেছন থেকে জাপ্‌টে ধরে ফেললো।

— মাতাব!

কিসমতেব গলা নয়? উত্তেজিত মাহ্‌তাব আগে খেয়াল কবেনি। এখন ভাল করে চেয়ে দেখে, তার দু'বাহুব কবলেব মধ্যে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে কিসমত দুই হাতে শক্ত কবে একখানা ঝাঁকা ধবে বয়েছে আব তাতে ফালি ফালি কবে কাটা একবাশ 'শূয়োরে আলু'।

মাহ্‌তাব হকচকিয়ে গেল।

কিসমতেব গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল। একটা ঢোক গিলে বললো — সব মানুষকে তো কওয়া যায়না মাতাব! তবে তোমাক্ কওয়া চলে। ফজরে আসিয়া মানুষজন ওঠার আগেই মাটি খুঁড়ি চুপি চুপি এই আলু তুলিযা কাটিযা পানির সোঁতায় আজ ডুবায়ে রাখছিলাম।

ভোববেলাব কথাটা মাহ্‌তাবের মনে পড়ে গেল। কিন্তু, কি বলবে মাহ্‌তাব ঠাহর কবতে পাবছিল না। কিছুই অবশ্য বলতে হল না। দেখতে দেখতে কিসমতেব স্বাভাবিক মেজাজ ফিরে এল। বললো — মাতাব, দিন কয়েক ইস্কুল করা তুমি বাদ দেন। এই খবরটা তোমাক্ দিবাব জন্য মুই কত মানুষকে তোমার কথা পুছ কবছি! আজ হঠাৎ ওরা আসিয়া পড়িল, আলাবাক্সেব বাপকে দিযা তোমার মাকে খববটা পাঠায়ে, কত রঙ্ ঢঙ্ ছল বাহানা করি শয়তানদের যে মুই ঠেকাইছি তা খোদাই জানে।

কোমবের কাছ থেকে ভাঁজ-করা ছোট একটা বস্তা বের করে তাতে ভিজে ঝাঁকা থেকে আলুগুলো তুলে তুলে ভরছিল কিসমত। একটু থেমে বললো — হাটের ইজাবাদাব তমিজ হাজী কইলে, তোমাক্ থানায় ধরি দিতে পারিলে উঁই আমাকে নগদ পঁচিশ টাকা বখশিশ দিবে। পঁচিশ টাকায দেড মণ ধান পাওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু মাতাব, তোমবা দশেব খেদমত করেন। সেই ভাত কি মোর হারাম হইত না?

বিমুগ্ধ মাহ্‌তাব তখনও কিছু বলতে পাবল না। চাঁদের আলোয় ঝাঁকা ভর্তি ফালি ফালি করে কাটা 'শূয়োরে আলু'গুলো দেখে শুধু তার মনে হল যে কিসমতের পবিত্র স্পর্শে ওগুলো আজ 'হালাল' হয়ে উঠেছে।

লাখে না মিলয়ে এক

গোলাম কুদ্দুস

লাখে না মিলয়ে এক।

আমি ষাট লাখে পেয়েছিলাম তোমাকে। ভিখু, কত বছর আগে কৃষকদের মধ্যে এসেছিল সেই আলোড়ন, যাকে বলা হয় তেভাগা আন্দোলন? সে কি সতের বছর আগে? আর তাতে কি ষাট লাখ কৃষক অংশ নিয়েছিল? মাথা গুনতি করে কি এই সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল? তবু এটাই চলে আসছে। এর সত্যিমিথ্যে আমি জানিনে। তবে বাংলাদেশের এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আন্দোলন যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এর খবরাখবর জোগাড়ের জন্য আমাকে তখন বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। আজ এতকাল পরে অবাক হয়ে ভাবছি, এত লোকের মধ্যে শুধু তোমার কথাই কেন এমন করে মনে আসছে?

অথচ তুমি বার বছরের কৃষক-বালক বই তো নও। কোন বৃহৎ কাণ্ডও তুমি ঘটাও নি আর আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ও মাত্র কয়েক ঘণ্টার, তবু এমনটা কি করে হল?

তোমার নামটা ভাই আমি বেমালুম হারিয়ে ফেলেছি। তোমাকে যে নামে ডাকছি, ওটা আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর নাম। তাকে বহুকাল হারিয়েছি, কিন্তু নামটা স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই নামের লেবেলটা আজ আমি তোমার গায়ে সেঁটে দিলাম।

কিন্তু ভিখু, কানু ছাড়াও গীত আছে। ভাবতে বসলে ক্রমে ক্রমে আরো অনেক মুখ এবং ঘটনার কথা মনে পড়ে। কি করে ভুলি হেমন্তদাকে! কৃষক সমিতিতে যোগ দেওয়ার আগে সে নাকি ডাকাত ছিল। পৌষমাসের রাত্রিতে টর্চ জ্বেলে গ্রামের পথে চলেছি, সামনে খানিকটা জল জমে আছে, থমকে দাঁড়িয়ে জুতো খুলতে যাচ্ছি অমনি আমাদের নব-বাল্মীকি আমাকে পাঁজা-কোলে করে শূন্যে তুলে ধরল। — আহা কর কি! ছাড়ো! ছাড়ো!... কে শোনে কার কথা। যতই বলি, আমিও গ্রামের ছেলে, ততই হেমন্তদা বলে, আহা আপনারা হলেন কলকাতার লোক, আপনাদের কি জলকাদা সহ্য হয়? ..... হেমন্তদা হিমশীতল জলটা পার করে আমার বপুটাকে হালকা সোলার মতো ডাঙায় নামিয়ে দিল। পরে সেই হেমন্তদাকে আর একবার দেখেছি, তিনি তখন চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। সেই লোহার মতো শক্ত শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। দেখলে মানুষটাকে চেনাই যায় না।

সব আন্দোলনে যুবকেরাই থাকে সকলের পুরোভাগে। কৃষক আন্দোলনেও সেদিন তার ব্যতিক্রম হয়নি। 'এক ভাই, এক টাকা, এক লাঠি'— আওয়াজটা তাদেরই সব থেকে আকৃষ্ট করেছিল। তারাই দলে দলে ভলান্টিয়ার হয়েছে, তারাই গাথা বেঁধে ধান কেটেছে, তারাই লাঠির ডগায় নিশান বেঁধে মিছিল করেছে, আর তারাই রাত জেগে পুলিসের হামলা ঠেকাতে পাহারা দিয়েছে। কিন্তু কৃষক-মেয়েরা তাদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। আমি এখনো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি রানী-শংকইলের মেয়েদের। তারা পুলিসের হাত থেকে চারটে বন্দুক কেড়ে এনেছে। পুরুষদের মধ্যে হুলুস্থুল কাণ্ড! কি করে বন্দুক ফেরত দেওয়া

যায়, সেই এক ভাবনা। আর এই সময় মেয়েদের মারধোর করার সনাতন রীতিটা হঠাৎ যুক্তি বহির্ভূত বলে মনে হতে লাগল। তখন এ নিয়ে অনেক গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষক সমিতির কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অভিযোগ করার দৃশ্য আমিও দু একটা দেখেছি।

ভাবলে অবাক লাগে তখন কত বড় বড় ঘটনা কত সহজে ঘটত। তোমার সে-সব বোঝাব মতো তখন বয়সও হয়নি, সুযোগও ছিল না। তুমি যেখানে জন্মেছ, সেখানেই বড় হযেছ। তুমি কোনো স্কুলে পড়নি, বাংলা দেশকে জানা তো দূবেব কথা, একখানা মানচিত্রও দেখনি। তুমি কি করে জানবে, মস্ত অবিভক্ত বাংলা দেশে কি তোলপাড় কাণ্ড চলছিল। তোমাব গ্রাম থেকে আট-দশ মাইল দূবে কি ঘটেছিল, তাব খববই কি তুমি জানতে?

তোমাব সঙ্গে দেখা হওযার মাস তিনেক আগে আমি সেইবকম একটা জাযগায গিযেছিলাম। রূপনাবাযণ বাযেব নামটা হযত শুনে থাকবে। তোমাদেব এলাকাব এম এল এ। আমি তাঁব ঘরেব দাওয়ায় বসে কেরোসিনেব ডিবেব আলোয খবব লিখতাম, আব মাঝে মাঝে কান পেতে শুনতাম গ্রামেব বাস্তায পাহাবাবত ভলান্টিয়াবদের মাতোযারা কণ্ঠের আওযাজ — 'জান দেব তবু ধান দেব না।' দাওযাব আব এক পাশ থেকে উঠত কযেকটা ছাগল, আব তাদের ডেকে পার্শ্বে শাযিতা বাড়ির বুড়ো-মা বিড় বিড করে কি যেন বলত। সামনে লাউ-কুমড়োর নীচু মাচাটাব মধ্যে জ্বলত জোনাকী। মাটির সানকীতে ডাল-ভাত খেযে আমি ওভাবকোট গাযে জড়িযে গবম খড়েব বিছানায শুযে শীতে কাঁপতাম, আব পাহাবাবত ভলান্টিযাবদেব নৈশ বিচবণেব জামাকাপড়েব অবস্থার কথা ভেবে লজ্জা পেতাম। সকালে তাবা অনেকে এসে আমাকে ঘিবে বসত. আব শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমাব ওভাবকোটেব ওপব সন্তর্পণে হাত বুলিযে বলত, — কমবেট, এটা গাযে দিলে শীত লাগে না, — না?

মানুষেব সঙ্গে একাত্ম হওযা কি সোজা কথা? এই জামাকাপড়েব প্রাচীব একটা ব্যবধান সৃষ্টি কবেছে। তাই বলে একে তো হঠাৎ বাদ দেওযাও যায না। ওদেব যে বস্ত্রে যে শীত সহ্য হয, আমি সে রকম কবতে গেলে নিউমোনিযায ভুগব। ওবাও তা আশা কবে না। কলকাতা থেকে ভদ্রলোক 'কমবেট' এসেছে. এতেই ওবা খুশী। আব আন্দোলনেব উৎসাহেব জোযাব আপাতত সব ব্যবধান ভাসিযে নিযে গেছে।

অথচ এই হঠাৎ আলোব ঝলকানিব মতো আন্দোলন বুঝতে হলেও তাব পিছনেব কথাটা বুঝতে হবে। কাবণ এই আলোড়ন আকাশ থেকে ঈশ্ববেব আশীর্বাদেব মতো নিশ্চয ঝবে পড়েনি। এরকম আকস্মিকভাবে তো সংসারে কিছু হয না। ১৯৪৩ সনেব মাবাত্মক দুর্ভিক্ষেব সঙ্গে এই আন্দোলনেব একেবাবে নাড়িব যোগ। সেকথা কৃষকেরা সবাই জানে, বোঝে এবং বাববাব করুণ সুরে আমাকে স্মরণ করিযেও দিযেছে। কত গ্রামেব মধ্যে দিযে যেতে যেতে তারা আমাকে কববেব সাবি দেখিযে দিযেছে। শ্মশানে যাবা পুড়েছে তারা তো স্মৃতি রেখে যাযনি। তবে সেদিন সবাইকে তো শ্মশানে নিযে যাওযা সম্ভব হযনি। গ্রামেব লোক বাধ্য হয়ে গ্রামান্তেব কোন জঙ্গল বা আমবাগান বা মাঠেই তাদেব ফেলে দিযে গেছে। কৃষকরা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে — ঐ যে ঐখানে! তিন বছব পবেও গাদা গাদা ভাঙা হাঁড়ি কলসী মালসা তার সাক্ষী হয়ে আছে।

দুর্ভিক্ষের সময় আমি ছিলাম শহরে, গ্রামেব কান্না আমি কি করে বুঝব! শুধু সেটা যখন করুণ মিনতির মতো শহরের ফুটপাতে এসে মাথা কুটে মরেছে, তখন চোখের জল ফেলেছি। ক্রমে ক্রমে তাও শুকিয়ে গেল। তবু তখনকাব একটা ঘটনা কি করে তোমাকে আমার নিকটবর্তী করেছে, সেই কথাই আজ অকপটে সব বলব।

একদিন বাত বাবোটা নাগাদ বাড়ি ফিরছি। সিঁড়িব কাছটা রীতিমতো অন্ধকার। সেখানে প্রায়ই একটা কুকুব শুয়ে থাকে। সাবমেয়-প্রীতি আমাব নেই, আমি কতবার যে ওটাকে লাথি মেবেছি, তবু আপদটাকে দূর করতে পারিনি। সেদিনও কুকুর মনে করে কুণ্ডলী পাকানো একটা বস্তুর উপর পদাঘাত করলাম। অমনি মানুষ-কণ্ঠের দুর্বল আর্তনাদে চমকে উঠলাম।

— কে? কে ওখানে শুয়ে?

কোন সাড়াশব্দ নেই।

আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করাব পর একটি বালক কণ্ঠের উত্তর এল — আমি।

— আমি কে?

— আমি।

ওপরের ফ্ল্যাট থেকে এক ভদ্রলোক টর্চহাতে নামছিলেন, সেটা ফোকাস কবতেই নামহীন গোত্রহীন 'আমি'কে দেখা গেল।

একটি বছর নয়েকের শীর্ণ কঙ্কালসার উলঙ্গ বালক, আর একটি বছব চারেকেব অনুরূপ শীর্ণ এবং উলঙ্গ বালককে কোলে জড়িযে শুয়ে আছে।

— তোবা কোত্থেকে এসেছিস?

কোন উত্তর এল না।

— তোর বাবা নেই?

— মবে গেছে।

— তোব মা নেই?

— মবে গেছে।

— ওটা কে?

— আমাব ছোট ভাই।

— কাঁদছে কেন?

— জ্বব।

ভিখু, তোমার কাছে সত্যি কথাই বলব। টর্চধারী নেমে গিযে মোটরে উঠল, আব আমি হঠাৎ এমন ক্লান্ত বোধ কবলাম যে সে তোমাকে বোঝাতে পাবব না। ভিতবটা যেন অসাড় হয়ে এসেছে। গত দুসপ্তাহ ধবে শহরে মৃত্যুর মহোৎসব দেখছি। কি কবতে পাবি, কি কবতে পেরেছি? কিন্তু মৃত্যু দেখতে দেখতে মনটা যে কেমন কবে পাথর হযে উঠেছিল, সেদিন রাত্রেই তা টের পেলাম। অথবা আদৌ টেরই পেলাম না। তাই নির্বিবাদে ছেলেদুটোকে ফেলে আমি টলতে টলতে ঘরে গিযে শুয়ে পড়লাম।

তখন শীত পড়তে শুরু কবেছে। একবার মনে হল, উলঙ্গ বড়ভাইটা শুধুমাত্র নিজেব কঙ্কালসার দেহটার উত্তাপ দিয়ে জ্বরোত্তপ্ত ছোটভাইটিকে রক্ষার কী করুণ চেষ্টাই না করছে। একথা এমন স্পষ্ট করে যে তখন ভেবেছি, তাও নয়, তবু একবার মনে হল চাদরটা দিযে ওদেব ঢাকা দিয়ে এলে হত। কিন্তু তক্ষুনি অবসাদের সুরে মন বলল, সব মরছে, ওরাও মরবে, মরতে দাও।

সকালে উঠে দেখলাম, ন্যাংটো ছেলেটার দুই বাহুর মধ্যে তার ছোটভাইটি মরে রয়েছে।

জানো ভিখু, আজও চোখ বুঁজলে তাদের দেখতে পাই। নিজের চেহারাটা নিজে যখন দেখি তখন শিউরে উঠি। অথচ নিজেকে এতকাল কত উঁচুদরের জীব বলে মনে করে এসেছি। বিশ্বসংসারে দুর্ভিক্ষের প্রলয়ে যখন ঘরবাড়ি বাপ-মা সবই ভেসে গেল, তখনো ঐ ক্ষুদ্র বালকটি তার ক্ষুদ্রতর ভাইটিকে ছাড়েনি, দুই হাতে বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চেয়েছে। আর আমি? সভ্যতার খোলস-পরা আমি মৃত্যুর মহোৎসব দেখতে দেখতে অবশ হয়ে ঘরে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে পেরেছি তো।

সে সময় তোমাব বযসও হবে ওরি মতো — বছর নয়।

— তুমিই বা দুর্ভিক্ষের কি বুঝবে? তোমার তো তখনো বোঝবার মতো বয়স হয়নি। গ্রামের সে ভয়ানক দিনগুলিব মধ্যে যে না থেকেছে, সে কি করে বুঝবে কৃষক মেয়েদের মনের ভাব, যখন তারা ধানের আঁটিব ওপব হাত বুলিযে বলে, — মা লক্ষ্মী, ঘরে এযেচ? তোমাকে আমি ছাড়বো না। — 'জান দেবো তো ধান দেবো না'ব বহস্য এই ।

কিন্তু কৃষকদের সঙ্গে অনেকটা মিশে গিয়েছিল তোমাদের অঞ্চলের কৃষকনেতা কালী সরকাব। তার ফলও সে ভোগ কবেছিল। তাব জ্যাঠামশায় জোতদাব এবং ধনবান। আন্দোলনেব শুরুতেই বাড়ির মাঝখানে পাঁচিল তুলে দিলেন। বাড়িব একমাত্র ইঁদাবাব জল বন্ধ কবলেন ভ্রাতুষ্পুত্রেব পরিবারে।

গ্রামেব কৃষকেবা অবশ্য তার জবাব দিয়েছিল।

কোনো লোক তাঁর বাড়িতে খাটেনি, তাঁব ধান মাঠে পড়ে ছিল। তাঁর আলুব ক্ষেত চষা হয়নি। তাঁব গোয়াল-ভবা গরুব মুখে ঘাস বিচালি জোগাবাব রাখাল পর্যন্ত জোটেনি। কালী সবকার আমাকে গম্ভীব মুখেই জানিয়েছিলেন, — ব্যাপাবটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দুই পক্ষেব কেউই কাউকে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

কৃষকদেব মনেব ভাব একটু একটু বুঝতে পাবছি বৈকি। কি কবে তারা ছাড়বে? দুর্ভিক্ষেব পবেব বছব সব জাযগায ভালো ফসল হয়নি। তার পবেব বছব বকেযা বাকি ঋণেব নামে কৃষকদেব সর্বস্বান্ত কবে শুষে নিয়ে গেছে। এই তৃতীয বছরে সোনার ধান মাঠে মাঠে আশাব বাণীব মতো হাতছানি দিচ্ছে।

আব আমাব মনেব ভাব শুনবে? আমি এসেছি সেই কলকাতা শহব থেকে, যেখানে কিছুকাল আগে মানুষ পশুব মতো আচরণ কবেছে। তখন সেই দাঙ্গাব দিনগুলি কতবার ভেবেছি এবং পবস্পবকে বলেওছি — এব চেয়ে মানুষের জন্য কিছু একটা করতে গিয়ে গুলি খেযে মরাও ভালো। সেই কিছু একটা, আমার চোখেব সামনে, মানুষ আব শস্যেব যুগ যুগান্তবেব নিবিড় সম্পর্কের রূপ নিযে উপস্থিত। মহানগবেব অন্ধকূপ থেকে হঠাৎ আমি ছাড়া পেযেছি গ্রাম গ্রামান্তবের দিগন্ত বিস্তারিত খোলা মাঠের মধ্যে। আমার মাথার ওপব রৌদ্রদীপ্ত ঘননীল উজ্জ্বল অনন্ত আকাশ, আব চারপাশে আশাদীপ্ত নক্ষত্রেব মতো অজস্র মানুষের মুখ। এই সব আগুনেব ফুলকি ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র, রোদে-পোড়া কালো মানুষের অঙ্গার স্তূপে।

বুঝতেই পারছ এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ মনোভাব কৃষক-জীবনের কঠোর বাস্তবতাব বিশ্লেষণেব অন্তবায ছিল। তবু মনে কবো না একেবাবেই চোখ বুজে ছিলাম।

নড়াইলে একজন কৃষক ভাতেব থালা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল — এটা তেভাগার ধানেব ভাত।. ... তাকে খুশী করাব জন্য আমি সজ্ঞানেই এমন মুখভঙ্গি কবেছিলাম যাতে তেভাগাব ধানেব ভাতেব বিশেষ মিষ্টত্ব এবং বসাস্বাদনেব প্রযাস বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

দিনাজপুবে এসে ফুলবাড়ির মাঠে প্রথম তেভাগাব ধান কাটা দেখলাম।

একটা লাল নিশান পুঁতে রেললাইনের ধাবে ধান-কাটা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে গানও গাওয়া হচ্ছে। একজন তামাক সাজছে সারাক্ষণ। কয়েকজন লোক ভাত-রাঁধার আয়োজন করছে। আজ মাঠেই বনভোজনের ব্যবস্থা। আমার পক্ষে খুশী এবং উত্তেজনা চেপে রাখা মুশকিল। আমি কয়েকজন সাঁওতাল কৃষকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা কবলাম।

এই সময দার্জিলিং মেল পাস কবে। হঠাৎ সেই দুরন্ত গাড়িটা মাঠের মধ্যে আমাদের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। ড্রাইভার এবং ফায়াবম্যানেরা হাসছে, আর হাত নেড়ে নেড়ে

কি যেন বলছে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে কাস্তে হাতে একদল কৃষক ইঞ্জিনেব দিকে দৌড়ে গেল। ওদিকে ওরাও গাড়ি থেকে পাল্টা ধ্বনি দিচ্ছে। গাড়ির যাত্রীরা হতবাক হয়ে এই কাণ্ড দেখছে। হঠাৎ শুনলাম ধ্বনির ভাষাটা বদলে দিযে কে যেন বলে উঠল — কৃষক মজুর এক হও।.... ওদিকে গাড়ির পিছন থেকে গার্ড ক্রমাগত তার ফ্লাগ নেড়ে বাঁশি বাজিয়ে ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু গাড়িটার নড়ার লক্ষণ নেই। কাবণ তখন কৃষকদের হাত থেকে একটা লাল নিশান নিয়ে ইঞ্জিনের মাথায় বাঁধা হচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল দার্জিলিং মেলের মতোই আন্দোলন বাঁধা লাইন দিয়ে দ্রুত সম্মুখে ধাবিত হবে।

কদিন পরে জেলা শহরে গিয়ে দেখি, সেখানে খুব উত্তেজনা। কোর্ট-কাছারিতে ঐ একমাত্র আলোচ্য বস্তু। আব ট্রেনে যেতে যেতে তেভাগা আন্দোলনেব নেতাদের সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ধারণা ব্যক্ত হতে শুনলাম। কেউ তাদের রাক্ষসেব মতো নৃশংস, কেউ বা তাদের অতি-মানব বলে বর্ণনা করছে।

ভিখু, সংস্কৃতি কি তা জানো? ঐ রকম শব্দ কখনো তুমি নিশ্চয়ই শোনো নি। তবু শোনো, শহরেব এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এক সভার আয়োজন কবল, তারা নাকি আমাব কাছ থেকে আন্দোলনের কথা শুনতে চায। আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তবু যেতে হল। কি যে বলেছিলাম আজ আমাব বিন্দুমাত্র মনে নেই, শুধু মনে আছে সভাশেষে বেরিযে আসতেই কে একজন বলল — চিবির বন্দবে গুলি চলেছে। . ঐটাই তেভাগা আন্দোলনেব প্রথম গুলির খবব।

চিবির বন্দব জায়গাটা দিনাজপুব থেকে বেশ কযেক মাইল দূরে। ট্রেনে গিযে আবাব কিছুটা হাঁটতে হয। দলবল বেঁধে সেখানে যাওযা গেল। যে জাযগাটায গুলি চলেছে সেটা বিরাট এক মাঠেব মাঝখানে। চাবদিকে পাকা ধানেব সমুদ্রে যেন ঢেউ খেলছে। একটা জাযগায শুধু কিছু ধানের শিষ মাটি ছুঁযেছে — সেটা বন্দুকের গুলিতে আহতদেব শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগেকাব ধড়ফড়ানিব ফল। নোযানো ধানেব গুচ্ছ তুলে দেখলাম তাব নীচেব মাটি রক্তে তামাটে হযে গেছে। কেউ কেউ সেই মাটি হাতে তুলে নিল। কৃষকবা আমাব হাতে কয়েকটি বুলেট উপহাব দিল। পুলিস কৃষকদেব তাডা কবে গ্রামেব প্রান্তে নিযে গিযে গুলি চালিয়েছিল, তাব কতকগুলো ঘবেব মাটিব দেওযালে ঢোকে। কৃষকেবা তা খুঁড়ে-খুঁড়ে বের কবেছে। এদেব সবাই মুসলমান। তাদেব ইচ্ছা আমি এগুলি কলকাতায সোহরাওযার্দির হাতে তুলে দিই। তিনি তখন লীগ-মন্ত্রিসভাব কর্ণধাব।

বেলা বাড়ছে। একখানা মাঠ পাব হযে আমবা এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি এসে উঠলাম। এখানেই আমাদেব আহাবের আয়োজন হয়েছে। অনেক লোক জমেছে, তাবা শুনতে চায অতঃপব কি করণীয।

চিরির বন্দবের কৃষকরা সেদিন কি চেযেছিল জানো? ধনুক। এ অতি সত্য কথা। তাদেব কাছে 'এক লাঠি, এক টাকা, এক ভাই' চাওযা হয়েছিল, তাবা তা দিয়েছিল। এখন তারা নিজের চোখে দেখছে হাজার হাজার লাঠি দিয়েও কযেকটা বন্দুককে ঠেকানো, গেল না। তাহলে এখন কি করবে তারা? আমাব কাছে এটা নতুন অভিজ্ঞতা। আমি গ্রামেই বড় হযেছি, কৃষকদের চিনি, একটা চরের লড়াইতেও তাদের দেখেছি, কিন্তু সেখানেও কয়েকজন লাঠিয়াল প্রধান ব্যক্তি। কৃষকেরা শান্তিতে থাকতেই ভালোবাসে। এখন বুঝতে পারি মানুষ কখন চরমপন্থার কথা চিন্তা করে। চরম নির্যাতনই হচ্ছে চরমপন্থার পরিপোষক।

ভিখু, তোমাকে আমি তত্ত্বকথা শোনাতে বসিনি, তেভাগার ইতিহাসও ব্যাখ্যা করছি না। এ কাহিনী আসলে তোমাকে নিয়েই রচিত। তবু যে কতকগুলো আনুষঙ্গিক ঘটনা এসে পড়ছে তার কারণ, এগুলি না বললে তুমি আমার মনে কেন স্থান নিয়েছ, তা বোঝা এবং বোঝানো যাবে না। এখন তোমার বয়স ঊনত্রিশ হওয়ার কথা। তুমি অনেক কথাই এখন বুঝবে।

এইবার অদ্ভুত এক কাহিনী শোনাব তোমাকে। অথচ এক হিসাবে সেটা নিতান্তই এক মামুলি ঘটনা। শুধু দৃষ্টির হেরফেরের জন্য অদ্ভুতকে মামুলি, আর মামুলিকে অদ্ভুত বলে মনে হয়।

চিরির বন্দরে খাওয়া দাওযাব আয়োজন ভালোই হযেছিল। কৃষকেবা উঠোনে, আমরা ভদ্রলোকের ঘরের বারান্দায় খেতে বসেছি। হঠাৎ নজরে পড়ল একজন অতি শীর্ণ অতি মলিনবস্ত্র পরিহিতা নারী একা একা খেতে বসেছে। তার খাওযাব স্থান কোথায় জানো? পাশাপাশি দুখানি খড়েব ঘবেব চালা থেকে বৃষ্টির জল পড়ে যে জাযগাটা ঢালু গর্তের মতো হয়েছে, সেইখানে গর্তের মধ্যে কলাপাতা ভাঁজ করে সে বসেছে।

আমি নিতান্ত মামুলিভাবেই প্রশ্ন কবেছিলাম — মেয়েটাকে সাঁওতাল বলে মনে হচ্ছে।

কে যেন স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিল — হ্যাঁ, শিববামের বৌ!

— মানে, যে শিববাম শহীদ হয়েছে?

— হ্যাঁ তারই বৌ।

আমি হাতে ভাতেব দলা নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর সেই ভাত আমাকে গিলতেও হল।

ভিখু, তুমি হয়ত জানো না, চিবির বন্দবে সেদিন শিবরাম আর সমীরুদ্দীন মারা যায়। সেই শহীদদেব হত্যাব প্রতিবাদেই আমাদেব চিরির বন্দরে আগমন।

অথচ একজন শহীদেব বৌ আজ সব থেকে নিকৃষ্ট জাযগায কুকুব-বিড়ালেব মতো খেতে বসেছে কলাপাতা বিছিযে। আর সেটা ঘটেছে সকলের চোখেব সামনে এবং কাবোবই তাতে কিছু মনে হচ্ছে না। এব নামই বোধহয একাত্মবোধ?

অথচ মজা এই যে শিবরাম এবং সমীরুদ্দীন মরেছে, তাদেব এই আন্দোলনে নিজেদেব কোন লাভই ছিল না। তারা ক্ষেতমজুব। তবু তাবাই প্রাণ দিল। আব এ-নিয়ে অনেক গবেষণাও শোনা গেছে -— ক্ষেতমজুরেবা কেন এত ক্ষেপল।. . কিন্তু সব সত্ত্বেও তলাব মানুষ তো ওপবে উঠতে পারল না? তাব উত্থান কে চায়? আমবা যে সম্পন্ন কৃষকেব বাড়িতে খেতে বসেছি তাদেব কাছে শিববামের বৌ তো দুঃখী-কাঙাল বই কিছু নয। কিন্তু অন্যেবা তা সহ্য কবলে কি করে? অন্তত আজকেব দিনটা ঐ শহীদেব বৌকে কি ঘবেব দাওযায এনে বসানো যেত না?

-— না, যেত না, সে তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

এবপর সমীরুদ্দীনের বাড়িতে যাওযাব ইচ্ছা আমার লোপ পেযেছিল। তবু যেতে হল। সেখানে শিবরামেব বৌয়েব দ্বিতীয সংস্কবণ ম্লানমুখে উঠোনে বসে আছে। শুধু তফাৎ এই, তার চাবপাশে চাব পাঁচটি ন্যাংটো ছেলেমেয়ে। খোলা উঠোনে চুলোয একটা হাঁড়িতে কি যেন ফুটছে। ওপাশে একটা দাওযায় একটা ঢেঁকি শোভা পাচ্ছে। তার ওপবেব খড়েব চালা অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছে। বৃষ্টির জলে দাওযাটাও ক্ষয়ে গেছে। আব একখানি মাত্র ঘর। তাব অর্ধেকটা ভেঙ্গে পড়েছে। — এই হল আব এক শহীদেব ডেবা। সমীরুদ্দীনেব বৌ লোক দেখে মাথায় কাপড দিতে গিয়েছিল, কিন্তু অতদূব ওঠানোব মতো কাপড কোথায? যা আছে তার ছিন্ন অংশেব ফাঁকে দেহ অসংবৃত। কাজেই সে এব, আমবা আড়ষ্ট হয়ে বইলাম। তারপর ফিবে এলাম।

কৃষকের সঙ্গে একাত্মবোধ? অত সোজা নয়।

তারপর কত জায়গায় গেলাম, কত কি দেখলাম, কত কি ঘটল, সে সব থাক। আমি শুধু একটা ঘটনা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। কারণ আমি তার মধ্যে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলাম। তা সত্ত্বেও সেখানকার কেউ আমার মনের গভীরে কেন স্থান পায়নি?

ডিমলার নাম শুনেছ? একবার এলাকাটা নাকি অসহযোগ আন্দোলনকালে ছ মাসের জন্য স্বাধীন হয়েছিল। মনে করো না সেটার পিছনে খুব বেশী বীরত্ব ছিল। জায়গাটা এত সভ্য জগতের বাইরে, এবং বর্ষাকালটায় এমন ডুবে থাকে যে ইংরেজরা ওর স্বাধীনতাকে গ্রাহ্যই করেনি। রাস্তাঘাট শুকিয়ে খটখটে হলে তারা ওখানে একজন দারোগা পাঠিয়েছিল, কেউ বাধা দেয়নি।

শুনে আমার ভারি হাসি পেয়েছিল। বক্তা রাগ করে বললেন — এতে হাসির কিছু নেই। আর এবার তো বাবুদের আন্দোলন নয়, এবার চাষা ক্ষেপেছে, কাজেই অবস্থা সঙ্গীন হতে পারে।

জায়গাটায় পৌঁছে দেখলাম; কই তেমন তো কিছু নয়। শুধু কনকনে শীতে ঘুমনো দায়। যেখানে আস্তানা পড়েছে, সেখানে দুজন নেতার সাক্ষাৎ পেলাম। মাচার ওপর আমরা তিনজন, তার নীচে কটি ছাগল।

ধান কাটা শেষ হয়েছে, কৃষকেরা নিজের খামারেই সব তুলেছে, এখন জোতদারেরা পুলিস এনে তা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। কাল হাটবার, পরশু মিটিং ডাকা হয়েছে। কাজেই আপাতত আগামী কাল ছুটি।

সকালবেলা তামাকের ক্ষেতে জল দেওয়া দেখছি, এমন সময় পাশের গ্রামের এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি থেকে একটি ছোকরা এসে বলল — বিকালে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন।

ঘটনাটা এতই নাটকীয় এবং আনন্দদায়ক যে তোমাকে তা বর্ণনা করে বোঝাতে পারব না। তুমি কি করে বুঝবে এক সপ্তাহ কারো পেটে চা না পড়লে বিশ্ব কেমন অন্ধকার দেখায়? কদিন আগে দীনেশ লাহিড়ী নামে এক কৃষক নেতাকে ঠাট্টা করেছিলাম, কারণ তিনি আমাদের ফেলে দশ মাইল পায়ে হেঁটে কই মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, ফিরতেও তাঁকে দশ মাইল হাঁটতে হয়েছিল। লাহিড়ীমশাই জমিদার বংশের ছেলে, বহুকাল জেল খেটে প্রৌঢ় বয়সে কৃষক-আন্দোলনে যোগ দেন। উত্তরবঙ্গের কৃষকদের ভাষা তাঁর মতো কেউ আয়ত্ত করেনি, অন্তত তাঁর মতো কাউকে জমিদার-জোতদারের বিরুদ্ধে খাঁটি কৃষকসুলভ গালাগালির ভাষা প্রয়োগ করতে শুনিনি।

তাঁর পায়ে জুতো নেই, গায়ে একটা গরম জামা নেই, রুগ্ন শীর্ণ শরীর। কোমরে ব্যথা, আর গত দেড়মাস তেভাগা সুরু হওয়ার পর কৃষকদের বাড়িতে জলের মতো ডাল আর পাটশাকের বেশী আহার্য জোটেনি। কিন্তু ডিমলায় এসে আমরা যে তাঁকেও ছাড়িয়ে গেলাম। কই মাছের ঝোলের চেয়ে চা আমাদের কাছে আরো আকর্ষণীয় মনে হল।

যাঁর বাড়িতে আমরা হাজির হলাম তিনি একজন সম্পন্ন কৃষক, কিন্তু ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে জোতদারের চেয়ে কম নন। গোয়াল-ভরা গরু, খামার-ভরা ধান, বিরাট বিরাট আটচালা ঘর। এরকম পরিবার কৃষক সমিতির সঙ্গে আছে দেখে আনন্দ হল। এবং তা আরো বেড়ে গেল, যখন শুনলাম, আমাদের জন্যে খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে চিঁড়ে ভাজা হচ্ছে।

এমন সময় দেখা গেল মাঠের মধ্য দিয়ে একটা লোক প্রাণপণ বেগে ছুটে আসছে।

— গুলি চলেছে।

— কোথায়?

— উই, হোথায়!

— কেউ মরেছে?

তা সে বলতে পারে না। খবর শুনেই সে ছুটেছে। রইল আমাদের চা আর চিঁড়ে ভাজা। তার পিছন পিছন ছুটছি আমরা তিনজন। তখন লাল হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ধান-কাটা মাঠে নাম-না-জানা একরকম ছোট ছোট লাল ফুল দুপায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছি। আশ্চর্যের ব্যাপার,

কতবার ভেবেছি এই ফুলের নাম কাউকে জিজ্ঞাসা করি কিন্তু জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছাতে পৌঁছাতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দেখা গেল, গুলির যথার্থ ফলাফল কেউই জানে না। যতই এগুচ্ছি, ততই লোকের মধ্যে বেশী আতঙ্কের ভাব দেখছি। কেউ বলছে, দশজন মরেছে — কেউ বিশ, কেউ পঞ্চাশ, কেউ বলছে একশ, বন্দুকধারী পুলিশ, কেউ তার সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে পাঁচশ।

আমার সঙ্গী নেতাদ্বয়ের যিনি সিনিয়ার, তিনি তাঁর টর্চলাইটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন — আপনি রিপোর্টার মানুষ, আপনি গিয়ে দেখুন।

আমি তাঁর এই ব্যবহারে বিস্মিত ও লজ্জিত হলাম। পরক্ষণেই মনে হল, আচরণটা হয়ত কাবণ-সঙ্গত। কেননা পুলিস তাঁদের দেখলে গ্রেপ্তার করতে পারে। তবুও এই বিদেশ বিভুঁইয়ের সব কিছুই আমার অজানা অচেনা। আমি এখানে কি বলব, কি কবব?

ছায়ার মতো দুজন কৃষক আমার অনুগামী হল। তাদের না পেলে আমি যে কি করতাম জানিনে।

ঘটনাস্থলে গিয়েও প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলাম না। নির্জন অন্ধকার মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে খড়ের আগুন জ্বলছে, আর তার পাশে কয়েকজন আহত কৃষক মাটিতে পড়ে আছে। হঠাৎ মনে হল যেন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসে পড়েছি এবং যেখানে কোনো বন্যপশুর ভয়ে মানুষ আগুন জ্বেলে নিজেকে রক্ষা করছে।

আসলে মৃতেব সংখ্যা এক, গুরুতর আহতেব সংখ্যাও এক। কিন্তু গুলিবিদ্ধ লোকেব সংখ্যা বহু। তার কাবণ পুলিস বুলেট ব্যবহাব করেনি, পাখি-মাবা কার্তুজ দিযে মানুষ মেরেছে। মানুষও তাই ছররাবিদ্ধ হয়ে পাখির মতো দূর দূবান্তরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মাটিতে লুটিযে পড়েছে। তাদের কতকগুলি পড়ে আছে এই মাঠে, আর কতকগুলি গ্রামে ঢুকতে পেরেছে।

মাবা যে গেছে তার নাম তৎনারাযণ। তার ঘবেব মধ্যে ঢুকে ডোল থেকে জোতদাবরা ধান ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন তার চিৎকারে রাস্তা থেকে বহু হাটুরে লোক সেখানে ছুটে যায়।

আমি গিয়ে দেখলাম তৎনারায়ণেব মৃতদেহের অর্ধেকটা মাচার ওপর, বাকী অর্ধেক শূন্যে ঝুলছে। মাথার খুলি ফেটে গেছে। পাশের বারান্দা থেকে মাঝে মাঝে কাদের ক্লান্ত কান্নার স্বর ভেসে আসছে।

পুলিস উঠোনে আর একটা লোককে এনে শুইয়ে রেখেছে, তার বাঁ চোখের মধ্য দিয়ে গুলি পাশ কেটে বেরিয়ে গেছে, তবু লোকটা মরেনি। লোকটির নাম গুল মহম্মদ। তাকে হাসপাতালে পাঠালে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। কিন্তু হাসপাতাল এখান থেকে কতদূরে?

পুলিস বলল, সকালের আগে গরুর গাড়ি যোগাড় করা যাবে না।

রাত্রে আপাতত কিছু করণীয় নেই। পাশের গ্রামে আস্তানায় ফিরে গেলাম। রাত তখন দুটো। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে বরফ। একমলা ভাত খেয়ে নেতাদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত ভোর হয়ে গেল। কি করতে হবে? সেই মামুলি মিটিং ডাকার কথা, গ্রামে গ্রামে খবর পাঠানোর কথা, লোকের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু আপাতত আমাকে গিয়ে দেখতে হবে যাতে পুলিস গ্রামের লোকের এজাহার ঠিক ঠিক লিখে নেয়।

গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চক্ষুস্থির। লোককে খবর পাঠাতে হয়নি, তারা নিজেরাই কাতারে কাতারে আসছে। নেতাদ্বয়ের কিছু হিসেবের ভুল হয়েছে। কিন্তু এদের হাতেই বা ওগুলো কি বস্তু? খুব কম লোকের হাতেই লাঠি, বেশীর ভাগের হাতে সড়কী, বল্লম, খাঁড়া,

রামদা, মেয়েদের হাতে বঁটি খোন্তা। কারো কারো হাতে লাঙলের ফাল, কোদাল এবং কুড়ুল। আটটা নটার মধ্যে সমস্ত মাঠ ছেয়ে গেছে। মাথা গুনতি করলে হাজার দশেকের বেশী হবে না, তবে চর্মচক্ষে জনসমুদ্র বলেই বোধ হচ্ছিল।

মাত্র চারজন বন্দুকধারী পুলিস, আর একজন দারোগা। তাদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

দারোগাবাবু বললেন, আমি নিজে গরুর গাড়ি করে এক্ষুণি গুলমহম্মদকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি শুধু দয়া করে দেখবেন untoward কিছু না ঘটে।

— তাহলে আপনার বন্দুকধারীদের একটু পিছিয়ে রাখুন।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে।

কাল যে দুজন কৃষক ছায়ার মতো আমার সঙ্গে এসেছিল তারা জিজ্ঞাসা করল — লোকেরা কি করবে?

— আমি তার কি জানি?

— ওরা আপনার হুকুম চাইছে?

— আমার!

— হ্যাঁ আপনার।

মুহূর্তকাল ভেবে যে সত্য আবিষ্কার করলাম, তা আমার পক্ষে আদৌ সুখদায়ক ঠেকল না। এখানকার নেতাদ্বয় আত্মগোপন কবাব ফলে প্রচার হয়ে গেছে আমিই তাঁদেব প্রতিনিধি। ফলে এই দশ হাজার ক্রুদ্ধ বর্শা-বল্লমধারী লোক আমার নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

আমি ছায়াসঙ্গীদের প্রশ্ন করলাম, — ওবা কি চায?

উত্তর এল, ঐ যে সামনে জোতদারদের গ্রাম, ওটাকে আক্রমণ কবতে চায়?

— তারপর?

— ওরা সব জোতদারদেব মাথা কেটে আনবে।

— আর?

— ওদের মেয়েদের পুড়িয়ে মাববে।

— কি করে?

— সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে।

— আর এ সব যদি আমি না কবতে বলি?

ছাযাসঙ্গীবা নিশ্চুপ। একজন বলল, তাহলে কি হয় বলা যায় না। তাহলে হয়ত এই পুলিসদের ওরা ছেড়ে দেবে না।

আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এত লোকের হাতে ধাবালো অস্ত্র-শস্ত্র আমি কখনো দেখিনি। আর এতে আমাব মনে পুলক সঞ্চাব হচ্ছিল না। শুধু বোধহয় মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে ধরে এনে আমার ঘাড়ে একশ মণ বোঝা চাপিয়ে দিযেছে। আমি কি করি এখন? কি করে এদের থামাব? অথচ আমার মুখের একটা কথায় আজ এরা প্রলয় কাণ্ড ঘটাতে পারে। এতবড় শক্তি এবং সম্মান যে আমার ভাগ্যে জুটতে পারে, তা ভাবতে পাবিনি। আমি যেন হঠাৎ সম্রাট হয়ে গেছি। একবার যদি চেঁচিযে বলি, তাহলেই ঐ যে সম্মুখে সবুজ ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম, সেখানে জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে ফুৎকারে উড়ে যাবে মানুষের কাঁচা মাথাগুলো। অথচ এত বড় যে শাহানশাহ সম্রাট, সে কেন দুশ্চিন্তাব ভারে এমন নুয়ে পড়েছে!

ছায়াসঙ্গীদের একজনকে পাঠালাম নেতৃদ্বয়ের কাছে নির্দেশেব জন্য। সে লোকটা আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে বলল, উপস্থিত যা ভালো বুঝি, তাই যেন করি।

আমি একথা গোপন করতে চাই নে, যে আমার ভারি রাগ হল এঁদের দায়িত্বজ্ঞান দেখে। আর যতই রাগ বাড়তে লাগল ততই আমার মুষড়ে-পড়া ভাবটা কেটে গেল। আমি যেন একটু আলো দেখতে পেলাম। এটা বুঝতে পারছি, ঐ খুনখারাপির দায়িত্ব হঠাৎ আমি নিজের স্কন্ধে নিতে পারব না। কিন্তু এদের থামাব কি করে? আওয়াজ মাঝেমাঝেই সমুদ্র গর্জনের মতো উঠছে, আর সেই সঙ্গে এদের মধ্যে থেকেই বেপরোয়া বক্তারও অভাব ঘুচে যাচ্ছে। কেউ কেউ উত্তেজিত লোকদের আরও উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু উত্তেজনার চেয়ে পেটের ক্ষিদে যে বড়, সেটা আমার মাথায় ছিল। সুতরাং কৌশল হবে কালক্ষয় করা। এইভাবে বারোটা-একটা নাগাদ ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই সামলে দেওয়া যাবে। অতএব —

অতএব আমি বক্তৃতা করতে লাগলাম। কে একজন একটা চোঙ আমার হাতে দিল। তাতে মুখ লাগিয়ে যে সব আপাত সত্য কথা বললাম. তাব যে ষোল-আনাই মিথ্যে, তা আমি হলফ করে বলতে পাবি। এই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, সুবিধাবাদী নেতারা কিভাবে অনর্গল বানানো মিথ্যা পরম সত্যের মতো জোব দিয়ে বলে যেতে পারে এবং কিভাবে তাবা 'ম্যানেজ' কবে। গ্লানি এবং ধিক্কারে আমার মন ভবে গেল। ভিখু, তুমি যদি সেখানে থাকতে, দেখতে পেতে মানুষেব সঙ্গে একাত্ম হওযার সাধনা প্রহসনে পবিণত হওয়া কত মর্মান্তিক!

যা ভেবেছিলাম তাই। দুপুরবেলা তিনভাগ লোক চলে গেল। বাকী যাবা রয়ে গেল তাবা অধিকাংশ আশপাশের গ্রামেব লোক। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু এমন সময়ে মূর্তিমান আব এক দুর্ভোগ এসে দেখা দিল।

উত্তরবঙ্গের এক বিখ্যাত ব্যক্তি এসে হাজিব। তাঁর নামধাম কবতে চাইনে, — কারণ যে কাণ্ড তিনি করেছেন তা যে কোনো ব্যক্তিব পক্ষে অতি লজ্জাকর। কলকাতায় লোকটিকে দেখেছি, অল্পবিস্তর পরিচয়ও ছিল, খাঁটি লীগের লোক। এখানে এসেই শুনেছিলাম লোকটি সপ্তাহ দুই আগে এই এলাকায় প্রচণ্ড এক দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম করেছিলেন। হিন্দু মুসলিম কৃষক সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন দুই ক্রুদ্ধ জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন আজকের আত্মগোপনকারী নেতৃদ্বয়। তারপর তেভাগা শুরু হতেই কৃষকদেব মধ্যকার ফাটল যখন জোড়া লেগে গেল, তখন উল্টোদিকে হিন্দু মুসলমান জোতদাবরাও মিশে গেল ঝাঁকের পাখির মতো। আজ যিনি এসে উপস্থিত তাঁকেও জোতদাববাই পাঠিয়েছে কৃষকদেব ঠাণ্ডা করতে।

কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো কৃষকদের স্তিমিত ক্রোধ তাঁকে দেখে আবাব বেড়ে উঠল। আর কৃষকরা এতক্ষণ পর একটা কিছু নাগালের মধ্যে পেয়েছে। সব্বাই তাঁকে ঘিবে ধরল। কি করে তিনি গুলির খবর পেলেন? তিনি তো থাকেন দূরে শহরে। তাহলে গুলি চালানোর আগেই জোতদারেরা নিশ্চয় তাঁকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল। লীগনেতা কৃষকদের এতগুলো প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেন না। আর তাঁব পিঠের উপর কৃষকরা তখন সড়কি আর বল্লম উঁচিয়ে ধরেছে।

— দিই ব্যাটাকে শেষ করে। আপনি হুকুম দেন।

আমি জবাব দিলাম — এই যদি তোমরা কর, আমি এক্ষুনি চলে যাব।

হঠাৎ সেই লীগনেতা কেঁদে ফেললেন, আর সেইসঙ্গে মাটিতে বসে পড়ে আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরলেন — আপনি বাঁচান আমাকে।

আমি কি স্বপ্ন দেখেছি। এর নামই কি শ্রেণী সংগ্রাম? কিন্তু আমি যে কাণ্ড করলাম তা নিতান্তই মোলায়েম। আমি তাঁকে হাত ধরে তুলে ধরে বললাম, — আপনি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান।

তিনি তক্ষুনি সানন্দে জোতদারদের গ্রামের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাঁর অপসৃয়মান মূর্তিটির দিকে চেয়ে আমার মনে হল, কেন কঠিন হতে পারলাম না। এদের মতো লোকেরাই তো দুর্ভিক্ষে মানুষ মেরেছে, আর এখন লোক একটা আন্দোলনের পথে এগুতে চাইছে বলে তাদের গুলি চালিয়ে মারছে। লোকটা যেদিকেই তাকাচ্ছে সেদিকেই তো মৃত্যু। তবু ও লোকটাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া কেন? আর আমি ছেড়ে দিতে চেয়েছি বলেই যে কৃষকরাও ছেড়ে দিয়েছে তাও তো ঠিক নয়। এত যে রাগ, তবু তারা মানুষের গায়ে সহসা হাত দিতে চায় না। আজ যে জোতদারদের গ্রাম জ্বলেনি, মানুষ মরেনি, তাতে তো তাদের একটুও নিরানন্দ দেখছি না, বরং তারা শেষ পর্যন্ত কি ব্যাপারটা এড়াতে পেরে খুশীই হয়নি? হিংস্রতা তো তাদের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। মাটির বুকে সন্তানের মতোই যত্নে তাবা ফসল ফলায়। তবু আমি জানি ক'দিনের মধ্যেই আসবে আরো বন্দুক, আরো পুলিস, জোতদারদের আরো গুণ্ডার দল। কিন্তু তার চেয়েও যে আরো কিছু ভয়ঙ্কর ঘটতে পারে, তখন তা কি ভেবেছিলাম?

বাংলাদেশে কৃষকদের জয় না হলে জাতি দুই টুকরো হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ দাঙ্গার কলকাতা থেকে বেরিয়ে তো স্পষ্টই দেখলাম, ভাঙ্গা কি করে সহজে জোড়াও লাগে। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, বাংলাদেশেব সাহিত্যিক নাট্যকার যাঁরা এত করে সাম্প্রদায়িক মিলন চেয়ে এসেছেন, তাঁরা হয়ত আসল জায়গায় হাত দিতে পারেননি। কিন্তু আজ আব তা নিয়ে আক্ষেপ নেই। কারণ কৃষকের জয় নামক বস্তুটার সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক কিছু জড়িত। সেদিন নিকট দূরের বহু শক্তি তাকে পিষে মারার জন্য তৈরি ছিল। তবু এর আর একটা দিকও ভাবতে ইচ্ছে করে। সময়টা ভারতের স্বাধীনতার লাভের আগের বছর। কিন্তু স্বাধীনতার ছায়াটুকু যে কতদূরে তা কেউ জানত না। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটা অনির্দেশ উত্তেজনার ঢেউ বইছে। অন্তত কল্পনা করতে দোষ নেই যে, সেদিন ষাট লক্ষ কৃষক অন্যান্য বহু লক্ষ মানুষের সঙ্গে মিলে দৃঢ়পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে বাংলা দেশের অন্য চেহারা হত — এসব এখন ভেবে লাভ কি? তখন সব ভাবনাই ছিল অস্পষ্ট। শুধু তখন মাঠে মাঠে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়েছে, এসব কথা বড় বড় শহরের বড় বড় মাথাওলা নেতাবা কি আর ভাবছেন না। তাঁদের উপরই ভার দিয়ে বসেছিলাম।

সরল বিশ্বাসের এই এক দোষ। কিন্তু ভিখু, তুমি কি এইসব বকুনির বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছ? পারলে সরল বিশ্বাস নামক দ্রব্যটা ত্যাগ করো। ওতে শুধু ভগবানই মেলে, আর কিছু না। তোমার আজ বয়স হয়েছে, ঘাড়ের উপরের মাথাটা দিয়ে কি কিছু ভাববে না?

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ডিমলা ত্যাগ করলাম। পথে কয়েকজন কৃষকের বাড়িতে বসতে হল। তাদের আমি চিনি না, কিন্তু তারা আমাকে একদিনের মধ্যেই চিনেছে। তাদের মুখ আমার আজ মনে নেই, কিন্তু সেদিন বিদায় নেওয়ার সময় তাদের প্রত্যেকের চোখেই জল দেখেছিলাম। এমন কি সুকৃতি আমি করেছি, যাতে এতটা আশা করতে পারি? কিন্তু মানুষ মানুষের বন্ধু হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। আমার চোখের জল আসেনি; এরা আমাকে দেখলেও এদের তো আমি ব্যক্তি হিসাবে দেখিনি। এরা সারাদিন আমার চোখে সমষ্টির মধ্যেই মিশে ছিল। আমার বরং এদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, কারণ জানি — দুদিন পরেই এদের উপর আসবে শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণ। ভিখু, এরপর আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। বেশ কয়েকদিন নিশ্চিন্ত কাটানো গেল। একদিন সকালে চা খেতে খেতে কাগজের প্রথম পাতায় চোখ পড়তেই দেখি খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে আঠারো জন নিহত। আর অনেকে আহত হয়েছে।

কলকাতা থেকে ডাক্তারসহ কয়েক ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হল। তাঁরা দুদিন পরে ফিরে এলেন। পুলিশ তাঁদের ঐ এলাকায় ঢুকতে দেয়নি।

তখন আমার কাছে প্রস্তাব এল, আমি ঐ এলাকায় অন্য কোনো পথে ঢুকতে পারি কিনা। আমি সহজেই রাজী হয়ে গেলাম। আমার কাছে ছবিটা স্পষ্ট ছিল। বালুরঘাট স্টেশনে নেমে খাঁপুর যেতে হয় — মাত্র কয়েক মাইলের পথ। এই পথটাই পুলিশ আটকে রেখেছে। কিন্তু বালুরঘাট ছাড়িয়ে ফুলবাড়ি স্টেশনে যদি নামা যায় তাহলে মাইল দশেক হেঁটে হয়তো পিছন দিক দিয়ে খাঁপুরে ঢোকা যেতে পারে। এতেও পুলিশের হাতে পড়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এছাড়া অন্য পথ নেই। তবু ভাগ্যিস আমি রাজী হয়েছিলাম, নইলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হত না।

আমি আবার সেই স্টেশনে নামলাম যার কাছে একদিন দার্জিলিং মেল থেমেছিল। আমি আবার সেই মাঠ দিয়ে হাঁটলাম যেখানে একদিন নিশান উড়িয়ে ধান কাটা হয়েছিল। আমি আবার সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলাম যেখানে এক সময় দিবারাত্র উৎসবের বন্যা বয়ে গেছে। কিন্তু এবার কেমন যেন সব নিঃঝুম। দুই একটা আধা পরিচিত মুখ চোখে পড়ল, তাবা পাশ কাটিয়ে গেল। ক্যাঁচর ক্যাঁচব করে ছইওয়ালা একটা গরুর গাড়ি আসছে। কাছে এসে থামতেই দেখলাম বসে আছেন কালী সরকার। তাঁর মুখচোখ শুকনো। আমাকে দেখে বললেন — আপনি! ও বুঝেছি।

কালী সরকারেব শ্বশুরবাড়ি খাঁপুরে। গুলি চলার সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাপের বাড়ি। তারপর তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন কিছু দূরের একটা গ্রামে। এখন সেখান থেকেই স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে আসছেন আমাদের কালী সরকার। তাঁর কথা শুনে মনে হল না খাঁপুরে ঢোকা যাবে।

মাইল সাতেক হেঁটে সন্ধ্যার মুখে যে গ্রামে আশ্রয় পেলাম, সেখানে খাঁপুরের আরো কয়েকজনকে দেখলাম। তারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে স্থান পেয়েছে। পরিচয় হল প্রৌঢ় নীলকণ্ঠ বর্মনের সঙ্গে। ভিখু, তুমি তাকে নিশ্চয়ই চেন। এঁর স্ত্রী যশোদা বর্মন খাঁপুরে মারা গেছেন। পরদিন সকালবেলা এই শোকাচ্ছন্ন প্রৌঢ় মানুষটি আমাকে খানিক দূরে এগিয়ে দিলেন। তারপর আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখালেন, ঐ যে গ্রাম দেখছেন, ওর পাশে আড়াআড়ি যে মাঠটা, সেটা পেরুলেই খাঁপুর। আমার আর এগুতে সাহস হচ্ছে না, আমি যাই।

নীলকণ্ঠ বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন। তাঁকে কে যেন একজোড়া নতুন চটিজুতো কিনে দিয়েছে। সেটা পায়ে দিয়ে মাথা নীচু করে নীলকণ্ঠ ফিরে যাচ্ছেন, আর আমি একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। নীলকণ্ঠ সহজে এলাকা ছাড়েননি। গুলি চলার পরেও কয়েকদিন আশেপাশেই ছিলেন, আর প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে তাঁকে শীত অগ্রাহ্য করে মাঠের মধ্যে এসে সটান শুয়ে পড়তে হত। কারণ পুলিশ হানা দেয় শেষ রাত্রেই।

আমি চলেছি একা। আশেপাশে অনবরত দৃষ্টি ফেলছি। আশ্চর্য, চোখে একটা লোক পড়ল না। মাঠ জনশূন্য, কেউ কোথাও কোনো কাজে আসেনি।

ক্রোশ খানেক এগিয়ে যে গ্রামে ঢুকলাম, সেখানেও সব নিস্তব্ধ। একটা সম্পন্ন কৃষকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যখন ডাক দিতে যাব — কেউ আছেন? এমন সময় তুমি কোত্থেকে এসে আমাকে দেখে বললে, আপনি কে? — তোমার কাছ থেকেই শুনলাম ঐ গ্রামেরও পুরুষ মানুষ সব পালিয়েছে।

এইখানে বলে রাখি, এতকাল পরে তোমাদের রাজবংশী কৃষকের ভাষা বেমালুম ভুলে গেছি। যাই হোক আমার সব কথা শুনে তুমি বললে, খাঁপুরে যদি ঢুকতে চান, এই তার সময়।

— বলো কি? এই দিন দুপুরে? খোলা মাঠ দিয়ে গ্রামে ঢুকতে হবে না?

— আমি তো দুপুরবেলাতেই গিয়েছিলাম সেদিন। এই সময়টা কেউ সন্দেহ করে না।

— কেন বলো তো?

— এই সময় কেউ আসতে পারে, পুলিশ ভাবতেই পারে না।

— কিন্তু পাহারা তো দেয়?

— না, কোন পাহারা থাকে না। সব্বাই তেল মেখে পুকুরে স্নান করতে যায়।

— তুমি ঠিক জানো?

— হ্যাঁ।

— তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

— হ্যাঁ।

— তোমার ভয় করবে না?

— আমার ভয় কিছু করে না, তবু মা শুধু বকে।

— তাহলে তোমায় যেতে হবে না। আমি একাই যাব।

— না, আপনি সব চিনতে পারবেন না। ওরা টের পেয়ে যাবে। আমি হেসে বললাম — পেলেই বা।

— ওরা ধরতে পারলে খুব মারে।

— আমাকে মারবে না।

তুমি তবু আস্তে আস্তে বললে — আমি যাব আপনার সঙ্গে, আপনি কতদূর থেকে আসছেন।

তুমি আমার হাত ধরে টানতে লাগলে, চলুন নইলে মা টের পাবে, আমাকে যেতে দেবে না।

আমি তোমার সঙ্গে মাঠে নামলাম। হাঁটছি আর মনে হচ্ছে আমরা দুজনে যেন চক্রান্তকারী। আমরা পুলিশকে জানান দিয়ে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি লুকিয়ে। এক নিষিদ্ধ স্থানে ঢুকতে যাচ্ছি, পিছনের দরজা দিয়ে।

এই সর্বপ্রথম আমার মনে হল, আমি যেন কৃষকদেরই একজন। আগে আমি আন্দোলন দেখেছি একজন দর্শক হিসাবে। তাদের প্রতি আমার অগাধ সহানুভূতি আছে, কিন্তু আমি আর তারা আলাদা। এমন কি ডিমলায় যখন হাজার হাজার কৃষক আমার ওপর অমন করে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তখনও কে যেন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ আমি স্বেচ্ছায় লুকিয়ে লুকিয়ে এক অবরুদ্ধ গ্রামে ঢুকতে যাচ্ছি।

আমি এখন বুঝতে পারছি, কেন সব ছাড়িয়ে তোমার স্মৃতি আমার কাছে এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের এই খাঁপুর যাত্রার সময় সব আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে এসেছে। এখন আর সেই সভা-শোভাযাত্রা নেই। লাল নিশানের ক্ষীণতম ইশারাও লুপ্ত। চারিদিকে সব চাঞ্চল্য থেমে গেছে। সব আওয়াজ বন্ধ হয়েছে। শুধু একটা বীভৎস ভয় বিরাজ করছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। হাজার হাজার মানুষের উৎসাহ আর উত্তেজনার মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন শস্যশূন্য মাঠ, ভাষাশূন্য গ্রাম। যেন এক বিরাট রঙ্গমঞ্চে আলো নিভে গেছে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিদায় নিয়েছে, পিছনের সাজ-ঘরও নীরব, দর্শকের আসনগুলিও ফাঁকা।

এই অবস্থায় একজন নির্ভীক বালক এবং একজন তরুণ সাংবাদিক মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে দেখছিল। পিছনে মৃত্যু, সামনে নিষ্পেষণের যন্ত্র, আর মাথার উপর মধ্যাহ্নের সূর্য। তখন আচমকা মনে পড়ে গেল, তেভাগা আন্দোলনের প্রথম দিকে একজন আমায় কোলে করে শীতল জলের ছোঁয়া থেকে আমার পদযুগলকে রক্ষা করেছিল, আর আজ খাঁপুরে এগিয়ে দেওয়ার জন্য একজন বয়স্কলোক খুঁজে পাওয়া গেল না।

মাঠের ওপার থেকে গান ভেসে এল। তুমি আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে বললে, পুলিসেরা রেকর্ড বাজাচ্ছে।

মাইল দুই দূরে লাউড স্পীকারের ধ্বনিতরঙ্গ এমনভাবে এসে কানে ধাক্কা দিতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। আমি প্রশ্ন করলাম, ওরা কি রোজই বাজায়?

— হ্যাঁ, প্রায় সব সময়। খাসি মেরে মেরে খায়, আর রেকর্ড বাজায়, আর তাস খেলে।

— খাসি পায় কোথায়?

— সব গ্রাম থেকে ধরে ধরে নিয়ে যায়। আর জেলে এনে পুকুর থেকে সব মাছ ধরে।

গ্রামের কাছে এসে দেখি এপাশটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরেছে। বহু কষ্টে সেটা পার হয়ে তুমি আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলাম।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। বেশ গরম বাতাস দিচ্ছে। গ্রামের মধ্যে টুঁ শব্দ শোনা যায় না, কেবল ঝরা পাতা মাঝে মাঝে এক একটা দমকা হাওয়ায় সরসর করে মাটির উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাস থেমে গেলে সব নীরব। একটা মস্ত গোয়ালঘরের পাশে যেতেই পরিচিত একটা শব্দ কানে এল — গরুগুলো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। কিন্তু জাবব কাটার এই ধরনের কোরাস কখনো আমি শুনিনি। কৌতূহলবশে গোয়ালঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গোটা কয়েক গরু চোখ বুজে মুখ নাড়ছিল, আমাদের পায়ের শব্দে নির্বোধেব মতো চোখ মেলে চেয়ে রইল। আমি ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম, কারা এদের ঘাস জল দেয়?

— পুলিস কটা রাখালকে ধরে এনেছে।

আমি বললাম, চল ভিতরে ঢুকি। বাড়ির ভিতবে ঢুকলাম। তকতকে ঝকঝকে নিকানো উঠান এবং ঘরগুলি। কোথাও একটু মালিন্য নেই। শুধু কিছু শুকনো ঝবা পাতা পড়ে আছে।

এইভাবে অনেকগুলি বাড়ির ভিতবে ঢোকা গেল, বেশির ভাগ বাড়িতেই লোকজন নেই। শুধু দু একটা বাড়িতে বন্ধ ঘরেব মধ্যে থেকে স্ত্রীকণ্ঠে ভয়ার্ত আওযাজ শুনলাম — কে? কে?

তুমি আমার হাত টিপে দিলে, অর্থাৎ যেন শব্দ না করি। আমাব ভয় হচ্ছিল, হঠাৎ কোথেকে একটা কুকুব ডেকে উঠবে, কিন্তু সারা গ্রামে কেন একটা কুকুব দেখলাম না। অবশেষে তুমি আমাকে একটা বাড়ির উঠোনে এনে দাঁড় করিয়ে চাটাইয়ের দরজা ঠেলে ভিতরে গেলে। খানিক পবে তোমার সঙ্গে এক বুড়ি বেরিয়ে এল। বুঝলাম এই বুড়ির সঙ্গে তোমাব প্রায়ই সাক্ষাৎ হয।

বুড়ি হাত নেড়ে আমাকে কাছে ডাকল। কাছে যেতেই ফিসফিস কবে বলল, তুমি কার ঘরের ছেলে বাবা! কেন এই রাক্ষসপুরীতে এসেছ, পালাও শিগগির। নইলে এরা মেরে ফেলবে।

এতক্ষণে আমার পা শিউরে উঠল। বাল্যকালের কোন রূপকথা শুনতে শুনতে যেন এইরকম এক বুড়ির কল্পনা করেছিলাম, আর তার মুখের ভাষাও যেন এইরকমই ছিল। আজ বাস্তবে তার নমুনা দেখে ভয়ে বিস্ময়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হল রূপকথার গল্পকারেরাও বোধ হয় এমনি করে অবরুদ্ধ জনপদের অভিজ্ঞতাই কল্পনার রঙ চড়িয়ে প্রকাশ করেছিল। তাতে থাকত রাজকন্যা রাজকুমার তেপান্তরের মাঠ, জীয়ন কাঠি মরণ কাঠি। বুড়ি উঁচু দাওয়ার উপর বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, — আমাদের তুমি দেখতে এসেছ! আহা মায়ের বুকে ফিরে যাও বাবা, নইলে এরা তোমাকে খুন করবে বাবা।

বুড়ি ফিসফিস করে আরো কত কি বলতে লাগল আর মাঝে মাঝে পুনবাবৃত্তি করে বলল — পালাও।

আমি বললাম, — এই ভিখু তো প্রায়ই আসে, তাকে বারণ কর না কেন?

— ও কিছুতেই শোনে না, একদিন ছোঁড়া মরবে।

তুমি আমাকে বললে, ওদের স্নান বোধ হয় হয়ে গেল, এবার জলদি চলুন!

আমি ভেবে পেলাম না এই গ্রাম থেকে আর কি খবর সংগ্রহ করার আছে। আরো কিছু শূন্য বাড়ি আর ঝরাপাতা দেখবো শুধু। এর জন্যই এত পথ আসা?

তবু এঁকে বেঁকে পা টিপে টিপে গ্রাম পার হতে হল। আগের মতোই কাঁটাতারের বেড়া পার হলাম। হঠাৎ পিছনে একটা গুলির শব্দ! আমরা প্রাণপণে ছুটলাম খোলা মাঠের উপর দিয়ে। খানিক পরে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম। কই কেউ তো তেড়ে আসছে না। গুলিটা আমাদের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হযেছিল অথবা ঘুঘুজাতীয় পাখি মাবাই তাব লক্ষ্য ছিল, তা আমি আজও জানিনে। যে গুলি কবেছে সে কি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, আব ওটা যদি ফাঁকা আওয়াজ হয়ে থাকে, সে কি আমাদের ভয় দেখাবার জন্য? মাঠের মাঝখানে এসে দুজনে থামলাম। তখন বিনা কারণেই বোধ হয় আমাদের চোখেমুখে দিগ্বিজয়ের আনন্দ ছিল। তুমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, ব্যাটাদের ফাঁকি দেওয়া গেল।

আমি বললাম, — ভালোই। কিন্তু পিঠে গুলি লাগলে লোকে কি আমাদেব বীর বলত?

তুমি সেকথায় কানই দিলে না। তুমি নাম ধরে ধরে কত লোক সম্পর্কে কত কথা বলতে লাগলে। কে কোন গ্রামে পালিয়ে আছে, কার পরিবারের কে মবেছে, প্রথম দিন কী হয়েছিল — এমনি অজস্র কথা। এক সময় তোমাদের গ্রামে এসে পড়লাম। তোমাকে বললাম, — এবার তুমি বাড়ি যাও, আমি চলি।

তুমি বললে, ঐ বাবলাগাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। তারপর সে গাছটা ছাড়িয়েও যখন তুমি আমার সঙ্গে আসতে থাকলে তখন আমি বললাম, — আর এসো না, এবার যাও।

হঠাৎ তুমি বললে, — আপনার তেষ্টা পায়নি?

— পেয়েছে। সামনের গ্রামে গিয়ে জল খাব।

— না, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি দৌড়ে জল নিয়ে আসছি।

পাশেই একটা মরিচের ক্ষেত। চারপাশে উঁচু মাটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে কয়েকটি বাবলাগাছ যেন আমার জন্যই এতকাল অপেক্ষা করছিল। তাদের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। বসে বসে তোমার ক্ষুদ্র মূর্তিটি ক্ষুদ্রতর হতে হতে হঠাৎ আমার মনে হল এই রকম এক একটি বালকই কি প্রাচীন কবিদের কখনো ধ্রুব, কখনো নচিকেতা, কখনো বা প্রহ্লাদ চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে? হয়ত নিষাদপুত্র একলব্য এইরকম কোন গ্রাম থেকেই দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল!

একটু পরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আবার তেমনি করে দৌড়ে আমার দিকে এলে, তোমার গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে।

তেষ্টা পাওয়ার কথা কেন জিজ্ঞাসা করেছিলে এবার বুঝলাম। মায়ের ভয়ে তোমাদের বাড়িতে ভাত খাওয়ানোর কথা বলতে পারনি। মুড়ি-মুড়কি আনা যাবে কিনা, তাতেও হয়ত তোমার সন্দেহ ছিল। এখন তুমি কোঁচড়ভর্তি মুড়ি আর আখের গুড় এনেছ। হাতে পিতলের ঝকঝকে মাজা বদনায় শীতল জল। খেতে খেতে এবার তোমাদের সংসার এবং গ্রামের অনেক খবর শোনা গেল। বিদায় নিতে গিয়ে বললাম, — আচ্ছা এবার যাই, কেমন?

তুমি বললে, — আবার আসবেন।

— আসব।

তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। কারণ তুমি আমার কথা সরল অন্তঃকরণে বিশ্বাস করছিলে। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিনি। আমার মনে পড়ল, ইতিপূর্বে কত জায়গায় কতজনকে বলেছি, আবার দেখা হবে। কিন্তু তাদের কতজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে? অথচ এমনি করেই সারা জীবন বলতে হয়। তোমাকেও বললাম। আর মনে মনে এও জানি, কোন দিন দেখা হলে এই তুমি তো সেই তুমি থাকবে না।

আমি কিছুদূর এসে ঘাড় ফিরিযে দেখি, তুমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ। আমি যতই হাঁটছি, ততই বুঝতে পারছি আমার পিঠের উপব তোমার দৃষ্টি আছড়ে পড়ছে। আমি আর তাকাতে সাহস করলাম না।

তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। কলকাতায় কত চায়ের দোকানে 'বয়রূপী' কৃষক বালকদের মুখের দিকে তাকিয়ে কতবার তোমার কথা মনে পড়েছে। মাঝে মাঝে ওদেব কারো মুখে হয়ত তোমাব মুখেব আদল লক্ষ্য করে চমকে উঠেছি। হয়ত তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। হলেও সেই পুরনো দিনের বালকটিকে দেখতে পাব না, কালের স্রোতে তোমাকে আজ যৌবনে উত্তীর্ণ করেছে। তবু তুমি এই সতেব বছর ধরেই আমাব চেতনায় বালকবেশে সেই মাঠের মধ্যেই একা দাঁড়িযে আছ।

তুমি যেন আমাদের এই বাংলা দেশেব কৃষক আন্দোলনের কৈশোর অবস্থার প্রতীক!

কতকাল ধরে কত ধার্মিক ভক্তকে বৃন্দাবনের এক বংশীধারী কিশোব মাতিয়ে রেখেছে। আমাব মতো ঘোব নাস্তিককে না হয মাতিয়ে রাখুক তোমার মতো এক রাজবংশী চাষার ছেলে।

তুমি বেঁচে আছ, কিন্তু তোমার যৌবনের দিনগুলি নিদারুণ রুক্ষ ধূসর পথ পার হতে হতে এখন কোথায় এসে বিশ্রাম নিচ্ছে, তোমার বুকেব মধ্যেকার সেই সাহস এখনো অক্ষয় আছে কিনা, এসব আমি কিছুই জানি না। শুধু জানি, যতদিন কৃষক তাব মুক্তি খুঁজে না পায়, ততদিন আমারও মুক্তি নেই, ততদিন বাব বার তোমাকে আমায খুঁজে ফিবতে হবে।

কানাকড়ি

সন্তোষকুমার ঘোষ

দরজায় বারকয়েক টোকা দিল মন্মথ, তবু খুলল না। নাম ধরে ডাকল সাবিত্রী।

ভেতর থেকে সাবধানগলা সাড়া এলো; কে।

আমি।

দরজা খুলে গেল। সাবিত্রী বলল, এত দেরি হ'ল তোমার। আমি তখন থেকে ভয়ে মরি। চুপচাপ তক্তপোষে পা তুলে বসে আছি। জিনিস-পত্তব কিছু গোছগাছ হয়নি কিন্তু।

গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে মন্মথ বললে, কী করি, দু'দুটো টিউশনি ছিল যে। একটু পাখা করবে?

খালি-গা, হাঁটু অবধি কাপড় তুলে মন্মথ পাঁচ মিনিট হাওয়া খেল কিন্তু সাবিত্রী তখন কিছু বলল না। বলল অনেক পরে, একেবারে শুতে এসে।

আজ দুপুরের কথাটা। বিকেলের দিকে গলির ঠিক মুখটাতে ট্যাক্সিব হর্ণ বেজেছিল। মিনিটখানেক পবে একজোড়া মশমশ জুতো এসে থেমেছিল ওদের দোরগোড়ায। তাবপব দরজায় টোকা। কাছে পিঠে কেউ নেই, নতুন বাসা, চেনা নেই, জানা নেই, ভয়ে কাঠশবীব সাবিত্রী, ছিটকিনি তো ছিলই, তার ওপর খিল তুলে দিয়েছিল। ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল, ফিসফিস সুরে একজন বললে, ওদিকে নয়, ইদিকে। চোখেব মাথা খেয়েছ?

মশমশ জুতো বললে, তাই নাকি, মাইবি ভুল হয়ে যায়। তুমি তৈরি?

রেডি।

তা হলে ষ্টেডি — গো।

মশমশ জুতো মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে, পিছনে পিছনে খুটখুট। বোধ হয হাই-হীল। একটু পরে গলির মুখ থেকে ট্যাক্সি ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ এলো।

মন্মথ শুনলো সব, বলল, নতুন জায়গা, তাই সব তাতেই অস্বস্তি হচ্ছে। একটু চেনাজানা হোক, তখন আর এত ভয় পাবেনা।

প্রথম থেকেই সাবিত্রীর পছন্দ হয়নি। না বাসা, না গলি। আলাদা বাসার জন্যে মন্মথকে পেড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু সে কি এমনি। বাপের বাড়ি বেহালায়, সেখানে তবু মাটির ছোঁয়া ছিল। নারকেল গাছের ছাতাধরা ছোট্ট একটু ছাত ছিল। কিন্তু আহিরীটোলার এই গলিতে আছে শুধু পীচ আর পাথর।

অবাড়ন্তশরীর মেয়েদের বয়সের মতো, এ-বাড়িতে বেলা যেন বাড়ে না। সারারাত ভ্যাপসা গরমের পর একেবারে শেষ রাতে গলির গ্যাস-আলো ক্লান্ত চোখ বোজে, সেই সঙ্গে মানুষও। কিন্তু ক' মিনিট। একটু পরেই সদর রাস্তায় সাড়া জাগে, গঙ্গাযাত্রীদের নিয়ে প্রথম ঢঙ ঢঙ ট্রাম বেরুলো। চৌবাচ্চায় ঝিরঝির শব্দ, জলের কলটা যাটনম্বব আলেকজাণ্ডার সুতোর একগাছি দাঁতে চেপে আছে।

তারপর থেকে সব বাঁধা টাইমে। বাবুরা বাজারে বেরিয়েছেন, এখন তবে সাড়ে সাতটা। কুচো চিংড়ি আর পুঁইশাকে থলে ভর্তি করে ফিরছেন ঃ আটটা। কলতলায় মগ হাতে ঠেলাঠেলি, নাছুঁই পানি স্নান ঃ সাড়ে আট। নমো নমো খাওয়া। নটা। রেকাব থেকে তুলে নেওয়া মিঠে এক খিলি পান, রাস্তাব দড়ি থেকে ধরানো আয়েসী একটা কাঁচি — সারাদিনের বরাদ্দ ছুটির মধ্যে একটি — সাড়ে নটা, দৌড় — দৌড় — দৌড়।

তারপর থেকেই গলিটা যেন ঝিমোতে শুরু করে। কোন সাড়া নেই, ক্বচিৎ একটা কাকের কা-কা, ক্বচিৎ সারাদুপুর রোদে টোটো-হয়রান ফিরিওয়ালা এ-গলিতে খদ্দের না হোক, ছায়া খোঁজে।

সাড়া জাগে শুধু একবার, সেই শেষবেলায়, গলির মোড়ে ট্যাক্সির হর্ণে। পাশের ঘরের দরজায় তিনটে টোকার ইশারা, মশমশ জুতোর পিছে পিছে মিলিয়ে যায় হাই-হীল।

আলাপ হতে হতে ছদিন কাটলো।

জানালায় আয়না রেখে সাবিত্রী কপালে বড়ো করে সিঁদুরের টিপ পরছিল, ছায়া দেখে ফিরে তাকাল। বলল, আসুন। আপনি তো ও-ঘবে থাকেন?

চৌকাটেব ওপর ইতস্তত দু'টি পা। সাবিত্রী দু'টি উঁচু গোড়ালি পলকে দেখে নিল।

জুতো পায়ে ঢুকবনা ভাই। বেরুচ্ছি। দু'দিন থেকেই দেখছি আপনারা নতুন এসেছেন। তা ফুরসুৎই পাই না যে এসে পরিচয় করব। দবজা সব সময়ে তো বন্ধই দেখি। আজ খোলা দেখে এলুম।

আসুন, আসুন না ভেতরে। সাবিত্রী আবাব বলল। জুতো খোলাব দবকাব নেই, উনি তো দু'বেলাই ঢুকছেন।

তক্তপোষে বসে মেয়েটি বলল, বাঃ দিব্যি তো গুছিয়ে নিয়েছেন। দু'জনের সংসার।

দু'জনেব না। সাবিত্রী কুণ্ঠিত হেসে বলল, তিনজন।

ওমা তাই তো। খুকিকে তো দেখতেই পাইনি। কেমন চুপচাপ ঘুমুচ্ছে। কার মতো হয়েছে. — বাপেব মতো?

কী জানি। সাহস পেয়ে সাবিত্রী বলল, আপনাবা ক'জন দিদি।

হেসে লুটিযে পড়ার ভঙ্গি করে মেযেটি বলল, দিদি আবাব কী। মল্লিকা। আমাকে মল্লিকাদি বলে ডাকবেন। বয়সে তো আমি বড়ই হবো আপনাব চেযে মনে হচ্ছে।

মল্লিকাদি, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, আপনারা ক'জন — তিনজন না চাব?

একজন ভাই। মল্লিকা বলল, এক এবং অদ্বিতীয়। দু'জন হতে পারলাম কই যে তিনজন হবো।

ওমা, আপনার বিয়ে হয়নি? করেননি কেন।

করিনি কি আর সাধ করে। হ'ল না। মল্লিকা উদাসীন ভঙ্গিতে বলল। কিন্তু আমি আর বেশীক্ষণ বসব না ভাই। বেরুতে হবে। শ্যামের বাঁশি বাজলো বলে।

শ্যামের বাঁশি? একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে সাবিত্রী বলল, ও, ট্যাক্সির কথা বলছেন। আপনি বুঝি খুব ট্যাক্সি চড়েন?

তা চড়ি, মল্লিকা বলল, আপনি চড়েন না।

আমি? বলতে গিয়ে চোখ দুটো যেন নিবে গেল সাবিত্রীর। আমি? আপনিও যেমন মল্লিকাদি। গরীবের ঘরের মেয়ে পড়েছি গরীবের হাতে — আমি ট্যাক্সি চড়েছি দু'বার। একবার বিয়ের সময়, আরেকবার এই এবারে, মিনু হতে হাসপাতাল যেতে। সাবিত্রী ইঙ্গিতে ওর মেয়েকে দেখিয়ে দিলে।

নিজের কথাটা বলেই সাবিত্রী কৌতূহল সামলাতে পারল না, বলল, আপনাকে নিতে রোজ রোজ কে আসেন, মল্লিকাদি। ওই যে মশমশ জুতো, কোট, প্যান্ট —

ওমা, তাও দেখেছ। মল্লিকা অল্প হেসে বলল, ও হ'ল আমার এক মামাতো ভাই। আমার হার্টের ব্যামো কিনা, তাই রোজ হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়।

পরদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারা হলে সাবিত্রী নিজেই গেল মল্লিকার ঘরে। মল্লিকা বিছানায় শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল, এসো ভাই। কাজকর্ম চুকলো।

ঢুকবে কি, সাবিত্রীর পা সরছিল না। ছোট্ট, কিন্তু এমন সাজানো গুছানো ঘর আব কখনো চোখে পড়েনি। ঝকঝকে পালিশ খাটের ওপর ধবধবে বিছানা, ফুলতোলা বালিশেব ওয়াড়। ড্রেসিং আয়না, টি-পয়, গ্রামোফোন একটা। আলমাবিতে কাচের, চীনা মাটির খেলনা কতরকম।

এগুলো? সাবিত্রী জিজ্ঞাসা কবল।

এগুলো পুতুল। মল্লিকা বলল, আমি খেলি যে। আমার কি পুতুল খেলাব বয়স গিযেছে ভাই।

খাটের একপাশে সাবিত্রী বসল সন্তর্পণে। নোংরা কাপড়, কী জানি। মল্লিকার হাতেব বইটা দেখিয়ে বলল, কী পড়ছেন।

পৃষ্ঠা মুড়ে রেখে মল্লিকা বলল, গল্পের বই। কাল সিনেমায যে বইটা দেখতে গেছলুম, সেটাই লিখেছে। ভারি চমৎকার। তোমাকে কী বলব ভাই, কাল দু'জায়গায় আমার চোখে জল এসেছিল।

কাল সিনেমায গিয়েছিলেন বুঝি?

যেতে হয়েছিল, সাধ করে কি আর গিয়েছি। আমার সারা বিকেল মাথা ধরে আছে, তবু ছাড়ল না।

কে ছাড়লনা দিদি?

আবার দিদি। বলবে মল্লিকাদি। ছাড়ল না আমার জ্যাঠতুতো ভাই।

আপনার জ্যাঠতুতো ভাই, মল্লিকাদি। আপনার ছোট?

আঙ্গুলে বয়সের হিসেব করে মল্লিকা বলল, অনেক ছোট। প্রায় দু'বছর হবে। কেন তুমি দেখনি? সেই যে, রোজ গাড়ি নিয়ে বিকেলে আসে? ও আবার সিনেমার কাজ করে কিনা। ডিরেক্টর।

সাবিত্রী তখন কিছু বলল না, বলল অনেক পরে মন্মথকে, গরম ভাতের থালায় হাওয়া দিতে দিতে।

না জেনে শুনে আমাকে কী একটা বাসায় এনে তুলেছ, শুনি?

খাওয়া বন্ধ করে মন্মথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। ফিস ফিস করে সাবিত্রী বলল, তোমাকে সেদিন বলিনি? ও-পাশের ঘরে থাকে একটা নষ্টচরিত্রের মেয়েমানুষ। আমি এখানে থাকব কী করে বলো তো। তুমি তো বেরিয়ে যাও সারাদিনের মতো। একটু থেমে বলল, সেদিন বলেছিল মামাতো দাদা, আজ বলেছে জ্যাঠতুতো ভাই। মামাতো ভায়েরা রাতারাতি জ্যাঠতুতো ভাই হলে আসল সম্পর্কটা কী হয়, মুখ্য হলেও সেটুকু বুঝতে পারি।

মন্মথ ফের মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। বলল, তুমি বেশি মেশামেশি কোরো না। নিজে ঠিক থাকলেই হল। তোমাকে চিনি তো, খারাপ কিছু তোমার কাছে ঘেঁষতে পাবে না।

ওর চরিত্রতেজের ওপর স্বামীর অটুট শ্রদ্ধা আছে জেনে সাবিত্রীর বুক ভরে গেল।

দুপুরে মন্মথ অফিসে বেরুচ্ছে, সাবিত্রী বলল, আজ কিন্তু বাসার খোঁজ আনা চাই।

মন্মথ বলল, আচ্ছা।

ফিরতে ফিরতে মন্মথর রাত আটটা বেজে গেল। দরজার ছিটকিনি খুলে দিয়েই সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, পেলে খোঁজ।

কিসের?

বাসার।

জামা খুলে মন্মথ হুকে টাঙিয়ে রাখল, জবাব দিল না।

ভাত বেড়ে দিয়ে সাবিত্রী বলল, কাল যদি নতুন বাসার খোঁজ না কর, তবে আমি মাথা খুঁড়ে কুরুক্ষেত্র করব বলে রাখলুম।

বিরক্ত গলায় মন্মথ বলল, বাসার খোঁজ পাওয়া কি অত সহজ নাকি।

তাই বলে খুঁজবে না তুমি।

ডালের বাটিতে সুড়ুৎ চুমুক দিয়ে মন্মথ বলল, খুঁজব, খুঁজব। অত ব্যস্ত হলে কি চলে।

হাতাটা ঠং করে মেঝেয় ফেলে দিয়ে সাবিত্রী তিক্ত গলায় বলল, আমাকে একটা বেশ্যাবাড়িতে এনে তোলার সময় মনে ছিল না?

মন্মথর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বলল, তোমাকে বেশ্যাবাড়ি এনে তুলেছি আমি?

সাবিত্রী চোখ দু'টো তখনও জ্বলছে। রুদ্ধস্বরে বলল, বেশ্যা ছাড়া কী। দিনরাত রঙ মাখে, সঙ সাজে, ও কী-জাতের মেয়েমানুষ আমার জানতে বাকি নেই। তুমি যদি বন্দোবস্ত না কবো, আমিই করব। কালই বেহালায় চলে যাবো।

ভাতেব থালায় জল ঢেলে দিয়ে মন্মথ বলল, তাই যাও। তবু যদি সেখানে কী সুখ আমাব জানতে বাকি থাকত। বাপ নেই, মা ছেলেবৌয়ের কাছে চোর হয়ে আছে। ভাইযেব ছেলের কাঁথাবদলানো থেকে ভাজেব কাপড় কাচা অবধি সব কাজ করতে হয়নি সেখানে? দু'বেলা হেঁসেল ঠেলা, আর ঠেস দেওয়া কথা শোনা। দু'খানা শোবাব ঘর পর্যন্ত নেই। শনিবাব শনিবাব আমি যেতাম, শুতে দিত চিলেকুঠিতে, বুড়ি মা বারান্দায় ঠাণ্ডায় শুয়ে শুয়ে কাশত। তখন তুমি কেঁদে কেঁদে ইনিযে বিনিয়ে বলোনি আমাকে আলাদা বাসা করতে? বলোনি, এখান থেকে যেমন করে হোক আমাকে নিয়ে চলো। তোমার সঙ্গে না হয় গাছতলাতে থাকব, সেও সুখ? ও-কথাগুলো কি থিযেটারে শিখে এসে মুখস্থ বলেছিলে।

একটা মাদুর নিয়ে সাবিত্রী আলাদা শুতে যাচ্ছিল। মন্মথ বলল, খাবে না তুমি?

উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ ঢেকে সাবিত্রী চাপা কান্নাভাঙা গলায় বলল, আজ আমাকে বাপের বাড়ির খোঁটা দিলে তুমি। আমি জলটুকুও ছোঁব না।

ছোঁবেনা?

না।

থাকো তবে। একটা বালিশ নিয়ে মন্মথ বাইরের রকে শুতে গেল।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল, সারা গা ব্যথাব্যথা। ঘরে এসে আয়নায় দেখল চোখ দুটি লাল। সাবিত্রীর ইতিমধ্যে স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। এক পেয়ালা চা এনে মন্মথর সমুখে রেখে চলে যাচ্ছিল, মন্মথ ডাকল, শোন।

ভিজে চুল, খোলা, তখনো সিঁদুর পরেনি, সাবিত্রীর কপাল প্রাক্‌সকাল আকাশের মতো স্নিগ্ধ, নিষ্প্রভশুভ্র। বালিশে মুখ লুকিয়ে সারারাতকাঁদা চোখ দুটিতে করুণ ক্লান্তি। মন্মথ অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কোন কথা বলতে পারল না। সাবিত্রী মাটির দিকে অপলক চেয়ে আছে। মন্মথ অনেকক্ষণ পরে ডাকল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী চোখ তুলে তাকালো। পাতা দুটি কেঁপে উঠল একবার, একটু ভিজল, ঠোঁট দুটি থরথর হ'ল। উঠে গিয়ে মন্মথ সামনে দাঁড়াল সাবিত্রীর, একখানা হাত কাঁধের ওপর রাখল।

সরে যেতে চাইল সাবিত্রী, হাতখানা সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু সরতে গিয়েও সরতে পারল না, আরো বেশি করে ধরা পড়ল, ঢলনামা মুখ ডুবিয়ে দিল মন্মথর বুকে।

পরক্ষণেই হাসিকান্না মুখখানা তুলে বলল, একি, তোমার গা এত গরম।

মন্মথ সামান্য হাসল।

সাবিত্রী বলল, কাল আবার রাগ করে বাইরে শোয়া হয়েছিল। আজ অফিসে যেতে পাবেনা তুমি।

মন্মথ বলল, ও কিছু না। অফিসে যেতেই হবে। তুমি বাসাবাসা করে পাগল হয়ে আছ, তাই তোমাকে বলিনি। আমাদের অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। এ-সময়ে সবাই ভয়ে ভয়ে আছে। গরহাজির হলে গোলমাল হতে পারে।

বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো সরে গেল সাবিত্রী। সশঙ্ক স্বরে বলল, তোমারও চাকরি যাবে নাকি।

যেতে তো পারেই। আমদানী রপ্তানীর ওপব আমাদের অফিস, মাল আসছে না নিযমিত বিদেশ থেকে। পাকিস্তানেও চালান যাচ্ছে না।

একটু চুপ কবে থেকে মন্মথ আবার বলল, দু'দিন একটু চুপ করে থাকো। চাকবির ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক। এর মধ্যে আর নতুনবাসাব হাঙ্গামা কবে কাজ নেই। একটু নিচু গাঢ়গলায় মন্মথ বলল, আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি। নিজেদের নিজেবা সন্দেহ করে যেন ছোট না কবি। আমাকে তুমি চেন, আমিও জানি তুমি কী। আমাদের দু'জনেব কাছে দু'জনের দাম থাকলেই হল।

বাজারের থলি হাতে মন্মথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, সাবিত্রী ডাকল এই, শোন।

মন্মথ ফিরে তাকাল। সাবিত্রী বলল, গেঞ্জিটা ছেড়ে দিয়ে যাও, ওটা পরে আর বাইবে যায় না। লোকে বলবে কী।

সিঁদুবে চোখের জলে বুকেব কাছটাতে মাখামাখি। মন্মথ একটু হেসে গেঞ্জিটা খুলে দিল।

একটু পরেই মল্লিকা এসে দাঁড়াল দবজায়। মিটি মিটি হেসে বলল, কাল রাত্তিবে বুঝি কত্তাগিন্নীতে ঝগড়া হয়েছিল?

সাবিত্রী লজ্জিত গলায় বলল, কুই, নাতো।

ইস, আবার লুকোনো হচ্ছে।

আপনি কী করে জানলেন।

হাত গুনতে জানি যে। ঘরে খড়ি পেতেছিলাম। না ভাই, খড়ি নয়, আড়ি। কাল আড়ি পেতেছিলাম তোমাদের দরজায়। সাবিত্রী তবু বিশ্বাস কবছে না দেখে মল্লিকা বলল, কাল তোমার কর্তাকে রকে ঘুমোতে দেখলাম কিনা, তাই। শেষ শো'তে থিযেটাব দেখেছি কাল, ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। দেখছ না চোখ দু'টো ফোলাফোলা, ভালো ঘুম হযনি কিনা তাই। একটু থেমে মল্লিকা বলল, কাল তোমরাও তো ঘুমোওনি। চোব এলে কিন্তু মুশকিলে পড়তে ভাই। বলে মল্লিকা হাসল।

কিন্তু সাবিত্রী হাসল না। সেই লজ্জাটুকু ঢাকতে মল্লিকাকে একটু বেশি করে হাসতে হল।

এড়াতে চাইলেও সব সময় এড়ানো যায় না। এক বাসায় থাকতে গেলে দু'চাববাব মুখোমুখি হতেই হয়, মিষ্টি হেসে মিষ্টি হাসির শোধও দিতে হয। বিশেষ, মল্লিকা যেদিন একবাটি মাংস নিয়ে রান্নাঘরের সমুখে এসে দাঁড়ালো, সেদিন আর সাবিত্রী না বলতে পারলো না। একটুখানি চেখে বলল, চমৎকার হয়েছে মল্লিকাদি।

মল্লিকা বলল, বুনো পাখি। শশাঙ্করা বাইরে গিয়েছিল, শিকার করে এনেছে। ভাবি চমৎকার স্বাদ না?

শশাঙ্কই যে মল্লিকার সেই জ্যাঠতুতো কিম্বা মামাতো ভাই, সাবিত্রী জানত। চুপ করে রইল, কিছু বলল না।

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ কী রাঁধলে ভাই? কী মাছ, দেখি।

সেদিন বাজার থেকে মাছ আসেনি, কিন্তু মাথা কাটা গেলেও সাবিত্রী সে-কথা স্বীকার করতে পারবে না। বলল, দেরিতে বাজার এসেছে, এ-বেলা বেশি কিছু হয়নি মল্লিকাদি। অল্প চারটি খেয়েই আফিসে গেছেন। ও-বেলার জন্যে রেখে দিয়েছি বাঁধাকপি আর মাছের মুড়ো।

চলে যেতে যেতে মল্লিকা বলল, ও-বেলা আমার এক বাটি চাই কিন্তু।

মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল সাবিত্রীর মুখ। তখন থেকে কেবলি প্রার্থনা করেছে, হে ঠাকুর, আজ যেন উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরেন, কিন্তু মন্মথ ফিরল সাতটা বাজিয়ে।

ঘরে ঢুকেই মন্মথ জামাটা ছাড়তে যাচ্ছিল, সাবিত্রী সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, খুলো না। তোমাকে এখুনি বাজার যেতে হবে।

বিস্মিত বিরক্ত গলায় মন্মথ বলল, কেন।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো সাবিত্রী। সন্তর্পণ গলায় বলল, একটা বাঁধা কপি আনবে, আব একটা মাছেব মুড়ো।

মন্মথ বিদ্রূপ করে বলল, হঠাৎ এত সখ যে। এত খাবাব সাধ — পোযাতি হলে নাকি আবার?

সাবিত্রী বলল, চুপ চুপ, আস্তে। সাধ নয় গো মান। আমার মান বাঁচাতে পারো একমাত্র তুমি। তাবপব সাবিত্রী ফিসফিস কবে সব কথা বলল। শুনে কঠিন হয়ে গেল মন্মথব মুখ। কী ফ্যাসাদ বাধিযে আছ বলো তো। মাসের শেষ, হাতে পয়সা নেই, শেষ রেশনটা বাদ দেবো কিনা ভাবছি, — তাব ওপর এসব কী পাগলামি। তোমাকে বারবার বলিনি, আমবা দু'জনকে নিযে দু'জন, কারুর কাছে ছোট হবো না, তাই বলে ছোট কাজও করব না কখনোও, কেন, কেন তুমি পাল্লা দিতে চাও অন্যেব সঙ্গে?

মন্মথর হাত দু'খানা চেপে ধবল সাবিত্রী। ধবা গলায় বলল, আর করব না। কিন্তু আজকের মতো আমাকে বাঁচাতেই হবে। না-হয় কোন হোটেল থেকে একবাটি কিনে নিযে এসো। কম খবচে হবে।

হাত ছাড়িযে মন্মথ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল. পাগলামি ক'রনা। আমি এখন যাই, হোটেলে হোটেলে খোঁজ নিইগে কোথায বাঁধাকপি দিয়ে মাছেব মুড়ো রাঁধা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত, মন্মথ কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটিতে বাঁধাকপির ঘণ্ট জোগাড কবে আনলও। অনেক রাতে, শুতে এসে সাবিত্রী বলল, হোটেলের রান্না, মল্লিকাদি কিছু টের পায়নি কিন্তু! খুব সুখ্যাতি করছিল।

সেদিন দুপুর থেকেই মল্লিকার ঘর সাজানোব ঘটা দেখে সাবিত্রী অবাক হয়ে গেল। যেখানে যত ঝুল ছিল, সব সাফ করেছে মল্লিকা, বালতি বালতি জল ঢেলে মেঝে ধুয়েছে। খাটটা ছিল ঘরেব মাঝখানে, সেটাকে টেনে এনেছে এক কোণে। ঘষে ঘষে পবিষ্কার করেছে আয়নাব কাঁচ। ফুলদানীতে টাটকা তাজা ফুল, জাজিমেব ওপব ধবধবে চাদর।

কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে গাযে মুখে মাথায় সাবান মেখেছে মল্লিকা, বারান্দায় সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা। সাবিত্রী সারাক্ষণ উঁকি দিয়ে দেখছে মল্লিকার কাজ। বলল, আজ যে এত ঘটা মল্লিকাদি?

মল্লিকা মুচকি হাসল। বলল জানো না? আজ যে আমাকে দেখতে আসবে ভাই। তা কেউ তো নেই, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করছি।

সাবিত্রী বলল, ঠাট্টা!

কেন আমাকে বুঝি দেখতে আসতে পারে না? আমার বিয়ের বয়স কি একেবারেই গিয়েছে ভাই। দেখতো কেমন টান টান চামড়া, ধবধবে রঙ, মল্লিকা সামনে হাত দু'খানা প্রসারিত করে ধরল।

অপ্রতিভ সাবিত্রী বলল, তা কেন, তা কেন। সত্যি করে বলুন না, মল্লিকাদি কে আসবে আজ।

আমার ক'জন বন্ধু। নেমন্তন্ন করেছি আজ। এখুনি এসে পড়বে ওরা।

তারপব কতক্ষণ ধরে যে মল্লিকা আয়নার সমুখে বসে বসে প্রসাধন করল। সাবান দেওয়া চুল ফাঁপিয়ে দিল খোঁপাবাঁধার এক নিপুণ কৌশলে। একটু রঙ, একটু পাউডার ক্রীম মিশিয়ে তৈরী করল অপরূপ ত্বকপ্রলেপ, ভ্রূরেখাকে দীর্ঘায়ত করল তুলিকায়। হারমোনিয়ামেব নিখুঁৎ সাজানো রীডের মতো দাঁতের পাঁতি বার করে যখন হাসল, সাবিত্রী মুগ্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে বলল, আপনার বন্ধুরা এসে পড়বেন। আমি এখন যাই মল্লিকাদি।

মল্লিকা বলল, আহা, ব'সনা।

এখনও ঘর সাজানো একটু বাকি ছিল, এটা-ওটা এখানে সেখানে সরাতে লাগল, টুলের ওপর বসে মেযেকে দুধ দিতে দিতে সাবিত্রী দেখতে থাকল নির্নিমেষে।

ঠিক সেই সময়ে বারান্দায় মশমশ জুতোর শব্দ শোনা গেল, আজ এক সঙ্গে অনেক জোড়া। পালাবে কি, দরজা তো মোটে একটা। মাথার কাপড় সামলাতে গিয়ে কাপড় আলগা হয়ে পড়ল, পায়ের দিকে তাকাতে গিয়ে নজরে পড়ল গোড়ালির ওপরেও খানিকটা জায়গায় উপযুক্ত প্রচ্ছদ নেই।

খুকিকে একরকম জোর করেই দুধ ছাড়াল সাবিত্রী, মেঝেয় শুইয়ে দিল, ব্লাউজের বোতামগুলি পট পট করে বন্ধ করল কোনক্রমে। খুকিকে কোলে নিয়ে দৌড়তে যাবে, চৌকাঠের ওপর দাঁড়িযে আছে শশাঙ্ক, একেবারে মুখোমুখি।

না-জানি আজ একটা গোটা আতরের শিশিই ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর রুমালে শশাঙ্ক উজাড় করে এসেছে, গন্ধে সাবিত্রীর গা-বমিবমি অনুভূতি এলো। চৌকাঠ ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল শশাঙ্ক, সেই ফাঁকটুকু দিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও সাবিত্রীর মনে হ'ল ছোঁয়াছুঁযি হয়ে গেল বুঝি। অসম্বৃত গিলে আস্তিন আদ্দির জামাটা বুঝি সেঁটেই রইল আঁচলে, হীরে ঠিকরানো আঙ্গুলের শর বিঁধে রইল পিঠে, ঠিক যেখানটায় ব্লাউজটা ফেঁসে গেছে।

তা ছাড়া ঘরে এসেও সাবিত্রী ভুলতে পারল না শশাঙ্কর চাউনি। কী আতুর, আচ্ছন্ন চোখে চেয়ে ছিল লোকটা। পাতের পাশে বসে থাকা বেড়ালটা যে-আগ্রহে বাটির গা চেটে চেটে খায়, চুষে চুষে খায় মাছের কাঁটা, তেমনি। সাবিত্রী সারা শরীর ভরে শিহরণ অনুভব করল।

শনিবার, মন্মথ সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ফিরল। ঘরে পা দিয়েই একরকম চেঁচিয়ে উঠল, কী হচ্ছে কী হচ্ছে ও-ঘরে।

সাবিত্রী বলল, একটু আস্তে কথা বলতে পারো না? গান। মল্লিকাদি গান গাইছে। ও-ঘরে আজ কত লোক এসেছে জান।

ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল মন্মথর মুখ। জানালা দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিতে দিতে বলল, ছি-ছি-ছি। ওরা বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু করলে দেখছি।

খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে সাবিত্রী বলল, ঘুঙুরও বাজছে না?

মন্মথ তখন ভেন্টিলেটার দুটোও বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছে। বলল, ওসব শুনে কাজ নেই।

এক একবার গান থামে, সাবিত্রী বলে, এই বুঝি ওদের আসর ভাঙলো। কিন্তু ভাঙেনা। একটা শেষ হতেই এক পশলা হাততালির তারিফ শোনা যায়, পবক্ষণেই হারমোনিযমটায় নতুন সুর ককিয়ে ওঠে।

মন্মথ বলল, কী কেলেঙ্কারি। এই তবে পেশা তোমার মল্লিকাদির। এতদিনে পরিষ্কাব বোঝা গেল। ছি-ছি পেটে খাবার জন্য কত ছোট কাজই না কবে মানুষ। বলতে বলতে মন্মথর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; আমাদের কিন্তু গর্ব আছে সাবিত্রী, উপোস কবে শরীর শুকিয়ে মবলেও ভেতরের মানুষটাকে নীচু করিনি। কালই বাড়িওযালাকে বলব আমি। একটা বিহিত কবতে হবে।

সাবিত্রী ভেবেছিল মল্লিকা পর্বদিন মুখ দেখাতে পাববে না ওব কাছে। আশ্চর্য, পবদিন কলতলায মল্লিকাই সেধে কথা বলল।

এমন বেহায়া মেযে, বলল, কাল কেমন গান শুনলে ভাই।

সাবিত্রী কোন জবাব দিল না।

মল্লিকা বলল, উঃ, কী ধকল গেছে কাল। থামতেই চায় না। একটা শেষ হতে আবেকটার ফরমাস কবে।

সাবিত্রী বাঁকা গলায বলল, কাল যাবা দেখতে এসেছিল, তাদেব আপনাকে পছন্দ হযেছে মল্লিকাদি?

কুলকুচিব জল সশব্দে দূবে ছিটিযে সশব্দে হেসে উঠল মল্লিকা। ওমা, তুমি এখনো ঠাট্টাব কথাটা মনে বেখেছ? আমাকে দেখতে তো আসেনি। শীগ্‌গিবই আমবা একটা গীতিনাট্য অভিনয কবব কিনা, কাল আমাব ঘবে তাব মহলা হ'ল। আসছে পূর্ণিমায় শো। নাট্যপীঠ থিযেটাবও ভাড়া নেওযা হযেছে, জান?

সাবিত্রী নীববে কাপড় কাচতে লাগল। মল্লিকা হঠাৎ কাছে ঘেঁসে এলো। সাবিত্রীব কানেব কাছে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থেকো ভাই। কাল শশাঙ্ক তোমাকে একেবাবে স্পষ্ট সামনাসামনি দেখেছে। কী বলব, ওব মাথা ঘুবে গেছে একেবাবে। ওবা এবাবে যে ফিলিমটা তুলছে, তাতে নাকি ছোট্ট একটি মাযের পার্ট আছে। খুকিকে তুমি দুধ দিচ্ছিলে না — ঠিক অমনি একটা পোজ ওদেব চাই।

সাহস পেযে আরো কত কী বলত মল্লিকা ঠিক নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সাবিত্রী দুমদাম পা ফেলে উঠে গেল। মুখ ফিবিযে বলে গেল, তুমি মবো মল্লিকাদি।

ববিবার বাড়িওযালার কাছে যাই-যাই করেও মন্মথ আলসেমি করে সারাদিন বাসায কাটিযে দিল। সোমবার অফিসফেবৎ যাবার কথা ছিল, সেদিন বেলা তিনটের সময়ই সটান চলে এলো বাড়ি। কোনোদিকে না চেযে সোজা ঘবে গিযে তক্তপোষে শুয়ে পড়ল।

মেঝেয় আঁচল পেতে শুযেছিল সাবিত্রী, ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, একি, এত শীগগির ফিরলে আজ? তাহলে আজ সিনেমায় নিযে যেতে হবে কিন্তু।

কঠিন চোখে তাকাল মন্মথ। বলল, হ্যাঁ। সেইটেই বাকি আছে। সিনেমা দেখাবই সময় আমাদের।

ভয় পেয়ে আরো কাছে ঘেঁসে এলো সাবিত্রী। মন্মথব কপালে উদ্বিগ্ন করতল রাখল, ভিজে হাত গরম ঠেকল, কিন্তু নিশ্চিত বোঝা গেল না, তখন গাল কাৎ কবে রাখল মন্মথর কপালে। বলল, জ্বর হয়নি তো।

পাশ ফিরে সরে গেল মন্মথ। বিষণ্ণঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল, জবাব আমার কপালে লেখা নেই, সাবিত্রী, জামার বুক পকেটে আছে। উঠে গিয়ে দেখ।

অফিসের ছাপমারা লেফাফা দেখে সাবিত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। খাম না খুলেই বলল, এ কী ছাঁটাই?

মন্মথ এ-প্রশ্নের জবাব দিল কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে।

মল্লিকা উঁকি দিয়ে বলল, ওমা, খুকিকে এখুনি ভাত দিয়েছ, ভাই? বয়স কত ওর — দাঁত উঠেছে?

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলল, উঠেছে দিদি, ওপরনীচ মিলিয়ে ছ'টা। ভীষণ পেটের অসুখ যে ওর, তাই ভাবছি আজ দুধ দিয়ে কাজ নেই।

মল্লিকা মুখ টিপে হাসল ঃ কলকাতার দুধ তো সিকিটাই জলমেশানো, পাথরভর্তি চালের চেয়ে সেটা পেটের পক্ষে ভালই হত সাবিত্রী।

মুখ টেপার রকম দেখে সাবিত্রীর সারা শরীর জ্বলে গেল। মনে মনে বলল, বেশ্যা, হারামজাদি।

সন্ধ্যার পর নিজেই একটা দরখাস্তর মুসাবিদা কবছিল মন্মথ, আপনমনে হাসছিল। সাবিত্রী পাশে এসে বসল। মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, হাসছ যে। আজ কোথাও কোন আশা পেয়েছ?

মন্মথ বলল, না। আজ আলফ্রেড এণ্ড জ্যাকসন কোম্পানীর বড়বাবুকে কেমন জব্দ করেছি সেই কথাই ভাবছি।

সাবিত্রী উৎসুক চোখে চেয়ে আছে দেখে মন্মথ গল্পটা বলল ঃ আরে না-কামানো গাল আর খালি পা দেখে ব্যাটা তো কথাই বলতে চায় না। বলে বেযারার কাজ নেই বাপু, অন্যত্র দেখ। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বললুম, বেযারার কাজ চাইনে স্যার, ক্লাবিকাল। আমি সাত বছব সিমসন জোসেফের বাড়ি ক্লার্কের কাজ করেছি। আমাব চেহাবা আগাগোডা দেখে নিযে — চোখ তো নয শালাব, যেন বুরুশ — বড়বাবু বললে, তুমি! বললুম, ভদ্রলোক স্যাব, দস্তবমত আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। জ্যাঠামশায় মাবা গেছেন স্যার, তাই. .। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভঙ্গি বদলে গেল ব্যাটার। বললে, অশৌচ কেটে যাক, একটা দরখাস্ত নিয়ে আসবেন। দেখি ছোট সাহেবকে বলে কিছু করতে পাবি কিনা। মন্মথ হো-হো কবে হাসতে লাগল।

নিয়ে যাও তবে দরখাস্ত?-সাবিত্রী বলল।

আর সেখানেই তো মুশকিল। দরখাস্ত তো কালই নিয়ে যেতে পারি। না হয় দু'আনা খবচ করে দাড়ি কামিয়ে বললাম, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল স্যার। কিন্তু পা দু'খানা মুড়ি কী দিয়ে।

অনামিকা থেকে নিঃশব্দে বিয়ের আংটিটা খুলে সাবিত্রী মন্মথর হাতে দিল। মন্মথ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল, কালই একজোড়া জুতো কিনবে তুমি।

সাবিত্রী চায়না, না ঘেঁষতে, না মিশতে, তবু কি কম্‌লি মল্লিকা ছাড়ে। মন্মথ বেরিয়েছে টের পেয়েছে কি এ-ঘরে এসে বসবে। বিব্রত, বেআব্রু করবে সাবিত্রীকে একটার পর একটা রঞ্জনরশ্মি প্রশ্নে।

গাযে যে বড়ো একটাও জামা রাখনি সাবিত্রী?

কুণ্ঠিত সাবিত্রী আরো জড়োসড়ো হয়ে বসতে চেষ্টা করে বলে, বড় গরম যে মল্লিকাদি?

গরম? হাসালে ভাই তুমি আমাকে। চারদিন থেকে সমানে বিষ্টি, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া, আমরা রাত্তিরে চাদর গায়ে দিচ্ছি, তবু তোমার গরম গেল না। অবাক করলে ভাই। এ-গরম তোমার বয়সের।

মল্লিকার গলাটা টিপে ধরলে, নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে বুঝি রাগ যেত সাবিত্রীর। কিন্তু উপায় নেই। মুখ ফুটে কাউকে বলা যাবে না কিছু। গোপন ঘায়ের মতো লুকিয়ে

রাখতে হবে এই দুঃখ; এই অনটন, যা অনশনের সোদর। কিন্তু পুঁজেরক্তে ছেঁড়া কাপড়খানাও যে মাখামাখি হয়ে গেল, সাবিত্রী লুকোবে কী?

মল্লিকা বলল, আজ দুপুরে একটু বেরুবো। ঘরখানার ওপর একটু নজর রেখো। সেই কথাই তোমাকে বলতে এলুম।

কোথায় যাবে, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করেনি, মল্লিকা নিজেই বলল।

বেসে যাবো ভাই। শশাঙ্করা খুব ধরেছে। সারাদিনের ধকল, শরীরে কি এত সয়! দম নিয়ে ফের বলল, তা শশাঙ্ক বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। জিতিযে দেবে কিন্তু তোমাকে ঠিক। পাঁচ টাকায় পাঁচশো। সেই যে ম্যাজিক আছে না, ধূলোমুঠো সোনা হযে যায়? এ তাই।

পাঁচ টাকায় পাঁচশো, মল্লিকাদি?

ওই কথার কথা। তা তেমন তেমন ঘোড়া মিললে হয় বৈকি। আর তিন টোটের খেল মেলাতে পারলে তো কথাই নেই, — রাতারাতি বড় মানুষ।

সাবিত্রীর চোখ দু'টো জ্বলছিল। মল্লিকা বলল, অবাক হয়ে চেয়ে আছ যে।

সাবিত্রী শুকনো গলায় বলল, এমনি।

কিন্তু মল্লিকা বেবিয়ে যেতেই সাবিত্রী চালেব হাঁড়িতে হাত দিল। বেরুল টিনেব একটা কৌটা, সেই কৌটোর মধ্যে ন্যাকড়ার একটা পুঁটলি। গিঁট খুলতে ছড়িযে পড়ল পয়সা, সবশুদ্ধ সওয়া পাঁচ আনা। মন্মথর চাকরী হলে কালিঘাটে পূজো দেবে বলে কবে যেন সাবিত্রী আলাদা করে রেখেছিল।

মল্লিকাব তখনো সাজগোছ সারা হয়নি, সাবিত্রী গিয়ে দাঁড়াল। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে, মল্লিকা তখন কণ্ঠায, ঘাড়ে, কনুই অবধি পাউডার মাখছে। ফিবে তাকিয়ে বলল, কী ভাই।

সাবিত্রী অনেকক্ষণ কিছু বলতে পাবল না। তাবপব সঙ্কোচ জয কবে নীচু গলায বলল, কম পযসায় বেস খেলা যায় না, মল্লিকাদি?

মল্লিকাব চোখে মুখে কৌতুক ছড়িযে পডল, বলল, কত কম পযসা, ভাই?

এই ধবো, স'পাঁচ আনা?

স'পাঁচ আনা কেন, পাঁচ আনাতেই চলবে। আমাব চেনা বুকি আছে কত, তুমি খেলবে?

কুণ্ঠিত, কাঁপা হাতে সাবিত্রী মল্লিকার হাতে পাঁচ আনা গুঁজে দিল। মল্লিকা বলল, ঘোড়া?

সাবিত্রী, বলল, ওসব আমি বুঝিনে, তোমাব যা ভাল মনে হয়, ক'র মল্লিকাদি।

সেই পাঁচ আনা সুদে-আসলে ফিবে এলো কিন্তু। মল্লিকা বলল, তোমার ভাগ্য ভাল সাবিত্রী আমরা এলোমেলো খেলে ফতুর, কিন্তু তোমার নামে যেটা ধরলুম, সেটাই বাজি নিলে। তবে পেমেন্ট ভাল হয়নি, নামী ঘোড়া কিনা। পাঁচ আনায় পেয়েছে আট আনা।

আমার এই ভালো মল্লিকাদি, সাবিত্রী আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে।

চাযেব সঙ্গে ফুলুরি বেগুনী দেখে মন্মথ অবাক হ'ল। পয়সা পেলে কোথায় তুমি?

যেন কতই রহস্য, সাবিত্রী এমন ভঙ্গিতে হাসল।

চাকরির দরখাস্ত লিখে লিখে আর জবাব না পেয়ে পেয়ে মেজাজ আজকাল সর্বদাই তিরিক্ষি মন্মথর, স্ত্রীর কাছেও জবাব না পেয়ে চটে গেল, রোজগার করেছ নাকি?

তবু হাসল সাবিত্রী — যদি বলি তাই।

ঠাট্টাকটু গলায় মন্মথ বলল, আশ্চর্য হবো না, জলজ্যান্ত আদর্শ যখন পাশেই রয়েছে।

কথার ধরনে সব উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছিল সাবিত্রীর, তবু মন্মথকে সব কথা খুলে বলতেই হল।

অন্ধকার হয়ে গেল মন্মথর মুখ। গম্ভীর স্বরে বলল, এও তো এক হিসাবে তোমার রোজগারই। ছি-ছি। তোমাকে বলিনি সাবিত্রী, ও-সবে কাজ নেই। না খেয়ে থাকবো সেও স্বীকার, তবু তোমার উপার্জন খেতে চাইনে।

কার্তিক মাসের গোড়াতে সাবিত্রী বাপের বাড়ি গেল। ইচ্ছে ছিল না, শুধু মন্মথর পেড়াপীড়িতে। সাবিত্রী বারবার বলেছে, আমার কিছু ক্ষতি হবে না দেখো। তা ছাড়া, আমাদের এখন এই দুঃসময় চলছে। কার কাছে তোমাকে রেখে যাবো।

মন্মথ বলেছে, সে-ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে। এ-অবস্থায় এত খাটুনি সহ্য হবে না, তার ওপর পেট ভরে দুবেলা খেতেও পাওনা। শেষ পর্যন্ত একটা বিপদ বাধাবে? আর, কদিনের জন্যেই বা। তোমার হিসেব মত তো আর সাড়ে পাঁচ মাস?

কিন্তু ঠিক পঁচিশ দিনের মাথায় সাবিত্রী ফিরে এলো, ফ্যাকাশে, সাদা কাঠি। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে, পেট চুপসে ছুঁয়েছে পিঠ।

মল্লিকা বলে, ছেলে কোলে করে আসবে ভেবেছিলাম, তা এ কী চেহারা নিয়ে এলে, ভাই?

সাবিত্রী বলল, ও-শত্তুর না এসেছে ভালই হয়েছে মল্লিকাদি। এলে খাওয়াতাম কী।

কী হয়েছিল রে।

কিচ্ছু না। শরীরটা এখান থেকেই খারাপ নিয়ে গিয়েছিলাম তো। রোজই ঘুষঘুষে জ্বর হত। ওখানে গিয়ে কলতলায় মাথা ঘুরল একদিন, — ব্যস।

শরীরটা দু'দিন একটু সেরে এলেই পারতে।

সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ দিনকতক ঘোরাঘুরি করছে। ব্যবসা করছে বলে। বাপের বাড়ি যাবার আগেই সাবিত্রী শুনে গিয়েছিল, এক বন্ধুর প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে মন্মথ, কাজ দিলে কমিশন। লক্ষ্মীর কৌটো কুড়িয়ে কাচিয়ে বেরিয়েছিল পাঁচ টাকা, খুদ বিক্রী করে আরো দেড়। একটা ট্রামের মান্থলি কিনেছিল মন্মথ।

একদিন দুপুরে মন্মথ খেয়ে দেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ছে দেখে সাবিত্রী বলল, কী গো, আজ কাজে যাবে না?

মন্মথ হাই তুলে বলল, দূর, দূর। শুধু ঘোরাঘুরি, শরীরটাই মাটি।

কাজ দিতে পারনি তোমার বন্ধুর প্রেসে?

দিয়েছি তো। মন্মথ খাটের নিচে রাখা লেটার হেডের স্তূপ দেখিয়ে দিল, ওগুলো দেখতে পাওনি? চক্রবর্তী এণ্ড দত্ত, — অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

কোন কোম্পানী?

কোম্পানী আমি নিজেই। দত্ত নামটা দিয়েছিলাম মনগড়া। শুধু একটা নাম কেমন ন্যাড়ান্যাড়া শোনায় বলে। ওগুলো কাল সের দরে বেচে দিও।

আরেকটা কাজের কথা অনেক দূর এগিয়েও হল না। কোন একটা ফার্মের ট্রেড রিপ্রেসেণ্টেটিভ। কলকাতার বাইরে যেতে হবে মাঝে মাঝে। একশো টাকা মাইনে, রাহা খরচা, উপরন্তু বিক্রির ওপর দু' পারসেণ্ট কমিশন। সে-অফিসের মাঝারি একজন কেরাণীকে পান খেতে কিছু হাতে গুঁজেও দিয়ে এসেছিল। নির্দিষ্ট দিনে দেখা করতে গেল মন্মথ। ফিরে আসতে সাবিত্রী বলল, হল?

না। মন্মথ বলল, জোচ্চোর শালা জোচ্চোর — পাঁচশো টাকা জমা রাখতে চায়। আরে তোদের মাল নিয়ে কি সরে পড়তাম আমি? এটুকু বিশ্বাস করতে পারিস না?

মন্মথ বলতে বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যেন সাবিত্রীই জামিনের টাকা চেয়েছে। যেন সাবিত্রীই ওকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

অন্য লোক নিয়েছে ওরা?

আরে সেই কথাই তো বলছি। যাকে নিয়েছে সে আবার আমার চেনা, প্রভাস গাঙ্গুলী। সেদিন বিয়ে করেছে কিনা, নগদ নিয়েছে দু'হাজার, বলামাত্তর পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল।

কোন কারণ নেই, তবু সাবিত্রী মাথা নীচু করল। ওর বাবা শুদ্ধমাত্র শাঁখা সিঁদুরে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন, সেই আপশোসই মন্মথ করছে না তো এতদিন পরে, কোলে একটা আসবার পরে, এমন কি আরও একটা নষ্ট হয়ে যাবার পরে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়, কিন্তু শাক ঢাকবে কী দিয়ে। আর মল্লিকা এমন সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে যে লুকোবার উপায় নেই।

মল্লিকা বললে, এত শীগগির আজ খেতে বসেছ ভাই?

পাতে শুধু কলমী শাক সেদ্ধ, আর কয়েকদানা মাত্র ভাত। অন্যদিন হলে সাবিত্রী তাড়াতাড়ি জল ঢেলে দিত থালায়। কিম্বা বলত আজ তোমার ভগ্নিপতির তাড়াতাড়ি কাজ ছিল দিদি, বাজারটাও করে দিয়ে যেতে পারেনি, তা, আমারও শরীর ভাল নেই, দু'টো দাঁতে কাটছি শুধু।

নিজের ঘরে গিয়ে ছোট একটা বাটিতে মাছের ঝোল নিয়ে ফিরে এল মল্লিকা, একটু চেখে দেখবে ভাই, নুন দিয়েছি কিনা বুঝতে পাচ্ছি না।

অত্যন্ত সহজ হল, অন্যদিন হলে অপমান বোধ করত, মল্লিকাকে ফিরিয়ে দিত, কিন্তু আজ কী হ'ল সাবিত্রীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। কত ভুল না করে মানুষ, কত অকারণে একে অপরকে ঠেলে রাখতে চায় দূরে। পাশের ঘরের এই মেয়েটিকে কেন বরাবর অপছন্দ করে এসেছে সাবিত্রী? ওর কাছে আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে বলে? অকস্মাৎ সাবিত্রীর মনে হ'ল সেও তো মল্লিকার কাছে কম কথা লুকোয়নি। মল্লিকা গোপন করতে চেয়েছে ওর কলঙ্কের কুলো, সাবিত্রী ওর অভাবের ফুটো কলসী। এতদিন পরে সাবিত্রী প্রথম অনুভব করল একই পৈঠায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

বুক ঠেলে খানিকটা লবণাক্ত কান্না ছাপিয়ে পড়ল সাবিত্রীর চোখে।

সেদিন সাবিত্রী একটা অসমসাহসিক কাজ করল।

তেমন কিছু রোদ নেই তবু চোখ দু'টো গরম, কান ঝাঁঝা করছে। অনভ্যস্ত পায়ে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে শাড়ি। ধারকরা স্যাণ্ডালটার স্ট্রাপ যেন চামড়া কষে ধরেছে।

একা পথ চলার অভ্যাস নেই, ভয় ছিল ঠিক চিনতে পারবে কিনা। মল্লিকা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, — বিশেষ অসুবিধা হল না।

ঘড়িতে দেখল তখনো সিনেমা শুরু হতে মিনিট পনেরো দেরি। ধপ করে একটা কৌচে বসে পড়ল সাবিত্রী। মল্লিকার দেওয়া গন্ধ রুমালে মুখের ঘাম মুছল।

কিছুই লুকোয়নি আজ মল্লিকার কাছে। মন্মথর চাকরি না থাকার কথা, অভাবের কথা, উপোস দেওয়ার কথা। সব অহংকার, অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বলেছে, তোমার পায়ে পড়ি মল্লিকাদি, যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে দাও। নিজের জন্য ভাবিনা। কিন্তু চোখের ওপর মেয়েটা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, সহ্য হয় না।

কী-কাজ করবে তুমি?

তাই-তো, কী কাজ। না-জানি ভাল লেখাপড়া, না সেলাই। টীচার হতে পারবে না, নার্স না দর্জি না। কথাবার্তায় তুখোড় নয় যে টেলিফোনে কাজ নেবে। অসীম প্রয়াসে সংকোচ জয় করে সাবিত্রী বলেছে, আচ্ছা সেদিন যে কাজটার কথা বলেছিলে সেটা হয় না? সেই যে সিনেমায়, ছোট্ট একটা পার্ট, মায়ের? শশাঙ্কবাবুকে একবারটি বলে দেখ না মল্লিকাদি।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল মল্লিকা। দাঁত দিয়ে সূতো কাটতে কাটতে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি বললেও হবে; কিন্তু তার চেয়েও একটা সহজ উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুমি রাজি হবে ভাই।

রাজি? হাসতে গিয়েও চোখ দু'টো আবার ভারি হয়ে এল সাবিত্রীর। ভিখারীর আবার বাছবিচার। আমার কিছুতেই ভয় নেই মল্লিকাদি। তুমি বল।

মল্লিকা বলল। সাবিত্রী এত যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তবু প্রথমটা কোন কথা বলতে পারল না। মল্লিকা জোর দিয়ে বলল, অন্যায় কিছু করতে বলছি না তো, শুধু পাশে গিয়ে বসবে। আমার নামে টিকিট তো কেনাই আছে। আমি জোর দিয়ে বলছি সাবিত্রী, আমি বললে যা হত, এতে তার চেয়ে দশগুণ ফল হবে। নিজের কাজে নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হয় ভাই।

কী সম্মোহন ছিল মল্লিকার অকম্প স্বরে, অপলক চোখে, সাবিত্রীর অন্তস্তল অবধি কেঁপে উঠল। কুয়োব গভীর তলদেশে নির্জীব একটা কণ্ঠ যেন ভেসে উঠল ঃ বেশ আমি বাজি, মল্লিকাদি। টিকিটখানা দাও।

তারপর চলে এসেছে এই ছায়ালোক বাযোস্কোপে। মন্মথ বেবিয়ে গেছে। তাব অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত কবেনি।

আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক পাশে এসে বসল। গদি-আসনে সারা শরীর কেঁপে উঠল সাবিত্রীর, জড়োসড়ো হয়ে বসল। বিস্মিত শশাঙ্কই প্রথম কথা বলল, আপনি?

মল্লিকাদির শরীর খারাপ। আসতে পারলেন না। টিকিটটা নষ্ট হবে, তাই আমাকে --

অন্ধকার ঘরে পর্দার ওপরে ততক্ষণ ছবির নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। কী কথা বলছে ওরা, প্রেক্ষাগৃহে কখনো তুমুল হাসি, কখনো স্তব্ধতা। সেদিকে তো চোখ নেই সাবিত্রীব, সেদিকে কান নেই। গলা শুকনো, দেহ আড়ষ্ট, চোখে জ্বালা। এই বুঝি নিবালোকতাব সুযোগে এগিযে এলো একখানি রোমশ হাতেব ছোবল। এই বুঝি ওব কোমর জড়িয়ে ধবল একটি দুঃসাহসী লালসা। যতবার শশাঙ্ক নড়েচড়ে বসল, ততবাব ভযে অন্যদিকে সবে গেল সাবিত্রী, কতবাব যে পাশেব হাতলে অন্যমনস্ক হাত রাখল, কতবার যে তুলে নিল, হিসেব নেই। একবার খসখস কবে উঠল, মনে হ'ল শশাঙ্কব বাঁহাত কী যেন খুঁজছে এদিকে। প্রাণপণ প্রয়াসে শরীরটাকে শক্ত করল সাবিত্রী, মনটাকে প্রস্তুত করল, এমন সময ফশ্ কবে আলো জ্বলে উঠল। আড়চোখে চেয়ে সাবিত্রী দেখল শশাঙ্ক একটা সিগারেট ধবিযেছে। বাঁ ধারের পকেটে এতক্ষণ দেশলাইয়ের বাক্স খুঁজছিল।

বুকেব ভেতব থেকে রুমাল বাব কবে সাবিত্রী সন্তর্পণে কপালের ঘাম মুছল।

বিরতির আলো জ্বলতে উঠে গেল শশাঙ্ক, একটু পরে দু'টো আইসক্রীম নিযে ফিবে এল। একটা সাবিত্রীর হাতে দিয়ে বলল, কেমন লাগছে।

ঘাড় কাৎ করে সাবিত্রী অস্ফুটস্বরে কী বলল, নিজেই শুনতে পেল না।

বুঝতে পারছেন? প্রোগ্রাম কিনে দেবো একটা?

সাবিত্রী বলল, না।

কী অসুখ হয়েছে মল্লিকার।

থতমত খেয়ে সাবিত্রী বলল, বেশি কিছু না। এই — এই মাথাধরা আর কী।

আবার আলো নিবল। আবার সেই ছাইছাই ফিকে অন্ধকার, পর্দায় মুখব ছবির অবিবাম গতি, সেই দমবন্ধ ভয়, ঘামঘাম অস্বস্তি। কিছু বুঝলনা সাবিত্রী, বুঝতে চাইল না, পালা কবে হাতলে হাত রাখল, তুলে নিল, সরে বসল, সরে এলও, বারবার একটা অগ্রসর পুরুষ হাতের স্পর্শ কল্পনা করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধ্বক ধ্বক শব্দ শুনল।

শেষ বারের মত আলো জ্বলতে সব লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রচালিতের মত সাবিত্রী অনুসরণ করল শশাঙ্ককে, বাইরে আসতে পাঁচমিনিটের বেশি লাগল।

শশাঙ্ক বলল, কিছু খাবেন?

না-বলতে গিয়েও সাবিত্রী কিছু বলতে পারল না, ওর কথা বলার ক্ষমতাই লোপ পেয়েছে। পর্দা ঠেলে একটা ছোট কামরায় বসল দু'জনে। শশাঙ্ক বলল, কী আনতে বলব।

অস্বচ্ছন্দ শুকনো গলায় সাবিত্রী কোনমতে বলল, এক গ্লাস জল।

শুধু জল? তা কি হয়। শশাঙ্ক কিছু খাবারও ফরমাস করল।

যতক্ষণ সিনেমার মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সাবিত্রী লক্ষ্য করেছে, ভয় করেছে শশাঙ্কের হাত দু'খানাকে; এবারে খাবারের টেবিলের তলা দিয়ে ওর পা দু'খানার দিকে নজর পড়ল। মিহিগিলে কোঁচাটা শুঁড়ের মত লম্বা হয়ে একজোড়া চকচকে কালো নিউ-কাটের গন্ধ শুঁকছে। সেই মশ্‌মশ জুতো। সাবিত্রী কাঁপল, পা দু'খানার নিম্নতম প্রান্ত অবধি শাড়িতে ঢেকেও স্বস্তি হলনা, টেনে নিল চেয়ারের নিচে। তবু যেন চোখ বুঁজে অনুভব করল আবেক জোড়া পা নিঃশব্দে, গুটিগুটি এগিয়ে এসেছে; নতুন স্যাণ্ডালেব ফিতেয় পাযেব পাতার যেখানটা কেটে গিয়ে জ্বালা করছে, তার ওপর সাবিত্রী যেন বাববার কঠিন একজোড়া নিউ-কাটের চাপ অনুভব করল।

শশাঙ্ক বলল, আপনার বুঝি সিনেমা দেখাব বিশেষ অভ্যাস নেই?

এতক্ষণে সাবিত্রী সম্বিৎ ফিরে পেল। হঠাৎ মনে পড়ল, আসল কাজই বাকি রয়ে গেছে। যে জন্যে এত আয়োজন করে আসা, সেই কথাটাই বলা হয়নি শশাঙ্ককে।

বলল, না। আপনারা — আপনি তো খুব দেখেন, না।

আমি? আমাকে তো দেখতেই হয়। আমি সিনেমায় কাজ কবি জানেন না?

ফুবিযে যাচ্ছে সময়। চাযের পেয়ালায় শশাঙ্ক চুমুক দিচ্ছে আস্তে আস্তে। একটু পবেই বিল নিযে এসে দাঁড়াবে বয়। যা বলার আছে সাবিত্রীব, এই বেলা।

তবু কি সোজাসুজি বলতে পাবল। প্রথমে জিজ্ঞাসা কবল স্টুডিও সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক খবব। কেমন করে তোলা হয ছবি, কথা গাঁথা হয কি-কবে। তারপব শুনতে চাইল, কী-কী ছবি উঠছে এখন।

শশাঙ্ক বলল, একখানা মোটে। তাও কাজ এগোচ্ছে না। বাজার খারাপ। বাববাব মাব খেযে এ-ব্যবসা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে সবাই।

নিজে থেকে শশাঙ্ক প্রস্তাব করবে, সে আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতব হয়ে মিলিযে যাচ্ছে। বিল চুকিযে দিতে শশাঙ্ক পাঁচটাকাব একখানা নোট দিযেছে, খুচরো পযসা এখুনি ফেবৎ নিযে আসবে বয। আর সময় নেই।

মরীযা হয়ে সাবিত্রী বলল, মল্লিকাদি বলছিলেন, — আপনাদের ছবিতে নাকি — নাকি একটা পা-পার্ট খালি আছে। লোক খুঁজছেন আপনাবা।

স্মিতচোখ দু'টির ওপরে শশাঙ্কর ভ্রূজোড়া সন্নিহিত হয়ে এল ঃ মল্লিকা বলেছে আপনাকে? কবে?

কিছুদিন আগে। জলে নেমে আর শীত নেই সাবিত্রীর। মাথা নীচু কবে বলে যেতে লাগল, আমাদেব বড় অভাব শশাঙ্কবাবু। তাই ভাবছিলাম, আমি যদি .. আমাকে যদি —

সিগাবেট বার কবে দেশলাইয়ের বাক্সে সজোরে বাববার ঠুকল শশাঙ্ক। বলল, বড্ড দেবি হয়ে গেছে, সাবিত্রী দেবী। মল্লিকাকে যখন বলেছিলাম তখন স্বাভাবিকভাবে মাযেব পার্ট করতে পারে এমন একজনকে খুঁজছিলাম আমরা। তা কাজচালানো গোছের একজনকে দিয়েই সেরেছি। সে-বই তো তোলা হয়ে গেছে, এখন মুক্তিপ্রতীক্ষায় আছে।

সাবিত্রী বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু শেষ বাজি ধবার মত সুরে বলল, আপনাদের নতুন ছবিতে কোন পার্ট খালি নেই?

আছে। কিন্তু মায়ের পার্ট তো নেই। একটা হিরোয়িন খুঁজছি আমরা। কিন্তু, — সাবিত্রীর মাথা থেকে পা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক বলল, কিন্তু, ক্ষমা করবেন সাবিত্রী দেবী, সে পার্ট আপনাকে দিয়ে বোধ হয় হবে না।

শশাঙ্কব চোখে নিজের চেহাবাব ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেল সাবিত্রী। লজ্জার জোযারে সমস্ত বক্ত এসে জড়ো হল মুখে, পরমুহূর্তের ভাঁটায় আবাব সব শুকিয়ে কাগজ-সাদা হয়ে গেল। চুল উঠে যাওয়া প্রশস্ত কপাল, কালোরেখার পরিখার আড়ালে বসে-যাওয়া দু'টি নিষ্প্রভ চোখ, গালের উঁচু হাড়, প্রকট কণ্ঠাস্থি, শিরাবেরুনো লিকলিকে হাত, সমতল বুকেব কববে দু'টি বোঁটায় স্তনের এপিটাফ, এ-চেহারা হিরোয়িনেব সাজে না, এ-কথা শশাঙ্ক চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে খেয়াল হ'ল, এই আশ্চর্য।

শশাঙ্ক বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এবার কিছু করতে পাবলাম না। তবে আপনার কথা আমাব মনে থাকবে। পরের ছবিতে যদি সুবিধে হয়, খবর দেবো।

একটা গাড়িও কবে দিতে চেয়েছিল শশাঙ্ক, সাবিত্রী নেয়নি। দ্রুত পাযে ফিবে আসতে আসতে দোকানেব ঘড়িতে সময় দেখে ভয়ে বুক শুকিযে আছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, খুকি হযত উঠে খুব কান্নাকাটি কবছে। মন্মথ নিশ্চযই বাড়ি ফিবেছে অনেকক্ষণ, সাবিত্রীকে না দেখে মুখ ওর কালো হয়ে গেছে। আজ আব বক্ষা নেই। মনশ্চক্ষে সাবিত্রী দেখতে পেল, দাঁতে ঠোঁট চেপে মন্মথ ঘবময পাযচারি কবছে, দু'হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ। সাবিত্রীকে দেখে কী কববে মন্মথ? মুখেব ওপর দরজা বন্ধ কবে দেবে? বার কবে দেবে গলাধাক্কা দিয়ে? ওব হুকুম না নিযে বাড়িব বাহিবে পা বাড়ানোব অপবাধেব জন্যে চেঁচামেচি, কেলেঙ্কাবি কববে?

ঝোঁকের মাথায বাড়ি থেকে বেবিযেছিল যখন, তখন এ-সব সম্ভাবনাব কথা একবাবো মনে হয়নি। সর্বনাশ হতে হলে মেযেমানুষেব কত মতিচ্ছন্নই না হয।

দবজা খোলাই ছিল। খুকিকে বুকেব উপব শুইয়ে মন্মথ ছড়া শুনিযে ঘুম পাড়াচ্ছে। দেযালেব দিকে মুখ ফিবিয়ে সাবিত্রী কাপড় ছাড়ল, তখনো বুকেব মধ্যে ঢিপঢিপ কবছে।

সিনেমা ভাঙল?

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেবে সাবিত্রী চুপ কবে বইল।

মন্মথ হাসি মুখে বলল, আবে, জানি জানি। এসে দেখি তোমাব মল্লিকাদি খুকিকে লেবেঞ্চুস বিস্কুট দিয়ে ঠাণ্ডা কবছে। ওব কাছেই শুনলাম।

পবম প্রশান্ত মন্মথব মুখ, কী নিরুত্তাপ কণ্ঠ। পাযেব নখ দিয়ে মেঝে ঘষতে লাগল সাবিত্রী। এব চেযে মন্মথ সোজাসুজি ধমক দিল না কেন, এই নিষ্ঠুব বিদ্রূপেব চেযে আঙুল দিযে গলা টিপে ধবলেও ভাল ছিল।

মন্মথ বলল, ভাল, ভাল। জুজু-বুড়ি হয়ে না থেকে নিজেব পথ নিজে দেখছ, খুব ভালো। নীচু সুবে বলল, তা সুবিধে হল কিছু। শশাঙ্ক কিছু বলল?

কী বলবে?

এই ধবো কাজেব কথা। কতবকম জানাশোনা ওদের, তোমাকে একটা কাজ তো জুটিযে দিতে পারত? তা তুমিও কিছু বললে না?

না।

হঠাৎ সোজা হয়ে মন্মথ বিছানায় উঠে বসল। কঠিন গলায় বলল, তবে গিযেছিলে কেন। নিজের দরকারেব কথা ভাল করে না বললে লোকে বুঝবে কেন?

অত ইনিয়ে বিনিযে কথা বলাব আমার অভ্যাস নেই।

মন্মথর বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। — অভ্যাস নেই। নেকি! কচি খুকি! নাক টিপলে দুধ গলে, না? কিসে নিজের ভাল হয়, তাও বোঝ না?

শান্তস্বরে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, কিসে?

সে কথাব জবাব না দিয়ে মন্মথ বলল, শশাঙ্ক তোমাকে বাড়ীতেও পৌঁছে দিয়ে যেতে চাইল না?

চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি।

চে-য়ে-ছি-ল। বা-জি হ-ই-নি। সাবিত্রীব কথাটাবই প্রতিধ্বনি কবে মন্মথ মুখ ভেংচে উঠল, রাজি হওনি কেন?

হলেই কি মান থাকত তোমাব।

মান ধুযে জল খাও, পেট ভববে। তীব্রস্বরে মন্মথ বলল, কী ক্ষতি হত তোমার শশাঙ্ক যদি গাড়ি কবে পৌঁছে দিত?

পলক পড়ছে না, মণি দুটো জ্বলছে মন্মথব। সেই অগ্নিদৃষ্টিব সঙ্গে চোখ মেলাতে গিযে সাবিত্রী চমকে উঠল। এতক্ষণে বুঝতে পেবেছে মন্মথ ঠাট্টা কবছেনা, সত্যিই বুঝি সে চেযেছিল সাবিত্রী শশাঙ্কব সঙ্গে এক মোটবে আসুক।

একটু ছোঁযাছুঁযির ঘুষ দিযে কাজ হাঁসিল হোক।

মন্মথ বলে যেতে লাগল, ওবা আমুদে লোক, একটু ফুর্তি চায। খুশি হলে উপকাবও কবে। শুচিবাযুব বাড়াবাড়ি কবে সব মাটি কবলে?

ছুটে গিযে সাবিত্রী হাত চাপা দিল মন্মথব মুখে, তোমাব পায়ে পড়ি, চুপ করো। বলে আব অপেক্ষা করলনা, টলতে টলতে পাশেব ঘরে এসে মল্লিকাব বিছানায উপুড হযে পড়ল। মল্লিকা পাশে এসে বসল তাড়াতাড়ি, কি হযেছে সাবিত্রী, অমন কবছ কেন।

জবাব শোনা গেল না। উপস্থিত কান্না বোধেব প্রাণপণ প্রযাসে সাবিত্রীর কণ্ঠ বিকৃত হযে গেল। ওব পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মল্লিকা বলল, কী হয়েছে ভাই, আমাকে খুলে বল। সিনেমায না জানিযে গিয়েছিলে বলে খুব বেশি বকেছেন মন্মথবাবু?

মাথা নেড়ে সাবিত্রী জানাল, না।

তবে? কানেব কাছে মুখ নামিযে মল্লিকা ফিসফিস কবে জিজ্ঞাসা কবল, তবে বুঝি সিনেমাব হলে শশাঙ্ক বেশি বাড়াবাড়ি কিছু কবেছে?

বালিশে মুখ ডুবিযে সাবিত্রী তেমনি মাথা নাড়ল, তাও না।

তবে?

এ তবেবও জবাব পেলনা। ফুঁপিযে ফুঁপিযে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী। কী কবে বোঝাবে কোথায কাঁটা। এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কব কাছে অন্তত ওব শবীরটাব মূল্য আছে, আব মন্মথব কাছে ভেতবেব মানুষটাব, মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনদিন বলা যাবে না, কত বড় দু'টো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।

প্রতিপক্ষ

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ

ভোর ভোর ঘুম ভাঙ্গল পরান মুচির। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বন্ধ ঝাঁপেব ফাঁকে সরু একচিলতে ধোঁযাটে আলোর রেখা। কাক-শালিখরা একে-দুয়ে মিলে এ-গাছে ও-গাছে 'পাখিসব-করে-বব' সাধতে শুরু করেছে। পরান আজকাল এত সকালে মাচা থেকে নামে না। চৈতমাসের দ্বিতীয় পক্ষ এখন। এখনও দিন-রাতেব সন্ধির সময়টায় একটু গা-শিব্‌শিব্ হাওয়া দেয়। আবহাওয়ার এইটুকু হেরফেরেই হাঁপানিব টান ওঠে। দুবছব ভুগে ভুগে এখন টান ওঠার ধরা-বাঁধা সময় কিছু নেই। তবু ভোরবেলার টানটা নিত্যকার ব্যাপাব। বিশেষ করে ঋতু বদলের কালে। একটা অদৃশ্য হাত গলার নলিটা চেপে ধবে। শ্বাসনলিটা সংকুচিত হয়ে যায়। আর তখন প্রাণপক্ষিটা একটু হাওয়াব জন্য বুকের খাঁচাব মধ্যে পাখা ঝাপ্টাতে থাকে। পবান তখন পক্ষিটাকে খাঁচায় শান্ত বাখাব জন্য হাঁ-করে শ্বাস টানতে টানতে প্রাণপণে হাঁপায়। তার বিশ্বাস একটা অপদেবতা গলায চেপে ধবে প্রাণপক্ষিটাকে বেব কবে নেবাব চেষ্টায় বার বার আক্রমণ করে। একগোছা মন্ত্রপূত তাবিজ-কবচ ধাবণ কবেও রাক্ষসটাব আক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। পরান রাক্ষসটাব নাম দিয়েছে নলিবাক্ষস। বাক্ষসটা তাকে পঁয়তিরিশেই যেটেব বুড়ো কবে মজুবখাটাব শক্তিও শেষ কবে দিয়েছে।

মেঝেতে চাটাই বিছিযে শোয় বৌ সৌরভী ছয ও চাব বছবের ছেলেমেযেকে নিযে। ফবসা হতেই সৌবভী উঠে মোটা তাঁতের শাড়িটা টেনেটুনে গাযে জড়িযে ঝাঁপ খুলে বাইবে গেলে পবান নিশ্চিন্তে পাশ ফিরল। সৌবভী এখন মাঠ ফিবে যাবে রানাবাড়ি। ঐ বাড়িব 'বাব' কাজের ঝি সৌবভী। প্রথমেই মস্ত উঠোন ঝাঁট দেবে। ততক্ষণে বাড়িব মেযেছেলেবা কেউ উঠে উঠোনের কোণে মস্ত একপাঁজা কাঁসা-পেতলেব বাসন, ডেগ-কড়া এঁটোকাঁটা সমেত জড় কবে বাখবে। সৌরভী সেগুলো নিযে বাড়িব সামনে পুকুবঘাটে গিয়ে ঘণ্টাখানেক সময় নিযে ঘসে ঘসে মাজবে। ঝক্‌ঝকে করে মেজে এনে বান্নাঘরেব বাইবে বাখবে। তখন মেয়েরা কেউ ধোযা বাসনের উপব এককলসি জল ঢেলে দিযে অছুৎ-দোষ কাটিযে ঘরে তুলবে। তারপর সৌরভী পাবে আধকেজির মত মুড়ি। মুড়ি আঁচলে নিয়ে বাড়ি এসে ভাগ কবে খেতে দেবে পরান ও ছেলে-মেয়েকে। নিজে শিকা থেকে হাঁড়ি নামিযে খাবে পান্তা। পান্তা খেয়ে আবাব গিয়ে ভাবী কাজ, ধান সিদ্ধ করে শুকুতে দেওযা, ভানার কাজ বা কাপড়-চোপড়-মশাবি কাচাকাচি প্রভৃতি নানা কাজে দুপুর গড়ায়। তখন গামলায় কবে নিয়ে আসে ভাত, বাটিতে ডাল আর ঘ্যাঁট। তা কম না। প্রায় তিনপো কেজি চালের ভাত। ভাগ করে খেতে আধপেটা ক্ষুধা মেটে। বাকি আধখানা পেট ভরতে পঞ্চায়েতের 'ডোলেব' চাল ভরসা। পশুপতি রানার কাছ থেকে চিট্‌ লিখিয়ে নিয়ে যেতে হয়। পরান হাঁপানিতে ভুগে ভুগে স্থায়ী ভিক্ষাজীবী তালিকাভুক্ত হয়েছে। ডোলের চাল সব সপ্তাহে না পেলে হাঁড়ি চাপে না। তখন পশুপতির দয়া ভরসা।

পশুপতি গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান। পেশায় পুরোনো এল. এম. এফ্ ডাক্তার। একসময়ে ভাল পশার ছিল। এখন পাশের গ্রামে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে অবধি রোগী তেমন জোটে না। অবশ্য তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি তেমন কিছু হয়নি। পেশাটা উপরি, চাষবাসই প্রধান। তাছাড়া পেশাটা গ্রাম্য মানুষের কাছে মানও আদায় করে। নইলে চল্লিশ বিঘা এ রাজ্যের সবচেয়ে সরেস দোয়াশলা জমি এখন ভাড়া-করা ট্রাক্টরে গভীর চাষ দিয়ে শ্যালোতে সেচ দিয়ে, পটাসিয়াম-নাইট্রোজেন সার আর পোকামারা ওষুধের কারিকুরিতে সারা বছর অপর্যাপ্ত ফসল দেয়। ইউরিয়া-ফসফেটের চাপানে আলু-কপি-শালগম আর আমন-বোরো-গমের পাহাড় দিচ্ছে। পশুপতির বড়ছেলে সেই 'স্পেশাল কেডার' আমলের প্রাথমিক শিক্ষকের পাকা চাকরি ছেড়ে, আর ছোটছেলে ক্লাশ টেন-এর পড়া ইস্তাফা দিয়ে মুনিষ-চাকর খাটিয়ে চাষ সামলায়। তাতেই পশুপতি ফসল উৎপাদনে 'আদর্শ চাষী' অভিজ্ঞান ও রৌপ্য পদক লাভ করেছে।

পশুপতি ইউনিয়ন বোর্ডের আমলে একদফা প্রেসিডেন্ট্ ছিল। দাপটে রাজ্যপাট চালিয়েছে। জমানা পাল্টে যেতে বেশ কিছুকাল মাথা নিচু করে নয়া জমানার হালচাল দেখে নিয়ে সময় বুঝে ভোল পাল্টে ডিগবাজি খেয়ে আবার মাথা তুলেছে। কথায় আছে, জহুরিবাই শুধু খাঁটি জহ্ব চেনে। তখন দারিদ্র্যদূরীকবণে কেন্দ্র-রাজ্য মিলে উঠেপড়ে লেগেছে। গ্রামাঞ্চলেও নানা পরিকল্পনায় থোক টাকা মঞ্জুর হচ্ছে। তাই পঞ্চায়েতগুলো অতিমাত্রায় সক্রিয় হযে উঠেছে। পুরোনো অভিজ্ঞ (আড়ালে লোকে বলে পুরোনো পাপী) পশুপতিকে দূরে রাখা চলে না। ঝটিতি উপপ্রধান করে নিয়েছে তাকে।

পরান মুচি যদি কোনে গ্রুপ থিযেটাবেব গেঁয়ো-গবিব নায়ক হতো তবে পশুপতিকে সাজানো যেত খলনাযক। যদিও সিনেমাব মত ফাইট্ দিবার অনুকূল পরিস্থিতি নেই। যদি বা থাকে তা কিছুটা আছে পবানেব বোগক্লিষ্ট শবীর থেকে মনে ও পশুপতিব চরিত্রেব লাম্পট্যের ঝোঁকেব মধ্যে।

পশুপতিব বযস ষাটেব দিকে অনেকটা এগিয়েছে। লম্বা না হলেও নাতিহ্রস্ব। তবে দীঘে-পাশে খুব মোটা না হলেও ঘাড়ে-গর্দানে পালোযানসুলভ। মস্ত গোল মাথাটা প্রায ন্যাড়া। চওড়া চোযাল ও নাকেব পাটা, আব পুরু একজোড়া ঠোঁট চরিত্রের একদিকের ইঙ্গিত দেয়। ভাঁটাব মত দুটো গোল চোখ একটু লালচে আর মস্ত ভুঁড়ি দেখে তাকে দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক মনে হলেও আসলে কিছুটা মতলববাজ আব তান্ত্রিকসুলভ পঞ্চ ম-কারে আসক্তিও একটু বেশি। বিশেষ কবে প্রথম দুটি ম-কাবে। তবে চরিত্রে দযামাযাও আছে। দয়াদাক্ষিণ্য ও লাম্পট্য বলা যায় সমান সমান। কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে পশুপতি বাড়ি ছেড়ে পুকুরের অপব পাড়ে সদর রাস্তার কাছে তার ডাক্তারখানায় থাকছে। তা নিয়ে কিছু কিছু কানাঘুষো চলছে ইযারবন্ধুদের মধ্যে। আব ঝি-চাকররা সবাই ছোটলোক বা অচ্ছুৎ। তারা কিছু জানলেও মুখ খোলে না।

মুচিপাড়ার মানুষগুলো পশুপতির খাতক। তার জমিতে মুনিষ-খাটা থেকে পঞ্চায়েতের ডোল পাওয়া সবই তার অনুগ্রহ-নির্ভর। ভয়ে-ভক্তিতে আর নিজেদের তৃণজ্ঞানে তাকেই পঞ্চায়েতের ভোটে জেতায়। নিজেদের মুখপাত্র করে। পশোডাক্তারের বিরোধী পক্ষ তাকে মুচিদের 'ভক্ষক' বললেও ওরা নিজেরা বলে, চবিত্তির না থাক, তাঁর খেয়েই বাঁচি যখন তখন তিনিই আমাদিগের 'রক্ষক'। কার্যত সমস্ত মুচিপাড়াটাই পেটের ভাতেব জন্য বাঁধা পড়ে গেছে পশুপতির কাছে। এটুকু খলনায়কের পশ্চাৎপট।

পরান এই আর্থিক শৃংখলের বাইরে ছিল না আগে। যখন পশুপতির রাখাল (স্থানীয় ভাষায় 'বাগাল') ছিল, এবং পরে বড় হয়ে যখন তার জমিতে মুনিষ খেটেছে তখন মাথা

সোজা করে পশুপতির দিকে তাকাতে পারত। সেই মাথা এখন পশুপতির পায়ের তলায় রাখতে হয়। মন না চাইলেও পশুপতির দয়া পেতে তার মন যোগাতেই সৌরভীকে দিতে হয়েছে বারকাজের জন্য। নইলে বড় গৃহস্থবাড়ির কাজ বাগদি মেয়েরাই পায়। রোগে যত কাহিল হচ্ছে পবান, পশুপতির উপর রাগ-দ্বেষ তত বাড়ছে মনে সৌরভীর কারণেই। বৌ কি শেষে বেদখল হবে? পশোডাক্তার বলে দিয়েছে, খবরদার, বৌয়ের সঙ্গে শুবি না। উত্তেজনা হলেই মরবি।

পবান শুনে মনে মনে চটলেও নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে পৃথক না শুলে সহজেই শরীর উত্তেজিত হয়, আর তাতে বুক ধড়ফড় করে। তা থেকে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। যতই পঙ্গু হচ্ছে দিন দিন ততই ঈর্ষা আর সন্দেহ বাতিক বাড়ছে। উপার্জনের মুরোদ না থাকায় আর বৌয়ের ভাতে ভাগ বসিয়ে মুখ খোলার সাহসও আর নাই। তাই একা ঘরে বসে সারা বিশ্বসংসারের উপর ঝাল ঝাড়ে গাল দিয়ে। গাল পাড়ে নিজের মরা বাপকে এবং নিজেকেও। বাপের উদ্দেশ্যে বলে, শালা ছিদেম পয়সাও রেখে যাওনি, শুধু দিয়ে গেছ তোমার হাঁপানি। নিজেকে বলে, মর্ শালা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়, ল্যাঠা চুকে যাক্। আর কদ্দিন নলিরাক্ষসটার সঙ্গে যুদ্ধ করে মাগের ভাত খাবি? পশুপতির উদ্দেশ্যে বলে, শালা মা মেগো, নিজের পুতের বৌকে নেশার মৌজে জড়িয়ে ধরেছিলি। তাই না তোর ধুমসি বৌ ঝ্যাটা তুলে তোকে ডাক্তারখানা সই করে দিয়েছে। ঘরের কিত্তি চাপলেই চাপা থাকে না। শালা মুচিপাড়ার বৌ-ঝিদের তুমি রাত করে ডাক্তারখানায় গিয়ে চাল নিতে বল। এ-বেলা অচ্ছুৎ মানো না। তা নিয়ে না শাওনমাসে মনসাপুজোর আগে সঙ-এর গান বেঁধেছে শাখারীদের শীতল ওগো পাড়ার দলের লেগে—কালোর ঘরে ধলো ছেলে কেমন করে হয় গো/ অন্ধকারে অচ্ছুৎপাড়ায় লুকিয়ে কে যায় গো। মাঝে মাঝে অচ্ছুৎপাড়ায় কালো কালো মানুষগুলোর ঘরে ফর্সা ফুটফুটে বাচ্চার জন্ম হয়। সৌরভী তেমনি ফর্সা রং নিয়েই বৌ হয়ে এসেছিল। এখন দুটি সন্তানের মা, তবু ঐ রঙের জৌলুসই ভদ্রপাড়ার অনেকের চোখ টানে।

ভোরবেলা শুয়ে শুয়ে পবান নলিরাক্ষসটার দিনের প্রথম দফা আক্রমণের প্রতীক্ষা করছিল। একবার হাঁপ উঠে মিনিট পনেরো জোর লড়াই করে রাক্ষসটাকে তাড়িয়ে দিয়ে কয়েক ঘণ্টা একটু স্বস্তি মেলে। সে-ফাঁকে গরুর চামড়া ছাড়ানোর ছুরিটাকে বালিতে শান দিয়ে ধার করে রাখবে। আগের রাতে দানোদের একটা গাইয়ের বিয়োতে গিয়ে বাছুরের একটা ঠ্যাং আগে বেরিয়ে আসাতে আর খালাস হয়নি। সে অবস্থায় পড়ে গিয়ে ঘণ্টা তিনেক চার পা ছুড়ে দাপিয়ে মরে গেছে। মরলে হিন্দু গ্রামের লোক আস্ত ভাগাড়ে ফেলে। ভাগাড়ে চামড়া ছাড়িয়ে নিবার হক্ একমাত্র পবান আর তার খুড়তুতো ভাই নারানের। ঠাকুরদার আমল থেকে জমিদারের হুকুমনামার অধিকারে। চামড়াটার দামের অর্ধেক ভাগ পেলেও দুবেলা কিছুদিন বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে পেটপুরে ভাত খেতে পারবে। পবান ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঝাঁপের সরু ফাঁকে উঠোনে একটু যেন কাঁচা রোদের ছিটেফোঁটা গাছগাছালির ফাঁকে ঢুকে পড়েছে। ছেলে-মেয়ে তখনও জাগেনি। জাগলেই তো খাওয়ার জন্য ঘ্যান্ ঘ্যান্ শুরু করবে। সৌরভী মুড়ি নিয়ে না আসা পর্যন্ত ঘুমুক না। .. এসব ভাবতে ভাবতে পবান উঠে পড়ল। মাচার অনেকটা উপরে একটা ছোট তাকে একটুকরো অয়েলক্লথে মুড়ে রাখা থাকে একফুট লম্বা ও দুইঞ্চি চওড়া ফলার মস্ত ছুরিটা। অবশ্য প্রতিবার চামড়া ছাড়িয়ে একটু টাট্‌কা গরুর চর্বি মাখিয়ে রাখে। তবে ভাগাড়ে মরা গরু পড়ে নমাসে-ছমাসে একটা, ততদিনে চর্বিটুকু পিঁপড়েয় শেষ করে।

ছুরিটা পাড়তে উঠেই পবান টের পেল নলিচাপা রাক্ষসটা গলায় থাবা বাড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে বালিশে দুহাতের কনুই ও দুথাবার মধ্যে মাথা রেখে

আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হল। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল আক্রমণ ও প্রতিরোধ চেষ্টা। সে কি টান! প্রাণপক্ষিটা ছট্‌ফটিয়ে একেকবার প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম করে। মিনিট কুড়ি লড়াই করে তবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়। তারপরও কিছুক্ষণ জোরে জোরে শ্বাস টেনে গামছা দিয়ে মুখ-চোখ মুছল। যাক, ভোরবেলার পর্ব শেষ হল।

ছুরিটা পেড়ে নিয়ে দাওয়ায় নেমে পরান শানকাঠে মিহি বালি দিয়ে ভালরকম শান দিয়ে চক্‌চকে করে ফেলল। ডগাটা সরু ছুঁচোলো। ভোঁতা ডগায় চামড়া ছাড়ানো যায় না। ছুরিটার ধার আঙুলে পরীক্ষা করতে করতে পরান নলিরাক্ষসের উদ্দেশ্যে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে স্বগতোক্তি করল, শালা এখন তোকে পেলে এই ছুরির ডগা দিয়ে তোর নলি ফুটো করে মেরে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ডুগডুগি বানাতাম। —অবশ্য পরান জানে তা সম্ভব না। কারণ রাক্ষসটা থাকে অদৃশ্য। অনেকটা গল্পের নিয়তির মত। নিয়তি অদৃশ্য থেকে কখনও বাঘ হয়ে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে খায়, কখনও কুমির হয়ে জলে টেনে নেয়, কখনও শরীরে ঢুকে হার্টফেল করায় কিংবা ধীরে ধীরে রক্ত শুষে মারে (পরান বাস-ট্রেন-বিমান-নিয়তির কথা শোনেনি)। কখনও তার মনে হয় রাক্ষসটা একটা অতিকায় মাকড়সা। দেশ জুড়ে এমন একটা মায়াজাল তৈরি করে ঝুলিয়ে রেখেছে যে জালে শুধু পরানের মত হা-ভাত যো-ভাতরাই আটকে যায়। —এসব জটিল তত্ত্বকথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কাজের মতলব মাথায় এল। গরুটার চামড়া ছাড়াবার সময় ভাগাড়ে বসেই যদি নলিরাক্ষসটা আক্রমণ করে তবে মহা বেকায়দায় পড়তে হবে। এ-বেলাই পশোডাক্তারের কাছে কেঁদেককিয়ে একটা হাঁপের ইঞ্জেক্‌শন্ নিতে পারলে সারা দিনের মত নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আগেও অনেকবার বেশি ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট হলে পশোডাক্তার ইঞ্জেক্‌শন্ দিয়ে সাময়িক আরাম দিয়েছে। কারণ যাই হোক পরানের উপর একটু নেক্‌নজর আছে ডাক্তারের। তার কারণ না বোঝার মত মূর্খ না পরান। তবে তার সুযোগটুকু নিতে বাধ্য হয় বুঝেও। যা হোক এখন গরুটার চামড়া ছাড়িয়ে আনার গরজ পরানের। চামড়ার দাম অর্ধেক পেলেও অনেকদিন তার নিজের হাতে কিছু উপার্জন হবে। সেটা কাজের মানুষ অকেজো হয়ে এখন বোঝে কি আনন্দের বিষয়। নারান তো মুনিষ খেটে সংসার চালায়। এ-কাজে একেবারেই আনাড়ি। ঠিকমত ছুরি চালাতে শিখতে এখনও ঢের দিন লাগল। পরানই ছুরির কাজ করে। নারান শুধু চামড়া টেনে ছাড়াতে হাত লাগায়। আগের দিন রাতেই পরান তাকে বলে রেখেছিল গরু মরলে ভাগাড়ে ফেলে কিনা দেখতে।

সৌরভী মুড়ি নিয়ে এলে মুড়ি খেয়ে পরান গিয়ে হাজির হল পশোডাক্তারের ডাক্তারখানায়। মনে মনে যতই গাল দিক পশুপতির সামনে পরান কেঁচো। পশুপতি একাই ছিল। পরান মেঝেতে বসে হাতজোড় করে নিবেদন করল, এ যাত্রা আর বাঁচবনি। বড্ড কষ্ট দিচ্ছে এজ্ঞে হাঁপানিটা। উঠতে বসতে টান উঠছে। দয়াধম্ম করে যদি একটা ইঞ্জিসান ফুঁড়ে দ্যান তো এট্টু আরাম পাই।

পশুপতি তখন সবে কেজিখানেক মুড়ি দু লিটার সদ্য দোয়া কাঁচা দুধে একখাবলা গুড়সহ মেখে খেয়ে প্রাতঃভোজন সেরে খাটে আধশোয়া হয়ে গড়গড়ার নলে মুখ দিয়েছে। এক দমক তামাক টেনে বলল, তুই হতভাগা দেখছি আমাকে ফতুর করবি। ইঞ্জেকশনের দাম অনেক বেড়ে গেছে। একটা পাঁচটাকা। তোর এদ্দিনে ষাট-সত্তুর টাকা ভজেছে। গায়ে খেটে শুধতেও তো পারবি না। তবে শুধবি কি করে?

পরান বাইরে মুখটা মরো-মরো করে রাখল। মনে মনে বলে চলল, শুধতে পারব না জেনেও তো দিচ্ছ। আমাকে বাঁচিয়ে রাখার গরজ তোমারও। আমি মরার পর বৌয়ের যদি পেটে বাচ্চা আসে, সবাই আঙুল তুলে দেখাবে তোমাকে। সঙের গান বাঁধবে তোমাকে

নিয়ে। বামুনপাড়ার ফিচ্‌লে ভৈরবঠাকুর বলে, অন্ধকার হল গঙ্গাজল। অন্ধকারে কে বা মুচি আর কে বা বামুন। শুধু আলো জ্বেলে মুখটি দেখা চলবেনিকো। মুচিরা হল অচ্ছুদের মধ্যেও সবচেয়ে নিচের থাকে। অন্য সব অচ্ছুৎ জাতের গোমাংস খেলে জাত যাবে। কিন্তু মুচি গরুর চামড়া ছাড়িয়ে যদি সেই গরুর মাংস এনে খায় তবে জাত যাবে না। তবে নিজেরা গোহত্যা করবে না। এই হল শাস্ত্রের নির্দেশ। সেই মুচির ঘরেই কিনা উঁচু জাতের—। ফিচ্‌লে বামুন ভৈরব নিজেই ইঙ্গিত দেয়।

পরান তিতো খাওয়া মুখ করে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, এ হপ্তায় ডোল নিয়েও বাহানা করছে। পাই কি পাই না—এবারে মনে লয় না খেয়ে মরতে হবে।

পশুপতি তামাক টানা শেষ করে নল পেঁচিযে রেখে বালিশে কনুই রেখে কাত হল। সঙ্গে বিরাট ঢাকেব মত ভুঁড়িটিও কাত। খালি গায়ে শুধু একটা সস্তা গেরুয়া বাদামি লুঙ্গি। পরানকে ভাটা চোখে একটুকাল নিরীক্ষণ কবল। পরান যেন বিড়ালের থাবায় ধরা পড়া নেংটি ইঁদুর। বলল, তোদের পাড়ায় কজনের ঘবে হাঁড়ি চাপে উনুনে ডোলেব চাল না পেলে? তোদের দারিদ্রাসীমার উপরে তোলা শিবেবও অসাধ্যি। জাত-পেশা তো সবাই ছেড়েছিস্। শিল্প-ঋণ দিলেও ভেঙ্গে খেয়ে ফেলবি। এখন যা, পরে দেখব ডোলেব ব্যাপ—
তোর বৌ ডাক্তারখানায় ঝাঁট্-ন্যাতা দেয় না কেন বে? আমি কি আলাদা গৃহস্থ? আজ সন্ধ্যেবেলা এ-ঘরে মিটিং বসবে পঞ্চাযেৎ কমিটির। বৌমাকে বলবি গিয়ে এখনই দুপুরেব মধ্যে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে। তখন আমাব স্টকের বস্তা ঝাড়া চাল যা আছে দিয়ে দেব'খন।

পবান দানাদের মবা গরুটাব কথা একদম চেপে যাবে ভেবেছিল, চাল দিনে-দুপুরেই এরকম অযাচিত পাবে শুনে খুশি চেপে রাখতে পাবল না। বলল, কাল বেতে দানাবাড়িব একটা গাই বিয়েতে গিয়ে বাঁধকে মরেছে। আজ ঠিক ভাগাড়ে ফেলবে। চামডাটা পেলে কিছু রোজগার হয়। একটা ইঞ্জিসান ফুঁড়ে দ্যান যদি তবেই ভবসা কবি ছুবি ধবতে।

পশুপতি পরানকে চোখ ছোটো কবে দেখে। পবান বোঝে ডাক্তাব মনে মনে কি একটা মতলব ভাঁজছে। একজোড়া ভীমেব মত তার উরুত একটাব উপর আবেকটা একটু একটু খেলছে। পরান মনে মনে বলল, তোমার জোড়া মুগুরের ক্যাচাকলে পেষাই কবার লেগেই তো মুচিপাড়াব বৌ-ঝিগুলারে রাঁত করে তোমার ডাক্তাবখানায ইস্‌পিশাল ডোলেব চাল নিতে আসতে বল। অন্ধকারে লুকিয়ে না নিলে অন্যবাও দেখে চাইবে। সবাইকে এককথাই বললে কি আব গোপন থাকে? সবাই জানে ঘরে ভাত নাই তো বৌ-ঝি যাকে হোক পাঠাও একটু রাত কবে। রাত নটা-দশটাই এখানে অনেক। তা জেনেও জানে না, বুঝেও বোঝে না ভাব দেখায়। অন্ধকাব নাকি গঙ্গাজল।

পশুপতি ভেবেচিন্তে বলল, দানারা গরুটাকেভাগাড়ে ফেলবে ঠিক জানিস্? যদি পাইকেবকে চামড়ার দাম ধরে বেচে দেয়? একটা পুরো বয়সের গরুব চামড়ার দাম এখন সাত-আটশব কম হবে না। পাইকেরকে বেচে দিলে গরুর লাশ গরুর গাড়িতে তুলেই নিযে যাবে।

এমন সম্ভাবনাব কথা শুনে পরান কিছুক্ষণের জন্য থ হয়ে থাকল। তারপর বলল, সে কি কতা ডাক্তারবাবু? মরা গরু ভাগাড়ে ফেলবে, আমরা চামড়া ছাড়িয়ে নিবো— এই তো নিযম। এখন জমিদার না থাক পঞ্চাৎ তো আছে? আপুনি পঞ্চাতে থাকতে ইটা কি কবে হয়? তা বাদে বাগানে শেয়াল আর গাছে শকুনগুলা আশা করে থাকে। তাদিগেরকে মরাগরুর মাস খেতে না দিলে তো গিরস্তের অকৈল্যেন, গ্রামেরও অমুঙ্গল। ইসব শাস্তরের কতা।

পশুপতি মোটা গর্দানের উপর হাঁড়ি-মাথা নেড়ে ভাঁটা চোখ এতক্ষণে গোল কবে বলল, থাম। শাস্তর শোনাতে হবে না তোকে আর। ওসব জমিদারির সঙ্গেই বরবাদ হয়ে

গেছে। আসল কথা তোরা হলি আমার ভোটার। প্রকাশ দানা আমার কাছে ভোটে হেরে গেল না এবার পঞ্চায়েতের নির্বাচনে ? তাইতে মরা গরু পাইকেরকে দিয়ে তোদের মুরুব্বি বলে আমাকেও জব্দ করবে ভাবছে হয়ত। 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখায়' বলে না, সেরকম আর কি। প্রকাশ দানা হলো মহাঘড়েল। আচ্ছা আমি চকৌদারকে বলে দেব, এখনই আসবে। গাঁয়ের মধ্য দিয়ে মরা গরু নিতে দেব না।

অতঃপর পশুপতি পরানকে একটা এড্রোনালিন ইঞ্জেক্শন ফুঁড়ে দিয়ে বলল, যদি চামড়াটা আদায় হয়, অর্ধেকদাম থেকে আমার ইঞ্জেক্শনের দাম শুধবি। বিনিপয়সার ওষুধে রোগ সারে না। বৌমাকে গিয়ে পাঠিয়ে দে আমাদের বাড়ি থেকে। এই ঘরে ন্যাতা দিয়ে যেতে বলবি।

পরান জিভে জোন্দা স্বাদ নিয়ে বেরিয়ে এল। যেতে যেতে তার স্বভাব ফিরে পেল। পশুপতিকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে সওয়াল শুরু করল ঃ তুমি শালা কদিন আগে তোমার পুতের বৌকে বৌমা-বৌমা করে নেশার ঝোঁকে আদর করে একেবারে জাপটে ধরেছিলে। শালা এসব খবর হল কয়লার আগুন, কাপড়ে চাপা থাকে না। এখন মুচিবৌয়ের দিকে নোলা বাড়াচ্ছ। আমার বৌয়ের রংটা ফর্সা, তাইতে চোখ পড়েছে। ইদিকে বল বৌমা। ইঞ্জিসনের টাকা আমিও দোব তুমিও নেবা। ...

বাড়ি ফিরে পরান দেখল এর মধ্যেই নারান মুনিষের কাজ ছেড়ে ফিরে এসে ওদের দাওয়ায় বসে পান্তা খাচ্ছে। সে দেখে এসেছে দানারা মরা গরুটাকে ভাগাড়ে ফেলেছে। তাই কাজ ছেড়ে চলে এসেছে।

পরান তাড়াতাড়ি ছুরি আর একটা ধামা নিয়ে ছুটল ভাগাড়ের দিকে। নারানকে বলে গেল জলদি যেতে। ডাক্তার ভয় ধরিয়ে দিয়েছে মনে। গরুটার আস্ত দখল না পেলে স্বস্তি নাই। ভাগাড় গ্রামের বাইরে মস্ত একটা বাগানের শেষ প্রান্তে। বাগান জমিদারের ছিল, এখন খাসের। গাছ আগেই অনেক কেটে নিয়েছে। এখন জংগল আর শেয়ালদের অভয়ারণ্য।

পবান গিয়ে দেখল গোটা দশেক শেয়াল গরুটাকে ঘিরে বসে পাহারা দিচ্ছে। ওরা জানে পরান গিয়ে চামড়া ছাড়িযে নিলে তবে ওদের ভোজ। মুচিপাড়ার মানুষগুলোর মতই কখনও বা টানা উপোস দেয় ওরা। তাতে গৃহস্থর হাঁস-মুরগী দু-চারটা চুরি করে খায়। পরান তাতে দোষ দেখে না ওদের। ওরা স্বাধীন, কুকুরের মত প্রভুর পায়ে দাসখত দেয় না। প্রভুর পাতেব প্রসাদ খায় না, আর বেত খেযে কাঁদে না। অন্যের হুকুমের গোলাম না শেয়ালরা। 'তু' কবলে কাছে যায় না, 'ছুঁ' করলে তেড়ে আসে না। ... এসব প্রশস্তির কথা ভাবতে ভাবতে ছুরিটা ছোরার মত তামেচা-বেহরা করে এগোয় পরান। শত হলেও নখীদন্তী ওরা। মুখে বলে, সরে যাও বাবাসকল, দশ হাত দূরে সরে বস। আগে আমার কাজ সারতে দাও।

পরান মুখে অনর্গল কথা বলে শেয়ালগুলোকে ভয়ে রাখে আর নিজের ভয় তাড়ায়। ওরা কিন্তু বাধ্য ছাত্রের মতই হাত দশেক সরে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। কোনো কোনোটা হাই তুলে হাঁ করে দুপাটি চক্চকে দাঁত দেখিয়ে যেন অধৈর্য ভাব প্রকাশ করছে। পরান একা কাজ শুরু করতে সাহস পায় না। ওরাও খুবই ক্ষুধার্ত, যদি ছুরি চালাবার সময় মাংসের গন্ধ পেয়ে খেপে গিয়ে সবগুলো একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ? পরান আড়চোখে গরুটার চামড়ার সাইজ জরিপ করে, আর হাত তুলে শেয়ালদের উদ্দেশ্যে মুখ চালিয়ে যায়।

গরুটার সাইজ বেশ বড়। বাছুরের ঠ্যাংটা একইভাবে বেরিয়ে আছে। পাছাটা ফুলে ঢোল। আর যথার্থ অর্থেই ল্যাজে-গোবরে লেপটে আছে। পরাণ প্রথম গলার নলিতে ছুরি বসাবে। নারান মাথাটা একটু তুলে ধরবে আর পরান ছুরিটা চোয়ালের ঠিক নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে যতটা সম্ভব উপরে তুলে চামড়া বাঁচিয়ে চালাবে। তারপর চার পায়ের চামড়া খুরের উপর পর্যন্ত চিরে দেবে। শেষে পেট বরাবর গলা থেকে পাছার দিকে ছুরি টেনে নামাবে।

... এসব অভ্যস্ত কারিগরি ভাবনার সঙ্গে মুখও চালায় সমানভাবে। বলে, একটু ধৈরজ রাখ বাবাসকল। নাবানে এল বলে। কাজটা মনে কর খুব সহজ নয়কো। চামড়া খসানো জানবা খুব সোজা না, ছোরম আছে এ-কাজে। বাছুরে চোখ দেবা না। ওটার চামড়ায় একডজন ডুগডুগি হবে। রথের মেলায় একটা পাঁচটাকা করে বেচব। বেশি দাম? হুঁঃ টাকার কি আর সেকাল রেখেছে কর্তাবা? টাকায় আটসের চাল ছিল এক সময়, এখন একসের আট টাকা। তোরা ভাত না খেয়ে ভাল আছিস বাবাসকল। যাক সেকথা, এখন শোন, বাছুরের বিজলি কাট মাস নুন মেখে রোদে দিয়ে শুকিয়ে হাঁড়িতে রাখব। বর্ষাকালে চাল জুট্‌লে ঝোল, না জুটলে শুধু পুড়িয়ে খাব। তা বাদে গরুটার দাবনার মাস দুভাই দুকেজি নোবো। বাকিটা তোমাদিগের। তবে শকুনরাও কিন্তু নাড়িভুঁড়ির হকদার, ওদিগে বঞ্চিৎ করবা না।

তখন নারান এল ওর ধামা ও একটা লাঠি নিয়ে। পরান ওকে বলল, লাঠিটা একপাক ঘুরোয়ে দে। শেয়ালগুলো এত কাছে থাকা ভালো না। যাও বাবাসকল, আরো বিশহাত পিছোও। রান্না হলেই পাত পড়বে। এখন পিছোতে বাবু হয়ে বসে থাকো সব।

নারান জানে, পরান শরীব ভাল থাকলে অমন বক্ বক্ করে। বোধ হয় ডাক্তাববাবু ইঞ্জেক্‌শন ফুঁড়ে দিয়েছেন। শবীর ভাল না থাকলে মুখ গোমড়া করে গুম্ মেরে থাকে। নারান কাজে হাত দিল বিনা বাক্যে।

সন্ধ্যার পরই রান্না করেছে সৌরভী সেই মাংস পেঁযাজ-রসুন-লংকার ঝালে ঝোল আর পশুপতির বস্তা-ঝাড়া কেজিদেড়েক চালেব ভাত। দুপুরে ডাক্তারখানায় নেতা দিতে গেলে পশুপতি ঐ চাল দিয়ে বলে দিয়েছে, এখন এ চাল নিয়ে যা। ঘণ্টাচারেক রাতে আসবি। তাব আগে মিটিং শেষ হলে আমি খাব। তারপর এলে চার কেজি ডোলের চাল আমিই দেব। — শুনে অবধি কথাটা গলার কাঁটার মত ঢোক গিলতে খচ্ করে বিঁধেছিল পবানের। তাবপর ভাত-মাংসে পেট ভবতে শরীরের সঙ্গে মনও এলিয়ে পড়েছে মাচাসই হয়ে। শুয়ে শুয়ে চোখ বড় করে দেখতে দেখতে তার মনে হল সৌরভীব চলাফেবায় আজ যেন একটু বেশি ছট্‌ফটে ভাব। ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে শুয়ে পড়ার জন্য ধমকধামক দিয়েছে আজই প্রথম। নিজে উল্টো দিকে ফিরে বসে খেলেও মনে হল বেশ তাড়াতাড়িই হাত চালাচ্ছে। শেষে হাঁড়ি তাকে তুলে দিয়ে এঁটো বাসন ও বাতি নিয়ে মাজতে চলল ডোবার ঘাটে। বাইরের থেকে দরজার ঝাঁপও টেনে দিয়ে গেল। ঘরে অন্ধকার নামতে পরানোর দুচোখও অন্ধকারে বুজে গেল।

রাত তখন হয়ত দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়েছে সবে, কিসব হিজিবিজি স্বপ্ন দেখে ঘুম চটে গেল পরানের। অনেক দিন পর কড়া মাংসের ঝোল পেটে পড়ে পেট গরম হয়ে মাথাও গরম হয়েছে। চ্যাট্‌চ্যাটে ঘাম সারা গায়ে। ঘরের মধ্যে থল্‌থলে অন্ধকার। পরানের চোখে পড়ল দরজার ঝাঁপের মুখে আঙুল আষ্টেক ফাঁক। বাইরের ক্ষয়া চাঁদের আলোর চওড়া একফালি খানিক ঢুকে পড়েছে দাওয়ায়, দেখা যাচ্ছে। দরজায় বাঁশের হুড়্‌কোটা তুলে দিলে এক আঙুলের বেশি ফাঁক থাকে না। তখন মনে পড়ল সৌরভীর রাত দশটা নাগাদ চাল আনতে যাবার কথা। তবে কি ডাক্তারখানা থেকে সৌরভী আর ফেরেনি রাতে? প্রশ্নটা মনে জাগতে বুকের খাঁচাসুদ্ধ কেঁপে উঠল পরানের। উঠে বসে মাথা নুয়ে কান পাতল নিচের দিকে। একটু যেন ছেলে-মেয়ের মিহি নিঃশ্বাস শুনতে পেল। কিন্তু বড়দের ভারী নিঃশ্বাস না তা। সৌরভী যে ফেরেনি তার অকাট্য প্রমাণ ঝাঁপ বন্ধ করে হুড়্‌কো দেয়নি।

পরান কিছুক্ষণ নিশ্চল বসে থাকল। একটা ছবি আঁকল মনে মনে — পশুপতির একজোড়া ভীমের গদা উরুতের ক্যাচাকলে বন্দী হয়ে মুক্তির জন্য হাঁকোড়-পাকোড় করছে সৌরভী। অথবা ব্যাপারটা উল্টো, সৌরভীই নিজে থেকে নিজের গতরের ক্ষুধা মিটাতে

সেখানে থেকে গেছে। এসব চিন্তায় বুকে দুপ্‌দুপানি শুরু হল। ভাবল, থাক মাগী বাইরে, দরজায় হুড়কো তুলে দেই। দরজা বন্ধ করবে স্থির করে মাচা থেকে উত্তেজিত হয়ে নামতে গিয়ে পবান টের পেল নলিরাক্ষসটা গলায় থাবা বাড়িয়েছে। মাঝবাতে অক্ষম রাগে দুঃখে আব হয়ত সৌরভীর জন্য একধরনের হাহাকারে অসহায় পরান নিয়তিব দোসব নলিরাক্ষসেব হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল।

আধঘণ্টা পরে পবান অনেকটা সুস্থ বোধ করল। ততক্ষণে উত্তেজনা ঠাণ্ডা বরফ হয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কবে বুঝল, এবপব বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে তাব পক্ষে। না সৌরভী না পশুপতি তাকে মানুষেব মর্যাদা দেবে। নেড়ি কুকুবেব মত দুমুঠো মুড়ি আর ভাত তু-কবে দেবে। পশুপতির নির্দেশে তাও লাথি-ঝাঁটা মেবে দেবে অথবা তাড়াবে। মুখচোরা সৌবভী ক্রমশ মুখ খুলবে। আড থাকবে না মুখেব। একমাত্র মুক্তি নিজেই যদি এইবেলা সময থাকতে নিজের নলিটা একেবাবে বন্ধ কবে দেয। ঘবে-বাইরে-দেহে তিন শক্রুব সঙ্গে লড়াই কবে বাঁচা যাবে না। সে অনেকবাব আত্মধিক্কাবে নিজেকে গলায দড়ি দিযে ঝুলে পড়তে বলেছে। এখন সেটাই নিষ্কৃতিব উপায হিসাবে বেছে নিল।

মাথার উপরেব তাক থেকে টাট্‌কা চর্বি মাখানো ছুরিটা অয়েলক্লথ সমেত পেড়ে নিযে মাচা থেকে নেমে আধখানা ঝাঁপ খুলে দাওযায গরুর দড়ি রেখেছিল। সেটা নামিয়ে দড়িটা খুলে নিযে একমাথায হাতর্তিনেক অংশে ছুবি ও অয়েলক্লথ থেকে চর্বিটুকু মাখালো ঘষে ঘষে। তাবপব সে প্রান্তে তৈবি কবল একটা আলগা ফাঁস।

যন্ত্রের মত দ্রুত হাত চালিয়ে প্রস্তুতি শেষ কবলেও পবানের মাথায় খেলছিল কিছুটা নাটকীয পবিকল্পনা। মববেই যখন চুপি চুপি আড়ালে মরবে কেন? নিষ্ক্রিয প্রতিরোধ কি বস্তু না জানলেও প্রায তাব কাছাকাছি একটা নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদেব সংকল্প পরানেব চিন্তায দানা বাঁধল। সংকল্পটা হল, পশুপতিব ডাক্তারখানাব সামনে সদব বাস্তার পাশে মস্ত আমগাছটাব রাস্তার উপবে মোটা ডালটা থেকে ঝুলে পড়বে। আব তার আগে ডাক্তারখানায় শিকল তুলে দিবে। সকালে পশুপতি যখন অচ্ছুৎ সৌবভীব সঙ্গে ধরা পড়বে তখন মজা লুটতে যারা আসবে তাবা আবও একটা মজার দৃশ্য দেখবেঃ মূর্তিমান প্রতিবাদ হিসাবে পবানেব উলংগ দেহটা গাছ থেকে ঝুলে ওদেব ভেংচি কাটছে। পশুপতি তাব মূল প্রতিপক্ষ হলেও এ মুহূর্তে গ্রামেব এবং সমাজের সব পশুপতিদেবই সে একটা শিক্ষা দিয়ে যেতে কৃতসংকল্প। সকলে দেখুক প্রতিবাদ কত অর্থপূর্ণ হতে পাবে। ... ঠিক এমনি একটা পবিত্র ক্রোধ নিযে দড়িটা কোমবে জড়িয়ে তাতে ছুবিটা গুঁজে দিযে বাড়ি থেকে বেবিযে পড়ল পবান। ঠিক তখন তাকে উৎসাহ দিতেই যেন ভাগাড়েব শেযালগুলো একসঙ্গে ডেকে উঠল।

ডাক্তারখানার পিছনে কাঠা-দুই জায়গায় পশুপতির ধান ঝাড়া হয। তাব পাশে পুকুরপাড়ে মস্ত পোয়াল গাদার গাযে ঠেসানো সরু লম্বা একটা মই। পোযাল উঁচু করে গাদা দিতে বা ভাঙ্গতে লাগে ওটা। পরান মইটাব প্রায় মাঝামাঝি কাঁধ ঠেকিযে টেনে নিয়ে আমগাছের দশ-বারো হাত উঁচুতে মোটা ডালে ঠেকিয়ে দাঁড় করালো। তারপর গেল ডাক্তাবখানার দবজায শিকল তুলতে। কি খেযাল হল শিকল তোলাব আগে একটা কপাটে আস্তে ঠেলা দিযে দেখল। তাতেই কপাটটা মৃদু শব্দে আধখানা হাঁ হযে গেল। পবান অমনি সবে দেযাল ঘেঁসে দাঁড়িযে কান পাতল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝল কাবো ঘুম ভাঙ্গেনি, কেউ জেগে নেই।

এবার পরানের ভাবনা নিশ্চিত স্বেচ্ছামৃত্যুব পূর্বমুহূর্তেও একটা অন্য খাতে পড়ল, যা একান্ত ঐহিক। তাব প্রচণ্ড ইচ্ছা হল, মববেই যখন তখন একবাব পশুপতি ও সৌবভীব

যুগল-নিদ্রা একটু চাক্ষুষ করে মরবে। এ-চিন্তার সঙ্গে গলায় দড়ির ফাঁস পরার ভীতি দূর করার সম্পর্ক আছে। মনে জোর পাবে। এরকম একটা যুক্তি খুব স্পষ্ট না হলেও পরানের মনে আছে। সে মনে সাহস এনে চোরের মত ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। মশারির কোণে গিয়ে দাঁড়াল। অবিকল মোষের মত ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দ করে নাক ডাকছে পশুপতির। পরান আস্তে আস্তে মশারির কোণ একটু ফাঁক করে উঁকি দিল। জানলা দিয়ে একটু চাঁদের আলো পরানের মতই চুরি করে ঢুকে পড়েছে। চোখ একটু সয়ে গেলে পশুপতির মস্ত ভুঁড়িটা কাপড়সিদ্ধ করা দশ-বারো নম্বরি বিরাট কড়া উল্টনো মনে হল পরানের। তেমনি কড়ায় সোডায় সিদ্ধ-করা কাপড় মাঝে মাঝে রানাবাড়ির খাটে আছড়ে কাচে সৌরভী। পশুপতি দুপাশে পা ফাঁক করে চিৎপাত হয়ে ঘুমুচ্ছে একা। সৌরভী নিশ্চয় আগে বেরিয়ে গেছে। তাই হয়ত দরজা খোলা। ভেজিয়ে রেখে গেছে সেই দরজাটা। পশুপতি মদের মেশায় আর গতরের সুখের পরিশ্রমে উঠে আর দরজা ভিতর থেকে খিল আটকায়নি। কিন্তু সৌরভী কোথায় গেল? এমনও হতে পারে, এই মোষটার দু-উরুতের ক্যাচাকল থেকে ছাড়া পেয়ে কাহিল হয়ে কোনোরকমে বাড়ি গিয়ে ঘরের ঝাঁপ আটকাবার কথা মনে ছিল না, বা সে অবস্থাই ছিল না। পশুপতিও এখন মদের খোয়ারিতে অচেতন। সহজে খোয়ারি কাটবে না।

পরান অবস্থা বুঝতে পেরে সাহস করে মশারির সামনের পাট তুলে দিল। অমনি ভক্ করে দিশি মদের বোট্‌কা গন্ধটা পরানের নাক দিয়ে ঢুকে একেবারে তালুতে উঠল। পশুপতি ঠিক যেন একটা মরা মোষের লাশ। ফিকে আলোয় এখন দেহটা অনেক স্পষ্ট হয়েছে। পরান নিজের গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবার কথা ভুলে পশুপতি নামক মোষটার চামড়া ছাড়াবার প্রক্রিয়াটা ভাবতে শুরু করল। প্রথম গলার নলিতে ছুরি বসিয়ে কানের তলা দিয়ে ঘাড়ের উপর দিকে যতটা চামড়া পারা যায় রেখে ছুরি ঘুরিয়ে আনবে। ...... এসব ভাবতে গিয়ে বুকে দুব্‌দুব্ শুরু হল। পরানের মনে হল নলিরাক্ষসটা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে গলা চেপে ধরতে।

ঠিক তখন আবছা ভৌতিক আলোয় পরান দেখল পশুপতিরই একটা লোমশ মোটা হাত তার গলার দিকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। এই প্রথম একটুও ভয় না করে ক্ষিপ্ত পরান চেঁচিয়ে বলল, শালা নলিরাক্ষস, এতদিনে তোকে হাতে পেয়েছি। ইবার প্রতিশোধ লিয়ে যাব।

একটানে কোমর থেকে মস্ত ছুঁচালো ছুরিটা বের করে পরান পশুপতির গলার নলিতে খাড়া বসিয়ে দিয়ে দুহাতে চেপে ধরল ছুরির বাঁট।

কল্যাণী

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

এই একটি মাস কল্যাণীর আর অবসর বলতে এক তিলও থাকে না। সংসারে 'ছিষ্টি' কাজ তো আছেই, তার উপর 'মায়ের রূপরচনা'। হ্যাঁ, পাড়ার আর সবাই বলে ঠাকুর তৈরি, কিন্তু কল্যাণী বলে রূপরচনা—এ কথাটা ওব নিজস্ব নয়, স্বর্গতঃ ঠাকুর অর্থাৎ শ্বশুর শিবশঙ্কর ঠাকুর এই আখ্যাই দিতেন প্রতিমা-মূর্তিকে।

কৌলিক পূজার আর কিছুই বজায় নেই।

পাড়ার কৌতূহলী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে জমেছে। আজ দো-মেটে হবে। ওবা রোজ আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িযে দেখে—ম্লান মুখে কথার জবাব দিতে দিতে কল্যাণী হাতে কাজ ক'রে যায়।

আজও সকালে উঠে বাসিপাট সাত-তাড়াতাড়ি চুকিয়ে পুকুরে ডুব দিযে এসে রূপরচনার কাজে লাগল কল্যাণী। হাতে আব মোটে সময নেই, কদিনই বা বাকি। অথচ এবাবে চাঁদা পত্র একদম আদায হচ্ছে না। হবে কি ক'বে, পাড়াতে যে বড়লোকেবা ঘববাড়ি কবেছে, তাদের সর্বজনীন পূজোর দিকেই সবাই ঝুঁকেছে। সর্বজনীন পূজোর বিরাট প্যাণ্ডেল, ঠাকুর আসেন লবিতে চ'ড়ে। তিন দিন তিন বাত ধ'রে নানা বকমের তামাশা। সেখানেই যায় মোটা মোটা চাঁদা। তা যাক, সে জন্যে কল্যাণীব দুঃখ নেই, কিন্তু আটআনা-চারআনাব ববাদ্দটুকুও যদি বন্ধ হয়ে যায় তো মায়ের সামনে ধূপ-ধুনোটুকু দেবার সামর্থ্য থাকবে না যে কল্যাণীর। শুধু কি চোখের জলেই মাকে আবাহন করবে কল্যাণী এবার! তার জন্যে রূপরচনাব দরকাব ছিল না, প্রতিনিযত ধ্যানেই তো সে মাযের কাছে মিনতি জানায, মুক্ত কর মা, মুক্তি দিযে তোমাব চরণে টেনে নাও।

তবু কল্যাণী মাটি থেকে ফালতু ইট-পাটকেল বেছে ফেলে দিয়ে জল ঢালে। নবম কাদা মাখতে মাখতে স্বামীর উদ্দেশে গলা একটু চড়িযে বলে, ওগো, ওঠ। বেলা যে অনেক হ'ল, চাতাল ছাড়িযে সূর্যি ঠাকুর মন্দিরে ঢুকলেন।

মন্দির, তবে মাথায় খোলার খাপরা, মাটি-লেপা ছ্যাঁচার বেড়া, অবশ্য মেঝেটুকু লাল সিমেন্টেব। সবই তো সেই শ্বশুরের আমলের। তাঁর কাছেই কল্যাণী ঠাকুর-গড়া শিখেছে। বাবো বছরের মেয়ে, আদর ক'রে ঠাকুব বলতেন— গৌরী। গৌরীদান করেছিলেন কল্যাণীর বাবা। তখন এই সংসারে লক্ষ্মী ছিলেন বাঁধা। শিবশঙ্করের পূজার্চনার রীতি ছিল রাজসিক। আর পাড়া ছাড়িয়ে মহল্লায় তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ... কল্যাণীব চোখে সে সব স্বপ্ন ছবি হয়ে আজও বেঁচে আছে। এখনও প্রতিমার রূপরচনাব কালে সেই ছবিগুলিই ভেসে ভেসে আসে।

পাশের ঘরে অন্নদাশঙ্করের খড়মের শব্দে কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। যাক, আজ তা হ'লে মা মুখ তুলে চাইবেন মনে হচ্ছে। একবারের ডাকে অন্নদার ওঠার কথা নয়, তিন-চার দফা ডাকাডাকির পর বিরক্তি-ভরা ভ্রূকুটি নিয়ে সে ওঠে। হবে না কেন, গাঁজার

আড্ডায় নিমতলার শ্মশানঘাটেই তো রাত এগারোটা-বারোটা বাজে। কিছু বলবার উপায় নেই। বললেই কটাস ক'রে জবাব মিলবে ঃ তা গেঁজেলের ঘরে থাকতে মন না চায় তো গেলেই পাবিস মাতাল নাগরের পাকা দালানে। এর পিছনে যে ইতিহাস আছে সেটা কল্যাণী মন থেকে মুছে ফেলতে চায়। তবু এক-এক সময় অন্নদার খোঁচা খেয়ে স্মৃতিপটে জেগে ওঠে একটি সুন্দর দিব্যকান্ত তরুণ মুখ। আহা, শেষ পর্যন্ত ছেলেটা মাতাল হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে চৌমাথার মোড়ে অশ্বত্থগাছের ডালে ঝুলেছিল—শীতের রাতে। গা শিউরে ওঠে। মিথ্যে কথা নয়, কল্যাণীকে ছেলেটা ভালবেসেছিল। নল-খাগড়ার জঙ্গল কেটে প্রথম দোতলা ইমারৎ এ পাড়ায় ওরাই প্রথম তোলে। অন্নদার সঙ্গে রোজই আসত ছেলেটা। কল্যাণীকে 'বউদি' বলে ডাকত। আস্ত পাগল ছিল। পাগল না হ'লে অমন ভালবাসতে পারে। সে যাক, আজ অন্নদাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চাঁদা আদায়ে পাঠাতে হবে। নইলে মায়ের কোরা শাড়ি অন্ততঃ একখানা কিনবে কি দিয়ে? নিজের সাধ্যমত কল্যাণী প্রতিমা গড়ছে। কিন্তু তিনখানা শাড়ি তো চাই, —মা দুর্গার দশহাত শাড়ি, লক্ষ্মী-সরস্বতীর নয়—আটহাতি হ'লেও চলে। কলাবউয়ের জন্য বড় গামছা একখানা। আর— আরও আছে, কার্তিক-গণেশের ধুতি। আর ভাবতে পারে না কল্যাণী, অনেক টাকা চাই যে!

কোন কালেই অন্নদা কিছু ভাবে না। তবে তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। তাতে কল্যাণীর আপত্তি নেই। পুরুষ মানুষ একটু আলা-ভোলা হতেই পারে। কিন্তু মেয়েদের তো হাল ছেড়ে হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে থাকলে চলে না। কুলবধূর দায়িত্ব সামান্য নয়। লৌকিক মর্যাদা তাকে বজায় রাখতে হবে।

এই মর্যাদার দায়িত্ব কল্যাণীকে অষ্টপ্রহর উদ্ব্যস্ত ক'রে রেখেছে। তবু রক্ষে যে ছেলেপুলে নেই। তাদের খাওয়ানো-মাখানোর ঝামেলা নেই। আছে এই মন্দির, আর আছে অন্নদাশঙ্কর। দু দশ ঘর যজমান এখনও যেতে যেতে টিকে রয়েছে। তাদের অন্নপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, সত্যনারায়ণ, লক্ষ্মীপুজোর কল্যাণে এখনও যৎসামান্য রোজগারপত্র হয় অন্নদাশঙ্করের। তবে তারা নিতান্ত গরিব বস্তির বাসিন্দে। বড় বড় ঘর তো অন্নদাশঙ্করের হাতছাড়া হয়ে গেছে কবেই। . মাটির ওপর নতুন মাটির হালকা প্রলেপ দিতে দিতে কল্যাণী বলল, ওগো, একবার ইদিকে শোন।

সাড়া এল ঃ কল্কে সাজা নেই কেন?

ওমা, দেখেছ, একদম ভুলে গেছি। এই যে, আমার হয়ে এসেছে। দাঁড়াও, যাই।

থাক্, আর সোহাগ কাড়তে হবে না। যা করছ তাই কর। আমি আবার একটা মানুষ, তার আবার তামাক।

আচ্ছা, এই সাত-সকালে ঝগড়া মুখে ক'রে উঠলে! বলছি, ভুল হয়ে গেছে।

ভুল! আমি আর বুঝি নে! অচ্ছেদ্দা। আচ্ছা, আমিও শিবুঠাকুরের ব্যাটা, তোমাকে দেখাব, ভুলকে ঠিক করতে হয় কি ক'রে।

মুখ বুজে থাকাই ভাল। আর একটি কথা কইলে, কল্কেটা আছড়ে ভাঙবে, তখন কেনার পয়সা যোগাড় করতে হবে কল্যাণীকেই। যোগাড় মানে—ধার। সে ধারটুকু শোধ হবে কবে তার ঠিক নেই। মনে মনে কল্যাণী প্রমাদ গণল—এই মেজাজের ওপর চাঁদা চাইতে যাওয়ার কথা বললে আর রক্ষে থাকবে না। কিন্তু না বললেই বা চলবে কি ক'রে! এমনি সঙ্কোচ ক'রে ক'রে তো এতদিন কেটেছে। আর চলে না।

ওদিকে বাচ্চাদের প্রশ্ন ঃ খড়ি দেবেন কবে? রঙ দেবেন কবে? এমন মাখনের মত মাটি কোথায় পাওয়া যায়? আমায় একটু দেবেন?

কল্যাণী হাসিমুখে ওদের কথার জবাব জুগিয়ে যায। আর উৎকর্ণ হয়ে থাকে। পাশেব ঘরে কি ঘটছে-না-ঘটছে শুনে বোঝবার চেষ্টা করে।

হুঁকোর টান উঠতে কল্যাণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

পাশের ঘর থেকে অন্নদার সাড়া এল ঃ বলি মাটি তো খুব লাগানো হচ্ছে। তাবপর, কি দিয়ে কি হবে শুনি?

মন্দির থেকে কল্যাণী হেসে উত্তর দিল, মায়ের কাজ তিনিই কবিয়ে নেবেন। এতোকাল তো এইভাবেই মা এসে পূজো নিয়েছেন, এবার নেবেন।

তোমার আব কি, ব'সে ব'সে মাটি মাখছ, খড়েব গোঁজা দিচ্ছ। কিন্তু বাইবেব দুনিয়া যে বদলে বরবাদ হয়ে গেল সে খবর রাখ? জান এবার আরও একটা পূজো বাড়ল পাড়াতে। চাটুজ্যেদেব দলেব সঙ্গে গাঙ্গুলীরা আর এক হযে পূজো কবছে না। 'সাধারণ' দল বেরিয়ে গিয়ে নতুন পূজো করছে। বলি, চাঁদা তো দেবে এই পাড়াব লোকেই, তোমার এবার আশাব গলায় খোলামকুচি।

ব'সে ব'সে অত না ভেবে একবার বেরোও না গো। তুমি গিয়ে দাঁড়ালে মুখেব ওপব না বলতে পাববে ভেবেছ! দু চাব আনাও তো দেবে মাযের নামে।

মাথা খারাপ নাকি! এই কেলেঙ্কারিব পর---

কেলেঙ্কাবি অবশ্য একটা বড় রকমেবই হয়ে গেছে---মাস দেড়েক আগে। এব আগেও দু-চাববাব এ বকম কেলেঙ্কাবি অন্নদার দৌলতে ঘটেছে. তবে এবাবেব মত টিটিক্কার পড়ে নি কখনও। তা, তখন পাড়ায তেমন লেখাপড়া জানা লোকেব সংখ্যা কমই ছিল। আব দেবদ্বিজে ভক্তিব এতটা দৈন্যও ঘটে নি। এবাব যেন বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ওই পুকুবপাড়েব ফুটফুটে বউটাব সঙ্গে অন্নদাব ফষ্টিনষ্টি কল্যাণীব নজব এড়ায় নি। দু-একবাব আকাবে-ইঙ্গিতে কল্যাণী বুঝিয়েও দিযেছে অন্নদাকে, সাবধান হও। কিন্তু গবিবেব কথা বাসি না হ'লে তো মিষ্টি লাগে না।

একদিন সন্ধেবেলা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। একেবাবে হাতেনাতে ধবা পড়েছে আসামী। ঘোঁট চলল রাতদুপুর অবধি। পাড়ার এখানে-ওখানে জটলা-চকববা, হাফশার্ট আব গেঞ্জি গায়ে বাস্তাব ওপাবেব বাবুবা এসে জুটেছে। অবশেষে বাম-পাগলা ব্যাপাবটা সামলে দিলে। বাম ভটচায ওরফে রাম-পাগলা, বস্তিব তরফের মাতব্বব লোক। স্বভাবচবিত্রেব কথা বাদ দিলে, লোকটি স্ফূর্তিবাজ।

বাস্তার দু পাশে দুটি সমাজ। ডান দিকে বস্তি এলাকা, একটিও পাকা বাড়ি নেই। সাবি সারি খোলার ঘর, টিনের চালা। আব সামনে দিয়ে ব'যে যাচ্ছে চওড়া বাঁধানো ড্রেনেব জল। আব রাস্তাব এপারে দোতলা তিনতলা নতুন ডিজাইনেব বাড়ি। দু তরফের মধ্যে অলিখিত পার্থক্য চাক্ষুষ করতে সবাই অভ্যস্ত।

রাম-পাগলা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে চেঁচিয়ে বললে, আমাদের বস্তিব ব্যাপাবে ভদ্দরলোকের নাক গলাবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা দয়া ক'বে অন্তর্ধান করুন। আমাদের ব্যাপার আমরা বুঝব মশাই।

তারপর অন্নদাকে আর মেয়েটির স্বামীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি বুঝিযে দিল বাম-পাগলা, কে জানে! তবে ব্যাপারটা মিটে গেল।

আজ এতদিন পরে যে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে সেই কেলেঙ্কাবিই কাল হয়ে দাঁড়াবে, তা কল্যাণী ভাবতে পারে নি।

অন্নদা ঝেড়ে জবাব দিয়ে দিল--- সে পারবে না চাঁদা সাধতে যেতে। ভদ্দরলোকদের সে বেশ ভাল ক'রেই চেনে। চাঁদা তো দেবেই না, উল্টে কতকগুলো কথা শুনিয়ে দেবে।

কল্যাণী বলবার আগেই সে নাকি দু-এক জায়গায় চেষ্টা করেছিল। তারা ঠোঁট উল্টে বলেছে, মায়ের খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই তাঁর কপালে অন্নদার মত সেবক জুটেছে। মায়ের নামে পয়সা আদায় ক'রে তো অন্নদা সৌখিন সাদা চটি কিনবে কিংবা জালি গেঞ্জি। আরও কি যে বলেছে তা অন্নদা না বললেও কল্যাণীর বুঝতে অসুবিধা হয় না। আশেপাশে বস্তির ঘরে ঘরে প্রায়ই এসব ছোটবড় চ্যুতি ঘটে, তা নিয়ে হাঙ্গামাও হয়, আবার চাপা পড়তেও বেশী সময় লাগে না। কল্যাণীকে সবই দেখতে হয়, চোখ কান তো আর বন্ধ রাখা যায় না—তবে এসব ও গায়ে মাখে না। ও থাকে নিজের মন্দির নিয়ে। সবাই ওকে সমীহ করে। সধবাবা সাবিত্রীব্রত করলে ওকেই শ্রদ্ধার্ঘ দেয়। ওর সন্তান নেই তাতে কি, এমন সতীকে কে না পূজা করবে!

অবশেষে চাঁদা আদায়ের ভারটুকুও কল্যাণীর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। আসুক। কল্যাণীর কিছুতেই আপত্তি নেই, শরীরে বইলে ওর আর কি!

সেদিন দুপুরে ঠাকুরের গায়ে খড়ি লাগিয়ে কল্যাণী বেরিয়ে পড়ল। ওকে যেন ওই পাকা বাড়িগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রাস্তার কলে জল নেবার সময় তিনতলা ফ্ল্যাট-বাড়ির বউ-মেয়ে সবাইকেই কল্যাণী দেখেছে—আগে ওখানেই যাবে। এক বাড়িতে অনেকগুলি পরিবার থাকে। কাছাকাছিও বটে।

প্রথমেই তেতলায় উঠল। কড়া নাড়তেই সাড়া পাওয়া গেল ঃ কে, কে?

আমি, একবার এদিকে শুনুন না!

দরজা খুলে দিলে একটি বউ ঃ কি চাই?

আপনাদের কাছে একটু সাহায্য চাই। আমরা মায়ের পূজো করি-

ও। আসুন আসুন।

বসতে বলল বউটি। বেশ মিষ্টি কথা। বললে, আপনাকে যেন দেখেছি কোথায়।

এই তো আপনাদের সামনেই, ওই মন্দির আমাদের।

মন্দির শুনে বউটি অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কল্যাণী বললে, এই তো সামনের ওই বস্তিতে।

অ, তাই বল। মন্দির বললে কি ক'রে বুঝব ভাই! তা কি ব্যাপার বলুন তো, আপনাকে দেখে বস্তির লোক বলে কার সাধ্য! বেশবাস সবই ভদ্রঘরের মত—কথাও বলেন ভাল।

আমরা ব্রাহ্মণ। শ্বশুর ছিলেন পণ্ডিত। আর তাঁর ছেলেও পূজার্চনাই করেন।

ছেলে মানে, ওই সেই ঠাকুর তো! তার কথা আর কে না জানে। —ব'লে বউটি অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

কল্যাণী মুখ বুজে রইল।

বউটি বললে, রাগ করলেন ভাই! না না, আমি সেভাবে বলি নি। এমনি কথার কথা। পুরুষদের কথা না তোলাই ভাল—ওর আর ইতর-ভদ্দর নেই। যাক যে কাজে এসেছেন সেটাই হোক। ছেলেমেয়েদের কাছে শুনি বস্তিতে ঠাকুর হচ্ছে—একটি মেয়েলোক নিজে হাতে ঠাকুর গড়ে। মেয়ে-কুমোর পেলেন কোথায় ভাই?

কল্যাণী গলার আড়ষ্টতা কাটিয়ে খুশী মুখে বললে, কুমোর ডাকার পয়সা কোথায় দিদি। আমিই মায়ের রূপরচনা করি। আর পয়সা যখন ছিল তখনও ওঁদের বংশের বিধি এই রকমই ছিল, আমার শ্বশুরও নিজেই রূপরচনা করতেন।

আপনি নিজেই সব করেন! সময় পান কি ক'রে? আর এ তো সহজ কাজ নয়। তা মেয়েদের মধ্যেও আর্টিস্ট আছে, অ্যাঁ!

বউটির কথার ধরন অন্যরকম। কল্যাণী এ রকম মেয়ে এর আগে দেখে নি। ওর প্রশংসা এতদিন বস্তির মানুষেই করেছে, আজ প্রথম ও স্বকর্ণে তিনতলার ফ্ল্যাটের মানুষদের তারিফ পেল।

বউটি বললে, আপনি একটু বসুন। আমার ননদ-জা ওদের সবাইকে ডাকি।

একে একে অনেকগুলি নানাবয়সী মেয়ে জুটে গেল। পাশের ফ্ল্যাটেরও বউ-ঝি এসেছে বস্তীর ঠাকরুণকে দেখতে, যে মেয়ে নিজের হাতে দুর্গা-প্রতিমা গড়তে পারে সে তো ফ্ল্যাটবাসিনীদের দ্রষ্টব্যই।

সবাই সায় দিল চাঁদা অবিশ্যি দেওয়া উচিত। সর্বজনীন পূজোর জন্যে অনেক কাজের লোক আছে। কিন্তু এরকম একটা মৌলিক প্রচেষ্টাকে মেয়েরা সাহায্য সমর্থন না করলে মেয়েদেরই কর্তব্যে অবহেলা করা হবে। কেউ বলল, আমার নামে এক টাকার রসিদ কাটুন ভাই। কেউ আট আনা, কেউ বা দু টাকার রসিদ কাটতে ফরমাস করল। চাঁদাটা এখন আর বাড়ি-পিছু ধরছে না ওরা, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে চাঁদা দেবে। এদের রকমসকম দেখে কল্যাণীর যৌবন-অতিক্রান্ত বুকের মধ্যে খুশির ঝড় ব'য়ে যায়। এই তো সুদিনের সূচনা। তবে নাকি পূজো হবে না? মায়ের দয়া থাকলে কেন হবে না? কল্যাণী তো অধর্ম করে নি, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় নি, নিরন্তর মায়ের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। মা তো সবই দেখেছেন অন্তরে অন্তরীক্ষে থেকে।

বউটি বললে, ওমা, আপনি চুপ ক'রে ব'সে কেন? আজ যা পাচ্ছেন নিন। কাল আমি আপনার হয়ে আর সবাইকে ব'লে দেব। চটপট রসিদ কাটতে থাকুন।

কল্যাণী ম্লান হেসে প্রশ্ন করলে, রসিদ কি দিদি?

একটি মেয়ে বললে, চাঁদা নেবেন। রসিদ দেবেন না?

রসিদ তো নেই ভাই। মায়ের পূজোয় যে যা দেবেন হাত পেতে নেব। তাঁর ভোগে লাগবে।

দু-একজন মুখ টিপে হাসল।

বউটি বললে, আচ্ছা, এবার আপনাকে বিশ্বাস ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু এর পর রসিদ বই একটা ছাপিয়ে নেবেন। বুঝলেন, শুধু হাতে চাঁদা কেউ দিতে চায় না।

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

তা মন্দ উঠল না। এক জায়গায় ব'সেই সাড়ে আট টাকা চাঁদা উঠল।

একে একে সবাই চ'লে গেল। কল্যাণী ব'সে আছে। বেশ লাগছে এখানে ব'সে থাকতে। এদের এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশটিতে লক্ষ্মীশ্রী রয়েছে। ঠিক এমনটি অনেক কাল পরে নজরে পড়ল কল্যাণীর।

বউটি এক সময়ে বললে, বসুন ভাই, চা খাবেন?

চা তো খাই নি কখনো দিদি।

ওমা, অবাক কাণ্ড! চা খান নি? তা খেয়ে দেখুন না।

আর একদিন খাব। মায়ের পূজোটা চুকে-বুকে যাক। এখন তো খুব বিচার আচারে থাকতে হয়। মায়ের রূপরচনার সময় কত সংযম মেনে চলতে হয় দিদি, কি আর বলব।

কেন?

মায়ের ধ্যানকে মন থেকে বাইরে ফুটিয়ে তোলা তো সাধনার ব্যাপার।

বউটি বললে, রাগ করবেন না দিদি। আপনার মুখে কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগছে না। কিন্তু আপনার এই অন্নদা ঠাকুরকে দেখলে সবাই মুখ টিপে টিপে হাসে। আচ্ছা, ও কি ক'রে ঠাকুরের পূজো করে ভাই?

কল্যাণী হাত জোড় করে বললে, সবই মায়ের ইচ্ছা দিদি। তাঁর ক্ষমা না থাকলে কি আর মানুষ বাঁচত!

বউটি বললে, অবিশ্যি ভক্তি আলাদা জিনিস। কিন্তু, না—থাক্।

কথাটা চেপে গেলেও বউটি মুখ টিপে হাসতে লাগল।

হাসছেন কেন দিদি?

এমনি। আপনাকে ভারি পছন্দ হয়েছে আমার।

অবিশ্যি আপনি মেয়েমানুষ, তাই আপনার পছন্দতে ভয়ের কিছু নেই।

আচ্ছা, এককালে আপনি খুব সুন্দরী ছিলেন, তাই না?

কি জানি, হয়তো ছিলাম, হয়তো ছিলাম না।

এখন ভাই সত্যি কথা বলি, আপনাকে আমরা সবাই চিনি। এমনিই তখন না-চেনার ভান করে ছিলাম।

ও, তাই নাকি! বাঃ রে, বেশ মজা তো!

বউটি আরও ঘনিষ্ঠতা করল এক খিলি পান দিয়ে। তার পর যে কথাটা বলল, তার জন্য কল্যাণী মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

হঠাৎ ওর দু হাত চেপে ধ'রে বলল বউটি, আচ্ছা, তোমাকে ওই অন্নদা হতভাগা ভাগিয়ে এনেছিল, বার ক'রে, তাই না? সত্যি বলবে, আমার গা ছুঁয়ে আছ।

কল্যাণীর আপাদমস্তকে কে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় কল্যাণী সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘৃণায় ওর সর্বাঙ্গ যেন রি রি ক'রে উঠল।

দৃপ্ত কণ্ঠে কল্যাণী বলল, আপনি গেরস্থের বউ, তাই আর শাপশাপান্ত করলাম না। নইলে বলতাম, কুলটা ছাড়া এ কথা কেউ মুখে আনতে পারে না। ঢের হয়েছে, আপনাদের সাহায্য আমার দরকার নেই। এই রইল আপনাদের চাঁদা।

স্তম্ভিত ভাবে বউটি দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের সামনে দিয়ে কল্যাণী তর-তর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

কল্যাণী নিজে আর কোথাও চাঁদা আদায়ে বেরোয় নি। অন্নদাকে বলেছে বস্তির বাইরে কারুর কাছে হাত পাতবে না। আমার মাথার দিব্যি রইল। তাতে মায়ের পূজো যেমন হয় তেমনি হবে।

অন্নদা পরদিন সকালে পুরনো লাল শালুর ওপর লেখা দুর্গাপূজার ফেস্টুনটা টাঙিয়ে দিতে দিতে বলল, ঠিক হয়ে যাবে বউ, তুই তোর কাজ ক'রে যা। আমি দেখি ইদিকে।

ছেলেমেয়েরা আজও ভিড় জমিয়েছে। সর্বজনীন তলায় এখনো কোনো আয়োজনের চিহ্ন নেই—ওদের ঠাকুর আসে লরিতে চ'ড়ে। কণ্টাক্টর এসে ম্যারাপ বাঁধে ষষ্ঠীর দিন সকালে। ঢোল-সানাই বসে, সেও ষষ্ঠীপূজোর দিন। তখন আর ছেলেমেয়েরা এখানে কেউ উঁকি দেয় না। তা না-ই দিক, এখন তো ওরা রয়েছে। কল্যাণী রঙ চড়াতে চড়াতে খুশী হয়ে ওঠে। ওর ভরসা আছে, মা পূজোর যোগাড় করিয়ে নেবেন। এই তো অন্নদাও হাত লাগিয়েছে কাজে, তবে তার ভাবনা কি!

অন্ধজনে দেহ্‌ আলো

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'এই যে অশ্বিনীবাবু।'

সময়মত টের পেলে অশ্বিনী কেটে পড়ত। এখন আর উপায় নেই। সুরপতি কাঁধে হাত রেখেছে।

অগত্যা 'এই যে আসুন' বলে মনে মনে বাপান্ত করে সরে বসে জায়গা করে দিতে হয়।

ধাঁধাটার ফয়সালা হল না। তার কথাই শুনেছে মেনকা। সে বলেছিল বলেই বরদার সঙ্গে ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমায় গেছে। সে ফেরার আগেই ফিরে এসেছে। নিজে থেকে ব্যাপারটা মেনকা না জানালে অশ্বিনী জানতেও পারত না। তবু কেন বরদার সঙ্গে মেনকা সিনেমায় গিয়েছিল শুনে তার রাগ হয়ে গেল? এ ধাঁধা নয়?

লাঠি ঠুকে ঠুকে সুরপতি সামনে ঘুরে আসে। কোঁচার খুঁটে বেঞ্চি ঝেড়ে নিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। ছোকরা চাকরটাকে বিদায় দেয়। লাঠিটা কোলে শোওয়ায়। দাবনায় হাত বুলোয়।

'দেখলেন তো মশায়, আপনিই যে বসে আছেন—'

'আপনার দিব্যদৃষ্টি।'

'ঠাট্টা করছেন ভাই।'

ঠাট্টাই অশ্বিনী করেছিল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে নীরব ঠাট্টা। সুরপতির কাতর সুরের ভাই ডাক শুনে, মুখোমুখি চেয়ে তাকে কাতরভাবে হাসতে দেখে ভড়কে যায়। লোকটা সত্যি সত্যিই অন্ধ তো? আর পাঁচটা কালো চশমা-ওয়ালার মত শয়তানের ধাড়ী নয় তো?

'ছি ছি ঠাট্টা করব কেন।' গম্ভীর মুখে অশ্বিনী বলে। জোরে জোরে মাথা নাড়ে। মুখ গম্ভীর করে জোরসে মাথা নাড়লেই যেন ''অন্ধের সেটা নজরে পড়ে যাবে। 'সত্যি আপনার বাহাদুরি আছে। নইলে এত বড় পার্কের মধ্যে রাত্তির বেলা—'

'অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রি।' সুরপতি খিক খিক করে। হাসে না কাশে বোঝা দুষ্কর।

বোঝার গরজও বড় বোধ করে না অশ্বিনী। কথাটা শোনা শোনা। কোন্‌ নাটকে যেন কথাটা আছে? অবিশ্যি নাটকে কোন কথা থাকা না থাকা বড় নয়। বলার ভঙ্গিটাই আসল। তাই না অতি সাধারণ কথাকে কেউ কেউ চমৎকার ডায়লগ বানিয়ে ফেলতে পারে. যেমন আজ বৌদির হাতের মাংস খাব অশ্বিনীদা। ডাঁটা-চচ্চড়িতেই বৌদি যা স্বাদ তোলে, আহা মাংসে না-জানি কী হবে।

বৌদির হাতের মাংস বলতে অবিশ্যি মেনকার হাত দুটোকে কেটে-কেটে রান্নার আব্দার বরদা করেনি। কাচের চুড়িতে হাত দুটির যত বাহারই খুলুক, হাড় বাদ দিলে ক' ছটাক মাংস ওতে মিলবে! সিনেমা থেকে মেনকাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ফের বাজার দাবড়ে সে দস্তুরমত পাঁঠার মাংসই কিনে এনেছে। কিন্তু তার গদ্‌গদ গলার কথা শুনলে অশ্বিনী মোহিত হয়ে যায়। কথার ঢংয়ে কে বুঝবে যে মেনকার রান্নার তারিফটা নেহাতই খোশামুদি মাত্র।

মেনকাকে না সে সিনেমার পর রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে চেয়েছিল? রেস্তোরাঁর মাংস খেয়ে তার জুত হয়না বলে।

'আপনার ওই সিগারেট অশ্বিনীবাবু। বলি বটে, চারমিনারের গন্ধ আমি স্ট্যাণ্ড করতে পারি না, কিন্তু আজ ওরই গন্ধে— ।' কথাটা মুলতবি রেখে সুরপতি পকেট থেকে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট বের করে। প্যাকেট থেকে সিগারেট। 'চলবে নাকি?'

অশ্বিনী দোটানায় পড়ে যায়। নিজের সিগারেটের সিকিভাগ মাত্র পুড়েছে, গোল্ডফ্লেকের লোভে হেনস্থা করে এখন ওটা ফেলে দিলে পরে আপশোশ জাগবে না? পরে মানে যখন পকেটে সিগারেট থাকবেনা অথচ একটা টানের জন্য প্রাণটা আইঢাই করতে থাকবে। টুকরো টাকরার জন্যে মেঝে, তক্তাপোশের তলা অবধি হাতড়াতে হবে।

'জানি, একবার যারা চারমিনারে মজেছে— ।' সিগারেটের প্যাকেট পকেটে চালান করে দিয়ে সুরপতি সিগারেট ধরায়।

অশ্বিনীর ইচ্ছে করে গলা বাজিয়ে প্রতিবাদ করে ওঠে। বস্তির মেয়ে নিয়ে যে ঘর করে বালিগঞ্জের মেয়ে তার পছন্দ নয়? বালিগঞ্জী পেলে কোন্ শালা বস্তি চায়। নেহাত ওটা জন্মেও জুটবে না বলে বস্তিই বিধিলিপি বলে বস্তির গুণ গেয়ে বস্তিবাসিন্দাকে নিজের চাওয়ার মান বাঁচাতে হয়।

এমন প্রতিবাদের ইচ্ছেটা বরদার সামনেও বারকয়েক মাথা চাড়া দিয়েছে। বরদাও যে গোল্ডফ্লেক খায়। বরদাও যে এমন কথা বলে।

কিন্তু বাপ টেঁশে যাওয়ায় সাতাশ বছরেই তিন তিনটে বাড়ির মালিক বনে গেলেও মেনকাকে বৌদি বৌদি আর অশ্বিনীকে দাদা দাদা করে যে বাপ্তেন হন্যে হয়ে যায় তার কথারও প্রতিবাদ যখন কোনোদিন করতে পারেনি তখন কি প্রতিবাদ করা উচিত সুরপতির কথার? এখনও আলাপের আড় ভাঙেনি যে সুরপতির?

'আপনি তাহলে আজও টিউশনিতে গেলেন না?'

'টিউশনি? অ—না

'অফিসে গিয়েছিলেন?'

'হুম।'

'যাননি তো? শরীর খারাপ হলে যাবেন কেন। সুরপতি নড়েচড়ে বসে। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নাকেমুখে ধোঁয়া ছাড়ে। 'মশায়, শরীর খারাপ হোক চাই না হোক, পাওনা ছুটি সব্বাই নেয়। অথচ আমার স্ত্রীকে এই কথাটা কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। উনি কি বলে জানেন?'

গত সাত দিনে কমসে কম সাতশবার শুনেছে— ফের শুনতে হবে? আবার জানিনা বলাটাও কি ঠিক হবে? অশ্বিনীর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে লোকটার কি তাহলে খারাপ ধারণা হয়ে যাবে না?

'উনি বলেন—'

'আপনার স্ত্রী অত্যন্ত ডিউটিফুল। কী অফিসে কী সংসারে। তাই উনি—'

'প্লিজ।'

'আজ্ঞে?'

'ডিউটিফুল বললে ওঁকে ছোট করা হয়। দয়া করে ওই বিশেষণটা ব্যবহার করবেন না।'

যাব্বাবা। ওই বিশেষণ কি অশ্বিনীর মনগড়া? 'আমার স্ত্রী শুধু ডিউটিফুল নয় মশায়, দুর্দান্ত বিউটিফুলও' বলে সুরপতিই কি প্রথম দিন মিনিট খানেক ধরে আদেখলা হাসি হাসেনি?

শুধু স্ত্রী নয়, সুরপতির চেহারাটাও যে একদা রাজপুত্রের মত ছিল, এখন গায়ে চাপ চাপ চর্বি জমে নাদুসনুদুস একটি ভুঁড়ি গজিয়ে উঠলেও শরীরটা একসময় চাবুক চাবুক ছিল, চোখ দুটি এখন গর্তে ঢুকে গেলেও একসময় ভাসা-ভাসা টানা-টানা ছিল, এই টাক মাথাতে চুলের কেয়ারি ছিল, পাশাপাশি সেদিন দুজনকে চমৎকার মানাত, দেবদেবী বলে সবাই তারিফ করত— প্রথম দিনই সুরপতি সেকথা শোনায়নি? গতকালও তার জের টানেনি?

'ডিউটি নয় অশ্বিনীবাবু, লাভ। ভালোবাসা। ওঁর সব কিছুরই মূলে আছে ভালোবাসা। জানেন, আমার যেসব আত্মীয়স্বজন একদিন—'

'আপনাকে ত্যাগ করেছিল, আপনার স্ত্রীর নামে যাতা রটিয়েছিল তারাও আজ আপনার স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'হবে না? হওয়া উচিত নয়?'

অঙ্কের ডবল প্রশ্নের জবাবে অশ্বিনী দুহাতে কলা দেখিয়ে সোৎসাহে বলে, 'নিশ্চয় হবে। একশোবার হওয়া উচিত।'

কিন্তু এভাবে প্রতিপক্ষকে বশে আনা কি সকলের পক্ষে সম্ভব? অশ্বিনী সমস্যায় পড়ে যায়। ভালোবাসার বিয়ের মাহাত্ম্য বোঝাতে বিয়ের মাস ছয়েকের মধ্যেই লেবরেটরিতে অ্যাসিডের বোতল উল্টে চোখ দুটিকে জন্মের মত খারিজ করে দেওয়া?

ঘটনাটা নিছক অ্যাকসিডেন্ট, নাকি ভালোবাসার ঝাণ্ডা উঁচু রাখার মতলবে সুরপতিই ওই কাণ্ডটি ঘটিয়েছিল? অশ্বিনীর খটকা লাগে।

'আফিস কামাই দূরস্থান, দুবেলা রান্নাটা পর্যন্ত উনি—'

গাড়োল কাঁহাকা! আজকের দিনে শ আড়াই টাকায় অথর্ব স্বামী আর একটা ছেলেকে পুষতে হলে ছোকরা একটা চাকর রাখার বেশি হিম্মত যেন কারো থাকে! ভালোবাসার বিয়ে না হলে কোন মেয়ে যেন বিয়ের পর চাকরি করে না। রান্নাবান্না ঘরসংসারের কাজে হাত দেয় না বিয়েটা ভালোবেসে হয়নি বলে!

'দিন একটা গোল্ড ফ্লেক খাই।'

'খাবেন।'

'রোজ আপনি অফার করেন—।'

সিগারেটের প্যাকেটটি অশ্বিনীর হাতে সঁপে দিয়ে সুরপতি যেন বর্তে যায়।

এবং অশ্বিনী করে-কি সুরপতির প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে নিয়ে একটা চারমিনার তাতে রেখে দেয়। একটি গোল্ডফ্লেক ধরায়, প্যাকেটে মজুত করে রাখে একটা। মেনকাও চারমিনারের গন্ধ সইতে পারে না, দেখা যাক গোল্ডফ্লেক-চারমিনারের ফারাকটা সে আজ ধরতে পারে কিনা।

'জানেন', ফিসফিস করে সুরপতি বলে, 'ও কাল রাতে আমায় খাইয়ে দিয়েছে।'

'আচ্ছা!'

'আর আমি না ওর আঙুল কামড়ে দিয়েছি।'

'বটে!' অশ্বিনী নাক সিটকায়, জিভ ভেঙায়।

'অনেক আগে—বুঝলেন—বিয়ের পর, প্রথম প্রথম আমরা এক পাতে খেতাম। ও আমায় খাইয়ে দিত, আমি ওকে খাইয়ে দিতাম। সাত সাত বছর হয়ে গেল—কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে। চোখে ভাসছে।'

চোখে ভাসছে! ঠুলি জোড়া খসিয়ে চোখের খোদলে আঙুল ঢুকিয়ে নেড়েচেড়ে পরখ করে দেখবে নাকি ভাসমান দৃশ্যটাকে?

'চারু অ্যাভেনিউয়ের ওপর দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট। আমার এক বন্ধু জোগাড় করে দিয়েছিল বলে, বুঝলেন না নইলে ষাট টাকায় অমন ফ্ল্যাট—জানালায় দরজায় নীল পর্দা, নীল রঙটা ওর খুব পছন্দ কিনা। নিজেব মনেব মত কবে ঘব সাজিয়েছিল। যে দেখত—'

'তারিফ করত।' না দেখেও অশ্বিনী তারিফ করে। তারিফ করাব জিনিস হলে তারিফ করবে না? সাজানো-গোছানো ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট, দক্ষিণে একফালি বাবান্দা। বাবান্দায কি সিজন ফ্লাওযারের শোভা। ঘরের ফুলদানিতে হররোজ টাটকা রজনীগন্ধা। সন্ধ্যায় স্বামীস্ত্রীর বারান্দায় পাশাপাশি ইজিচেয়াব পেতে বসে-থাকা। স্ত্রীর গান, স্বামীর কবিতা পাঠ। কোন কোন দিন সেজে-গুজে বেড়াতে যাওযা—গঙ্গার ধার, লেকেব পাড়। শনিবার রাতভব গল্প আর খুনসুটি।

এ সব বইয়ে পড়েই লোকে তারিফ করে, এতো জলজ্যান্ত ঘটনা।

'আমাদের—অন্ধদের—বুঝলেন অশ্বিনীবাবু এই একটা মস্ত সুবিধে। আজ আব কিছু দেখতে পাই না বটে কিন্তু একদিন যা চোখে দেখেছি আজও তা চোখেব সামনে জ্বলজ্বল করছে। ঘুমোলেও সেই সব দিনের দৃশ্যই স্বপ্নে দেখি।'

তীব্র একটা জ্বালা অশ্বিনীর বুকে আচমকা দপ কবে ওঠে। মেনকাকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেনি বটে কিন্তু বিয়ের পব তো রেওয়াজ মাফিক ভালোবেসেছে। সুবপতিব মত পাঁচ মিনিটে তার বিয়ে চুকে যাযনি, গুটিকয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে বিয়ের আসর জমাতে হয় নি। তাব বিয়েতে নহবত বেজেছে, পাড়া মাৎ হযেছে। লোকজনের হইচই আব আলোব বোশনাইয়ে নিজেকে একটা কেউকেটা মনে হয়েছে। তারপর ধবো বাসবের স্মৃতি। ফুলশয্যাব স্মৃতি। দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট না হলেও দক্ষিণ খোলা ঘর একটি তাব ভাগ্যেও জুটেছিল। মা না মবে যাওযা পর্যন্ত, সে ছাঁটাই না হওয়া পর্যন্ত দশটা বছর চার ভাই মিলে এক সঙ্গে এক বাড়িতে ছিল। মেনকা গান না গাক, সে কবিতা না পড়ুক—তারা দুজনেও মাঝে-মাঝে বেড়াতে যেত বইকি। তাবা কখনও এক পাতে না খেলেও, মেনকা তাকে কোনদিন খাইয়ে না দিলেও ঘবে খিল দিয়ে একটা রাজভোগ একই সঙ্গে দুজনে খাযনি কি? দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে? কতবার!

কিন্তু কই, সেসব দিনেব স্মৃতি তো আজ ভুলেও কদাচ মনে পড়ে না। মাত্র দেড় বছরেব বেকাব জীবনই তার দশ বছরের স্মৃতিটাকে বেমালুম লোপাট করে দিল।

সত্যি, কি সৌভাগ্য তবে অন্ধ হওযাব।

চাকবি কবেও সংসারের কাজ করে বলে বউয়ের গুণকীর্তনে সুবপতি মুখে থুতু তুলে ফেলে। কিন্তু চাকরি না করলেও জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সংসাবের সব কিছু মেনকা সামলায় না, একাধাবে বাঁধুনির কাজ, ঝিযেব কাজ, ঘুঁটে দেওযার কাজ, ধোপানিব কাজ, ছেলে-মেয়েদের মাস্টাবির কাজ। ভাড়াটেদের কাছ থেকে এটা-ওটা ধাব করার কাজ। স্বামীর সাথে শোওয়াব কাজ।

তিন মাসের বাড়িভাড়া বাবদ একশো কুড়িটাকা এখনও না দিয়ে যে অশ্বিনী ভদ্রভাবে ঘুবে ফিরে বেড়াতে পারছে—এব জন্যে বাহাদুরিও কি মেনকার প্রাপ্য নয়? ববদাব বৌদি ডাকে সে যদি না খুশি হয়, খুশি হয়ে তাকে ঘরে এনে বসায়, দু-দণ্ড হেসে কথা বলে, তাব রসিকতায় আঁচল খসিয়ে হেসে লুটোয়, সবশেষে নিজে হাতে চা করে খাওযায়—কী উপায় হবে অশ্বিনীকুমারের?

'আচ্ছা অশ্বিনীবাবু—'

'আমার নাম অশ্বিনী নয।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, আপনাকে মিথ্যে বলেছিলাম।'

'মিথ্যে বলেছিলেন?'

'উপায় ছিল না। আপনার স্ত্রী আরতি দেবীই আমায—'

'আমার স্ত্রীকে আপনি চেনেন?'

মায়া হয। সুরপতির ব্যাকুলতা দেখে মায়া হয়। থাকগে। মানুষকে হিংসে করা উচিত নয। মানুষকে ঈর্ষা করা উচিত নয়। মানুষকে ভালোবাসো। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখো।

মানুষের ন্যাকামি দেখেও, মানুষের ভণ্ডামি দেখেও, মানুষের বদমাইসি দেখেও গলা চিরে বলো সবার উপরে মানুষ সত্য।

'আপনি আমায মিথ্যে পরিচয দিয়েছেন? কিন্তু কেন— কেন— কেন — ?'

অশ্বিনী উঠে দাঁড়িয়েছিল, সুরপতির আর্ত স্বরেও ভ্রূক্ষেপ করেনি—হঠাৎ ওর বুকফাটা কাশির দমকে বসে পড়ে।

সদ্য ধরানো সিগারেটে টান দিয়ে সুরপতি কাশছে। হাত-পা ছুঁড়ছে। লাঠিটা কোল থেকে পড়ে গেছে।

'সিগারেটটা ফেলে দিন।' বলে নিজেই অশ্বিনী সিগারেটটা সুরপতির হাত থেকে ফেলে দেয। 'চারমিনারে তো আপনার অভ্যেস নেই।'

'চারমিনার? আমার প্যাকেটে?'

'আমিই ঢুকিযে রেখেছিলাম।'

'আপনি।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি টের পাবেন না। আপনি অন্ধ। আপনি আহাম্মক। কিন্তু আমার খেযাল ছিল না যে—'

'আমি আহাম্মক।' খপ করে সুরপতি অশ্বিনীর একটা হাত মুঠো করে।

'আঃ, ছাড়ুন—লাগে।'

থাবার মত দুহাত দিযে অশ্বিনীর আঙুলগুলি পিষতে পিষতে সুরপতি বলে 'আগে বলুন কেন আপনি আমায আহাম্মক বললেন, আমার স্ত্রীর কথা আপনি কী বলছিলেন? কেন আপনি মিথ্যে পরিচয দিযেছেন? কী আপনার মতলব? কে আপনি? বলুন শিগগির—নইলে এখুনি আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব। আমার ঘড়ি আংটি ছিনিয়ে নিযে পালাচ্ছেন বলে--'

এই লোকটার ওপর সে টেক্কা দেবার চেষ্টা করছিল? অশ্বিনী তাজ্জব। মায়া করে এই লোকটাকে সে রেহাই দিচ্ছিল?

নিজেকেই অশ্বিনীর এখন আহাম্মকের বেহদ্দ বলে মনে হয়।

'শুনবেন তাহলে?'

'আলবৎ।'

'তবে বলি, ধর্মত বলা আমার কর্তব্যও। হাত ছাড়ুন। আপনি কি জানেন কেন শ্যামবাজার ছেড়ে আপনাদের উঠে আসতে হযেছে?'

'এ বাড়িটা আরও ভালো বলে।'

'আপনি তাই শুনেছেন বটে, কিন্তু চোখ থাকলে দেখতে পেতেন—যাক, আপনি কি জানেন আপনার স্ত্রী রোজ নতুন নতুন শাড়ি পরে অফিসে যায়?'

'মিথ্যে কথা।'

'আপনি কি জানেন আপনার স্ত্রীর চেহারা এখন বিচ্ছিরি হয়ে গেছে। তাই মুখে রঙ ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে—'

'মিথ্যে কথা।'

'আপনি কি জানেন, আপনার স্ত্রী প্রতি মাসে নতুন নতুন গয়না গড়ায়?'

'মিথ্যে কথা। ওর সব গয়না হয় গিল্টি, নয় কাচ, নয় প্ল্যাস্টিকের। ছেলে হবার সময় সোনার গয়নাগুলি—'

'এই তো মুশকিল। সত্যিমিথ্যে যাচাই আপনাকে ওই স্ত্রীর কাছ থেকেই করতে হয়। স্ত্রী বলেছে বলেই না ওই ছেলেকে আপনি নিজের ছেলে ভেবে—'

'ও একটা অ্যাকসিডেন্ট। ছেলেমেয়ে আমরা চাইনি—'

'অ্যাকসিডেন্টই বটে। আরতি দেবীর পক্ষে মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া কি। নইলে দেবদেবীর মত মা-বাবার অমন হতকুচ্ছিত—'

'খবর্দার!' গর্জে ওঠে সুরপতি।

'অনর্থক রাগ করছেন। চিৎকার করে লোক জড়ো করলে দুজনেরই ক্ষতি। বাড়ি খালি না হওয়া পর্যন্ত পার্কে গল্প করে আপনাকে আমার আটকে রাখার কথা। আরতি দেবী অবশ্য বিনে পয়সায় একাজ—'

'তবেরে হারামজাদা।'

'লাঠিটা খুঁজছেন? এই যে।'

তাড়াতাড়ি লাঠিটা তুলে নেয় অশ্বিনী। তারপর ছড়ি ঘোরাবার ভঙ্গিতে মোটা লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে তরতর করে হাঁটা শুরু করে।

পিছনে অকথ্য আক্রোশে চিৎকার করছে সুরপতি। খিস্তি করছে। দাপাদাপি করছে। করুক করুক করুক।

এমন চিৎকার দাপাদাপি তো অনেকেই করে। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ মনে মনে। অন্যের তাতে কী যায় আসে।

কাজটা অন্যায় হয়ে গেল? বিনা দোষে একজনকে সাজা দেওয়া?

হলে আর কি করা। বিনা দোষে সাজা ভোগ করাই তো দুনিয়ার নিয়ম।

লাঠিটা ডাস্টবিনে ফেলে অশ্বিনী তুড়ি দেয়।

ছবি

ধীরেন্দ্রলাল ধর

প্ল্যানচেটের আসর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব ঢেউ কলকাতায এসেও ধাক্কা মেবেছে। দিনদুপুরে জাপানী বোমারুদের বীতিমত আক্রমণ হযেছে কলকাতাব উপব। বোমাভীত নাগরিকেরা শহব খালি করে চলে গেছে। প্রতিটি সন্ধ্যায চলেছে নিষ্প্রদীপেব মহড়া। ঘরেব মধ্যে আলো জ্বাললেও সে আলো বাহিরে বেরুনো নিষেধ। এমন দিনে চুপচাপ বাড়িতে বসে-বসে আর বউ পড়ে সময কাটে না! সন্ধ্যার পব আমরা ক'জনে মিলে তাই প্ল্যানচেটের আসব বসিয়েছি। একখানি কাঠের টেবিলের সামনে তিনজন বসে প্ল্যানচেটের উপর হাত রেখে মনে-মনে কোন মৃত-আত্মাকে স্মরণ কবি। তারপবই প্ল্যানচেট নড়তে সুরু কবে। বেশ কিছুক্ষণ নড়াচড়াব পর প্ল্যানচেটের নীচ থেকে কাগজখানি তুলে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করি তার উপরের পেনসিলেব বেখাগুলি থেকে কোন প্রশ্ন-উত্তবেব সন্ধান পাওয়া যায় কি-না। সন্ধ্যাব পব দু'তিন ঘণ্টা এইভাবে দিব্যি কেটে যায।

এই আসবেব সদস্য-সংখ্যা বর্তমান চারজন। আমি, আমার ভাই জযদেব, আর আমাব প্রতিবেশী কাকা-ভাইপো মহাদেব ও ভূদেব। তবে সবদিন ভূদেব আসতো না, মাঝে-মাঝে সে যেত বাযোস্কোপ।

একদিন মহাদেবকে খুব চঞ্চল বলে মনে হোল! অনেকক্ষণ বসে থেকেও প্ল্যানচেট আব চলে না। আমরা বিস্মিত হলাম, বললাম — আজ কি হোল বলত?

মহাদেব বললো — আজ আমার মনটা বড় চঞ্চল, তাই আজ এতে ঠিক মন দিতে পাবছি না।

— কেন, আজ কি হলো? নতুন কোন মামলা-মোকদ্দমা নাকি?

মহাদেবের অনেক সম্পত্তিব মালিক, তাব সম্পত্তিঘটিত মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে।

— ঠিক তা নয। ব্যাপারটা বিশেষ গোপনীয। তবে তোমাদের আমি বলতে পাবি যদি কখনও প্রকাশ না পায।

— কি বলত?

— কোনদিন মুখ ফুটে কাউকে বলবে না?

— জান তো আমরা কখনও কোথাও পরচর্চা করি না।

— তবে শোনো ভূদেব আমাকে খুন করাব চেষ্টা কবছে।

— পাগল নাকি?

— শুনলে তাই মনে হয বটে, আমিও তাই প্রথমে বিশ্বাস কবিনি। কিন্তু প্রতি রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায। মনে হয কে যেন এক ঘা চাবুক মারলো। পরক্ষণেই দেখি হাতে পাযে মাথায় বুকে, কোনো-না-কোনো জাযগায় কনকন করছে। সেই ব্যথা বাকি বাতটুকু আমায় সুস্থির হতে দেয় না। প্রথমে ডাক্তার দেখাই, কয়েকটা ভিটামিন বি ইনজেকসন নিলাম, কিন্তু তাতে কিছুই হোল না। শেষে গুরুদেবকে বললাম। তিনি আমাকে এক তান্ত্রিকের কাছে যেতে বললেন। তান্ত্রিক বললো আমাকে শুকো-বাণ মারছে, এবং মারছে আমাব ভাইপো। একভাবে পাঁচ-ছ মাস এই বাণ মারাব ফলে শেষে শুকিয়ে-শুকিযে আমি একদিন মরে যাবো।

— তুমি ওইসব বুজরুকি বিশ্বাস করো?

— যদি প্ল্যানচেট বিশ্বাস করি তাহলে যন্ত্রমন্ত্রই বা বিশ্বাস করবো না কেন? তবে আমি শুধু শোনা-কথায় বিশ্বাস করিনি। আমি লোক লাগিয়েছিলাম, তার মুখ থেকেই জানলাম, ভূদেব বায়োস্কোপ দেখতে যায় না, প্রতি শনিবারে এক তান্ত্রিকের কাছে যায়। আমাদের কথাটা লুকোয়। দেখ, আজ শনিবার, আজ সে গেছে।

— তাতে তার লাভ?

— বিষয়। আমি মরে গেলে সব বিষয় সে হাতে পাবে।

— তোমার তো ছেলেমেয়ে নেই, সে তো এমনিই সব বিষয়ের মালিক হবে।

— সে তো অনেকদিন সবুর করতে হবে। ততদিন সবুর করার ইচ্ছা তার নেই।

মহাদেব বিষণ্ণ হাসি হাসলো।

— এর কোন প্রতিকার করেছ?

— একটা মাদুলি নিয়েছি, তাতে তিন-চারদিন ভাল আছি।

— আশ্চর্য ব্যাপার।

— জীবনটাই আশ্চর্য বুদ্ধদেববাবু!

ভিতরে-ভিতরে ব্যাপারটা এতদূর এলেও বাইরে কিন্তু তার কোন প্রকাশ ছিল না। কাকা-ভাইপোও যথারীতি আসতো আমাদের প্ল্যানচেট বৈঠকে।

দিন যায়। ব্যাপারটাকে আমরা দু'ভাই বিশেষ কোন গুরুত্ব দিইনি। অনেক মানুষের অনেক রকম ধারণা থাকে। আমাদের মনে হয়েছিল মহাদেববাবুরও অনেক বিষয় সেইজন্য মনে তার ভাইপো সম্পর্কে অমনি এক ধারণা আছে। যাকগে, দেখতে-দেখতে পূজো এসে পড়লো, মহাদেববাবু বললেন — এভাবে আর ভাল লাগছে না, দিন-কতক কলকাতার বাইরে ঘুরে আসি। অবিরাম ব্ল্যাক-আউটে মন বিষিয়ে গেছে।

কাকা-ভাইপোয় একদিন কলকাতার বাইরে চলে গেলেন।

কয়েকদিন পরে একখানি চিঠি পেলাম যে মহাদেববাবু রাজগীরে গিয়ে উঠেছেন, ওখানকার উষ্ণ প্রস্রবণ ও পাহাড়ঘেরা গ্রাম্য পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তিনি এখন কিছুদিন ওইখানেই থাকবেন। তারপর কয়েক সপ্তাহ একেবারে চুপচাপ, আর কোন খবর নেই।

হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে জয়দেব বললো — দাদা, আজকের খবরের কাগজ দেখেছ?

— কেন? সকালেই তো পড়েছি।

— না, সব তুমি পড়নি! একটি খবর তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। কাগজের একটি পাতা খুলে ছোট্ট একটি খবরের দিকে জয়দেব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো : 'রাজগীর পাহাড় থেকে পতনের ফলে মৃত্যু।'

সংক্ষিপ্ত সংবাদ। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহাদেব ঘোষাল বায়ু পরিবর্তনের জন্য রাজগীরে গিয়েছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় জরাসন্ধ বৈঠকের উপর তিনি বেড়াতে যেতেন। গত শনিবার সন্ধ্যার পর বৈঠক থেকে নেমে আসার সময় সহসা একটা সাপ দেখে তিনি ভয়ে পিছিয়ে যান। একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ছিলেন, পদস্খলন হয়ে তিনি প্রায় শতাধিক ফুট নীচে পড়ে যান, তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

খবরটা পড়ে মনটা দুঃখিত হলো, বললাম — সত্যি মানুষটি ভাল ছিল। এমনভাবে অপঘাতে মরলো! বড়ই দুঃখের কথা।

জয়দেব বললো — গত শনিবারে ব্যাপারটা ঘটেছে, আজ বুধবার।

আমার ফটো তোলার একটা সখ আছে, এলবামের পর এলবাম জমিয়েছি ছবি তুলে। মহাদেববাবুর ছবিও তুলেছিলাম। সেলফ থেকে এলবামখানি নিয়ে দেখতে লাগলাম। জানা চেনা বন্ধুবান্ধবদের ছবির মধ্যে মহাদেববাবুর ছবিও পেলাম। চুড়িদার কোট গায়ে পুরোদস্তুর দেশী পোশাকে তোলা ছবি।

ছবিটার পানে তাকিয়ে আছি, এমন সময় ঘবে এসে ঢুকলো ভূদেব। অশৌচের বেশ! ক্লান্ত কণ্ঠে বললো — কাকাবাবুকে বেখে এলাম।

— হ্যাঁ, এইমাত্র কাগজে পড়লাম। ব্যাপাবটা তো ভাল বুঝলাম না।

কি করে যে কি হলো, আমিও ভাল বুঝলাম না। জরাসন্ধ বৈঠকটা ঠিক উষ্ণ প্রস্রবণেব উপবেই পাহাড়ের একটা ছাদ বলতে পারেন। কাকাবাবু আর আমি বোজ সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে বসে থাকতাম, সন্ধ্যার পর নেমে এসে স্নান কবে হোটেলে ফিবতাম। শনিবাব দিন যেই আমবা উঠবাব যোগাড় কবেছি অমনি একটা সাপ কোথা থেকে ছিটকে এসে পড়লো একেবাবে কাকাবাবুর পায়ের কাছে. কাকাবাবু লাফিযে পিছু হটে গেলেন। কিন্তু সেখানে পিছু হটাব জায়গা কোথা. সে তো একেবারে পাহাড়েব কিনাবা। সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলাতে না পেরে কাকাবাবু একবাবে নীচে গিযে পড়লেন। একেবারে শ'খানেক ফুট নীচুতে পডলে আর কি কিছু থাকে, আমি যখন নেমে এলাম, তখন আব করার কিছু নেই। মনে হলো, কলকাতায নিয়ে আসি. তারপর ভেবে দেখলাম আর অতো হাঙ্গামা করে কাজ কি? শেষ যখন হয়ে গেল, তখন সব শেষ করেই যাই। চিতাভস্ম নিয়ে এসেছিলাম, কাল এখানকার গঙ্গায় দিলাম।

চেয়াবেব উপব কম্বলেব আসনটা বিছিয়ে ভূদেব বিমর্ষভাবে বসে পড়লো।

মহাদেববাবুব ফটোখানি তার সামনে ধবলাম, বললাম — এইমাত্র তোমার কাকাব ছবিখানা বের করলাম।

ছবিটাব পানে তাকিযে ভূদেব চমকে উঠলো, বললো — এ কী।

আশ্চর্য। আমি তো এতক্ষণ এটা দেখিনি, ফটোয মহাদেববাবুর মুখে নীচেকার ঠোঁটেব উপব দিযে একটা লাল রেখা, হঠাৎ দেখলে বক্তেব দাগ বলে মনে হয়। এমন একটা দাগ তো এখানে থাকার কথা নয। হাত দিযে দাগটা মুছতে গেলাম। সমস্ত মুখখানা লাল রঙে মাখামাখি হয়ে গেল। এই লাল বং এখানে এলো কোথা থেকে? আমার টেবিলে তো লাল কালি নেই।

— রক্তে কাকুব মুখখানা অমনিই হয়ে গিয়েছিল। ভূদেব বললো।

— কিন্তু এখানে লাল রং এলো কোথা থেকে? আমার এখানে তো লাল কালি অবধি নেই! আশ্চর্য!

বলতে-বলতে সহসা আমার মনে হলো, যেন হাতের এলবামখানা অত্যন্ত ভাবী হযে উঠছে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা। এলবামখানি হাতে ধরা যাচ্ছে না। জয়দেবকে বললাম — দেখ, দেখ, এলবামটা কেমন ভাবী হযে উঠলো, বরফেব ঠাণ্ডা বলে মনে হচ্ছে।

জয়দেব তাড়াতাড়ি এলবামখানি হাতে নিল, নিয়েই টেবিলের উপর বেখে দিল, বললো — ফটোখানি প্রেতাবিষ্ট হয়েছে, মহাদেবের প্রেতাত্মা এখন এই ঘবেই এসেছেন।

জযদেব বিলিতী প্রেত-চর্চা সমিতির মাসিক পত্র মাঝে মাঝে পড়তো, বললো — আমি বিলিতী কাগজে পডেছি এই ধরনেব ব্যাপার। অপঘাতে যাদের মৃত্যু হয় তারা অনেক সময তাদের শোবার ঘরে অথবা তাদের প্রিয় বন্ধু বা প্রিয় বস্তুর কাছে আসে, আর সেই আগমন বুঝতে পারা যায় এই একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ দিয়ে। এই এলবামখানি যেভাবে ঠাণ্ডা হযেছে তাতে সেই কথাটাই সত্য বলে মনে হচ্ছে। এখন যদি প্ল্যানচেট চালানো যায়, তাহলে মহাদেববাবুর যা কিছু বলার আছে তা আমরা এখনি জানতে পাববো।

ভূদেব বললো — কিন্তু আমি তো আর বসতে পারবো না, আমাকে আরো কযেকটা জায়গায় যেতে হবে। আমি এখন যাই।

ভূদেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অন্যমনস্কের মত বেবিযে যাচ্ছিল, জয়দেব ডাকলো — আপনার কম্বলের আসনটা পড়ে রইল।

ভূদেব ফিরে এসে আসন তুলে নিলে।

জয়দেব বললো — দাঁড়ান।

ভূদেব দাঁড়ালো।

জয়দেব বললো — দেয়ালে আপনার দুটো ছায়া পড়ছে কেন? আলো তো আমাদেব ঘবে একটা।

ভূদেব সভয়ে দেযালেব পানে তাকালো, তারপর অস্থিবভাবে বললো — আমি যাই, আমি যাই।

ভূদেব তাড়াতাড়ি ঘব থেকে বেরিয়ে গেল। ঘর পার হয়েই অন্ধকার বারান্দা, তারপরেই ফটক। পরক্ষণই ফটকের সামনে একটা পতনের শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি আমরা দুজনে বাইবে গেলাম। ভূদেব বারান্দায় শেষ সিঁড়ির কাছে পড়ে আছে। ডেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, ধরাধরি করে ঘবে এনে শুইয়ে দিলাম। চোখে-মুখে জল দিলাম। ধীবে-ধীরে ভূদেব চোখ মেললো! ভীতিব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, গেছে?

— কে?

— সেই ছায়া?

— কিসেব কি — সাহস দিয়ে বললাম — তুমি জোযান মানুষ। একটা ছাযা দেখে এতো ভয় পাচ্ছ?

— আপনি জানেন না, আপনি বুঝবেন ... ওই তো, ওই তো দাঁড়িযে আছে...

— কই, কোথায় কে?

— ওই যে জানলার বাইবে অন্ধকারে।

— আমবা জানালাব পানে তাকিযে কিছুই দেখতে পেলাম না। বললাম — কই? কেউ তো নেই।

— ওই তো বযেছে, আমি স্পষ্ট দেখছি। না-না-না — জানলাটা আপনি বন্ধ কবে দিন।

জানলাটি বন্ধ কবে দিলাম, ভূদেব ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো।

জযদেবকে বললাম — বাড়িতে একটা খবব দাও, একজন ডাক্তার ডেকে আনো।

— বাড়িতে খবব দিযে কিছু হবে না। বাড়িতে সাবাবাত ধরে ছাযা আমার পাশে-পাশে থাকে। এখানেও ছাড়েনি। ডাক্তার কি ভূতেব সঙ্গে লড়বে? বাড়ি আমি এখন যাব না। তাব চেযে আমি এখানেই এখন কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিই, তবু আপনাবা এখানে আছেন, একটু সাহস আছে!

— বেশ ত ঘুমোও না। বলো তো কোন ডাক্তাবেব কাছে গিযে একটা ঘুমেব ওষুধ নিযে আসি।

— দবকাব হবে না। বলে, ভূদেব চোখ বুজলো।

ঘণ্টাখানেক সেইভাবে কেটে গেল। মনে হলো ভূদেব ঘুমিযে পড়েছে। জযদেব কুকাবে রান্না কবছিল। এসে বললো — রান্না শেষ হযে গেছে, উনি ঘুমোন, ততক্ষণ খেযে নিই। এসব তো আব উনি কিছু খাবেন না।

আমবা দু'জন খেতে চলে গেলাম।

আহার শেষ কবেছি, ঠিক এই সময় সহসা ভূদেবেব আর্তনাদ শুনতে পেলাম, তাড়াতাড়ি হাত ধুয়েই ছুটে এলাম, ভূদেব সোফার উপরে বসে আছে, তাব দুই চোখ বিস্ফারিত, ভয় ব্যাকুল। বললাম — কি হয়েছে?

ভূদেব সে কথাব কোন সাড়া দিল না. সামনেব দেযালেব পানে তাকিযে সে তখন বলছে — মাপ কবো কাকু। তুমি আমায মাপ করো। আমি ঝোঁকের মাথায় অন্যায় করে ফেলেছি. সম্পত্তির লোভে আমার মাথা খাবাপ হযে গিযেছিলো। না হলে তোমাকে কখনই আমি পাহাড়ের ওপব থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পাবি? তোমাকে আমি খুন কববো একথা কোনদিনই ভাবিনি, বাজগীবে হঠাৎ মাথাব মধ্যে কেমন যেন গোলমাল হযে গেল। কী যে হলো, কী যে কবে বসলাম, এখনও তো ভেবে পাই না। তুমি আমায মাপ কর কাকু।

রামাই দারোগার কার্যকলাপ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনচিত্ত বোঝা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। মফস্বলের এই শহরটিতে নতুন যে দারোগাটি বদলি হয়ে এসেছেন, তাঁর নাম রামচন্দ্র দত্ত। লোকের মুখে মুখে তিনি 'রামচন্দ্র' বইলেন না, হয়ে গেলেন 'রামাই দারোগা'। ভালোবেসে এই নামকরণ, না ঘৃণায়, তা বোঝা মুশকিল। তবে ভদ্রলোকের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যতক্ষণ তিনি তদন্তে না বেরিয়ে থানায় আছেন, ততক্ষণ তাঁকে দেখা যেত তিনি নিজের চেয়ারে বসে আছেন পাত্রমিত্র নিয়ে একেবারে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মতো। তাঁর সভায় থাকতেন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, অভিনেতা ইত্যাদি। ঢালাও চা আসছে আর তিনি মেতে আছেন জমজমাট আড্ডায়। শহরের কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের তিনি ডেকে ডেকে নিয়ে এসেছেন জমাট আসরে। ভদ্রলোক পুলিশ হলে হবে কী, তাঁর উৎসাহ সাহিত্যে, নাট্যে, আর বিবিধ শিল্পে। তার মধ্যে কারুশিল্প, চারুশিল্প, দারুশিল্প, সবই আছে। এঁদের নিয়ে দিনরাত থানার মধ্যে তাঁর 'হো-হো-হা-হা' লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে বই কী। থানার লোকজনও বিস্ময়ে হতবাক। থানার বড়বাবু যিনি তিনি যদি গম্ভীর না হয়ে এ রকম পাত্রমিত্র নিয়ে বসে হো-হো-হা-হা করেন তাহলে লোকে তাঁকে মান্য করবে কতখানি? আর তদন্ত? ছোটোখাটো চুরি ছিনতাই ইত্যাদির তদন্তে তিনি যান না, অধস্তনদের পাঠান। 'বড় কাজে' অবশ্য তাঁর নিজে না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু তিনি বদলি হয়ে এখানে আসা অবধি তেমন 'বড় কাজ' আর ঘটল কই? হাই তুলে তাই একদিন তিনি তাঁর পাত্রমিত্রদের বললেন, মশাই, আপনাদের অঞ্চলটা কি একেবারে সাধুপুরুষদের স্বর্গ? একটাও ডাকাতি নেই, খুন নেই, ধর্ষণ নেই, এ কীরকম জায়গা? উত্তরে পাত্রমিত্ররা একটু কাষ্ঠহাসি হেসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার সেই মোসাহেবদের মতো হাঁ-তা-বটেই তো বলে ধুয়ো তুলে ছেড়ে দেন।

এমন যে মফস্বল শহর, তার মাইল চারেক কি পাঁচেক দূরে —পশ্চিমে— একটা অজ পাড়াগাঁ ছিল। একদিকে দিগন্তবিশারী ধানের মাঠ, অন্যদিকে গ্রাম, আর মাঝখানে চওড়া উঁচু সড়ক যার ওপর দিয়ে আগের দিনে যেত গরুর গাড়িই বেশি, এখন আধঘণ্টা অন্তর অন্তর বাস যাচ্ছে দূরের আর এক শহর পাড়ি দিতে। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা যায় অটো রিক্সা। তার ওপর সাইকেল রিক্সা তো আছেই। অনবরতই দেখা যাচ্ছে তাদের, শহর থেকে সওয়ারি নিয়ে এ-গ্রাম সে-গ্রামে এসে থামছে। ঐ যে অজ পাঁড়াগাঁয়ের কথাটা তুললাম? শহর এগিয়ে আসতে আসতে গ্রামটাকে এখন গ্রাস করে আর কী। আগে ছিল একখানা মাত্র ভাঙাচোরা কোঠাবাড়ি, এখন হয়েছে আট-আটটি ছাদওয়ালা কোঠা, একটি ছাড়া সাতটিই দোতলা। আগে ছিল দরমার বেড়াওয়ালা ঘরদোরই বেশি, এখন গোটাকতক ঘর বাদ দিয়ে বাকিগুলো সব ইঁটের। ঘেঁষ দিয়ে ইঁট গাঁথা দেওয়াল, মাথায় পাকা ছাদ নয়, লাল লাল টালি বসানো। এ ছাড়া, সড়ক ঘেঁসে গড়ে উঠেছে ইট গাঁথা মাথায় টালি বসানো পাড়ার ছেলেদের ক্লাব ঘর 'ইয়ুথ ক্লাব'। সেটা আবার বছর খানেক হল ভেঙে তিনটুকরো হয়ে গড়ে উঠেছে

— কাছে-দূরে আরও দুটো ক্লাব ঘর, একটা 'নিউ ইয়ুথ ক্লাব' আর একটি 'যুবসংঘ'। এটাও ভাঙো ভাঙো করছে, 'নিউ যুবসংঘ' এই হয়ে দাঁড়াল বলে। শুধু 'ইয়ুথ ক্লাব' বা 'যুবসংঘ' বলা ভুল হল, বড় করে ক্লাব ঘরের নাম লেখা থাকলেও নিচে থাকত গ্রামের নাম 'আরশিনগর'। আসলে সবাই মুখে মুখে বলে 'আরশি' কিন্তু 'শহর' এগিয়ে আসবার বেশ ধরে 'নগর' শব্দটি আরোপ করে রূপ দিয়েছে 'আরশিনগর'।

আমাদের রামাই দারোগা সেদিন সভাস্থ হয়ে এই প্রসঙ্গেরই অবতারণা করছিলেন। বলছিলেন বেড়ে নামটি তো মশাই, 'বাড়ির কাছে আরশিনগর, ও এক ঘর পড়শি বসত করে।' সভাসদরা সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন 'আরে তা বটেই তো তা বটেই তো।'

রামাই বললেন তা, গাঁয়ের মধ্যে তিন-তিনটে ক্লাবঘর যখন, তখন তিন-তিনটে 'মাতব্বর' নিশ্চয়ই আছেন। আমাদের খাতায় খুঁজে দেখলুম তিনজনই 'নামী' লোক, তার মধ্যে একজন তো বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর আবার গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকেই গতিবিধি বেশি। না-না, শহরের হৃদয়ের মধ্যে তিনি কমই বসবাস করেন, তাঁর ঝোঁক 'বর্ডার'-এর দিকে। বোধহয় বাপ-কাকাদের ছেড়ে আসা দেশটার দিকে তাঁর এখনো নাড়ির টান আছে, নইলে ঘন ঘন 'বুড়ি' ছুঁয়ে আসবার বাতিক কেন?

বটেই তো! বটেই তো! নামটা কী স্যার?

'স্যার' জবাব দিলেন, সাধুপুরুষদের আবার 'অষ্টোত্তর শতনাম' থাকে। এঁরও 'ওবর্ফে' দিয়ে তিনটি নাম আপাতত নথিভুক্ত আছে, 'অহিভূষণ', বোধহয় এটিই আসল নাম, অন্য দুটি হল 'বাঁকাকেষ্ট' আর 'জুলুম খাঁ'। সভাসদদের একজন বললেন, শেষের নামটি আমিও শুনেছি। বর্ডারের দিকে এই নামটারই চলন বেশি। রামাই বললেন, ঠিকই শুনেছেন, ঐ নামেই তিনি মাঝে মাঝে 'সীমানা' পার হয়ে যান।

কেন?

রামাই সুর করে বললেন, ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিককে, সে কটা কেন'র উত্তর লেখে? আমাদেরও তাই, উত্তর এখনো জানা নেই, হাতের মুঠোয় যা আছে তা 'অনুমান' মাত্র।

কবি মন্তব্য করলেন, 'অনুপান' নহে।

রামাইয়ের সহাস্য উত্তর, নহে।

রামাই বর্ণিত এই যে 'জুলুম খাঁ', নিজের গ্রামে তিনি 'বাঁকাকেষ্ট' বা কারও কারও কাছে 'বাঁকাদা' নামে পরিচিত। বেশ পেটানো লম্বা চেহারা, বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে বলেই মনে হয়। দিনমানে এঁকে গ্রামে সচরাচর বেশি দেখা যায় না, দেখা যায় সন্ধ্যার অন্ধকার রীতিমতো গাঢ় হবার পর। গ্রামের তিনটি ক্লাবঘরের তিনজন 'মাতব্বর'দের মধ্যে ইনি একজন হলেও এঁর প্রতাপ বেশি। অন্য ক্লাবদুটির 'মাতব্বর' যারা তারা এঁর হুকুমের বাইরে যাবার হিম্মৎ রাখেন না। এঁর নিজস্ব ক্লাবঘরটির নাম 'নিউ ইয়ুথ ক্লাব' এবং এটি স্থাপিত রয়েছে বড়রাস্তার ধারে বটে কিন্তু গ্রামের একেবারে প্রত্যন্ত সীমায়। এর ঘরের পাশ থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গল। জঙ্গল মানে নানান গাছ-গাছালির একত্র সমাবেশ, আম, কাঁঠাল থেকে সেগুন গাছ পর্যন্ত বিরাজমান। এছাড়া দেশটাতে গাছপালা ও ঝোপঝাড় তো আছেই। এই জঙ্গল পার হওয়ার পর অন্য গ্রামের সীমানা শুরু। সেই সীমানা পার হয়ে অন্য গ্রাম - গ্রামান্তরে যাওয়ার বাধা নিষেধ নেই। বাঁকাদা বা জুলুম খাঁর তো নয়ই। তল্লাটের সবাই ওকে চেনে, কিন্তু ওর কাণ্ডকারখানার বিরুদ্ধে একটা লোকও মুখ খুলতে সাহস পায় না। এমনি ওর দাপট। কার বা কাদের মদতে এই দাপট, তা আমাদের বলার দরকার নেই।

আরশি গ্রামে ভিতরে গোটা কয়েক পুকুর আছে। তার মধ্যে একটি পুকুরই বড়, তার একটা ঘাট রীতিমতো শান বাঁধানো, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে জলের ভিতরে। সিঁড়িটার

ওপরের ধাপের সঙ্গে রয়েছে মানানসই একটা চাতাল। চাতালের মাঝখানে ঝাঁকড়া মাথা খুব বড একটা আমগাছ, তাব গোড়া ঘিরে গোল করে আসন গাঁথা আছে, লোক এসে এখানে বসে দু-দণ্ড ছাযায জিবোতে পারে। পুকুরটা চওডায বেশি নয, কিন্তু লম্বায় অনেকখানি। বাঁধানো ঘাটের উল্টো দিকে পুকুবটা যেখানে শেষ হযেছে, সেখানে কোনো বাঁধানো সিঁড়ি নেই, শুধু ঐ সীমায় যাবা বাস কবে, তাদের জন্য রয়েছে একটা ঘাটেব মতন — তাল গাছের কাটা গুঁড়ি দিয়ে ধাপ বানানো। কাছেই এক-ইঁট দিয়ে গাঁথা, মাথায় টালি বসানো একটা বাড়ি, সেই বাড়ির মেয়েরা ঐ ঘাটে নেমেই বাসন মাজে, চান কবে, কিন্তু কোনো কোনো সময় দেখা যায় ও বাড়ির একটি কিশোরী মেয়ে ঐ ঘাটে না নেমে পুকুবেব পাশেব পাযে-চলা পথটা ধরে হেঁটে সেই ঝকঝকে বাঁধাঘাটটিতে এসে চান করছে। তখন হযতো ঠিক দুপুরবেলা ঘাটে আর কেউ নেই, শুধু তাব বযসী একটি মেয়ে ছাড়া। এই মেযেটি তাব বন্ধু। ওকে দেখেই সে নিজেব ঘাটে না নেমে এই ঘাটে চলে এসেছে। দুজনেবই বযস চৌদ্দ-পনের। কাঁচা ঘাটের মেয়েটি শাড়ি পরেছে, তাকে মানিয়েছেও বেশ। গায়েব বঙ ফবসাব দিকে, দোহাবা চেহাবা, মুখখানি বড় মিষ্টি লাগে দেখতে। ছোট কপাল, টানা ভুরু, ভাসা-ভাসা চোখ, পাতলা ঠোঁট, মাথায় এক ঢাল চুল। ধনীব ঘরে জন্মালে, একটু ঘসা মাজা কবলে, একেই ডানা কাটা পবী বলে চালানো যেত। গবিব ঘরেব মেয়ে, দিনরাত মাযেব সঙ্গে খেটে মরে, যত্ন আত্তি বা উপযুক্ত খাবার দাবাব পায কই? তাই শরীরে চাকচিক্য নেই। তা সত্ত্বেও হঠাৎ দেখলে ওকে মন্দ লাগে না। নামটিও উপযুক্ত, শ্রীমতী। তুলনায ওর বন্ধুটি একটু লম্বা, গাযেব বঙ একটু চাপা, কিন্তু দেহসৌষ্ঠবে এ-ও কম যায না। এ আবার শাড়ি পবে না, এব গাযে সবসময়ই থাকে সালোযার কামিজ। নাম কেতকী, কিন্তু ডাকে সবাই 'কেযা' বলে, যেমন শ্রীমতীকে লোকেবা ডাকে 'শ্রী ব'লে। উচ্চারণে 'শ্রী'কে শোনায 'ছিবি'।

এই শ্রী যখন কলসি কাঁখে কাছে এসে দাঁড়াল, কেয়া একটু হেসে বললে, 'কীরে ছিবি, আছিস কেমন?'

ছিরি মুখটিপে হেসে বললে, যেমন রেখেছিস।

ওমা! ওকী কথা। আমি কাউকে বাখনেওয়ালী নাকি।

নযই বা কেন? আমাদের সবাব বাখনেওয়ালা তো তোব কথায ওঠে বসে।

কেয়া বসিকতাটুকু উপভোগ করেও বললে এ যে তুই বাম বলতে বাবণ বুঝলি! আমাব কথায় সে ওঠে-বসে, না, আমি তার কথায উঠি বসি।

ছিবি এবাব হেসে ফেলল, বললে, কী বুঝছিস! শেষ পর্যন্ত বিয়ে কববে তো?

কেয়া বিয়েব কথায লজ্জা পেল, বলল, দূর! আঠাবো বছব বযেস আগে হোক তখন বিযেব কথা ভাবব! টি-ভির বিজ্ঞাপন দেখিস না? আঠারো বছর বয়স না হলে —

ছিরি এবার স্পষ্টতই হেসে উঠল, তাবপর বলল, থাক আর ব্যাখ্যানা করিস না! কত যেন আইন মেনে সব চলছে!

তা চলছে বই কী। যারা মানবার তারা মানছে, আর যারা মানবার নয়, তারা মানছে না।

ছিরি মুচকি হেসে বললে, বাঁকাদা কোন্ দলে? মানবার দলে, না, মানবার দলে নয়?

কেয়া বললে, জেনে শুনে কেন ন্যাকা সাজছিস!

বলেই স্বর পালটে বলে উঠল, এই শোন এখন কেউ কোথাও নেই, তোকে চুপি চুপি বলি, তুই একটু সাবধানে থাকিস। তোর ওপরও ওর নজর পড়েছে।

ধ্যাৎ, তুই থাকতে আমি।

কেয়া বললে পুরুষের নেশা ছুটতে কতক্ষণ? আজ আমি আছি, কাল হবি তুই।

কথাটা শুনে শ্রীমতী গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, দেখ ভাই, ঠাট্টা করিস না! শুনে আমার যে ভয়ে বুক কাঁপে! গরিবের ঘরে জন্মেছি, যতটা পারি গতর খাটিয়ে মাকে সাহায্য করি। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, জল তোলা ছোট ভাই দুটোকে দেখা এই করেই আমার সময় কেটে যায়। এর ওপর শরীরের ওপর শকুনের চোখ যদি পড়ে — কথাটা সে শেষ করতে পারে না, গলাটা ধরে আসে।

কেয়া বললে, শরীরের ওপর কেন, মনের ওপর পড়তে পারে না?

ও লোকের মন আছে? অবশ্যি এ-কথা তুই-ই ভালো বলতে পারিস।

কেয়া মন্তব্য করল, মনের খবর আমিও জানি না। যা জানি তা শুধু তুই কেন, গোটা গাঁয়ের লোক জানে। ওর ভয়ে লোকে মুখ বুজে থাকে, টু শব্দটি করে না।

তোর বাপ-মা?

বাপ-মা কি গাঁ ছাড়া? ওরে গরিব আমরাও। আমাদের ঘরও এক ইঁট দিয়ে গাঁথা, মাথায় টালি। বাপ-মায়ের এই মেজো মেয়েটাকে কী করতে হয় বা না হয় তা তারা জানে, কিন্তু রা কাড়ে না লোকটার ভয়ে। পিস্তল, ছোরা, পেটো, কী ওর নেই?

এই খবরটা পুলিশ জানে না?

পুলিশ? ও-কথা না তোলাই ভালো।

শ্রীমতী বলে, তা যা-ই বলিস বাঁকা কেষ্টোর এলেম আছে, সবাইকে কেমন বশ করে রেখেছে বল?

কেয়া হেসে উত্তর দেয়, তা রেখেছে। আমাকে তো রেখেই ছে, এর পর তোকেও রাখবে বলে মনে হয়।

ধ্যেৎ, আয় চান করতে নামি।

দুজনে চান করতে নামে। দু-তিনটে ডুব দেবার পর কেয়া আবার বলে, হ্যাঁরে, বাঁকাকে তোর মনে ধরে না?

দূ'র কী যে বলিস। ওসব ভাববার আমার সময় নেই। তোকে বলেছি না?

কেয়া বললে, দেখতে শুনতে কিন্তু লোকটা খারাপ নয়।

কে বলেছে খারাপ? খারাপ কাজগুলো ছেড়ে দিক না? তাহলে লোকে ওর পুজো করবে।

তুই-ও পুজো করবি তো?

শ্রীমতী উত্তর দেয়, তা করব বই কী! পুজো করার মতো লোককে পুজো করব না?

তা বটে।

বাঁকা প্রসঙ্গের আপাতত এইখানেই সমাপ্তি ঘটে। ওরা চান করে যে যার বাড়ি চলে যায়।

কিন্তু বাড়ি গিয়েও স্বস্তি নেই। কেয়াকে সংসারের কাজ কিছু কিছু যে না করতে হয় এমন নয়। সেই হাতের কাজ করতে করতে ওর মনে ছিরির কথাগুলোই গুন গুন করে বাজতে থাকে, 'খারাপ কাজগুলো ছেড়ে দিক না? তাহলে লোকে ওর পুজো করবে'। কথাগুলো কানের কাছে যত গুঞ্জন তুলতে থাকে, ততই ওর মনে অস্বস্তি, লাগে। তাহলে সে যা ভাবছিল তাই? ছিরিরও ভেতরে ভেতর বাঁকার ওপর টান আছে নাকি? ওর মন বলে, নিশ্চয়ই আছে। নইলে সে যখন বললে তুইও পুজো করবি তো? তখন সে বললে তা করব বই কি, পুজো করবার মতো লোককে পুজো করব না?

ছোট থেকে ওরা একই সঙ্গে খেলাধুলো করতে করতে বড় হয়েছে, ছোট থেকে বাঁকাকেও দেখেছে বড় হতে, কিন্তু বড় হয়ে ছেলেটা অমন বিগড়ে গেল কেন? কেয়া জানে, তার থেকে শ্রীমতীকে অনেক ভালো দেখতে। তাই ওকে দেখতে দেখতে আজকাল ওর মনে কী রকম যেন একটা জ্বালা ধরে। যদি বাঁকা ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শ্রীমতীর দিকে তাকায়।

এই আশঙ্কা থেকেই শ্রীমতীকেও কথাটা বলে ফেলেছিল, 'তোর ওপর ওর নজর পড়েছে'। আসলে কথাটা স্রেফ বানানো। বাঁকা আর যাই করুক, তখনো পর্যন্ত কেয়া ছাড়া আর কারও দিকে নজর দেয়নি। তবু ওর ভয় যায় না। বাঁকা যে লুটেরা লোক, এ বিষয়ে ভুল নেই। ও লুট করতে জানে, ভালোবাসতে জানবে কী? যখন দরকার হয় ওকে ক্লাবঘরে ডেকে পাঠায়। যখন ডেকে পাঠায়, তখন ক্লাব ঘরে সে থাকে একেবারে একা। কেয়া ঢুকতেই সে ঝপ করে সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দেয়, আর তাকে দুহাতে জাপটে ধরে। হাত দুটো যেন লোহার হাত। এক এক সময় মনে হয় যেন তাকে দু-হাত দিয়ে সাঁড়াশির মতো টিপেই মেরে ফেলবে। তা এও মরণ বই কী! কাছে টেনে নিয়ে শুধু একবার বলবে, পিল খেয়েছিলি তো? নিজের কাছে নিজের স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সুটকেশ কিনে দিয়েছে ঐ বাঁকাই। দিয়েছে সালওয়ার কামজের সঙ্গে দামী সাবান, স্নো পাউডার। দিতে সে কিছুই বাকি রাখেনি, তার সঙ্গে ঐ 'পিল' লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে খেতে হয় কেন? গাঁয়ের মেয়ে বলে সে কিছু জানে না নাকি? টি ভি যদ্দিন থেকে এসেছে তদ্দিন থেকে গাঁয়ের মেয়েরাও জেনে গেছে। বিজ্ঞাপনগুলোতে তো সবই থাকে। 'অনুভব করেছি তাই বলছি' থেকে এই 'পিল' গুলোর কথা! কিছু কি জানাতে বাকি রাখে ঐ বিজ্ঞাপনগুলো? এর পরে আছে 'গভীর রাতের ছবিগুলো।' না, টি-ভির ছবির কথা নয়, সে 'অন্য' ছবির কথা। ভি সি আর এনে যখন ওরা দেখে তখন একবার বাঁকাও তাকে ডেকে নিয়েছিল। গভীর রাতই হবে। তার জানলায় আস্তে আস্তে তিন টোকা। বাঁকার সংকেত। মা টের পেলেও কিছু বলে না বা বলতে পারে না। শুধু ফিসফিসিয়ে বলে, সাবধানে থাকিস।

রাত্রে সে মায়ের কাছেই শোয়। বাবার ঘর আলাদা, হাঁপানী রোগী, প্রায়ই রাত জেগে কাটায় আর খক্ খক্ করে কাশে। ছোট ভাই দুটোর বয়স আট আর আর দশ, হাফপ্যান্ট পরে স্কুলে যায়, তারা বাপের খুব অনুগত। শোয়ও বাপের কাছে। সে যে তাদের দরজা খুলে বাইরে গেল, বাপ কি টের পেল না? পেলেও কিছু বলার তার সাধ্য নেই। জানালায় টোকা দিতে অবশ্য বাঁকাকেই নিজেই আসে। নিজেই তাকে অন্ধকারে টানতে টানতে ক্লাব ঘরে নিয়ে যায়। এইসব রাতে বাঁকা আর সবাইকে ভাগিয়ে দেয়, তাদের দেখা হয়ে গেলে আবার ঐ' 'ছবি' চালায় শুধু কেয়ার জন্য। পাশে বসিয়ে বলে, ভালো করে দ্যাখ্। তুই আর আমি ছাড়া ঘরে কেউ নেই।

আহা! মেমসায়েবগুলো রয়েছে না?

বাঁকা অবাক হয়ে বলে, মেমসাহেব! মেমসায়েব কোথায়!

কেয়া উত্তর দেয়, কোথায় আবার! ঐ ছবিতে! মাগো কী ঘেন্না!

ছবি দেখতে দেখতে ও যত 'ঘেন্না-ঘেন্না' বলে, তত মজা পায় বাঁকা। ও যত চোখ বোজে, তত হি হি করে হাসে বাঁকা। কেয়ার শরীরটা কাঁপতে থাকে, গলার ভিতরে বমি বমি ভাব আসে, বিতৃষ্ণায় সারা মন ভরে যায়। ছবি অবশ্য বড় নয়, ঝপ করেই শেষ হয়ে যায়। আর শেষ হওয়া মাত্রই ওর ওপর পড়ে বাঁকা মহাজন যেন তার দেনা উসুল করে নেয়। চোখের জল মুছতে মুছতে কেয়া বাড়ি আসে। এ-সময় বাঁকাও কী রকম যে বেহুঁস হয়ে শতরঞ্চির ওপর পড়ে থাকে, তার হাতে যে টাকা তুলে দেওয়া উচিত, তা-ও সে দেয় না। কেয়া অন্ধকারেই ফিরে আসে, সাপেই কাটুক বা শেয়ালে কামড়াক তাতে তার কী? অথচ কেয়ার কিছু হয় না। তার পায়ের শব্দে সাপ শেয়াল সবই বোধহয় এক এক করে সরে যায়। আর তাদের পাড়ার মধ্যে ঢোকামাত্র কুকুরগুলো একবার মাত্র ডেকে ওঠে, তাকে চিনতে পেরেই তারা চুপ করে, আর ডাকে না। ভেজানো দরজা খুলে সে ভেতরে ঢোকে। মা যে তখনো জেগে আছে তা সে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে মা কোনো সাড়া না দিয়ে ঘুমের

ভান করে পড়ে রয়েছে। কিন্তু এ সব দেখে সে উচ্চবাচ্য করে না। উঠোনে নেমে রান্নাঘরের লাগোয়া একচিলতে ঘেরা জায়গায় টিনভর্তি যে জল ধরা থাকে, তা দিয়ে ঘাড়ে মাথায় মুখে পায়ে জল ঢেলে একটু ঠাণ্ডা হয়ে সে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। মাথায় জল দেওয়ার পরেও আগুন নেভে না, ঘুম আসে না, সে ভিতরে-ভিতরে ছটফট করতে থাকে, চোখে বারবার জল এসে পড়ে। বারবার নিজেকে প্রশ্ন করে, একে কি ভালোবাসা বলে? সে দেখেছে হিন্দি ছবিতে 'পেয়ার' হলে সে 'পেয়ার' আর কখনো ভাঙে না, কিন্তু এখানে সঙ্গে সঙ্গে টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। অথচ তার কিশোরী বয়স থেকেই সে স্বপ্ন দেখত এক ধরনের ভালোবাসার যার সঙ্গে বাঁকার এই ব্যবহারের কোনো মিল নেই। এ যেন জলখাব-জলখাব বলতে বলতে এক গেলাস জল খেয়ে গেলাসটা অমনি ঠক করে টেবিলের ওপর রেখে তাড়াতাড়ি অন্য কাজে প্রস্থান করা।

বাঁকা তাই করে। কেয়ার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাঁচ মিনিটের। তারপরে সে কেয়াকে দু-হাত দিয়ে ঠেলে দেয়, যা পালা পালা!

সে চাবুক-খাওয়া জন্তুর মতো পালিয়ে আসে। অথচ, ওকে তো অস্বীকারও করা যায় না। ও যে মাঝে মাঝে জামা কাপড় দেয়, দরকারি জিনিসপত্র পাঠায়, টাকাও দেয়। তাদের ঘরে ছিল ছেঁচা বাঁশের বেড়া, ওর দয়াতেই তো ইটের দেওয়াল উঠেছে। তবু কি একে ভালোবাসার সম্পর্ক বলা চলে? এইটুকু বয়সেই কেয়া বুঝতে পারে, এ সব নিছক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। আবার এটুকু না হলে তাদের সংসারই বা চলে কী করে? তার বাবা শহরে এক কাপড়ের দোকানের কর্মচারী মাত্র, তাতে আর কটা টাকা বা ঘরে আসে? যেটুকু আসে তা দিয়ে আজকালকার দিনে চলে কি? তাই মা বাবা সব বুঝেও না বোঝার ভান করে। সারা গ্রামের লোকও কি জানে না? সব জানে, ভয়ে কিছু বলতে পারে না। ছোঁড়ারাও পারে না, বুড়োরাও পারে না। আতঙ্কের মুগুরে তাদের কোমর ভেঙে গেছে।

কেয়া সব মেনে নিয়ে একেও 'ভালোবাসা' বলে ভাবতে চেষ্টা করত। ভাবত বিয়ে না করলেও বাঁকাকেষ্টই তার স্বামী। কত স্বামী কত বউকে যত্ন করে না, তারা এক হাতে চোখের জল মুছে অন্য হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ করে বেড়ায়। তাদের মতো সে নিজেও বা পারবে না কেন? কিন্তু বাঁকার কি সংসার আছে? বাড়ি বলে একটা বস্তু তার আছে বটে, সেখানে এক পাতানো বুড়ি পিসিমা ছাড়া আর কেউ নেই। এছাড়া, সে বাড়িতে বাঁকা থাকে কতক্ষণ? রাত্রে যে সেখানে শুতে যাবে তাও বহু দিন হয় না, ক্লাবঘরে 'গভীর রাতের ছায়াছবি' দেখে বাকি রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দেয়। পিসি ডাকতে এলে তাকে 'দূরছাই' করে তাড়িয়ে দেয়।

একদিন কেয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা তোমার বাপ মা নেই?

উত্তরে সে খেঁকিয়ে উঠেছিল, তা দিয়ে তোর দরকার কী? তুই যেমন আছিস তেমনি থাক।

আর একদিন মার জবানীতে বলেছিল, মা বলছিল, তুই কি এ ভাবে কাল কাটাবি? বিয়ে করবি না?

বাঁকা শুনে চোখ বড় বড় করে মন্তব্য করেছিল, তা করনা। কে বারণ করছে?

তোমার আপত্তি নেই।

আমি কি তোর বিয়ে-করা বর, যে আপত্তি থাকবে?

কেয়া বলেছিল, বর তো হতেও পারো।

বাঁকা ওর চুল মুঠি করে ধরে এক টান দিয়ে বলেছিল, ওসব খোয়াব ছাড়।

কেয়া নিজের চুল কোনোমতে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, তাহলে মাকে কি বলব আমার সম্বন্ধ দেখতে?

বল্‌না দেখতে। এক বেটাকে ছাদনতলায় ধরে নিয়ে আয়, আমি একটু হাতেব সুখ করেনি।

মানে!

বাঁকা বললে, হাত পা ভেঙে লাড্ডু করে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেব!

এই তো! দিব্যি হিংসে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

আবে! ওসব হিংসে-হিংসি বাখ! আমাব হচ্ছে হিসেবেব কড়ি! হিসেব ছাড়া বুঝি না। যদ্দিন এ মেজাজ থাকছে, তদ্দিন তোকে কাছে ডাকব! তারপরে পেছনে মারব লাথি, পগাব পাব হবার পব যাব গলায খুশি ঝুলে পড়িস, দেখতে আসব না। কিন্তু এর মাঝখানে যদি কারও সঙ্গে লটর পটর কবো তো, একদিন গর্দান যাবে, সাফ বলে দিলুম।

কেয়া বললে, বাঁকাদা এসব কথা আসে কোত্থেকে? আমাকে একটু ভালোবেসে দ্যাখো না, আমি চিবদিনেব দাসী হয়েই থাকতে চাই।

দ্যাখ, এসব ইনিযে-বিনিযে বাংলা সিনেমার ভাষা আমাকে বলিস না। আমাব মাথা ধরে যায।

তাহলে কি হিন্দি সিনেমাব ভাষা বলব?

তুই পাববি? তাহলে সে বকম পোশাক পবতে হয, বাগানে যেতে হয়, নেচে নেচে গাইতে হয 'বাহো মে আ যা-ও, সাজন হো তো পর্দা কেয়া?'

ওটা কী বললে? ওব মানে কী?

আবে, মানে ফানে ছেড়ে দে! তুই বাগানে গিযে নাচতে পাববি, গাইতে পারবি?

কেন পাবব না? তুমি শিখিয়ে দেবাব ব্যবস্থা কব?

আবে ফোট্‌! নাচবি কার সঙ্গে?

কেন তোমার সঙ্গে?

আমার সে সময কোথায? নে এখন যা। বকবক কবিসে আমাব মাথা ধবিযে দিলে একেবাবে! পা — লা!

কেয়া উঠে দবজা পর্যন্ত গিয়েও ফিবে দাঁড়াল, বলল, তোমাব আব কী, তুমি তো সবসময়ই বল পালা আর পালা। আমিই শুধু কলঙ্কের ডালি মাথায় বয়ে বেড়াই।

বাঁকা ক্লাবঘরেব সেই শতবঞ্চির ওপবই শুয়ে ছিল, এবার উঠে বসল, এই! আবাব তুই বাংলা সিনেমার ভাষায় কথা বলছিস্‌! যা বলবি সোজাসুজি বল্‌। কে তোকে কলঙ্ক দিয়েছে? কেন দিয়েছে? তাব নাম বল, তাব মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিয়ে আসব।

ওঃ! খুব মুরোদ!

বলে, কেযা আব দাঁড়াযনি, অন্ধকাবে কোনো রকমে পথ চিনে যেমন আসে, তেমনি ফিবে এসেছিল ঘরে।

কিন্তু এইসব স্মৃতিব ক্ষত তাকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দেয় না, তাব অন্তবকে যেন কুবে কুবে খায। তার সঙ্গে বাঁকার সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক নয। তবু ঘবের বাইরে দিবালোকে বেরুলে লোকে যখন তার দিকে তাকায়, তখন তাব মনে হয়, তারা মুখ ফুটে না বললেও তাকে বাঁকার প্রণয়িনী ভেবে মনে মনে ধিক্কার দিচ্ছে। এ যে কী জ্বালা, তা যার অভিজ্ঞতা না হয়েছে সে বুঝবে না! বাঁকা যেমন তাকে খেলার পুতুল ভাবে, কেয়াও বাঁকাকে তার বেশি ভাবতে চেষ্টা করে না। কিন্তু সর্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে বাঁকার চিন্তাই তার মনে আসে, আর কিছু যেন তার ভাববার নেই, অনুক্ষণ শুধু বাঁকা আর বাঁকা।

এ-রকম অবস্থায় দেখা হয়ে যায় 'ছিরি'র সঙ্গেই, প্রায়ই। 'ছিরি'-ও কি সব-সময়ে তাব মতো বাঁকার কথা ভাবে? নইলে তাকে দেখামাত্রই বাঁকার কথা তোলে কেন? সেদিন বললে, এই, কাল দেখলুম তোর বাঁকাকেষ্টকে, একেবারে দিনদুপুরে।

কোথায়?

এই পুকুরে। একা একা স্নান করছিল, জামা-প্যান্ট ঘাটে রেখে, একটা জাঙিয়া পরে।

তুই তখন কোথায় ছিলি?

ওপারে, আমাদের ঘাটের ধারে।

তোকে ও দেখেছিল?

কী করে দেখবে? আমি ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

কেন? তোর আবার নতুন করে ওকে দেখবার কী ছিল?

ছিলরে ছিল। জামাকাপড় পরা ছাড়া খালি গায়ে ওকে তো কখনো দেখিনি! সত্যি কেয়া, ওর মুখটাই শুধু রোদে পুড়ে পুড়ে কালো হয়েছে, বুকটা হয়নি। ওর বুকটা এখনো ধবধবে ফরসা!

না হয় তাই। তাতে হলটা কী?

'শ্রী' বললে, হলটা কী জানিস? মনে হল, ওকে যদি কেউ ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে, তাহলে দেখা যাবে, ওর মতো মানুষ আর হয় না!

কেয়া বলে উঠল, তা তুই-ই দেখ্ না। ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনতে পারিস কিনা।

আহা! আমি কী করে পারব? আমি কি ওর সঙ্গে মিশি?

ছেলেবেলায় তো মিশতিস?

ছেলেবেলার কথা ছেড়ে দে। বাপ-মা-মরা ছেলে দেখে মায়া হত!

আর এখন? এখন মায়া হয় না? হয়, স্বীকার করতে চাস না।

'ছিবি' বললে, ওসব কথা ছাড়। তুই-ই ওকে ফেরাতে পারিস। একমাত্র তুই। সেজন্যই কথাটা তোকে বললাম। ও তোকে ভালোবাসে — একমাত্র তোকেই ভালোবাসে।

'কেয়া'র মতো মুখরা মেয়েও এ-কথার জবাব দিতে পারে না, চোখের জল গোপন করে 'শ্রী'র কাছ থেকে সরে আসে। বাড়ি যায় না, জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করে, কথাগুলো তার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। তার বয়েস অল্প হতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতা কম নয়। বাঁকার সঙ্গে মিশে তার অভিজ্ঞতা কি কম হয়েছে? কিন্তু একে যে পুতুল-খেলা বলে, ভালোবাসা বলে না। একথা কী করে বোঝাবে সে শ্রীমতীকে। 'ছিবি' কতটুকু জানে তার ও বাঁকার সম্বন্ধে? মনে মনে কেয়া বলতে থাকে শ্রীমতীর উদ্দেশে · মুখপুড়ি, তুই গিয়ে ভালোবাস। তোর রূপ নির্লজ্জের মতো দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে, তুই গিয়ে ওকে রূপের ঝলক দেখিয়ে বশ কর। করে, কেমন তুই ওকে ফেরাতে পারিস দেখব। আর না পারিস তো, তুই মরবি — মরবি — মরবি!

কিন্তু এততেও ক্ষোভ মিটল না, আর একদিন দুপুরে ওকে ওপার থেকে এপারে স্নানের ঘাটে ডেকে আনল কেয়া। সেদিনও ঘাটে তারা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। মনের জ্বালায় শ্রীর সঙ্গে ইচ্ছে করে কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল কেয়া। প্রসঙ্গ ছিল ঐ এক — বাঁকাকেষ্ট। কেয়া বলে উঠল, তোর তো শরীরে রূপের গাঙে রূপ ভেসে যাচ্ছে, তুই-ই যা না একদিন ওর কাছে, দেখ্ না রূপ দিয়ে ওকে ভোলাতে পারিস কি না। ছেনালীতে তুই-ও কম যাবি না।

কী বললি! আমি ছেনাল! তোর মতো।

তোর মতো মানে। আমার সম্বন্ধে কী জানিস— কতটুকু জানিস!

রাগের মাথায় শ্রীমতীও বলে ওঠে, সবটুকু জানি। গাঁয়ের লোকেরাও জানে। ভয়ে লোকে কিছু বলে না তাই। ছেনাল মেয়ে বেহায়া — মেয়ে। অন্যাকে 'ছেনাল' বলতে তোর মুখ খসে যায় না!

কেয়া ক্ষেপে যায়, বলে, তুই বেহায়া — তুই ছেনাল! লুকিয়ে লুকিয়ে ওর চান করা দেখিস, লুকিয়ে লুকিয়ে ওর সঙ্গে প্রেম করিস — আমি জানি না কিছু — বুঝি না কিছু!

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় শ্রীমতী, তারপরে চাপা গলায় বলে, কী বললি! আমি প্রেম করি! ওরে! আমি প্রেম করলে ঠিক ওকে ভালোর দিকে নিয়ে আসতুম!

কেয়া চিৎকার করে বললে, তা নিয়ে আয় না! ছেনাল মাগী! বেহায়া মাগী! আমাকে ছেনাল বলা — বেহায়া বলা! এমন অপমান! ওকে যদি বলে দেই, তাহলে তোর অবস্থা কী হবে জানিস!

যা যা বল্‌গে যা তোর পেয়ারের লোককে! না হয় আমাকে মেরে ফেলবে! এই তো! এর বেশি কিছু তো নয়! ওরে ওর হাতে তোর মত হামলে পড়ার চেয়ে মরণও ভালো!

তাই মর তুই! মুখপুড়ি -- হতচ্ছাড়ি -- বেহায়া মেয়ে! এর শোধ যদি না নেই তো আমার নাম 'কেয়া' নয়!

বলতে বলতে দুমদাম পা ফেলে কেয়া চলে গেল। কলসি হাতে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল শ্রীমতী, তার পরে জলে নেমে কয়েকটা ডুব দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

সেই সময়, ঠিক সেই সময় কী কারণে কে জানে, দিনমানে বাঁকাকেষ্ট গাঁয়ে আসছিল, বাড়িতে পিসিমার হাতে রাঁধা ভাত খাচ্ছিল, দু-একবার ক্লাবঘরে এসেও বসছিল। তার যা কাজ, বোধ হয় তারই জের টেনে তাকে দিনকয়েক আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছিল। তখনো ঠিক দুপুর হয়নি, সূর্য মাথার ওপরে আসেনি, ক্লাবঘরে বসে দুই সাঙাতের সঙ্গে কথা বলছিল বাঁকাকেষ্ট, সামনে একটা বোতল খোলা, এমন সময় হন হন করে এসে ঢুকল কেয়া। এমন সে কখনো করে না, না ডাকলে সে কখনো আসে না, তাই তাকে আসতে দেখে শুধু সাঙাতরা কেন, বাঁকাও অবাক হয়ে গেল।

কী রে! তুই!

কেয়ার চোখে জল। বললে, আমাকে অপমান করেছে!

কে?

'ছিরি।'

'ছিরি' কে? ও, সেই ডবকা মেয়েটা! যার বাপ বাজারে যায় তরি তরকারি বিক্রি করতে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ — সেই! তুমি তাকে খুব চেন — ছোটবেলায় খুব দেখেছ!

তা, ঘ্যানঘ্যান না করে কী সে করেছে বল্‌ না! এমন খাণ্ডারনী হয়ে অসময়ে ছুটে এলি কেন?

কেয়া কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার আর লজ্জা কী! আমার আর আব্রু কী! আমাকে 'ছেনাল' বলেছে! আমি যে তোমার কাছে আসি, তা নিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে, আমাকে 'কলঙ্ক' দিয়েছে, 'বেহায়া' বলেছে, 'ছেনাল' বলেছে! তোমাকে নিয়েই কথা! তুমি সহ্য করবে?

'না-করব না' — বলে উঠে দাঁড়াল বাঁকাকেষ্ট, তার চোয়ালটা শক্ত দেখাচ্ছে, চোখদুটো আরক্তিম, বললে, ও কোথায় রে!

পুকুরে। ওদের নিজেদের ঘাটে বাসন মাজছে!

দেখছি! বলে এগোতে গিয়ে বাঁকার পা লেগে মদের বোতলটা গড়িয়ে পড়ল। বোতলে যেটুকু মদ অবশিষ্ট ছিল, তা গড়িয়ে মেঝেতে পড়ল। কিন্তু তাতে ও ভ্রূক্ষেপ করল না, হন হন করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। একবারে সোজা চলে এল 'শ্রী'দের ঘাটে, শ্রী সেখানে বসে তখনো বাসন মাজছিল। ওপারে বাঁধাঘাটে তখন অনেকেই স্নান করছিল, পুকুর পাড়ের বাগানে একটা রাখাল গরু চরাচ্ছিল। এমন কি জানালা দিয়ে ওকে সাকরেদ দুটিকে নিয়ে অমন করে ছুটে আসতে দেখে 'ছিরি'র মা-ও ঘরের কাজ ফেলে ঘাটের দিকে ছুটে আসছিল।

কিন্তু তিনি আসবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। মেয়েতে-বাঁকাতে কী কথা হয়েছিল তিনি জানেন না, তিনি আসতে আসতে দেখলেন, মেয়ের গলা টিপে ধরেছে বাঁকা। তিনি যখন ঘাটের কাছে এলেন, তখন মেয়ে পড়ে আছে নিচে, উপুড় হয়ে। অর্ধেক দেহ তাব মাটিতে, অর্ধেক জলে।

কী হল গো কী হল! — মা চিৎকাব কবে উঠলেন, আমাব মেয়েব কী হল!

রুখে দাঁড়াল বাঁকা, চেঁচিয়ে উঠল, খববদার! চিল্লালে একেবাবে শেষ কবে দেব। কেউ যদি এ-ব্যাপার নিয়ে টুঁ শব্দ কবে, তাহলে আর রক্ষে নেই। লাশ পড়ে থাকবে!

সবাই শুনল ওর কথা। ছিরির মা শুনল, বাখালটা শুনল, ঘাটে অতগুলো লোক চান কবছিল, তারা শুনল। আতঙ্কে কেউ 'রা' কাড়ল না। তাব সাঙাৎবা তো করবেই না, কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা তাব তথাকথিত প্রণয়িণী কেযাও না। বীবদর্পে পা ফেলে তাঁর ক্লাবঘবে ফিবে গেলেন বাঁকাকেষ্ট।

যথাসময়ে গাঁয়ের চৌকিদার মারফৎ খববটা পেলেন রামাই দাবোগা। পাত্রমিত্রবা তখনো তাঁকে ঘিরে বসে ছিল। আসছিল চা আর আলুর চপ। অনেক দিন পবে থানায একটা 'বড কাজ'-এব খবব এসেছে, থানার বড়বাবুর তো নড়েচড়ে বসা উচিত। কিন্তু তিনি তা কবলেন না। ডেকে পাঠালেন সেকেণ্ড অফিসার প্রদ্যোৎবাবুকে, বললেন, যান মশাই, তদন্তটদন্ত করে আসুন, লাশ চালান দিন, ডাক্তার থেকে মর্গ, সব ঝামেলাই আজ পোযান দেখি আপনি. ইযাং ম্যান, আব হ্যাঁ, সাক্ষীদের এজাহাব নিতে ভুলবেন না, 'খুন' এব ব্যাপাবে ওটাই আসল জিনিস।

প্রদ্যোৎবাবু 'জো হুকুম' বলে যথাবীতি পুলিশী সম্মান জানিযে চলে গেলেন। বামাই দারোগা পাত্রমিত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আকাশ মেঘলা-মেঘলা— দিনটা বেশ জমেছিল মশাই! 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্য সাযুং'— কী বলেন? অ্যাঁ। 'বপ্রক্রীড়াপবিণত গজং প্রেক্ষণীয়ং, দদর্শ — তাই না?

'তাঁরা' বললেন, হ্যাঁ, তা বটেই তো, তা বটেই তো।

বড়বাবু 'কালিদাস' থেকে মনটাকে সামান্য একটু সবিয়ে বলে উঠলেন, এ ঠিক ঐ ব্যাটা 'বাঁকাকেষ্ট'র কাজ। কী বলেন?

দারুশিল্পীটি এবার মুখ খুললেন, বললেন, চৌকিদার তার নাম বলেছে কি?

রামাই বললেন, কী কবে বলবে? সে তো কিছু চোখে দেখেনি।

কারুশিল্পীটি বললেন, অন্য কেউ।

বামাই বললেন, সেই খবরই তো আনতে পাঠালুম। প্রদ্যোৎবাবু খুব উৎসাহী মানুষ, ও ঠিক খবব বার করে আনবে।

কিন্তু দিনেব শেষে সব কাজ মিটিয়ে প্রদ্যোৎবাবু ফিরে এসে বললেন, এক ব্যাটা সাক্ষীও পাওয়া গেল না। কেউ কিছু দেখেনি। ওর মা-ও না।

বাপ?

তিনি বাড়িতেই ছিলেন না। হাটে গিয়েছিলেন।

মা খুব কান্নাকাটি করছে তো?

তা করছে।

আপনি জেরা করেছেন?

তা করেছি। কিন্তু ঐ এক কথা। তিনি কিছু দেখেননি, মেয়ে ঘাটের ওপর মবে পড়ে আছে, এটুকু ছাড়া। ঠিক আছে। ফোরেনসিক রিপোর্ট আসুক। তারপর দেখা যাবে।

সেদিন গভীব রাত্রের তলব মতো কেয়া যখন 'যুব সংঘ'-এর ঘরে এল, তখন যথারীতি ঘরে বাঁকা ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওর কাছে গিয়ে কেয়া কেঁদে ফেলল, তুমি একী করলে!

কী করলুম! আমি তো ওখানে ছিলুমই না! কেউ আমাকে দেখেনি। তুই-ও না। পুলিশকে তো তোরা এই কথাই বলেছিস।

কেয়া ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, তা পুলিশকে যা বলবার বলেছি, কিন্তু তোমাকেও কি তাই বলব? তুমি তাকে একটু কড়কে দেবে, এই ভেবেছিলুম। তাকে যে একেবারে 'শেষ' করে দেবে, এ কে ভাবতে পেবেছিল?

দ্যাখ্ গোখ্‌রো সাপ নিয়ে খেলা করছিলি। সে যখন উত্যক্ত হয়ে ছোবল মারে, তখন সবটুকু বিষই ঢেলে দেয়। এটা তোব জানা উচিত ছিল।

হ্যাঁ, দোষ আমারও। আমার ওসব কথা তোমাকে বলা উচিত হয়নি। আমাকে তুমি শাস্তি দাও। বলে, সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। ওকে দুহাতে কাছে টেনে নিয়ে বাঁকা বললে, কী শাস্তি তুই চাস, বল? সে-শাস্তিই দেব।

আমাকে মেবে ফেল! অমনি কবে — দুহাতে গলা টিপে।

মুহূর্তে কেয়ার বুকের কাছ থেকে বাঁকাব হাতটা সরে যায়। মুহূর্তে উন্মনা হয সে! ঠিক সেই মুহূর্তটিকে মনে পড়ে। ছোটবেলায তো ওকে 'বুড়ি' বলে সবাই ডাকত, ও-ও ডাকত। সেই বুড়ি কবে শ্রীমতী হল, 'শ্রী' হল, 'ছিবি' হল, কে জানে। তার গলায় হাত দিতে সে অবশ্যই বুঝতে পেরেছিল বাঁকা তাকে কী করতে যাচ্ছে, কিন্তু সে গলায হাত দিতেই — তাব ছোঁয়া পেয়ে — মেয়েটা যেন কেমন হয়ে গেল, দুটি চোখ বুজে ফেলল, নিজেব হাত দুটো শিথিল করে দিল, দুটি হাত দিয়ে সে প্রতিরোধও করল না। তাতে বাঁকাব মাথায আবও যেন খুন চড়ে গেল! একটা টিয়ে পাখিকে টিপে মারাব মতন কবে সে 'ওকে' শেষ করে দিল।

ওকে উন্মনা দেখে কেয়া একটু অবাক হয়েছিল, ওব মুখেব দিকে তাকিযে বললে, কী তুমি কবলে বলো তো? 'ছিরি' তোমাকে মনে মনে ভীষণ ভালোবাসত। তোমাকে একদিন পুকুবে চান কবতে দেখে আমাকে কী বলেছিল জান? বলছিল, বোদে পুড়ে পুড়ে ওর মুখটা কালো হযেছে, কিন্তু বুকেব কাছটা ঠিক আগের মতোই ফব্‌সা আছে। ওকে যদি ভালোর দিকে ফেরানো যায তাহলে দেখবি ও এক নতুন মানুষ হয়ে উঠবে।

বাঁকা এবার অবাক হয়ে কেয়ার মুখেব দিকে তাকাল, ফিসফিস কবে বলাব মতো সুরে বলল, তুই কি হিংসে করতিস, নারে। সত্যি করে বল।

দু-হাতে মুখ ঢাকল কেয়া, তারপর কান্নাভবা গলায় বলতে লাগল, হ্যাঁ, হিংসে করতুম। হিংসে করতুম ওব রূপকে। হিংসে কবতুম ওব মনটাকে! ও তোমাকে ভালো করতে চাইত, অন্ধকারকে আলো করতে চাইত!

এর উত্তরে অবাক-করা গলায় বাঁকা বললে, তোকে আজ ছেড়ে দিচ্ছি। তুই বাড়ি যা। রোজ অন্ধকারে যাস, আজ যেতে হবে না, ঐ টর্চটা নিয়ে যা।

স্তম্ভিত হয়ে গেল কেয়া। বললে, সত্যি বলছ! বাড়ি যাব!

হ্যাঁ।

আর কখনো আসব না?

বাঁকা খেঁকিয়ে উঠল, কখনও আসবি না কে বলছে! যখন ডাকব, তখনি আসবি। কিন্তু আজ তুই যা। আর কিছু ভালো লাগছে না।

এক মুহূর্ত চুপ কবে ওব দিকে তাকিযে থেকে কেয়া বললে, ঐ আলমাবিতে বোতল আছে না? ওটা নিযে এসে খেতে আরম্ভ কব।

বাঁকা উঠে বসে প্রচণ্ড বাগে চিৎকার করে উঠল, হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই খেতে আরম্ভ কবব। তুই ভেবেছিস কীরে শালী? আমি ওটা খাব না তো কী, জঙ্গলে গিয়ে গলায দড়ি দেব! যা ভাগ —নইলে এক লাথি মেরে দরজার বাইরে বাব করে দেব! পা — লা!

কেয়া আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এল। টর্চটা সে নিল না। রোজ যেমন অন্ধকাবেই সে ফিরে যায়, তেমনি ফিরে যেতে লাগল।

সেদিন থেকে দেখা গেল বাঁকা আব বড় গাঁযের বাইরে যাচ্ছে না। যদি বাব হয, তো, খানিক পরেই ফিরে আসে। সাইকেলটা বাড়িতে বেখে। হ্যাঁ সে কখনো ক্লাব ঘরে আসে, কখনো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কেন, কে জানে। এবা অন্ধকাব জগতের মানুষ, এদেব বোঝা শক্ত, এদের গতিবিধি বোঝা আরও শক্ত। গাঁযে সে রাতেও থাকে, বিশেষ করে বাত একটু বেশি হলে সে ফিরে আসেই। ক্লাবেও যায়, কিন্তু আজকাল আব কেয়াকেও সে ডাক দেয় না। কেয়া বাড়িতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে বাঁচে। গভীর রাতে বাঁকা এখন কী কবে, কোথায় যায়, কেয়া তার খোঁজ বাখতে পারে না।

কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে যায়। ভোরে উঠে গাঁয়ের লোকেবা দেখে, পুলিশে পুলিশে গাঁ একেবাবে ছেয়ে গেছে। বিশেষ করে জঙ্গলের গভীবে। পুলিশেব ভিড় জঙ্গলেব দিকেই বেশি। গাঁয়ের এ-কান থেকে সে-কানে কথাটা দেখতে দেখতে বটে যায়, বাঁকা নাকি গলায় দড়ি দিয়েছে। একটা বড় আমগাছের ডালে তার দেহটা ঝুলছে!

আর যাবে কোথায়! দলে দলে লোক ছুটল জঙ্গলে। একটা গাছকে ঘিরে চাবদিকে পুলিশ দাঁড়িয়ে। গাছটার কাছে কাউকে যেতে দিচ্ছে না পুলিশ! দূব থেকে ঝুলন্ত দেহটা দেখা যায়, সেই জামা, সেই প্যান্ট, খানিকটা পাতাব আড়ালে হলেও মুখখানা চেনা যায়।

মানুষ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। যে-লোকটা তাদেব সবার টুঁটি টিপে ধবেছিল, সে আজ তাদেব মুক্তি দিয়েছে! তাবা এ-যাবৎ যেন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পাবেনি। চেঁচিযে সুখ দুঃখেব কথাও কইতে পাবেনি। এবার দাবোগাব ডাকে সবাই তাব কাছে একে একে জড়ো হল। আজ বামাই দাবোগা নিজে এসেছে এজাহার নিতে। আজ আর ভয নেই, আতঙ্ক নেই। সবাই এজাহাব দিল, সবাই সেই এজাহারে সই কবল। এমনকি সবার আগে কাগজে সই করতে যে এগিযে এল, সে কেয়া। তারপরে এগিযে এল শ্রীমতীব মা, সেই বাখালটা, সেদিন স্নান করতে নামা সেই সব মানুষ। এবা সবাই সাক্ষী, এবা সবাই প্রত্যক্ষদর্শী। কে একজন বুড়ো মতন লোক বললে, আর সাক্ষ্য নিয়ে হবে কী, যাকে ঝোলাচ্ছ, সে তো নিজেই ঝুলে পড়েছে! এ কেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়া! পাপের বেতন মৃত্যু, এ-তো জানা কথা! খুন, রাহাজানি, চোরাচালান, কী ও করেনি? ভয়ে, আতঙ্কে লোকে টুঁ শব্দটি করত না! এমন কি ঐ মেয়েটাকে দেখলেন তো? ভযে ও কিছু বলত না, ছোঁড়া যা বলত, ও শুনতে বাধ্য হত। ঐটুকু মেয়ে কীভাবে ইজ্জৎ লুটিয়ে দিত, তা তো ও নিজেব মুখেই বলল, দেখলেন তো দাবোগাবাবু?

রামাই দাবোগা বললে, তা তো সব দেখলুম আব জানলুম, আব লিখেও নিলুম, দবখাস্তও নিলুম। যে লোক নিজে ঝুলেছে, তাকে আবাব ঝুলিযে কী হবে জিজ্ঞাসা কবলেন না? মশাই, এ সব হচ্ছে বেকর্ড — থানায় রাখতে হয — কাগজেও দিতে হয — নইলে লোকে জানবে কী কবে?

তা বটে।

এবার আপনাবা পাতলা হন, আমাদেব কাজ কবতে দিন।

দেখতে দেখতে গ্রামের লোক সরে গেল। বামাই দাবোগা এবাব প্রদ্যোৎবাবুকে ডেকে পাঠালেন। তিনি জিপ নিয়ে ছুটে এসে বললেন — কী শুনছি স্যাব, বাঁকাকেষ্ট নাকি নিজেই গলায় দড়ি দিয়েছে?

রামাই দাবোগা বললেন, তা তো গ্রামের সবাই দেখেছেন, আমার শিল্পী ও কবি বন্ধুরাও দেখেছেন। ঐ দেখুন, গাড়ি ভর্তি করে ওঁরাও আমার সঙ্গে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন? দুর্ভিক্ষেব ডাকে প্রজাদের কাছে ছুটেছেন রাজা, কবি এসে বললেন, আমিও যাব। রাজা বললেন, কাজের মধ্যে আপনি গিয়ে কী করবেন? কবি বললেন, কাজের মধ্যে —'অ-কাজের লোক' -এবও দবকার হয়। তাবা গিয়ে সুর বেঁধে দেয়।

তাঁর সভাসদদের দিকে ফিরে বামাই বললেন, কেমন তাই না?

তাঁবা বললেন, হ্যাঁ, তা বটেই তো — তা বটেই তো!

একটু অবাক হয়ে প্রদ্যোৎবাবু বললেন, ঠিক বুঝলুম না সার।

দারোগা এবাব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, প্রদ্যোৎবাবু আসল সাক্ষীদের সব সাক্ষ্য নেওয়া হয়ে গেছে, এবার বাছাধন যাবে কোথায়? আপনি আপনার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে এখুনি শহরে ছুটে যান, সেখানে 'বলাকা' বেস্টুবেণ্টে গিয়ে হানা দিন। আমাদের সাদা পোশাকের দল সেখানে রয়েছে, বাছাধন পালাতে পারবে না, এখুনি গিয়ে অ্যারেস্ট করুন?

কাকে?

খুনীকে।

খুনী কে?

বামাই বললেন, কে আবাব। 'বাঁকাকেষ্ট', ওবফে 'বাঁকা', ওবফে 'অহীভূষণ'।

অবাক হয়ে দূবেব আম গাছটা দেখিয়ে প্রদ্যোৎবাবু বললেন, সেতো ঐ ঝুলছে'

বামাই বললেন, না, সে ঝুলছে না, ঝুলছে তাব ডামি। ঐ আমাদেব কাকশিল্পীব অবদান। মাটিব তৈবি কিন্তু অবিকল আসল 'বাঁকাকেষ্ট'। ওটি দেখিয়েই গাঁয়ের লোকের মুখ খুলিয়েছি। আব একবাব খুলিয়েছি যখন তখন আব মুখ বন্ধ হবে না। আপনি যান। এবাব বুঝলেন তো, থানায বসে এঁদেব নিয়ে 'হো-হো-হা-হা' কেন কবি? কাজেব মধ্যে 'অ কাজ'-এব লোকেবও দবকাব হয, মাঝে মাঝে।

একসূত্রে বাঁধা

শক্তিপদ রাজগুরু

হুড়মুড় করে এসে ছেলেটা একরকম আছড়েই পড়ল ঘবেব মধ্যে। কাঁধে একবাশ গামছার মোট, হাতে একখানা নোতুন গামছা দলামোছা করে জড়ানো।

হাঁপাচ্ছে ছেলেটা। ভীত চকিত চাহনি মেলে এদিক ওদিক দেখছে বাস্তাব পানে চেয়ে। হল্লাব গাড়ী থেকে জনকযেক লোক নেমে ফিরিওয়ালাদেব যাকে পাচ্ছে জামার কলার হাত ঘাড় ধরে টেনে তুলছে। আবও দুচারজন যাবা তাব মত সবে পড়া ফেরিওযালাদেব সন্ধান করছে। অতীন খুব যাহোক দৌড়ে সরে এসেছে আজ।

ধরা পড়লেই বিপদ হতো। চল থানায কোর্টে, জরিমানাও দিতে হবে।

দারোয়ানটা মুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

— বাহার যাও। রাস্তামে যাও।

অতীন কাঁচুমাচু করে বিনীতকণ্ঠে জানায়,

— বেরুলেই ধরে নিয়ে যাবে দারোয়ানজী। একটু থেকেই আমি বেব হযে যাবো।

— আভি নিকোলো।

দরকার হলে দারোযানজী ওব ঘাড় ধরেই বের কবে দেবে রাস্তায।

হঠাৎ সামনেই নোতুন গাডীখানা এসে থামল। গাড়ী থেকে বেব হযে আসেন তরুণ একটি যুবক। এই বিবাট প্রেস-পত্রিকা প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের মালিক।

মুনিবকে আসতে দেখে দারোয়ানের কর্তব্যনিষ্ঠা আবও বেড়ে যায়। গর্জে ওঠে সে,

— নিকালো।

ঠেলে বেরই করে দেবে গামছাওয়ালা ছেলেটাকে। মালিক নিমেষবাবু ছেলেটার দিকে একবার চাইলেন। তিনিও ব্যাপাবটা বুঝেছেন। ওদিকে হল্লা তখনও যায় নি। বেব হলেই ধবা পড়বে বেচারা।

বলে উঠেন নিমেষবাবু,

— থাক। ওকে একটু থাকতে দাও। পরে যাবে ও।

দারোয়ান থমকে দাঁড়াল। ছেলেটাও অবাক হয়। একটু ঘাবড়ে যায।

বৈশাখের দুপুর। চারিদিকে কড়া রোদে পিচ পর্যন্ত গলে গেছে, তাপ উঠছে। ছেলেটা একরকম রোদে রোদেই গামছা ফিরি করছিল।

ঘামে নেয়ে উঠেছে। তারপরেই ওকে দৌড় দিতে হয়েছে। ভযে উত্তেজনায় তার গলা শুকিয়ে গেছে।

দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই।

নিমেষবাবু গাড়ী থেকে নেমে নিজের ঘরে যাবাব মুখে বাইণ্ডিং সেক্‌শনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। ওপাশে কোন কর্মচারীর বসবাব একটা টুল। তাতেই বসে বলে চলেছেন,

— কি রে যদু, ভাল করে ছাঁট ফর্মাগুলো। কালকের লটে দেখলাম অনেক বাদ রয়ে গেছে।

যদু মুখ কাঁচুমাচু করে শরীরটা কাল ভালো ছিল না।

আজও তো ভাল দেখছি না। ছুটি নিয়ে যা — মাইনেপত্র পাবি। দুচারদিন ছুটি নিয়ে ভালো হয়ে আয়।

কে এক গ্লাস জল এনে দিয়েছে নিমেষবাবুকে। জলটা খেতে গিয়ে হঠাৎ তা'র চোখ পড়ে ওই গামছাওয়ালা ছেলেটার দিকে। কেমন সতৃষ্ণ চাহনিতে চেয়ে আছে এই দিকেই।

ছেলেটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে চোখ নামাল। এমন করে চেয়ে থাকাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি তার। নিমেষবাবুই জিজ্ঞাসা করেন।

— জল খাবি?

খুব তৃষ্ণার্ত সে। জিব শুকিয়ে আসছে। সারা শরীরে ঘাম বইছে। মাথা নাড়ে অতীন।

ওকে এক গ্লাস জল দে মধু। আয় গামছাগুলো নামা। জল খেয়ে একটু বস।

ছেলেটা অবাক হয়েছে।

অনেক লোককেই দেখেছে। বড় লোক গাড়ীওয়ালা আদমীদের জানে সে। তোয়ালে না হয় একটা গামছা কিনে মুখের উপর অর্ধেক দাম দিয়ে গাড়ী নিয়ে বের হয়ে যায় — পিছু পিছু কাঁচুমাচু করে গেলে তবে হয়তো বাকী দামটা নেহাৎ তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়ে দেয় রাস্তার উপরে।

জলটা খেয়ে একটু শান্ত হয় অতীন।

— কদ্দিন ব্যবসা করছিস?

অতীন নিমেষবাবুর দিকে চাইল, পাঁচজনের মত আশা করেছিল সেও পড়বে, পাশ করে মানুষ হবে। কাজকর্ম করবে।

কিন্তু তা হয়নি। বাবা মারা যাবার পর থেকেই সাধারণ বাঙ্গালী সংসারের মত তার উপরই সব দায় দায়িত্ব এসে পড়ল, পড়াশোনা আর হ'ল না। ছোট দুটো ভাই, একটি বোন আর বিধবা মা— তাদের মুখের অন্ন যোগাতে হবে। অন্য কোন পথ আর পায়নি।

কারখানাতেই ঢুকেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে পায়ে চোট লাগে — বসে রইল বেশ কিছুদিন। মাইনেপত্র নেই, সংসারের সেই অভাবের কালো ছায়াটা গাঢ়তর হয়ে ওঠে।

শেষকালে সামান্য কিছু সঞ্চয় ভেবে এই পথ নিল অতীন। রাস্তায় রাস্তায় গামছা ফিরি করে। অতীন জবাব দেয়,

— মাস ছয়েক হ'ল। বাড়ীতে মা — দুটি ভাই —বোন।

হাসল নিমেষবাবু — সবই আছে। নেই কেবল মা লক্ষ্মী, না রে! তা এতে চলে?

চুপ করে থাকে অতীন।

কি করে চলে তা আর বোঝাতে পারে না সে। কোনদিন একবেলা জোটে, কোনদিন তাও পুরোপেট জোটে না। মহাজনদের দেনা মিটিয়ে থাকে না বিশেষ কিছু। বিবেকানন্দ রোড থেকে বৌবাজারের মোড় অবধি বার দুয়েক টহল দেওয়াই হয়। বলে অতীন,

— তবু স্বাধীন ব্যবসা, যদি কোনদিন দাঁড়াতে পারি।

নিমেষবাবু ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকেন — এত হতাশা ক্লান্তির মাঝেও ওর কণ্ঠে একটা আশার সুর জাগে। সেই সুরটা নিমেষবাবুর মনে লেগেছে।

নিজের জীবনেরই যেন এটা মূলকথা।

সামান্য অবস্থা থেকে নিমেষবাবু এত উপরে উঠেছেন। নিজে আজ এতবড় প্রেসের মালিক, দোকানও বেশ চালু, তাছাড়া নিজেই একটা পত্রিকা করেছিলেন নেহাৎ খেয়াল বশেই।

জীবনে একটা কথায় তিনি বিশ্বাস করেন — নিজে কাউকে ঠকাবেন না, সেটা কঠিনভাবে মেনে চলেন, তাই দেখেছেন তিনিও কোথায় ঠকেন নি। মাঝে মাঝে নানা বিপদ কষ্টও এসেছে। এসেছে নানাদিক থেকে আঘাত। তবুও তিনি আবার দাঁড়িয়েছেন।

ছেলেটার কথায় তাঁর সেই স্বপ্নের রেশই ধ্বনিত হয়,

— দোকান টোকান নে! রাস্তায় কতদিন ঘুরবি!

ছেলেটির কাছে ওটা একটা স্বপ্নই, চিরদিনের স্বপ্ন। কিন্তু কোত্থেকে দোকান করবে সে। সামান্য তার পুঁজি। জবাব দেয়,

— সে তো অনেক টাকার ব্যাপার, ঘর জোগাড় করাই তো দায়। ঘর না হোক, কারও বাড়ীর একটু রক্ পেলেও হয়, তাও বলে পাঁচশো টাকা সেলামী লাগবে। কোত্থেকে দিই। তাই পথে পথেই ঘুরছি। হঠাৎ বলে ছেলেটা,

— গামছা লাগবে স্যার! বাঁকুড়া ধনেখালি সন্তোষপুরের মুখপাত গামছা আছে। তোয়ালে—

হাসতে থাকেন নিমেষবাবু প্রাণখোলা হাসি।

— আমার কাছেই ব্যবসা শুরু করলি যে রে? বেশতো চালু তুই। তা দে দুজোড়া গামছা। ভাল দেখে দিবি কিন্তু আর গলা কাটিস না।

অতীন নায্য দামেই গামছা দুজোড়া বের কবে দেয়। দামটা নিয়ে একটা নমস্কার জানিয়ে পথে নামবার আগে বলে,

দরকার হলে বলবেন বাবু, তোয়ালে গামছা। আমি মাঝে মাঝে খোঁজ নোব।

দেখাদেখি প্রেসেব — দোকানেব দুচার জন কর্মচারীও কিছু মালপত্র নেয়। অতীন খুশী মনেই বের হয়ে এল। নিমেষবাবু তখনও হাসছেন।

বেশ চালু ছেলে তো? একেবারে বাণিজ্য করে চলে গেল।

অতীনের সাহস একটু বেড়েছে। পথে পথে পরিক্রমা কবে নানা ধবনের মানুষ দেখেছে সে। এ যেন তাদের থেকে বিচিত্র ধাতেব। মাঝে মাঝে প্রেসে যায়। হঠাৎ সেদিন গিয়ে দেখে নিমেষবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘুবছেন।

বিরাট বিরাট কয়েক স্তূপ পত্রিকা ছাপা হয়ে এসেছে।

বিভিন্ন জায়গায় যাবে সেগুলো, দেবী হযে যাচ্ছে। লোকজন আসে নি বিশেষ।

অতীন বলে, আমি হাত লাগাবো স্যার!

— পারবি!

হাসে অতীন, গামছা বাঁধা অভ্যেস আছে, দেখি নিশ্চয়ই পারবো। অতীন অন্য কয়েকজনের সঙ্গে প্যাকেট করে বাঁধতে থাকে, বেশ চালু হাত। নিমেষবাবু ওর চটপট পরিষ্কাব কাজ দেখে অবাক হন।

ছেলেটা বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছে, শুধু তাই নয়, প্রেস দপ্তরীখানার কযেকজন লোককেও সেই সঙ্গে কাজ করিয়ে নিয়ে চলেছে।

জামাটা খুলে গামছার মোটের উপর রাখা পরনের কাপড়খানা সামলে নিয়ে কাজ কবে চলে।

— পাঁচখানার প্যাকেট আলাদা রাখো, ওদিকে দশখানার প্যাকেট।

শক্ত করে বাঁধন দে মতি, নাহলে আল্‌গে যাবে।

রাশিরাশি পত্রিকা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্যাকেটজাত হয়ে যায়, একটু বিশ্রাম।

এরপর আর এক টাল মাল আসবে।

নিমেষবাবু নিজে থেকেই ওদের জন্য ভাল ডিমের মামলেট রুটি আর চায়ের ব্যবস্থা করেছেন, নিজেও গেঞ্জি গায়ে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে চা মামলেট খেতে থাকেন।

হ্যাঁরে অতে, আজ বাণিজ্যে যাবি না? সারাদিন তো প্যাকেট বাঁধছিস্ —

অতীন হাসে — একটা দিন না হয় ছুটিই নিলাম বড়বাবু।

প্রেস — দোকানের সকলেই ওই নামেই ডাকে নিমেষবাবুকে। অতীনও সেই নামটাই ব্যবহার করে।

— খা চাটা খেয়ে নে। যাবার আগে আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবি অতে।

নোতুন মাল এসে গেছে। ওরা কাগজ দড়ি নিয়ে আবার বাঁধতে বসে।

রাত্রি হয়ে গেছে, রাশিকৃত প্যাকেটের দিকে চেয়ে খুশী হয় নিমেষবাবু, ছেলেটা না এসে লাগলে সব মাল পড়ে থাকতো। মেলিংও হতো না। রাশিরাশি টাকা লোকসান হয়ে যেতো। ছেলেটা কাজের।

প্রথম দিনেই লেবেল শ্লিপ ঠিকমত লাগিয়ে এতবড় কাজটাকে স্রেফ হাকাহাঁকি করেই তুলে দিল।

হাত পা ধুয়ে অতীন জামাটা গায়ে দিয়ে গামছার মোট তুলে নিযে বের হবার আয়োজন কবছে। ওর মনেও খুশীর সাড়া।

তবু একজনের একটা উপকাব করতে পেরেছে। নিমেষবাবু ওব হাতে তুলে দেন দশটাকার একটি নোট। অবাক হয় অতীন।

— আজ্ঞে!

হাসেন নিমেষবাবু, নে। বাড়ীতে তো কিছু দিতে হবে।

— টাকা নোব? অবাক হয় অতীন।

নিমেষবাবু জবাব দেন।

— দোষ কি! আমার এতগুলো টাকা বেঁচে গেল, ঠিক তাবিখে বই বেরুল। এর দাম তো অনেক। পরে দেখা করিস। কাল পরশু!

অতীন কোনরকমে টাকাটা পকেটে নিয়ে বেব হয়ে এল। মনেব মধ্যে একটা তবু কাঁটার মত বেঁধে। টাকার তারও দরকাব।

চাল ডাল তবকাবীও কিনতে হবে। নইলে কাল সকালেই সংসাব অচল হয়ে যাবে। তাই হাত পেতে টাকাটা নিয়েছে — নিতে বাধ্য হযেছে। নইলে নেবাব ইচ্ছে তার ছিল না।

কথাটা বলেন নিমেষবাবুই।

প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি অতীন। সে এতকাল এই স্বপ্ন দেখেছে। ছোট্ট একটা দোকান হবে তার নিজস্ব। বেশ জানে সে একটু পায়ের নীচে মাটি পেলে সে দাঁড়াতে পারবেই।

নিমেষবাবু বলেন ঃ আমার রকের ওপাশে একটু জায়গা কাঠ দিয়ে ঘিরে দিচ্ছি। ওখানেই দোকান কর্ তুই। গামছা লুঙ্গি তোয়ালে এইসব রাখবি।

সদর রাস্তার উপরেই একখানি দোকান দেবে সে। অতীন কথাটা যেন বিশ্বাস করতেই পারে না। নেহাৎ বড়বাবু — বলছেন তা চুপ করে শোনে সে তবু বলে,

— সে তো অনেক টাকা লাগবে বাবু, মালপত্র কিনতে হবে।

হাসেন নিমেষবাবু, ঠিক আছে, আড়াইশো টাকা দোব, মালপত্র কেন, টাকা শোধ দিয়ে দিবি।

— সত্যি। চমকে ওঠে অতীন, বলে — তবে ঘরভাড়াও নিতে হবে বড়বাবু!

বড়বাবু হাসতে থাকেন।

— জ্ঞান তো টনটনে রে অতে। ভাড়াটে হতে চাস। যাতে উচ্ছেদ করতে না পারি? এ্যাঁ।

অতীন মাথা চুলকোতে থাকে। নিমেষবাবু বলেন — ঠিক আছে, তুই দশটাকা ভাড়া দিবি মাস মাস। রসিদ দেবেন সবকার মশাই, বলে দোব।

অতীন খুশীভরে বড়বাবুর পাযের ধুলোই নিযে বসে। বিব্রত হন নিমেষবাবু, আবে ছাড় ছাড়, পা ছাড় অতে। ভালো হবে না বলছি।

অতীন পাযেব নীচে মাটি পেযেছে ওই লোকটির দয়ায়। আশ্রয দিযেছে, অর্থ দিয়েছে, তাকে আর দুপুরেব খর বোদে — না হয অঝোব বৃষ্টিব মধ্যে পথে পথে ঘুবে বেশাতি করতে হবে না।

দোকানে বসে বেচাকেনা কববে। মাও খুশী হয় ছেলেব এই উন্নতিতে। বেশ ঘটা কবেই দোকান উদ্বোধন করছে অতীন।

নিজে হাওড়াব হাট থেকে দেখেশুনে মাল কিনে এনেছে, লুঙি গামছা তোযালে, আরও টুকিটাকি কি সব। মেয়েদের জামাও কিছু এনেছে।

এরই মধ্যে গোটাকতক প্যাকিং বাক্সর কাঠ দিয়ে তাক আলমাবী বানিযে নিযেছে, বাজার থেকে ছোট কলাগাছ, ঘট পূজোর জিনিষপত্রও আনে।

প্রেসের গুপী ভট্টাচার্যই বলেছে। পূজো টুজো আমিই কবে দোব অতে। ঠাকুব দেবতার নাম নিযে দোকান চালু কর।

বড়বাবুকে গিযে বলে অতীন।

— আজ বৈকালে দোকান খুলছি বডবাবু, আপনাকেই বউনি কবতে হবে। চমকে ওঠেন নিমেষবাবু, ফের গলা কাটবি অতে?

তবু নিমেষবাবুই ওব দোকানের প্রথম খদ্দেব। সওদা একজোড়া গামছা। অতীন দাম নেয় আড়াই টাকা।

হাসেন নিমেষবাবু — আড়াই টাকা! বেশী লাভ নিলি কিন্তু অতে!

অতীন টাটে বসেছে, কপালে চন্দনেব টিপ, বডবাবুর কথায় বলে, — তা বউনিব লাভ, বেশিই নিইছি বড়বাবু।

— বেশি লাভ করিস না অতে, কম লাভে বেশী বেচবি, খদ্দের আসবে।

রাস্তাব ধারে দোকান, একেবারে কলেজ স্ট্রীটেব উপরেই। অতীন কিছুদিনেব মধ্যেই বেশ জমিয়ে তুলেছে। দোকানে সন্ধ্যেব পর থেকেই খদ্দেরের ভিড় জমে।

মেয়েদেব ভিড়ই বেশী। মেয়েদের হালফ্যাশানের নানা রকম ব্লাউজ, জামা—রুমাল তো আছেই, তাছাড়া তোয়ালে গামছা লুঙিও আছে। তবে মেয়েদের জিনিষ বিক্রী কবেই লাভ বেশী।

একবার বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে তারা তো আসেই, পরিচিত মহল থেকেও অন্যান্য মেয়েরাও আসে, মালপত্র কিনে নিয়ে যায়।

অতীন তবু আশপাশের দোকান থেকে কম দামেই জিনিষপত্র বেচে।

— চার টাকা দাম।

কোনো ভদ্রমহিলা বলেন — অনেক বেশী দাম বলছেন দাদা।

— পাঁচ দোকান দেখে নিয়ে যান। দাম আমার কম।

কথাটা সত্যিই। তাই তারা ফিরে এসে নিয়ে যায়।

অতীন ছোট ভাই সতীনকে এনেও দোকানে বসায়। ছোট ভাইটা স্কুলে পড়ছে, অতীন কোনদিক থেকে তার কর্তব্যের ত্রুটি করে নি।

ভাইগুলোকে পড়াচ্ছে। সতীন ম্যাট্রিক দিয়েছে।

অনেক আশা তার ভাইকে কেন্দ্র করে, তার ছোট ভাই যতীনও সামনের বছর পরীক্ষা দেবে।

অতীন তবু বড়বাবুর কাজে আরও নিবিড় করে মিশে গেছে। কাগজ বের হবার সময় দু-তিন রাত্রি সেও প্রেসে পড়ে থাকে, রাশিরাশি পত্রিকা হৈ চৈ করে প্যাকেটবন্দী করে। লেবেল সাঁটে হিসাব মত। পূজো সংখ্যা বের হবার সময় অতীনের অবসর নেই।

এদিকে তাব দোকানেও পূজোর মরশুম পড়ে। ছোট্ট দোকানটা বড় হয়ে মালপত্রও বেশী আমদানী কবে। বেচাকেনাও হয় প্রায় ষাট-সত্তর টাকা আন্দাজ।

বাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ী থেকে খেয়ে-দেয়ে এসে বাঁধাইখানায় ঢোকে, রাশবন্দী পত্রিকা বাঁধা হচ্ছে, হাত লাগায় তাতেই। নিজেই কাটিং মেসিন চালায়। প্যাকেট করে।

নিমেষবাবুও ওদেব সঙ্গে থাকেন।

কলবব হৈ চৈ কবে অতীন কাজ কবে ওদেব সঙ্গে, ও থাকলে সকলেরই হাত চলে জোবে।

— ঢুলছিস নাকি রে মধু! দোব এক বালতি জল ঢেলে।

অতীন নিমেষবাবুর টাকা অনেক আগেই শোধ করে দিয়েছে। তবু বেশ জানে. তাব কৃতজ্ঞতাব ঋণ এ জীবনে শোধ কবতে সে পাববে না।

শশী দপ্তবী বলে,

— অতে এইবাব বিয়ে কববে বডবাবু।

বডবাবুও খালি গাযে ওদেব মাঝে একটা চেযার টেনে বসে আছেন। শশীর কথায় নিমেষবাবু অবাক হন।

অতীন চুপ করে থাকে। শশী বলে চলেছে,

—আজ্ঞে বডবাবু, লভ্ ম্যাবেজ। ওবই কোন খদ্দেব।

স্যাঁ কবে একটা প্যাকেটই ছুডে দেয অতীন শশীব দিকে। শশী ঘাডটা সবিয়ে প্যাকেটটা ধবে নিযে হাসতে থাকে।

ওকেই শুধোন না?

— কি বে অতে? লভ্ ম্যাবেজ — বডবাবু হাসি চেপে গম্ভীবকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবেন।

অতীন ওই লোকটিকে অন্তরেব থেকে সমীহ করে। মাথা চুলকে জবাব দেয। — আজ্ঞে খদ্দেব নয়, আমাব দোকানেব ব্লাউজ জামা ফ্রকট্রক সেলাই কবে বেচতে আসে! অন্য অনেক দোকানেই দেয়। খুব ভালো মেয়ে — আপনিও দেখেছেন। কালো মত কবে সেই যে আসতো।

বডবাবু দেখেছেন মেয়েটিকে।

অতীন বলে — আব একটু বাড়াবো ভাবছি। যদি বকটায আব হাত দুয়েক জাযগা দেন।

নিমেষবাবু হাসতে থাকেন।

— খুব চালু তো তুই বে! আগে বিয়ে-থা হোক. তারপব দেখা যাবে।

তবে ব্যাটা বিয়ে-থা করবি — সামলাতে পারবি তো; যা খর্চাব দিন —

অতীন বিনয়ের সঙ্গে বলে,

— আপনি তো আছেন।

কৃত্রিম কোপে চমকে ওঠেন বড়বাবু,

· ওবে হারামজাদা, নিজে বিয়ে কবে পরের ঘাড়ে চাপাবার তাল। বিয়ে করবি তুই আব ঠ্যালা সামলাতে আমরা।

হাসতে থাকে অতীন, বড়বাবুর স্বভাবের এই সহজ মধুর ভাবটা সে চিনেছে। ছাপাখানার ম্যানেজার থেকে সুরু করে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে একপবিবারে কর্তার মতই মেশেন। তাদের সুখদুঃখের তিনিও সমান শরিক।

এমনিতে তাই প্রথমদিন থেকেই লোকটিকে চিনতে দেরী হয়নি অতীনের।

বড়বাবু বলেন।

— বিয়ে করবি, ভেবে-চিন্তে দেখ অতীন। ভাইটা চাকরী পেলেই তোকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবে, মা, বোন তো আছেই, তারপব বৌ আসবে।

— তাইতো দোকানটা বাড়াতে চাইছি বড়বাবু। তাছাড়া —

অতীন বাকী কথাটা বলতে পারে না। মিনার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে তার বাধে।

মেয়েটিকে দেখেছিল প্রথম এখানেই, বাড়ীতে তৈরী কিছু ব্লাউজ বেচতে এসেছিল। চোখে-মুখে ওর অভাবের ছাযা, করুণ ডাগর দুটো চোখে নীরব বেদনার আভাস।

— কত করে ডজন?

মিনা জবাব দেয় — আঠারো টাকা। তাতেই বেশী কিছু থাকে না।

অতীন এক একটা ব্লাউজ গড়ে চার টাকা সাড়ে তিন টাকায় বেচবে। আজই কযেকটা অর্ডাব আছে। কি ভেবে আঠারো টাকা দিয়ে এক ডজনই কিনে নিয়ে বলে,

— কাল-পরশু আবও এক-দেড় ডজন দেবেন, তবে একটু হাতের কাজ যদি করা থাকে ভালো হয়। বাইশ টাকা দর দিতে পারি।

মেয়েটি কৃতজ্ঞতাভরে ওব দিকে চাইল।

কযেকদিনেব মধ্যেই দুপুবের দিকে সেই অর্ডাবটা দিযে যায মিনা। দুপুরেব বোদে বাস্তাব পিচ গলে গেছে, স্ট্রাপছেঁড়া চটিটা আটকে যায, যেন পদে পদে বাধাই পেয়েছে সে পথ চলায।

তবু আসতে হয়েছে।

— একটু বসবেন না? ঘেমে নেযে উঠেছেন যে।

মিনা একটি টুল টেনে বসল। দামটা নগদই মিটিযে দেয অতীন।

পবিচয়টা এমনি করেই গড়ে ওঠে। মিনা বলে,

তবু আপনি মালপত্র কাটান আমাব। অন্য দোকানে গেলে পথ থেকেই জবাব দেয।

অতীন জানে পথে পথে ঘোরাব বেদনা। ঘাড়ে গামছার বোঝা নিযে দীর্ঘপথ হেঁটেছে। টনটন করছে ঘাড় হাত-পা। পুলিশের তাড়া খেয়ে দৌড়েছে কতদিন প্রাণ হাতে নিয়ে।

তাই বোধহয় মিনার এই পথে পথে ঘোরাব বেদনা সে বোঝে।

একটা বস্তিবাড়ীতে থাকে। মাঝে মাঝে মালপত্র আনতে গেছে অতীন। মাল আনাটা যেন একটা উপলক্ষ্য, মাঝে মাঝে ওকে দেখতে গেছে। শান্ত একটি মেয়ে। সেলাই মেসিনেব শব্দ ওঠে।

ওকে দেখে অবাক হয়েছিল প্রথম দিন মিনা। মেসিন ছেড়ে উঠে আসে।

আপনি — কি ভাগ্যি আমার। বা এসেছেন তাহলে। আপনার অর্ডার কাল পুবো দিযে দোব।

অতীন চোখ মেলে ওর সংসারের শ্রীহীন অবস্থাটা দেখছে। বৃদ্ধ বাবা-মা আর ভাইবোন তারা। দাদা কোন একটা কারখানায চাকরী করে। মা এক কাপ চা নিযে আসে। বুড়ি বলে,

— মেয়েকে নিযেই আমার ভাবনা বাবা। কষ্টের সংসার। বড় লক্ষ্মী মেয়ে।

অতীনও ক্রমশঃ তা বুঝেছে।

মিনা মাঝে মাঝে আসে। ব্যবসা সম্বন্ধে তারও বুদ্ধি কম নেই। সে বলে, কিছু থান কাপড় কিনে দাও, সস্তায় ভাল হবে। তাছাড়া মেয়েদের রকমারী ফ্রক তৈরীর ব্যাপাবেও তার হাত ভালো। সুন্দর কাটিং।

তার দোকানের মাল অন্য দোকান থেকে আলাদা। তাই বিক্রিও ভালো।

অতীন মাথা চুলকোতে থাকে।

বড়বাবু বলেন, হিসেব করে চলবি, মেয়েটাকে বলবি গরীবের ঘর, ঠাটবাট যেন না বাড়ায়। মারা পড়বি।

অতীন স্বপ্ন দেখছে।

পূজোর বাড়তি কয়েকদিন রাত্রি কাজ করে চলেছে প্রেসে। নিমেষবাবুব পত্রিকার অসম্ভব কাটতি, পুজো সংখ্যা ছেপে শেষ করতে পারে না তারা।

দপ্তরীখানা — মেইলিং — লেবেল লাগানো কঠিন ব্যাপার।

অতীন ছোট ভাইটাকেও লাগিয়েছে, নিজেও খেটে চলেছে। জানে নিমেষবাবুব কাজ তাবই কাজ। এটা শেষ করা তার কর্তব্য।

এরই মধ্যে কাণ্ডটা ঘটে যায়।

এতদিন ব্যবসা করছে অতীন, এমনিতে সাবধানী সে। তবু সর্বনাশা কাজটা ঘটে গেল।

পূজোব বাজাব। প্রায শ তিনেক টাকার মাল কিনেছে হাওড়াব হাটে। গামছা লুঙি, কিছু প্যাণ্ট জামাও বয়েছে। বিবাট একটা মোট হয়ে গেছে।

একটা কুলিব মাথায মাল চাপিয়ে হাট থেকে হাঁটতে হাঁটতে হাওডা ষ্টেশন অবধি এসে সেখান থেকে বাসে তুলবে।

তবু কম খরচে মালটা আনা হয, পডতা থাকে। তাছাড়া ট্যাক্সি করতে গায়ে বাজে। বেশ ভিড বযেছে ষ্টেশনে।

চাবিদিক লোকজন গিশগিশ কবছে। মালটা নিযে কুলি দাঁড়িয়ে আছে। বাসটায খুব ভীড। কোনবকমে সামনে দবজা খুলে মাল নেবাব জন্য কনডাক্‌টাবকে বাজী কবিয়ে পিছন ফিবে দেখে কুলি নেই, মালও গাযেব। হন্যে হযে এদিক ওদিক ছুটোছুটি কবতে থাকে।

কিন্তু কোথায় বা কুলি কোথায বা সেই মাল। মাথায হাত দিয়ে বসে পড়ে অতীন। পুজোব মবশুমে এতগুলো টাকা একেবারে জলে গেল।

অনেক কষ্টেব টাকা তাব। চোখ ফেটে জল বেব হয়ে আসে।

ধাক্কাটা সামলাবে কি কবে তাই ভাবছে। হাত খালি হযে গেছে। পূজোব সময দোকানে মাল তুলতে পাববে না, খালি থাকবে সাব সাব তাকগুলো। খদ্দেব ভিডবে কি দেখে।

তাবপর সংসাবেব চাহিদা আছে। কোনদিকে দিশে পায না সে। বডবাবুব কাজকর্ম পুরোদমে চলেছে। এবাব পূজোয় ভাল ব্যবসা কবেছেন তিনি। তাঁব পত্রিকাও আশাতীতভাবে জনপ্রিয় হয়েছে বাজাবে। চাহিদামত মাল দিতে পাবছেন না তিনি।

অতীন কোথায বে?

কে বলে, দোকানে চুপ করে বসে আছে। কি হযেছে তার। দেখলাম কাঁদছিল।

— কাঁদছিল। একটু অবাক হল বড়বাবু। ডাক তাকে।

অতীন এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ছোট ছেলের মত কাঁদছে সে।

— কি হয়েছে বে অতে? মেযেটা ভেগেছে? তখনই বলেছিলাম ও চলন্তিকা মেয়ে, তা কত গেল হ্যারে?

অতীন বলে ওঠে,

— তা নয় বাবু! আজ তিনশো টাকার মাল কুলিব মাথা থেকে হারিয়ে গেল।

— তাই নাকি। দরদভরা কণ্ঠে বলেন বড়বাবু।

পূজার মুখ। দোকান খালি পড়ে থাকবে, কেই বা বেচ্যাকেনা করবে। গুছিয়ে নিয়েছিলাম বড়বাবু, কিন্তু সবই আমার কপাল।

বড়বাবু ধমকে ওঠেন,

ব্যাটা লবাব। কদ্দিন নিজেব ঘাড়ে মোট চাপিয়ে বেচেছিস, হারায় নি কিছু। নবাব গেলেন কুলির মাথায় মাল চাপাতে, হয়েছে তো এইবাব। ট্যাক্সি করতে পারিস নি? তিন টাকা যেতো, তিনশো টাকা বাঁচতো। মরগে এইবার।

অতীন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে। তার বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা দোকান, এতদিনেব সাধনা সব এক আঘাতে চুরমার হয়ে গেল।

বড়বাবু ধমকে বলেছেন।

— আবাব মেয়েদের মত কান্না হচ্ছে।

কি ভাবছেন তিনি। এতদিন ছেলেটাকে দেখেছেন। তার ব্যাপাবে প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম কবে। এ দরদ, এই সাহায্য টাকা দিয়ে কেনা যায় না।

অতীন চুপ কবে বেব হয়ে যাচ্ছে।

বড়বাবু ডাকেন, দাঁড়াল অতীন।

— লবাবেব যাওয়া হচ্ছে কোথায়? দোকান তুলে দিবি তাহলে?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। ড্রয়াব খুলে বড়বাবু তিনখানা একশো টাকাব নোট বেব করে ওর দিকে এগিয়ে দেন,

— নাও ধরো। মুখ খুলতে লবাবেব লজ্জা হয। পাবো তবে এ টাকাব মালও হাবিয়ে এসো। ফের যদি দেখেছি কুলিব মাথায় মাল তুলেছিস, পেটে লাথি মাববো তোর। নিজে বয়ে মাল আনবি, একবাবে না পাবিস দুবাবে আনবি, কালই দোকানে মাল দেখতে চাই আমি। যাও আর ঘটা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না রামভক্ত হনুমানের মত।

অতীন নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হযে গেছে, মানুষটাব দিকে চেযে থাকে সে, বাববাব তাব বিপদে ডেকে সাহায্য করেছেন উনি।

এ তার বিশ্বাসের বাইবে। সাবা মন কি এক কৃতজ্ঞতায ভবে ওঠে। মানুষেব মনেব এই শুভ কামনার দাম কি জানে না অতীন, তবু মনে হয বড়বাবুর আবও বাড়বাড়ন্ত হোক্।

দোকানে বের হযে এসে দেখে মিনা দাঁড়িয়ে আছে। খবরটা সে পেয়েছে অতীনের ভাই সতীনের কাছে। চমকে উঠেছে শুনে।

ওকে দেখে বলে ওঠে সব শুনলাম। এতগুলো টাকা গেল এই সময।

তারও ভাবনা জেগেছে। অতীন বলে ওঠে,

যাক্‌গে। বড়বাবু তো আছেন। খুব বকেবাকে দিলেন টাকাটা। সতে তুই তাক টাক সাফ কব। সাঁঝবেলাতেই মাল আসবে, কাল বাকী সব মাল এনে লাগাবো। বড়বাবুর হুকুম কাল যদি দোকানে সমস্ত মাল না তুলি কযে গাট্টা লাগাবে।

— টাকা দিলেন উনি! তিনশো টাকা! মিনা অবাক হয়!

হাসে অতীন। বড়বাবুকে দেখনি, যেমন বড় তেমনি দবাজ মন।

হঠাৎ গাড়ীটা এসে থামে রাস্তার ধারেই। স্বয়ং বড়বাবুই চলেছেন। ওকে থামতে দেখে অতীন শশব্যস্তে রক থেকে নেমে যায়। বড়বাবুর কথায় র‍্যাক থেকে রুমালের দুটো বাক্স নিয়ে এগিয়ে গেল।

— একটা রুমাল দে দিকি, রুমালটা কোথায় ফেলে এসেছি।

অতীন একটা সিল্কের দামী রুমালই এগিয়ে দেয়, বড়বাবু চটে ওঠে, ব্যাটা নচ্ছাব, একটা সুতি রুমাল দিতে বল্লাম, উনি আনলেন মুর্শিদাবাদ সিল্কের রুমাল; লবাব কোথাকার।

একটা সুতি রুমাল তুলে নিয়ে দামী রুমালটা ওর মুখের উপর ফেলে দিয়ে বের হয়ে গেলেন গাড়ী নিয়ে একটা আধুলি ধরিয়ে দিয়ে।

অতীন হাসতে থাকে, মিনা অবাক হয়, লোকটার গাড়ী থেকে হাঁকডাক মেজাজের কথা শুনে মনে মনে বিরক্তই হয়েছে সে। মুখের উপর ওই আধুলি ছুড়ে দেওয়াটা ভালো লাগে না।

মিনা বলে, খুব যে গরম দেখলাম ওর, পয়সার গরম।

জিব কাটে অতীন, ওকথা ওকে বলোনা মিনা, ওই তো বড়বাবু। আমার অন্নদাতাই বলতে পারো। এই দোকান ঘব মূলধন আজকের টাকা সবই ওঁব দেওয়া। সব কর্মচারীই তার আপনজন। মস্ত লোক — দেখবে কোনদিন এইখানেই বসেই কথা বলছেন।

মিনাও দেখছিল তাকে।

অতীন পূজোব বাজারে সেবাব খুব কামিয়েছিল। বডবাবুব টাকা ফেবৎ দিতে গিয়ে একচোট বকুনি খায়। শেষকালে বলেন তিনি — পূজোর মজুরী। দিনবাত দুজনে খেটেছিস, ওটা তোরাই রাখ। কারবারে খাটা।

দোকান ক'মাসেই জমে উঠেছে, শীতেব মবশুম, গরম কাপড জামাও তুলেছে, বকেব আবও খানিকটা জায়গা নিয়ে দোকান বাড়িয়েছে।

এই সময ওদের বিযেও হযে গেল। অতীনের বিয়েতে প্রেসের অনেকেই আসে। বৌভাতেব দিন নিজে আসেন বডবাবু। মিনা আজ লোকটিকে নতুন কবে দেখে। ওব হাতে দেন একটা হার। মিনা প্রণাম কবে।

বড়বাবু নিজে দাঁডিযে থেকে কাজকর্ম খাওযা দাওযাব তদাবক কবেন, কর্মব্যস্ত সদাহাস্যময মানুষটিকে আজ নোতুন করে দেখে মিনা।

অতে, দোকান এইবাব ভালো কবে জমা, কারিগব তো ঘবেই বযেছে।

নোতুন ছাঁট কাট এবং পোষাক বের কর দিকি। অতীন হাসে।

অতীনেব ইচ্ছা আছে, একটু গুছিয়ে নিতে পারলে ওপাশে বড়বাবুর কাছ থেকে একটা ঘবই নেবে। কাটা পোষাকেব দোকান দেবে ভালো কবে। এ দোকানে বসিযে দেবে সতীনকে।

ব্যবস্থা কবে রেখেছে সে। মহাজনবা তাকে বাকীতে মাল দিতে চায কিন্তু অতীনই নেযনি, ভেবেছে এইবার সেই কথা। দবকাব হয় মিনাকেও দোকানে নিয়ে যাবে।

বাস্তাব ধাবের অনেক বড় দোকানেব কাউন্টাবে মেযেদেব বেচাকেনা করতে দেখেছে, নিজেব দোকানে কাজ কববে ক্ষতি কি।

তাই বডবাবুব কথায বলে,

— ভাবছি তাই বডবাবু। কিন্তু না করলে তো সংসার চলবে না। হাসেন নিমেষবাবু, জ্ঞান হয়েছে তাহলে!

মিনার কিছু নিজেব সঞ্চিত টাকা ছিল। বুদ্ধিটা সেই দেয, বড়বাবুব কাছে ওদেব গ্যাবেজ ঘরটার জন্য বলে, ওটা তো বন্ধই থাকে, ওটাকে একটু সাবিযে নিয়ে বং কলি কবলে ভালো দোকান হবে। মালপত্র কিছু বাকীতে নেব, কিছু কিনবো। আব কাউন্টার একটা কবিয়ে নোব। র‍্যাক্ তাকও পুরোনো কিনে বং করিয়ে নোব।

টাকাপত্রের হিসাবও হয়ে যায়। মিনাব নিজের সখ দোকান দেবে। পথে পথে একদিন ঘুরেছে। সেই পথের ধাবেই রীতিমত দোকান দিয়ে বসবে।

অতীন ভয়ে ভযেই কথাটা পাড়ে সেদিন।

বড়বাবু দেখছেন ওকে পথে পথে ঘুবতে। ছেলেটা নিজের পরিশ্রমে আর চেষ্টায় এত বড হয়েছে, আজ দোকান করতে চায়।

বুদ্ধিটা কে দিল রে? জিজ্ঞাসা করেন বড়বাবু।

অতে বলে— আপনি তো বললেন, সেদিন, তাই বলছিলাম দ্যান ওই গ্যাবেজটা —

সরকার মশাই মুখের উপর বলে,

— নাথুমল ওটার জন্য হাজার টাকা সেলামী আর পঁচিশ টাকা ভাড়া দিতে চেয়েছে।

সরকার মশাই-এর অবশ্য কিছু প্রাপ্য আছে তা ছাড়া। কিন্তু বড়বাবু কথাটা শুনে কি ভাবছেন। অতীন হতাশই হয়েছে। কোন আশাই তার নেই। নাথুমল অনেক বড় কারবারী, সে ওসব দিতে পারে।

বড়বাবু বলেন, নাথুমলকে জবাব দিন সরকার মশাই, ওটা অতেকেই দিতে হবে। কাল থেকে ভাড়া বন্দোবস্ত করে দেন।

অতীন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সরকার মশাই বোদামুখ করে চলে যায়। আড়ালে গজগজ করে।

— বাবুর ওটি পোষাপুত্র, কি লগ্নে যে তাড়া খেয়ে গামছার মোট নিযে ঢুকেছিলি তা তুইই জানিস। ব্যাটার ববাত ফিরে গেল।

প্রেসের দপ্তরীখানাব অনেকেই খুশী হয়। — তাহলে দোকানই দিলি অতে। কথায় বলে বৌ ভাগ্যে ধন।

শশী বলে, দোকানের নাম দে মিনা স্টোর্স।

হাসে অতীন। সে বলে তাকে, দোকানেব নাম যা দোব ঠিক করে বেখেছি। দোকানেব নাম দোব 'মনোবমা'। আমাদেব কাগজে দেখনি কত রকম ভালো লেখা ছবি খবব গল্প-টল্প থাকে, তেমনি আমার দোকানেই সব থাকবে — তাছাড়া ওই 'মনোরমা' কাগজের দৌলতেই তো সব আমারও তো বরাত ফিবেছে ওই কাগজেব দৌলতে, তাই নাম দোব 'মনোবমা'। বড়বাবুকে বল্লাম কথাটা। বড়বাবু বল্লেন, তুই তো বেড়ে চালু হযেছিস অতে। মগজে বুদ্ধি আছে।

তোড়জোড় কবে লেগেছে অতীন, মিনাও মাঝে মাঝে আসে। দোকানেব তাক আলমাবী লাগানো হচ্ছে, কাউণ্টার একটা পুরোনো দোকান থেকে কিনে এনে পালিশ কবছে।

দোকানের উদ্বোধন করতে হবে ঘটা করে। কাগজেব দু'একজন ফটোগ্রাফাবকেও বলে রেখেছে ছবি-টবি তুলে দেবে। বড়বাবুকেই বলে অতীন,

— এবাবও কিন্তু দোকানে আপনাকেই বউনি কবতে হবে বডবাবু। হাসেন বডবাবু,

— আবার গলা কাটবি তাহলে?

অতীন বলে, আপনার বৌমাও বলছিল সেই কথা, ওব দযাতেই সব —

বড়বাবু ধমকে ওঠেন,

থাম দিকি ব্যাটা। বিযে করে আরও বিটলেমি বেড়েছে।

উদ্বোধনের দিন এগিয়ে আসে।

হঠাৎ এমনি দিনে অসুস্থ হয়ে পড়েন বড়বাবু। প্রেস দোকান কাবখানার চালু কাববাব, নানা ঝামেলায় ডুবে থাকতে হয়। দিনরাত কাজ নিয়েই থাকেন।

হঠাৎ অফিসেই মাথা ঘুরে পড়ে যান সেদিন, অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ী নিযে যাওযা হোল, সারা প্রেস দপ্তবীখানা দোকান-এর কর্মচারীরা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ক'দিন ধবে যমে মানুষে টানাটানি চলেছে।

অতীনও গেছে বার কয়েক খবর নিতে। বিরাট বাড়ীর কাছে। ঢোকবাব সাহস নেই। দেখে ডাক্তারের দল আত্মীয়স্বজনরা নীরবে আসা-যাওয়া করেন।

— কেমন আছেন বড়বাবু?

দারোয়ান ওর দিকে চেয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোন ধনী আত্মীয়কে স্যালুট দেয়। অতীন কোন জবাবই পায় না।

সেই সহজ সরল সুন্দর প্রাণখোলা মানুষটি হঠাৎ যেন তাদের সহজ সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গেছে। কেউ তাকে চেনে না।

এই পরিবেশে তার প্রবেশ নিষেধ। তবু সে আসে স্তব্ধ বিরাট বাড়ীটার কাছে; বেদনাসিক্ত চাহনি মেলে চেয়ে থাকে।

কোন জবাব মেলে না। লোকমুখেই শোনে অবস্থা নাকি ভালো নয়।

মুখ বুজে দোকানে আসে। কোন রকমে কাজ করে মাত্র। সব উৎসাহ তাব নিভে গেছে। নোতুন দোকানের কাজ চলেছে। মনে হয় এ দোকান না করলেই হ'ত। বডবাবু কি আসতে পারবেন তাব দোকানে প্রথম বউনি করতে!

অনেক আশা নিযেই দোকান করতে চেযেছিল সে। মনে হয নিশ্চই আসবেন ... বড়বাবু! সেরে উঠবেন!

হঠাৎ খববটা আসে প্রেসে। স্তব্ধ হযে যায সব কোলাহল। ফ্লাট মেসিনেব গর্জ্জন থেমে যায়, বন্ধ হয়ে গেল দপ্তরীখানা। বইএব দোকানও বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাদেরই দোকান নয, বই-এব পাড়াই আজ বন্ধ।

এই ব্যবসায় অন্যতম প্রখ্যাত একটি উৎসাহী মানুষ আজ আর নেই।

— বডবাবু নেই! অস্পষ্ট কণ্ঠে আর্তনাদ কবে ওঠে অতীন। কাঁপছে সেই তকণ ছেলেটি। কান্না ভিজে কণ্ঠে বলে অতীন।

—সতে, দোকান পাঠ কাজকর্ম আজ বন্ধ করে দে। বড়বাবু চলে গেছে।

শ্মশানেব পথে আজ লোক ধবে না। মৌন শোভাযাত্রা চলেছে। গুণমুগ্ধ বন্ধু, প্রীতিমুগ্ধ বাংলাব ববেণ্য সাহিত্যিক শিল্পীব দল সমব্যবসাযী বন্ধু আত্মীয়স্বজন চলেছেন প্রিযবন্ধুব শেষযাত্রায।

শ্মশানে লোক ধবে না। তাদেব ভিড ঠেলে এগিয়ে আসে অপবিচিত অজানা সাধাবণ একটি মানুষ, মালাটা বড়বাবুব গাযেব উপব দিযে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

শিশুব মত কাঁদছে আজ অতীন।

ভিড থেকে বেব হযে এল, দূরে দাঁডিযে আছে মিনা। তাবও চোখে জল।

সন্ধ্যাব ম্লান আভা নামছে গঙ্গাব বুকে, পশ্চিম আকাশে বুক ভবা বক্তেব জ্বালা দু একটা নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে কোন অজানাব দিকে।

স্তব্ধ হযে বসে আছে অতীন, আর মিনা।

ধূ-ধূ জ্বলছে সেই অনির্বাণ চিতাব অগ্নিবেখা উর্ধ্বাকাশেব পানে উঠছে। সমবেত হাজাবো মানুষেব চোখে জল নামে। তাবই ধাবা নেমেছে অপরিচিত ওই অতীন ফিবিওযালাব চোখে।

বলে সে — বড়বাবু বলতেন, জীবনে ফাঁকি দিস না, ফাঁকিতে পডবি না। তাহলে ফাঁকি তাকে দিইছি মিনা — নাহলে এমনি কবে তিনিই বা চলে যাবেন কেন? বাবা মা ভাই ঠাকুর কোন কিছুই আমাব ছিল না, — বড়বাবুকেই দেখেছিলাম একটা পুরো মানুষ, অতে ফিরিওয়ালাকেও সে ভোলে নি। ওপাশেব হাজারো মানুষের অন্তবেব বিমুগ্ধ প্রীতিব সঙ্গে মিশেছে তুচ্ছ একটা ফিবিওয়ালাব চোখেব জল।

মানুষ আজ মানুষেব জন্য কাঁদে। চিরকালই কাঁদে। এক জায়গায় সে আজও বদলায় নি, হাজারো মিথ্যাব মাঝে এইখানে সে সত্য, এইখানেই সে সুন্দর।

রাত্রির অন্ধকার নামে গঙ্গার বুকে আকাশে তারাগুলো উজ্জ্বল নীল আভায় জ্বলছে।

অসাময়িক

শম্ভু মিত্র

মানুষটির নাম সত্যপ্রিয় চৌধুরী। আজ বয়স হয়েছে, এবং তার সঙ্গে আবো এমন একটা কিছু হয়েছে যাতে অনেকদিন পবে কেউ যদি তাঁকে দ্যাখে চিনতে পাবে না। আমিও পাবিনি। গোড়াতে পারিনি। ফিল্ম-পরিবেশকদেব আপিসে যাবার সিঁড়িব মুখটা দুপুবেও অন্ধকার। সেইখানে সিঁড়িতে ওঠবার জন্যে পা বাড়িয়েই হঠাৎ অতোখানি একটা দীর্ঘ শবীব মুখোমুখি এসে পড়ায় পাশ কাটাবাব মধ্যেই একবাব তাকিযে ফেলেছিলুম। কিন্তু সেও ঐ এক পলকের জন্যই, তারপরই চোখ ফিরিয়ে আপন গতিবেগে ওপবেই উঠে যেতুম, কিন্তু ঘিলুর মধ্যে ততক্ষণে টবে টক্কা ক'রে একটা টেলিগ্রাফের বার্তা চঞ্চল ক'বে তুলেছে. — লোকটার চোখটা যেন আমাকে চিনতে পারলো, সঙ্গে সঙ্গে মোটব নার্ভগুলো ব্রেক কষলো, আর আমি ওপবেব ধাপে ফিরে দাঁড়াতে গিযে প্রায় ভদ্রলোকেব গাযেব ওপবেই হুমড়ি খেযে প'ড়ে তাঁর মুখেব দিকে তাকালুম। ঠিক। ভদ্রলোকেব ঘাড় ফেরানো চোখে সেই চিনতে পাবাব ভাব। আমাব মাথাব মধ্যে তখন যেন ডজনখানেক কেবাণী তাদেব অফিসাবেব তাড়া খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফাইলের তাড়াব মধ্যে খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না।

দীর্ঘ ভদ্রলোকেব শীর্ণ মুখেব ওপর হাসি। ঝোঁক দিযে ভ্রূদুটিকে উপব দিকে তুললেন কুশল প্রশ্নের ভঙ্গিতে, আব সঙ্গে সঙ্গে আমি চিনতে পাবলুম। বিস্ময়ে কথাগুলো যেন আমাব মুখ থেকে স্খলিত হযে পডলো — "আপনি! এ কী চেহাবা! এ কী চেহাবা! এ বকম কেন হোল? কী হযেছে আপনাব?"

সত্যপ্রিয় ভাঙা তোবড়ানো গালে আবাব একটু হাসলেন। বললেন — "আমিও তো ভেবে ভেবে কোনও ঠাওর পাচ্ছি না। তোমরা কেউ বলতে পাবো? যে, কী হোল আমাব?"

আগেকার মতো সেই মেঘডাকা গম্ভীর আওযাজ নেই সত্যপ্রিযেব। নবনাট্য আন্দোলনেব মঞ্চে যে কণ্ঠ শুনে লোকে উদ্বেল হোত, মেয়েরা প্রেমে পড়তো, সে উদাত্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বব কোথায় হাবিয়ে গেছে। আজ সে যেন অনেক ক্লান্ত, অনেক ফিকে। হঠাৎ মনে হ'তে পাবে এ কণ্ঠ যেন আর কথোপকথনের নয়, এ যেন শুধু স্বগতপ্রলাপেব।

আমারও সেই কথাই মনে হোল একটু পবে তাঁর সঙ্গে চাযের দোকানে ব'সে। এতদিন পরে দেখা, আমার সত্যদাকে যে কী দিয়ে আপ্যায়ন করবো ভেবেই পাইনি। আমাব যাবাব কথা ছিল ওপরতলায় এক ফিল্মপরিবেশকের আপিসে, একটা পোস্টারের ডিজাইন নিযে, (আমি কমার্শিয়াল আর্টিস্ট) ভুলে গেলুম সেসব, আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলুম সত্যপ্রিয়দাকে মোড়ের ছোট্ট চায়ের দোকানটায়, অনেক কথা বলবো আর অনেক কথা শুনবো ব'লে। অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে, অনেক কথা আমার শোনবার আছে, অনেক খবর জানবার আছে।

সত্যদা বললেন, — "তা এককালে তো আমাকে গুরু ব'লে মান্‌তে, তারই দক্ষিণাস্বরূপ দুটো টোস্ট খাওযাও তো। আজ সারাদিন কিছু খাওযা হযনি।"

সেকি। আমি চেয়াব ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম —"চলুন তা'হলে একটা ভালো জায়গায় যাই, পেট ভ'রে খেয়ে নেবেন, এখানে শুধু টোস্ট খেয়ে কী হবে। চলুন।"

হাত তুলে বাধা দিলেন তিনি। মাথা নেড়ে বললেন, — "নাহে। ঐ দুখানা টোস্টের ওপব দিয়েই যাক। বেশী দক্ষিণা চাইতে গেলে আবাব সম্পর্কটাই ভেস্তে যাবে। বোসো।"

আমি বসলুম, কিন্তু তাঁব কথায় একটা অভিমানেব আবেগ আমাব বুকেব মধ্যে হঠাৎ ফুলে উঠতে থাকে. বললুম. — "আমি জানি অনেক লোক আপনাব সঙ্গে বেইমানি করেছে. আপনারই সাহায্যে দাঁড়িয়ে উঠে পবে আপনার নামেই কুৎসা ক'বে বেড়িয়েছে, কিন্তু আমি বোধ হয় তাদেব মতো নই, আমি সেবকম বংশে জন্মাইনি। আমাব যদি কোনও মনুষ্যত্ব থাকে, আমাব যদি কোনওবকম সত্যজ্ঞান হয়ে থাকে, — সে সমস্ত আপনাব জন্যে। আজ যদি তাব দক্ষিণা দিতে আমাকে সর্বস্ব দিতে হয় সেও আমি হাসিমুখে দিতে পাববো, দুখানা টোস্ট খাইয়ে শোধ দিতে চাইব না।"

বলতে বলতে সত্যিই আমার চোখ জ্বালা ক'রে জল এসে পড়লো, আমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হোল।

সত্যপ্রিযদা কিন্তু কিছুই বললেন না. চুপ ক'রে সামনেব দিকে চেয়ে বইলেন, যেন আমাব এই আবেগেব ভিতর দিযে আরো অনেক গভীর কথা, অনেক মৌল কথা তাঁর চোখের সামনে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যাব কোনও সমাধান নেই।

একটু পবে আপন মনে বললেন, — "কেন যে এমন হয। আমার কাছে এলেই সবাইযেব কেন যে এমন হিস্টিরিয়া হয়! কিন্তু আমি তো আর কিচ্ছু চাই না। স্তুতিও চাই না, কুৎসাও চাই না, — খালি একটু বিশ্রাম চাই।" একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তাঁর।

এই সেই সত্যপ্রিয চৌধুরী যে বাংলাদেশেব নাট্য-আন্দোলনের একজন নেতা। সেদিন যার শরীর ছিল বিশাল, মন ছিল তীক্ষ্ণ, সাহস ছিল অপবিমেয়, আর আশা ছিল তার চেয়েও বেশী। আজকেব মতো এই নিষ্প্রভ চোখ নয়, সেদিন যাব চোখ ছিল বিদ্যুতেব মতো শাণিত; আজকের মতো এই অস্থি-চর্মসার ক্লান্ত মুখাবযব নয, সেদিন যার মুখে সকালের আলো ঝলকাতো, সেই সত্যপ্রিযদাব মনে কোনও সংশয় ছিল না। যাব মনে ভবসা ছিল যে স্বার্থান্বেষী মুনাফালোলুপ মুষ্টিমেয় লোক দেশের সাধাবণ লোকেব পরিস্ফুরণের পথে বাধা হযে দাঁড়িযেছে, কেবল তাদের জন্যই জনগণেব সৎশিল্পের বসাস্বাদনেব পথে বিঘ্ন ঘটছে। তাই স্বার্থত্যাগ ক'রে একনিষ্ঠভাবে গভীর নাটকের অভিনয় ক'রে যেতে হবে, কেবল দেশের লোককে ভালো জিনিসটি দেখবার সুযোগ ক'রে দিতে হবে, তাহলেই তাবা আপন-পর বুঝতে পারবে, এবং যা সৎ ও সত্য তার জয় হবেই। এ হবেই হবে।

এবং সত্যই কিন্তু তখন-তখন হযেওছিল জয। হৈ হৈ প'ড়ে গিয়েছিল সত্যপ্রিয় চৌধুরীব প্রযোজনায়। বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া প'ড়ে গেল নতুন যুগ এসেছে ব'লে। নাট্যাভিনয় আবার নতুন ক'রে এবং আগের চেয়ে অনেক বেশী ক'রে জাতে উঠলো। ইন্‌টেলেক্‌চুযাল এবং মর‍্যাল দুই খ্যাতি একসঙ্গে হোল। সেদিন সত্যপ্রিয়দার চলায় বলায় হাসির আওয়াজে যেন জয়ের নিশান হাওয়ায় উড়তো।

আর আজ তিনি ক্লান্ত, একটু হেসে নিজের ডানহাতটা এগিয়ে দিলেন আমাব দিকে, বললেন, — "তুমি তো এক সময়ে রিহার্সেলের ঘরে সকলের হাত দেখতে, — দ্যাখতো। — তখন দেখতে দিইনি, আজ দ্যাখ।"

তাঁর সেই কালিমেড়ে দেওয়া ঘর্মাক্ত তেলামুখের হাসির দিকে তাকিয়ে আমাব মনেব সমস্ত অভিমান যেন বয়স্কদের শোকের সামনে শিশুর কান্নার মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, — "আপনি কি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন আজকাল?"

তিনি বললেন — "করি বৈকি। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো যা কিছু করবার ছিল সমস্ত করেছি, ক'রে চাঁদ বেণের মতোই হেরে গেছি। তাই আজ চ্যাংমুড়ি কাণিকেই বিশ্বাস করি। — অন্ধকার একটা বড়ো সত্যি জিনিস ভাই। ইস্কুলে পড়েছ তো, পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল! মানুষের অস্তিত্বেও তেমনি তিনভাগ অন্ধকার একভাগ আলো। কিংবা হয়তো তারও কম।"

আমি কথা পাল্টাতে জিজ্ঞাসা করলুম, — "আপনি আজকাল কোথায় আছেন?"

তিনি আবার একটু হাসলেন, বললেন, — "বাড়ির ঠিকানা আমি অনেকদিন হোল কাউকে দিই না। তোমাকে বলছি, আশা করি তুমি কাউকে বলবে না। — থাকি ক্যানিং লাইনে একটা গ্রামে। স্টেশন থেকে মাইল দুয়েক দূরে।"

—"এখানে এই ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটারদের পাড়ায় এসেছিলেন কেন?"

— "ওরা মাঝে মাঝে আমাকে দিয়ে সিনারিও ঠিক করিয়ে নেয়, সংলাপ লিখিয়ে নেয়। না, নাম দেয় না। অল্প কিছু টাকা দেয়। কখনো দেড়শো কখনো দুশো।"

— "এই টাকাতে আপনি করেন?"

— "করি। খালি তাই নয়, এইটুকু কাজ পাবার জন্যে আবার তোষামুদিও কবি।"

সত্যপ্রিয়দা কারুর তোষামুদি করছেন এ ছবিটা আমি চেষ্টা করেও কল্পনা করতে পারলুম না। কিন্তু তিনি মাথা নেড়ে বললেন, — "করি। নইলে আমাকে না দিয়ে তো আর কাউকে ইচ্ছে কাজটা দিয়ে দিতে পারে। আমার মতো উঞ্ছবৃত্তির লোক তো কেবল আমি একাই নই।"

চা আসে, টোস্টও।

সত্যপ্রিয়দা বললেন, — "চা খেয়ে নিয়ে আমার হাতটা একবাব দেখে দিয়ো তো। — কবে ভালো হবে তা জানতে চাইছি না, কবে একেবারে মন্দ হবে সেটা খালি ব'লে দিও। এই যে দেড়মাস দুমাস অন্তর দেড়শো দুশো টাকা রোজগার হয়, এইটাও কবে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে বলতে পারো? তাহলে একটু নিশ্চিন্ত হই। — বুঝতে পাবলে না? যেদিন সত্যি বন্ধ হবে আমি তো ঠিক সেইদিনই বুঝতে পারবো না, তারপরেও দুমাস, তিনমাস, হয়তো চারমাস ধরে ঘোরাঘুরি করবো, আর আশা করে যাব যে এইবাব আসবে কিছু টাকা। এই কষ্টটা থেকে অন্তত তুমি আমাকে বেহাই দিতে পাবো। দ্যাখনা যদি সেইটুকুই পারো।"

আমার কি যেন হয়, হঠাৎ জোর দিয়ে ব'লে উঠি — "না, এরকম চলতে পারে না। আপনি আবার আসুন। আমি আবার লোকজন জড়ো করবো। আবার আমরা নতুন ক'রে নাটক করবো নতুন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আবার আপনাকে কাজে নামতেই হবে।"

সত্যপ্রিয়দা মাথা নাড়েন, বলেন — "নাঃ। আর তা হয় না।" আমি অনুনয় ক'রে বললুম, — "কেন হবে না? বলছি তো, আমি ছেলেমেয়ে জোগাড় করবো, যারা এখনো স্বপ্ন দেখতে পারে, যারা এখনো আদর্শের জন্য ত্যাগ করতে পারে, সেইরকম অল্পবয়সীদের আমি যোগাড় ক'রে আনবো।"

সত্যপ্রিয়দা বললেন — "তাতে কী হবে? দু'একবছর পরে তো আর তারা অল্পবয়সী থাকবে না, তখন? যাদের নিয়ে শুরু করেছিলুম তারা আজ কোথায়? কেউ ব্যবসা দেখছে, কেউ অফিসার হয়েছে, কেউ ফিল্মে গেছে, আর যারা কোনও রকম সুবিধে ক'রে উঠতে পারেনি তারা আজও প্রতিষ্ঠার লোভে থিয়েটারের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বিষমুখে সকলের কুৎসা ক'রে বেড়াচ্ছে। — তাদের পরে আবার যারা নতুন এলো তারাই বা কী করলে? — যাক্‌গে। ....তুমি কি এখনও নাটক করছো? কোনো দলে আছো?"

বললুম,—"না। জীবনে আমি একটাই দলে ছিলুম। এবং শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলুম।"

সত্যপ্রিয়দা হাসলেন, বললেন, — "সতীত্বের গৌরব?"

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, — "শেষ দিনটায় তুমি ছিলে?"

— "ছিলুম। আমি, পৃথ্বীশ আর দীপক সবচেয়ে আগে এসেছিলুম। এসে দেখলুম আপনি লাইব্রেরীর বইগুলোর ওপর হাত বোলাচ্ছেন, আমরা তাই আপনাকে জানান না দিয়ে বারান্দার কোণের দিকে চ'লে গেলুম।"

— "জানো, অনেকের অনেক রক্ত জল ক'রে কেনা হয়েছিল বইগুলো। তাই নেড়েচেড়ে দেখছিলুম। — কিন্তু মনে আছে? অমরেশ পরে ইঙ্গিত করলে যে আমি তাড়াতাড়ি এসে বই সরিয়েছি?

— "তার শাস্তি অমরেশকে সেইদিনই পেতে হয়েছিল। সেই রাত্তিরেই।"

— "হ্যাঁ, তোমরা কয়েকজনে নাকি তাকে মেরেছিলে। কিন্তু কেন মাবতে গেলে। অমরেশ বোকা ছিল।"

"কিন্তু খগেনকে পেলেও সেদিন আমরা ছাড়তুম না। সেই বুঝেই সে গা ঢাকা দিয়েছিল।"

— "খগেন এখন কী করছে?"

— "নানান আপিস ক্লাবে যে কোনও নাটকের ঠিকে-ডাইরেকশন দিয়ে বেড়ায়। তার জন্যে পয়সা পায়। তারপর কমার্শিয়াল আর্টিস্ট।"

—"সুশান্ত, প্রদীপ, এরা কী করে?"

"সুশান্ত একটা দল করেছে। প্রদীপ আর একটা দল করেছে। — কিন্তু এদের কথা ছেড়ে দিন আপনি। এরা দল করেছে দলাদলিব জন্যে। এদের প্রধান কাজ হচ্ছে পরস্পরের নামে কুৎসা করা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনার নামে প্রত্যহ একটা কুৎসিত কথা না বলতে পাবলে এদের পেটের ভাত হজম হোত না। কিন্তু আপনি তো একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তাই এখন নিজেদের মধ্যেই সব গালাগালির লক্ষ্যটা থেকে যাচ্ছে। যাকগে, যাকগে, এবা অত্যন্ত তুচ্ছ লোক। — আপনি আবাব ফিরে আসুন, সত্যদা, আমরা আবার কাজে লাগি। সেইসব দিনগুলোর কথা মনে হ'লে ভেতরটায় যে কী হয় সে তো আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। আচ্ছা, তখন তো আমরা কোনওদিন কোনও ছোট কথা ভাবিনি। আপনি বলতেন, নিজেকে সম্মান করতে পাবলেই আত্মসম্মান থাকে, সেটা অপরের দেওয়া না-দেওয়ার ওপর নির্ভর করে না। আপনি বলতেন, দেশের সাধারণ লোক নেভাপ্রদীপের মতো মন নিয়ে উন্মুখ হয়ে ব'সে আছে যে কবে আমরা সেই প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দোব, সেইদিনই দেশে দেওয়ালির রাত আসবে। — সেই বড়ো-কথাটা তো আজও আমাদের বলা হোল না সত্যদা, কেউ যে বলবে এমন লোক নেই। আপনি ফিরে আসুন। আমাদের জন্যে, দেশের জন্যে, আবার একটা কিছু করুন।"

কিন্তু সত্যদা চুপ ক'রে থাকেন, তারপর নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, "নাঃ। আমার সে শক্তি নেই ভাই, আমার দ্বারা হোল না। প্রথম যখন শুরু করেছিলুম তখন দেশ পরাধীন। আমরা সবাই তখন এক, কারণ শত্রু তখন বিদেশী ইংরেজ। তারপর স্বাধীন হলুম। সামনে থেকে বিদেশী শত্রু হ'টে গেল, আর আমাদেরও যতো কুশ্রী ঝগড়া বেরিয়ে পড়লো। যারা অভিনয় করবে তাদেরও, যারা দেখবে তাদেরও। তবুও করেছি। এক-আধটা টিউশানি ক'রে না খেয়ে না প'রে করেছি। কই, দেশের লোক তো একটা থিয়েটার দিলে না আমাদের। তারা ফ্যাশান ক'রে আমাদের অভিনয় দেখতে এসেছে। আর হাততালি দিয়ে ফিরে গিয়ে তাদের পুরানো অভ্যস্ত জীবনযাপন করেছে। তাই, যারা অভিনয় নিয়ে ব্যবসা করেছে তাদেরই রোজগার বেড়ে গেছে। এই লোকেরাই যে সেখানে ঝাঁক বেঁধে গিয়ে পয়সা দিয়ে এসেছে, তবেই না বেড়েছে। — ছেলেটা মারা গেল, সে কথা তো জানো। আজ ভাবি ভালো হয়েছিল, নইলে আরো কষ্ট পেত। অরুণাংশু তখন সকলকে তাতাচ্ছে যে, স্যাক্রিফাইস ক'রে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, শিল্পী হওয়া যায় না। — খগেন তখন সেই যে নতুন মেয়েটি

এসেছিল — সীতা — যার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ছিল, — তার সঙ্গে জোব ক'রে প্রেম করবার চেষ্টা করছে। দল বেঁধে মদ খাচ্ছে তারা, ঐ বাচ্ছা ছেলে অমরেশকেও ভিড়িয়েছে সেই দলে। যেদিন ইচ্ছে আসছে, যেদিন ইচ্ছে কামাই করছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে ব্যক্তিগত কাজ ছিল। অদ্ভুত! আমি তখনো ভাবছি নতুন নাটকের কথা। নতুন ধবনের। — বাড়িতে নীলিমা ছেলেব শোকে পাগল।

আমাকেই দোষ দেয। বলে, আমার মহত্বের সাধনার দাম দেয আমাব ছেলে। হ্যাংলা হয়, পরের বাড়িতে গিযে চুরি ক'রে খায়, তারপব ম'বে যায। — বলতে পারো ভাই, কাব জন্যে কবেছি এ পাগলামি!

তাবা তো অন্তত আমাব তৈরি জিনিসটাকে কোথাও বাখবে আদর ক'রে? নতুন ফর্ম তো এনেছিলুম একটা, সেইটারই একটা স্থান ক'বে দাও কেউ, যাতে তার বৃদ্ধি হয, প্রসাব হয়! — আসলে কী জানো?

ইতিহাস বলো, ভবিষ্যৎ বলো, বা জনসাধাবণ বলো, কারোর ওপব কোনও ভরসা করাই ভুল। যা করবে তা নিজেব দায় মনে কবেই কোবো, কাবোর ওপর ভবসা ক'বে কোরো না। ছোটোবেলাব ঐ যে ধারণা, ভালো কাজ কবলে মানুষ পুবস্কাব পায, পুণ্যেব জয় হয়, — এ একেবাবে ভুল। তোমার পোড়ো জমিটাব সামনে দিয়ে যদি চওড়া বাস্তা বের হয় তাহলেই তোমার জমির দর বেড়ে যাবে, আবাদ করো আর নাই করো।"

হঠাৎ আমাব মনে হোল তেলচিটে ময়লা পাঞ্জাবী গায়ে যেন বিরাট একটা ভাঙা পিরামিডেব মতো ব'সে আছেন তিনি। সারা মুখে কতো দাবিদ্রের ডৌল আব বেখা। চোখ দুটো ঘোলা। ঢল্‌-নামা গঙ্গাব মতোই গভীর কিন্তু তেমনি অস্বচ্ছ, ভিতবে যে কতো কী হচ্ছে তা কিচ্ছু বোঝা যায না। সেই মুখেব দিকে তাকিযে থেকে কথা শুনতে শুনতে আমাব যেন আচ্ছন্ন লাগছিল, জোব ক'বে সেটাকে কাটাবাব জন্যে সোজা হয়ে বসি, আবাব চাযেব অর্ডার দিই। কিন্তু সত্যপ্রিযদা নড়েন না, কোথাও যে কিছু নড়ছে জীবনে তাও যেন তাঁব গোচর নয়।

আমি তাঁকে বলি, — "আমাদেব দলে যদি অরুণাংশু খগেনেব মতো লোক না থাকতো তাহলেই আমরা ঠিক থাকতুম। ওদেব মতো লোক যেখানে যাবে সেই জায়গাটাকেই ভাঙবে।"

তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে আগের মতোই মৃদুস্বরে বললেন, — "না। এ জাতেব মোটের মাথায় standard breed হচ্ছে এইবকম। এই চোদ্দ পনেরো বছর ধ'বে কতো ছেলে এলো, গেল, — সব এই। সমাজেই মানদণ্ডের গোলমাল হযে গেছে। সেইজন্যেই আমার কথা শুনতে শুনতে ওদের রাগ হোত। অথচ একদিন ঐ অরুণাংশু, ঐ খগেন, আদর্শবাদীর উজ্জ্বল চোখ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমার কথা শুনে ওদের ভিতরটা যেন রণ্‌ রণ করতো। তাবপর আস্তে আস্তে ওদেব চোখের জ্যোতি ক'মে এলো। যে সাফল্যের আশা করেছিল সে যখন এলো না, — টাকা এলো না, ফিল্মের মতো পাব্‌লিসিটি এলো না, সুন্দরী নারী এলো না প্রেমজ্ঞাপন করতে,— তখন ওদের রাগ হল আমি যেন ঠকিয়ে এনেছি। কারণ আমার ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, আব লোকমুখে তো আমার খানিকটা প্রতিষ্ঠা। —তাই যখন হঠাৎ ছেলেমেয়েদের মেলামেশার কথা জানতে পারলুম, বাধা দিতে গেলুম, ফল উল্টো হোল, আমার সামনে ওদের একটা যে সঙ্কোচের বাধা ছিল সেটা উড়ে গেল। ওরা বললে, যে-তাড়না প্রাকৃতিক তাকে দমন করা যায় না। আমি বল্‌লুম — তাকে চালনা করা যায়, সাবলিমেট কবা যায়। ওরা বললে, — আগে পেট ভ'রে খাই, তারপর কৃচ্ছ্রসাধনের কথা ভাবা যাবে। বললে, — আমরা সাধারণ মানুষ, সাধাবণেব মতোই বাঁচতে চাই। খিদে পেলে খাবো, আর না খেতে পেলে চুরি করবো। তবেই আমরা সাধাবণ লোককে আনন্দও

দিতে শিখবো। ঐসব দার্শনিক নাটকের মাধ্যমে উচ্চস্তরের সামাজিক দায়িত্ব পালন ক'রে নয়। সেন্টিমেন্ট দিয়ে, ঢং দিয়ে, ভেল্কি দিয়ে, — সাধারণ মানুষের মনোমত সাধারণ হ্য়ে।

ভয়ে আমার হাত পা যেন কাঁপতে লাগলো, বললুম — তা'হলে এতদিন আমরা যা ভেবে এসেছি সব ভুল? বীর থাকবে না, কেউ, কেউ লড়াই করবে না, মহৎ হবে না?

ওরা তিক্তভাবে হেসে বললে — মাফ কববেন, চারদিকে যাদেব দেখা যায় তারা কেউ বীর নয়, বীরত্ব দেখতেও চায় না। তাই নায়কেব চেয়ে এখন নায়িকাব টান বেশী। সোজা লাইনের চেয়ে কার্ভ্-এর দাম বেশী।

"এসব কথা তোমবা কেউ জানো না। তোমরা খালি জানো যে মিসেস ঘোষকে আমি বকেছিলুম ব'লে খগেনবা কমিটি মিটিঙে আমায মাপ চাইতে বলেছিল। আমি রাজি হইনি, তাই আমাকে সাস্পেণ্ড করার প্রস্তাব এনে সেটা পাশ করালো। তাই না? কিন্তু এসব অনেক পরে, তার আগে — ওঃ! — কিন্তু কেনই বা তোমাকে এ সমস্ত বলছি। থাকগে।"

আমি বললুম, — "না বলুন, আমার শোনাব দবকার আছে।"

— "কী দরকাব?"

সে কথার জবাব না দিযে আবার মাথা ঝাঁকিযে বললুম, — "আছে দরকার। আপনি বলুন।"

তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ সোজা প্রশ্ন ক'বে বসলেন, —"অরুণাংশু এখন কোথায জানো?"

আমি যেন এই প্রশ্নটাবই অপেক্ষা কবেছিলুম গোড়া থেকে। অন্যদিকে তাকিযে বললুম, — "এখন কলকাতাতেই ফিরে এসেছে। সাঠে অ্যান্ড মাচওয়ে কোম্পানীর ম্যানেজাব। থিযেটার রোডে থাকে।"

তিনি একটু হেসে বললেন, —"থিযেটাবেব সঙ্গে বুঝি ঐটুকু সংযোগই বেখেছে?"

আমার হাসি এলো না, কারণ আমি সত্যপ্রিয় চৌধুবীর মতো মহৎ নই। রাগে আমার চোখ বাঙা হযে উঠেছে, তবু সংযত থাকবার চেষ্টা ক'রে বললুম, — "বছর দেড়েক আগে সে ফিরেছে। ঠিকানা যোগাড় ক'রে আমি একদিন গিযেছিলুম তার বাড়িতে। বেয়ারাকে দিয়ে ব'লে পাঠালে এখন ব্যস্ত আছি, আপিসে দেখা করতে বোলো। আমি একটা কাগজে লিখে বেযারার হাত দিয়ে আবার পাঠালুম যে, আপনার সঙ্গে দেখা করবার আমার আদৌ কোনও ইচ্ছে নেই, আমি শুধু নীলিমা বৌদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তাঁকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। কিন্তু দেখা করতে দিলে না। বেয়ারা এসে বললে, যে এ বাড়িতে ও নামেব কেউ থাকে না। আমি আর পারলাম না, সিঁড়ির কাছটায় গিয়ে চেঁচিযে ডাকতে লাগলুম — নীলিমা বৌদি, আমি মুকুলেশ এসেছি। আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, আপনাকে তার জবাব দিতেই হবে। নীলিমা বৌদি বেরিয়ে আসুন, আমাকে বলুন আপনি কী ক'রে এ কাজ করতে পারলেন—! ততক্ষণে ওপরে অরুণাংশু বেরিয়ে এসেছে, রেলিং ধ'রে চীৎকার ক'রে বেয়ারাকে ডেকে বললে আমায় তাড়িয়ে দিতে। আমারও তখন মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেছে। আমি অরুণাংশুকে গালাগাল দিয়ে বললুম যে সে আপনার বিশ্বাসের সুযোগ নিযেছে, আপনার সঙ্গে বেইমানি করেছে —। কিন্তু বেশী বলা গেল না, চাকরে ও দারোয়ানে মিলে আমাকে মেরে গেটের বাইরে বের ক'রে দিলে। দু'একটা রাস্তার লোক দাঁড়িয়ে প'ড়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, আমি ঠোটের রক্ত মুছতে মুছতে চ'লে এলুম।"

খানিকক্ষণ আমরা দুজনেই চুপ ক'রে রইলুম। তারপর সত্যপ্রিয়দা আস্তে আস্তে বললেন, "নীলিমাকে তোমরা অমন ক'রে বিচার কোরো না। ওর যা কিছু অনিষ্ট সব আমি করেছি, ও আমায় সত্যিই ভালোবেসেছিল।"

আমি বিশ্বাস করি না কথাটা, তবু চুপ করেই থাকি। তিনি আবার বললেন, সত্যিই ও আমাকে ভালোবেসেছিল। আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমার সাথী হ'তে চেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল যে, ও একেবারেই অভিনয় করতে পারে না। ও কী করবে? ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়লো।

আমি প্রতিবাদ না করে পারলুম না যে, — "অভিনয় ছাড়াও তো কতো কাজ থাকে। পোশাকের ভার নিতে পারতেন, প্রম্পট্ করতে পারতেন, — মাঝে মাঝে তা করেওছেন শুনেছি সেসব, কেন বন্ধ করলেন?"

সত্যপ্রিয়দা বললেন — "কিন্তু সেটা তো ওর ক্ষমতার উপযুক্ত কাজ হোলো না। সারাদিনের মধ্যে ওর তো আরো কাজ থাকা চাই, যে-কাজ ওব বুদ্ধিব যোগ্য। — তাই ও চাকরি নিল। সেল্‌স্ অর্গানাইজ করাব কাজ। কিন্তু ওর সে কাজ সম্বন্ধে আমার তো বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না। আমি আমার কাজেই মশগুল থাকতুম। কিন্তু নীলিমা তো চেয়েছিল যে আমার কাছে তার মূল্য হবে, খালি টাকা রোজগার কবহে তো সাথী হওয়া যায় না। অথচ আমি তার এই নির্ভরতা বুঝতে পারতুম না। আমার মনে হোত, আমরা দুজন স্বাধীন সম্পূর্ণ লোক, স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়েছি। ফলে, তার কাজ সম্পর্কে আমার ঔদাসীন্য নীলিমার মনে হ'তে লাগল তারই সম্পর্কে আমার ঔদাসীন্য। ও কল্পনা করতে লাগল আমি আব যেন কাবোব প্রেমে পড়েছি। — ওব সেই অসুস্থতা দেখে সত্যিই আমার মন ক্রমশ বিরূপ হয়ে যাচ্ছিল। কারণ, তাতে আমার কাজেব ক্ষতি হচ্ছিল। এমন সময়ে ছেলে হবাব সময় হোল। ও চাকবি ছেড়ে দিল। আমি আবার ওর শবীরেব দিকে নজর দিলুম, আমাদেব সব ঝগড়া মিটে গেল। আরো মিটে গেল ছেলে হবাব পব। ও যেন ঠিক কাজটা পেল, যাতে আমাদেব দুজনেবই উৎসাহ। ও ঠিক কবলো ও ঘবকবণাব কাজ কববে, ছেলে মানুষ কববে। —কিন্তু আমাব বোজগাব ক্রমশই কমতে লাগল। আব ততোটাই নীলিমা ক্ষেপে উঠতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই আমাকে নাটকেব কাজ ছাডাতে পারলো না, ফলে বোজগাব কিছু বাডলো না। ববঞ্চ খুব কমেই গেল। তখন একদিন বাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলুম যে আমাদেব পাঁচ বছবেব ছেলে দুপুব বেলায় পাশের বাড়িব জাল-আলমারি থেকে চুরি ক'রে তবকাবি খাচ্ছিল, হঠাৎ ধবা প'ড়ে গেছে। — দুজনে অনেকক্ষণ চুপ ক'বে ব'সে রইলুম। সেই নীববতাব মধ্যে নীলিমার কঠিন মুখ যেন চিৎকাব ক'বে আমাকে দাযী করতে লাগলো। কিন্তু আমার মনে প্রায় অনেক বছর আগে ইবসেনের একটা প্রশ্ন বার বাব ঘা দিতে লাগ্‌লো — ছেলেমেয়ে আছে ব'লে কি মানুষ ভালো কাজ করতে পারবে না, সত্যের জন্যে দাঁড়াতে পারবে না। — তাবই মাসকয়েক পবে ছেলেটা মারা গেল।"

আমি প্রায় রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা কবলুম — "এই রকম হয়েছিল নাকি? — তারপব?"

সত্যপ্রিয়দা চোখ দুটো ছোট ক'বে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেন কষ্ট ক'রে কী দেখবার চেষ্টা করছেন। বললেন, — "তারপর? ভাবো নীলিমার কী রইল? আমাব সাথীত্ব পেল না, সংসাব পেল না, ছেলে রইল না। আমার মতো হাঘরের ঘবে ও কী দিয়ে পূর্ণতা আনবে। কখনো কুৎসিত বিষাক্ত কথা ব'লে ঝগড়া করে, আবাব কখনো আমাকেই আঁক্‌ড়ে ধ'বে কাঁদে। আমি দিনের পর দিন দেখেছি। কিছু করতে পারিনি। তার কাছেও থাকতে পারিনি বেশীক্ষণ, রোজগারের জন্যে যেতে হয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় রিহার্সেলে যেতে হয়েছে। কাউকে বুঝতে দিইনি আমার দিন কী করে কাটছে। আর একলা বাড়ির মধ্যে নীলিমা একটু একটু করে অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কতো করে তখন সেই নাটকটা আমরা তৈরি কবলাম — 'ক্রান্তিপূর্ব — কতো বিশিষ্ট লোকের কাছে কতো প্রশংসা হোল, কিন্তু লোকে দেখতে এলো না। কী জানি কেন। হয়তো সাধাবণ দর্শকের মন বদলাচ্ছে। তাই জোর ক'রে অভিনয়টা

চালাতে গিয়ে অনেক ধার হয়ে পড়লো। অতোগুলো বৎসরের পরিশ্রমেব পর হাতে কোনও টাকাপযসা রইল না, শুধু ধার রইল। — তখনই ঐ মদ খাওয়া, ঐ মেয়েদের নিয়ে ব্যাপারগুলো ঘটলো। —ওরা বন্ধঘরের মধ্যে উদ্ধতভাবে আমার সঙ্গে কথা বললে, ওরা সবাই যে আমার চেয়েও কতো বেশী আত্মত্যাগ করেছে সেইসব কথা—। আমি কিন্তু কখনো বলিনি যে আত্মত্যাগের মৌরুসী-পাট্টা কেবল আমার। বলতে পারলুম না। কিছুই বলতে পাবলুম না। বাড়ি ফেরার পথে কেবলই মনে হ'তে লাগলো, নিশ্চয়ই আমাব কোথাও পাপ হয়েছে, নইলে আমারই হাতে গড়া ছেলেরা এসব কথা আমাকে বললো কী ক'রে! আমারই পাপ. নিশ্চয় আমারই পাপ। — সেদিন বড়ো কষ্ট হচ্ছিল। এরকম কখনো হয়েছে তোমার যে, চোখ শুক্‌নো থাকে, অথচ থেকে থেকে কী রকম একটা জন্তুব মতো অস্বাভাবিক আওযাজ বেবিয়ে পড়ে গলা থেকে? — ভগবান করুন, যেন না হয়।'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবাব বলতে লাগলেন, — ''বাড়ি ফিবতে অনেক রাত হোল। নীলিমা কঠিনভাবে জিজ্ঞাসা কবলো, — 'এতোক্ষণ কোথায ছিলে?' — আমি কোনও জবাব দিলাম না। ও আবাব বললো, — 'আমাব সম্পর্কে কী ঠিক কবেছ? আমি কী কববো?' আমি বললুম, — 'তুমি ঠিক ক'বে নাও তুমি কী কবতে চাও।' নীলিমা বললো, — 'একটা স্ত্রী তার স্বামীর কাছে যা ন্যায্যভাবে চাইতে পাবে তাব চেযে বেশী তো কিছু চাচ্ছি না। আমি একটা সংসাব চাই, ছেলেপুলে চাই, তাদেব ভবিষ্যৎ গড়তে চাই। এটা চাই না যে আব একজনেব মহত্ত্বেব সিঁড়ি হবাব জন্যে তাবা ম'বে যাক। আমাব স্বামীব অবহেলা চাই না। আমাব একটা ভবিষ্যৎ চাই. তাব জন্যে আমাব —।' আমি বাধা দিযে বললুম— 'এতোদিনে তো বুঝতেই পেবেছ যে আমি একেবাবে অক্ষম. একেবাবে অপদার্থ. তাহ'লে আব কেন আমাকে এসব কথা বলছো। আমাব স্বাচ্ছন্দ্য দেবাব ক্ষমতা নেই, ছেলেপুলেকে বাঁচিযে বাখবাব ক্ষমতা নেই. আব তোমাব ভবিষ্যতও বাঁধিযে দেবাব ক্ষমতা নেই। আমি লোকটা ঐটুকুই, আমি নপুংসক, আমি হিজ্‌ড়ে, আমি পাপী, আমি স্বার্থপব. আমি সব, আমি সব। দযা ক'রে আমাকে ছেড়ে চ'লে যাও। আমার ওপর ভবসা ক'বে তোমবা সবাই নিজেদেব সর্বনাশ আব কোবো না। দোহাই তোমাদেব, তোমবা যাও। চ'লে যাও।' তারপবেও দিন কাটলো। কী ক'বে কাটলো তা আব এখন বলা অসম্ভব। কিন্তু কিছুদিন কাটলো। বেশ বুঝতে পাবছিলুম যে চারপাশ থেকে কী একটা যেন ঘনিযে উঠছে। কিন্তু আমিও তখন শেয়ালেব মতো সতর্ক হযে গেছি। বিহার্সেলে খুব সাবধানে ব্যবহার কবি, বাড়িতেও। আমাব অপর আমিটা যেন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে কান খাড়া ক'বে আছে, একটু বাঁচবাব পথ পেলেই যেন সেদিকে দৌড় দেবে। কিন্তু ওরা ঠিক আচমকা ধ'বে ফেললে। রাণী ঘোষ চোখ রাঙিয়ে এসে জানতে চাইল যে খবরেব কাগজে ওব নাম অতো ছোট কেন। বলবার ধবনে আমার অপমানবোধ হোল, তাই গলাটাকে খুব আস্তে ক'বে বললুম — বিজ্ঞাপন আমি পাঠাই না, মুকুলেশবা পাঠায়, তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে দ্যাখ। রাণী ঘোষ ব'লে গেল — তবু জবাবটা আপনাবই দেওয়া উচিত ছিল, কারণ ওরা তো সব আপনারই ফলোযাব, যন্ত্রী তো আপনি। — তাবপব রিহার্সেলের সমযে খুবই হেলাফেলা ক'রে সংলাপ বলছিল, আমি বলে ফেললুম — যদি তোমার রিহার্সেল দেবার ইচ্ছে না থাকে দিয়ো না, কিন্তু দিতে উঠে এরকম করাটা যে এদলে চলে না সে কথা তোমাব জানা নেই? — বাস্‌। রাণী কেঁদে কেটে কী করলো সে তো সবাই জানো। আমি নাকি তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছি। দলের প্রতি অনুরক্তি আমার চেয়ে তাব একতিলও কম নয়। এবং কমিটির লোকেরা এর প্রতিকার না করলে সে আর এ দলে থাকবে না ইত্যাদি। — পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরী হোল, সামান্য জ্বরেব মতো হয়েছিল। নীলিমা

আমাকে চা দিতে এলো বাইরে যাবার পোশাকে। বললে — তোমাব এমনি ডাল ভাত বেঁধে রেখেছি, কালকেব তরকারিটাও আছে। যদি আরও কিছু ইচ্ছে হয় রেঁধে নিও। আমি চললাম।

আমি হতবুদ্ধির মতো বললুম — কোথায়?

নীলিমা বললে — সে কথা তোমাকে বলবার কোনও প্রয়োজন দেখছি না, কাবণ সেটা তোমার কোনও আগ্রহের বস্তুই নয়। খালি এইটুকু জানালেই যথেষ্ট হবে যে আমি অসতী হয়েছি, আর সেই জন্যই চ'লে যাচ্ছি।

আমি উঠে গিয়ে ওর হাতটা ধ'রে বললুম — নীলিমা, কী বলছো তুমি?

ও বললে — হাত ছাড়ো।

আমি বললুম — না। তোমাকে আমি যেতে দেব না। তোমার মাথাব ঠিক নেই, তুমি সুস্থ হও, তারপরে যা ইচ্ছে হয় কোবো।

নীলিমা টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলে, বললে — সুস্থ মানে? তোমাব মনোমত হওযা? তুমি যেটাকে ভালো মনে করো সেইটেই সবচেযে ভালো, সকলের পক্ষেই ভালো, তাই না? আশ্চর্য আত্মম্ভরিতা তোমার।

কঠিন বিদ্রূপেব হাসি হেসে উঠলো নীলিমা, বললে — তুমিই একমাত্র মানুষ, না? তোমার মতই একমাত্র মত, না? কিন্তু আব আমি তোমার বৌ না। আমি অসতী। অসতী হয়ে আমি তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। এখন থেকে আমার নিজেব ভালোমন্দ আমি নিজে বুঝবো।

আমি জিজ্ঞাসা করবো না মনে করেও না-জিজ্ঞাসা ক'রে পারলুম না, — কে, কে সে?

নীলিমা বললে — অরুণাংশু। (চেঁচিযে বললে) — হ্যাঁ। অ-রু-ণা-ং-শু।

এমনই একটা সন্দেহ একদিন আমাব মনে হযেছিল। ছেলে মারা যাবাব পব থেকেই অরুণাংশু একটু বেশী আসতো আমাদের বাড়িটায়। আমার অবর্তমানেই আসতো। একদিন বিকেলে আমি এসে পড়াতে কী রকম যেন সন্ত্রস্তও হয়েছিল, তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে চলে গেল, আমাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেল যে আমিও রিহার্সেলে যাবো কিনা। কিন্তু নীলিমাকে আমি খুব লক্ষ্য করেও তো তাব মুখে কোনও আনন্দের আভাস, বা গোপনীযতার চেষ্টা, কিছুই তো দেখতে পাইনি। তাই আর সে সন্দেহকে প্রশ্রয় দিইনি। আজ সেইটাই হঠাৎ বাজের মতো আচমকা আমারই মাথায পড়লো। — হয়তো খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে গিযেছিলুম, হঠাৎ দেখি, নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটে গিয়ে দরজা আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে বললুম — আমি তোমাকে যেতে দেব না। তুমি ভুল করছো। অরুণাংশুর এবকম করা স্বভাব। সে কখনো —

নীলিমা বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো — অরুণাংশুর সম্বন্ধে তুমি কোনও কথা না বললেই তোমার মর্যাদা থাকতো —

আমিও তেমনি ক'রে বললুম — বলবো না। আমি কারোর সম্পর্কে কোনও কথা বলবো না। কিন্তু তুমি এই পাগলামি কোরো না, এটা পাগলামি —

নীলিমা প্রায় চীৎকার ক'রে বললে — আমি অসতী, — অসতী। আমার সঙ্গে তুমি বাস করবে কী করে —

আমি বললুম — না। একদিনের একটা ঘটনায় কেউ খারাপ হয়ে যায় না। তুমি থাকো, তোমাকে আমি যেতে দেব না —

বলতে বলতে আমি তাকে টেনে বিছানার কাছে নিয়ে এলুম। বললুম — একদিন তো তোমাতে আমাতে যে সম্পর্ক ছিল সেটা পবিত্র ছিল, সেটা পুণ্যের ছিল —

নীলিমা যেন কী এক অন্ধ আক্রোশে হিংস্র হয়ে উঠে আমার বুকের কাছের গেঞ্জিটা টেনে ধ'রে বললে — বুঝতে পারো না কেন? আমি সেটাকে নোংরা করেছি। তোমার এই বিছানায় আমি অন্য লোকের সঙ্গে শুয়েছি। শুয়ে তোমাকে ঠাট্টা করেছি। নোংরা করেছি, বুঝতে পারছো, সমস্ত বাড়িটাকে নোংরা করেছি। থাকবে? থাকবে এখনো আমাকে নিয়ে? পারবে? —

আমি দুহাত দিয়ে মাথাটাকে ঢেকে ব'সে রইলুম, যেন আমার মাথায় কেউ মেরেছে। কখন যে নীলিমা চ'লে গেল জানতেও পারিনি। .....এক গ্লাস জল আনতে বলতো মুকুলেশ।

আমি যে চেঁচিয়ে জল আনতে বলবো সে ক্ষমতা ছিল না। ভয় হচ্ছিল যে একটু জোরে কথা বলতে গেলেই হয়তো গলা ভেঙে যাবে। তাই উঠে গিয়ে ছোট রান্নাঘরটা থেকে জল চেয়ে নিজের হাতে নিয়ে এলুম। পুবানো পাথরের টেবিলের ওপর চায়ের দাগ লেগে আছে, মাছি উড়ছে, তার পাশে গ্লাসটা রাখলুম। সত্যপ্রিয়দা সমস্ত জলটাই ঢক্ ঢক্ ক'বে খেয়ে ফেললেন।

তাবপব আবার বললেন, — কমিটিব মধ্যে দুটো দল হযে গেল। কিন্তু মেজবিটি বললে যে আমি দলটাকে নিজের জমিদারীর মতো ব্যবহার করি। আমাব উচিত বাণী ঘোষের কাছে সকলের সামনে ক্ষমা চাওয়া। আমি বললুম, যে আর আমি কোনও ব্যাপারে কোনরকম জোর খাটাতে যাবো না, কোনো পদেও আমি থাকতে চাই না, আস্তে আস্তে সেগুলোও অন্যেবা নিয়ে নিক, কিন্তু ক্ষমা চাইতে হ'লে আব আমি এখানে থাকতে পারবো না, কারণ আমি যে নিজেব দোষ বুঝতে পাবছি না, দোষ বুঝলে — তোমরা জানো — আমি কখনো ক্ষমা চাইতে পবাঙ্মুখ হই না। আমাকে এমনি সাধারণ সভ্য হিসেবে থাকতে দাও। আমি এখনো কাজ কবতে পাবি, আমাকে কাজ করতে দাও —। অনেকের হয়তো বা মন ভিজেছিল কিন্তু খগেন বললে — আমার মনে হয় সত্যপ্রিয়দা, আপনার এখন দল ছেড়ে দেওযাই উচিত। আপনাব আইডিযাগুলো পুরানো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনাব প্রোডাক্শন্ আব পপুলাব হচ্ছে না। আমার মনে হয আধুনিক নাট্য আন্দোলনে আপনাব আব কিছু কববাব নেই।

হঠাৎ আমাব মনে হোল যে খগেনরা ঠিক বলেছে। আমি কোনও কিছুই তো ঠিক ক'রে কবতে পারলুম না। মানুষের ঘরের জীবন আর বাইরের জীবন — এই দুটো স্তর তো কতো চেষ্টা করেও আমাদের অভিনয়ে একসঙ্গে আনতে পারলুম না। অথচ কী একটা মূল কারণে আমাব দুটো জীবন একসঙ্গে ভেঙে গেল। — যদি সেটা এতদিনেও বুঝতে পারতুম তাহলে আবার হয়তো নাটক করতে আসতুম।

খুব জোরে নিশ্বাস টেনে সত্যপ্রিয়দা বললেন — "চলো, বেরিয়ে পড়া যাক, ভিতরটায় যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।"

দুজনে বেরিয়ে এলুম ফুটপাতে। হঠাৎ যেন সমস্ত শহরের গোলমালটা ভেঙে পড়লো আমাদের ওপর। বাইরের আলো যেন চোখ বিঁধতে লাগলো।

সত্যপ্রিয়দা আমার বাহুটা ধ'রে রাস্তার ভীড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন — "এই হোল জীবন, এ কিছুই পবিত্র থাকতে দেয় না। ভালোর মধ্যে মন্দ, আর মন্দের মধ্যে ভালো, সব জড়াজড়ি ক'রে আছে। এখানে লখীন্দর যেমন আদরের, সাপও তেমনি আদরের। এখানে বেহুলাকে স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে হয় স্বর্গের সভায় নাচ দেখিয়ে। উদ্দেশ্যের জোরে নয়, যুক্তির জোরে নয়, — লাস্যের অভিনয় ক'রে। খগেনরাই ঠিক, আমি ভুল।"

হাঁটতে থাকেন সত্যপ্রিয়দা। আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটি। একটু পরে জিজ্ঞাসা করি, — "আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে যাবো?"

উনি যেন আপনমনে হাঁটছিলেন, এই কথায় হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন — "না। সেখানে, — সেখানে নীলিমা আছে। কোনও চেনা লোক দেখলে তার ভালো লাগবে না।"

ব'লে উঠলুম — "বৌদি কি আপনার কাছে?"

সত্যপ্রিয়দা ফুটপাতের কিনারে গিয়ে দাঁড়ান রাস্তার দিকে মুখ ক'রে। তারপব বললেন — "হ্যাঁ। অন্তঃসত্ত্বা হবার কিছুদিন পরেই ও আমার কাছে পালিয়ে আসে। বলে, এবাবে যেন আমি ওর সন্তানটাকে বাঁচাই।"

খুব চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু বাঁচলো না। সেই প্রসব হওয়ার সময়েই নীলিমার পক্ষাঘাত হয। এখন আমরা ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। — তোমরা যারা অল্পবয়সী, যাদের এখনো আশা আছে, তারা বুঝতে পাববে না যে সমস্ত আশা-ভরসা খুইয়ে যখন দুটো মানুষ পবস্পরকে জড়িয়ে ধ'বে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে মৃত্যুব অপেক্ষায়, তখন তাদেব ভালোবাসা সে কী বকম ভালোবাসা। — আচ্ছা, আমি চললুম।"

একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লেন তিনি।

ফুটপাতেব ওপব থেকে একটা কলেজের ছেলে ব'লে উঠলো — "মাইবি কি অস্বাভাবিক লম্বুবে।"

আমার হঠাৎ জবাব দেবাব ইচ্ছে হোল যে, হ্যাঁ, আমাদের এই বেঁটেদেব জাতে ওদেব বাঁচতে দেওযা উচিত নয, ওবাই অস্বাভাবিক। কিন্তু কিছু বলতে পাবলুম না, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে হাঁটতে লাগলুম।

অনুপমা

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

তখনও জানতাম না ব্যাপারটা। তাই নাম জিজ্ঞাসা করতে মেয়েটি যখন হাসতে শুরু করল তখন বললাম, তোমার নামটা বোধহয় খুব মজার তাই হাসছ।

আমার কথা শুনে মেয়েটি আরও জোরে হাসতে হাসতে বললে, না না, এমনি সাদামাটা নাম। অনুপমা। সবাই 'অনু' বলে ডাকে। আপনিও তাই ডাকবেন। বলে আবার হাসতে লাগল অনুপমা।

বুঝলাম হাসিটা ওর কথাব বাহন। গানের সঙ্গে যেমন তানপুবা ওব তেমনি কথার সঙ্গে হাসির ফোযারা। তার ওপব অনুপমা সুরূপা। ভাবি সুন্দর মুখশ্রী। সঙ্গে এমন সবল হাসি। তাই ওর কথা শুনতে ভালই লাগে।

প্রথম যেদিন আমার কাছে এল সেদিন শুধু দু'চাবটে কথা বলেই চলে গেল। বললে, আবাব একদিন আসব।

এরপব অনুপমা একদিন এসে বললে, দাদা, আপনাব একটা ছবি দেবেন?

হ্যাঁ, দেব।

ছবি দিলাম। ছবিটা হাতে নিযে নাড়াচাড়া কবে বললে, এব তলায আমাব ভাইয়েব নাম লিখে দিন। ছবিটা যেন আপনি আমাব ভাইকে দিচ্ছেন। আমাব ভাইযেব নাম বিজয়।

ছবির তলায় লিখলাম, স্নেহেব বিজযকে —

খুব খুশি হল অনু। বললে, এটা পেয়ে আমাব ভাই খুব খুশি হবে। বড চঞ্চল ছেলেটা, তবে আপনাব গান শুনলে একটু স্থির হয়ে বসে।

এতগুলো কথার মধ্যে কত যে হাসল অনু তাব হিসেব নেই। হাসলে ওর সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো যেন টুথপেস্টেব বিজ্ঞাপনেব কোন মেযের মত দেখায়।

এইভাবেই ও মাঝে মাঝে আসে আমাব কাছে। এখন ওর কাছ থেকে জেনেছি ওর ভাই বিজয় কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আছে। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করাব পর আর পড়ে নি। এখন দিনরাত কেবল পার্টি নিযে আছে। তাই অনুব খুব ক্ষোভ। বলে, এই দেখুন না আমার কথা। আমি একটা প্রাইমারি স্কুলের টিচার। বাড়িতে অসুস্থ বাবা। চাকরি থেকে অবসর নিযেছেন। দুটো বোনও আছে। তারা এখনও স্টুডেন্ট। আর এই বিজয় আমাদের একমাত্র ভাই। ও কোথায় চাকরির চেষ্টা করবে তা নয়, দিনরাত টো টো করে ঘুরছে। আমার একার রোজগারে এতগুলো লোকের খাওয়া-পরা। তাই আমাকে দু'চারটে প্রাইভেট টিউশনিও করতে হয়।

এতগুলো দুঃখের কথা বলল কিন্তু সব হাসতে হাসতে। নতুন কেউ শুনলে মনে করবে বানিয়ে বানিয়ে কথাগুলো বলছে। নইলে এসব কথা কি কেউ হাসতে হাসতে বলতে পারে!

প্রায়ই অনু আসে আর দু'চারটে কথা বলে চলে যায়। বেশিক্ষণ বসতে পারে না। বলে, অনেক কাজ দাদা। তবু আপনার কাছে এলে মনটা ভাল হয়ে যায়। বুঝতেই পারছেন আমার

কত দায়িত্ব — বলে এমন হাসবে যেন মনে হবে ঠাট্টা করে কথাগুলো বলছে। কিন্তু আমি তো জানি এগুলো ঠাট্টা নয়। সব সত্যি। আসলে হাসিটা ওর মুদ্রাদোষ। মুদ্রাগুণ বললেই ভাল হয়।

এরপর বেশ কয়েকদিন অনুর দেখা নেই। তারপব একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে এল। হাসতে হাসতে বললে, আপনাব কাছে আসব আসব করেও আসতে পারিনি। কী কবে পারব বলুন? এখন তো রান্নাটাও আমার ঘাড়ে পড়ল।

বললাম, কেন, তোমাব মা তো রান্না করেন। তিনি বুঝি অসুস্থ?

অনু বললে, অসুস্থ তো হয়েছিল মা। কিন্তু সুস্থ আর করতে পাবলাম কই? চলে গেল। বলে হেসে উঠল অনুপমা।

মার মৃত্যুর কথা বলেও হাসি। এ হাসিতে মন সায় দিল না আমার। চুপ কবে গেলাম। অনু জিজ্ঞাসা সবল, আপনার কি শরীব খারাপ দাদা? এত চুপচাপ হয়ে গেলেন যে?

বললাম, তোমার মার মৃত্যুব খবব শুনে আমি তো তোমার মত হাসতে পারি না। তুমি যে কি কবে হাস তা বুঝি না।

অনুপমা গলায় জোব এনে বললে, কেন হাসব না? ভগবানের কী কাণ্ড দেখুন। মা ছিল নিপাট ভালমানুষ। সংসাবটাকে মাথায় করে বেখেছিল। তাঁকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আমাকে জব্দ কবতে চায় ভগবান। আমাকে কাঁদাতে চায়। কিন্তু আমিও তেমনি মেয়ে। কাঁদতে আমাব বয়ে গেছে। বলে হাসতে লাগল অনু।

এমন মেয়ে এর আগে আমি দেখিনি। হাসতে দেখেছি অনেক মেয়েকে। প্রাণ খুলে হেসেছে তাবা হাসিব কথায়। কোন সুখবব পেয়ে আনন্দে হেসেছে। কিন্তু কান্নাব কথায হাসতে দেখিনি আর কাউকে। তবে জগতে কত বিচিত্র মানুষ আছে। সকলকে কি আমবা জানি, না জানতে পারি।

অনুব অনেক সমস্যা। তারমধ্যে ওব এখন চিন্তা ভাই বিজযকে নিয়ে। সেদিন এসে অনু বললে, জানেন দাদা, গতকাল আমাব ভাইকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। তাবপবই হাসতে হাসতে বললে, এখন হাজতে থাকুক। ভালই হল।

বললাম, ভাল কেন?

অনু বললে, বাইবে থাকলেই তো একটা না একটা গণ্ডগোল বাধাবে। হাজতে আটকা থাকলে তবু কিছুটা জব্দ হবে। বলে খুব হাসতে লাগল অনু।

একদিন অনু একটা মেয়েকে নিয়ে এল আমার কাছে। বললে, দাদা, এ আমাব বন্ধু শিখা। এখন বেশ গাইছে। আপনি ওর গান শুনে দেখুন না একবার? শুধু ও কেমন গাইছে এটা ওকে বলে দিলেই হবে।

বললাম, ঠিক আছে শুনব। তবে আজ তো পারব না। আমাকে এখুনি বেরতে হবে। পরশু একে নিযে এস।

অনু বললে, পরশু তো আমি আসতে পারবনা। ওদিন আমায় দু'জায়গায় পড়াতে যেতে হবে।

বললাম, শিখা একাই আসুক। গান শুনে নেব।

নির্দিষ্ট দিনে শিখা একাই এল। ওর গান শুনলাম। মোটামুটি ভালই গায়। সেই কথাই বললাম শিখাকে। শিখা শুনে খুশি হল। বললে, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি।

বললাম, আশীর্বাদ করছি। তবে গানের লাইনে এখন ভীষণ প্রতিযোগিতা। এত ভিড় কাটিয়ে প্রথম সারিতে আসা খুবই মুশকিল।

আমার কথায় শিখা খুব দমে গেল। কান্নাভাঙা গলায় বললে, তাহলে কী দাদা আমি দাঁড়াতে পারব না?

ওকে উৎসাহ দিতে বললাম, পারবে না কেন? নিষ্ঠা আব চেষ্টা থাকলে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে যাবে।

এবার খুশি হল শিখা। বললে, চেষ্টা আমি করছি। আর নিষ্ঠা আমার আছে।

বললাম, তাহলে আর ভাবনা কী। তোমাব হবে।

এরপরই আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, অনু তোমাব কতদিনের বন্ধু?

শিখা বললে, আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকি। আমাদেব বন্ধুত্ব সেই ছেলেবেলা থেকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা একটা কথা বলতে পার?

কী কথা দাদা? বললে শিখা।

বললাম, অনু কি ছেলেবেলা থেকেই এইরকম? মানে এই কথায় কথায় হাসি। দুঃখেব কথাও দিব্যি হাসতে হাসতে বলে?

শিখা বললে, অনুকে যে কত বকমের ঝামেলা পোহাতে হয তা যদি জানতেন। বাবা অসুস্থ। মা মারা যাবার পর সংসারের সব কাজ ওকে কবতে হচ্ছে। ওব দুটো বোন আছে। তারা কলেজে পড়ছে। তারা অনুর মত নয। এবমধ্যেই বযফ্রেন্ড জুটিয়েছে। এসব ব্যাপাবও নজরে রাখতে হয় অনুকে। তার ওপর নিত্য অশান্তি ভাই বিজয়কে নিয়ে। অনু কিন্তু এসব ঝামেলা হাসিমুখে সহ্য করে যাচ্ছে। সবদিক একা সামলাচ্ছে।

বললাম, অসাধারণ ক্ষমতা তো অনুর। তাও আবার হাসতে হাসতে লডছে।

শিখা বললে, হ্যাঁ, এই হাসিটাই ওব শক্তি। অনু বলে, দুঃখকে ভয় পাই না আমি। দুঃখের পরে দুঃখ এলে সহ্য করা সোজা। তাই দুঃখেব কথা হাসতে হাসতে বলি। কিন্তু আমাব ভয় সুখকে। সুখেব পবে দুঃখ এলে তা বোধ হয় এমন হাসতে হাসতে সইতে পাবব না। তাই সুখকে আমি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।

খুব দামি কথা বলেছে তো অনু। বললাম শিখাকে।

উত্তরে শিখা বললে, আপনাকে তাহলে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। অনুকে তো এতদিন দেখছেন। সত্যিই সুন্দরী। একজন বডলোকেব ছেলে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু ও বাজি হয় নি। বাজি না হওয়াব কাবণ জিজ্ঞাসা কবাতে বললে, আমি গরিবের মেয়ে। ওদেব অবস্থার সঙ্গে আমাদের অবস্থার আকাশ-পাতাল তফাত। রূপের মোহের আয়ু বড অল্প। দু-দিন ঘর করতে করতেই অরুচি। তখন আমাকে ছেড়ে দিলে কী অবস্থা হবে আমাব। পাহাড থেকে গড়িয়ে একেবারে তলায়। খবরের কাগজ খুললে এবকম ঘটনা তো প্রায়ই দেখা যায। না ভাই, দুদিনের সুখের আমার দরকাব নেই। আমার দুঃখই ভাল। তবু তো হাসতে পারছি।

এরমধ্যে অনু একদিন এল। শিখার গান আমার ভাল লেগেছে জেনে খুব খুশি হল। বললে, শিখার চেষ্টা আছে। তবে দোষ কী জানেন, কোথাও একটু ধাক্কা খেলে বড্ড মুষড়ে পড়ে। তখন ওর কান্না কান্না মুখ দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু ওকে সান্ত্বনা দেব কি, আমার হাসিটাই সব মাটি করে দেয়। কী মুশকিল বলুন তো।

অনুর এইসব কথা শুনতে বেশ লাগে। দুঃখ তো সংসারে সবারই আছে। কিন্তু হাসি দিয়ে কীভাবে দুঃখকে ঢেকে রাখতে হয় তা পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলেছে মেয়েটা।

এরপর বেশ কিছুদিন অনু এল না আমার কাছে। এতদিন তো দেরি করে না। যতই কাজ থাক তবু পাঁচ মিনিটের জন্যেও একবার দেখা করে যায়। হাসতে হাসতে দু'চারটে দুঃখের খবরও দিয়ে যায়।

সেদিন নিউমার্কেটে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি সামনে অনুপমা। চমকে উঠলাম ওকে দেখে। সিঁথিতে সিঁদুর। হাতে শাঁখা। পাশে যমদূতের মত লম্বাচওড়া একজন লোক। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। বয়েস প্রায় ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ। তেইশ বছরের অনুপমাব পাশে একেবারে বেমানান। আমাকে দেখে এগিয়ে এল অনু। পাশের লোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বললে, ইনি আমার স্বামী। তারপর হাসতে হাসতে বললে, এইসব ব্যাপারে খুব ব্যস্ত ছিলাম বলে আপনাব কাছে যেতে পারিনি। দু'একদিনেব মধ্যে যাব।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। এমন একটা ফুটফুটে চেহারাব মেয়ের এই স্বামী! তাছাড়া হঠাৎ বিয়েটা হলই বা কী করে। ও তো একবারও নিজের বিয়েব কথা আমাকে বলেনি।

অনুপমা পরের দিনই এল আমার কাছে। স্বামীকে নিয়ে নয়। একলাই এল। এসেই কুলকুল করে হাসি। বললে, খুব অবাক হয়ে গেছেন তো।

বললাম, অবাক হওয়ারই কথা। বলা নেই কওয়া নেই একেবাবে বিয়ে। তাও আবাব. . .।

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই ও বললে, বুঝেছি আপনি কি বলতে চান। ওব চেহারাটাই ওরকম। গায়েও ভীষণ জোব। আমার মত চাবটে মেয়েকে একসঙ্গে তুলে ধবতে পাবে। এত ক্ষমতা ওর। কিন্তু দাদা, মানুষটা ভাল। একটু থেমে বললে, তাছাড়া ওকে বিয়ে না করে আমার উপায় ছিল না। আমার ভাইকে বাঁচাতেই ওকে বিয়ে কবতে হল। বলে একগাল হাসি।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ভাই কী করেছিল?

অনু বললে, এমনিতে তো এদলে ওদলে ঝগড়া মাবামাবি লেগেই আছে। কিন্তু এবাবে একেবারে খুনোখুনি ব্যাপাব। আমাব স্বামী না থাকলে সেদিন বিজয নির্ঘাত খুন হত। উনি তো এককালে এসব করেছেন। তাই সেই ছেলেটাব হাত থেকে বাঁচাতে পাবলেন বিজযকে। আব তারই জোরে বিজয় খুন কবল সেই ছেলেটাকে। সব ঘটনা ঘটল আমাব স্বামীব চোখেব সামনে। তার মানে পুবো ব্যাপাবটার সাক্ষী থেকে গেলেন আমাব স্বামী।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপব?

অনু বললে, তারপর আর কী। ইনি এলেন আমার কাছে। সোজা প্রস্তাব। বললেন, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হও তাহলে বিজয়ের কোনও ভয় থাকবে না। তুমি আমাব স্ত্রী হওয়ার পর শালাবাবুকে তো আর ধরিয়ে দিতে পারব না। উল্টে প্রাণ দিয়ে রক্ষে করতে হবে বিজয়কে। ব্যস, রাজী হয়ে গেলাম। বলে প্রায় দু'মিনিট ধবে হাসল অনু। তারপব হাসতে হাসতে বললে, আপনি ওকে ভুল বুঝবেন না দাদা। ভাবছেন আমাকে ব্ল্যাকমেল করে বিয়ে করল। ঠিক তা নয়।

তবে কী? জিজ্ঞাসা করলাম।

অনু বললে, ওব কথায আমি নিজেই রাজী হয়ে গেলাম।

বললাম, কেন?

কেন আবার। ইদানীং আমাকে বিয়ে করার জন্যে বেশ কয়েকজন খুব বিরক্ত করছিল। এঁকে বিয়ে করে আমি রেহাই পেলাম। এখন আর আমার কাছ ঘেঁসতে কেউ সাহস করবে না। মানুষটি আগে যা ছিল ছিল। এখন ওসব ছেড়ে দিয়েছে। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে শক্তিটাকে বজায় রেখেছে। আমাকেও সেইভাবে তৈরি করতে চায়। আমার গা-হাত-পা টিপে বলে বড্ড নরম। তোমাকে ব্যায়াম শেখাব। এই বলে আমার শরীরটাকে নিয়ে লোফালুফি করতে থাকে।

বললাম, তোমার ভয় করে না? ওর হাত ফস্কে পড়ে গেলে।

অনু হাসতে হাসতে বললে, পড়ে গেলে ওর যাবে। আমার কী।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার স্বামী করে কী?

অনু বললে, ব্যবসা। এখন খুব সৎভাবে টাকা উপায় কবে। খুব ভাল লোক দাদা। আমার কথা শোনে। হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে চলে গেল অনু।

শিখা একদিন এল। জিজ্ঞাসা করলাম, অনু কেমন আছে?

বললে, অনু বেশ ভালই আছে। ওর বাবা মাবা গেছেন। বোন দুটোরও বিয়ে দিয়ে দিয়েছে অনু। আর ভাইটা কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথায চলে গেছে। অবশ্য যাবার আগে অনুকে জানিয়ে গেছে।

শুনে খুব ভাল লাগল। যাক মেয়েটার ওপব থেকে অনেকগুলো দাযিত্ব চলে গেল। এখন ওরা স্বামী স্ত্রী বেশ ভালই আছে তাহলে।

এখন অনু খুব বেশি আসতে পাবে না। এলেও বেশিক্ষণ থাকে না। বলে, অনেক কাজ দাদা। আমাব স্বামী তো তাব ব্যবসা নিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ব্যবসার কাজে দু'চারদিনের জন্যে কলকাতার বাইরেও যেতে হয়। তাই বাড়ি ছেড়ে আসতে পারি না। আমাকেই তো সব কিছু দেখতে হয়।

জিজ্ঞাসা কবলাম, তোমাব স্কুলের চাকবিটা কবছ তো?

অনু বললে, না দাদা, ও কাজটা ছেড়ে দিযেছি। উনিই বললেন, এখন আর তোমার চাকরিব দরকাব কী। তার থেকে আমাব ব্যবসার ব্যাপারে চিঠি লেখা হিসেব পত্তব রাখা এইসব কাজগুলো কব। তাই ছেড়ে দিলাম স্কুলেব চাকবিটা। বলে আবাব সেই হাসি।

বললাম, হ্যাঁ, দবকাব যখন নেই তখন চাকবি কববে কেন। তার থেকে নিজেদের ব্যবসাব কাজ দেখা অনেক ভাল।

এবপর অনেকদিন আব অনুব দেখা পাইনি। অবশ্য আজকাল এইবকম হচ্ছে। হয় তো আজ এল, তাবপব তিন চাব মাস আব দেখা নেই। তাবপব হঠাৎ একদিন এসে হাজির। কিন্তু এবাব প্রায় মাসছয়েক কি তাবও বেশি আসে নি আমাব কাছে। ওর কথা যখন প্রায ভুলে যেতে বসেছি তখন একদিন এসে হাজিব।

কিন্তু অনুব এ-রূপ আমি দেখার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। হাতেব শাঁখা উধাও। সাদা সিল্কেব থান পবে এসেছে।

ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করাব আগেই বললে, কপালে সইল না দাদা। উনি চলে গেলেন।

কী হয়েছিল? জিজ্ঞাসা করলাম।

অনু বললে, হবে আব কী। খুন। উনি যাদেব হাত থেকে আমার ভাইকে বাঁচিয়েছিলেন তাদেবই কেউ বদলা নিল। বলে হাসল অনু।

ওর হাসিটা এবাব আমাব অন্যবকম লাগল। মনে হল যেন জোর করে হাসছে। আগের মত সরল হাসি নয়। মেকী।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কী করবে ঠিক করেছ ?

বললে, কী আর করব। স্বামীর বিরাট ব্যবসা। ব্যবসাই দেখব। টাকাব তো অভাব নেই। বাড়ি, গাড়ি সব হয়েছে। এখন আমার খুব সুখ। বলে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলল অনুপমা।

সজনের ডাঁটা

কুমারেশ ঘোষ

সহরেব বাইরে খানিকটা জমি কিনে ছোট্ট একটা বাড়ি তোলা গেলো। বন্ধুবা বাড়ি দেখে মনে মনে খুশি হ'লেন কিনা জানিনে, তবে মুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কবলেন।

দক্ষিণ খোলা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি। সামনে বারান্দা। বারান্দার থামে লতিয়ে উঠেছে মাধবীলতা। সামনে একটু খোলা জায়গা, ঘাস বিছানো। তার এক পাশে তরিতরকারিব বাগান। আর একদিকে নানা ফুলেব গাছ। একজন ভদ্রলোকের বাগান থেকে একটা সজনেব ডালও এনে পুঁতে দিয়েছিলাম বেড়ার ধারে। সজনের ফুল আব ডাঁটা, দুই-ই ভোজন-বিলাসী বাঙালী বাড়িব পরম আদরের জিনিষ।

কথাটা গোপনেই বলি। বাড়ি তৈবী কবতে গিযে টাকাব টান পড়েছিলো যখন, তখন হাত পাততে হয়েছিলো আমার এক ধনী অথচ উদাব আত্মীযেব কাছে। বিমুখ হ'তে হযনি, সটান ধার দিযেছিলেন বিনা আড়ম্বরেই। অর্থাৎ মুখেব কথায টাকা পাওযা গেছলো হাতে. খৎ লিখে দিতে হয়নি। ঘটনাটি এ-যুগেব একটি বিস্ময়।

কিন্তু স্বাভাবিক যা, পাকে চক্রে তাই ঘটে গেলো। ভদ্রলোক হঠাৎ মাবা গেলেন। কাজেই তাঁর ছেলেদের বলে যেতে পারলেন না এই ধাব-দেওয়া টাকাব কথা। হয়তো, বেঁচে গেলাম আমি। এই নিয়ম ঃ একজন মবলে, আর একজন বাঁচে।

নাঃ বাঁচা গেল না। দিন-দুয়েক বাদে স্বর্গীয় আত্মীয়টির বড় ছেলে আমার দবজায এসে উপস্থিত। হাতে একখানি নোটবুক। বললো, বাবার নোটবুকে দেখচি তিনি আপনাকে দেড়হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। দেবেন টাকাটি ফেরত? এ সময়ে পেলে বড় উপকাব হয়। বড় দরকার ছিলো।

প্রথমে হকচকিয়ে গেছলাম। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, সে টাকা তো কবে শোধ করে দিয়েচি। লেখা নেই নোটবুকে?

— না।

— তবে বোধহয় তোমার বাবা নোটবুকে লিখতে ভুলে গেচেন।

এইবার আত্মীয়-পুত্র থতমত খেলো। হয়তো লজ্জাও পেলো সে। বললো, হযতো তাই। বাবা অনেককেই এরকম মুখের কথায টাকা দিতেন। শুধু নোট বুকে টুকে রাখতেন। আর যাঁদের কাছ থেকে ফেরত পেয়েছেন লিখেও রেখেছেন এই বইয়ে। আপনার টাকা উল্লেখ নেই বলেই এসেছিলাম। যাক, মনে কিছু করবেন না।

হেসে বললাম, না, না, মনে করবো কেন? তিনি সে সময় টাকাটা দেওয়ায় বড় উপকার হয়েছিলো। এ বাড়িতে বাস করচি, বলতে গেলে তাঁরই অনুগ্রহে। সত্যিকথা বলতে কি, তিনিই আমাকে এখানে বসিয়েচেন।

— আচ্ছা আমি তা হলে।

— একটু চা হবে না? — ভদ্রতা করলাম।

— না। — ছেলেটি বোধহয় লজ্জা পেযেই তাড়াতাড়ি চলে গেলো।

যাক বাঁচা গেলো। আর টাকা চাইতে আসবে না কেউ।

সেইদিনই দুপুরবেলা —

খেতে বসেচি। গৃহিণী পাঁচ তবকাবি ভাত সাজিযে নিয়ে সামনে ধবলেন। বসলেন একপাশে হাতপাখা হাতে নিয়ে।

সজনে ডাঁটাব চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে বললাম, বাঃ বেশ তো কচি ডাঁটা!

গৃহিণী হেসে বললেন, এ তোমারই বাগানেব। ঐ যে সেবার একটা সজনে ডাল পুঁতেছিলে পুবেব দিকে বেড়াব ধাবে, সেই গাছের ডাঁটা।

— সেই গাছেব?

চোখ দুটো বড় বড় হ'যে গেলো আমার। একটু যাকে জাযগা দিযেছিলাম, সে আজ প্রতিদানে দিলো তার যথাসাধ্য। আর আমি।

খাওয়া ছেড়ে একলাফে উঠে দাঁড়ালাম।

গৃহিণী অবাক হলেন, কী হলো?

বললাম, একটা দরকাবি কাজ মনে প'ড়ে গেচে। এখুনি বেরুতে হবে। তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে গেলাম।

উঠালাম দেড হাজার টাকা।

গেলাম ছুটে সেই আত্মীয়েব বাড়ি।

টাকাটা দিযেছিলাম মনে আছে, কিন্তু কি কৈফিযৎ দিযেছিলাম আজ আব মনে নেই।

নবীনা

রঞ্জন

ভদ্রলোক আবাব বললেন, ওঁকে কি তবে কাল একবার নিয়ে আসব?

আমি বললুম, না না, তেমন তাড়া তো কিছু নেই, রিপোর্টগুলি আমি দেখলুম তো, সব কিছু একেবারে নর্ম্যাল। কোন গোলমালই হওযা উচিত নয। ব'লে হাসলুম। আশা কবি, আমার হাসিটা যত চেষ্টিত ছিল ঠিক ততটা অনাস্তবিক দেখায় নি। নতুন ডাক্তারেব পসাব বাড়াতে হ'লে রোগীর প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন কববার উপায় নেই। তাই আবার বললুম, দিন পনেরো পরে একবার দেখা যাবে, এখন কিছু তাড়া নেই। আরও হেসে বললুম, ফজলুল হক কি বলেছিলেন মনে নেই? বিধি সময বেঁধে দিয়েছেন। তাড়া ক'বে লাভ নেই। এই বসিকতাগুলি আমার ভাল লাগে না, কিন্তু রোগীরা পছন্দ কবে। পব্রুচি বোল্না — সাফল্যের জন্যে এই মূল্য দিতেই হয।

আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, আমাব নিজেব তাড়া ছিল। সাডে ছ'টা বেজে গিয়েছিল। রাত আটটায় তরুণের বিয়ে। তাব আগে আমায মেসে ফিরে পোশাক বদল ক'বে নিতে হবে। তারপব তরুণের বাড়ি, সেখান থেকে ববানুগমনে বালিগঞ্জ যাত্রা। দীর্ঘ পথ। সময অল্প। আমার সত্যি তাড়া ছিল।

কাবও বিয়েতে আমি আজকাল সাধাবণত যাই নে। কিন্তু তরুণেব কথা আলাদা। সে আমাব পুরনো বন্ধু। পুবনো মানে মেডিক্যাল কলেজে আসবাবও আগে। প্রথম চেনা সেই স্কটিশে আই এস-সি. পড়বাব সময। দু বছবের পরিচয, কিন্তু দুজনেব দুজনকে এমন ভাল লাগল যে পরে যখন তরুণ বিজ্ঞানেব আগুন ছেড়ে আর্টেব ধোঁযাব আলো খুঁজল, আব আমি ডাক্তাবির মত ব্যবহাবিক বিদ্যায আত্মনিযোগ কবলুম, বন্ধুত্ব তখনও অটুট বইল। আমি মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি মির্জাপুবে একটা মেসে উঠে এলুম, তরুণও তাই করল। যদিও তার কলেজ র'যে গেল স্কটিশ চার্চ। আবও পবে তরুণ কমার্স প'ড়ে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হ'ল। আমি তো ডাক্তাব। তবু (নাকি সেই জন্যেই?) অন্তবঙ্গতা অক্ষুন্ন বইল। বস্তুত, তরুণেব পরে আব আমাব নতুন বন্ধুত্ব কাবও সঙ্গে হয নি। অতএব, বিযে সম্বন্ধে আমার মতামত যাই হোক না কেন, তরুণের বিয়েতে না গিযে আমাব উপায ছিল না। শুধু তাই নয়, না গেলে এমন কি যেতে দেরি হ'লে আমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা কবতুম না। তাই এত তাড়া।

তাডা মানেই দেবি। তখন ট্রামেব সামনে বাস এসে দাঁড়াবে। বাসেব সামনে গরুব গাড়ি। ডাক্তারের সামনে পুরনো বোগী, নতুন ডাক্তার। এড়াবাব উপায় নেই। কুশল জিজ্ঞাসা কবতে হয়। অন্যেব বেলায় যে প্রশ্নের উত্তরেরই প্রয়োজন হয় না, ডাক্তারের বেলায তাব উত্তবের শেষ নেই।

যোগেশবাবু যে? ভাল তো?

তা ভালই ছিলুম। কিন্তু কাল হ'ল কি, কি জানেন, এই গলদা চিংড়ির লোভ আমি কিছুতেই সামলাতে পারি নে। কিন্তু কাল আমার বড় শ্যালা, ওই যে যিনি লয়েডস ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু, তা ইন্‌চার্জ বললেই হয়, ওপরে এক ছোকরা সাহেব এসেছে, সে কিছুই জানে না, আমার শ্যালার কথায় ওঠে বসে। হ্যাঁ, কি বলছিলুম, ওই শ্যালা পাতিপুকুরে গিয়েছিল মাছ ধরতে। হ্যাঁ মশাই, ওই এক বাতিক ওর। তা যা বলছিলুম, সারা দিন ব'সে ব'সে আমার নস্কব মশাই কিছু পান নি। হে-হে। শেষে বিরক্ত হয়ে ফেরবার সময় শ্যালা এক রাশ গলদা চিংড়ি কিনে আনলে। সত্যি এক রাশ। আমার গিন্নী আবার — জানেন তো? — ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হয়, ভান করতে হয় যে শুনতে ভাল লাগছে। সেদিনও তাই হ'ল। এমনি একজন ভূতপূর্ব (অতএব, আশা রাখি, ভবিষ্যৎ) রোগীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর সমস্ত কাহিনী শুনতে হ'ল। ট্রামে উঠতেই সাতটা বেজে গেল।

ট্রামে উঠেও দেখি একেবারে অপর প্রান্তে আমার একজন রোগী দাঁড়িয়ে। রোগী মানে রোগীর স্বামী। দেখেই চিনতে পারলুম, তবু মুখ ফিরিয়ে নিলুম। মনে মনে বললুম, আমাব বোগীর সংখ্যা অল্প। তাই তো আমার সব রোগীর মুখ ও নাম মনে থাকে। আমি যদি কেদার দাস হতুম, বা বিধান রায়, — যা একদিন হবই — তা হ'লে কি আমাব মনে থাকত সব বোগীর কথা, তাদেব নাম, ধাম, অসুখ — সব বৃত্তান্ত? অসম্ভব। তখন আমি আমার বোগীদের পথে চিনতে না পারলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হবেন না। আজও তাই হোক।

আমি (ডাক্তার হিসাবে) বিধান রায় হব — এই কথাটা মনে হ'লেই ভাল লাগে। কিন্তু তখন আমি আমাব রোগীদের চিনব না, তারা সবাই আর আমাব কাছে বিভিন্ন এক-একটি ব্যক্তি থাকবে না, অসংখ্য বোগীদের মধ্যে কে কোথায় হাবিয়ে যাবে, জীবন্ত মানুষগুলি সব 'কেস্' হয়ে যাবে — এটা ভাবতে ভাল লাগল না। আমি সফল হতে চাই, কিন্তু হৃদয়হীনতায় সাফল্যেব যে মূল্য দিতে হয তা দিতে বাধে। পরে কি হবে জানি নে, এখন আমি চার বছর প্র্যাক্‌টিস করছি, কত বোগী দেখেছি বলতে পারব না, কিন্তু দেখা হ'লে আজও সবাইকে চিনতে পাবি। শুধু চেনা নয়, কে কেন এসেছিল তাব সব কিছু আমার চোখের সামনে নিমেষে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে, গোপালবাবু তাঁব প্রথম পুত্রেব জন্মেব সময পুত্রের জননীর চেয়েও বেশি কাতব হয়ে পড়েছিলেন। সুরেনবাবু তাঁর স্ত্রীর দুটো সীজাবিযান হবার পরেও সাবধান হন নি। গোপালবাবু বা সুবেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লেই সবটা মনে প'ড়ে যায় — যেন কাল বা পরশু তাঁদের আমি চিকিৎসা করেছিলুম। আমার এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি একাধাবে গর্বের বস্তু ও বিড়ম্বনার সূত্র। ট্রামের অন্য দিকে তাই নারায়ণবাবুকে দেখেও (স্ত্রীর নাম নাবায়ণী, মমতাজের প্রতিযোগিনী, ত্রয়োদশ কন্যার জন্মের আগে আমার কাছে এসেছিলেন) আমি না-চেনাব ভান ক'বে তাঁর দৃষ্টি এড়ালুম।

আমি ভাবছিলুম, তরুণের বাড়ি ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছতে পারব কি না! আশা ক্ষীণ। ট্রাম চলছিল আস্তে, ঘড়ি জোবে। গতিতে চিন্তা সাধারণত স্থগিত থাকে, গতির নেশাই মনকে অধিকার ক'রে থাকে। কিন্তু চলিষ্ণু যানে আরোহণ ক'রে স্থাণু হয়ে থাকলে অলস চিন্তা প্রশ্রয় পায়। তাই আমি ভাবছিলুম আমার আসন্ন বন্ধু হারানোর কথা। বন্ধুর বিয়ে মানেই তো বন্ধু-বিচ্ছেদ। তরুণ বিবাহিত হবে, আমি 'বিধবা' হব। তরুণ জীবনের সাথী পাবে, আমি আমার একমাত্র সাথী হারাব। ভাল লাগছিল না।

কিন্তু নিজের ক্ষতির কথা চিন্তা না করলে তরুণের কথা ভাবতে ভাল লাগছিল। ও বিয়ে করবারই মত ছেলে। ও আরও অনেক আগে বিয়ে করলেও অবাক হবার কারণ ছিল না। ও মাঝে-মাঝে ছোটগল্প লেখে। ওর জীবনের কল্পনাও ওই ছোটগল্পেরই মত। বিস্তার

নেই, অনাবশ্যক বিশ্লেষণ নেই, চরিত্রবাহুল্য নেই, সংসারের সামগ্রিকতা নিয়ে মিথ্যা মাথাব্যথা নেই — ছোট, সংক্ষিপ্ত, জমাট, জটিল, সুডৌল, সুগঠিত একটি কাহিনী। একটি, দুটি, বড় জোর তিনটি চরিত্র। নাটকের প্রথম অঙ্কের ভণিতা নেই, তৃতীয় অঙ্কেব সংঘাত নেই ঃ শুধু মাঝের ঘটনার মনোরম বিবরণ।

তরুণের স্বপ্ন ছিল জীবনকেও তার ছোটগল্পের মত নিখুঁত ও সংক্ষিপ্ত করা। তার অ্যাকাউন্টেন্সির ব্যালান্স শীটের মত ডেবিট আর ক্রেডিটে মিলিয়ে দেওয়া সর্বশেষ পাইটি পর্যন্ত। সেই হিসাবে সুন্দরী স্ত্রী না থাকলে জমার ঘরে অর্ধেক শূন্য থাকত। তরুণ বেহিসেবী নয়, সে অ্যাকাউন্টেন্ট। সে যে এত শীঘ্র বিয়ে করবে তা আব বিচিত্র কি?

আমি আমাব নিজেরই কাছে আমার দুঃখ গোপন ক'রে নিজেকে বললুম, তরুণ সুখী হোক, ব্যাচিলরত্বের উজান-ভাঁটার নদীতে নৌকাবিহার এবার শেষ হ'ল, সে তীব খুঁজে পেয়েছে, এবার সে নীড় বাঁধুক। আমার শুভেচ্ছা রইল। ঈশ্বরেব আশীর্বাদ ওদের উপব বর্ষিত হোক অজস্র ধাবায। আমি দূর থেকে ওদের দাম্পত্যসুখ অবলোকন ক'রে ধন্য হব। ঈর্ষা করব না, অভিশাপ দেব না; আর সুখের কথাই যদি বল, তরুণেব চেয়ে কে বেশি তা অর্জন করেছে? আমার বন্ধু হওযা সত্ত্বেও, তরুণেব বিবাহপূর্ব জীবন শুধু তাব বিবাহিত জীবনেব একনিষ্ঠ প্রস্তুতিই ছিল। বিবাহিত সুখে তাব সত্যি অধিকার ছিল।

যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই হ'ল। আমার মেসে গিযে ববযাত্রীর যোগ্য বস্ত্র পরিধান ক'বে কোনক্রমে কোঁচা সামলাতে সামলাতে যখন তরুণের বাড়ি পৌঁছলুম, তখন সবাই চ'লে গেছে বিবাহবাসরে। বাড়ির সামনে একটাও হাঁসওয়ালা গাড়ি না দেখে তা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হ'ল না। আমি ভাবলুম, ভালই হ'ল। সারাটা পথ এক-শহর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রেও এবাব একা একা বিয়ে-বাড়িতে যাওয়া যাবে। বিযেটা (এক স্বামী-স্ত্রীব কাছে ছাড়া) এমন কি একটা অসাধারণ ঘটনা যে আলো জ্বালিযে বাজনা বাজিয়ে তা প্রচাব না কবলে হবে না?

বিয়ে-বাড়িতে গিয়েও আমি প্রায় সকলের শেষে পৌঁছুলাম। তরুণকে তখন বিযেব আসবে নেওয়া হয়ে গেছে। কর্ণবিদারী কোলাহলেব মধ্যে ইতস্তত অতিথিবৃন্দ আহারে ব্যস্ত, যেমন হয়ে থাকে প্রত্যেক বাঙালীর বিয়েতে। কোনক্রমে খাওয়া সেবে ট্রাম ধরা, বিয়েটা যেন একটা উপলক্ষ মাত্র। আমি পৌঁছতেই তাই কন্যাকর্তাদের মধ্যে কযেকজন এসে বললেন, পাতা পড়েছে, এখনি ব'সে গেলেই ভাল। আমি এসব উপরোধ উপেক্ষা ক'রে বিযেব জায়গায়, অর্থাৎ ছাতের উপরে, যেতে চেষ্টা করলুম। আমি খেতে আসি নি, আমি আমাব একমাত্র বন্ধুর বিয়েতে এসেছি।

কিন্তু বরের এক মাইলের মধ্যে আমার মত কাবও যাবাব উপায় ছিল না। চতুর্দিকে মহিলাপরিবেষ্টিত হয়ে বেচারী তরুণ যথাসাধ্য আশানুরূপ পরিহাসে ব্যস্ত ছিল। সত্য বলতে কি, তরুণ পারে এগুলি; আমি পারি নে। মেয়েদের-ভাল-লাগে এই রকমেব বসিকতা ওব সহজেই আসে, আমার আসে না। রোগী নয়, আত্মীয়া নয, এই রকম কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'লেই আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ কবি। বলবাব মত কোন কথা খুঁজে পাই না, কলারের তলায় শুধু ঘামতে থাকি। তার উপর যদি একের বদলে একঝাঁক মেয়ে হয় তা হ'লে তো কথাই নেই। আমাকে বরং এক দল ম্যান-ঈটার দিয়ে ঘিবে রাখ, কম গাল দেব।

আমি তাই ছাতের স্বল্পালোকিত একটা কোণে দাঁড়িয়ে রইলুম, সেখান থেকে আমি সবকিছু দেখতে পাব কিন্তু আমাকে কেউ দেখবে না। এইটেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। জীবনে কখনও ক্রিকেট খেলি নি, কিন্তু ক্রিকেট খেলা দেখতে আমার ভাল লাগে। জীবনেও আমার স্থান মাঠে নয, গ্যালারিতে। মঞ্চে নয, বীয়াব স্টলে।

কিন্তু নাটক ও খেলায় বিরাম আছে। তখন সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্ব'লে ওঠে, অন্যান্য দর্শকের অলস চক্ষু শিকার-সন্ধানে ব্যাধের মত ইতস্তত চতুর্দিকে বিচরণ করতে থাকে। আমিও সেই দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পেলুম না। একজন অতিব্যস্ত ভদ্রলোক দ্রুতপদে এক দিক থেকে অন্য দিকে যেতে যেতে আমায় দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। সর্বাঙ্গে স্বেদ ও হলুদের অবস্থিতি থেকে বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে তিনি কন্যাপক্ষের কর্তাব্যক্তি। অতিথিদের, বিশেষ ক'রে বরযাত্রীদের, পরিপূর্ণ তুষ্টিবিধানই তাঁর একমাত্র চিন্তা। আমাকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি কাছে এগিয়ে এলেন। আসতে আসতে বললেন, আসুন, আসুন, আর সবাই ব'সে গেছে, এব পরে ট্রাম —

ভদ্রলোক কাছে এসে আর কথাটা যেন শেষ করতে পারলেন না। আমিও ভদ্রলোককে দেখে একটু বিব্রত বোধ করলুম। বিরতির পরে তিনি বললেন, ও, আপনি? তা — তা — এখনও আপনার খাওয়া হয় নি বুঝি? তা — আসুন না আমার সঙ্গে, আর সবাইয়ের খাওয়া যে হয়ে গেছে প্রায়। আসুন।

স্পষ্টতই ভদ্রলোক আমাকে চিনেছেন। আমারও মনে হ'ল, এঁকে কোথাও দেখেছি। কিন্তু অন্তত এই একবার আমার স্মৃতিশক্তির গর্ব খর্ব হ'ল। কিছুতেই মনে করতে পারলুম না, ভদ্রলোক কে, বা কোথায় তাকে দেখেছি, বা কবে আর কেন। তবু বিস্মৃতি গোপন ক'রে চেনবার ভান ক'রে বললুম, আমি এখন খাব না। যদি কিছু মনে না করেন, তরুণের সঙ্গে একবারটি দেখা ক'রে পরে নীচে যাব।

অনিশ্চিতভাবে ভদ্রলোক বললেন, ওঁকে কি আব এখন পাবেন? বেশ, পবেই না হয় খাবেন। আমাদের কিন্তু সব আয়োজন তৈরী। সময় হ'লেই সোজা দোতালার ঘবে চ'লে আসবেন।

ভদ্রলোক বিদায় নিলে আমি মনে মনে আমার বোগীর নাম-তালিকায় তাঁর সন্ধান কবলুম। বার বার মনে হ'ল যে, তিনি আমাব কাছে এসেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্মবণ কবতে পারলুম না কেন — সন্তান হয় না ব'লে, না, কি সন্তান আসন্ন ব'লে?

আমি ওঁর কথা ভাবতে ভাবতে ছাতের অপর প্রান্তে আবাব আমাব বন্ধু তরুণকে দেখছিলুম। ভাবছিলুম, বছর না ঘুরতেই সে-ও হয়তো আমাব কাছে আসবে খবর দিতে — আর কতদিন বাকি, কোন ভযের কারণ আছে কি না, ইত্যাদি। কিন্তু অত দূরের কথা চিন্তা করবার সুযোগ ছিল না। আমার চোখেব সামনে হিন্দু বিয়েব আগেকার নানা অনুষ্ঠান চলছিল মহাসমাবোহে। একসঙ্গে অন্তত কুড়িজন মহিলা কুড়ি রকম নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ওগুলি থামলে চলছিল সমবেত উলুধ্বনি। এই প্রথাগুলি নিশ্চয়ই এক সময়ে সুন্দর ছিল, এখনও অনেকে এর মধ্যে হিন্দুধর্মেব অজেয় ঐতিহ্য ও মাধুর্য আবিষ্কার ক'রে অভিভূত হন, কিন্তু আমি ডাক্তার মানুষ। অত কবিত্ব আমাব আসে না। আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অনাবশ্যক ও গ্রাম্য ব'লে মনে হয়। আমি — কিন্তু থাক্ আমার কথা। আমি তো আর বর নই। তরুণ তার বিবাহানুষ্ঠানের সব কিছু প্রাণ ভ'রে উপভোগ করছিল, সেইটেই বড় কথা।

ক্রমে বিয়ের লগ্ন এল। রাত তখন অনেক। বেশির ভাগ অতিথিই আহারান্তে বিদায় নিয়েছেন। বিবাহবাসরে বড় জোর জন কুড়ি লোক। আমি সকলের অগোচরে পিছনেব একটা জায়গায় ব'সে যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছিলুম। অশুদ্ধ, অশ্রাব্য, অবোধ্য সংস্কৃতে পুরোহিত যা খুশি মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তরুণও (যে কিনা সংস্কৃত জানে) সেগুলি ঠোঁট নেড়ে পুনরুচ্চারণ করছিল। পরে শুভদৃষ্টির সময় এল। তরুণের মুখে আশা না আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়েছিল বলতে পারব না। আমি তরুণকে দেখেছি, তরুণের স্ত্রীকে দেখতে আমিও তরুণের চাইতে কম কৌতূহলী ছিলুম না।

দুজনে এসে দুটো চিত্রিত পিঁড়ির উপর দাঁড়াল। যে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আগে আমাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলছিলেন, তিনিই দুজনের উপর একটা চাদর না কি বিছিয়ে দিলেন। তরুণের দিকে আমি এতক্ষণ তাকাই নি, কিন্তু চাদরের অন্তরালে সে অদৃশ্য হতেই আমি কনের কথা ভুলে গিয়ে আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আবার যখন তরুণকে দেখা গেল তখন তার আনন আনন্দে উদ্ভাসিত। যেন তার সব কিছু প্রার্থনার উত্তর নিমেষে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেন এক মুহূর্তের মধ্যে তার এতদিনের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে। আশাপূরণ নয়, ওটা সামান্য ব্যাপার। তখন তরুণের মুখ দেখে মনে হ'ল, হঠাৎ তার জীবন যেন পূর্ণতা লাভ করল। আর কিছু চাইবার নেই। এবার এক দুই হ'ল। এর পব থেকে এদের দুজনের মিলিত জীবনে দুজনের সকল চেষ্টা নিয়োজিত হবে শুধু একটি সাধনায়। দুই তখন এক হবে। দুজনের মিলিত আত্মা প্রদীপশিখার মত প্রজ্বলিত হযে ওদের মিলিত নীড়টিকে মন্দির ক'রে তুলবে। ধ্যানমগ্ন সাধকের পবিপূর্ণ আনন্দের আভাস সত্যি তখন প্রতিফলিত হয়েছিল তরুণের মুখে। সে মুহূর্তে আমি সত্যিই প্রায ক্যাথলিকদের মত বিশ্বাস করতে পাবতুম যে মানুষের বিবাহ স্বর্গে অনুষ্ঠিত হয়, যে কোন অদৃশ্য দেবতা এসে একটি পুরুষকে মিলিযে দিয়ে যান একটি মেযেব সঙ্গে।

কিন্তু বিবাহ স্বর্গে অনুষ্ঠিত হ'লেও, বিবাহিত জীবনটা কাটাতে হয় এই পৃথিবীব কাবাগারে। তাই আমার ভয় হচ্ছিল যে আমার বন্ধু বোধ হয় বিয়ের কাছ থেকে বড বেশি প্রত্যাশা করেছে। শেষে নিরাশ হবে না তো? বিযের পরে তো দেবপুরোহিতগণ স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন বর দেবার জন্যে অবশিষ্ট রইবেন শুধু তরুণের স্ত্রী নবীনা দেবী। তিনি কি ভাবছিলেন সেই মুহূর্তে?

পঞ্চপ্রদীপ না কি যেন একটা আলো নিয়ে একটি মহিলা বধূর মুখেব চার দিকে ঘোরাচ্ছিলেন। আবার চতুর্দিকে উলুধ্বনি উঠল। এত কোলাহলে আব এত বেশি আলোয আমি আমার বন্ধুপত্নী নবীনা দেবীকে আর ভাল ক'বে দেখতে পেলুম না। তা ছাড়া আমি বেশ অনেকটা দূরেও দাঁড়িয়ে ছিলুম। তবু বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে, নবীনা সুন্দবী। শুধু রূপ নয়; দৃষ্টি ও শ্রুতির শত বাধা সত্ত্বেও বুঝতে পারলুম যে, নবীনার মুখে বুদ্ধিব দীপ্তি ছিল না, সারা মুখে ও দেহে এমন একটা স্নিগ্ধ নির্মল লাবণ্যের আবেশ ছিল যা বোধ হয় এই বাংলা দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এবারে যেন বুঝতে পাবলুম তরুণের মুখের অভিব্যক্তির পূর্ণ মর্মার্থ। বস্তুত, আমিও মনে মনে তরুণের যোগ্যা স্ত্রীর যে রূপটি কল্পনা করেছিলুম, নবীনা ঠিক তাই, ঠিক তাই।

কিন্তু বিবাহ-বাসর এমন নির্বিঘ্নে রূপোপভোগের প্রশস্ত স্থান নয়। তাই সেই ভদ্রলোক আবার এসে উপস্থিত হলেন, যিনি কিছুতেই আমাকে না খাইয়ে ছাড়বেন না। বললেন, তরুণবাবুও আপনার খোঁজ করছিলেন। কিন্তু আজ কি তাঁর দেখা হবে? দেখছেন তো কি ভীড় ওখানে ওঁকে ঘিরে। তার চেয়ে চলুন খেয়ে নেবেন, ইতিমধ্যে বিয়ের ঝামেলাটা চুকে যাবে। পরে বরং ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন। ভদ্রলোক আমি আর দূরের বরবধূর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই কিছুই আর দেখবার উপায় ছিল না। ভদ্রলোক আবার বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

এখনও কিছুতেই ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলুম না। কিন্তু তিনি এমন বার বার খেতে যেতে অনুরোধ করতে লাগলেন যে, কি ক'রে এড়াব তাও ভেবে পেলুম না। যেতেই হ'ল তাঁর সঙ্গে। খেতেই হ'ল অন্যান্য জন কুড়ি অতিথির সঙ্গে। ভদ্রলোক নিজে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সহকারীদের পরিবেশন তত্ত্বাবধান করছিলেন। অপর ভোক্তাদের এ কথা মনে হয়েছে কিনা জানি নে, আমার নিজের একটু অস্বস্তি লাগছিল যে আমার দিকে যেন বড় বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছিল।

বিয়ে-বাড়িতে যেমন হয়ে থাকে, উপরের ছাদ থেকে অনবরত কেউ না কেউ কোন না কোন অজুহাতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছিলেন। আমারও বার বার সেদিকে না তাকিয়ে উপায় ছিল না। হিন্দু বিবাহের নানা জটিল উপচারের বিশদ বিবরণ আমি জানি নে। অনুষ্ঠানের কোথাও কোন ছেদ প'ড়ে থাকবে। হয়তো বা অনুষ্ঠানেরই অন্য কোন অংশের জন্যে কন্যাকে বিবাহবাসর থেকে নীচে আনবার দরকার হয়েছিল। আগে কয়েকজন মহিলা, পিছনে আবও কযেকজন, মাঝখানে বধূ। চিনতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। এবারে আমি অল্পবিস্তর স্বাভাবিক আলোয় আমার বন্ধুপত্নী নবীনাকে দেখতে পেলুম। আতিথ্যপরায়ণ ভদ্রলোককেও এবারে চিনতে পারলুম।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে আমি বিয়ে-বাড়ি থেকে বিদায় নিলুম। তরুণের সঙ্গে আর দেখা করলুম না। ভদ্রলোককে ব'লে এলুম তরুণকে বলতে যে, আমি এসেছিলুম, জরুরী একটা কাজের জন্য ওর সঙ্গে আর দেখা ক'রে যেতে পারলুম না।

*　　　*　　　*

এতক্ষণে আমার স্মৃতিপটে এক বছর আগেকার একটা কাহিনী কুশীলবসমেত ভেসে উঠেছিল।

মনে আছে। স্লিপে লেখা ছিল — সতীশ সেন উইথ সন্ধ্যা সেন।

যথারীতি অভিবাদন ও আসন গ্রহণের পরে আমি বললুম, হ্যাঁ বলুন।

আমার ঘরে তখনও বেয়ারাটা দাঁড়িয়ে কি যেন একটা কাজ করছিল। ভদ্রলোক ইঙ্গিতে জানালেন যে, একেবারে একা থাকলে ভাল হয়। এটা অস্বাভাবিক অনুবোধ নয়। আমি বেয়ারাকে যেতে বললুম।

ভদ্রলোক বললেন। বিব্রত, বিপন্ন, কিন্তু নিশ্চিত যে আমি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করব না।

আমি সন্ধ্যা সেনের দিকে তখনও একবারও তাকাই নি। মহিলা — মেয়েটি বললেই ঠিক হয়, একটা কালো চশমা প'রে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে একেবারে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি বিবক্তি এবং ক্রোধ দমন ক'রে ভদ্রলোককে আস্তে কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়, ইংরেজীতে, বললুম, আপনি ভুল দোকানে এসেছেন। ব'লেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

সন্ধ্যা সেন এতক্ষণে কথা বললেন, দাদা, তুমি, বরং বাইরে গিয়ে বসো, আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলব।

নিতান্ত সাধারণ এই কথাগুলি। কিন্তু এই কয়েকটা সামান্য কথায় নিমেষের মধ্যে আমার ঘরের কার্বলিক সাবানের গন্ধ যেন অন্য কোন সুরভিতে পরিণত হ'ল। সমস্ত আবহাওয়াটার এমন আকস্মিক আমূল পরিবর্তন হ'ল যে, আমার ডাক্তারী সত্তা কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার সামনে আমার রোগী ব'সে নেই, যে হৃদ্‌যন্ত্র আমি স্টেথোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করব। সন্ধ্যা দেবীর কাঠের চেয়ারটা সিংহাসন ব'লে মনে হ'ল — সেখান থেকে সম্রাজ্ঞী সবাইকে আদেশ দেবেন আর সবাই তা নিঃশব্দে মেনে নিয়ে ধন্য হবে। সন্ধ্যার কণ্ঠেই কি যেন একটা একেবারে বিভিন্ন রকমের স্বর ছিল যা অমান্য করা আমার মত লোকের পক্ষে অসাধ্য।

কিন্তু শুধু আমার মত লোকের নয়। সন্ধ্যা দেবী যাঁকে অভিভাবক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনিও বিনা প্রতিবাদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ঘরে রইলুম সন্ধ্যা আর আমি। সন্ধ্যা বললে, বসুন।

আমি বসলুম। সন্ধ্যা তার চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলতে আমি তাড়াতাড়ি তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একটা কাগজ পড়ার ভান করলুম।

সন্ধ্যা বললে, কি আপনার আপত্তি? — জিজ্ঞাসা নয়, জেরা।

আমি জানতুম, তর্কে প্রবৃত্ত হ'লে আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। বললুম, কি কি আপত্তি হতে পাবে তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে।

তা ছাড়া?

নীতিবিরুদ্ধ।

নীতি? কোন্ নীতি?

আমি প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছিলুম যে, তর্কের ফাঁদে পা দিয়ে ভুল কবছি, নিজেব পরাজয় ডেকে আনছি। হয়তো শুধু তর্কে পরাজয় নয়, আবও ভয়ানক কোন পরিণাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার স্বীয় ইচ্ছা ব'লে কোন কিছু আব অবশিষ্ট ছিল না। বললুম, ক্ষমা করবেন, আমাকে এমন অন্যায় অনুরোধ আপনি করবেন না।

আপনি শুধু অনুরোধ করতে বারণ ক'রে ক্ষান্ত হন নি। অনুরোধটাকে অন্যায ব'লেও অভিহিত করেছেন। আমার আপত্তি সেইখানে। তাব চেয়ে সরাসরি বলেন না কেন, আপনি ভয় পেয়েছেন, আপনার সাহস নেই একজন অসহায় মেয়েকে তার জীবনের চরম বিপদ থেকে বাঁচাতে?

সন্ধ্যা সত্যই বলেছে। কিন্তু হই দুর্বল, পুরুষ তো। এক অপরিচিতা মেয়ের হাতে এমন অপমান আমিও বিনা প্রতিবাদে গলাধঃকরণ করতে পাবলুম না। নির্বোধের মত বললুম, বিপদ আপনি আসে নি।

না, তা আসে নি। আপনারই মত কাপুরুষ আব একজনেব হাত ভর ক'রে এসেছে।

সন্ধ্যা আমার কাছে ভিক্ষাপ্রার্থিনী, কিন্তু তার বাক্যে যেন এতটুকু আবেদনের সুর ছিল না। বরং তিরস্কারের ঝাঁজ ছিল প্রতিটি কথায়। আমি সমগ্র পুরুষজাতির প্রতিনিধি নই, কিন্তু সন্ধ্যাকে সে কথাটা বলবার সাহস আমার কিছুতেই হ'ল না। আমি শুধু আবার ক্ষীণস্বরে বললুম, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি নতুন ডাক্তার। দরিদ্র থাকব, কিন্তু অসদুপায়ে ধনী হব না, আমার পকেট শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হোক, কিন্তু বিবেক বিক্রয় ক'রে তার স্ফীতি ঘটাবার দুর্মতি আমার যেন কখনও না হয়।

ঠিক এই কথাগুলি সন্ধ্যাকে বলতে পেরেছিলুম কি না মনে নেই, কিন্তু সত্যি যে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে অসহায় ভাবে আমার ভীত আত্মার জন্য প্রার্থনা করেছিলুম তা আজও মনে আছে। সন্ধ্যা তার পরে উঠে দাঁড়াল ; আমি ভাবলুম, ঈশ্বর, তুমি আমাকে মহাপাতক থেকে ত্রাণ করেছ। আমি অর্থের লোভে আত্মবিক্রয় করি নি। মোটা টাকা রোজগার করবার সুযোগ গেল কিন্তু আমার বিবেক অক্ষত রইল। ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ।

কিন্তু সন্ধ্যা গেল না। উঠে দাঁড়িয়ে তার ব্যাগটা খুলে একটা একটা ক'রে আটটা টাকা গুনে আমার সামনে রেখে দিয়ে বললে, এটা আপনার ফীর চেয়ে কম নয় আশা করি।

সন্ধ্যার কণ্ঠে আবার এই সামান্য কথাগুলি এমন শ্লেষপূর্ণ ও অবজ্ঞামিশ্রিত শোনাল যে, আবার নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে হ'ল। সন্ধ্যার দাদার উপর রাগ করা সহজ ছিল, সন্ধ্যার উপর রাগ করা অসম্ভব। সে যদি অসহায় ভাবে কাঁদত, জানতুম কি ক'রে তাকে তার পূর্বতন দুষ্কৃতির (বা দুর্বলতার) কথা স্মরণ করিয়ে ফিরিয়ে দিতে হয়। সে যদি চটুলা সুলভা রমণী হ'ত, জানতুম কি ক'রে তাকে অপমান ক'রে বের করে দিতে হয়। কিন্তু আবেদন নিয়ে এসেও যে দাবি করে, যার কথায় কোথাও এতটুকু অনুতাপের কোমলতা নেই — তাকে নিয়ে কি করব? দোষ স্বীকার না ক'রে যে অপরকে দোষী ব'লে অভিযুক্ত

করে, তার কি বিধান করব? শুধু বললুম, থাক্, ফী দিতে হবে না। আমি তো আপনার কিছু করতে পারলুম না।

পারলেন না নয়; বলুন, করলেন না।

আবার অভিযোগ। আবার আমার পৌরুষের উপর কশাঘাত নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে আর একবার সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে দেখেছি; ওই দৃপ্ত চোখ দুটোর দিকে বেশি তাকাবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বুঝেছি যে সন্ধ্যার ব্যক্তিত্বের সামনে আমার সকল প্রতিরোধ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, তাই কিছু না ব'লে চুপ ক'রে রইলুম। সন্ধ্যা সামান্য বিরতির পরে বললে, অর্থাৎ একটি অজাত অবাঞ্ছিত প্রাণীর বিনাশের দায়িত্ব এড়িয়ে দুটি প্রাণীর হত্যার অপরাধ বরণ ক'রে নিলেন।

আমার কিছু বলবার উপায় ছিল না।

একটু থেমে সন্ধ্যা বললে, সেইজন্যেই আপনাকে দ্বিগুণ ফী দিয়েছি।

এবারে শুধু ব্যক্তি হিসাবে আমাকে অপমান করা নয়, শুধু মাত্র পুরুষ জাতিকে অপমান নয়, পুরো ডাক্তারী পেশাটার অপমান। আমার জিহ্বায় কি পক্ষাঘাত হয়েছিল বলতে পাবব না, প্রতিবাদে কোনও একটি বর্ণ উচ্চারণ করা আমার সাধ্যের অতীত ছিল।

পববর্তী সমস্ত ঘটনার স্মৃতিই আমার অত্যন্ত অস্পষ্ট। মনে আছে সন্ধ্যাকে বলেছিলুম, আপনার সব কথা শুনব, শুধু তার আগে আপনার দাদাকে বিদায় ক'রে দিতে হবে। গোড়াতে বিশ্বাস কবে নি, কিন্তু পরে রাজী হয়েছিল।

তারপব? স্পষ্ট কিছু মনে নেই। মনে আছে, সন্ধ্যা আমাকে স্টেফান ৎসাইগের 'এমক্' গল্পটা প্রায পুরো শুনিযেছিল, ওটাকে সঙ্গেই এনেছিল। মনে আছে, আমি তার পবে সন্ধ্যাকে শুনিয়েছিলুম ফবাসী নাট্যকার ব্রিয়োর 'মাতৃত্ব' নাটকের গল্প। আমার সংকীর্ণ ভারতীয় বিবেক ততক্ষণে সার্বজনীন উদারতাব পর্যাযে উন্নীত হয়েছিল। আমি তখন শুধু হিপোক্রেটিসের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ চিকিৎসক ছিলুম না। আমি তখন যুক্তিবাদী। পাপপুণ্যের অবান্তর কুসংস্কার তখন আমার প্রভু ছিল না; আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুরুষজাতির ক্রটিস্খালন; নীতির ভয ছিল না, আইনের ভয ছিল না, একমাত্র প্রার্থনা ছিল সন্ধ্যার কোনও কাজে আসা, তার শাপমোচনে সহায়তা কবা।

করেছিলুম।

কিন্তু এর আগে যা কিছু লিখেছি তাব সবগুলি মিথ্যা কথা। ৎসাইগ বা ব্রিয়ো আমাকে অজুহাত জুগিয়েছেন মাত্র, আমার একমাত্র সত্যকার উদ্দেশ্য ছিল সন্ধ্যাকে আমার কাছে ঋণী করা। জটিল কোনও অস্ত্রোপচারের প্রযোজন হয় নি। সামান্য অপসারণেব পবে সন্ধ্যা যখন একান্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আমাব বসবাব ঘবে ফিবে এল, আমি বললুম, আশা করি এবারে আর আমাকে কাপুরুষ মনে কববেন না।

সন্ধ্যা একটু হাসল। সে হাসির অর্থ যেন এই যে সন্ধ্যার আদেশ অমান্য করবার অক্ষমতা প্রদর্শন ক'রে আমি আমাব কাপুরুষতাই বেশি ক'বে সপ্রমাণ করেছি। কিন্তু তখন আমার এত সব বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তিও ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না। সন্ধ্যা যে হাসছিল সেইটেই আমার সকল পবিশ্রমের পর্যাপ্ত পুরস্কার ছিল। সন্ধ্যা বললে, অনেক — অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমি যাব।

এতক্ষণে আমার ভয় ঘুচে গিয়েছিল। সন্ধ্যার সহাস্য আনন দেখে আমার নিজেবও আনন্দের অন্ত ছিল না। বললুম, আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে?

সহসা সন্ধ্যা গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, আর তো দেখা হবে না। ব'লেই সন্ধ্যা আবাব তার ব্যাগ খুলে কতকগুলি — অনেকগুলি — নোট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

এবারে যেন দাম দেবার পালা। আমি যা করেছি সন্ধ্যার জন্যে, তার মূল্য যেন একশো টাকার নোটের সংখ্যা দিয়ে গোনা যায়! যেন অর্থ ছাড়া সংসারের মূল্য নিরূপণের আর দ্বিতীয় উপায় নেই। যেন সব ঋণের শোধবোধ হয়ে যায় রাজার মার্কাওয়ালা কতকগুলি কাগজের হাতবদল হ'লে। সন্ধ্যাকে বললুম সে কথা। বললুম, আমি ভীরু কাপুরুষ হতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এমন জঘন্য ধারণা আপনি করে বসেন নি যে শুধুমাত্র টাকাব জন্যেই আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছি। আমি —

তবে?

আমি তখন ডাক্তারও নই, মানুষও নই। সন্ধ্যার বিনীত দায মাত্র। বললুম, থাক্। আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।

অর্থাৎ অনেক কিছু দিতে হবে। কিন্তু তা তো পারব না ডাক্তারবাবু। তাব বদলে ববং এগুলো রেখে দিন। আমাব পাওনাও একজন এই দিয়েই শুধেছিল, আমাব দেনাও তাই দিয়ে শুধলুম। আপনার কাছে সত্যিই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রইলুম।

আমি তখন কৃতজ্ঞতা চাইছিলুম না। ওই একান্ত লৌকিক অনুভূতিটাতে আমার তখন কিছুমাত্র প্রযোজন ছিল না। আমি আমার বিবেকবিরুদ্ধ কাজ কববাব বিনিময়ে যে পুবস্কাব চাইছিলুম তা দুটো ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার দিযে প্রতিশোধ্য নয়। কিন্তু স্পষ্ট ক'বে কিছু চাইবার না ছিল সাহস. না উপায়। আমার টেবিলের উপরে এক তাড়া নোট অবহেলিত হযে প'ড়ে রইল।

একেবাবে চ'লে যাবাব আগে সন্ধ্যা বললে, সত্যি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু হ্যাঁ, আমি কে বা কোথায় থাকি তা জানবার দযা ক'বে কিছুমাত্র চেষ্টা কববেন না। তা হ'লে আমার যতখানি উপকার কবেছেন তার চেয়ে অনেক — অনেক বেশি ক্ষতি কববেন। আপনাবও লাভ হবে না। বরং—

বরং?

যাক, জানি আপনি ওসব কিছু করবেন না। আপনাকে আবাব আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কাব।

নিশ্চযই আমাব সমস্ত সত্তা চেযেছিল সন্ধ্যার অনুধাবন করতে জানতে যে, সে কোথায থাকে, যেন আমাদেব সেই ডাক্তারী দেখাই শেষ দেখা না হয। কিন্তু, ওই যে বলেছিলুম আমাব সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। আমি সেই আমার টেবিলেব কাছে প্রস্তবমূর্তিব মত দাঁড়িযে সন্ধ্যার চ'লে যাবাব শব্দ শুনলুম। প্রথমে পাশের ঘরে, তার পবে বাস্তায় গাড়ির রওনা হবার শব্দ। কে জানি না, কোথায় গেল জানি না, আর কখনও দেখা হবে না, অথচ আমাকে দিয়ে সে সেই কাজ কবিয়ে নিয়ে গেল, যাতে এতটুকু গোলমাল হ'লে শুধু সন্ধ্যারই ভবিষ্যৎ অন্ধকাব হ'ত না, আমার নিজেবও! কেন সন্ধ্যা অপবিচিত আমার উপর এত আস্থা অর্পণ করেছিল? আমি কি ক'রে সমস্ত বিপদের কথা বিস্মৃত হযে অপরিচিতা এক রোগিণীর জন্যে এমন সর্বনাশা ঝুঁকি নিয়েছিলুম? কিসের লোভে? কিসের আশায়? কার জন্যে?

দ্বিতীয় উত্তর নেই। সন্ধ্যা, ওরফে, নবীনার জন্যে।

* * *

বলা বাহুল্য, এর পরে আমার তরুণের সঙ্গে দেখা করবার উপায় ছিল না। বিযের রাত্রেও না, তার পবেও না। তরুণকে আমি মিথ্যা বলতে পারতুম না কোন মতেই, এদিকে

সত্য বলবারও উপায় ছিল না। এ অবস্থায় দেখা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বন্ধুরও। এমন কি ভূতপূর্ব বন্ধুরও। আর নবীনাই বা আমাকে দেখলে কি ভাবত?

কিন্তু তরুণই একদিন, বোধ হয় বিয়ের দিন পাঁচেক পরেই আমার চেম্বারে এসে হাজির হ'ল। বিয়ের দিন এবং তার পরের দিনগুলি দেখা করি নি ব'লে অনেক অনুযোগ করল। আমি যথাসম্ভব অনৃতভাষণ এড়িয়ে সত্য গোপন ক'রে যুগপৎ ভদ্রতা ও সততা রক্ষা করলুম। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলুম, তারপর? লেজ কাটাবার পরে কেমন লাগছে? নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, এতদিন লেজটাকে কি ক'রে ব'য়ে বেড়িয়েছ? আমি দৃষ্টি এড়িয়ে হাসতে চেষ্টা করলুম।

তরুণ বললে, তা মনে হচ্ছে। তবে —

তবে? তবে কি তরুণ এখন আমায় এমন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে বসবে যা ডাক্তার বা বন্ধু হিসাবে আমি উত্তর দিতে পারব না, অথচ উত্তর না দিলেও উত্তর দেওয়া হয়ে যাবে? আমি একবার ভয়ে ভয়ে তরুণের দিকে তাকিয়ে একটা স্লাইড নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করতে লাগলুম। একটু হেসে তরুণ বললে, তবে কি জান —

কি?

আমাদের দেশের মেয়েরা একেবারে বোকা, একেবারে শিশু। কিচ্ছু জানে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে তরুণ আমার একেবারে কাছে এসে কানে কানে বললে, ডু য়ু নো, নবীনা ইজ অ্যান অ্যাবসল্যুট কিড্। শী ডাজন'ট নো এ থিং অ্যাবাউট দি ফ্যাক্টস অব লাইফ।

ব'লে তরুণ অনুচ্চ শব্দে তার কলেজী দিনের তৃপ্ত সবল সলজ্জ হাসি হাসতে থাকল।

ব্যক্তিত্ব

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভদ্রলোক উঠে চলে গেলেন। ডরোথির মনে হয়েছিল, তাব চোখের সামনে একবাশ মৃত্যুব অন্ধকার ছড়িয়ে উঠে গেলেন ভদ্রলোক। একটু বাদে তাঁর গাড়ি চলে যাওয়াব শব্দ কানে এলো। ডরোথি নির্বাক, নিস্পন্দ, বোবার মতো বসে। তার পবনে তখনো শোকেব বসন, বাহুতে শোকের চিহ্ন, চোখেমুখে শোকের ছাপ। হাতে একখানা চিঠি।

শোক মিথ্যে নয়। শোক হয়েছিল। বুকেব ভেতরটা নিঃশেষে শূন্য হয়ে গেছল। পাহাড়েব মত এক পুরুষ একটানা ষোল বছর পবে তাব জীবন থেকে বড় আচমকা বিদায় নিয়েছিল। চোখের সামনে শেষ ঘনাতে দেখেও এতবড় বিচ্ছেদ বিশ্বাস করতে পাবে নি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার শোক বড় কি আর কিছু, ডরোথি জানে না।

বসেছিল চিত্রার্পিতেব মত। হঠাৎ সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল তাব। মনে হল কেউ তাকে দেখছে, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। বিশালকায় কালো লোমশ একটা অদৃশ্য অস্তিত্ব ছোট চোখ মেলে সকৌতুকে দেখছে তাকে আব হাসছে অল্প অল্প। সেই হাসির ফাঁকে তার পুরু ঠোঁটের ভিতর দিকের লালচে অংশটুকুও যেন দেখা যাচ্ছে। ডবোথি শিউবে উঠল। আবারও। দেহাতীত আত্মা কি আসে? দেখে? তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, ঘবের মধ্যে সে একা বসে নেই, আরো কেউ আছে, নিবিষ্ট কৌতুকে দেখছে তাকে, তার অনুভূতির এই সদ্য বিপর্যযটুকুও বুঝি অগোচব নয তাব।

হঠাৎ শূন্য ঘরেব চার দিকে একবাব চেযে নিয়ে অস্ফুট স্বরে ডবোথি বলে উঠল, টনি বানডোডকার? যতদিন ছিলে তুমি একদিনেব জন্যেও আমাকে অসম্মান করোনি, কিন্তু আমার বুকের ভেতবটা গুঁড়িয়ে দিয়েও সব থেকে বড সম্মান আজ দেখালে তুমি, তোমাব ডোবা শপথ কবছে, তোমাব এই ইচ্ছের মর্যাদা সে রাখবে, তুমি যা চেযেছ তাই হবে!

ডরোথির কাছে কোনোদিন কথাব খেলাপ করেনি টনি বানডোডকার। কেবল একবাব ছাড়া।

তাব ফল শুভ হয়নি। ডবোথি জানে সেটা অঘটন একটা। সে প্রস্তুত ছিল না। এই অঘটন বরদাস্ত করতে তার বিক্ষিপ্ত স্নাযু অনেক সময নিয়েছে। ববদাস্ত ঠিকমত কোনদিনও কবতে পারেনি হযত। কিন্তু স্থির বুদ্ধিব মেয়ে সে। নিজেব সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছিল। তাছাড়া, মানুষটাও তো সুস্থ ছিল না তখন। কেন যেন হঠাৎ এক বিষাদ রোগে পেযে বসেছিল তাকে। কথা খেলাপ করার সেই অবুঝ মত্ততা তারই বিপবীত প্রতিক্রিয়া। সেটা যে এ-ভাবে আসবে ডরোথি কল্পনা করেনি। টনিকে নিয়ে হিমসিম অবস্থা তার তখন। ডাক্তাবদের একটা কমিটিই বসিযে দিয়েছিল সে। দরকার হলে বম্বে থেকে আরো বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে বলেছিল সে। ডরোথি আরো ঘাবড়ে গেছল কারণ, আপদে-বিপদে যে অনুগত লোকটা মুখ বুজে টনিকে সামলাতে পারত, ব্যবসায়েব কাজে সেই শিবাং কারমালিও তখন জাপানে। কেব্‌ল করে তাকে চলে আসতে বলবে কিনা সেই চিন্তাও কবেছিল ডরোথি।

সে-অবকাশ মেলেনি। মাস দুয়েকের মধ্যে সেরে উঠেছে বানডোডকার। তার মাথা থেকে যেন একটা ভূত নেমে গেছে। কিন্তু তাকে সারিয়ে তোলার ব্যাপারে চিকিৎসকের থেকেও ডরোথি বানডোডকারের কৃতিত্ব কম নয়। সব থেকে বড় ঝড়টা বুঝি তার ওপর দিয়েই গেছে। তার দেহের ওপর দিয়ে, মনের ওপর দিয়ে — নিরুপায় হয়েই নিজেকে সমর্পণ করেছে সে, এক উদভ্রান্ত যৌবনের অশান্ত ক্ষুধার মুখে আত্মসমর্পণ কবেছে। তার ফলে ডরোথির দু' দু'বারের সেই অটুট ব্যক্তিত্ব আর আত্মবিশ্বাস ধূলিসাৎ। সেই অতনু-নিভৃতে পুরুষের সর্বগ্রাসী অধিকারের অশান্ত ব্যক্তিত্বটাই যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছিল।

আস্তে আস্তে তারপর টনি বানডোডকার ঠাণ্ডা হয়েছে, শান্ত হয়েছে। আগের থেকেও ভদ্র নম্র হয়েছে। ডোরার বিষণ্ণ উৎকণ্ঠার কারণ উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটিব সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছে সে। কথাব খেলাপের দরুন তার পরিতাপের শেষ নেই। শুকনো মুখে বার বার ডোরাকে বলেছে, নিজের ব্যক্তিত্ব আর ইচ্ছাশক্তি বড় করে তোলো — দু'দুবার ঈশ্বব দয়া কবেছেন, এবারও করবেন না তোমাকে কে বলল?

তাব মুখের দিকে চেয়ে ডবোথির মাযা হয়েছে। হেসেই জবাব দিয়েছে, আয়নায় নিজের মুখখানা চেয়ে দেখোগে যাও, কে বলেছে। এই নিয়ে উতলা হযে ফের যদি রোগ বাড়াও আব আমাকে কাছে পাবে না বলে দিলাম।

কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছে টনিও। ভিতবে একটা চাপা দুশ্চিন্তা তারও আছে বইকি। দু'জনেবই আছে। টনি বলেছে, ভালো মন্দ যা-ই হোক, কথাব খেলাপেব জন্য তুমি আমাকে ঘৃণা কববে না বলো?

ডরোথি আবারও না হেসে পারে নি।

টনি বানডোডকার কথা দিয়েছিল তার দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পব। আঠারো ঘণ্টা উদগ্রীব হযে নার্সিংহোমে বসে থাকাব পর খবর পেয়েছিল, এবাবেও ছেলে হয়েছে। উত্তেজনায় আরো যেন ঘাম দেখা দিযেছে টনির সর্বাঙ্গে। ডোরা খানিকটা সুস্থ হবাব পবেও তার কেবিনের দিকে পা বাড়াতে পারেনি। শিরাং কারমালিকে হুকুম করেছে, কেমন হযেছে দেখে এসো তো।

চিবানুগত কারমালি মনিবের হুকুম পালন করে ফিরে এসেছে। বলেছে, ভালো স্যার।

— ভালো তো তুমি আমাকেও দেখো, কেমন ভালো? কেমন?

কাবমালি হুকুম পালন কবতে যত পটু, বাচনে তত নয়। জবাব দিল, বড্ড ছোট, ভালই মনে হল।

— আঃ। উত্তেজনাব ফলে দ্বিগুণ বিরক্তি, গাযের বং কেমন?

— লাল দেখলাম।

— তার মানে কালো — কেমন লাল? কালচে লাল?

— ন্-না।

— আর নাক মুখ চোখ?

— তাও ভালই বোধ হয়। মিসেস বানডোডকার আপনাকে কেবিনে যেতে বলেছেন স্যাব।

উৎকণ্ঠা একেবাবে কমেনি, তবু খানিকটা স্বস্তি নিয়ে কেবিনে ঢুকেছে টনি বানডোডকার। প্রথম শ্রেণীর মধ্যেও বাছাই-করা কেবিন। একদিকের শয্যায় ডবোথি শুয়ে। আর একধারেব বেবি-বেডে নবজাতক। ভীরু পদক্ষেপে টনি বানডোডকার আগে সেদিকে এগিযেছে। নির্নিমেষে দেখেছে খানিক দাঁড়িয়ে। মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া সরেছে একটু একটু করে।

ফিবে দেখে ডরোথি ডাগর চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, কিন্তু ঠোঁটেব ফাঁকে মিষ্টি হাসি। চোখাচোখি হতে বিশালবপু টনি বানডোডকারের কচি ছেলের মত লাজুক-লাজুক মুখ।

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ডরোথির দু'চোখ নড়েনি তার মুখেব ওপর থেকে। আবারও হেসেছে মিষ্টি করে। — নিশ্চিন্ত?

আনন্দে টনির ওকে আদব করতে ইচ্ছে হচ্ছিল একটু। নীচু হয়ে মুখের কাছে ঝুঁকেছে, তারপর মাথা ঝাঁকিয়েছে। অর্থাৎ খুব। তারপর চাপা উচ্ছ্বাসে বলে উঠেছে, এটাও কালোই হবে একটু, কিন্তু আমার মত আলকাতরার কালো নয় — নাক-মুখ-চোখ পার্ফেক্ট, জাস্ট লাইক ইউ, আমার মত হতভাগা-মার্কা হবে না, হি উইল্ বি এ জেন্টল্‌ম্যান।

ডরোথি হেসে ফেলেছিল, বলেছিল, তোমার থেকে জেন্টল্‌ম্যান তামাম দুনিয়ায নেই। আমার জিনিসের এ-ভাবে নিন্দে করলে রেগে যাব বলে দিচ্ছি।

তা নিয়ে আরো খানিক হাসাহাসির পর দু'জনেই চুপ। ডরোথি জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ?

মৃদু হেসে বানডোডকার জবাব দিয়েছে, ভাবছি তোমার ব্যক্তিত্বের কথা, আর রেভাবেণ্ড ফার্নান্‌ডেজের কথা। হাউ লাকি আই অ্যাম্!

একটু বাদে অন্যমনস্কের মত ডরোথি ডাকল, টনি —

— ইয়েস্ মাই ডিযার?

— একটা কথা বলব?

— হোযাই একটা, অনেকগুলো বলো।

— বাগ কববে না?

— রাগ? তোমার উপব? বিশেষ করে এই দিনে!

আশ্বাস পেযেও ডবোথির বিড়ম্বিত মুখ। একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল, দু' দু' বাব ঈশ্বর আমার মুখবক্ষা কবেছেন টনি, এই দুটিই বেঁচে থাক, এবপব আর না — লাক্ তো বরাবব একরকম থাকে না, এবপর অন্যবকম ব্যাপাব দাঁড়ালে তুমিই সব থেকে বেশি আঘাত পাবে টনি — তোমার জন্যেই আমার ভয়।

টনি বানডোডকারের খুশি মুখ। সেও সকৌতুকে চেয়ে আছে। তাবপর হেসেই বিস্ময প্রকাশ করেছে তোমার পাবসোন্যালিটির জোরে ঈশ্ববেব বিধান উল্টে দিতে পাবো তুমি, তোমারও ভয়! তুমি কি নিজেকে চেনো না ডোবা, নিজেব শক্তি জানো না!

— ঠাট্টা নয় টনি, দু'বাবে তোমার মুখবক্ষা করতে পেবেছি, এবারে আমার এখন থেকেই ভয ধবেছে। তুমি কথা দাও।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে, দাস ফার অ্যান্ড নো ফার্দাব, বংশেব দুর্নাম দু'দুবাব খণ্ডেছে, অ্যাম দা প্রাউডেস্ট ম্যান ইন দি ওয়ার্লড নাও — ঠিক আছে, তুমি ভয়-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দাও।

— কথা দিচ্ছ?

— সিওর, এ জেন্টল্‌ম্যানস ওয়ার্ড।

টনির ঠাকুবদা বলত, তাব সময় থেকেই এই পরিবাবেব ওপর অভিশাপ লেগেছে। ওই অভিশাপের সে প্রথম দূত। নইলে ঠাকুবদার বাবা-মায়েব চেহাবা নাকি তেমন খারাপ ছিল না। কিন্তু কোথা থেকে কেমন করে যে এলো সে, সেটাই বিস্ময তার। টনিব আবার সেই ঠাকুরদার মা বুড়ির ওপর সন্দেহ, কেমন ছিল সেই মা বুড়ির চরিত্র কে জানে!

ঠাকুরদাকে সে দেখেছে কিনা মনে নেই। তার ফোটো দেখেছে। পাহাড়েব মত দেহ, কালো কুৎসিত লোমশ আকৃতি। নাক থ্যাবড়া, ঠোঁট বিসদৃশ পুরু, চোখ ছোট। গোটা অস্তিত্বটাই যেন অশুভ। নিজেকে নিজে অভিসম্পাত করত তার ঠাকুরদা, তার বাবাও।

টাকার জোরে ঠাকুরদা সুশ্রী মেয়েই বিয়ে করেছিল। বংশগতভাবে টাকাব পাহাড় জমেছে তাদের। লৌহ আকবের খনির মালিক তারা — আয়বন ওর চালান দেয় জাপান, বোম্বাইয়ে, বাংলাদেশেও।

ঠাকুরদার আশা ছিল ছেলেটা অন্তত মোটামুটি সুশ্রী হোক। কিন্তু টনির বাবারও সেই রকম চেহারা নিয়েই আবির্ভাব। তেমন বীভৎস কুৎসিত, অন্য ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলে ধারে কাছে ঘেঁষত না। আর টনি শুনেছে তার মা আত্মহত্যা করেছে তার জন্মের পর। আত্মহত্যার কারণ একটু বড় হয়ে সহজেই সে অনুমান করতে পেবেছে। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেই পেরেছে।

ছেলে বড় হয়ে উঠতে টনির বাবা চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। ছেলেটার মতিগতি অন্যরকম। অল্প বয়সেই তার কুৎসিত চেহারার মধ্যে বাসনার যে আগুন জ্বলত, বাবা তা টের পেয়েছিল। সেই অল্প বয়সেই দুই একটা দুঃসাহসিক অঘটন ঘটিয়েছে। টাকার জোরে বাবা বিপদ সামলে উঠেছে। সমস্ত রমণী জাতটার ওপরেই যেন একটা জাতক্রোধ ছেলের।

অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ্ তার বাবাকে বলেছে, জন্ম থেকে মায়ের. স্নেহ পায়নি বলেই এমন হয়েছে। মায়ের স্নেহ ভালবাসা পেলে এ রকম হত না। কিন্তু ঠিক এরকম রমণী টনির বাবা পাবে কোথায়? টাকা অনেক আছে, কিন্তু টাকা দিয়ে কি স্নেহ ভালবাসা কেনা যায়?

তবু ঈশ্বরের দয়ায় সেই রকম যোগাযোগই হল একটা। দেশে বিষম গোলযোগ চলেছে তখন। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই কানাঘুষো বেশ জোর শোনা যাচ্ছে, ভারত এসে গোয়া দখল করবে। পর্তুগীজ আধিপত্যের অবসান হবে। দেশের মধ্যে একটা অরাজকতা চলেছে তখন। এমন দিনে সে সময়ের গীর্জার প্রধান ফাদার থরম্যান টনির বাবাকে বলল, একটি বিপন্ন মহিলা আর তাব সতের আঠার বছরের একটি মেয়েকে রক্ষা করতে হবে।

ফাদাব থরম্যান ভারী স্নেহ কবে টনির বাবাকে, আর সে ভদ্রলোকও ফাদাবের কথায় প্রাণ দিতে পারত।

১৯৫০ সালেব কথা। এক প্রতিপত্তিশালী পর্তুগীজ গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছে একটি মেয়ে আর তার মা। মা'টি বাড়ির আয়া ছিল। দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে দেখে সেই গুণ্ডা মা মেয়েকে দেশে চালান দেবার ব্যবস্থা করছে। উদ্দেশ্য অসৎ। তাদের দেশে সুশ্রী প্রাচ্য মেয়ের কদর খুব। মা-কে শাসিয়েছে কোনরকম গণ্ডগোল করলে তাকে গুলি করে মেরে শুধু মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে।

সেই মহিলা ফাদারকে গোপনে চিঠি লিখে বিপদ জানিয়েছে। মহিলারও বযেস তখন ছত্রিশ সাঁইতিরিশ — রূপ যৌবন আছে।

টনির তখন একুশ বাইশ বছব বযেস। বাপেব মতই অসম সাহসী সে। না, তার থেকেও বেশি। নিজেদের বিপদ তুচ্ছ করে বন্দুকের মুখে সেই মা মেয়েকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছিল তারা। সেই মেয়ে ডরোথি। তারপর থেকে ডরোথির মা এ বাড়িতে গভর্ণেসের মত থাকলেও, সেই কর্ত্রী।

কিন্তু তাদের বাড়িতে আনার পর টনির সুপ্ত প্রবৃত্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ডরোথিকে ঘিরে বাসনা দানা বেঁধে উঠেছিল। বাবা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, ফাদারের গচ্ছিত অতিথির প্রতি এতটুকু অশালীন ব্যবহার করলে ছেলেকে গুলি কবেই মারবে সে। বিপদ কেটে গেলে ওই মা-মেয়েব অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থাও ঠিক করে রেখেছিল টনির বাবা।

কিন্তু তার আগেই বিপদের সূচনা দেখল ডরোথির মা। এক রাতে সোজা এসে টনির মাথায় হাত রাখল মহিলা। বলল, তুমি আমার ছেলে, ছেলে মাকে উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করে এনে এতবড় কলঙ্কের কাঁটা মাথায় নেবে বাবা? কি পাবে? আমি আর ডরোথি আত্মহত্যা করব। আমরা মুছে যাব, কিন্তু তোমাদের বীর বংশের এত বড় কলঙ্ক আর মুছবে কি?

সেই থেকে মাথায় যেন ধুলো পড়ল টনির। আর সেই থেকে ডরোথির মা টনিরও মা হয়ে বসল। মায়ের অধিকার নিয়ে ডরোথির সঙ্গে রীতিমত ছেলেমানুষি রেষারেষি চলত তার। আর মায়ের পক্ষপাতিত্ব টনির প্রতিই।

সব শুনে ফাদার থরম্যান হেসেছিল। রেভারেন্ড ফার্নানডেজ তখন টনির থেকে বছর চারেকের বড় যুবক, কালো রঙ, সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার সামনেই থরম্যান বলল, সব পারসোন্যালিটি ফ্যাক্টর বুঝলে — ব্যক্তিত্ব দিয়ে অসাধ্যসাধন করা যায়। সে-রকম ব্যক্তিত্বশালী মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিতে পারলে, তার ছেলেপুলের চেহারা পর্যন্ত অন্যরকম হতে পারে, অফ কোর্স তোমার ছেলের থেকেও সেই মেয়ের ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি হওয়া চাই।

কথাগুলো টনির বাবার মনে ভারী ধরেছিল। ছেলের থেকেও বেশি একটি ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছিল ভদ্রলোক। আর ফাদার থরম্যানের সেই উক্তি পরিহাসের ছলে টনিকে বলেছিল ফার্নানডেজ। চার বছরের ছোট বড় হলেও তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বাবা ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ের খোঁজে আছে টনি জানত। কিন্তু সে-রকম মেয়ে যে তাদের ঘরেই আছে, বাবা শুধু সে খবরটাই রাখত না। টনির চোখে ডরোথির শান্ত ব্যক্তিত্বটুকুই যেন আসল রূপ। ডরোথির মা কিছু বললেও প্রতিবাদ করা যায়, অমান্য করা যায়। কিন্তু ডরোথি কিছু বললে তা যেন পারাই যায় না। প্রতিবাদ করলে বা অমান্য কবলে সে কিচ্ছু বলবে না, দু'বার অনুরোধ করবে না। শুধু মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে নিঃশব্দে চলে যাবে। ঠোঁটের ফাঁকে তার সামান্য একটু হাসির আভাস দেখা যাবে কি যাবে না। কিন্তু তারপর যেন অনুরোধ পালন না করে উপায় নেই তার। আর তারপরেও ডরোথি হাসতই শুধু। অর্থাৎ, সে যেন জানতই, যা চেয়েছে তাই হবে।

পরের তিনটে বছরের মধ্যে অনেক পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে গেল। টনিব বাবা আর ডরোথির মা মরে গেল। ওদিকে চোখ বুজল ফাদার থরম্যানও। বাবার ব্যবস্থামত ডরোথিবা অবশ্য তার আগেই ভিন্ন ডেরায় উঠে গেল।

টনি এত বড় ব্যবসার মালিক। ডরোথি আপিসে আসে, ব্যবসা দেখে, টনিকে পরামর্শ দেয়। মোটা মাইনেও পায় সে, যোগ্যতার মর্যাদা হিসেবে টনি তাকে আরো বেশি দিতে চায়, কিন্তু ডরোথি নেবে না। যত দিন যায়, এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্না রমণী যেন টনি আর দুটি দেখে না।

মনের কথাটা একদিন খোলাখুলিভাবে রেভারেণ্ড ফার্নানডেজকে বললে সে। ডরোথিকে সে বিয়ে করতে চায়। তার ধারণা যে ব্যক্তিত্বের কথা ফাদার থরম্যান বলে গেছল সেই ব্যক্তিত্ব ডরোথির আছে — তার থেকে বেশিই আছে।

খুশিমুখে ফার্নানডেজ তার পিঠ চাপড়েছে। বলেছে, গো অ্যাহেড, দেখো ডরোথি রাজি হয় কিনা। আমারও বিশ্বাস, ফাদার থরম্যান ঠিকই বলেছিলেন, পারসোন্যালিটি ফ্যাক্টর ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পরট্যান্ট থিং।

রেভারেণ্ড ফার্নানডেজের কালো মুখখানা সেদিন অনির্বচনীয় মনে হয়েছিল টনির।

প্রস্তাবটা পরদিনই আপিসের পর ডরোথির কাছে পেশ করেছে সে। তার আগে ফাদার থরম্যানের পারসোন্যালিটি ফ্যাক্টরের মহিমার কথা বলেছে, তার বাবার ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ের খোঁজের কথা বলেছে, আর রেভারেণ্ড ফার্নানডেজের বিশ্বাসের কথাও বলেছে। তবু, টনির মনে হয়েছিল, বিয়ের প্রসঙ্গ তোলার সঙ্গে সঙ্গে ডরোথি যেন চমকে উঠেছিল।

খানিক চুপ করে থেকে বিমর্ষ মুখে টনি বলেছে, থাক্ —

ডরোথি তখুনি বুঝেছে, কেন বলল।

তবু জিজ্ঞাসা করেছে, কেন?

— তুমি ভয় পেয়েছ।

একটু চুপ করে থেকে ডরোথি জবাব দিয়েছে, আমার ভয় শুধু তোমার জন্যেই, নইলে তোমার মত এমন মানুষ হয় নাকি।

সাগ্রহে টনি বলেছে, আমার কিছু ভয় নেই, আমার স্থির বিশ্বাস তোমার ব্যক্তিত্ব দিয়েই তুমি আমাদের বংশের অভিশাপ মুছে দিতে পারবে — ফাদার থরম্যানের কথা মিথ্যে হবে না, ফার্নানডেজেরও বিশ্বাস মিথ্যে হবে না।

আবারও খানিক চুপ করে থেকে ডরোথি বলেছে, আচ্ছা তাই হবে। কাল আমরা একবার রেভারেণ্ডের কাছে যাই চলো, আগে তার সঙ্গে কথা বলে তার আশীর্বাদ নিযে আসি।

আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে টনি। তক্ষুনি বিসদৃশ কিছু করে বসতে যাচ্ছিল। তিন হাত পিছিযে গিয়ে ডরোথি চোখ পাকালো, এই!

হাসতে হাসতে টনি আবার বসে পড়ে প্যাক্-প্যাক্ করে টেবিলের বেল টিপেছে। প্রাইভেট সেক্রেটারি শিরাং কারমালি হাজির।

— হ্যালো কারমালি, আমার বিয়ে।

— কংগ্র্যাচুলেশনস্ স্যার।

— আর ইউ হ্যাপি?

— ভেরি মাচ ইনডিড স্যার।

— কার সঙ্গে বিয়ে বুঝতে পেবেছ?

এবাব ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে ডবোথির দিকে একবার না তাকিযে পাবল না কারমালি। ডরোথিব মুখ লাল। কারমালি মাথা নাড়ল, পেরেছে।

— দেন অ্যারেঞ্জ।

ঘটা কবে বিযে হয়েছে।

আড়াই বছর পর পব দুটি সন্তান হয়েছে তাদের। কালো হলেও ছেলে দুটির চেহারা সুশ্রী, ভদ্র।

টনির দুর্বার বাসনা নিজের ব্যক্তিত্বেব গুণেই সংযত করতে পেরেছে ডরোথি। তা বলে উপেক্ষা বা বঞ্চিত কবেনি তাকে। তার মুখেব দিকে তাকালে বাসনার তাপ বুঝতে পারে ডরোথি। তাই প্রস্তুত হবার অবকাশ পেযেছে। গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেছে।

সন্তান-সম্ভবা হবাব সময় থেকেই স্থির, সংযত, গম্ভীর সে। কিন্তু টনি তখন বেপরোয়া, মত্ত। তবু জিজ্ঞাসা করে, কি হল তোমার?

ডবোথি হেসেই জবাব দিয়েছে, চাষ করেছি।

সত্যি তখন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দেখেছে টনি তার।

দ্বিতীয় সন্তান হবার পর ডরোথি কথা আদায় কবেছে টনিব, আর নয়, এই শেষ।

সানন্দে কথা দিয়েছিল টনি বানডোডকার।

কিন্তু বছর তিনেক না যেতে এই কথারই খেলাপ করেছিল সে। ডরোথি তাকে বিশ্বাস করত। তাই অবাক হয়েছিল সে। ঘাবড়েও গেছল।

এই দুর্যোগ এত আচমকা এসেছে যে ডরোথি হতভম্ব। বিয়ের পবে আপিস দেখা ছেড়ে দিয়েছিল সে। ব্যবসায়েব কোন গণ্ডগোলের ফলে এরকম হল কিনা জানে না। জানবে কার কাছ থেকে, কারমালি তখন জাপানে। নিশ্চিন্ত আনন্দে কেটেছিল এই তিনটে বছর। বিজ্ঞানের যুগে নিরাপদে থাকতে চাইলে বিপদ এড়ানো সহজ। কিন্তু গোঁ ভরে এই বিপদের মধ্যেই যেন ঝাঁপ দিল মানুষটা। ক্ষণে ক্ষণে উদভ্রান্ত। উদভ্রান্ত যখন, তখনই অবুঝ, বেপরোয়া সে। ডরোথি তখন প্রাণপণে তাকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছে, কথার খেলাপের কথা বলেছে, বিপদের সম্ভাবনার কথা বলেছে। টনি বানডোডকার কানেও তোলেনি। উল্টে বিরক্ত হয়েছে। বিরক্তি বাড়লে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

পুরুষের এই গ্রাস থেকে ডরোথি নিজেকে উদ্ধার করতে পারেনি। তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ধূলিসাৎ যেন।

ঘন ঘন গীর্জায় গেছে এর পর। ফার্নানডেজের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। চিকিৎসার ঢালাও ব্যবস্থা করেছে। মানুষটাকে সুস্থ করে তোলা ছাড়া আর কিছু ভাবাব অবকাশ নেই।

টনি বানডোডকার সুস্থ হল যখন, ডরোথি তখন অন্তঃসত্ত্বা।

সময় যত এগিয়ে এসেছে তত যেন শান্ত নির্জীব হয়ে পড়েছে টনি বানডোডকার। পরিতাপের শেষ নেই তার।

ডরোথিরও বিবর্ণ পাণ্ডুর মূর্তি। সে ভেবে পায় না হঠাৎ এ-রকম মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল কেন লোকটা। ভালো যে হয়ে উঠেছে এটুকুই ভাগ্য, ভাবে সে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। এটিও ছেলে। কিন্তু আগের ছেলে দুটোর মত নয়। টনির মত বীভৎস কুৎসিত নয় বটে, তবে কুৎসিতই। এই ছেলের বেলায় বংশের অভিশাপ ছ'আনা কেটেছে বলা যেতে পারে।

টনি বানডোডকার সদা বিষণ্ণ। না, ডরোথি কোন দিনও অনুযোগ করেনি তাকে, ভর্ৎসনা করেনি। ঈশ্বরের এই বিধান সে মেনে নিয়েছে। প্রয়োজনে টনিকে সান্ত্বনাও দিয়েছে।

কিন্তু সান্ত্বনা খুব পায়নি টনি। দিনের বেশির ভাগ সময় এক নীরব যাতনা ভোগ করেছে। পরিশ্রম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ডরোথি আবার চিন্তিত হয়েছে।

ছোট ছেলে সনি দিনে দিনে বড় হচ্ছে। কিন্তু এই ছেলেটা যেন চক্ষুশূল টনির। কোনো সময় তাকে কাছে ডাকে না, আদর করে না। তার মায়া-মমতা সব বড় দুই ছেলের জন্য। ছোট ছেলে সনিকে খুব প্রীতির চোখে দেখে না ডবোথিও। কিন্তু বাপেব এতটা এক চোখোমির প্রতিবাদ না করে পারে না এক এক সময়। বলে, কেন, তোমার বাপ-ঠাকুরদার মত অত কুৎসিত তো হয়নি। এর ছেলেপুলে দেখো, আরো ভালো হবে।

কিন্তু ওই ছেলেটার দিকে চেয়ে ডরোথির নিজেরই ভেতরটা আবার এক এক সময বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত।

সাত আট বছর বয়সের সময় এই শিশু যেন বাবা-মায়েব ব্যবহারেব তাবতম্য বুঝতে পারত। এমনিতে নিরীহ, শান্ত, কিন্তু নির্বোধ যে নয়, তাও বোঝা যেত। দৈবাৎ মেজাজ বিগড়লে বাপের দ্বিতীয় সংস্করণ যেন। তখন সনিকে ঠাণ্ডা কবা এক দুরূহ ব্যাপাব।

হঠাৎ ছোটখাট একটা স্ট্রোক হয়ে গেল টনি বানডোডকারেব।

তার এক বছর বাদে দ্বিতীয় স্ট্রোকে তার শেষ। ডরোথি চেষ্টার ত্রুটি করেনি। শেষ সময়েও সে ভাবতে পারেনি টনি তাকে ছেড়ে যাবে।

একটু আগে যে ভদ্রলোক চলে গেল সে এই পরিবারের অ্যাটর্নি। সে শিলমোহব-কবা একখানা চিঠি দিয়েছে ডরোথির হাতে, আর তাকে একটা উইল পড়ে শুনিয়ে গেছে। উইলে নির্দেশ আছে, ডরোথি বানডোডকার সম্মত হলে তবে এ উইল কার্যকব হবে, অন্যথায় এব কোন মূল্য নেই। উইলে লেখা, তার যাবতীয় বিষয়-আশয় এবং ব্যবসাব একমাত্র উত্তবাধিকারী হবে তার ছোট ছেলে সনি বানডোডকার। যতদিন না সে সাবালক হয়, ততদিন তার হযে রক্ষণাবেক্ষণ করবে ডবোথি বানডোডকার এবং শিরাং কারমালি। এবং এই দায়িত্বভার বহনের জন্য অবশ্যই তারা তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক নেবে।

তড়িদাহতের মত খানিক বসে থেকে অ্যাটর্নির সামনেই ডরোথি হাতেব শিলমোহব-কবা খামটা খুলেছে। রুদ্ধশ্বাসে পড়েছে। চিঠি নয়, ছোট বক্তব্য গোছেব একটু কিছু।

তার মর্ম :

এই উইলে ডরোথিব আপত্তি থাকলে সেটা ছিঁড়ে ফেললেই হবে। ডরোথিব ভালবাসা সম্পর্কে এতটুকু সংশয় নেই টনি বানডোডকারের। ডরোথির এই ভালবাসা আত্মত্যাগেব মতই দুর্লভ। তবু, উচিত বিবেচনায় এই নির্দেশ বেখে গেল সে। কারণ, বিবেকের তাড়না থেকে মুক্ত হবার জন্যেই প্রথম দুটি সন্তানের যাবতীয় দায়িত্ব ডরোথি এবং শিরাং কারমালিব নেওয়া উচিত।

বাবার ছবির খোঁজে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অন্তুর বাবাব ছবিটা ছিল উত্তবদিকেব দেয়ালের বেশ খানিকটা উঁচুতে টাঙানো। বলা যায়, টঙে। ঘুলঘুলিব ঠিক নীচে। বাড়িটা তৈরির সময় গজালগুলো ওইভাবেই গেঁথে দেওয়া হযেছিল। তাতে ভাড়াটেদেব কোনো হাত ছিল না। উঁচ্কপালে হয়ে না তাকালে টঙে-তোলা এইসব ছবি সহজে নজবে পড়ার কথা নয়।

ছাপোষা মধ্যবিত্তদের ঘবে মৃত প্রিয়জনদের ছবি বড় করে ঘরে টাঙিয়ে রাখাব রেওযাজ খুব বেশিদিনের নয়।

অন্তুদের বাড়িতে সবচেয়ে পুরোনো ফটো ছিল তার ঠাকুর্দার। পোর্ট্রেট নয়, গ্রুপফটো। ওর ঠাকুর্দা নাজির না সেরেস্তাদার—কী একটা ছিলেন। ছবিটা তোলা হয়েছিল কাছারিতে। চেহারাগুলো খুব মজার। সকলেরই চাপদাড়ি। বুকের ডানপাশে বোতাম-দেওয়া আচকান। কপালজোড়া টাক থাকায় ওর ঠাকুর্দাকে তবু যাহোক চেনা যাচ্ছিল।

ঠাকুর্দার চেযে উর্ধ্বতন কোনো পুরুষের দূবের কথা, এমন কি অন্তুদের বাড়িতে তাব ঠাকুরমারও কোনো ছবি ছিল না। অবশ্য ছবি না থাকলেও ঠাকুমা কেমন দেখতে ছিলেন সে সম্বন্ধে ওব মনে প্রায় স্পষ্ট একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। তার কাবণ, ছোটতেই ওদের বলা হয়েছিল যে, 'তোদের ঠাকুমা দেখতে ছিলেন উপরোনো তোদের সেজো পিসিমার মতো।' অবশ্যই আরো ঢ্যাঙা, অবশ্যই আবো ফর্শা। 'অবশ্যই'গুলো অন্তুর মনে তেমন ঠাঁই পায়নি, কেননা তার কল্পনাশক্তি কোনোদিনই খুব একটা প্রখর ছিল না। ফলে, ঠাকুমা দৈর্ঘ্যে আর গায়ের রঙে সেজো পিসিমাকে কখনোই ছাড়িয়ে যেতে পাবলেন না। দুঃখের বিষয়। কিন্তু সত্যি।

অন্তুর মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে বটে, ক্যামেবাও এখন বলতে গেলে ঘরে ঘবে তবু কিন্তু কেউ ফটো তুললেই অন্তুর কানে কানে 'ক্লিক' নয় — 'ফস্' করে একটা শব্দ হয।

এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। স্মৃতি জিনিশটা ভারি হেজলদাগড়া। একবার যেটা ধবে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। চোখ কানেব মাথা খেয়ে বাস্তবকে দিব্যি অস্বীকার কবে বসে।

অবশ্যই 'ফস্' শব্দ একটা ছিল। শ্মশানে ছবি তোলাব। একটা লাঠির আগায় বসানো থাকত একটা বাটি। তাতে কী দেওয়া হত ভগবান জানে। হয়তো লোহাচুর। একটা কাঠিব মুখে আগুন দিযে বাটিটার মুখে ছোঁযালেই 'ফস্' করে জ্বলে উঠত। সেই আলোয় ছবি তোলা হতো।

. অন্তুর ছেলেবেলায সাধারণ মানুষেব ছবি একবারই উঠত। বেঁচে থাকতে নয়, মরে গেলে। সেই সুবাদেই অন্তুর স্মৃতি 'ফস্' শব্দটা ধবে রেখেছে।

অন্তু, অন্তু, অন্তু! অন্তু কি তোমার ইয়ার?

মাপ কববেন, একজন প্রবীণ লোককে আমি এতক্ষণ বেআক্কেলের মতো স্রেফ নাম ধরে ডেকে গিয়েছি। শুধু প্রবীণ কেন, কোনো প্রমাণ সাইজের লোককেই সচরাচর এভাবে বলাটা

ঠিক আদব নয়। যাঁকে অন্তু বলছি, তিনি একজন ছোকরা হলেও কথা ছিল। কিংবা লেখক যদি তাঁর গুরুজন কিংবা সমবয়সী হতেন। তা নয়। লেখক তো এখানে নৈর্ব্যক্তিক। তিনি হলেন সাংখ্যের পুরুষ। অন্তত সাহিত্যে এটাই প্রশস্ত। কাজেই টেকো মাথার যে ভদ্রলোক, চুলে কলপ দিয়ে বয়স ভাঁড়ানো সত্ত্বেও সরকারি চাকরি থেকে যাঁকে অবসর নিতে হয়েছে, যাঁর আর এখন শাদা চুল ঢাকবার এবং রোজ দাড়ি কামাবার আদৌ কোন তাগিদ না থাকায় চেহারাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতি ক্যাডাভ্যারাস, সেই অনন্তনারাযণ দত্ত, যাকে পাড়ার লোকে অনন্তবাবু, আপিসের সহকর্মীরা দত্তবাবু বা বড়বাবু বলতেন এবং যাঁকে অন্তু বলে আজকার লোকে কমতে কমতে ঘরে বাহিবে মাত্র দুচারজনে এসে ঠেকেছে — অগত্যা তাঁকে আমি এখন থেকে অনন্তনারায়ণ বলবারই অভ্যেস করব। যদি একটু-আধটু ভুল করে ফেলি, আশা করি পাঠকেরা নিজগুণে লেখককে ক্ষমা করে দেবেন।

তা অনন্তনারায়ণ যখন উত্তরদিকের দেয়ালে একটা টিকটিকির পোকা শিকাব দেখতে দেখতে সেইসঙ্গে মনের মধ্যে কেমন একটা কির্ কির্ করার ভাব। চুনকাম-করা দেয়াল শাদা হবে না তো কী। না, তা নয়। তবে একটা যেন কী। কী যেন নেই।

আর তারপরই যে কথাটা মনে পড়ে গিয়ে অনন্তনারায়ণের বুক ধড়াস ধড়াস করে উঠল, সেটা হল তাঁর বাবার এনলার্জ-করা একটা বড় বাঁধানো ছবি। ছবিটা নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ কপালে উঠে পশ্চিমদিকের দেয়ালে ঠিক এমন জায়গায় গিয়ে ঘা খেল, যেখানে আরো একটা বড় বাঁধানো ছবিতে উত্তরমুখো হয়ে আছেন স্বর্গাদপি গরীয়সী তাঁব গর্ভধারিণী মা। তাঁর মা-র চোখে কেমন যেন একটা ফ্যাল ফ্যাল করা চাহনি। সোজা পশ্চিমের দেয়ালের ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে কুপুত্র অনন্তনারায়ণকে যেন তিনি ভর্ৎসনা করছেন।

অনন্তনারায়ণ এমন ফ্যাসাদে জীবনে পড়েন নি। আরো একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। আজ অমাবস্যা। আর চারদিন পরেই তাঁব বাবাব মৃত্যুতিথি। তাঁর এক বোন আর এক ভাই এই শহরেই থাকে। সারা বছর তেনাদের টিকি দেখা যাবে না বটে, কিন্তু বাবার মৃত্যুতিথিতে ঠিক এসে হাজির হবে। তাও কি, একেবারে ছানাপোনাসুদ্ধু সপরিবারে। দাদাবউদিকে বিজয়ার প্রণামটাও ওই একই দিনে তাবা সেবে নেবে। সঙ্গে আনবে বাবার জন্য দুটাকা দামের একবত্তি চিম্‌সে-পড়া মালা। ওদের লজ্জা দেবার জন্যে অনন্তনারায়ণ করকরে পাঁচটা টাকা খরচ কবে একটা মালা এনে বাবাব গলায় পরিয়ে রাখেন। কিন্তু লজ্জা পাবার মতোন বুদ্ধি ওদের ঘটে থাকলে তো। পরের বারও ফের সেই দুটাকা দামের মালা। বোন হল সেজো। তার স্বামী করে লোহালক্কড়ের ব্যবসা। কিন্তু স্বামীটি হাড় কঞ্জুস। অনন্তনারায়ণের ছোট ভাইটিও আর এক। অর্ডার সাপ্লাই কবে তারও আয নিতান্ত মন্দ নয়। ও হয়তো ভাবে, বেশি টাকা দামের মালা আনলে দাদাকে হয়তো ছোট করা হবে। আহা, দাদার তো সামর্থ্য বেশি নয়। তার ওপর এখন তো পেন্সন একমাত্র ভরসা। হুঁঃ ছাড়ো তো। তোমরা আর আমাকে ভাই চিনিও না। তাই যদি হবে, জন্মের মধ্যে কম্ম বছরে একদিন — একদিনও তো দাদাবউদির জন্যে ভালোমন্দ কিছু একটা আনতে পারে। উলটো একটা বেলা গুষ্টিসুদ্ধু এসে অনন্তনারায়ণকে ওরা খেযে ফতুর করে দিয়ে যায়। যাকগে যাক, যাকগে ওসব। কথায় শুধু কথা বাড়ে।

তবু ভালো যে, মালার দামটা ওরা কম রেখেছে। যদি ওরা পাল্লা দিয়ে দাদাকে টেক্কা দেবার এতটুকু চেষ্টা করত, তাহলে আর অনন্তনারায়ণকে দেখতে হত না। সেটা হত নির্ঘাৎ মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

এখন ওরা এসে যদি দেখে (ভাবতেও অনন্তনারায়ণের গা শিউরে উঠল!) বাবার ফটোটারই কোনো পাত্তা নেই, তাহলে আত্মীয়স্বজনদের কাছে অনন্তনারায়ণের আব মুখ দেখাবাব কোনো উপায থাকবে না। সবার কাছে তাঁর পরিচয় হবে বংশের কুলাঙ্গার বলে।

পুরোনো কিছু কথা মনে পড়ে গিয়ে অনন্তনারায়ণের যে কী আফশোস হচ্ছিল বলার নয়। দক্ষিণের শহরতলিতে পৈতৃক ভাড়াবাড়িতে থেকে যাওয়াটাই হয়েছে তাঁর কাল। ভাড়াটা কম বলে তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে সংসারের হাল আজও কোনোমতে তিনি ধরে রাখতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি যে কোনো বিষয়-আশয় করে উঠতে পারেন নি, তারও জন্যে দায়ী এই কম ভাড়ার পৈতৃক ভাড়াটে বাড়ি। চলে তো যাচ্ছে, আর কেন — এই একটা ভাব তাঁর সমস্ত উদ্যম নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁর বয়সী সবাই চাকরি করতে করতে ব্যবসার লাইনে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। এখন তারা সবাই প্রায় বাড়িগাড়ির মালিক।

তবে এটা বলতেই হবে যে, অনন্তনারায়ণের ভাইরা অন্য অনেকের ভাইদের চেয়ে শতগুণে ভালো। তারা সবাই বিয়ে-থা করার পরই যে যার আলাদা হয়ে গেছে। পৈতৃক আসবাবপত্র সুদ্ধু ভাড়া বাড়িটা অনন্তনারায়ণ যে নির্ঝঞ্ঝাট ভোগদখল করতে পারছেন, সেও তো নেহাতই তাঁর ভাইদের কৃপায়। তারা অনায়াসে এ সবের ভাগ চেয়ে বসতে পারত। কিন্তু তারা তা করে নি।

ফলে পৈতৃক যা কিছু উত্তরাধিকার তার মালিক হয়েছেন একা অনন্তনারায়ণ। সেটা কম নাকি !

বাবা মারা যাওয়ার পর অনন্তনারায়ণ তাঁর বাবা আর মা দুজনেরই ছবি আলাদা করে এনলার্জ করিয়েছিলেন। কিন্তু মূল ফটোটা দোকান থেকে চেয়ে নিতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে, যেটা দাঁড়িয়েছে তা এই যে, ওই এনলার্জমেন্ট দুটোই দুনিয়ায় থেকে যাওয়া তাঁদের একমাত্র ছবি। অনন্তনারায়ণ এই সময় চেয়ারে সরে নড়ে বসায় বোঝা গেল যে, একথা মনে করে তিনি বেশ বিচলিত বোধ করেছেন।

এতক্ষণে বাবার ছবিটা তাঁর মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে উঠেছে। আঁকার হাত থাকলে তিনি এমন কি এঁকেও ফেলতে পারতেন। রং ময়লা হলেও গুম্ফমণ্ডিত ভারি সৌম্য চেহারা ছিল তাঁর বাবার। অনন্তনারায়ণ তাঁর শালার ছাপাখানা থেকে বিনা পয়সায় দু'টি পঙ্‌ক্তি ছাপিয়ে নিয়ে ছবির তলায় জুড়ে দিয়েছিলেন— "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।" ফাঁকা দেয়ালে পুরো ছবিটাই তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন।

এনলার্জ করে ছবি বাঁধানো তখন কত কম খরচে হত। এখন হলে? অনন্তনারায়ণের ঢাকের দায়ে মনসা বিকোনোর দশা। বাবা-মা র স্মৃতি ধরে রাখার আত্মপ্রসাদ হঠাৎ এইখানে এসে অনন্তনারায়ণের ঠোঁটের ফাঁকে মিলিয়ে গেল। তাঁর একটিই ছেলে। কলেজে পড়ে। খুব একটা মেধাবী নয়। তার ওপর রাজনীতির চক্করে পড়ে পড়াশুনো আরো ডকে উঠেছে। কেরিয়ার করার দিকে কোনো নজরই নেই। তার মানে, ভবিষ্যতে কখনো অনন্তনারায়ণের ফটো এনলার্জ করে বাঁধানো হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া যে ছেলে বিজয়ার পরেও বাপ-মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না, ঠাকুরদেবতায় যার বিশ্বাস নেই — তার কাছ থেকে সেসব আশা করাই ভুল। এইখানে অনন্তনারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঢোক গিলেন।

ভাইবোনদেরও বলিহারি। বাবা মা র ছবি দুটো থেকে কপি করে নিয়ে অনায়াসে তারা নিজের নিজের কাছে রাখতে পারত। দাদাবউদির সঙ্গে সম্পর্কের সব পাটও তারা এইভাবে চুকিয়ে দিতে পারত। তা ওরা দত্তবংশের স্মৃতির সব বোঝা দাদার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে চায়। কেন যক্ষ হয়ে তাঁকেই সব আগলাতে হবে? পৈতৃক ভাড়াবাড়িতে থাকতে পারার এটা কি মাশুল? কপালে একটা মশা বসেছিল। অনন্তনারায়ণ হাতের চেটো দিয়ে সেটা মারলেন। দূর থেকে দেখলে কেউ এটাকে কপাল চাপড়ানো বলে মনে করতে পারত।

বাড়ির বড়ছেলে হওযাব ঝকমারি অনেক। ভাইবোনেরা তো জ্ঞান হয়ে ঠাকুরদাকে দেখে নি। অনন্তনারায়ণ ছিলেন ঠাকুর্দার অন্ধের নড়ি। ছোটবেলায় সব সময় তাঁকে ঠাকুর্দার ছায়া হযে থাকতে হত। কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম থেকে শুরু করে নানক, কবির, তুলসীদাসের দোঁহা — ঠাকুর্দার পাল্লায় পড়ে তাঁকে মুখস্থ করতে হয়েছিল।

তার চেয়েও বড় কথা, ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষের নাম, শ্রেণী, গোত্র — রোজ সকালে উঠে আওড়াতো। এসব অত্যাচার তো আর কাউকে সইতে হয়নি। তবে?

ওরা তো ছবিতে বছরে একদিন মালা দিয়েই খালাস।

আজ তিরিশ বছর ধরে দাদা যে ভারবাহী পশুর মতো একা পূর্বপুরুষদের স্মৃতির বোঝা বইছে, সে একবার কেউ ভুলেও বলবে না। উলটে দেয়ালটা ফাঁকা দেখে চোখ কপালে তুলে সবাই নাটুকে গলায় বলে উঠবে — ছবি? বাবার ছবি?

না। সত্যিই, ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তির হবে। তাছাড়া অনন্তনারায়ণ জানেন, ওদের বউদিও তখন তাদের তালে তাল দেবেন। বলবেন আমি তখনোই বলেছিলাম, পই পই করে বলেছিলাম ইত্যাদি। তাতে অনন্তনারায়ণের প্রেস্টিজ আরো ঢিলে হয়ে যাবে।

অনন্তনারায়ণ বুঝলেন, এবার একটা কিছু না করলেই নয়। আজ যখন শনিবার, আজকেই কিছু একটা বিহিত করতে হবে। নইলে এরপর খুবই দেরি হযে যাবে।

যেই ভাবা সেই কাজ। অনন্তনারায়ণ আসল কালপ্রিটকে চিঠি লিখতে বসলেন। 'আসল কালপ্রিট' বলতে শঙ্কর। তাঁর এক বন্ধুপুত্র। লিখলেন :

শঙ্কর বাবাজীবন,

তোমার হয়তো মনে আছে, আজ বৎসরেক হইতে চলিল তুমি এক মাসের কড়ারে আমার পিতৃদেবের একটি এনলার্জড ফটো নিযা গিয়াছিলে আমাকে উহা হইতে একটি অয়েল পেন্টিং তৈরি করিযা উপহার দিবে বলিযা। তোমার আরো ইচ্ছা ছিল, ওই একইসঙ্গে আমার মাতৃদেবীর ফটোটিকেও অয়েল পেন্টিঙের রূপ দিবার। কিন্তু রোগা শরীরে তোমার নিতে কষ্ট হবে ভাবিযা এবং আমাদেরও ঘর দমকা হাওয়ার ভয়ে সেদিন তোমার ইচ্ছা পূরণ করিতে পারি নাই। তারপর বেশ কযেক মাস কাটিয়া গিয়াছে, ওখানকার কয়েকজনকে দিয়া খবরও পাঠাইযাছি। কিন্তু বাবা, আর আমার পক্ষে তো অপেক্ষা করা চলে না। আগামী বুধবার আমার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। বাড়িতে লোকজন আসিবে। মঙ্গলবার রাত্রের মধ্যেই ফটোটি আমার চাই। তোমার বাবা-মা-কে আমার ভালোবাসা দিও। আর কি।

ইতি —

আশীর্বাদক

শ্রী অনন্তনারাযণ দত্ত

চিঠিটা শেষ করে অনন্তনারায়ণের মেজাজটা বেশ ভালো হল। এরকম হয। অনেকদিন ধরে কোনো কাজ করব করব ভেবে ফেলে রাখার পর যখন সেটা করা হযে যায তখন তার একটা অদ্ভুত তৃপ্তি আছে। কাজটার ফলাফল যাই হোক না কেন।

চিঠিটা লেখার পর অন্দরমহলের দিকে তাকিযে অনন্তনারায়ণ একটা হুঙ্কার ছাড়লেন — 'ওগো শুনছ!'

আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছাটা কাঁধের ওপর ফেলতে ফেলতে অনন্তনারাযণের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন।

গিন্নীর এই চাবির গোছাটা দেখে অনন্তনারাযণ, প্রকাশ্যে নয, কিন্তু মনে মনে হাসেন। চাবি বলতে একটা খিড়কির দরজার, একটা রান্নাঘরের, একটা সেলাইযের কলের টেবিলের দুটো দেরাজের, একটা কাপড়চোপড়ের আলমারির আর সেই সঙ্গে বহুদিন আগে গত

হওয়া কয়েকটা টেপা-তালার — ব্যস এই হল ওর অস্থাবর সম্পত্তির পাহাবাদাব। আলমারির যে আধখানায় টুকিটাকি জিনিসপত্রের সঙ্গে ডয়ারে রোজকার খরচের টাকাপয়সা থাকে, সেটাতে কোনো চাবি নেই। সব সময় খোলা। গহনাটি তো নেই। সেই বিয়ের সময় যা পেয়েছিলেন, কম নয়। তিন মেয়েকে পার করতেই সে-সব খরচা হয়ে গেছে। অনন্তনারায়ণ চটাস করে আরেকটা মশা মারলেন। এবারো সেটা নিজের কপাল চাপড়ানোর মতো দেখাল।

অনন্তনারায়ণের স্ত্রী বরাবরই একটু উগ্রপন্থী। বেশ মন দিয়েই তিনি চিঠির বয়ানটা শুনলেন। এরপর দুজনের মধ্যেই কথোপকথনটা হল এই রকমের

'তৈরিই বটে। তা ওর হাতুড়ি বাটালি আছে তো?'

অনন্তনারায়ণ একটু দ্বিধায় পড়লেন। শ্লেষটা ঠিক কাকে লক্ষ্য করে বুঝতে না পেরে, বললেন, 'আর্টিস্ট তো, কাজেই ওটা কেটে 'আঁকিয়া' করাই ভালো। হ্যাঁ, আর্টিস্টদের আবার বড্ড অভিমান। একটু সরে বসতে বলার উপায় নেই।'

'উপহার কথাটা কোথা থেকে পেলে? শঙ্কর বলেছিল তোমাকে?'

'না মানে, কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয় সেইজন্যেই কায়দা করে কথাটা জুড়ে দিলাম আর কি।' অনন্তনারায়ণ এখানে একটু মিথ্যের আশ্রয় নিলেন। আসলে শঙ্কর তাঁকে ছবিটা বিনা পয়সায় এঁকে দেবে আগাগোড়া এটাই তিনি ধরে নিয়েছিলেন। তাই এ বিষয়ে তার মনে কোনো চিন্তাই ছিল না। উপহার কথাটা তাঁর কলমের ডগায় এসে গিয়েছিল নেহাৎই সৌজন্যের সূত্রে।

অনন্তনারায়ণের স্ত্রী একটু হাসলেন। মুখে না বললেও, ভাবখানা এই — 'তোমাকে আমি চিনি না? তোমার যদি সেই আক্কেলই থাকবে, তাহলে এতদিনে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই হয়ে যেত নিজেদের। তাহলে আর এভাবে রোজ দুবেলা বাড়িওয়ালার লাথিঝাটা খেতে হত না। পৈতৃক ভাড়াবাড়ি বলতে লজ্জা করে না তোমার? বাড়ি হবে হয় পৈতৃক, নয় ভাড়াটে। তা নয়, পৈতৃক ভাড়াবাড়ি! এ যেন সোনার পাথরের বাটি। ছিঃ!'

আর শেষটায় মুখটা একটু তেতো করে বললেন, 'মঙ্গলবার পত্রের মধ্যেই চাই। জব্বর লিখেছ। আমি বলি কি, চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এসে চোখ বুজে বসে থাকো। শ্বশুরমশাইয়ের ছবিটা আড়াল থেকে উড়ে এসে ঠিক দেয়াল জুড়ে বসে যাবে।

মেয়েদের বাস্তব বুদ্ধি সত্যিই বেশি। নৈর্ব্যক্তিক 'চাই' লেখাটা মোটেই কাজে আসবে না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনন্তনারায়ণ 'আমার চাই' কেটে ইলেক দিয়ে ওপরে লিখলেন, 'এ বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিবে।' অনন্তনারায়ণের মনে হল, 'বাড়ি না লিখে 'বাসা' লেখাটাই উচিত ছিল। যাকগে মরুকগে, ও নিয়ে অত খুঁতখুঁত করে লাভ নেই। এবং ওর পাশে আরেকটু জোর দিয়ে অনন্তনারায়ণ যোগ করলেন, 'এর অন্যথা না হয়।'

চিঠিতে অত কাটাকুটি থাকলে লেখকের দ্বিধা বা সংশয় প্রকাশ পেতে পারে। এই আশঙ্কা করে অনন্তনারায়ণ পুরো চিঠিটা একটু না কেটে আবার গোটা গোটা করে লিখলেন।

তারপর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি একটু বেরোচ্ছি। একবার শ্যামবাজারে যাব। ফিরতে দেরি হতে পারে।'

অনন্তনারায়ণকে বাইরে রেখে দরজাটা বন্ধ করার আগে তাঁর স্ত্রী, সম্ভবত না জেনেই, হঠাৎ একটা বোমা ফাটিয়ে বসলেন।

'শঙ্কর শুনেছিলাম নকশাল হয়ে গিয়েছিল। ছবিটবি আঁকে ঠিক আছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে ও নকশা না করে থাকলেই ভালো।'

দরজাটা ভাগ্যিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং অনন্তনারায়ণ আগে থেকেই সিঁড়ির রেলিংটা শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। ফলে অনন্তনারায়ণের মুখের চেহারায় মুহূর্তে কী পরিবর্তন

এসেছিল তাঁর স্ত্রীব সেটা চোখে পড়ে নি এবং অনন্তনাবায়ণও মাথা ঘুবে পডে যাওয়াব হাত থেকে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিলেন।

সিঁড়ি দিযে নামতে নামতেই, তাঁব গন্তব্য সম্পর্কে অনন্তনাবাযণ মনস্থিব কবে ফেলেছিলেন।

কালীঘাট স্টেশন বেশি দূবে নয। টিকিট কেটে আপ ট্রেনে উঠে জানলাব ধাবে বসে তাঁব প্রথম কাজই হল পকেট থেকে চিঠিটা বাব কবে কুটি কুটি কবে ছিঁড়ে ফেলা।

মনে মনে তিনি হিসেব কবে নিযেছিলেন যে, আসা-যাওযা নিযে মোট ঘণ্টাতিনেক লাগবে। তাছাড়া দেবি হওযাব কথা বাড়িতে তো বলাই আছে।

স্ত্রীব কথা শোনাব পব থেকেই তাঁর ভযটা এখন আতঙ্কে পবিণত হযেছে। ছবিটা নিযে আসাব পেছনে শঙ্কবেব সত্যিই কি কোনো চাল ছিল? পূর্বপুরুষদেব মুছে দেওযাব একটা গূঢ় দুবভিসন্ধি? পেছনটাকে একবাবে বববাদ কবে শুধু সামনেব দিকে মানুষেব মুখ ঘুবিযে দেওয়াব? কামপুচিয়ায পল্‌পতেব দল যা কবতে চেযেছিল? সেইজন্যে একই সঙ্গে বড কবে বাঁধানো সব ফটোই সে নিযে যেতে চেযেছিল? একটাব পব একটা চিন্তা স্রোতেব মতো বযে চলেছে, অনন্তনাবাযণ তাতে কুটোর মতো ভাসছেন। মাঝখানে সিগনাল না পেযে বেশ খানিকক্ষণ আটকে পডায ট্রেনটা লেট বান কবছিল। ফলে, মাঝপথেই সন্ধে হযে গেল। তাব মানে, শঙ্কবদেব বাড়িটা রাত্তিবে খুঁজে বাব কবতে একটু কষ্ট হবে। তা হোক। তাব চেযেও বড কথা, ওদেব বাড়িতে পৌঁছুনো। অবশ্য কপালে যে কী নাচছে কেউ জানে না।

স্টেশনটা এসে যেতেই অনন্তনাবাযণ হুটপাট কবে নেমে পডলেন। যখন তিনি বেবিযে যাবাব গেটেব একেবাবে মুখে, ঠিক সেই সময ফস্ কবে সমস্ত আলো নিভে গেল।

তীবে এসে তবী ডুবলে যা হয, অনন্তনাবাযণেব তখন সেই অবস্থা।

এখন উপায? ঘুট ঘুট কবছে অন্ধকাব। তাব ওপব অনন্তনাবাযণেব মনে পডল, আজ অমাবস্যা। লোডশেডিঙেব সবে শুরু। কখন শেষ হবে কেউ বলতে পাবে না। এটা তো শহবতলি। কাজেই সাবাবাত আলো না এলেও আশ্চর্য হওযাব কিছু নেই।

অনন্তনাবায়ণ যে অন্ধকাবেই টুকুস টুকুস কবে হেঁটে যাবেন তাও সম্ভব নয। কাবণ এখানকার বাস্তাঘাট তাঁব মোটেই সডগড নয।

সুতবাং পিছু হঠা ছাড়া এখন আব কোনো উপায নেই। এব পবেব ফেবাব ট্রেন এখুনি এসে যাবে। যাতাযাতী টিকিটেব পযসাটাই যা জলে গেল।

একেবাবে জলে গেল না। কেননা, ফেবাব পথে আবাব সেই জানলাব ধাবে বসাব ফলে হাওযা লেগে হঠাৎ তাঁব মাথাটা খুলে গেল।

আসছে বুধবাব তাঁব এক বিশেষ বন্ধু মল্লিকপুবে আবোগ্যভোজনেব নেমন্তন্ন কবায বাড়িতে তালা লাগিয়ে সপবিবাবে তাঁকে চলে যেতে হবে। শেষ ট্রেনেব আগে ফেবা যাবে না। ছেলে যদি যেতে না চায ওব দিদিব বাড়িতে ও যেন খেযে নেয।

মৃত্যুতিথিটা কাটিয়ে দেওযাব পব বাবাব ছবিব কথা আবাব ভাবা যাবে।

অনন্তনাবাযণেব স্ত্রী যা টাটা। উনি এখন বাজি হলে হয।

একপ্রস্থ খবচ আব খাওযানো দাওয়ানোব হাঙ্গামা থেকেও বাঁচা যাবে বইকী।

তাঁর স্ত্রী এই টোপটা এখন গিললে হয।

সংকেত

সোমেন চন্দ

তখনো আকাশ ভালো করিয়া পরিষ্কার হয় নাই। নানারকমের পাখি আগামী দিনের ঘোষণায় প্রাণপণে ডাকাডাকি করিতেছে। বনগ্রামের মরা নদীর কঠিন বুকেও ভয়ানক ঝড় তুলিয়া কাহাদের এক লঞ্চ তীরে আসিয়া ভিড়িল।

প্রথমে দেখিয়াছিল অন্ধ দশরথ। তাহার দুই ছেলে। এক ছেলে গিয়াছে বাহিরে, আর এক ছেলে যার বয়স অল্প — হাতের বৈঠাটি একপাশে রাখিয়া সে তখন অন্ধ পিতার জন্য এক ছিলিম তামাক ভরিতেছিল। আর দশরথও তখন তাহার হাতের জালটি গুটাইয়া একটু ভিজাইবার আশায় পশ্চিমের প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া ছেলের তামাকের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ কেমন একটা গুম্ গুম্ আওয়াজ তাহার কানে বাজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগে কান পাতিয়া শুনিয়া সে ডাকিল, 'রাম?'

দশরথ পুত্র রাম তখন তামাক ভরিতে ব্যস্ত। তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না, রাগিয়া বলিল, 'ক্যান?'

দশরথ বলিল, 'কিছু হুনস্‌নি?'

রাম মুখ না তুলিয়াই বলিল, 'না।'

দশরথ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'দ্যাখ তো চাহিয়া, ইস্টিমার তো — না?'

— 'তা অইলে তুমি কিছু দেখতে পাও, না বাবা?'

রামচন্দ্রের বিশ্বাস, তাহার বাবা তেমন করিয়া না দেখিলেও কিছুটা নিশ্চয় দেখিতে পায়, কিন্তু দশরথ ইহা শুনিলে আর রাগ সামলাইতে পারে না। এবার হয়তো শুনিতে পায় নাই, তাই রক্ষা। কোনো উত্তর না পাইয়া আবার সে ডাকিল, 'রামা।'

—'কী।' কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাম একবার সেদিকে তাকাইল ঃ দশরথের কথা মিথ্যা নয়, সত্যই একটা ছোট জাহাজের মতো চোখে পড়ে, এখন আওয়াজ আরও স্পষ্ট –

দারুণ খুশি হইয়া সে বলিল, 'হ, বাবা।'

— 'দ্যাখ্ আমার কথা হাছা কিনা।' দশরথ হাসিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক গল্প জুড়িয়া দিল ঃ সে অনেকদিন আগেকার কথা, বেলতলীর জমিদার বাড়ির বড় ছেলে সদ্য বিলাত হইতে ফিরিয়া সেই প্রথম যখন নিজ গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন আসিবার পথে বিস্তর দুর্ভোগ ভুগিয়া এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তার কিছুদিন পরেই দেখা গেল, মস্ত এক স্টীমার ভীষণ হাঁকডাকের সঙ্গে আশপাশের গ্রামের সমস্ত লোককে আনিয়া হাজির করিয়াছে নদীর পারে। স্টীমার-কোম্পানী নূতন লাইন খুলিয়াছে, তখনকার নদী কী আর এখন আছে! দশরথ সেই দৃশ্য দেখিয়াছে তাহার জীবনে। আজকাল কী আর সেরকম ঘটনা ঘটে। সেসব দিনের মানুষও আজ আর নাই, তাহাদের কীর্তিও নাই। এবং পরক্ষণেই এই অদ্ভুত খবরটি শ্রীরামচন্দ্রের মুখে সারা গ্রামে রটিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে লঞ্চের সিঁড়ি বাহিয়া যে লোকটি সদলবলে নামিয়া আসিল, তাহার গায়ে চমৎকার পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর, পায়ে চকচকে পাম্প-সু, মুখে একটি সিগারেট আর মৃদু হাসি।

যাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের কেহ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, কেহ সেখানে থাকিয়াই বুকের ওপর দুই হাত রাখিয়া এমনভাবে চাহিল, তাহাদের মতো তাহারাও চলিয়া যাইবে, মারিয়া ফেলিবে না তো আর। ইহারা নবীন। যাহারা প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া হাসিল। ইহাদের স্পর্ধা তো কম নয়। ব্যাপার যাই হোক না কেন সবটাতেই একটা বাহাদুরি দেখানো চাই। বাবু সেলাম, ইয়াসিন একটা সেলাম দিয়া বলিল। আজ জীবনের শেষ ঘণ্টাগুলি ঢং ঢং করিয়া বাজিতেছে। এতকাল যে-সেলামের জোরেই সে সকলের প্রিয় হইয়া আসিয়াছে আজও তাহার অন্যথা হইবে না।

বাবু সেলাম গ্রহণ করিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিলেন।

॥ ২ ॥

খবরে যদিও জানা গেল লোকটি কোনো কাপড়ের কলের ম্যানেজার — অর্থাৎ একেবারে বড় কর্তা, মিলের জন্য এখানে লোক সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে, তবু তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত রহিল না।

শীতের সকাল। রহমানের বাড়ি পার হইয়া দূরে কাহাকে যেন দেখিয়া বলরাম পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। লোকটা একটু কাছে আসিলে পর হাসিয়া বলিল, 'কাকা না গো?' ইয়াসিন বলিল, 'হুঁ'।

—'কী যে হইছে, দূরের থনে তোমারে চিনতেই পারি নাই। হ্যাশে -- হুনছোনি? তোমরা যতই কও, আমার কিন্তু মনটা কয় এখবর মিছা।'

— 'দুরো। তোমার তো হগলটাতেই খালি সন্দ!' ইয়াসিন পরম নিঃসন্দেহে অন্যদিকে চাহিয়া বলিল — এমনভাবে চাহিল যেন ইহার পরে আর দ্বিতীয় কথা নাই। সে সকলের আগে নিজের কানে যাহা শোনে, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবে, এমন হতভাগা এ অঞ্চলে কেহ নাই। ধীরে ধীরে সে বলিল, বাবুটি যে কোনো মিলেরই বড়বাবু, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তিনি যে লোক সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন, একথাও মিথ্যা নহে — বলরাম তাহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে। তাহার ছোটবেলায়ও যে এমনি আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। সে তখন ছোট হঠাৎ এমনি একদিন কোথা হইতে এক বাবু আসিয়া সারাটা গাঁ তোলপাড় করিয়া তুলিল।

ইতিমধ্যে আকবর আলী আসিয়া তাহার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। তাহার হাতে একটি আমের কচি ডাল, সেটা দাঁত দিয়া চিবাইতে চিবাইতে সে মাথা নাড়িতে লাগিল। ফিক্ করিয়া কিছু থুথু ফেলিয়া বলিল, 'লড়াইয়ের খবর রাখনি, ইয়াসিন মিঞা? হেইর লেইগা ফাঁকি দিয়া লোক লিবার আইছে, জান?'

আরো দুই একজন আসিয়া জুটিয়াছিল। এমন একটি কথা শুনিয়া তাহারা সকলে বিস্ময়ে আর ভয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সকলে আকবরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া ইয়াসিন রাগিয়া উঠিল। হঠাৎ নিজের বুড়া আঙুলটি তাহার চোখের সামনে ধরিয়া বলিল, 'তুমি এইটা জানো।' আকবর আলী গম্ভীর ভাবে বলিল, 'তোমার কুন ডর নাই, হ্যারা বুড়া মানুষগো নিব না।'

ঝগড়া ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। আরও বাড়িত। কিন্তু কে একজন বলিল, 'বাচ্চা মৌলবী।'

সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল, ঝগড়া কিছুক্ষণের জন্য থামিল — এই আশায যে, বাচ্চা মৌলবীই ইহাব মীমাংসা করিতে পারিবে।

বাচ্চা মৌলবী বলিযা তাহাকে সবাই ডাকে, তার একমাত্র কাবণ এই যে তাহাব বযস অত্যন্ত অল্প এবং এই বযসেই সে মৌলবী হইয়াছে। সে পাশেব গ্রামেই থাকে এবং মাঝে মাঝে কোনো পত্রিকা হাতে কবিযা আসিয়া বেলা দুইটা-আড়াইটা অবধি এ অঞ্চলেব সকলকে যুদ্ধেব খবব শুনাইযা যায। শহবেব খবব তাহাব কাছে অবিদিত নাই, মাসেব মধ্যে পনেবো দিনই তো সে সেখানে কাটায। এ কথা সবাই জানে, নবাবেব সঙ্গে বসিযা সে খানা খাইযাছে এবং নবাব সাহেব তাহাব হাতে চুমা খাইযাছেন।

বাচ্চা মৌলবীব পবনে পাঞ্জাবি আব লুঙ্গি, গোঁফ এখনও ভালো কবিযা উঠে নাই, হাতে একটা ঘড়ি। কিন্তু ঘড়িটা কখন চলিতে শুব কবে, আব কখন থামে এ খবব কেউ বাখে না। ঘড়িটা একবাব চোখেব সামনে ধবিযা এই শীতেব সকালেও পত্রিকা দিযা বাতাস খাইতে খাইতে মৌলবী শুদ্ধ ভাষায বলিল, 'ওনাবে আমি চিনি'। এই বলিযা ম্যানেজাববাবুব সঙ্গে তাহাব এক সুদীর্ঘ পবিচযেব ইতিহাস বিবৃত কবিযা অবশেষে বলিল, 'তাইন লোক নিতে আইছে ঠিকই। বহমান, তোমাব ঘবে তো তাঁত আছে, তোমাবে নিবে আগে।'

বহমান এতক্ষণ চুপ কবিযা শুনিতেছিল, মৌলবীব কথা শুনিযা হাসিযা ফেলিল। নতুন বিবাহ কবিযাছে সে, তেলে আব জলে চুলগুলি চমৎকাব পবিপাটি, চোখে সুবমা, পবনে জামা আব লুঙ্গি — বঙিন।

বেলা হইযা যাইতেছিল। মৌলবীব সময নাই, একবার সূর্যেব দিকে এবং আব একবাব ঘড়ির দিকে চাহিযা সে বলিল, 'দশটা বাইজ্যা গেছে, আমি যাই, কাজ আছে, আমাব একটু চৌধুবী বাড়ি যাইতে অইব।'

আকবব আলী তবু কিছুতেই বিশ্বাস কবিবে না। কিন্তু মৌলবীকে চলিযা যাইতে দেখিযা তাড়াতাড়ি তাহাব পাশে গিযা ফিক কবিযা থুথু ফেলিযা বলিল, 'মৌলবী!'

মৌলবী পাশে তাকাইল।

আকবব আলী বলিল, 'আমাব একটা কথা বাখবা তুমি?'

-- 'কও?'

— 'আমাব ভাই-এব লেইগা একটু কইযা দিবা তুমি —'

মৌলবী পবিষ্কাব ভাষায বলিল, 'দিব, দিব।' বলিযা তব্ তব্ কবিযা চলিযা গেল।

শত আনন্দ হইলেও হাসিযা কখনো আনন্দ প্রকাশ কবে না ইযাসিন। সকলেব দিকে একবাব তাকাইযা সে বলিল, 'অহনও বিশ্বাস অয না?'

বলবাম আগে সন্দেহ প্রকাশ কবিলেও ইতিমধ্যে আবাব বিশ্বাস করিযা ফেলিযাছে। ইযাসিনেব কাছে ঘেঁষিযা বলিল, 'কাকাগো, তোমাব কাছেই আইছিলাম, একটা আলাপ করুম।' মণ্ডল-পুত্র কিসেব পবামর্শ চাহিতে আসিযাছে কে জানে। ইযাসিন হাসিল।

।। ৩ ।।

বিকালেব বৌদ্রে চাবদিক ঝল্মল্ কবিতেছে। গাছেব ছাযাব নীচে একটা চেযাবে বসিযা ম্যানেজাববাবু মৃদু মৃদু হাসিযা বলিলেন, 'হ্যাঁ তোমাদেব গাঁ-টি বেশ ভালো লেগেছে। তোমবাই দেশেব গৌবব। ফেমিন হবাব আগে সাবা ভারতেব কাপড় যোগাতে তোমরাই। এমনকি বিদেশেও ছড়িয়ে দিতে, অথচ আজ শুকিয়ে মরছ। তোমাদেব কদব কজনা বোঝে?' নদীব

দিকে আঙুল দেখাইয়া তিনি বলিলেন, 'সেখানেও এমনি নদীর হাওয়া, নদীব একেবারে পাব ঘেঁষেই চমৎকাব ব্যারাক সেখানে, তোমবা থাকবে। হাতের কাছে হাসপাতাল, খেলাব মাঠ, সিনেমা, যখন যা খুশি।' — ম্যানেজারবাবু মৃদু হাসিলেন।

বহমান নাম লিখাইয়া ফেলিল। আজই রাত বাবোটার সময লঞ্চে উঠিতে হইবে।

বাড়ি ফিবিলে তাহাব বুড়া বাপ হুঁকাটি ছেলের হাতে দিযা বলিল, 'তাডাতাডি খাওন-দাওন সাইরা শুইযা পড, বাবোটা বাজলে পব আমি ডাইকা দিমুনে, যাও শুইযা পড গিযা।'

বহমান পিতৃআজ্ঞা যথারীতি পালন করিল।

তাডাতাড়ি খাইয়া-দাইযা শুইতে আব দেরি কবিল না।

কিন্তু বাত বাবোটা বাজিতে আর কতক্ষণ লাগে? বুডা রহমানেব ঘবেব দরজাব কাছে গিয়া ডাকিল, 'বাপ, সময় অইযা গেছে, অ্যালা ওঠ।

কোনো উত্তব আসিল না, বা কেউ বাহির হইযা আসিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা কবিযা বুডা মনে মনে হাসিল, নিজেব মৃত স্ত্রীব কথা মনে পডিল।

অথচ এদিকে বাবোটা বাজিযা যাইতেছে। বুডা আবাব ডাকিল, 'রহমান ওঠ, ইস্টিমাব ছাইডা দিতে আব কতক্ষণ।' এই বলিযা নিজেব ঘবেব দাওযায আসিযা আবাব তামাক সাজিতে বসিল। কিছুক্ষণ এমনি কাটিবাব পরও বহমানকে আসিতে না দেখিযা হুঁকা হাতে বুড়া আবার বাড়িব ভিতবে গিযা দেখিল, দাওয়ায় খুঁটি চাপিযা ধরিযা অন্ধকাবে নিঃশব্দে বহমান বসিযা আছে।

হুঁকাটি তাহাব হাতে দিযা বুড়া বলিল, 'তাড়াতাডি তৈয়ার অইযা লও বাপ, আব দেবি কইবো না।'

বহমান তেমনি খুঁটি ধবিযা বসিযা বহিল।

এক হাতে একটি বহু পুবনো লণ্ঠন, আব এক হাতে একটি প্রকাণ্ড চক্‌চকে লাঠি লইযা পথ দেখাইযা চলিল বুড়া। বাস্তায সাপ বা মানুষের ভয থাক বা নাই থাক, এ দুটিকে ছাড়া সে কখনো পথ চলিতে পাবে না। ধীবে ধীবে চলিতে চলিতে সে বলিল, 'হেইখান গিয়া চিঠি দিও, তা না অইলে চিন্তায থাকুম।'

বহমান আস্তে বলিল, 'আইচ্ছা।'

গোলাম আলীব বাড়ি পাব হইলেই একটা মস্ত বকুল গাছেব নীচ দিয়া হাটিতে হয। সেখানে বকুল ফুলেব গন্ধে চারিদিক ভবিযা থাকে। সেই গাছেব নীচ দিযা চলিতে চলিতে বহমানেব শবীব অবশ হইযা আসিল, ঘুমে ভবা চোখ বুজিযা আসিল, সে অনুভব কবিল এখনও যেন সে কাবও ফুলেব মতো বুকে মুখ বাখিযা গভীব নিঃশ্বাস ফেলিতেছে।

ঠক্ ঠক্ কবিয়া এখানে লাঠি ফেলিযা হাঁটিতে হাঁটিতে বুডা আবাব ডাকিল, 'বাপ্।'

— 'কও?' কিন্তু কিছুক্ষণ কান পাতিযা থাকিযাও রহমান আব কোনো কথাই শুনিতে পাইল না। বোধহয যা বলিতে হইবে সব ভুলিযা গিয়াছে বুড়া।

একটু পরেই লঞ্চেব আলো দেখা গেল। আশেপাশে অনেক লোক ভিড কবিযা দাঁড়াইযা আছে। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে গল্প করিতেছে। কেহ সিঁড়ি বাহিয়া লঞ্চে উঠিবাব চেষ্টা কবিতেছে। সব মিলিযা একটা মস্ত হল্লা।

একটু নির্জনতায ছেলেকে টানিয়া বুডা আবাব বলিল, 'বাপ।'

— 'কও?'

— 'একটা কথা কমু। এত বুড়া হইয়া গেলাম, তুমি আমাবে ছাইড়া কোনোকালে কোনোখানে যাও নাই, কিন্তু আইজ ছাইড়া গেলা, আমাব মনটাবে কী দিয়া বান্ধুম, তুমিই

কও?’ বুড়া অনেক কষ্টে তাহার সবগুলি কথা এতক্ষণে বলিয়া ফেলিল এবং ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এমন দৃশ্যের সঙ্গে রহমানের এই প্রথম পরিচয়, সে কী-যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।

নদীর উপরের ঠাণ্ডা বাতাসে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো কাঁপিতেছে। চারিদিকে জলের গন্ধ। আকাশে অজস্র তারা। পাশেই আগামী কোনো সুখের সৌরভে বিহ্বল লোকজনের হল্লা। বুড়ার শীর্ণ হাতের লাঠিখানাও ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে রহমান উপরে উঠিয়া দেখিল, সেই বাচ্চা মৌলবী সারা লঞ্চময় চর্কিবাজির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোকটা এমনি পাতলা ছোটখাটো মানুষ, যেন হাওয়ার সঙ্গে উড়িয়া চলে, এক মিনিটে হাজার মাইল অতিক্রম করে।

রহমানকে দেখিয়াই ঘড়ি দেখিয়া সে এদিক-সেদিক তাহার চঞ্চল দৃষ্টি বুলাইয়া তর তর করিয়া বলিল, ‘এতক্ষণে আইছ। টাইম অইয়া গেছে।’

মৌলবী টাইম ধরিয়া চলে। আবার ঘড়ি দেখিয়া সে সামনের দিকে অগ্রসর হইল।

রেলিং ধরিয়া রহমান একা দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েকহাত নীচেই তাহাদের গ্রামের নদী, আজ ছাড়িয়া যাইতেছে, বলিয়া অত্যন্ত আপনার বলিয়া মনে হয়। নদীর জলে লঞ্চের আলো পড়িয়া চিক্‌মিক্‌ করিতেছে, লঞ্চের ভিতরের মানুষগুলির আবছা ছায়াও সেখানে দেখা যায়, অন্ধকারের বুকে কেবল আরো কতকগুলি গভীর অন্ধকারের মতো মনে হয়। আর তাহাদের আত্মীয়-স্বজনরা — তাহারাও লণ্ঠনহাতে বিদায়ের প্রার্থনায় কাতর।

রহমানের চোখের পাতা বুজিয়া আসিল। সে দেখিল, নদীর জলে কে এক নারীমূর্তি, নাকের চোখের জলে এক হইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। তাহার নাকের ডগায় ঘাম, ঘর্মাক্ত সমস্ত শরীরটিকে রহমান ঝুঁকিয়া দেখিল। তাহার গায়ে এখনও সেই মেয়েটির ঘামের গন্ধ। আরও নিবিড় হইয়া সে সেই গন্ধ শুঁকিতে লাগিল।

ঘুমে তাহার চোখ জুড়াইয়া আসিল।

কোনোরকমে একটা জায়গা করিয়া ছোট পুঁটলিখানা মাথার নীচে রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। একটু পরেই সে স্বপ্ন দেখিল। আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস, এখন ভয়ানক বাতাস ছাড়িয়াছে, দীর্ঘ সুপারি আর নারিকেল গাছের মাথায় ভীষণ মাতামাতিতে নদীর জলে দুরন্ত ঢেউ, বড় বড় ধান গাছের শিষগুলি যন্ত্রণায় কাঁপিতেছে, আকাশে পাখির কলরব, রহমান যেন শুনিতে পাইল, তাহাদের গোয়াল ঘরের গোরুগুলি ‘মা’ ‘মা’ করিয়া কাতরস্বরে ডাকিতেছে। মনে হয় এমন করিয়া যেন তাহারা আর কোনদিনও ডাকে নাই। তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া সে দেখিল, তাহার গোরু নয় তো — তাহার বৌ, আর গোয়াল ঘরটা আসলে গোয়াল ঘর নয় তো, তাহার শোবার ঘর। বৌ তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, গলা জড়াইয়া ধরিল, বুকের মাঝখানে তাহার হাতকে টানিয়া বলিল, ‘এই দ্যাখো, এহান কেমুন ব্যথা। তোমারে ছাইড়া আমি থাকতে পারুম না বন্ধু, মইরা যামু।’ একটু পরে রহমান টের পাইল, তাহার দুইটি পা আরও দুইটি পায়ের সঙ্গে সুতার মতো হইয়া গিয়াছে।

— ‘রহমান? ও রহমান?’

রহমান ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল, ভালো করিয়া চাহিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ‘কে? আজু?’

মৌলবী তাহার বৌ-র নাম জানিত, হাসিয়া বলিল, ‘না, আমি তোমার বৌ না, আমি মৌলবী।’

রহমান চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, ‘ও।’

কিন্তু মৌলবী কাজের লোক, তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'ভোর অইয়া আইছে, আর কত ঘুমাইবা?'

রহমান বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে অনেক অন্ধকারের সারি এখনও ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছে।

ম্যানেজারবাবুর কামরায় আলো দেখা যায়।

মৌলবী গল্প করিতে লাগিল, তাহার অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলিয়া যাইতে লাগিল — জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, রহমান কেবল হাঁ করিয়া শুনিল।

মৌলবী অনেক গল্প করিল।

কিন্তু ভোর আর হয় না, তাহারা উঠিয়া এধার-ওধার অনেক ঘুরিল। দুই একজনকে জাগাইয়া গল্প করিল। ঘণ্টা দুই চলিয়া গেল। তবু ভোর আর হয় না, বাহিরে তেমনি অন্ধকার, গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা, কেবল জলের শব্দ।

মৌলবীর ঘড়ির কাঁটা কখন চলিতে শুরু করে, আর কখন গিয়া থামে, সে তথ্য রহমান আজও জানিতে পারিল না, কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আবার সে একা-একা কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল, লঞ্চের এটা-ওটা উঁকিঝুঁকি মারিয়া কতক্ষণ দেখিল, শেষে হাত পা গুটাইয়া বৌ-এর কথা ভাবিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে ভোর হইল। এখন মস্তবড় নদী, ওপারের সীমানা কুয়াশায় ভরা, সূর্যের আলোয় জলের উপর কেহ কতকগুলি চক্‌চকে নূতন টাকা ছড়াইয়া রাখিয়াছে মনে হয়। নদীর দুইপাশে মাঝে-মাঝে ইটের খোলা, পাটের গুদাম।

দূরে মিলের চিমনি দেখা গেল। কিন্তু ধোঁয়ার চিহ্ন নাই। কোথা হইতে আসিয়া আবার মৌলবী দেখা দিল। কোনো নূতন খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে নিশ্চয়। বলিল, 'আমরা আইসা পড়ছি।'

।। ৪ ।।

সকলের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা তাহাদের কর্মস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। সকলে সামনের দিকে ছুটিয়া আসিল। ঐ যে কী একটা গম্বুজের মতো, ওটাই কি তাদের মিল? মৌলবী তাদের বুঝাইয়া দিতে লাগিল। সে সবই জানে। সকলে বিস্ময়ে আর আনন্দে এমন একটা জিনিসের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পৌঁছিতে বেশী দেরি হইল না। ধীরে ধীরে লঞ্চের গতি মন্থর হইয়া আসিল, এখন পাড়ে ভিড়িবে। ম্যানেজারবাবু আসিয়া দেখা দিলেন। কেমন একটা সফলতার আনন্দে তাঁহার সারামুখ উজ্জ্বল। সকলে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। দুই হাত ছাড়িলে যদি চলে, সেখানে পাঁচ হাত সরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তখনও লঞ্চটা পারে একেবারে ভিড়ে নাই, ধীরে ধীরে যেন একটা ভীষণ কলরব, সহস্র কণ্ঠের মিলিত চীৎকার ধ্বনি সকলের কানে আসিয়া বাজিল। সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, মিল দেখার আনন্দে একেবারে ভাঙিয়া না পড়িয়া রহমান আগেই কিছুটা লক্ষ্য করিয়াছিল, এখন সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া শব্দটা আরও লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিল। মৌলবীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নাই, সে নিতান্তই নির্বিকারভাবে ম্যানেজারবাবুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ব্যাপারটা সকলের আগে বুঝিবার আশায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ম্যানেজারবাবুর মুখ হঠাৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে, মুখের সেই মৃদুমন্দ হাসি আর নাই। লঞ্চ-চালকের কী একটা নির্দেশ দিতে তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই যা দেখা গেল, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই। নদীর পারেই প্রকাণ্ড চর, ধু-ধু করে বালু। তারপরে মিলের সীমানা। সেই ভীষণ গোলমাল আরও ভীষণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড চরটা মুহূর্তে হাজার হাজার লোকে ভরিয়া গেল। সেই লোকগুলি প্রাণপণে দৌড়িয়া আসিতেছে— প্রাণ যায় কী বাঁচে! ব্যাপার দেখিয়া রহমানের চোখে বিস্ময়ের অন্ত নাই— যেন একটা প্রকাণ্ড নদীর মুখ হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত জল বিপুল বেগে সারাটা পৃথিবী ভাসাইয়া লইল। রহমানের বুক কাঁপিতে লাগিল, নিঃশ্বাস দ্রুত হইয়া আসিয়াছে।

লোকগুলির কতক হুড়মুড় করিয়া জলে নামিয়া পড়িল, লঞ্চটাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। আর বেশীর ভাগই দাঁড়াইয়া রহিল পারে। কিন্তু সকলের মধ্যেই ভয়ানক চঞ্চলতা, কেহ হাত নাড়িয়া কিছু বলিতেছে, কেহ কেবলই চীৎকার করিতেছে, সকলের মুখে-চোখে কার্যকলাপে এমন একটা ভাব যেন এখনই পারিলে লঞ্চটাকে ডুবাইয়া দেয়। আর কী গোলমাল! আকাশকেও ফাটাইয়া চৌচির করিয়া দিবে মনে হয়। অমন দৃপ্ত বাগান্বিত পদক্ষেপে তাহাদের পায়ের নীচের ভূমিখণ্ড মুহূর্তে ধ্বসিয়া যাইবে যেন, তাহাদের চীৎকার ধ্বনিতে নদীর জলও উত্তাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু রহমান লক্ষ্য করিয়া দেখিল, একেবারে সামনে একটা লোকের মধ্যে পেছনের সকলের শক্তি যেন একত্রিত হইয়াছে। লোকটার বয়স অল্প, চেহারায় এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে একটা পার্থক্য ধরা পড়ে। সে হাত নাড়িয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া কি যেন বলিতেছিল। প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই শোনা যায় নাই, কিন্তু শেষে গোলমাল আপনিই কমিয়া আসিল। রহমান আশ্চর্য হইয়া শুনিল, লোকটা দৃপ্তস্বরে বলিতেছে ঃ 'বন্ধুগণ, আমাদের দেখে আশ্চর্য হবেন না। আমরা এই মিলেরই শ্রমিক, আপনারা যেখানে কাজ করতে এসেছেন আমরা সেইখানেই প্রথম কাজ করতে আসি। আমরা জানি আপনাদের শুধু চাকরির কথা বলেই আনা হয়েছে, আসল কথা বলা হয়নি। এই চাকরির ভেতর কী রহস্য তা আপনাদের কাছে গোপন করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমাদের কথা আপনারা একটিবার শুনুন, আমাদের বিশ্বাস করুন। যারা আপনাদের চাকরি দেবে বলে নিয়ে এসেছে তাদের আপনারা চেনেন না, কিন্তু আমরা চিনি। আমরা তাদের কাছে শুধু আমাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাতে গিয়েছিলাম, আমাদের সামান্য কয়েকটা মাত্র দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, কিন্তু তারা গ্রাহ্যই করে নি। তারা আমাদের মুখের ওপর লাথি মেরেছে। কিন্তু আমরা কেন তা সহ্য করব? আমরা স্ট্রাইক করেছি, মিলের কাজ বন্ধ। আমরা তার প্রতিবাদ জানিয়েছি।

আমাদের এই শক্তিকে পিষে ফেলবার জন্যে, আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়ার জন্যে তারা মিথ্যে কথা বলে আপনাদের এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আপনারা তাদের বিশ্বাস করবেন না। ভাই সব! আপনাদের চোখে পৃথিবী যেমন, আমাদের কাছেও তাই। আপনাদের যতখানি শোষণ, দুঃখ-দুর্দশার কষ্ট সহ্য করে চলতে হয়, আমাদেরও তাই। আমাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, আজ এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে কাল কোথাও দাঁড়াবার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। আমার চাষী ভাইরা, দোহাই আপনাদের, ভাই হয়ে ভাই-এর মুখের ভাত এমন করে কেড়ে নেবেন না। একথা মনে রাখবেন, আজ যারা আমাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারা আপনাদেরও সেই লাথি থেকে রেহাই দেবে না। বন্ধুগণ, আমরা আপনাদের ভাই, ভাই-এর কথা একটিবার মন দিয়ে শুনুন, ভাই-এর কথা বিশ্বাস করুন — আপনারা এ কাজে যোগ দেবেন না, দোহাই আপনাদের, যে লোক আজ আপনাদের ভাই-এর মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে, তার উল্লাসকে আর বাড়াবেন না।'

রহমান স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহার মনের ভিতর সব গোলমাল হইয়া গেল, সে আর কিছুই ভাবিতে পারে না।

ম্যানেজারবাবুর মুখে সেই হাসি আর নাই। রাগে অগ্নিমূর্তি হইয়া তিনি বলিলেন, সিঁড়ি ফ্যালো, সিঁড়ি ফ্যালো।

মৌলবী হাসিমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, হাসিয়া হাসিয়া সকলকে বুঝাইল — ও কিছু নয়, একটা চাকরি খালি হইলে পঞ্চাশটা লোক আসিয়া যেমন দাঁড়ায়, ইহারাও তেমনি, পঞ্চাশটা চাকরি খালি হইয়াছে তো পঞ্চাশ হাজার লোক আসিয়া হাজির হইয়াছে। জোর করিয়াই লইবে আর কী, যেন মগের মুল্লুক! যেন মামার বাড়ির আব্দার! প্রিয়নাথ, শ্রীপতি, বাদশা মিঞা, চাঁদ মিঞা এবং আরও অনেকে মৌলবীর কথায় সায় দিল, চরের উপর বিপুল জনতার দিকে আঙুল দেখাইয়া বোকার মতো তাহারা হাসিতে লাগিল।

ওদিকে সিঁড়ি পড়িয়াছে। একজন দুইজন করিয়া সকলে নামিতেছে। সকলের শেষে নামিল রহমান। নামিয়াই সে আশেপাশে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের গ্রামের কেহ তাহার পাশে নাই, সকলে জনতার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সে একা একা ঘুরিতে লাগিল, একবার গেল উপরের দিকে। এখন জনতা আর সেই রকম জমাট বাঁধিয়া নাই, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

একজন তাহার জামা ধরিয়া টানিল — বলিল, 'শুনুন।'

রহমান দেখিল তাহাকে যে জামা ধরিয়া টানিতেছে সে নিতান্ত অল্প বয়সের একটি ছেলে। বয়েস ষোল-সতেরোর বেশী হইবে না।

মুখের রঙ বেশ ফর্সা কিন্তু রোদে লাল ঘর্মাক্ত। মাথায় বড় বড় চুল — অবিন্যস্ত, সার্টের বুকের বোতাম খোলা, ফর্সা বুক আর গলা বেশ চোখে পড়ে। ছেলেটি চমৎকার মিষ্টি গলায় বলিল, 'আপনার বাড়ি কোথায় ভাই?'

রহমান বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ছেলেটি আবার বলিল, 'বলুন না, আপনার বাড়ি কোথায়?' রহমান এবার বলিল, 'বনগাঁ।'

— 'বনগাঁ? বাঃ, চমৎকার নামটি তো। আচ্ছা, সেটা এখান থেকে কতদূর হবে?'

রহমান হিসাব করিয়া বলিল কতদূর হইবে।

ছেলেটি বলিল, 'এখানে এই এলেন, না? এখানে কেন এসেছেন? এমনি বেড়াতে — না?'

তাহার এই অনুসন্ধিৎসায় রহমান প্রথমে একটু বিরক্তি বোধ করিল, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আর মিষ্টি কথা শুনিয়া তাহা ভুলিয়া গেল। বলিল, 'এহান কাজ করতে আইছি।'

— 'ও।' ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া একটু পরে বলিল, — 'কিন্তু কাজ যারা এখন করছে তাদের উপায় হবে কী? ব্যাপার কি হয়েছে জানেন? এদের কোনো দোষ নেই তবু এদের তাড়িয়ে দিয়ে আপনাদের সে জায়গায় বসানো হবে। যার আর কোনো উপায় নেই এমন একজনের ভাত মারতে আপনার ইচ্ছে হয়?'

রহমান কিছু বলিল না।

— 'বলুন না ইচ্ছে হয় কিনা?'

রহমান তবু কিছু বলিল না। ছেলেটি বলিল, 'মনে করবেন না, আপনিও চিরকালই ওদের সুনজরে থাকতে পারবেন, আপনাকেও এমনি একদিন তাড়িয়ে দেবে।' — এই বলিয়া একটু হাসিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

রহমানের ইচ্ছা হইল তাহাকে একটি বিড়ি খাওয়াইয়া দেয়, কিন্তু ছেলেটি তখন চলিয়া গিয়াছে।

রৌদ্রের তেজ ক্রমেই বাড়িতেছে। বালুর চর চিক্‌চিক্ করে। নদীর হাওয়া রৌদ্রের মতোই তীব্র।

রহমান এদিক সেদিক ঘুরিয়া একবার উপরের দিকে গেল, দেখিল গেটের কাছে কয়েকটি লোক হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অর্থাৎ কাহাকেও যাইতে দিবে না, এই মতলব। একটু দূরে তাহাদের গ্রামের কয়েকজন হাত গুটাইয়া জটলা করিতেছে। রহমান তাহাদের সঙ্গে জুটিল। সেই জটলায় বাদশা মিঞাই প্রধান বক্তা। তাহাকে দেখিয়া সে এক পলক হাসিয়া বলিল, 'রহমানরে হ্যারে তো যাইতেই দিব না, মনডা কয়।'

রহমান হাসিল। একটু পরে কি মনে করিয়া হঠাৎ বলিল, 'আইচ্ছা, বাদশা মিঞা ---'

— 'কও?'

— 'হ্যারা জোর কইরা গেলে কী করত?'

বাদশা মিঞা সমস্যায় পড়িল। সে এমন ব্যাপারের কথা আরও শুনিয়াছে বটে কিন্তু ইহার পরের ঘটনা আর জানে না। আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'কী করত আবার। ধইরা মাইর দিত।'

বাদশা মিঞা অকূলে কূল পাইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'হ, মাইর দিত। ঠিক, ঠিক, ঠিক।'

সুতরাং স্থির হইল, ওখানে জোর করিয়া ঢুকিলে উহারা খুব কষিয়া মার দিবে।

কিছু পরে মৌলবী আসিয়া বলিল, সামনের আর একটা গেটে তাহাদের যাইতে হইবে। সেখানে সকলেই আছে, শুধু তাহারাই কেন এখানে দাঁড়াইয়া আছে?

সকলে তাড়াতাড়ি মৌলবীকে অনুসরণ করিল।

সেই গেটের কাছে গিয়া দেখিল সেখানেও কয়েকটি লোক তেমনি হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বাদশা মিঞার মেজাজটা খারাপ হইয়া গেল।

যেখানেই যাই সেখানেই ইহারা জোঁকের মতো লাগিয়া থাকে কেন। মৌলবী তুড়ি মারিয়া বলিল, 'ভাই, তোমরা হ্যালে আস।'

এই বিপদের সময় ভাগ্যিস মৌলবীর মতো মানুষ সঙ্গে ছিল। তা না হইলে কী যে উপায় হইত কে জানে। সকলে দল বাঁধিয়া সামনের দিকে গেল কিন্তু তৎক্ষণে সেই লোকগুলি সারা গেট জুড়িয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

এ আবার কোন্ কায়দা? বাদশা মিঞা আশ্চর্য হইল। মার দিবে না তো! ব্যাপার দেখিয়া রহমান দূরে সরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে আরও কয়েকজন আসিল। মৌলবী আর শেষ পর্যন্ত যাইতে পারিল না।

এইভাবে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সূর্য এখন মাথার উপর উঠিয়াছে। চারিদিকে তেমনি গোলমাল। এই সমস্যার কখন যে শেষ হইবে, রহমান ভাবিয়া কূল পায় না।

এদিক-ওদিক দৌড়াইয়া, এ-গেট ও-গেট করিয়া তাহার ক্ষুধা পাইয়া গিয়াছিল। একটা ছোট পুঁটলিতে বৌ কিছু মুড়ি-চিড়া আর গুড় বাঁধিয়া দিয়াছিল। রহমান আর একজনকে লইয়া একটু নির্জনে গিয়া পুঁটলি খুলিয়া বসিল। খাওয়া শেষ হইলে নদীতে গিয়া হাত ধুইয়া আসিল। এখন একটা বিড়ি না খাইলে চলে না। কিছু দূরে একটা দোকানে গিয়া এক পয়সার বিড়ি সে কিনিল। কিন্তু একটা মুখে দিতেই আর একজন সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। এক মুহূর্তে এক পয়সার বিড়ি শেষ হইয়া গেল। রহমান নূতন বিবাহ করিয়াছে, সে এমনি দিয়া থুইয়া খাইবে না তো কে খাইবে।

হাজার হাজার লোকের এমন বিপুল সমাবেশ, মুহূর্তের পর মুহূর্ত এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া বিড়ি খাইতে খাইতে রহমান যতই ভাবিতে লাগিল ততই আশ্চর্য হইতে লাগিল।

ক্রমে বিকাল হইতে লাগিল। রৌদ্রে, অনাহারে, দৌড়াদৌড়িতে, চিন্তায় প্রত্যেকেই যেন এখন এক-একটি ভূতের মতো দেখিতে। এমন সময় আবার মৌলবীর ডাক আসিল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া জানাইয়া গেল যে তাহাদের এখন ঢুকিতে হইবে। আর দেরি করিলে চলিবে না, অনেক সময় পার হইয়া গিয়াছে।

সকলে দৌড়াইয়া গিয়া আর একটা গেটের কাছে গিয়া জড়ো হইল। গোলমাল আরও বাড়িয়া গেল। আকাশ বিদীর্ণ করিয়া নানারকম ধ্বনি উঠিল। কান ফাটাইয়া ফেলিবে আর কী! রহমান সকলের পিছনে ছিল, একেবারে সামনের দৃশ্য দেখিতে পায় নাই। পরে টের পাইল। তাহার সামনের লোকগুলি অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সে এখন একা, পাশে চাহিয়া দেখিল — আরে সেই ছেলেটি, কী একটা উত্তেজনায় তাহার মুখ লাল, চুলগুলি এলোমেলো, প্রাণপণে সে চীৎকার করিতেছে। রহমান বুঝিতে পারিল না সেই ভাষার অর্থ। সামনের দিকে চাহিয়া দেখিল, আশ্চর্য, এবার গেট জুড়িয়া শুইয়া কয়েকটি লোক। আর তাহাদের পা দিয়া মাড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল মৌলবী, আর তাহার পেছনে আরও কয়েকজন। রহমান নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, লোকগুলির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল সে।

এমন হল্লা সে জীবনেও শোনে নাই। কান ফাটিয়া গেলেও কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। দেখিল, এখান হইতে সেখানে লোক ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ ঘুষি দেখাইতেছে, কেহ দৌড়াইতেছে, হঠাৎ একটা লোক উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে শুরু করিল। রহমান আশ্চর্য হইয়া দেখিল, সে লোকটি আর কেহ নয়, তাহাদের লঞ্চ পারে ভিড়িবার সময় যে-লোকটি প্রথম জলের কাছে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়াছিল সে-ই। তাহার তখনকার কথাগুলি রহমান এখনও ভুলে নাই। তাড়াতাড়ি সে আরও কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত জনতা আরও ঘন হইয়া আসিল। লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল :

'বন্ধুগণ, আমার চাষী-ভাইরা. '

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এখন প্রায় সারাটা আকাশ লাল। নীচে ধ্বংসের উৎসব দেখিয়া রক্তবর্ণ আকাশ যেন রক্তনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া বিস্তর অশুভ কামনা করিতেছে। মানুষের পায়ের চাপে মাটির পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে আর বাকী নাই। এখানকার এই কলরবের আগুনের মতো যদি কোনো শিখা থাকিত তবে সারাটা পৃথিবী নিশ্চয় পুড়াইয়া ফেলিত। বক্তা মাটিতে লাথি মারিয়া বলিষ্ঠ ডানহাতে শূন্যে ঘুষি দেখাইয়া দৃপ্তস্বরে বলিল, 'বন্ধুগণ, আমার চাষী ভাইরা '

কিন্তু এমন সময় হঠাৎ গুলির ভীষণ আওয়াজ, আশেপাশের সব লোক পাগলের মতো ছুটোছুটি করিতেছে, কারুর কোনো দিকে কোনো খেয়াল নাই, কে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল — সেদিকে কোনো লক্ষ্য নাই, সকলেই যার যার প্রাণ হাতের মুঠায় লইয়া দৌড়াইতেছে। এক মুহূর্তে সারাটি মাঠ সশস্ত্র সৈন্যে ভরিয়া গেল।

রহমান প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, যখন খেয়াল হইল তখন তাহার মাথা ঘুরিতেছে, হাত-পা কাঁপিতেছে, কানের ভিতর ভীষণ ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। সে কোনোরকমে দৌড় দিল, দৌড়াইতে দৌড়াইতে শুনিতে পাইল — পেছনে কত লোকের তীব্র আর্তনাদ, কত লোকের কাতর গোঙানি। মুখ ফিরাইলে দেখিতে পাইত, কেহ রক্তাক্ত দেহে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে,

কেহ্ পড়িতে পড়িতে হাঁটিতেছে, আবার হঠাৎ বসিয়া পড়িল। শীতেব দিনের গৈরিক ধূলি বক্তবর্ণ হইযা গেল।

অনেকদূব গিযা আর দৌড়াইতে না পাবিযা রহমান তবে থামিল, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছেব নীচে সে বসিয়া পড়িল। হাত-পা তাহাব এখনো ঠক্‌ঠক্ করিযা কাঁপিতেছে, বুকের ভিতব কালবৈশাখীব ঝড়। পেছনে যাহা ফেলিযা আসিয়াছে রহমান সেদিকে আবার চাহিতে চেষ্টা কবিল। কিন্তু পাবিল না, চক্ষু তাহার বুজিয়া আসিল। সেখানকার কথা স্মবণ কবিযা চোখে তাহাব জল ভবিযা আসিল। বহমান নির্জীবের মতো পড়িযা রহিল।

যখন উঠিল তখন অনেক রাত। কোথাও টুঁ শব্দটি নাই। বহমান ধীরে ধীবে উঠিযা বসিল, শবীবেব সবগুলি গ্রন্থি তাহাব বেদনায টনটন কবিতেছে। তবু কোনো বকমে সে হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক পরে নদীব পাবে আসিযা দাঁড়াইল। চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে এখানে, নদীতে নৌকা আর জাহাজেব শব্দও শোনা যায়। রহমানেব মনে পড়িল সেই লোকটির কথা ঃ 'বন্ধুগণ, একথা আপনারা মনে বাখবেন, আজ আমাদেব যাবা শুধু লাথি মেবে তাড়িযে দিচ্ছে, কাল তারাই আপনাকেও লাথি থেকে রেহাই দেবে না!'

নদীর জলেব দিকে চাহিযা বহমানের চোখ আবাব ছল ছল কবিযা উঠিল।

ড্রেসিং টেবিল

সলিল চৌধুরী

বিয়ের পর নন্দা আমাকে যত চিঠি লিখত তার প্রায় প্রত্যেকটাতেই শেষে পুঃ দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা থাকত ঃ 'ঘর যখন নেবে আমার জন্যে একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে ভুলো না — আর আয়নাটা যেন খুব বড় আর ভালো হয়।'

বিয়েব আগে নন্দার বাড়ি যখন যেতুম প্রথমেই নজবে পড়ত দবজাব সামনেব দেওযালে একখানি চটা-ওঠা আয়না। তাতে মুখ দেখলে — ওঃ যা দেখাত, নাক থেকে কপাল পর্যন্ত পুরো এক হাত লম্বা, আব ঠোঁট থেকে চিবুক মাত্তব এক ইঞ্চি। আবাব একটু নডলে চডলেই আযনাটা নানাবকম ভঙ্গি করে মুখ ভ্যাঙাত।

রীতিমত মন খাবাপ হয়ে যেত আমাব, আব নন্দা হাসত, বলতো, 'তোমাব কাছে যখন যাব, তখন ভালো আযনা কিনে দিও।'

পববর্তী জীবনে নানা সমালোচকের সম্মুখীন হতে হয়েছে — তাঁদেব সমালোচনায় নিজেব প্রতিবিম্বও দেখেছি, — দেখে বেশিব ভাগ সমযেই মনে পড়েছে নন্দাব বাডিব সেই আযনাটাব কথা। সে কথা থাক —

বিযেব ঠিক পবে। তখন আমাব দু-তিনটে খবরেব কাগজে ভালো চাকবি পাওযাব কথা হচ্ছে। মানে এই হল বলে আব কি! সেটা না হওযা পর্যন্ত কটা দিন নন্দা তাব বাবার কাছে থাকবে — ঠিক হল। আর চাকবি হলেই ঘবভাড়া নিয়ে নন্দাকে কলকাতায নিয়ে আসব। কেমন কবে ঘব সাজানো হবে, কোন্ জাযগায কি থাকবে -- সে সব প্ল্যান দুজনে মিলে আলোচনা কবে পুবোপুবি মাথায নিয়ে কলকাতায এসে হাজিব হলুম। নন্দা বইল গ্রামে তাব বাবাব কাছে। এব পবে ছ-মাসেব কাহিনী যদি আপনাবা শোনেন — থাকগে — সে সব বলে লাভ নেই। কাবণ যে কাহিনী বলতে বসেছি সেটা আমাব নিজেব কথা নয। তবু বলে বাখা ভালো যে, চাকবি আমি পেয়েছি। নযতো অনেকে মনে করতে পাবেন যে বেকাব সমস্যাব ওপব আমি কটাক্ষ কবছি। অবশ্য যে চাকরিগুলো পাবাব কথা ছিল তাব একটিও পাইনি। কিন্তু এমন একটা পেযেছি যা ঘুণাক্ষবে মনের ত্রিসীমানাতেও কোনদিন ঠাঁই পাযনি। এক কথায জুতোব দোকানেব সেলসম্যান। আব কসবাব একেবাবে ভেতব দিকে যে এদো পুকুবগুলো আছে তাবই একটাব পাড়ে দু-খানা টিন-দেওযা ঘব এক মামাতো ভায়েব সঙ্গে বখবা কবে ভাড়া নিয়েছি। নন্দাও চলে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে — মানে বেশ আছি। নন্দার একটা আশ্চর্য প্রতিভা আছে, বোধহয় সব মেয়েবই ওটা থাকে, সেটা হচ্ছে অবস্থাব সঙ্গে নিজেদেব খাপ খাইযে নেওযাব ক্ষমতা। একদিনেব জন্যেও মুখ শুকনো দেখিনি নন্দাব, যেন কসবাব টিনের ঘব ভাড়া নেওযাটাই তাব আজীবনেব স্বপ্ন। কিন্তু একটা ব্যাপার, এ ঘবে আসাব পব থেকে একবাবেব জন্যেও নন্দা বলেনি ড্রেসিং টেবিলের কথা। আমিও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন সময এক শনিবাবেব দুপুবেলা একটা ঘটনা ঘটল। নগদ কবকবে ষাট টাকা মাইনে গুনে নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিবছি পথের দু-দিকে চাইতে

চাইতে। ইচ্ছে করলেই কত কী কিনতে পারি অথচ কিছুই কিনছি না, এটা যেন আমাব একটা সম্রাটিক খেয়াল। বেশ ভালো লাগে পকেটে টাকা থাকলে। হঠাৎ ঠিক কসবাব মোড়ে দেখি এক চমৎকার ড্রেসিং টেবিল — রাস্তায নীলেমে বিক্রি হচ্ছে। আবো কত কি ফার্নিচার আশ্চর্য সস্তায বিক্রি হচ্ছে। ড্রেসিং টেবিলেব গ্লাসের একটা কোণ কেবল একটু ফাটা। তাছাড়া প্রায় নিখুঁত। দাম উঠল তিরিশ টাকা, ভাবুন! হুপের মাথায় যা থাকে ববাতে বলে কিনে ফেলে মুটের মাথায চাপিযে সটান বাড়িব দিকে পা বাড়ালুম। বাড়ি ভাড়া যাবে ১৫ টাকা, বাকি ১৫টি টাকায় সাবা মাস সংসাব চালাতে হবে। নন্দাব মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল — কত আশা কত স্বপ্ন বুকে নিয়ে বেচারী ভালবাসতে শুরু কবেছিল। তাব তো কিছুই মিটল না। তিরিশ টাকা যায যাক, কুছ পরোযা নেই।

বাড়ি ঢুকতেই নন্দা প্রথমটা অবাক হয়ে গেল, তাবপব কি যেন ভেবে কী ভীষণ খুশি যে হযে উঠল কি বলব। অন্য মেয়ে হলে হযতো টাকার হিসেব কবে এতক্ষণ প্যান্ প্যান্ কবতে বসত, কিন্তু দরিয়াব মত দিল আছে নন্দার। কবি না হোক, কবি-স্ত্রী হবাব নিশ্চয উপযুক্ত। প্রায় সাবাক্ষণ নন্দা আযনাব সামনেই বসে কাটালো, ঘুরিযে ফিবিয়ে চুল বাঁধল, কাপড় ছেড়ে কপালে টিপ পবলো, মাথায় ঘোমটা টেনে অকারণে দু-একবার হাসলো। বিছানায় শুয়ে শুযে খুশিতে যেন আবেশ আসছে কখন ঘুমিযে পড়েছি। বিযেব আগেব দিনগুলো স্বপ্নে ভাসছে, কেমন যেন সার্থক মনে হচ্ছে জীবন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, নন্দা ডাকছে। ধড়মড়িযে উঠে বসলুম, নন্দাব দু-চোখ ফুলে লাল হযে উঠেছে, চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে, সারা শবীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'কী হযেছে নন্দা? তুমি কাঁদছো কেন অত?'

'ও আয়না তুমি ফেবত দিযে এস, ও আমাব চাই না।' বালিশে মুখ ঢেকে নন্দা কাঁদতে লাগল। হয়তো পুবনো জিনিস বুঝতে পেবে ওব অপমান হয়েছে। কিন্তু নতুনেব দাম কত! সে কি আমাদেব কেনার সাধ্যি! এত অবুঝ হলে কেমন কবে চলবে? আর জিনিসটা তো প্রায় নতুনই বলা যেতে পাবে।

'ছি! নন্দা শোন।'

'না, না, না, আমাব চাই না। তুমি যেরত দিযে এস।' স্তম্ভিত হযে গেলুম। কেবল সংকীর্ণ একটা প্রেসটিজ বড় হল নন্দাব। আব আমাব কোন দামই নেই ওর কাছে?

'বেশ! তাই হবে। ফেবত দিযে আসব।'

নন্দা আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল, খানিক পবে ফিবে এল আবাব। আমাব কোলেব ওপব এক তাড়া চিঠি ফেলে দিযে বলল, 'এইগুলো পড়ে দেখ।'

নীল খামে মোড়া বাংলায লেখা চাবখানা চিঠি।

'কাব চিঠি এগুলো? কোথায় ছিল?'

'আযনাব দেবাজেব মধ্যে ছিল।'

চিঠিগুলো নিযে বসলুম। খুলে পড়তে শুরু করলুম একখানা কবে, হাত কাঁপছে। কি ব্যাপাব কে জানে? তাবিখ হিসেবে পব পব সাজালে চিঠিগুলো এই ঃ

।। ১।।

বাগেবহাট

প্রিয়তমাসু —

আজ বাত বারোটায এখানে এসে পৌচেছি। মনে হচ্ছে কতদিন যেন ছেড়ে এসেছি তোমাকে। ভাবতে অবাক লাগছে কাল এতক্ষণ তুমি কত কাছটিতে ছিলে।

জায়গাটা শহর থেকে কিছুটা দূরে। অমলের কথা মনে আছে তো? সে এখানকার কলেজে প্রফেসারি করছে। কাল থেকে তার ওখানেই উঠব। শরীর বড় ক্লান্ত লাগছে — অবশ্য ট্রেনে বিশেষ কষ্ট হয়নি। ট্রেনে একটা বড় মজার ব্যাপার হয়েছে শোন ঃ আমার সামনের বেঞ্চেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে আমার সহযাত্রী। সুন্দর ঝকঝকে একটি পরিবার, ছেলেমেয়ের নিটোল স্বাস্থ্য, প্রৌঢ়ের অমায়িক হাসিমুখ, আর খাঁটি বাংলার মা, ভীষণ ভালো লাগছিল। স্কেচ বইটা বের করে মনে রাখার মত করে সাজিয়ে নিচ্ছিলাম। একটি মেয়ের নজরে পড়ল যে আমি ছবি আঁকছি, সে তার বোনকে বললো, বোন মাকে বললো, মা বাবাকে বললেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভীষণ উৎসাহে একেবারে ফেটে পড়লেন। 'তাই নাকি? দেখি কেমন আঁকলেন আমাদের? আরে! এমন অদ্ভুত মশাই। একেবারে জাদুকর লোক দেখছি আপনি?' তারপর মহা হৈ চৈ। যাই কেনেন তাই খেতে দেন আমাকে, কিছুতেই ছাড়বেন না। 'আরে মশাই, বাঙালীর এত দুর্দশা কেন জানেন? তারা শিল্পীর কদর জানে না। আমারও ওসব শখ ছিল, এককালে নামও ছিল গাইয়ে বাজিয়ে মহলে। নিন ধরুন — লজ্জা কিসের?'

খেতে হল। ভদ্রলোক যখন কথা বলেন উত্তরের প্রত্যাশা করেন না, মনের ভাবটা যেন এই যে তার ওপরে আর কোন কথাই চলতে পারে না।

'বিয়ে থা করেননি তো? বেশ, বেশ! ঐটি যেন করবেন না। এই দেখুন না আমার — হেঁ হেঁ — সব চুলোয় যাবে তাহলে—'

আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম, আমি বিয়ে করেছি — ভদ্রলোক মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন —

'আমার মেয়েদের ছবি আঁকা শেখান না আপনি? যা লাগে দেব। কলকাতায়ই তো থাকেন — আমার বাড়ি হচ্ছে বিডন স্ট্রীট। আসবেন নিশ্চয়। যাক তাহলে ঐ কথাই রইল। হাসি, খুশি! তোমরা খুশি তো? দেখ কেমন মাস্টার পেয়ে গেলে — হেঁ — হেঁ — হেঁ।'

কোন কথার উত্তর দেবার অবকাশ নেই আমার। বোন দুটি জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি আসবেন তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আসব।' — উপায় নেই।

ইতিমধ্যে ছোট ভাইটি আমার ব্যাগ হাতড়ে অ্যালবামটা টেনে বের করেছে — আঙুলে থুতু লাগিয়ে ছবি উলটে দেখছে।

মা বললেন, 'ছি খোকা, অসভ্যতা কোর না, রেখে দাও।'

'না মা। মাস্টারমশাই আমাকে দেখতে বলেছেন, বলুন না আপনি বলেননি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওকে দেখতে বলেছি।' উপায় নেই, এরা সব এক জাতের। ভদ্রলোক রানাঘাটে নেমে যাবেন। তোমার তৈরি লুচি বের করলুম —

'খেতেই হবে।' খোকাকে দিলুম, বোনেদের দিলুম। নানা কথা হল — দেশের স্বাস্থ্য, টেনাসি অ্যাক্ট, কমনওয়েলথ — তারপর তাঁরা নেমে গেলেন। গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন ঃ 'আরে ভালো কথা, আপনার নাম ঠিকানাটা তো জানা হল না। বলুন বলুন - তিনি কাগজ কলম বের করলেন। একবার বললুম — শুনতে পেলেন না — আবার বললুম — 'রহিমুদ্দিন চৌধুরী।'

'অ্যাঁ?'

'রহিমুদ্দিন চৌধুরী।'

'হুঁ'

লিখে নিলেন কিন্তু হাত কাঁপলো। ঢোক গিলে বললেন ঃ 'তা বেশ বেশ। কিন্তু ধরার উপায় নেই, দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালী — তাই নয় গো?'

দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালী — তাই নয় গো? আমি চেঁচিয়ে বলতে চাইলাম, 'এখন কি বুঝলেন তবে পাঞ্জাবী?' কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হল না। আবহাওয়াটা সহজ কবাব জন্যে বোন দুটি তেমনি হেসে বলল —

'ভুলে যাবেন না, আসবেন ঠিক — বিডন স্ট্রীট'। হাসবার চেষ্টা করলুম। গাড়ি ছেড়ে দিল। দেখতে পেলাম খোকার হাত থেকে মা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন খাবারটা। তোমাব হাতেব তৈরি সেই খাবাবের টুকরোটা প্লাটফর্মে পড়ে বইল। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে কবল — মনে হল কামরা শুদ্ধ লোককে ডেকে বলি ঃ 'দেখ তোমরা, কত বড় অবিচাব হল দেখ।' কেউ কিছু জানল না। আমি চুপচাপ বসে রইলাম —সমস্ত দিনটাই আমাব মাটি।

সব কথা এখন আর মনে নেই — মনে বাখতেও চাইনে। মাঝে মাঝে বোন দুটিব কথা কানে ভাসছে ঃ 'ভুলে যাবেন না — আসবেন ঠিক — বিডন-স্ট্রীট।' মনে মনে বলি ঃ

'না, তোমাদের ভুলবো না বোন — তোমবাই নতুন বাংলা — তোমাদেব মুখ চেযেই যে আমবা বেঁচে আছি — তোমাদেব ভুলবো না।'

চিঠিব উত্তর দিও . .

তোমাব রহিম

খামেব ওপব ঠিকানা লেখা ঃ আমিনা চৌধুবী, উজানীপাড়া, হাওড়া।

।। ২ ।।

বৌ — বাগেবহাট

আজ সকালে অমলেব বাসায এসে উঠেছি। পথে আসতে দেখছি বহু লোক ঘববাড়ি ছেড়ে চলে যেতে শুরু কবেছে, থমথম কবছে সমস্ত শহবটা — লোকে জোবে পর্যন্ত কথা বলছে না। বুঝতেই পাবছ হঠাৎ একেবাবে এব মাঝখানে এসে পড়ে হতভম্ব হযে গেছি। ব্যাপাবটা ভালো কবে বোধগম্য হওযাব আগেই শুনি অমল চাকবিতে ইস্তফা দিযেছে — মালপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। দু-একদিনেব মধ্যেই ওবা পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় বওনা হবে। আমাকে ওবা আশা কবেনি —

অমলেব বৌ একটু ফিকে হাসল।

'ব্যাপাব কি অমল? কি খবব বৌদি? তোমবাও শেষকালে চললে?' বৌদি হাসবাব চেষ্টা করল, 'তোমাদেব দেশে তো আব আমাদেব জাযগা হবে না ঠাকুরপো!'

'আমাদের দেশ? আমাদেব দেশ মানে? খুলনা তো অমলের দেশ — আমাব দেশ ২৪ পবগনা — যাচ্ছ তো আমাব দেশেই শুনছি।'

'আজকাল আব তা নয — এখন মোছলমানেব দেশ পাকিস্তান আব হিন্দুব দেশ হিন্দুস্থান।' অমল বলল বৌদিকে ঃ 'তুমি যা কবছিলে তাই কব গিযে।' জিনিসপত্র গোছাতে বৌদি চলে গেল। চুপচাপ অমলেব দিকে চেযে বসে রইলাম। অমলেব বাচ্চাটা নতুন হামা দিতে শিখেছে — ফুটফুট করছে সুন্দর — সামনের দুটো দাঁত উঠেছে। সে তার বাপের পা ধবে দাঁড়াতে গিযে ধপ কবে পড়ে কেঁদে উঠল। অমলেব ভ্রূক্ষেপ নেই।

'শোন রহিম, কথা আছে তোব সঙ্গে।'

'বল, শুনছি।' বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলুম। অমলেব কাছে যা কথা শুনেছি তাব মোট কথাগুলো তোমাকে জানাচ্ছি, শহব থেকে কয়েক মাইল দূবে নমঃশূদ্রদেব গ্রামে একটা

ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে। নমঃশূদ্ররা বেশির ভাগই চাষী — নয়তো জেলে। স্বভাবতই তারা খুব গরিব। কিছুদিন ধরে জমিদারদেব অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা সবাই একজোট হচ্ছিল। তাদের দুজন নেতাকে ধরবার জন্যে পুলিশ ওয়ারেন্ট বের করে। নেতাদের মধ্যে একজন হিন্দু একজন মুসলমান। তাদের ধরার জন্যে গ্রামে যখন একদল পুলিশ ঢোকে চাষীবা তাদের বলে ফিবে যেতে। তাতে কাজ না হওয়ায় কিছুটা উত্তম মধ্যম দিয়ে তারা তাদের বের কবে দেয় গ্রাম থেকে। এর পরেই ঘটনার শুরু। বহু আর্মড পুলিশ আব বে-সবকাবী গুণ্ডাবাহিনী গিযে হাজির হয় গ্রামে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে শুরু হয় প্রচণ্ড অত্যাচার। গ্রামকে গ্রাম তাবা জ্বালিযে দেয় — আর যা পায় লুট কবে নিযে আসে। সমস্ত মানুষ গাঁ ছেড়ে পালাতে শুরু কবে — আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে। এদিকে জোব প্রচার চলতে থাকে যে হিন্দুবা হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু — ওদেব তাড়াও। এই সুযোগে শহবে গুণ্ডারা হিন্দুদেব কয়েকটা দোকান লুটপাট করে — আগুন দেয। সদর বাস্তায় ওরা শাসাতে থাকে হিন্দুদের। আনোয়াবকে তোমার মনে আছে? সেই যে স্কাউড্রেলটা কলেজে একদিন তোমাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিল? শুনেছিলাম একজনের সঙ্গে শেযাবেব বিজনেস কবাব নাম কবে তাব যথাসর্বস্ব মেবে দিয়ে পাকিস্তান চলে এসেছে। এখন শুনি সেই নাকি এখানকাব গুণ্ডাবাহিনীর মস্ত বড কর্তা। তিনিই নাকি লীড কবেছেন।

শুনে পর্যন্ত রক্ত টগবগ করে ফুটছে। বাসকেলটার যদি একবাব দেখা পাই তো ওর টুঁটি আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব, এ তুমি দেখে নিও। অমলবা চলে যাচ্ছে, কাল না গেলে পরশু যাবে — নযতো তাব পরদিন। কি বলব ওদের বলতো? লজ্জায় দুঃখে আমাব বুকটা খান খান হয়ে যাচ্ছে। কি যেন আমাব একটা করা উচিত বুঝতে পাবছি না। অমলের দেশ ছেড়ে যদি অমলকে চলে যেতে হয, আমার দেশকেই বা আঁকড়ে থাকব কোন্ যুক্তিতে? ভাবতে খারাপ লাগছে বড়। এখানে বিশেষ কাউকে চিনি না। একটি পরিচিত ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে — তাবা পিস কমিটি করেছে বললো। সব কাজকর্ম এখানে প্রায় বন্ধ। ভাবছি কাল পরশু নাগাদ ঢাকা চলে যাব। সেখানে শুনেছি কিছু কিছু কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে। অন্য কিছুই ভেবো না। আজকের দিনে মানুষকে আর সহজে বেশিদিন বিভ্রান্ত কবে বাখা যায় না। মনুষ্যত্ব জয়ী হবেই — এই আশাতেই বুক বাঁধতে হবে। ওখানকার পরিচিতদেব কাছে এখানকার সঠিক খববটা দিও. . .

তোমার রহিম

।।৩।।

বৌ —

তোমার চিঠি পেয়ে আবো ভাবনা বাড়ল। কলকাতাব কাগজগুলো খুলনার ব্যাপাবকে যদি এইভাবে প্রচার করতে শুরু করে থাকে তাহলে তাব সাংঘাতিক ফল ফলবে। যে পয়সা লাভের আশায় ওরা দানবকে জাগিয়ে তুলেছে সেই দানবই ওদের ধ্বংস কববে। তবে ওরা বোধহয় নিশ্চিত যে, সময় বুঝে দাঙ্গা বাধানো বা থামানো এটা ওদেরই হাতে। এখানকার কাগজগুলোও ঠিক তাই শুরু করেছে। পরস্পরেব ওপব সন্দেহ আর অবিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে, কখন কি ঘটে সেই আশঙ্কায় সবার চোখমুখে বিষণ্ণতা দেখছি, এমন যদি কোন শক্তি থাকত যা এই সমস্ত নোংবামিকে পাযে মাড়িয়ে মনুষ্যত্বের ধ্বজাকে উঁচুতে তুলে ধরবে। শুধু আমি নয়, প্রায় সবাই মনেপ্রাণে এই কথাটি অনুভব করছে — কিন্তু সে কই? এখানে সরকাবী মহলে কিছু কাজের আশায় ঘোবাঘুরি করতে হচ্ছে। আমি যে বাঙালী— এই কথাটাই প্রায়

ভুলতে বসেছি। তুমি তো জান আমি পয়সা খরচ করে উর্দুভাষা শিখেছিলুম। উর্দু সাহিত্যকে আমি ভালবাসি, কিন্তু যখন সেটা শাসনের দণ্ড হয়ে সোজা ঘাড়ের উপব পড়তে চায়, আমার সংস্কৃতির টুঁটি টিপে ধরে তখন তাকে বর্জন কবাই মানুষেব কাজ। সকলেব কথায় সোজা বাংলায় উত্তর দিই — বুঝলো ভালো, না বোঝে পবোয়া নেই। কাজেই কাজ যে জুটবে না বেশি তা বোধ হয় বুঝতে পার।

তোমাব রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করতে হযেছে জেনে ভারি কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে দেখে যারা কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে নিযেছে, আমি অন্তত বিশ্বাস করি তাদেব ববীন্দ্রসঙ্গীত শেখবাব কোন অধিকার নেই। কিন্তু এ বিশ্বাস হাবিও না যে — এবা সবাই ভালো — এদের বাদ দিয়ে একা তুমি যাবে কোথায়? দুর্ভাগ্য দেশের, তাব অভিশাপ এখনো কাটেনি, সে দুর্ভাগ্য থেকে তুমি আমি বাদ যাব কেমন করে বল বৌ। মনুষ্যত্বেব অপমান যখন দেখি — মনে হয় আগুন হযে ছড়িযে পড়ে খাক করে করে দিই এই হতভাগা দেশেব পচা আবর্জনাগুলোকে।

সেদিন শুনলুম কযেকটা চ্যাংড়া ছোঁড়া মিলে সদব রাস্তাব ওপরে এখানকাব কলেজেব পণ্ডিতমশাইকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে — টিকি কেটে দিযেছে, মুখে গোমাংস দিযেছে জোব কবে। ভাবতে পাব? আমি শুনে এখানকাব মাতব্ববদের বললুম ঃ 'আপনাবা থাকতে চোখের সামনে এই সব ঘটছে — আপনাবা কি ঠিক জানেন যে আপনারা এখনো বেঁচে আছেন?' তাবা বললেন ঃ কী করব — ওদেব হাতে বন্দুক আছে, পেছনে পুলিশ আছে। ওবা হুমকি দিয়েছে — যে কেউ ওদের বাধা দেবে তারাই পাকিস্তানেব শত্রু, তাদেব ঘরদোব ওরা জ্বালিয়ে দেবে, তাদের খুন কববে — ইত্যাদি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় গোটা জাতটারই শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, নইলে কটা আগাছাকে উপড়ে ফেলা যায় না? আগাছাই বোধহয় জন্মাচ্ছে বেশি — বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও স্বীকার কবতে হবে।

এখানে আব মোটে ভালো লাগছে না বৌ। এবারে এসেই বোধ হয ভুল কবেছি — তোমাকে ছেড়ে আর এক দণ্ডও থাকতে পাবছি না বৌ। .. কাজকর্ম চুলোয যাক, দু-একদিনেব মধ্যেই পাড়ি দেব। অমলের চিঠি পেয়েছি — ওবা আগামীকাল বওনা হবে। কলকাতায গিযে তোমার সঙ্গে দেখা কববে লিখছে। ওখানেই ওদেব থাকাব ব্যবস্থা করে দিও। কোনরকমে চলে যাবেই।

তোমাব বহিম

(এব পবেব চিঠিটা প্রায কুড়ি দিন পবে লেখা। মনে হয় এব আগে আবো চিঠি লিখেছিলেন — যে কোন কাবণেই হোক সেটা নেই।)

।। ৪ ।।

আমিনা —

আমি বোধহয় শিগগিবই পাগল হযে যাব। গত সাত দিন ধবে এক সেকেণ্ডেব জন্যেও ঘুমোতে পারিনি। পাগলের মত সাবা শহবে ঘুরে বেড়িয়েছি। মনে হচ্ছে মনুষ্যত্ব শেষ হযে গেছে — বীভৎস তাণ্ডব চলছে পশুত্বেব। চারদিকে চিৎকাব, কানা আব পৈশাচিক উল্লাস। তার ওপব আজ আট দিন তোমার কোন চিঠিপত্র নেই। হাজার হাজার রিফিউজি এসে জড়ো হচ্ছে। তাবা বলছে কলকাতায় আব একজন মুসলমানও বেঁচে নেই। বিশ্বাস কবা উচিত কি না সে বিচারের বুদ্ধিও আমার লোপ পেযে গেছে। তুমি কোথায় আছ? তুমি এখনও আছ তো? একথা আজ আব কোন মানুষকে জিজ্ঞেস কবি না। — জিজ্ঞেস কবি সূর্যকে, জিজ্ঞেস কবি গাছপালাকে। জিজ্ঞেস করি, আমাব আমিনা কেমন আছে, কোথায আছে?

অমলের একখানা চিঠি এসেছে। বর্ডার থেকে ওদের মারধোর করে সমস্ত লুটপাট করে নিযেছে। বৌদিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে — অমল কোন রকমে বাচ্চাটাকে নিয়ে রানাঘাটে পৌঁচেছে। অমল লিখেছে — 'আমার অবস্থার কথা না লেখাই ভালো, তবে এটুকু জ্ঞান এখনো আছে যে এ খবর কলকাতার কাগজওয়ালাদের হাতে পড়া উচিত নয়। যা ভালো হয করিস। আমি দেহমনে সম্পূর্ণ অথর্ব হয়ে গেছি।'

আমি এখনই বেরিয়ে পড়ছি। এখানে আর কয়েক ঘণ্টা থাকলে বোধহয় আত্মহত্যা কবে বসব। বৌদিকে খুঁজে বের করতেই হবে। তোমার খবর পেলে মনে অনেকটা জোর পেতুম। জানি না আবার কবে তোমাকে দেখব — জানি না দেখব কিনা।

আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা কর। বড় অহংকার ছিল আমার দেশকে আমি চিনে ফেলেছি — সে অহংকারও চূর্ণ হয়েছে। মনুষ্যত্বকে বড় করতে গিয়ে পশুত্বকে ছোট কবে দেখেছি — তাই পশুর প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। যেখানেই থাক, যেমন থাক — সাবধানে থেক। তোমাকে আমি হারাতে পারব না বৌ, অমলের মহত্ত্ব আমাব আছে কিনা সে পরীক্ষা আমি দিতে পারব না। আমি সাধারণ মানুষ।.... ..... .

তোমার রহিম

চিঠি এই কটাই। পড়ার পর হাওডাব উজানীপাড়ায় গিযে খোঁজ করেছি শিল্পী বহিমুদ্দিনেব বাড়ি কোনটা। কেউ বলেছে — 'জানি না', কেউ বলেছে — 'এ পাডায কোন নেড়ে ফেড়ে আব নেই মশাই।' একজন পানওযালা শেষ পর্যন্ত দেখিযে দিল একটা একতলা বাডি — তার দুখানা ঘর নিযে ওরা থাকত। বাড়িটাব শোচনীয অবস্থা। দরজা জানলাব একটাও কপাট নেই — মাঝখানে কেবল একটা চট ঝুলছে। ডাকাডাকি করলে কেউ সাডা দেয না। শেষ পর্যন্ত চট সবিয়ে ভিতবে ঢুকে দেখি অন্তত বিশজন মেয়েছেলে বাচ্চাকাচ্চা শুদ্ধ কেউ বসে কেউ শুযে রয়েছে। আমাকে ঢুকতে দেখে সবাই যেন চমকে উঠল। বাড়িটাব চেয়েও তাদের অবস্থা খারাপ। জিজ্ঞেস করলুম ঃ 'বহিমুদ্দিন চৌধুরী এখানে থাকেন?'

তারা কেউ নামও শোনেনি রহিমুদ্দিনের — সেইদিন সকালে খালি ঘব পেয়ে এসে আশ্রয নিয়েছে — পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু সব। শুনলাম এরি মধ্যে চাববাব হুমকি দেওয়া হয়েছে — রাত্রেব মধ্যে উঠে যেতে হবে। একটি মধ্যবযসী মহিলা ঘবেব এককোণে বসে বমি করতে শুরু করলেন, সবাই নির্বিকার। এক ধামা খই মুডকি নিযে দুটি ছেলে ঢুকল — দেখে মনে হল স্কুলেব ছাত্র। তারাই ওদেব এবাড়িতে জোব করে জাযগা কবে দিয়েছে — দেখাশোনা কবছে। তাদেব জিজ্ঞেস কবলুম। একজন চিনত বহিমুদ্দিনকে, আমিনাকেও চিনত। তাব দিদি রহিমুদ্দিনেব কাছে ছবি আঁকা শিখতে আসত — সেও আসত দিদিব সঙ্গে। তাব কাছেই সব খবব পেলুম। বলল ঃ 'মাস্টাবমশাই শুনেছি পাকিস্তানে আছে — কিন্তু আমিনাদিদি বোধহয বেঁচে নেই। একদিন রাতদুপুবে এই ঘরটাব শিকল বন্ধ কবে আগুন ধবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি আগুন নিবিয়ে ওদের উদ্ধার করতে — কিন্তু পাবিনি — তখন ভীষণ গুলি চলছিল।' ছেলেটার চোখ ছলছল করতে থাকে। বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলুম — সমস্ত দেওয়ালগুলো পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে — পাশেই একটা নিমগাছ ঝলসে কুঁকড়ে গেছে। আগুন লেগেছিল সত্যিই। নন্দাকে ব্যাপারটা বলিনি — কেননা একটা সন্দেহ আমার হয়েছে — আমিনা যদি পুড়েই মরে থাকে — ড্রেসিং টেবিলটা অক্ষত রইল কি কবে? ছাত্রটি বলেছিল ঃ টেবিলটা ছিল পাশেব ছোট ঘবটায়। — হয়তো আমিনাও সে ঘরে ছিল? কিন্তু সে গেল কোথায়?

নন্দার বিশ্বাস, কাগজে খববটা বেরুলেই আমিনা এসে নিয়ে যাবে তাব ড্রেসিং টেবিলটা —তাই এ কাহিনী লেখা। আয়নাটা নন্দা কাপড় দিয়ে মুড়ে বেখে দিয়েছে।

কাহিনীর এইখানেই শেষ। প্রসঙ্গত একটা ঘটনাব উল্লেখ কবতে চাই পাঠক-পাঠিকাব কাছে। হয়তো তার সঙ্গে এই কাহিনীব কোন সম্পর্ক নেই — কিন্তু সাদৃশ্য রযেছে। গত ১লা এপ্রিলের একটি বাংলা কাগজে এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ হাওড়া স্টেশনের নিকট গতকাল এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোবাফেরা কবিতে দেখিযা পুলিশ গ্রেপ্তার কবে। তাহার কাছে ব্যাগের মধ্যে কযেকটি তুলি ও কিছু স্কেচ ছবি পাওয়া গিযাছে। সন্দেহ হয সে হাওডা স্টেশন ও পুলের প্ল্যান আঁকিয়া নিতেছিল। নাম জিজ্ঞাসা কবিলে সে পাগলের ভান কবে ও বলে ঃ 'একজন মানুষ।'

খবরেব হেড লাইনে লেখা — **"পাকিস্তানেব গুপ্তচব গ্রেপ্তার।"**

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

বিমল কর

নদীর চরায় শিবানীর চিতা জ্বলছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলগাছের তলায় বসেছিলাম। ফাল্গুনের শেষ, উলটো টান ধরে গিয়েছিল দুপুরে। রোদ পাখা গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে, নদীর বাঁকের মাথায় আকাশে সূর্য হেলে পড়ছিল।

ভুবন গরুর গাড়ির উপর বসে, গাড়িটা অর্জুনগাছের ছায়ায় দাঁড় করানো, গরু দুটো গাছগাছালির ফাঁকে শুয়ে ছিল। শিবানীর মুখাগ্নি শেষ করে ভুবন খানিকক্ষণ চিতার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, রোদ আর আগুনের ঝলসানি গায়ে মাখে নি, তারপর গাড়িতে গিয়ে বসেছে। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে মুখ আড়াল করে সে বসে ছিল, কদাচিৎ মুখ তুলছিল, তুলে শিবানীর চিতা দেখছিল।

চিতার কাছাকাছি, নদীর ভাঙা পাড়ের আড়ালে চার-পাঁচটি ছেলেছোকরা আর নিত্যানন্দ। তারা মাথায় গামছা বেঁধে, ভিজে তোয়ালে মুখে ঘাড়ে বুকে বুলিয়ে শবদাহের তদারকি করছিল। পুরুত্তমশাই আর ছোটকিলাল অনেকটা তফাতে, মাটির কয়েকটি সরা ও কলসি সামনে নিয়ে গাছের ছায়াতেও ছাতা খুলে বসে আছে।

আমরা মাঝদুপুরে এসেছি। তখন চতুর্দিক ধু ধু করছিল। গরম বাতাস গায়ে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। এতক্ষণে যেন সব ক্রমশ জুড়িয়ে আসার মতন ভাব হয়েছে। বালিভরা নদীর তাপ মরে আসছিল, শীর্ণ জলের ধারাটি শিবানীর চিতার পাশ দিয়ে বয়ে যেতে যেতে কদাচিৎ বাতাসে কিছু শীতলতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলতলায় বসে শিবানীর সংকার প্রত্যক্ষ করছিলাম।

সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অনাদি বলল, 'শেষ হতে হতে বিকেল পড়ে যাবে।' বলে সে শিবানীর চিতার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কমলেন্দু পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসে ছিল, সে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ল, আকাশমুখো হয়ে বোধহয় শিমুলের ফুল দেখবে।

আমি আর একবার ভুবনের দিকে তাকালাম। ভুবন কুঁজো হয়ে বসে, হাঁটুর ওপর মাথা, দু'হাতে মুখ আড়াল করা। অনেকক্ষণ সে ওই একইভাবে বসে আছে। তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক ঃ শিবানী ওর স্ত্রী। তবু আমার মনে হলো, ভুবনের এতটা শোকাভিভূত ভাব ভাল দেখাচ্ছে না। সে জোর করে তার শোকের মাত্রার গভীরতা দেখাতে চাইছে। এতটা শোক পাবার কারণ তার নেই। তবু এই শোক কেন? সে কি আমাকে ঈর্ষান্বিত করতে চায়? কিংবা আমাদের তিনজনকেই?

কথাটা আমার এখন বলা উচিত নয় বুঝতে পেরেও যেন ভুবনের শোকে খুঁত ধরাতে বললাম, 'শিবানীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে মাসখানেক আগে। ভুবনের ওপর কি জন্যে যেন রেগে ছিল। ওর শরীর স্বাস্থ্যের কথায় দুঃখ করছিল .'

আমাব কথায় অনাদি মুখ ফিবিয়ে দূবে ভুবনের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শেষে অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আমবা বোধহয না এলেই ভাল করতাম।'

আমবা চুপচাপ অনাদিব কথাটা ভাবছিলাম। সবুজ একটা বুনোপাখি চিকিব-চিক করে ডাকতে ডাকতে চোখেব পলকে আমাদেব মাথাব ওপব দিয়ে উড়ে চলে গেল।

কমলেন্দু সব জেনেশুনে বুঝে হঠাৎ বলল, 'কেন? আমরা না এলে কি ভাল হত?'

অনাদি ধীবস্থিব প্রকৃতিব, আস্তে আস্তে নীচু গলায সে কথা বলে। সামান্য অপেক্ষা করে সে বলল, 'ভুবন হযতো অস্বস্তি বোধ কবছে। ঠিক এ সময়ে সে বোধহয় আমাদেব বাদ দিযেই তার স্ত্রীকে ভাবতে চেযেছিল।'

'ভাবুক, কে তাকে বাবণ করেছে---' খানিকটা অবহেলা, খানিকটা উপহাসেব গলায আমি বললাম।

অনাদি আমাব দিকে তাকাল। 'আমবা ওব চোখেব সামনে বসে থাকলে ভুবনেব পক্ষে আমাদেব বাদ দিযে শিবানীকে ভাবা মুশকিল।'

কমলেন্দু শুযে শুযে বলল, 'বেশ তো, তা হলে সাত-সকালে লোক দিযে আমাদেব বাড়িতে শিবানীব মাবা যাবাব খবব পাঠানো কেন। না পাঠালেই পাবত।'

'কিংবা বলে দিলেই পাবত আমবা যেন না আসি', আমি বললাম।

'খবব না দিলে খারাপ দেখাত, বোধহয় ভদ্রতা কবে .'

'আমবাও ভদ্রতা বক্ষা কবছি। শিবানী আমাদেব বন্ধুব স্ত্রী, তাব সংকাবে না আসাই কি ভাল দেখাত।' কমলেন্দু বলল।

'বন্ধুব স্ত্রী শুধু কেন, শিবানী আমাদেব কি বলব বান্ধবী, যাই বলো . সেও তো আমাদেব কিছু একটা ছিল। সে মাবা গেছে, আমবা শ্মশানে আসব না?' আমি বললাম।

অনাদি আব কথা বাড়াল না। পকেট হাতড়ে আবাব সিগাবেট বেব কবল। আমাদেব দিল। নিত্যানন্দ চিতাব কাছে গিযে খোঁচাখুঁচি কবতে কাঠ ফেটে শব্দ হলো। সে চেঁচিযে কি যেন বলল, তাব সহচব দুটি ছেলে তাব কাছে গেল। ভুবন মুখ তুলে চিতাব দিকে তাকিযে আছে। চিতাব ওপব কয়েকটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যেন আতসবাজিব মতন বাতাসে উড়ে ফেটে গেল, সামান্য ছাই উড়ল। একটি ছেলে কয়েকটি কাঠেব টুকবো ফেলল চিতায।

ভুবন চিতাব দিক থেকে চোখ ফিবিয়ে উদাসভাবে নদী আকাশ আব জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপব এক সময় আমাদেব দিকে মুখ ফেবাল। আমাদের মধ্যে দূবত্ব সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তাব চোখাচোখি হলো। ভুবন মুখ ফিরিযে নিল, নিয়ে হাঁটুব ওপব কনুই বেখে গালে হাত দিযে নদীব দিকে তাকিয়ে থাকল। ওব এই ভঙ্গি আমাব ভাল লাগছিল না। মনে হলো, আমাদেব যেন সে আব দেখতে পারছে না, বা দেখেও দেখতে চাইছে না—উপেক্ষা কবছে।

বাড়াবাড়ি দেখলে আমাব রাগ হয়, ভুবনেব এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমাব কেমন রাগ আব বিবক্তি হচ্ছিল। আতিশয্য কেন? আমরা কি জানি না শিবানীব সঙ্গে ভুবনের সম্পর্ক কি ছিল? তবে? তবু ভুবন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমবা কিছু জানি না, যেন শিবানী তাব সর্বস্ব ছিল, শিবানীর মৃত্যুতে তাব বিশ্বভুবন অন্ধকার হয়ে গেছে।

দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পাচ্ছিল। ভুবনের বোকামির শেষ নেই। তুমি যে কাকে এত শোক দেখাচ্ছ ভুবন, তবু যদি শিবানীর ভালবাসা পেতে! শিবানী তোমায় ভালবাসে নি, যদিও শেষ পর্যন্ত তোমায় বিয়ে করেছিল। তুমি স্বামী হর্যেছিলে বলে যা পাবার পেয়ে গেছ, তা ভেব না। বরং শিবানীর ভালবাসা বলতে যা, তা আমি পেযেছিলাম।

ফাল্গুনের দমকা বাতাস এলো দক্ষিণ থেকে; নদীর তপ্ত বালির ওপর দিয়ে ঘূর্ণি তুলে ঘোলাটে বাতাস নাচতে নাচতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। ভুবন আবার হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে হাত আড়াল করে বসল। যেন সে কাঁদছে।

ভুবনের এত আতিশয্য আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। অনাদি আর কমলেন্দুকে বললাম, 'আমরা একটু আড়ালে গিয়ে বসি না হয়—' বলে উপহাসের গলায় মন্তব্য করলাম, 'ভুবনবাবুর আমাদের হয়তো সহ্য হচ্ছে না, অনাদি যা বলল।'

কমলেন্দু শিমুলফুল দেখছিল, নাকি আকাশ, কে জানে। সে বলল, 'তাতে যদি ভুবন শান্তি পায় আমার আপত্তি নেই। ... আমাব বরং শিবানীর চিতার কাছে বসে ওদিকে তাকিয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগছে।'

'তাই বুঝি শুয়ে আছ, আকাশ দেখছ?'

কমলেন্দু কথার জবাব দিল না।

অনাদি এবাব বলল, 'আমাবও কেমন অস্বস্তি লাগছে। একটু আড়ালে দূরে গিয়ে বসাই ভাল। তাছাড়া এবার এদিকে রোদ ঘুবে গেছে, বসে থাকা যাবে না।'

আমবা আরো অল্পক্ষণ বসে থেকে শিমুলতলা ছেড়ে উঠে পড়লাম। তারপর তিন বন্ধু শিবানীর চিতা এবং ভুবনের দৃষ্টি থেকে সরে অন্য দিকে চলে যেতে লাগলাম।

খানিকটা দূবে এসে আমরা বসলাম। এখানে ঘন ঝোপঝাড আব ছাযা, মাথাব ওপব নিমগাছ, সামনে কুলঝোপেব ওপর দিযে নদী দেখা যায। মাঝে মাঝে পাখিব ডাক ছাড়া আব কিছু কানে যাচ্ছে না। নদীর বালি ছাড়া অন্য কিছু চোখেও পড়ছে না। এখানে যে যার মতন আবাম করে বসলাম, বসে নিশ্চিন্ত হলাম।

কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে ছোটোখাটো দু-চাবটি কথাব বিনিময হলো; শিবানী এভাবে, আচমকা একটা অসুখে মারা যাওযায় আমরা দুঃখিত। শেষে আমবা একে একে কেমন নীবব হয়ে গেলাম। নদীব দিকে অপরাহ্নের স্তিমিত ভাব নামছিল। আমবা তিনজনেই কখনো নদী, কখনো শূন্যতা, কখনো গাছপালা, কখনো পায়েব তলায ঘাস-মাটি দেখছিলাম। এবং পরিপূর্ণ নীবব হয়ে গিযেছিলাম।

অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকাব পর হঠাৎ কমলেন্দু কেমন কবে যেন নিশ্বাস ফেলল। দীর্ঘনিশ্বাস নয, তাব চেযেও যেন গভীবতাপূর্ণ কিছু; তার নিশ্বাসেব শব্দে আমবা ওব দিকে সচকিত হয়ে তাকালাম।

কমলেন্দু সুপুরুষ। তাব মুখ এখনো দু মুহূর্ত তাকিয়ে দেখাব মতন। লম্বা ধরনের কাটাকাটা মুখ, রঙ ফরসা, নাক এবং চোখ বেশ তীক্ষ্ণ। তার ফবসা সুন্দব মুখে আমবা কোথায যেন এক বেদনা দেখতে পেলাম।

অনাদি বলল, 'কি হলো?'

কমলেন্দু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল কযেক মুহূর্ত, তারপর আমাদের দিকে তাকাল। শেষে বলল, 'না, কিছু নয়।... কই, দেখি একটা সিগারেট .'

পকেট থেকে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ওকে দিলাম। নিজে একটা সিগারেট নিয়ে ও আমাদের দু'জনকে দুটো সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা ধোঁযা গলায নিল। তারপর আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ দিকটায় পালিয়ে এসে ভালই হয়েছে। সামহাউ, আমার শিবানীর চিতাব সামনে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। .. হতে পাবে, তখন আমি বোকা ছিলুম, বয়স কম ছিল, তবু এ কথা তো ঠিক, শিবানী আমাকে ভালবেসেছিল। ... আমার চেযে বেশী সে আর কাউকে কখনো ভালবাসেনি।'

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু পরস্পরের কথা জানতাম এবং ভুবন, আমাদের চতুর্থ বন্ধুও সব জানত। কমলেন্দুর সঙ্গে শিবানীর মেলামেশা ভালবাসার কথা আমার অজানা নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে সে যে দাবীটুকু জানাল তাতে আমার আপত্তি হলো না। সবচেয়ে বেশী ভালবাসার কথা উঠলে শিবানীর কাছে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী পেয়েছে এ আমি বিশ্বাস কবি না। একেবারে সরাসবি না হলেও, কমলেন্দুকে শোনাবার জন্যে, ঠাট্টার একটু গলা করে বললাম, 'আমাব তো মনে হয়, ওটা আমিই এক সময়ে পেয়েছি।'

ধীরস্থির শান্তশিষ্ট মানুষ হলেও অনাদি এখন হঠাৎ কেমন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হলো। ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে বলল, 'এ সব তোমাদের মনের ধারণা, কল্পনা। আমার সঙ্গে শিবানীর ঘনিষ্ঠতা এমন সময়ে হয়েছে যখন আমরা দুজনে কেউই বাচ্চা ছিলাম না। সিরিআসলি যদি কাউকে সে ভালবেসে থাকে, আমি সে দাবী সবচেয়ে বেশী করতে পারি।'

অনাদির কথায় আমি বা কমলেন্দু, আমরা কেউই খুশী হলাম না। আমাদের কথায় অনাদিও হয় নি। তিনজনে আজ আমরা যে দাবী কবছি সে দাবী ছেড়ে দেওয়া কেন যেন আমাদেব সাধ্যাতীত বলে আমার মনে হলো। আমাদেব তিনজনেরই বযেস হয়েছে, চল্লিশেব এপাবে চলে এসেছি। আমাদেব তিনজনেরই স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। আজ শিবানীব সঙ্গে আমাদেব প্রেম নিযে অকারণ গল্প কবার বা মনোমালিন্য সৃষ্টি কবাব কোনো অর্থ ছিল না। তবু, আমবা তিনজনেই এমন এক দাবী জানাচ্ছিলাম, যেন সেই দাবী প্রতিষ্ঠা করতে না পাবলে আমাদের কোনো বিশেষ সুখ ও অহংকাব প্রকাশ করা যায় না।

কমলেন্দু ঘন ঘন কযেকটা টান দিল সিগারেটে, সে অনাদিব দিকে এবং আমাব দিকে বাব বাব তাকাল, তাবপর সিগারেটের টুকবোটা ফেলে দিযে বলল, 'আমার সঙ্গে শিবানীব ওপব-ওপব মেলামেশা তোমবা দেখেছ, আমি তোমাদেব সে-সব গল্পও বলতাম, চিঠিপত্রও দেখিযেছি, কিন্তু ভেতবে আমাদেব কি হয়েছিল, তোমরা কি কবে জানবে?'

'ভেতবে ভেতবে যা হযেছে তাও তো পবে তুই বলেছিস,' আমি বললাম না।

'না, আমি সব বলি নি। কিছু না-বলা আছে, সামথিং সিকবেট .'

'সে-বকম গোপনীযতা আমাবও আছে, কমল।' অনাদি বলল।

আমাবও গোপনীযতা ছিল। আমবা তিন বাল্যবন্ধু পরস্পবেব কাছে জীবনেব কোনো কিছুই বড় একটা অগোচব বাখতাম না। শিবানীর বেলাযও কিছু রাখিনি, বাখতে চাই নি, তবু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয কিছু রেখেছিলাম, নয়তো আজ এ-কথা উঠত না। শিবানীব সঙ্গে মেলামেশাব সময়ও আমবা কেউ কারুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হই নি। কেন না—কমলেন্দু শিবানীব সঙ্গে কৈশোবে ও প্রথম যৌবনে মেলামেশা কবেছিল, করে শিবানীব কাছ থেকে দূরে সরে গিযেছিল। শিবানীব সঙ্গে আমাব ঘনিষ্ঠতা একেবারে যৌবনবেলার, আমাব সঙ্গে শিবানীব ছাড়াছাড়ি হযে যাবাব পব অনাদির সঙ্গে শিবানীর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। শিবানীও আমাদেব বাল্যকালেব বান্ধবী। তার সঙ্গে আমাদের যা যা হযেছে তা পবস্পবকে আমবা জানিযেছি। স্বভাবতই কোনো ইতব ঈর্ষা আমাদের থাকাব কথা নয়, তবু যদি কোনো ঈর্ষা থেকে থাকে বা হযে থাকে তা তেমন কিছু নয়। নযতো আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটত এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব বজায় থাকত না। এতকাল যা হয় নি তা হওযা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। শিবানীকে নিয়ে কোনো বিবোধ আমাদেব মধ্যে হয় নি, সে জীবিত থাকতে যা হলো না, আজ যখন সে আমাদের মধ্যে আব নেই—তখন তা হবাব কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পাবে না।

আমার কি রকম যেন মনে হলো। কমলেন্দুর দিকে তাকালাম, তাবপব অনাদিব দিকে। আমার মনে হলো, ওবা নিজেদের গোপনীয়তাকে তাদেব প্রতি শিবানীর চরম ভালবাসাব নিদর্শন হিসেবে মনে করছে। আমি নিজেও প্রায় সেইরকম মনে করছিলাম। যদিও আমাব আরো কিছু মনে হচ্ছিল।

কেমন এক অস্বস্তি এবং কাতরতাবশে আমি বললাম, 'একটা কথা বলব?'

ওবা আমাকে দেখল।

'আমাদের সব কথাই সকলের জানা।' ধীরে ধীরে আমি বললাম, 'আমবা কিছুই লুকোচুরি রাখি নি, তবু আমাদের তিনজনেবই কিছু গোপনতা আছে। আজ সেটা বলে ফেলা কি ভাল নয়?'

কমলেন্দু অপলকে আমাব দিকে তাকিয়ে থাকল। অনাদি চোখেব চশমাটা ঠিক কবে নিল। আমার মনে হলো ওরা অনিচ্ছুক নয়।

কমলেন্দু বলল, 'বেশ। তাই হোক। কথাটা আজ বলে ফেলাই ভাল।'

অনাদি বলল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শিবানীব চিতা এখন জ্বলছে, আমবা শ্মশানে। এই সময সে-সব কথা বলা কি ভাল দেখাবে!'

'খাবাপই বা কি।' আমি বললাম, 'আমাব ববং মনে হচ্ছে, বলে ফেললেই স্বস্তি পাব।'

অনাদি আস্তে মাথা নাড়ল। সে সম্মত।

কমলেন্দুর দিকে আমি তাকালাম। সে বলুক প্রথমে। শিবানীব জীবনে সেই প্রথম প্রেমিক।

'সব কথা বলাব কোনো দরকার নেই কমল, আমবা জানি। আমবা যা জানি না তুমি শুধু সেইটুকই বলো।'

কমলেন্দু আমার দিকে তাকিযে মাথা নেড়ে বলল, 'তাই বলব।'

কমলেন্দু বলল : 'তোমাদেব নিশ্চয মনে নেই, আমি একবার মাস দেড়েক কি দুযেকেব জন্যে মোতিহারিতে ছোটকাকাব বাড়ি বেড়াতে গিযেছিলাম। ফিবে এলাম যখন, তখন বর্ষার শুরু, আমাদেব ম্যাট্রিকের রেজাল্ট আউট হযে গেছে। বাবা পাটনায মেসোমশাইকে আমাব কলেজে ঢোকাব সব ব্যবস্থা করতে চিঠি লিখে দিযেছিলেন। পবীক্ষায আমাব বেজাল্ট কি হযেছিল তোমরা তা জানো। কলেজে পডতে যাবাব আনন্দে তখন খুব মশগুল হযে আছি, বাড়িতে চব্বিশঘণ্টা আদবেব ঘটা চলছে। শিবানীব সঙ্গে আমাব তখন গলায গলায। মোতিহারিতে সে আমায চিঠি লিখত। তাব মা-বাবাব কথা তোমরা জান, পযসাকড়ি থাকাব জন্যে, আর তাব বাবা মনোজকাকা বেভিন-স্কীমে বিলেত ঘুবে আসাব পব আবো একটু সাহেবী হযে গিযেছিলেন। শিবানীকে শাডি ধরাতে ওঁবা দেবী কবেছিলেন। আমি যখন মোতিহাবিতে তখন শিবানী শাড়ি ধবেছে। চিঠিতে আমায লিখেছিল। ফিবে এসে দেখলাম, ছিপছিপে শিবানীকে শাডি পরে একেবাবে অন্য রকম দেখাচ্ছে—বেশ বড় হযে গেছে—বেশ বড়। . কই, আব একটা সিগারেট দাও তো . ।'

অনাদি কমলেন্দুকে সিগাবেট দিল। সিগাবেট ধরিয়ে কমলেন্দু কেমন অন্যমনস্ক হযে থাকল সামান্য, তাবপর বলল :

'একদিন বিকেলবেলা নাগাদ সাংঘাতিক বৃষ্টি নেমেছিল। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। এক একটা বাজ পড়ছিল—যেন মনে হচ্ছিল ঘরবাড়ি গাছপালায় আগুন ধবিযে ছাই কবে দেবে। আর তেমনি আকাশ, পাকা জামের মতন কালো। .. দেখতে দেখতে যেন সন্ধ্যে। দোতলায় আমার ঘরে আমি দরজা-জানলা বন্ধ কবে বসে। একটা জানলা, যেটা দিয়ে ছাট আসছিল না জলের, খুলে রেখেছিলাম। উলটো দিকে শিবানীদেব বাড়ি। শিবানীর মা—লতিকা-কাকিমার শোবার ঘরের গায়ে শিবানীর ঘব। আমার ঘর থেকে শিবানীর ঘর দেখা যায় ... কিন্তু খানিকটা দূর। আমরা আমাদের ঘরে বসে বসে জানলায় দাঁড়িয়ে হাত-টাত নেড়ে হাসি-তামাশা করছিলাম। কখনো কখনো ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চেঁচিয়ে কিছু বলছিলাম, শব্দ বড় একটা পৌঁছচ্ছিল না।

'আমি অনেকক্ষণ ধরে শিবানীকে ডাকছিলাম। ইয়ার্কি করেই। তাকে ইশাবা কবে বলছিলাম শাড়ি পবে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলে আসতে। শিবানী আমায় বুড়ো আঙুল দিযে কাঁচকলা দেখাচ্ছিল। এইবকম কবতে করতে একেবাবে সন্ধ্যে হয়ে এলো। পেযাবাগাছেব ডালেব পাশ দিয়ে শিবানীব ঘবেব অনেকটাই চোখে পড়ে আমার। সে আমায দেখিযে দেখিযে জানলায় বসে চুল বেঁধেছে, একটা শাড়িও আলনা থেকে এনে দেখিয়েছে, দূব থেকে বঙটা বুঝতে পাবি নি। . সন্ধ্যেব মুখে সব যখন অন্ধকার, আমি নীচে থেকে বাতি আনতে যাব, দবজায দুমদুম শব্দ। খুলে দেখি শিবানী, হাতে বাতি। সে ওই বৃষ্টিব মধ্যে এ বাড়ি চলে এসেছে, নীচে থেকে আসার সময মা তাব হাতে বাতি দিয়ে দিয়েছে। শিবানী এইটুকু আসতেই খানিকটা ভিজে গিয়েছিল, হাত পা মাথা শাড়ির আঁচল বেশ ভিজেছে। লণ্ঠনটা আমার হাতে দিয়ে শিবানী তাডাতাড়ি দবজা বন্ধ কবে দিল। জলেব ছাট আসছিল। আমি আলনায ঝুলানো আমাব একটা জামা এনে ওর ভিজে হাত মাথা ঘাড মুছিযে দিতে লাগলাম। ওর মাথার চুল অনেকটা ভিজে গিযেছিল বলে শিবানী তাব লম্বা বিনুনি খুলে ফেলছিল। ওকে আমি আমার পডাব টেবিলের সামনে চেযাবে বসিযে দিয়ে ভিজে পা দুটি মুছিযে দিতে গেলাম, ইয়ার্কি কবেই। ও পা দুলোতে লাগল, হাসতে লাগল। শিবানী ততক্ষণে মাথাব চুল খুলে ঘাড়ে পিঠে ছডিয়ে দিয়েছে। তাবপব আমরা লণ্ঠনেব আলোয বসে গল্প করতে লাগলাম। শিবানীর গানের মাস্টাব ছিল, সে যে এক সময়ে মোটামুটি ভাল গাইত তা তোমবাও জানো। শিবানীকে একটা গান গাইতে বললাম। শিবানী যে গানটা গাইল তা আমাব এখনো মনে আছে, আমি অনেকবাব সে গান শুনেছি, কিন্তু সেদিনের মতন কখনো আব নয়। ঝড় বৃষ্টি, বাইবেব দুর্যোগ আব অন্ধকাবেব মধ্যে আমাব ঘবে বসে মিটমিটে লণ্ঠনেব আলোয সে গাইল : 'উতল ধাবা বাদল ঝবে ।' ওই গানেবই একটা জাযগায ছিল 'ওগো বঁধু, দিনেব শেষে এলে তুমি কেমন বেশে, আঁচল দিযে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে ।' বাব বাব শিবানী ওই চবণ দুটি গাইছিল, আব আমাব দিকে তাকিয়ে দুষ্টু কবে হাসছিল। অর্থটা আমি বুঝতে পাবছিলাম। গান শেষ হলে আমবা গল্প কবতে লাগলাম। এ গল্প সে-গল্প। শেষে আমবা ছেলেমানুষেব মতন হাতেব বেখা, কপালেব বেখা, ভাগ্য, ভবিষ্যৎ এইসব কথা নিয়ে মেতে উঠলাম। একে অন্যজনকে সৌভাগ্যেব চিহ্ন দেখাতে ব্যস্ত। হঠাৎ শিবানী বলল, তার বুকে নীল শিবাব একটা ক্রশ আছে। আমি বললাম, তা হলে সে মস্ত পুণ্যবতী। বলে আমি হাসছিলাম। এবকম যে হয না, হতে পাবে না, তা আমি জানতাম। আমাব হাসি দেখে শিবানী বুঝতে পাবল আমি তাকে অবিশ্বাস কবছি। সে বলল, 'হাসছ কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না?' আমি মাথা নাডলাম, 'তুমি কি যীশু?' শিবানীব অভিমানে লাগল। বলল, 'আহা, যীশু না হলে বুঝি কিছু থাকতে পাবে না?' আমি তাকে আবো বাগিয়ে দিযে বললাম, 'যার কোথাও পাপ নেই তাব থাকতে পাবে । মানুষেব নয়। যীশুব মতন তুমি মবতে পারবে?' শিবানী কি ভাবল জানি না, হঠাৎ যে সে তাব বুকেব জামাব ওপরের বোতাম খুলে—জামা অনেকটা সবিযে আমায বলল, 'আলো এনে দেখ।' আমি দেখলাম। কি দেখলাম। কি দেখলাম তা তোমাদেব কাছে বলে লাভ নেই। বুঝতেই পারছ। তবে শিবানীর বুকে শিরা ছিল, নীলচে বঙের। সেটা ক্রশ কি না আমি দেখি নি। আমি অন্য জিনিস দেখছিলাম। . আজ আমার স্বীকার কবতে দোষ নেই, সেই বয়সে শিবানীব সেই ইনোসেন্স ছিল। আমার হাতে সেটা মরে গেল।'

কমলেন্দু নীবব হলো। তাকে খুব অনামনস্ক ও অপরাধীর মতন দেখাচ্ছিল।

নদীর চরের ওপারে রোদ সরে যাচ্ছে, তাপ অনেকটা কমে এসেছে। কোথাও একটা কাক ডাকছিল, গাছের পাতায় বাতাসেব সবসর শব্দ হচ্ছিল। কেমন যেন একটা নিঃঝুম ভাব।

আমরা তিন বন্ধুই নিশ্বাস ফেললাম। কমলেন্দু রুমালে মুখ মুছে নিল।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। 'শিশির, তোমার যা বলার ..'

আমার বলার পালা কমলেন্দুর পর। শিবানীর জীবনে আমি দ্বিতীয় প্রেমিক, তার যৌবনের প্রেমিক। আমারও তখন যৌবন। আমাদের তখনকার ঘনিষ্ঠতাব কথা কমলেন্দুদের অজানা নয়। ওরা যা জানে না, ওদের কাছ থেকে যা আমি গোপন রেখেছিলাম, এবাব তা বলাব জন্যে আমি তৈবী হলাম। কুলঝোপের মাথা ডিঙিযে অপবাহ্নের রোদ এবং নদী দেখতে দেখতে আমি গলা পরিষ্কাব করে নিয়ে বললাম, 'আমি খুব সংক্ষেপে সাবতে চাই।'

'শুনি...' কমলেন্দু বলল।

'বলছি ..। তোমাদের কাছে কোনো ভূমিকাব দবকাব নেই। তবে তোমাদের জানা দরকার যে, তিন-চার বছর শিবানীর সঙ্গে আমাব খুব মাখামাখি ছিল, এটা তাব শেষের দিকেব ঘটনা—' আমি ধীবে ধীবে বললাম। 'শিবানীর বাবা তখন মাবা গেছেন, লতিকা কাকিমারা তাঁদের নতুন বাড়িতে থাকেন। আমি আমাব ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্রেনটিসশিপ শেষ করে পাওয়ার হাউসের চার্জে বয়েছি। শিবানীব সঙ্গে আমাব সম্পর্কটা তখন এমন অবস্থায যে, তোমবাও ভাবতে, আমি তাকে বিযে কবব। লতিকা-কাকিমাও ভাবতেন। শিবানীবও তাতে সন্দেহ ছিল না। সন্ধ্যেবেলা ওদের বাড়ি গিয়ে আমাকে তখন বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা কবতে হত না, সোজা ড্রযিংরুমের পবদা সরিযে বাঁদিকেব দবজা দিযে শিবানীর শোয়ার ঘবে চলে যেতে পাবতাম। গল্পগুজব, গানবাজনা, খাওযাদাওযা সেবে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন বাত হযে গেছে। শিবানী আমায ফটক পর্যন্ত এগিযে দিযে যেত। আর প্রায় রোজই ফেবাব সময়, ফটকেব কববীঝোপেব আড়ালে দাঁড়িয়ে সে আমায চুমু খেত। . শিবানীকে যে দেখতে খুব সুন্দব ছিল, তা আমাব কখনো মনে হযনি। তাব গাযেব বঙ, চোখমুখেব ছাঁদ আমাব পছন্দ ছিল না। কিন্তু তাব শরীব আমাব ভীষণ পছন্দ ছিল. তাদেব বাড়ির আবহাওয়ায যে স্বাধীনতা, সপ্রতিভ ভাব, খোলামেলা আচবণ ছিল, তাও আমার খুব পছন্দ ছিল। নতুন ধবনেব রুচি, পবিচ্ছন্নতা, বেশবাসেব সৌন্দর্য .. এ-সবেব জন্যে, আর শিবানীব তখনকাব শরীরেব জন্যে তাকে আমাব ভাল লাগত। শিবানীব সেই যৌবন বয়সে, তোমবা জানো, মনে হত তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ফেটে পড়ছে।

একদিন, সেটা শীতকাল, লতিকা কাকিমা তাঁদেব মহিলা সমিতির মিটিঙে গিয়েছিলেন। বাড়িতে চাকর আর ঝি ছিল। ঝি-টাব ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করেছে, সে শুয়ে আছে। শিবানীব শোবাব ঘবে বসে আমবা গল্প করছিলাম। জানুযাবি মাস, প্রচণ্ড শীত। ঘরেব জানলা-টানলা সবই বন্ধ ছিল। . সাধাবণ একটা কথা নিযে আমবা দু'জনেই হাসছিলাম, হাসতে হাসতে শিবানী বিছানায় গিয়ে লুটিযে পড়ল। সে এমনভাবে লুটিয়ে পড়েছিল যে তাব একটা হাত মাথার ওপর দিয়ে বালিশে পড়েছে, অন্য হাতটা তার কোমবের কাছে বিছানায অলসভাবে পড়ে আছে, তার মুখ সিলিংয়ের দিকে, মাথার ওপব হাত থাকার জন্যে তাব বুকের একটা পাশ আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। শিবানীর কোমবের তলা থেকে পা পর্যন্ত বিছানা থেকে মাটিতে ধনুকের মতন বেঁকে—কিংবা বলা ভাল—ঢেউয়ের মতন ভেঙে পড়েছে। বিছানাব ওপর সুজনিটা ছিল কালচে-লাল, তাতে গোলাপেব মতন নকশা, শিবানীব পরনেব শাড়িটা ছিল সিল্কের, তার রঙ ছিল সাদাটে। ওর ভাঙা শবীরের বা আছড়ে-পড়া শবীবের দিকে তাকিয়ে আমার আত্মসংযম নষ্ট হয়ে গেল। ঘবেব বাতি নিবিয়ে দিয়ে আমি যখন তাব গায়ের পাশে, সে আমায় যেন কেমন কবে ফিসফিস গলায় গরম নিশ্বাসেব সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আমি কবে তার মাকে কথাটা বলব। .. আমি তখন যে-কোনো বকম ধাপ্পা দিতে রাজী। বললাম, কালই বলব, কাল পবশুর মধ্যে। শিবানী যেন অন্ধকাবেব মধ্যে সুখে

আনন্দে উত্তাপে সর্বাঙ্গে গলে যেতে শুরু কবল। . সে কতবাব কবে বলল, সে আমায় ভালবাসে। আমি কতবাব করে বললাম, আমি তাকে ভালবাসি। তারপব ঘবের বাতি জ্বালা হয়ে গেলে আমি শিবানীর মযলা বঙ, ছোট কপাল, মোটা নাক, সামনেব বড় বড দাঁত, পুরু পুরু ঠোঁটের দিকে তাকিযে মুখ নীচু করে পালিয়ে এলাম। তারপব থেকেই আমি পালিযেছি . '

আমি থেমে গেলাম। আমাব গলার কাছে একটা সীসেব ডেলা যেন জমে গিয়েছে। চোখ ফেটে যাচ্ছিল। কী যে অনুশোচনা আজ, কেমন কবে বলব।

নদীব ওপাবে বনের মাথায় রোদ চলে গেছে। ছায়া পড়ে গেছে নদীব চর জুড়ে। ফাল্গুনের বাতাস দিচ্ছিল। ঝাঁক বেঁধে পাখিবা উড়ে আসতে শুরু কবেছে। সমস্ত জাযগাটা অপবাহ্নেব বিষণ্ণতায ক্রমশই মলিন হযে আসছে।

আমাদেব তিন বন্ধুর নিশ্বাস পড়ল।

আমি সিগারেটেব প্যাকেট বেব কবলাম। মুখ মুছলাম কোঁচায়। তিনজনে সিগাবেট ধবিযে নিলাম। এবাব অনাদিব পালা। শিবানীব জীবনে তৃতীয প্রেমিক। অনাদির দিকে তাকালাম আমবা।

অনাদি প্রায আধখানা সিগাবেট শেষ কবল, কোনো কথা বলল না। শেষে মাটিব দিকে তাকিযে তাব কথা শুরু কবল :

'শিবানীব সঙ্গে আমাব ঘনিষ্ঠতা যখন হযেছে তখন আমবা কেউই বাচ্চা নেই। আমাব বযস তেত্রিশ পেবিযে গিযেছিল, শিবানী প্রায তিবিশ। লতিকা মাসিমা তখন আব ঠিক বেঁচে থাকাব মতন অবস্থায নেই। সেই আবথ্রাইটিসেব অসুখে পঙ্গু, শয্যাশাযী। আমি ব্যাংকে অ্যাকাউন্টেন্ট হযেছি নতুন তোমবা ভাই জানো, মহেশ্বরী যখন কন্ট্রাকটাবী ব্যবসায নামল তখন আমি তাব পেছনে ছিলাম, তাব সঙ্গে আমাব ভেতবে ভেতবে কথা ছিল, তাব লাভেব একটা পার্সেন্টেজ আমায দেবে, আমি ব্যাংকে তাব সববকম সুবিধে কবে দেবো। প্রথম প্রথম মহেশ্বরীব কাছ থেকে বেমক্কা দু' চাবশো পেতাম। ব্যাংকে আমি তাব সুবিধে টুবিধেব মাত্রাও বাড়াতে লাগলাম। মামা ম্যানেজাব, যদিও নিজেব মামা নয। মামাকে আমি নানাভাবে ইনফ্লুয়েন্স কবতাম। কিন্তু মহেশ্ববী শেষে আমায ডুবিযে দিল। বিশ্রী এক অবস্থায পড়লাম। ব্যাপাবটা এমন ঘোবালো হযে দাঁড়াল যে, আমাব পক্ষে কোথাও আব আইনেব ফাঁক থাকল না। শিবানীব সঙ্গে আমাব তখন মেলামেশা। সত্যি কথা বলতে কি, আমাব তখন এমন কাউকে দবকাব, যে আমায অর্থসাহায্য কবতে পাবে। অন্তত একটা জামিন থাকলেও আমাব পক্ষে একটু সুবিধে হয। শিবানীদেব নিজেব বাড়িঘব, জমি, লতিকা মাসিমাব—আমি তাঁকে মাসিমা বলতাম—কিছু টাকা এবং অলংকাব ছিল। নিজেকে বাঁচাবাব জন্যে শিবানীদের শবণাপন্ন হবাব কথা ভাবছিলাম। লতিকা মাসিমা মাবা গেলে সমস্ত সম্পত্তিই শিবানীব হবে। তাছাড়া, লতিকা মাসিমা বেঁচে থাকতেও যদি শিবানীব সঙ্গে আমাব তেমন একটা সম্পর্ক দেখতে পান, তিনি আমায বিপদ থেকে পবিত্রাণ কবতে পাবেন। বেশি বলে লাভ নেই, আমি শিবানীব সঙ্গে যে-ধবনেব সম্পর্ক পাতালাম—তাতে মনে হবে আমবা যেন স্বামী স্ত্রী। আমি শিবানীর অঙ্গ স্পর্শ কবি নি--মানে সেভাবে নয, আমাব তাতে আগ্রহ ছিল না। অথচ আমি শিবানীদেব বাড়িতে সাবাদিনও থেকেছি। তাদের বাড়িতে থেকেছি, খেযেছি, বিছানায শুযেছি, লতিকা মাসিমাব জন্যে ডাক্তাব ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছি, শিবানীব ও তাদেব সংসাবেব তদাবকি কবেছি। আমাব ওপব লতিকা মাসিমাব সুনজর পড়ল, শিবানী প্রথম প্রথম আমায কি ভারত জানি না, পরে সে আমাব উপব নির্ভর ও বিশ্বাস কবতে লাগল। তখন চাকরিতে আমার গণ্ডগোল বেধে গেছে,

মামার জোবে তখনো জেলে যাই নি, কিন্তু মহেশ্বরীকে মামলায় জড়িয়ে পডতে হয়েছে। শরীর খারাপেব অজুহাতে আমি ছুটি নিয়েছি, পুজোর মুখে। আমাব বাড়ি বলতে এক মা, বাডির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিযেছিলাম। ছুটি নিয়ে শিবানীদেব বাড়িতে পড়ে আছি। দুশ্চিন্তায় খাওয়া নেই, ঘুম নেই, চোখ-মুখ শুকিযে হলুদ হযে গেছে। এমন সময একদিন বিকেল থেকে লতিকা মাসিব খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা হলো। ডাক্তাব ডেকে আনলাম, ওষুধপত্র চলতে লাগল নতুন করে। .. সেদিন সন্ধ্যেব পব লতিকা মাসিব অবস্থা যখন একটু ভাল হলো, আমি বাইবে—শিবানীদেব বাড়ির বাগানে একা একা ঘুরে বেডাচ্ছিলাম, অন্ধকারে। এমন সময় কখন শিবানী পাশে এসে দাঁড়াল। দু'চারটে কথার পব সে বলল, আমি আব কতদিন এভাবে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা নিয়ে বসে থাকব? ... আমি তখন জামিন এবং টাকাব কথা বললাম। শিবানী কিছু না ভেবেই বলল, লতিকা মাসির কাছে সে সব বলবে। আমরা দু'জনেই তখন একটা শিউলিগাছেব কাছে দাঁডিযেছিলাম, অনেক দিন পবে হঠাৎ আমার নাকে শিউলি ফুলের গন্ধ লাগল। আমি শিবানীর হাত টেনে নিয়ে কৃতজ্ঞতায কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার সেই কান্না কুকুবেব মতন। শিবানী আমায সান্ত্বনা দিল। পবে বলল, 'এই ঘববাড়ি টাকা—এ-সব মা আমাব ভবিষ্যৎ ভেবে বেখেছে। যাব কাছে আমার আশ্রয জুটবে, এ-সবই তার। তুমি তো এ-সবই তোমাব নিজের ভাবতে পাব।' আমি সে বাত্রে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। লতিকা মাসিমা আমাব তবফে জামিন দাঁডালেন, কিছু টাকাও আমায় তিনি দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহেশ্ববী মামলায এমন এক অবস্থায পডল যে তাকে সবিযে-বাখা টাকা বেব কবে দিতে হলো। আমাব গণ্ডগোলটাও মিটে গেল। লতিকা মাসি অবশ্য আবো মাস কযেক বেঁচে ছিলেন। কিন্তু শিবানী ভবিষ্যতেব জন্যে আমাব ওপব নির্ভব কবতে চেযেছিল, সে-ভাব আমি নিই নি, তাকে আশ্রযও দিই নি। শিবানীকে ঠিক বিযে কবাব মতন মেযে আমাব কোনোদিনই মনে হয নি। .'

অনাদি চুপ কবল।

আমরা চুপচাপ। নিঃসাড় যেন। একটা সাদা ধবধবে বক নদীব ওপব দিযে গোধূলিব আলোব সীমানা পেবিযে কোথায যেন চলে গেল।

কমলেন্দু বলল, 'লতিকা কাকিমাব টাকাটা তুমি ফেবত দাও নি?'

'পবে মাসিমা মারা যাবাব পব শিবানীকে কিছুটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয নি।'

আব কোনো কথা হলো না। আমবা তিন বিগতযৌবন বন্ধু, শিবানীব তিন প্রেমিক-পুরুষ নীরবে বসে থাকলাম, কেউ কাবো দিকে তাকালাম না। বসে বসে কখন যেন দেখলাম, আকাশ বন নদী জুড়ে আসন্ন সন্ধ্যার ছাযা। আমাদেব চাবপাশে সেই সীসেব মতন ছাযা ক্রমশই জমতে লাগল। আমাদের নাম ধরে চিতার কাছ থেকে ওরা তখন ডাকছে।

দাহ শেষ। চিতা ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেলেগুলোর জল ঢালা ফুবোলো। এবাব আমরা। নদী থেকে মাটির কলসিতে জল ভবে এনে কমলেন্দু শিবানীব ভিজে চিতায জল ঢেলে দিল। তারপর আমি। কমলেন্দুর হাত থেকে কলসি নিয়ে নদী থেকে জল ভবে আনলাম। এনে শিবানীর চিতায়, তাব নিশ্চিহ্ন শরীরের ছাইয়েব বাশিতে জল ঢাললাম। তারপব অনাদি জল দিল। শেষে ভুবন।

কলসিটা ভেঙে দিয়ে ভুবন ফিরল। আমরা কেউ আব পিছু ফিরে তাকাব না।

আমরা এগিয়ে চলেছি। ওরা পুরুতমশাই আর ছেলেরা আমাদের আগে আগে, গরুর গাড়িটা চলছে, চাকার করুণ শব্দ, আমরা চার বন্ধু পাশাপাশি। ভুবনকে আমাদের পাশে

পাশে হেঁটে যেতে দেখে আমাদেব অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বড ক্লান্ত, অবসন্ন। মনে হলো যেন ঠিক মতন পা ফেলতে পাবছে না। আমবা তাকে গরুব গাড়ির ওপর বসিয়ে দিলাম জোব করে। সে আমাদের দিকে মুখ করে গরুর গাড়িতে বসে থাকল, উদাস দৃষ্টিতে।

এমন সময় চাঁদ উঠে গেল। শুক্লপক্ষ, আজ বুঝি ত্রয়োদশী।

নদী পিছনে, দু'পাশেব জঙ্গল গুটোনো পাখার মতন দু'পাশে নেমে গেছে, সামনে উঁচু-নীচু কাঁচা বাস্তা। জ্যোৎস্না ধবেছে বনে, ঝিল্লিবব ঘন হয়ে এলো, ফাল্গুনেব বাতাস বইছে, গরুর গাড়িব চিকণ করুণ শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই, আব আমাদেব পায়েব শব্দ। মাথাব ওপর চাঁদ।

যেতে যেতে কমলেন্দু হঠাৎ বলল ভারী গলায, 'শিবানীব চিতায জল ঢালাব সময কেমন যেন কান্না এসে গিয়েছিল। আহা, বেচারী। ভাই, আমি আজ তাব কাছে, তাব চিতায জল দেবাব সময, মনে মনে ক্ষমা চেয়েছি।'

অনাদি যে কাঁদছিল আমরা খেযাল কবি নি। সে ছেলেমানুষেব মতন মুখে কান্না ও লালা জড়িয়ে বলল, 'আমিও ...'

চাঁদেব আলোয আমরা তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিন প্রেমিক চলেছি। আমাদেব সামনে ভুবন। পিছনে শ্মশান, শিবানীব ধুয়ে-যাওয়া চিতা।

যেতে যেতে সামনে ভুবনেব দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম, আমবা তিনজনে—তিন প্রেমিক শিবানীর নিষ্পাপতা, কৌমার্য, নির্ভবতা তো হবণ কবে নিয়েছিলাম। নিযে তাকে প্রত্যাখ্যান কবেছি। কিন্তু তাবপবও আব কি অবশিষ্ট ছিল শিবানীব, যা ভুবন পেযেছে। কি পেযেছে ভুবন যাব জন্যে তাব এত ব্যথা?

চাঁদেব আলোয ভুবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তার চাবপাশে নিবিড় ও নীলাভ, স্তব্ধ, মগ্ন যে চবাচব তা ক্রমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হযে এক অলৌকিক বিষণ্ণ ভুবন সৃষ্টি কবছিল। এ যেন আমাদেব ভুবন নয। অথচ আমাদেবই ভুবন।

সলিমের মা

ননী ভৌমিক

ধান কাটার পর ধু ধু করে বিস্তীর্ণ বাদামি মাঠ। আঁকাবাঁকা আল বেয়ে মানুষের চলার পথ সাদা হয়ে তকতক করে। নিচু জমির জলজ ঘাসগুলো পেকে হলুদ হয়ে আছে কোথাও। ছোট-ছোট তামাকের সবুজ ক্ষেত। কদাচিৎ উইঢিবির মত দু-একটা কুঁড়েঘব চোখে পড়বে এখানে ওখানে। লম্বা দড়িব খুঁটটুকু ধরে কদাচিৎ দু-একটা ন্যাংটো ছেলেকে দেখা যাবে গরু চরাতে নিয়ে যাচ্ছে।

তা ছাড়া মানুষ দেখা যায় না বড। সাবা বছর ধবে ক্ষেতে ক্ষেতে অক্লান্ত পবিশ্রম কবে কোথায় হারিয়ে থাকে তাবা। বুভুক্ষা আব আক্রোশ নিয়ে লুকিয়ে থাকে দশ হাজাব বিঘা মাঠের ফাঁকায়।

তার পর ধান পাকে একদিন। মেঠো পথে টাল খেয়ে সাববন্দী গরুব গাড়ি চলতে শুরু কবে তখন। মানুষ দেখা যায় হঠাৎ। দূব হাটের পথে পাড়ি দেবার চওডা রাস্তাব পাশে ঘাসটুকুব ওপব বসে হাঁটুভর্তি ধুলো নিয়ে। অচেনা লোকেব সঙ্গে আলাপ কবে, গবেষণা চলে ধানেব দর নিয়ে। ধান বিক্রি কবে দেবে সবাই। বিক্রি কবে কাপড কিনবে, কম্বল কিনবে। দুনো সুদে কর্জ শোধ দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চাইবে দু মাসেব জন্যে।

হাট না, মেলা। পৌষ মাসে ধান কাটা হয়, মাঝে মাঝে মেলা বসে জমজমাট। দশ-বারো ক্রোশ এলাকা জুড়ে যত আধিয়াব চাষী, সবাই গিয়ে জোটে সেখানে, ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সবাই। লজ্জার বিধিনিষেধ যাদেব শক্তি নয়, সেই সব ক্ষত্রিয় মেয়েবা পবস্পরেব আঁচলে আঁচলে গিঁঠ বেঁধে মেলা ঘোরে দিনেব পর দিন। মাটিতে জোয়াল নামানো গরুব গাড়িব ছইযেব ভেতব থেকে ছেঁড়া কাপড়েব পর্দা ফাঁক কবে মুসলমান ঘবেব মেয়েরা চেয়ে থাকবে উৎসুক তৃপ্তি নিয়ে। নির্বাধ উৎসব চলবে কয়েকদিন।

'ধানকলেব পাইকাববা কিনিবার চায না, কি করা বাপুবে—।'

'কটকটা বুদ্ধি উঁযাদেব '

সাবা বছব মেহনত কবে যে-ধান ঘবে উঠল সে ধান বিক্রি করে দেয অনাযাসে। তার পব বিষণ্ণ ভাবে বাড়ি ফেবে এক এক করে।

মুই-মুড়কি-মোয়া, গুডের তৈবি মিঠাইয়েব দোকান, জোলাব কাপড় গামছা, গরুহাটিব অগুনতি জোয়ান-জোয়ান গরু—শীত পোয়াবাব জন্য জ্বালানো সারি সারি ঘোলাটে আগুন—অন্ধকারে মেঠো জোনাকির মত ঝিলমিল কবে মাঠ জুড়ে।

'গরু কেনা গেল না'

'না, কেনা গেল না—'

তার পর রিক্ত ক্ষেতের এখানে ওখানে উঁইঢিবির মত নিঃশব্দ কুঁড়েগুলোয় ফিরে আসবে এক-এক করে। দশ হাজার বিঘা জমির ফাঁকায় আবার হাবিয়ে যাবে।

মঈনুদ্দিন প্রধানও ফিরে আসে আর সকলের মত। গরু কেনে না, কাপড় কেনে না। ফিবে এসে উঁচু দাওয়ার ওপর বসে হাঁফায়।

ভাঙা দাওয়া। তিনটে ঘরের মাটি গলে দেয়াল ভেঙে পড়েছে। প্রশস্ত ফাঁকা আঙিনায় দুটিখানিক ধান শুকোয়।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চায় না ওকে। আপন মনে ধান কুটে চলে সলিমেব মা। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বুড়ি দাদি আপন মনে ঘ্যান ঘ্যান করে বলতে শুরু করে এক সময়—

'তুই মববু, তুই মরবু সলিমের মা—'

একটা চাপা অস্বস্তি আর শত্রুতায় টান ধরে বুকের ভেতর। বসে থেকে মঈনুদ্দিন হঠাৎ ফাঁকা গলায় চিৎকার করে ওঠে— 'ভাত দিবার হয় কি না-হয—'

মঈনেব মুখের দিকে তাকিয়ে টের পায সলিমেব মা। গাইনটা নামিযে বেখে মাটির দিকে শক্ত হয়ে চেয়ে থেকে অপেক্ষা করে।

ভোঁতামত চেলা কাঠ একটা খুঁজে বেডায মঈন। হাতের কাছে যা পায তাই নিয়ে কুঁদে কুঁদে এগিয়ে যায় সলিমের মার দিকে। স্থিব হয়ে নীরবে মার হজম কবে সলিমেব মা। কাঁদে না, প্রতিবাদ করে না। কিছুক্ষণ গুম হযে থেকে তার পর ভাত বেড়ে দেয় মঈনকে।

এ-রকম মার খাওয়া অভ্যেস হযে গেছে সলিমের মার। মঈনুদ্দিনের রূঢ় মুখেব প্রত্যেকটি নিষ্ঠুর ভাঁজ ও ঘনিষ্ঠভাবে চেনে। অপবাধ হোক না হোক, জানে কখন মানুষটা হিংস্র হয়ে উঠতে চাইবে।

অথচ এমন ছিল না মঈনুদ্দিন। এমন হালও ছিল না এ বাড়ির। আঈনুদ্দিন প্রধানের বেটা মঈনুদ্দিন প্রধানের বাড়ি এ এলাকাব সকলে চেনে। নাম ছিল, ক্ষমতা ছিল, সম্মান ছিল প্রধানদেব। তবু এক পুরুষ দু-পুরুষের ভেতরেই কেমন কবে যেন সম্পন্ন কৃষক আধিযাবে পবিণত হযে যায। আঙিনাব ওপব গোলা দুটো ভরাট হয না আব। কোঠা বাড়িব টিনের চালেব ওপব হলুদ হযে মবচে ধরে।

অনেক কাল আগে গরুর গাড়ি চেপে সলিমেব মা এসেছিল এ বাড়িতে নতুন বৌ হয়ে। গাড়িব ভেতব ছিল মঈনুদ্দিন, বাকি সবাই পেছনে পেছনে হেঁটে আসছিল। মুসলমানেব বৌ, তাই ছই-ফেলা গাড়িতেও হয নি, কাপড়-গামছা গুঁজে ঢেকে দেওয়া ছিল ছইযেব মুখটা। কাপড়ের আবরণটা অল্প একটু ফাঁক করে চেযে চেয়ে দেখছিল সলিমের মা। মাঠেব পব মাঠ আশমান ছুঁযেছে। মাঝে মাঝে বাঁশ ঝাড, মাদার গাছ, কাঁঠাল গাছ দু-একটা।

এত জমি অথচ মানুষ নেই যেন। এক টুকরো জমি পড়ে থাকলে ছুটে আসবে না লোকে, ভিড় কবে কাড়াকাড়ি শুরু কববে না?

'তোমাদের গাঁযের মানুষগুলো ধনী।' নতুন বৌ বলেছিল মঈনকে। শুনে হেসে উঠেছিল মঈনুদ্দিন। রঙিন লুঙি পবা, পাটের পিরান গাযে বয়স্ক জোয়ান মানুষটাব দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল নতুন বৌ।

'হাসেন কেনে তুমি?'

'কবম আলি, করম আলি! এত বড় ধনী তোমাব গাঁওত্ নাই। দশ হাজার বিঘা— তামান জমি ওঁয়ার, বুঝ?'

· গাড়ি এসে থেমেছিল এ-বাড়িতে। ঘরের সামনে বেড়া-দেওযা তামাকেব ক্ষেত। অনেক দিন আগেকার সচ্ছল অবস্থার আঁচ পাওয়া যায় নকশা-কাটা খুঁটিতে। মাটিরই দাওয়া—তবু কিছু-কিছু ইঁট দিয়ে বাঁধাবার চেষ্টা হয়েছিল বোঝা যায়। চওড়া আঙিনার চাব পাশে ছয়-সাতটা মাটির ঘর। এককালে হয়ত ভর্তি থাকত মানুষে, এখন অব্যবহৃত ধস-খাওযা। আব আছে প্রধানদেব ঘরের আব্রু বাঁচাবাব মতো ঘেবাটোপ, মাটির উঁচু দেয়াল।

রাত্রে মঈনুদ্দিন সহসা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'মানী ঘর আমাদেব। তিন হালেব চাষ ছিল বুড়ো দেওনিয়ার আমলে, এখন একটি হাল।' কিন্তু আবার তো হবে? করম আলিব সঙ্গে মামলা চালাচ্ছে ও। মুনশেফ কোর্ট থেকে জজ কোর্ট, জজ কোর্ট থেকে চাই কি হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা চলবে বৈ কি। শহরের উকিল-আমলাবা বলে দিয়েছে—হাঁ, জয় হবে। আইন আছে, দলিল আছে, জয় হবে।

'তুমি হামাব জমি দখল করিবাব আসছেন? খুঁটি গাড়ি করি দিবেন? হামার তো বন্দুক নাই। না—ই। বন্দুক নাই, পিযাদা নাই। কিন্তু আইন আছে ...।'

স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বলেছিল মঈন। গরিব হয়েছি, কিন্তু এ ঘরের ইমান বড় কডা বৌ। ঘরেব বাইরে পা বাড়িও না, অচেনা পবপুরুষের মুখের দিকে চেয়ো না—মঈনেব মাও উপদেশ দিয়েছিল ওকে।

বাঁশেব তৈবি তাঁতে নকশা-তোলা ধোকব বুনতে বুনতে মাঝে মাঝে গল্প করে শোনাত পুরনো দিনের কথা। মঈনুদ্দিনের বাবা আইজুদ্দিন—তার বাবা ছিল এ তল্লাটেব সেবা লোক। ধনী, মানী। চারটা 'বিয়া' করেছিল মানুষটা। একটার বেশি ছেলে হয় নি। তাই খুব পেয়ার কবত ছোট বৌকে।

খুব সুন্দর নাকি ছিল বৌটা। তিন দিনেব পথ পেবিযে দক্ষিণ দেশ থেকে বহুত টাকা দিয়ে ঘরে এনেছিল। কিন্তু খেয়াল ভাল ছিল না সে বৌযের। দক্ষিণ দেশেব মেয়ে—বেসরম হয়ে তাকাত পরপুরুষের মুখের দিকে। একদিন দেওনিযা দেখল—হাটেব পাইকারেব সঙ্গে হেসে কথা বলছে ছোট বৌ।

খুব বাগ হযেছিল তার। ছেলেকে কেড়ে নিযে মাবতে মারতে ঘবেব বাব কবে দিযেছিল পেয়ারের বৌকে। আব কখনো ঢুকতে দেয নি। বজ্জাত বৌটাও নাকি ফিবে আসে নি আর ..

হামাক মারে নাই, ঐ মঈনের বাপ? রাগ হলে না ভাঙালে চলিবে না যে মানুষগুলাব—গল্প শুনে হিম হয়ে আসত বুকের ভেতব।

কিন্তু ভালো লেগেছিল বৈকি এ সংসাবকে। মন তাব থাকত নানান কাজে—ধান কাটা, কাঠ ফাড়া, গরুর দেখাশোনা করা। জোলাব পেশ নীল শাড়ি পবনে। শামলা হাতের কব্জি ঢেকে চওড়া নকশা খোদাই রূপোব চুড়, নাকে কানে সোনা, আলগা পায়ে বাঁকা মল—নানান কাজে আদরের ভেতর ঘুরঘুর করত ও।

তার পর ছেলে হল একটা। বোঁচা বোঁচা গোলগাল দেখতে। ছেলেব নাম দিল সলিম। সেই থেকে সবাই ওকে ডাকত সলিমেব মা বলে।

আর এক-একদিন শহরে মামলা কবে এক হাঁটু ধুলো নিয়ে মঈন ফিবত হাসিমুখে।

'পড়ালিখা লাগে। কত টাকা লাগে—তবে উকিল হচ্ছে ওমরা। ওঁয ধরিছে একটা আইন। করম আলি কেমন পার পায় মুই দেখিমু—'

তারপর গামছায় বাঁধা পোঁটলাটা খুলতে খুলতে ডাকত—'সলিমেব মা'।

'কি'?

'দেখি যাও কেনে।'

শুধু সলিমের মা নয়, সলিমেব দাদিও আসত উৎসুক হয়ে। প্রদীপ উঁচু করে দেখত গামছায় বেঁধে কি এনেছে মঈন। কোলের ভেতর বাচ্চা সলিমও আঁকুপাঁকু করে উঠত। 'চুড়ি আনছি, বেলোয়ারি চুড়ি। আর সেলিমের একটা লাল কোট আনছি—'

''ওগো মা, ধান যে সব বেচি দিবার ধরছিস এদিক', কপট ধমক দিতে গিয়ে সলিমের দাদি হাসত দরাজভাবে।

মাঝে মাঝে মুখ কালো করে ফিরত মঈন।

'কাহাকার শক্তি মামলায় ইমান রাখিবার পাবে। ইমান ঠিক রাখে কেটা?'

ঐ কেমন একটা ঝোঁক ছিল মঈনের। কাজকর্ম, দেখাশোনা সব ফেলে শহবে যেত ক্ষেপার মত। করম আলির গ্রাস থেকে সমস্ত জমি উদ্ধার না করে স্বস্তি ছিল না ওর। সলিমের মাকে আদর করতে করতেও অন্যমনস্ক হয়ে যেত মামলাবাজ, সলিমের মার চেয়ে বয়সে অনেক বড় জোয়ান গড়নের মানুষটা।'

'ইটা হামার লড়াই—ঐটা মামলা।'

কিছুক্ষণ হাঁ করে শুনত সলিমেব মা। কিন্তু পুরুষ মানুষের এই সব চিন্তা দুশ্চিন্তা তেমন করে স্পর্শ করত না তাকে। সেলিমকে উপুড় কবে ঘুম দেবাব জন্য কানেব ওপব থাবড়াত আস্তে আস্তে।

'সলিমটা বড হইবে, ভাতেব থালা মাথাত করি নিয়া যাইবে মাঠে। তোমবা কাজ করিবেন .'

কিন্তু একের পর এক মামলায় হেবে গিয়েছিল মঈন। নিজের হাতে হালচাষ শুরু কবেছিল ও। সারাদিন ক্ষেতে খাটত, সন্ধেবেলা চলে যেত ভিন গাঁয়েব দেওনিয়াব সঙ্গে সলা-পবামর্শ কবতে। যত হেরে যাচ্ছিল তত বদরাগি হযে উঠছিল মঈন।

'কোম্পানি আইন করোছে। কিন্তু আইনটা আমার হকেব আইন, না বে-হকেব আইন?'

ঘোলাটে চোখে গলার শিরা ফুলিযে বকাবকি কবত অন্য আধিযাবদেব সঙ্গে। বাইবের ঘবে মাটিব মেঝেতে পা ছড়িতে বসত ওবা। তামাক খেত, কাশত আব চিংকাব কবত বেসামাল হযে। অন্দবেব ভেতব থেকে শোনা যেত ওদেব তকবাব, ঝগডা।

সেবাব ধান কাটাব সময এল। একলা সব ধান কেটে তোলা যায না বলে বেহাবি ক্ষেতমজুরদেব সঙ্গে প্রতি বছর চুক্তি করত মঈন। তারা বাড়িতে থাকত চৌদ্দ-পনেব দিন। চাব-পাঁচ জনের জন্যে বেশি করে ভাত বান্না করতে হত সেলিমেব মাকে। প্রতি বছরের মত সেবারও তাবা এসেছিল কাজের চুক্তি করতে। কিন্তু ধমক খেয়ে ফিবে গেল। এ বাড়িব খোলানে ধান উঠল না এবার, কবম আলির খোলানে সব ধান পৌছিযে দিযে এল মঈন। সেইখানে ভাগযোগ করে ন্যায্য পাওনা নেবে কবম আলি।

দাওয়ার ওপব কপাল ঠুকে ঠুকে নিঃশব্দে কেঁদেছিল সলিমের দাদি—'হায় গে সর্বনাশ! মাথাটা তোর কাটা গেল্ ..'

বাস্তুটুকু ছাড়া যে কয বিঘা ছিল মঈনুদ্দিনের, তাও নাকি গেছে। সে আধিয়ার হয়ে গেছে করম আলির।

এক পহর রাত পর্যন্ত করম আলিব খামারে বেগার দিত মঈন, ঝাড়াই সাফাই করত, কাজ না থাকলে পাটেব দড়ি পাকাত বসে বসে। তার পর বাত্রে যখন ও পুবনো ভাঙা অন্ধকার ঘরে ফিরে আসত শুকনো চেহাবা নিযে তখন ওকে দেখে ভয হত কেমন।

'কত খাটিবেন তুমি একা?'

পিদেনটা উশকিয়ে উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল সলিমের মা। মঈন উত্তর দেয় নাই।

'কহছি কি, ক্ষত্রিয়-বিটিছোয়াগুলাও তো খাটে। হামারা গরিব মানুষ হছি, সলিমেব বাপ, হামাদের লাজ সরম নাই। হামরাও মাঠে খাটিমু—'

প্রস্তাব শুনে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল মঈন। মুসলমানের বাড়ি নয় এটা? প্রধানদের ঘরের সম্মান-ইজ্জত নাই একটা? বাদশা ফকিব হতে পারে—কিন্তু এ বাড়ির বৌ তাই বলে ইজ্জত খুইয়ে ক্ষেতে খাটবে পুরুষের সঙ্গে?

প্রাক্তন সচ্ছলতা হারিয়ে বুকের ভেতর একটা আহত জায়গা লুকিয়ে রাখত মঙ্গন, সেইখানে হাত পড়েছে। একটা ক্রুদ্ধ সন্দেহে এক মুহূর্তে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে মঙ্গন।

'কাম করবু তুই? পরপুরুষের মুখ না-দেখিলে যে তোর সুখ নাই! হামাক দরদ দেখাবার চাস যৈবনের গরবি? টের পাছি বিস্তর দিন—'

গলার শিরা ফুলিয়ে কুঁজো হয়ে চিৎকার শুরু করে মঙ্গন। একবার ছুটে এসে হিঁচকা টানে সেলিমকে ছিনিয়ে নেয় মার কোল থেকে। আবার দূরে সরে গিয়ে চিৎকার করে। কেমন একটা কাতর যন্ত্রণা নিষ্ঠুর মোচড় দেয় গলার আওয়াজে। 'ঘর থিকা বারাবার চাস তুই!'

'না-মারো সলিমের বাপ্'—ভয়ে মুখ শুকিয়ে অস্ফুটে মিনতি করেছিল সলিমের মা।

চওড়া বনেদি উঠোনের ওপর প্রদীপের ছায়াটা কাঁপছে দপ দপ করে।

দূরে ভাঙা ফাঁকা অব্যবহৃত ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে কালো হয়ে। দশ হাজার বিঘা মাঠ থেকে ঝিঁঝির একঘেয়ে শীতার্ত শব্দ মিশে যায় মঙ্গনের কাঁপা চিৎকারের সঙ্গে।

'হামাক মারে নাই? হামাক মারে নাই মঙ্গনের বাপ? পুব মুখে না যাযা হালের গরুটা পছিম মুখে যাবার চাহে। না মারিলে অঁয় বুঝিবে?' কি জানি কেন, খ্যানখেনে গলায় বিড় বিড় করে বকতে শুরু করেছিল সেলিমের দাদি।

তারপর আকাল এল দেশে। একটানা দশ হাজার বিঘা জমির ধারে মাদার গাছের তলে কয়েকটা সাঁওতাল পরিবার এসে ডেরা বেঁধে রইল কয়েক দিন। তারপর চলে গেল আবার

'কুন ঠাঁই যাবে তোমরা?' ঘর ছেড়ে দু-পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসেছিল সলিমের দাদি।

'উত্তরে যাছি – চা-বাগানের কাম আছে—' দলের ভেতর ভাসা ভাসা উত্তর দিয়েছিল অনিচ্ছায়।

বাঁশঝাড়ের ওপাশে মুসলমান আধিয়ারদের দুটো ঘর ফৌত হয়ে গেল একেবারে।

কর্জা বন্ধ করে দিলে করম আলি।

বর্ষা মাসটা কাঁঠাল খেয়ে চলেছিল, বর্ষার পরে হাতের চুড়, নাকের সোনা, কোমরের গোঠ সব খুলে দিতে হল মঙ্গনের হাতে।

খুলে দেওয়ার সময় বড় বড় চোখে মঙ্গনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সলিমের মা। তা দেখে নিষ্ঠুরভাবে তেড়ে এসেছিল মঙ্গন—'কি দেখ জুল জুল করি? কি দেখ তুই?'

তারপর বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিল ও—'দেখিমু আবার, যাউক এ বৎসরডা, মামলায হামার হক, কি তার হক—'

বর্ষার পরে মড়ক লেগেছিল গাঁয়ে। দুদিনের জ্বরে মরে গিয়েছিল বাচ্চা সেলিম। কাঁথা ঢাকা হয়ে বহুক্ষণ পড়ে রইল ও। হাত দুটো মুঠ হয়ে আছে, ঠাণ্ডায় বেঁকে গেছে মুখটা। দু-একজন লোক ছুটল। কাফন এল। গোর দিতে নিয়ে গেল মঙ্গন নিজে।

তখন ধুলোর ভেতর লুটোপুটি করে কেঁদেছিল সলিমের মা। মঙ্গনের পেছু পেছু গিয়েছিল তামাক বেড়া পর্যন্ত। সেখানে চিৎকার করে আছড়ে পড়েছিল মাটিতে।

এক-একজন করে লোক জুটেছিল কান্না শুনে। যে-কয়ঘর লোক ছিল মেয়ে-পুরুষে তারা এসে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে তাকিয়ে ছিল নিষ্প্রাণ চোখে। মাঝে মাঝে কি মনে করে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল চিন্তিতভাবে।

'না কাঁদো, না কাঁদো, কি করা—'

রাত্রে ঘর থেকে ছুটে বেরতে চেয়েছিল সলিমের মা। কবরের কাঁচা মাটির ওপর কাঁটা দেওয়া আছে তো খস খস শব্দ হচ্ছে—হয়ত মাটি খুঁড়ে সলিমকে টেনে বার করছে শেয়ালে—

সান্ত্বনাতে নয়, সলিমের মার কান্না থেমে গিয়েছিল প্রচণ্ড চাষাড়ে এক ধমকে।

'দুনিয়ার মানুষের সামনে উদলা হয়ে কাঁদিস তুই? পরধানের বাড়ির বৌ—। কতো, ভাঙ্গি, কতো কাঁদা দেখি মুই আজ—'

বিমূঢ় আতঙ্কে একেবারে চুপ করে গেল সলিমের মা। নোংরা ভোঁতা একটা কাঠ তুলে নিয়ে এলোপাথাড়ি বাড়ি মেরে চলেছে মঈন। নুরের দুদিকে সারা গালে খোঁচা খোঁচা কর্কশ দাড়ি। শুকনো পুরু ফাটা ফাটা ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে একটু। থ্যাবড়া নাকের দুপাশ দিয়ে গালের চামড়া কুঁচিয়ে নিষ্ঠুর হয়ে বেঁকে গেছে।

এক বছর, দু বছর, তিন বছব—পর পর কেটে গেছে তারপব, আকালের বছব শেষ হতে চায না কিছুতে। প্রতি বছর মাঠে ধান পাকে, সে ধান ফুবিযে যায করম আলির কর্জা শোধ দিতে। হাটে কাপড় নুন দিযাশালাইযের দব কমে না একটু।

পহব বাত পর্যন্ত কবম আলিব বাড়িতে বেগার দিযে হন্যে হয়ে ফিরত মঈন, দাওযায পা ছড়িযে বসে নিজেব মনে বকাবকি কবত একতবফা, মাঝে মাঝে ছুতো কবে এগিযে আসত সেলিমের মাব দিকে। মঈনেব মুখেব দিকে তাকিয়ে টেব পেত সেলিমেব মা। নিঃশ্বাস বন্ধ কবে কাঠেব মত স্থিব হযে অপেক্ষা করত। মাব খাওযাব পব ঝিম ধবে বসে থাকত কিছুক্ষণ, তারপব যিবে যেত গেবস্থালি কাজে।

'বেটাক খার্মস, এলায তুই মবিবু'—মাব খেতে দেখলেই খ্যান খ্যান কবে একটানা বকতে শুরু কবত সলিমেব দাদি।

একদিন বাত্রে ফিবে এসে দাপাদাপি কবে বেড়াল মঈন—'হামাক শোনায। হামাক শোনাস কেনে? পাথব ইট বাখিছে, লাঠিযালওলাক খাশি- ভাত খিলাইবে—এত কথা তোব হামাক শোনাস কেনে?'

'কি কহসেন?'

'কবম আলি—কবম আলি। কেনে, ঘুবি বেড়াছে না গবিবগুলো? লুটপাট করি ধান নেয কি না নেয়—তা হামাক শোনাস কেনে?'

সেইদিন মঈনের মুখেব দিকে তাকিয়ে একটা বহস্যাবৃত আশঙ্কায বুকেব ভেতব হিম হযে এসেছিল সলিমেব মা-ব। মাব খেতে হবে বলে নয—মাব খাওযা সহ্য হযে গিযেছিল ওব। অন্য কি-একটা অপবিচিত ভয়ে হাঁফ ধবেছিল বুকেব ভিতব।

দশ হাজাব বিঘা জমি। কালো মেঘেব মত একটানা ধানে ছেযে গেল। অঘ্রানের শুরুতে হলুদেব ছোপ পড়ল জাযগায জাযগায, কিন্তু ধান কাটাব সময যত এগিযে আসতে লাগল, তত যেন ক্ষিপ্ত হযে উঠতে লাগল মঈন। যাকে সামনে পেত, তার ওপবেই ঝাঁপিযে পড়ত ও। একদিন গাঁয়েব সমস্ত আধিযার এসে জুটল ওর বাহির বাড়িতে। মাটির উপব বসে বসে তামাক খেল, কাশল আর চিৎকাব করল এলোমেলো।

'ধান কাটি নিজের খোলানে তুলিবার চান, কিন্তু আইনটা কুনঠে পালি তুই?'

'ইটা আমার কৃষকের আইন।'

'হাঁ, ইটা হামারই আইন—'

'লাঠিয়াল আনিছে। কালো মাথা লাল করি দিবে। কিন্তু হামাক শোনায় কেন এত কথা?'

'ইটা হামারই আইন। দেখিবু শক্তি'—

অন্দরের ভেতর থেকে সলিমের মা আব সলিমের দাদি জেগে বসে থাকত কান পেতে। বুক টিপ টিপ করত ওদের।

পরদিন থেকে দল বেঁধে ধান কাটা শুরু করে দিল ওবা।

ঘরের সামনেকাব তামাক ক্ষেতেব বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দেখা যায় দশ হাজাব বিঘা জমিব ধান পেকে শুয়ে পড়েছে মাটিতে। ধানক্ষেতেব মধ্যে কর্মবত আধিযার কৃষকদেব কালো কালো মূর্তিগুলো বিন্দুর মত নড়ে। ধানের আঁটি মাথায় ক্ষত্রিয মেয়েরা আল বেযে হেঁটে আসে নিজেদের খোলানেব দিকে।

নিজেদের খোলানে ধান তুলবে আধিয়াররা। কৃষকের ন্যায্য বিচার হোক। ন্যায্য বিচার অনুসারে ভাগ হোক ধানের। অবাক লাগে সমস্ত জিনিসটা। ঠাহব হয় না কি হচ্ছে। শুধু অনেক দিনকার চাপা পড়া কি যেন নাড়া খেয়ে ওঠে বুকের ভিতর।

সলিমেব দাদি বিড় বিড় করে বকে, আর অকারণে ঘোবাফেবা কবে ধানেব পুঁজের কাছে। প্রধানদের বাড়ির পুরনো সচ্ছলতার স্মৃতি আছে প্রশস্ত খোলানটায, সহজে ভবাট হতে চায় না, নবম মাটিতে ইঁদুরের গর্তগুলো বুঁজিয়ে বুঁজিয়ে নিকিয়ে বেখেছে সলিমেব দাদি।

'মুই বুড়ি হছি কি না হছি? এইটা কথা শুনিবু মুই আজ'।

'বুড়ি হচ্ছেন তো কি করিবেন?' জিজ্ঞেস করেছিল সলিমেব মা।

'মুই বুড়ি হছি তো হামাব সবম কবে? মুই যায়া ধান আনিবু মাথাত করি—'

বারণ না শুনে, আপন মনে বকতে বকতে বুড়ি চলে গিযেছিল ক্ষেতের দিকে, ক্রোশ খানেক দূবে যেখানে ধান কাটছে মঙ্গনরা। .

এমন সময় হাঁক দিতে দিতে এল ওবা। একদল সিপাহি, একদল চৌকিদাব, দুজনে হাতে বন্দুক, বাকি সবার হাতে লাঠি। ভাড়াটে লেঠেলও ছিল একদঙ্গল, করম আলিকে খুশি কবাব জন্য লাঠি ঘুবিযে ঘুবিযে আস্ফালন কবছিল ক্রমাগত। সবাব পেছনে ঘোড়ায চড়ে এসেছিল বুড়ো কবম আলি জোতদাব নিজে। খালি গাড়ি নিযে এসেছে দুটো, 'ধান চাপাও গাড়িতে—'

ঘোমটা টেনে দবজাব পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণস্ববে আপত্তি কবেছিল সলিমেব মা। ধানেব পুঁজ-ভেঙে ছত্রখান করছিল যখন তখন এক সময় বেবিযে এসেছিল উন্মাদিনীব মতো— 'ধান নিবেন কেনে তোমরা—কেনে নিবেন—'

ধানের পুঁজ দুই হাতে জাপটে ধবে মবিযা হয়ে শুযে পড়েছিল সেলিমেব মা।

মঙ্গন এসে পৌঁছবাব আগেই আরো অনেকে এসে জুটেছে। ধানেব পুঁজ ভেঙে ছড়িযে বযেছে মাটিতে, কযেকজন তা কুড়িয়ে এনে স্তূপ করে বাখাব চেষ্টা কবছে আবার, ধান নিযে যেতে পারে নি ওবা। অত্যাচার করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে শত্রুদের।

মেয়ে আব পুরুষের ভিড়ে মাঝখানে হতভম্বেব মতো বসে আছে সেলিমের মা। কাপড় চোপড় এলোমেলো ছেঁড়াখোঁড়া। আব্রুর বালাই নেই। শবীবেব কয়েকটা জায়গায় মাটি লেগে আছে, কয়েকটা জায়গায় রক্ত চোঁয়াচ্ছে টিপ টিপ করে।

'হায়রে বাপ্—'

মঙ্গনকে দেখে অস্ফুট কোলাহল করে এগিয়ে এল সবাই। কি হয়েছিল, কারা হানা দিয়েছিল, সলিমের মার সাহায্যে ছুটে এসেছিল কারা, সঙিনেব খোঁচা খেযেও কেমন করে ধান আটকিয়েছে—তাই বললে, উল্টোপাল্টা এলোমেলো কবে। অনেক রাত পর্যন্ত মঙ্গনের বাড়িতে রইল ওরা, তারপর চলে গেল।

অন্ধকার নেমেছে চারদিকে। পুরনো নিঃসঙ্গ বাড়িটা নিঝুম হয়ে আছে আশঙ্কায়। চওড়া আঙিনা পেরিয়ে একটা অব্যবহৃত ভাঙা ঘরের কোল ঘেঁসে জোনাক জ্বলছে কয়েকটা। মাঠ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার টানে মাঝে মাঝে ভেসে আসে শিশির-ভেজা পাকা ধানগাছের তীব্র গন্ধ।

ভীত অস্বস্তিতে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকায় সলিমের দাদি আর অপেক্ষা করে মঙ্গনেব মুখেব দিকে তাকায়।

অনেকক্ষণ পবে শীর্ণভাবে জিজ্ঞেস করে সেলিমের মা—'তুমি মাবিবেন না হামাক—'

'কেন মারিব মুই? কেনে বাপুবে—' মঙ্গনের গলার আওযাজ ভেঙে আসে অসহ্য যন্ত্রণায।

'মোসলমানের বিটিছোয়া। . বে-ইজ্জত কবি গেল ডাকাতেবা '

একটা বিচিত্র আবেগে কাঁদতে শুরু করে সেলিমের মা। রুক্ষ চওডা হাত দিয়ে আনাড়ির মতো সান্ত্বনা দেবাব চেষ্টা করে মঙ্গন।

'না কাঁদো সলিমেব মা। চুপ কবো—'

'সলিম . সলিমটা মরি গেল্ '

কি বলতে গিয়ে গলায আটকিয়ে যায়।

পিকুর ডায়রি

সত্যজিৎ রায়

আমি ডাইরি লিখছি। আমি আমার নিল নতুন নিল খাতায ডাইরি লিখছি। আমি আমাব বিছানার উপর বসে লিখছি। দাদুও ডাইরি বোজ লেখে কিন্তু এখন না এখন অসুক কবেছিল তাই। সেই অসুকটার নাম আমি জানি আর নামটা করোনানি থমবোসি। বাবা ডাইবি লেখে না। মাও ডাইরি লেখে না দাদাও না খালি আমি আর দাদু। দাদুর খাতাবচে আমাব খাতা বড়। ওনুকুল এনে দিযেছে বল্লো কুড়ি পযসা দাম মা আগেই পযসা দিযেছে। আমি বোজ ডাইবি লিখবো বোজ যেদিন ইসকুল থাকে না। আজ ইসকুল নেই কিন্তু ববিবার না কিন্তু খালি আজ স্ট্রাইকেব জন্য ছুটি। প্রাই স্ট্রাইকেব জন্য ছুটি বেশ মজা এই জন্য। ভাগগিস লাইন টানা খাতা তাই লেখা বেকে যাচ্ছে না দাদা কিন্তু লাইন ছাডাই সোজাই লেখে আব বাবাতো লেখেই বাবার কিন্তু ছুটি নেই। দাদাবো নেই। মাবো নেই। মাতো কাজ কবে না আপিসে বাড়িতে খালি কাজ। এখন মা নেই মা হিতেসকাকুব সঙ্গে গেছে আব বলেছে আমায় একটা জিনিস একটা দেবে নিউ মাবকেট থেকে এনে দেবে। আজকাল মা খুব জিনিস দেয। একটা পেনসিল কাটাব একটা বিস্টাচ তাতে খালি তিনটেই বেজেছে একটা হকিস টিক আব একটা বল। ও আব একটা বই সেটা গৃম যেযাবি টেল তাতে অনেক ছবি। আজ কি আনবে তা সেটা ভগবান জানে হযতো বোধয এআবগানটান তাইতো বলেছি দেখা যাক। ধিংড়া একটা সালিখ মেবেছে এআবগান দিযে আমিও একটা চড়াই বোজ বসে বেলিংযে সেটাকে মাববো টিপ কবে দম কবে মবেই যাবে। কাল বাততিবে খুব জোবসে বম ফাটলো বাবা বল্লো বম মা বোল্ল না না গুলি বোধয় পুলিস-টুলিস বাবা বল্লো না বম আজকাল প্রাযই দুম দুম আওযাজ হয জালনা দিযে। ওই যে গাড়িব হৃন এটা নিশ্চই হিতেসকাকুব আমি জানি স্টেনডাড হেবাল তাহালে নিশ্চই মাই এলো।

* * *

কাল মা এআব গান দিলেন নিউ মারকেট থেকে সেটা হিতেসকাকু দিলো বল্ল পিকুবাবু আমি এটা দিলাম কিন্তু তোমাব মা কিন্তু না। হিতেসকাকু ঘডিব একটা ব্যান কিনেছে ঘডিব নামটা আমি বল্লাম টিসট আব হিতেসকাকু বোল্ল উহু টিসো শেসেব টিটা উচ্চাবণ হয়না তাই। আমার এআব গানটা খুব ভালো আব খুব বড় একটা কৈটোতে ছববা আছে অনেক একসোটারো বেসি। আমায় সিখিযে দিয়েছে হিতেসকাকু আমি মেবেছি এর্মনি আকাসে আব ওনুকুল চমকে গেলো। চড়াইটা কাল আসেইনি আজো আসেনি বদমাইস আছে কাল আসবেই আসবে আর আমিতো রেডি হয়ে থাকবো। বাবা আপিস থেকে এসে বল্লেন আবাব বোনদুক কেন মা বল্লেন তাতে কি বাবা বল্লেন এমনিতেই দুমদাম লেগেই আছে আবাব কেন বোনদুক বাড়িতে মা বোল্লেন তাতে কি হয়েছে বাবা বল্লেন তোমার কোনো সেনস নেই মা বল্লেন চেচামেচি আপিস থেকে এসেই কেন বাবা বল্লেন না বাবা হ্যা বাবা বল্লেন ইংরেজিতে মাও ইংরিজিতে। মা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক সিনেমার মত। আমি জেরি লুইস দেখেছি আর ক্লিনট

ইসটুড আরেকটা একটা হিন্দি সেটা মিলুদিদের সঙ্গে সেটায় ফাইটিং নেই এই যা বোধহয় কলমে।

* * *

আমার ফাউনটেন পেনে বাবার সবুজ কালিটা যেটা কুইং সেটা ভরেছি ড্রপা দিয়ে মার মিসটলের মার সবদি হয়ছিল সেটা দিয়ে। আজকে বাবাব টেবিলে লিখছি বসে বসে ডাইরিটা। টেলিফোন একটু আগেই কিবিং কিরিং কিরিং হল আব আমি দৌড়ে এলাম আব এসে হ্যাল বল্লাম ওমা দেখি বাবা বাবা বল্লেন কে পিকু আমি বল্লাম হ্যা আমি বাবা বল্লেন মা নেই আমি বল্লাম না মা নেই বাবা বল্লেন কোথায মা আমি বল্লাম মা হিতেসকাকুর সংগে সিনেমা বডদেব যেটা সিনেমা সেটা দেখতে গেছে তাই মা নেই বাবা বল্লেন ও বলে কড়াক কবে ফোনটা রেখে দিলেন আমি আওজ পেলাম। তারপব আমি একবার ডায়েল করলাম ওয়ান সেভেন ফোর আর তাতে টাইম বল্ল আমি টাইম মাঝে মাঝে সুনি কি যে বলে বোঝাই ছাই যায় না। আজ চড়াইটা এসেছিল। আমি জালনাব ধাবে এআরগান আর চডাইটা ঠিক এলো আমি দম করে মারলাম আর ছররাটা দেআলে ধিংডার বাড়িব দেআলে দেখলাম একটা ফুটো। চড়াইটা খুব ভিশন ভযপে উড়ে পালিযে গেলো। দাদা কাল ছাতে টিপ দাৰুণ টিপ ট্যাংকের উপর দইএব একটা ভাড ছোটো খুব সবচে ছোটটো ভাড রাখলো আব অনেক দূর থেকে টিপ কবে দম কবে আব ভাডটা টুকবো টুকবো কয়েকটা গ্যাবাব বাস্তায গিয়ে পড়ল যদি কারো মাথায় টাথায লাগে তাহলে হয়েছে আমি বল্লাম। দাদা অনেক বড আমারচে বাবো বছব তাই দাদার টিপ। দাদা কলেজে পড়ে আর আমি ইসকুলে তো। দাদা বোজ বাইবে বাব হয আমিতো বাডিতেই থাকি মাঝে মাঝে খালি সিনেমা দেখি আব সি এল টি একটা দেখেছি। দাদাতো কাল অনেক বাততিবে ফিরেছে আব তাই বাবাতো খুব বকলেন দাদাও খুব জোবসে বল্লো কথা আমাব ঘুম ভেঙ্গে গেছে এত জোরসে একটা তাই ভালো সপনো আর শেস হলই না। দেখলাম আমি দেখছিলাম টগবগ টগবগ খুব জোবসে যাচ্ছি ঘোডায আব ধিংড়া আমাকে ধবতেই পাবছে না আর হিতেসকাকু আমাকে নোতুন বোনদুক সেটা বিভলবার দিযেই বল্ল এটার নাম ফিসো আব দাদু একটা কাউবয় বলছে দাদুভাই চল যাই ভিকটোরিয়া মেমোরিযা আব তখনি সপনোটা ভেঙে গেল। এবার যাই একটু বাতরুমে।

* * *

কাল আমাদের বাড়িতে একটা পাবটি ছিল। কিন্তু আমার জন্মদিন না কিন্তু এমনি পাবটি। সবাই খালি বড়রা তাই আমি যাইনি খালি মাঝে মাঝে একটু খালি দেখছিলাম। খালি বাবার বন্ধু আর মার বন্ধু আব কিন্তু দাদারো বন্ধু না। দাদা নেই পবসু কিমবা তরসু থেকেই নেই তা জানি না কোথায়। দাদাতো পলিটিস করে তাই হোপলেস বাবা খালি খালি বলে আব মাও বলে। মাতো বাবণ কবে তাই আমি পাবটিতে যাইনা কিন্তু কাল তিনটে সসেজ খেয়েছি আব একটা কোকাকোলা। একজন সাহেব ছিল সে খুব জোবে হাসে হো হো হো হা হা হো হো হা হা হা আব আরেকজন মেমসাহেব। আর মিষ্টার মেনান আর মিসেস মেনান আর সিখ একজন নিশ্চই আমি পাগড়িতেই বুঝে গেছি। একবাব আমি ঘর থেকে শুনলাম খুব জোরে হাসল সবাই। একবার মা চলে এলো ঘরে আর এসে বাতরুমে গেল আর আয়নায় একবার দেখল আর একবার একজন আরেকজন মেয়ে বাতরুমে গেল আর খুব জোরে তার সেনটের গন্ধে একটা নতুন সেনট কিন্তু মার সেটা নেই। আরেকবার মা এলো আর বল্ল একি সোনা জেগে আছো ঘুমো ঘুমো আর আমি বল্লাম একা একা ভয় আর মা বল্ল কিসের ভয় বোকা ছেলে ঘুমো এগারটা বাজে চোখ বোজ আপনি ঘুম আমি বল্লাম দাদা কোথায় মা বল্ল ঢের হয়েছে ঘুমো বলে চলে গেল। বাবা কিন্তু আসেনি ঘরে বাবা এখন

বাবা মা এখন খুব ঝগড়া ইংবিজিতে করে আর মাঝে মাঝে বাংলা। কিন্তু পারটি তেতো ঝগড়াই না তাই পারটি ভালো পাবটিতে খালি ড্রিং আর একদিন একজন বমি করল মা বল্ল অসুক আমাকে কিন্তু ওনুকুল বলেছে মদ তাই। আমাদেব ফৃজেব ভিতর আছে আব খালি হোলে জল রাখে ঠানডা আব যখন গন্ধো থাকে মাঝে মাঝে মা তখন বকে সুখদেওকে বল্ল আচ্ছা করকে ধোতা নেই। আর সুখদেও বল্ল মেমসাব কেন বলে মাকে মা কি মেম নাকি আর মা কি সাহেব নাকি খুব মজার বেপারটা। তারপবত ঘুম এল কখন যে এসে যায় ঘুম কেউ জানেনা দাদু বলে মরে গেলেই নাকি লম্বা ঘুম আব খালি সপনো আর যা দেখতে চাই তাই সপনো খালি।

*　　　　*　　　　*

আমাব ডাইবিটা একটা জায়গায় যেখানে লুকিয়ে বাখি কেউ জানে না কিন্তু। সেটা আমাদের পুবোন গ্রামোফোন সেটা হাত দিযে দম দেয আব যেটা আর কেউ বাজায না কাবণ নোতুনটাতো ইলেকট্রিকে আর লং প্লেং বাজে তাই আর পুরোনটা বাজায না সেই সেটাব মধ্যেই ডাইবিটা আর তাই কেউ জানে না যে আমি ডাইবি লিখি। আমিতো অনেক লিখি তাই আমাব আঙুলটায একটু বেথা তাই মা যখন নোক কাটছে আমি তখন বল্লাম আঃ আব মা বল্ল কি হযেছে বেথা নাকি আমি বল্লাম না না তাহলে যে জেনেই যাবে মা আমি ডাইরি লিখি। ডাইবি দাদু বলেছে যে কেউ কাউকেই দেখাবে না খালি নিজে লেখে আব পড়ে খালি নিজেই আব কেউ না। আমাব ছববা আব বাইসটা আছে আমি শুনেছি কিন্তু চড়াইটা খুব বদমাইস আসেইনি আর। আমি ছাতে খালি ট্যাংকে গুলি মাবি টং টং আওযাজ হয আর ছোট ছোট ছোট গোল গোল গোল গোল দাগ হয়ে যায তাই তাহলে ভাবছি পাযরাই মাবব। পাযরারা চুপচাপ খুব বসে থাকে আর হাটে আব বেশি ওড়েনা। দাদা পাচদিনতো আসেনি দাদার তাই ঘবটাই খালি আব আলনায একটা সাট সেটা সাদা আব একটা নিল প্যাণ্ট ঝুলছে খালি আর বইটই সব। কাল আমি যখন বুদবুদ কবছিলাম খুব বড একটা তখন ঠিক শুনলাম হুন পেলাম আব বল্লাম হিতেসকাকু আব মা বল্লেন ডাবলিং তুমি ধিংড়াব বাডি যাওনা আজ ধিংড়ার তো ছুটি। আমি বোল্লাম ধিংড়া আমাব কানেব পাশে যেটা ঝুলপি খালি উপরে টানে আর বেথা লাগে তাই যাবো না মা বোল্লেন তাহলে ছাতে এআর গানট নিয়ে আমি বোল্লাম তাহলে পাযবা মাববো মা বল্লে ছি ছি ছি তা কেন এমনি মারো আকাসে যাও আমি বল্লাম ধেত আকাসে আবাব কোথায টিপ কবব মা বোল্ল তাহলে ওনুকুলের কাছে যাওনা আমি বল্লাম ওনুকুলতো তাসই খেলে আর দাবোআন আব সুখদেও আরেকটা লোক সব তাস খেলে আমি তাই কোথাও যাব না। আব মা তখখুনি ঠাস করে একটা মাবলো জোরসে তাই আমি খাটের ডানডায় আমার ধাককাই লেগে গেল। আমি একটু কানলাম কিন্তু বেসি না একটু আর তারপর তো মা চলে গেলো আর আমি আবেকটু কানলাম বেশি কিন্তু না আর তারপর ভাবলাম কি তাহালে করি। তখন তারপর ভাবলাম ফৃজে গিয়ে দেখা যাক কি আছে তাই দেখি দুটো লেডিকেনি আর একটা সেটা টৃংকাব কৃম রোল সেটা সব খেলাম তারপর তো বোতল থেকে ঢক ঢক ঢক একেবারে গেলাসেই ঢালিনি। তারপর একটা ইলাসটেট উকলি সেটা বাবার টেবিলে দেখলাম তাতে ভালো ছবিটবি নেই খালি একটা ডনেল ডাক। আর তারপর বারান্দায় দৌড়ালাম আর একটু হাইজাম একটা মোড়ার উপর দিয়ে একটা আগে ছোট সেটা খুব সহজ আব তারপর বড়টা সেটায় একবার খ্যাচ করে লাগল তাই দেখলাম ছোড়ে গেছে আর একটু একটু রক্ত তাই বাতরুমে তো ডেটোল ছিল ডেটোল লাগে না কিন্তু টিনচারাইডিনে লাগে তাই ডেটোলই দিলাম। আর তখখুনি দৌড়ে দেখলাম জেঠ প্লেনটা খুব জোরসে চলে গেল বাবা যখন গেল

জেঠে তখন দমদমে আমি গেলাম আর বাবা লানডান থেকে একটা ইলেকটিক সেভা আনল সেটা নিজের আর আমার জন্যে যুতো দুটো আর একটা আসটোনট সেটা খেলাব কিন্তু খুব বড সেটা তো রনিদা খাবাপি করে দিল। তারপর যাই আর কি একটু অংকটংক কবি।

*   *   *

আমি আবার আজকে ডাইরি লিখছি। আমার ছরবা ফুরিয়ে গেছে আর পায়বাটাব গাযে কেন লাগলো না নিশ্চই বোন্দুকটা বাজে তাহালে। আমি ভাবছি এটাকে ফেলেই দেবো তাহালে। দাদাব ড্রআরে আজ একটা দেখলাম টেক্কা দেশলাই তাহালে দাদাতো সিগারেট খায নিশ্চই নাহালে কেন দেশলাই। কিন্তু দাদা আসেনি কোথায গেছে ভগবান জানে কি বোধয় ভগবানো জানে না। যদি এবাব মা যদি যায় তাহলেই মুশকিল একবার কাল রাততিবে মা বল্লেন যে চলে যাবেন বাবাকে আমি তো দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম একটু তাই জেগেছিলাম চোখটা জোরসে বন্ধো কবে তাই মা জানে পিকুতো ঘুমোচ্ছে আব বাবাও ভাবছিলেন তাই তাই ওরা খুব জোবসে কথা বলছিলেন। এখন বাড়িতে আমি আর দাদু খালি আর ওনুকুল বোধয নিশ্চযই তাস খেলছে আব তাই বাড়ির ভিতরে আব কেউ নেই খালি আমি আর দাদু। দাদু নিচে থাকে দাদু ডকটার বেনারজিতো বলেছিলেন সিঁডি দিয়ে ওঠা না দাদুবত কনোবাবি থমবোসি তাই। দাদুর তাই একটা ঘণ্টা সেটা নিয়ে যদি টিং টিং টিং টিং কবলেই শোনা যায। আজ একবাব তাই শুনলাম দাদু বাজাচ্ছে তখন আমি জালনা দিযে থুতু ফেলছিলাম থুক থুক থুক যাতে অনেকদূব যায আব তখখুনি টিং টিং টিং শুনলাম আব তখখুনি বুঝলাম যে এটা দাদু তখন আমি আবো চারটে থুথু ফেললাম একটা পাচিলেব ওদিকে আব তাবপব ভাবলাম যে যাই দাদু ডাকছে। আব গেলাম সিঁডি দিযে দুম দুম কাঠেব তো সিঁডি তাই দুম দুম আওজ হয়। গিযে দেখি চুপচাপ দাদু শুযে আছে আব কিন্তু ঘুমোচ্ছে না তাই বল্লাম দাদু কি বেপার কিন্তু দাদু কিন্তু কিছু বল্লনা খালি উপবেব দিকেই দেখছে পাখাটাব উসা ফ্যানটার দিকে দাদুব ঘরেই খালি উসা সবইতো জিইসি আর তখখুনি আবাব টেলিফোনটা শুনলাম বাজলো তাই দৌডে এসে উপরে এলাম তখন অনেকবাব বেজেছে বোল্লাম হ্যালো আব শুনলাম মিস্টার সাবমা হায আমি তখখুনি বল্লাম সাবমাটারমা নেই হ্যায় বং নাম্বার বলে কড়াক করে রেখে দিলাম আব তারপব দৌডেতো হাঁপিযেছি তাই সোফায গিযে শুলাম আব পাটা তুলেই দিলাম মাতো নেই পাটা তুলেই দেখলাম ময়লা কিন্তু মা তো নেই। আর এখন আবাব আমাব বিছানাতে লিখছি ডাইবি আর পাতাই কিন্তু নেই এখন আব কেউ নেই খালি আমি আব দাদু আর একটা খালি মাছি আছে খালি খালি আসছে জালাতোন ভারি বদমাইস মাছিটা আর বাস এইবার পাতা শেস খাতা শেস বাস শেস।

আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া

রমাপদ চৌধুরী

আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিলো না। বড় জা জোর করে ঠেলে পাঠালো। বললে, 'নতুন, অত লজ্জা দেখাসনি। ঐ লজ্জা কবে করেই আমার সব হারিয়েছি, এখন তোদের দেখলে শুধু হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরি।' বড় জা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই বিয়ের পর যেদিন প্রথম আলাপ হলো, আমি বয়সের এবং সম্পর্কের মান রাখবার জন্য প্রণাম করলাম, সেদিন থেকেই বড় জা আমাকে 'তুই' বলতে শুরু করেছিলো। আর যেহেতু আমি ওর ছোট দেওরের বউ অর্থাৎ বাড়ির একেবারে আনকোরা নতুন বউ, সেই হেতু আমার নাম হলো, 'নতুন'। তা বড় জা বললে, 'দেখ্ নতুন, যা কিছু ফুর্তিটুর্তি এখন করে নে, এর পর তো সারাটা জীবন আমাদের মতো হাঁড়ি ঠেলতে হবে।' আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, অনভ্যাসের ঘোমটা টানতেও কেমন হাসি-হাসি পায়। তাই বড় জা-র খোলাখুলি কথাগুলো শুনে কেমন লজ্জা-লজ্জা করতো। কিন্তু বড় জা দমবার পাত্র নয়। তার দেওরটিকে বললে, 'ছোট্ ঠাকুরপো, নতুনকে নিয়ে পুরী কি দার্জিলিঙ কোথাও বেড়িয়ে এসো দিন কয়েকের জন্যে। ওই যে হনিমুন না কি বলে, আমরা কি ছাই জানি আজকালকার রীতিনীতি।' তা শুনে এমনভাবে হাসলো গৌতম, তাকালো আমার দিকে যে বেশ বুঝতে পারলাম অমন একটা ইচ্ছে ওরও যে না হচ্ছে তা নয়। গৌতমের গোপন ইচ্ছেটা বুঝতে পেরে — না, আজকালকার মেয়েদের মতো ওকে নাম ধরে ডাকতে আমি পারি না, পুরোনো দিনের বউদের মতোই আড়েঠারে বুঝিয়ে দিই, তবু সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে ওর নাম ধরে ডাকতে, নামটা মুখের মধ্যে লোফালুফি করতে বেশ লাগতো। কিন্তু বড় জা-র সামনে তো আর নাম বলতে পারি না। তাই বললাম, 'ওর ইচ্ছে হয় যাক্, আমি যাবো না।' বড় জা রাগ দেখিয়ে বলল, 'ওরে আমার লজ্জাবতী লতা, যাবার ইচ্ছে নেই! যা বলছি শোন নতুন, দুটিতে দিন কয়েক কোথাও গিয়ে —'

ঠেলেঠুলেই একরকম পাঠিয়ে দিলে। আমি আর গৌতম এসে উঠলাম পুরীর একটা হোটেলে। একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে। সমুদ্র আমি আগে তো কখনো দেখিনি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল! মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন! এমন একটা রূপের পৃথিবী আছে আমি জানতামই না? আমার বুকের মধ্যেও যেন খুশির ঢেউগুলো গুরগুর করতে করতে ফুর্তিতে ফেটে পড়তে লাগলো। ছেলেমানুষের মতো আমার নাচতে, গাইতে, ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো ঢেউগুলোর কাছে। কিন্তু তা না করে আমি গৌতমের উপর খুশী হয়ে উঠলাম, তাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলাম। আর ওর সুন্দর চোখজোড়ার দিকে, চোখের তারা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেমন ভাবতে ভালো লাগলো, ওর চোখ দুটো যেন সমুদ্রের মতো নীল, সমুদ্রের মতো গভীর, সমুদ্রের মতো বিশাল। আনন্দে আহ্লাদে ওর চোখের দুটি সমুদ্রে ডুবে যেতে ইচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো।

ও বলল, কি দেখছো অমন করে? ওর বোধ হয় একটু অস্বস্তি লাগছিলো। লাগবারই কথা। কেউ একজন হাতে চিবুক রেখে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগবে না?

কিন্তু আমি কি করবো। আমাকে তখন দুষ্টুমিতে পেয়েছে। বললাম, 'সমুদ্দুব দেখছি।'

ও কেমন অপ্রতিভ হলো, হাসলো। বললে, 'আমি কি সমুদ্র নাকি?'

আমি আরো দুষ্টুমি করে সুর দিয়ে গেয়ে উঠলাম, 'তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি।'

ও তিনটে আঙুলের হালকা থাপ্পড় দিলে আমার গালে। আমি খিলখিল করে হেসে উঠেই ছুটে বেবিয়ে এলাম ঘর থেকে। বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে সমুদ্রের ধারে, বালির ওপর যেখানটাতে ঢেউগুলো ফেটে ফেটে ফেনা হয়ে পড়েছে, সেখানে।

না, ঠিক অত দূর নয়। ঢেউয়ের অত কাছে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করলো। আমি তো তার আগে সমুদ্র দেখিনি। তাই অমন সুন্দর ঢেউগুলোকে যেমন ভালোও লাগলো তেমনি কাছে যেতেও কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলাম। অচেনা মানুষের কাছে যেতে হলে যেমন ভয়-ভয় কবে, তেমনি। ঠিক কেমন, বলবো? ফুলশয্যাব বাতটার মতো। ভালোও লাগছে, মনেব মধ্যে বেশ একটা খুশিব গুনগুন, আবাব অচেনা মানুষ গৌতমের এত কাছে যেতে হবে ভেবে কেমন এক ভয়-ভয় ভাব।

হঠাৎ চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি কি গৌতমও এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে আমার পাশটিতে, গা ঘেঁষে। আর আমাবই মতো তাকিয়ে আছে সমুদ্রেব দিকে।

ছোট ছোট এক-একটা দল পাড ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলো। মেয়ে পুরুষ, ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে। যেই ঢেউ এসে পডছে, দু-একজন ছুটে যাচ্ছে সাদা ফেনায পা ডোবাতে। ওদিকে জেলেদেব ডিঙির সাবি পড়ে আছে বালিব ওপব, আব বালিব ওপর বসে বসে বড বড জালগুলো মেবামত কবছে জেলেরা।

— এই, ওবা কি কুড়োচ্ছে, কি? আমি জিগ্যেস কবলাম।

ও বললে, ঝিনুক।

ও মা, তাই নাকি! আমিও ধীবে ধীরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোট বড় নানারকমেব, সাদা আর বঙিন ঝিনুকের রাশি এসে পড়ছে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ সবে গেলেই সেগুলো চিকচিক কবচে বালির ওপর। আমি দাঁড়িযে দাঁডিযে দেখলাম। কুড়োতে কেমন লজ্জা হলো। আমার বয়েসী অনেক মেয়েই ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। আমি কেমন লজ্জা পাচ্ছিলাম। কাবণ যারা সামনে দিযে হেঁটে যাচ্ছিলো, তারা ফিবে ফিরে তাকাচ্ছিলো আমার দিকে। মেয়েরাও। আমি দেখতে খুব সুন্দর, আমাব চোখ দুটো টানা-টানা, আমার ঘাড়টা কি চমৎকাব, আমার ফরসা সুডোল হাত দেখলে নাকি হাত বোলাতে ইচ্ছে করে, এমনি সব কথা বলে ইস্কুলের বন্ধুরাও আমাকে খেপাতো, কলেজের মেয়েবা প্রশংসা কবতো। কিন্তু সমুদ্রের পাড় দিয়ে যেতে যেতে ওরা যখন বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো তখন বেশ বুঝতে পারছিলাম রূপ দেখছিলো না ওবা। বয়স-হওয়া দুটি মহিলাব হাসি দেখেই বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে ওরা বুঝতে পারছিলো আমাদের সবে বিয়ে হয়েছে। ও ঠিক বোঝা যায়, আমি নিজেও তো কত মেয়েকে দেখেই ধরে ফেলতাম। বিয়ের পর চেহারাটাই কেমন অন্যরকম অন্যরকম লাগে। তা ছাড়া সিঁথিতে সিঁদুরও বোধ হয় একটু বেশী দিয়ে ফেলতাম তখন। একটু বেশী দূর অবধি।

ওরা তাকাচ্ছিলো বলে লজ্জা নয়, সবে বিয়ে হয়েছে বলে লজ্জা নয়, বরং মজাই লাগছিলো। তবে লজ্জা হচ্ছিলো ঝিনুক কুড়োতে, ওদের সামনে ওদেব মতো ঝিনুক

কুড়োতে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। একসময় দেখলাম, নিজেরই অজান্তে কখন হাসতে হাসতে আমিও ঝিনুক কুড়োতে শুরু করেছি, ঢেউয়ের ফেনায় পা ডুবিয়ে হাঁটছি। আর ঢেউ লেগে কাপড় ভিজে যাবে বলে কাপড়টা এক বিঘত তুলে ধরেছি। লজ্জা দূব হযে গেছে, ভয় ভেঙে গেছে তখন।

হাঁটতে হাঁটতে একটু অনুভবেই বুঝতে পারছিলাম যে গৌতম পিছন পিছন আসতে আসতে আমার ফরসা পা — পায়ের উন্মুক্ত অংশটুকুর দিকে তাকাচ্ছে।

এক বিঘত পা উন্মুক্ত করে হাঁটা এক জিনিস, আর সমুদ্রে স্নান করা অন্য। স্বামী বলেই তো বেশী অস্বস্তি। তা ছাড়া অত লোকের সামনে। না বাবা, আমি সমুদ্রে স্নান করবো না।

পবেব দিন সকাল থেকেই নুলিযাটা পিছনে লাগলো। — সমুন্দবে নাহাবে না দিদি।

ও বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি কি নতুন নাকি এখানে! আরো কতবার এসেছি।

সত্যি, গৌতমের ওপর এত হিংসে হচ্ছিলো। ও কতবাব এসেছে, অথচ আমি কিনা এই প্রথম। এমন চমৎকার জাযগা ছেড়ে কোথায় ছিলাম এতদিন? যাক্, এসেছি যখন চোখ ভবে দেখে নিই, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই।

যেখানটায় সকলে স্নান করছিলো সেইখানটায় এসে বালির ওপর বসলাম দুজনে। স্নান করতে কবতে সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ঢেউ লেগে বালিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মেযেরা, দু-একজন পুরুষ ঢেউয়েব মাথায় লাফাতে লাফাতে অনেক অনেক দূর অবধি চলে যাচ্ছে। আব তাবও ওদিকে অনেক দূবের অথৈ জলে কালো-কালো ক্ষুদে-ক্ষুদে কযেকটা ডিঙিতে কবে মাছ ধরছে নুলিয়াবা। পাড থেকে কেউ বা ডিঙি ভাসাবার চেষ্টা করছে, বাববাব ফিবে আসছে ঢেউ লেগে।

ও বললে, কি, সমুদ্রে স্নান কববে না?

আমি আতঙ্কে হাত নেড়ে বলে উঠলাম, না বাবা, অত শখ নেই আমার।

— আরে দূর, ভয়েব কিছু নেই। আমি নিয়ে যাবো তোমাকে, দেখো। গৌতম বললে — এমনভাবে তাচ্ছিল্যেব সঙ্গে বললে, যেন উনিও একজন নুলিযা, সমুদ্রেব সঙ্গে এত চেনাশোনা।

আমি মনে মনে বললাম, তোমাকেও আমি নুলিয়া না নিযে একা নামতে দেবো কিনা। বিয়ের পর বউয়ের কাছে সবাই অমন শিভালরি দেখাতে চায় গৌতমবাবু, আমি তা জানি।

মনে মনে এ কথা ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ ঠাট্টাব সুরে ডাকলাম, ও গৌতমবাবু!

ও ফিরে তাকালো।

বললাম, কি দেখছেন স্যার?

— সমুদ্র।

বললাম, উঁহু। আমি জানি।

— কি?

হেসে উঠে বললাম, বলবো না।

সত্যি, মেয়েরা যে কি করে স্নান করছিলো আমার নিজেরই অবাক লাগছিলো। কখনো বালিতে গড়িয়ে পড়ছে, কাউকে স্রোতের টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারো কাপড়চোপড় —

একজনের অবস্থা দেখে তো আমি আর গৌতম হেসে লুটিয়ে পড়লাম। বেচারা শাড়িখানা হাতে নিয়েই টুপ করে বসে পড়লো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে। কি করবে, জলের তোড়ে লাজলজ্জা রাখা দায়। আর কাপড়-জামা নামেই আছে, জলে ভিজে এমন অবস্থা, শরীরেব কিছুই চাপা-ঢাকা থাকে না। পুরুষগুলোও কেমন ক্যাটক্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখো।

আমি ইয়ারকির ছলে গৌতমের চোখের দিকে তাকালাম। — এই। কি দেখছো মশাই অমন ড্যাবড্যাব করে?

ও হাসলো। আর আমি ভাবলাম, ওদের মতো ওভাবে সমুদ্রের জলে নামতে পারবো না আমি এত লোকের সামনে। গৌতমের সামনে।

কিন্তু ইচ্ছেও যে না হচ্ছিলো তা নয়। এক একবার ভাবছিলাম, মন্দ হয় না। বেশ তো জলে লুটোপুটি খাওয়া যায়। বিয়ের আগে এই তো সেদিনও ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, আমরা দু বোন ছাদে গিয়ে ভিজলাম। তবে হ্যাঁ, নুলিয়া না নিয়ে নামতে পারবো না। ওদের মতো নুলিয়াটাকে হাত ধবতে দেবো না অবশ্য। মেয়েগুলো অমনভাবে নুলিয়াদের হাত ধবেই বা যাচ্ছে কেন ঢেউ কেটে কেটে! টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে, ভেসে যাবে, এই ভয়ে? তা একটু দূরেই নয় থাকবে নুলিয়াটা। না, এত দূর এসে সমুদ্রে স্নান না করে গেলে মনে খুঁতখুঁতুনি থেকে যাবে। বড় জা হয়তো জিগ্যেস কববে, হ্যাঁ বে নতুন, সমুদ্রে নেযেছিস তো বোজ? তাবপরও অবশ্য ইযারকি-ঠাট্টা করবে তা জানি। বড় জা অবশ্য বলেছিলো, আগে নাকি এসেছিলো একবার রথেব সময। ননদবাও। এবার ওবা যদি সবাই আসতো ভালো হতো। সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান কবা যেতো। বড জা বেশ ভালো মানুষ। সত্যি, আমি কত সুখী, কত সুখী। কাবো জীবনে যে এত সুখ থাকে বিযেব আগে কল্পনাও কবতে পাবিনি।

গৌতম হঠাৎ হেসে উঠলো হো-হো কবে। তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনে তাকাতেই আমিও হেসে উঠলাম। ভীষণ মোটা একটা লোক সমুদ্রে নামছিলো, প্রথম ঢেউ লেগেই কাত। ফুটবলেব মতো গডাতে গড়াতে ফিরে এলো বালিব ওপব হুমডি খেযে।

আবে, এব মধ্যে এত চডা বোদ উঠে গেছে? বালি তেতে উঠেছে।

— কি, নামবে না? গৌতম জিগ্যেস করলো।

আমি সায়ও দিলাম না, অমতও করলাম না। ভেতবে ভেতবে যে একটু ইচ্ছে না হচ্ছিলো তা নয। গৌতম বললে, চলো, তা হলে তেল তোয়ালে নিয়ে আসি, কাপডটা বদলে আসি।

উঠে পড়লাম। হোটেলেব নুলিযাটা আবাব সেলাম কবলে। — নাহাতে যাবে না দিদি?

বললাম, যাবো, দাঁড়াও।

গৌতম বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি একাই পারবো তোমাকে সামলাতে।

আমার অবশ্য নিজের জন্যে তত ভয় হচ্ছিলো না, ভয় হচ্ছিলো ওর জন্যেই। বললাম, থাক না একজন সঙ্গে। সবাই তো নুলিয়া নিয়েই নামছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো গৌতম, আমার কথাটাকে কোনো আমলই দিলো না। হেসে বললে, তুমি দেখছি সাজুন্তির চেয়েও ভীতু!

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম। কারণ আমাদেব দোতলার ঘরটিব পাশের সিঁড়ি বেয়ে তেতলার সেই বউটি, যার সাজগোজের ঘটা দেখে আমরা 'সাজুন্তি' নাম দিয়েছিলাম, তাকে নেমে আসতে দেখলাম। পিছনে তার স্বামী।

চোখাচোখি হতেই বউটি হেসে বলল, যাবেন না সমুদ্রে স্নান করতে?

কি আশ্চর্য, ওই বউটা — যে কাপড় ভিজে যাবে এই ভয়ে ঝিনুক কুড়োবার সময়েও ঢেউয়ের কাছে যেতো না, সেও চলেছে সমুদ্রে স্নান করতে? একটা সাদাসিধে শাড়ি পরেছে, গোলাপী রঙের টার্কিশ তোয়ালেটা বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধ অবধি ছড়িয়ে দিয়েছে সুছন্দ বুকের ওপর দিয়ে, এক রাশ ফাঁপানো চুলে ঢেকে গেছে সারা পিঠ।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি গৌতমের দিকে তাকালাম। চোখ সরিয়ে নিলে ও, আর বউটির প্রশ্নের জবাবে, হেসে বললে, তখন থেকে তো ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করছি।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে চটে গেলাম গৌতমের ওপর। আমি সমুদ্রকে ভয় পাই এ কথাটা বউটিকে না শোনালেই কি চলতো না? আর গৌতম বউটির দিকে অমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলোই বা কেন? না-হয় আমার চেয়ে একটু সাজগোজ বেশীই করে, দেখতে কি আমার চেয়ে সুন্দর?

বউটি এবং তার স্বামী হাসতে হাসতে নেমে গেল। আমি চুল খুলে কাপড় বদলে নেমে পড়লাম একটাও কথা না বলে। গৌতম পিছনে পিছনে।

নুলিয়াটা আবার ধরলো বেরুবার মুখে।

গৌতম বললে, না, না, লাগবে না।

আসলে ওর মনে প্রথম থেকেই একটা বাহাদুরি দেখাবার নেশা ঢুকেছিলো বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। ও যেন সব জানে, সব বোঝে, সব পারে। প্রথম প্রথম ওর এই ভাবটা আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। বেশ একটা নির্ভর করবার মতো মানুষ যেন। কিন্তু যেখানে সত্যিই ভয় আছে সেখানে এই বাহাদুরির কি দরকার। দু আনা পয়সা তো, তার বেশী আশাও করে না নুলিয়াটা। কিন্তু পয়সার জন্যে তো নয়, বরং পয়সা খরচ করতে পেলেই যেন খুশী হয় গৌতম। আসলে ওই অকারণ টাকা খরচ করার মধ্যেও যেন কি একটা বাহাদুরি লুকিয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারতাম, ও যেন আমার চোখে — তার নবপবিণীতা স্ত্রীব চোখে নিজেকে বড় করে তোলবার ফিকির খুঁজছে। কখনো অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করে, কখনো সমুদ্রকে তুচ্ছ করে, কখনো বা হোটেলের ঠাকুর-চাকবকে ধমক দিয়েও বোধ হয় আমার কাছে ওব মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করছিলো।

নুলিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে এসে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

গৌতম যখন ওকে তুচ্ছ করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিযে যেতে গেল, নুলিয়াটা তখন শুধু বললে, কারিণ্ট আছে বাবু।

কিন্তু কে শোনে তার কথা। গৌতম টানতে টানতে আমাকে তখন জলে নামিয়ে নিযে গেছে। ওর হাত ধরে ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুটা গিয়ে আর সাহস হলো না। ও যত এগিয়ে যেতে চায় আমি তত বাধা দিই। শেষে হাল ছেড়ে দিলে ও বললে, বেশ, তবে তুমি উঠে যাও, আমি একটু পরে উঠবো।

তখন ওর কথা আর কে ভাবে, নিজে পালিয়ে বাঁচতে পারলে হয়।

পাড়ে উঠে এসে চীৎকার করে বললাম, এই! বেশী দূর যেয়ো না।

কিন্তু বললেই কি আর শোনে। ঐ যে বললাম, ওর মনে তখন বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছে। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটেনি, এ সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন্ স্বামীর না হয়। ও তাই আমার কথায় কান দিলো না।

আমার অবশ্য যেমন ভয়ও করছিলো, তেমনি ভালোও লাগছিলো। সাজুন্তি ইতিমধ্যে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে, আর তার স্বামীটি স্নান করছে তখনো, কিন্তু নুলিয়ার হাত ধরে। তাকে দেখে আমি হেসেই ফেললাম। মেয়েমানুষেরও অধম, কি ভীতু রে বাবা ভদ্রলোকটা। মনে মনে ভয় পেলে কি হবে, গর্বও হচ্ছিলো গৌতমের জন্যে। এ একা-একাই কত দূর এগিয়ে যাচ্ছে দেখো।

একটার পর একটা ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিয়ে, কখনো ঢেউ ভেঙে পড়ার মুহূর্তে টুপ করে ডুব দিয়ে ও তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আমি চীৎকার করে ডাকলাম একবার, বোধ হয় শুনতে পেলো না।

এ কি, এত দূরে চলে যাচ্ছে কেন ও? এত দূর চলে গেছে তখন গৌতম, যেখানে আশে-পাশে আর একটিও লোক নেই।

সাজুন্তির স্বামী ততক্ষণে উঠে এসেছেন, আর বউটি গৌতমের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার স্বামীকে বললে, দেখো, দেখো উনি কত দূর গেছেন।

বউটির চোখের দৃষ্টিতে, গলার সুরে সপ্রশংস ভাবটুকু দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠলো আমার। সত্যি গৌতম যেন মুহূর্তের জন্যে নেপোলিয়ানের মতো বীর হয়ে উঠলো আমার চোখে।

কিন্তু সাজুন্তি আর তার স্বামী হোটেলের দিকে চলে যেতেই আমার বুকের ওপর একটা আতঙ্কের পাথর চেপে বসলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনে হলো, গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝি বা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই। হাত তুলে বারবার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যেন হাত তুলে চীৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচাও।

অত দূর থেকে চীৎকার এসে পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু সমস্ত শবীর যেন মুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠলো আতঙ্কে, ভয়ে। মনে হলো, গৌতম ভেসে যাচ্ছে, স্থির মৃত্যুব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তেব মতো আমি এদিক-ওদিক তাকালাম, কি করবো ঠিক কবে উঠতে পাবলাম না. নুলিয়াটাকে খুঁজলাম।

লোকটা ঠায দাঁড়িযে আছে তখনো। অন্যমনস্কভাবে কি যেন দেখছে।

সমস্ত শরীব শিউবে উঠলো আমার, চোখ ঠেলে কান্না এলো। পাগলের মতো হযে গেলাম আমি। ছুটে গেলাম নুলিয়াটার কাছে। তাবপব মুহূর্তেব মধ্যে আমার দু হাতেব দুটো বালা খুলে তাব হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নায ভেঙে পড়ে অনুরোধ করলাম, ওকে বাঁচাও তুমি, বাঁচাও। ঐ দেখ ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে.

ঠিক কি বলেছিলাম, কিভাবে বলেছিলাম, নিজেও জানি না। সেই মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক ছিলো না।

কিন্তু নুলিয়াটার মাথার ঠিক ছিলো। সে বালা দুটো আমার হাতেই গুঁজে দিয়ে একবার তাকালো গৌতমের দিকে। বিড়বিড় করে কি যেন বললে, তারপব সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

উঃ, সে যে কি উৎকণ্ঠায় এক ঘণ্টা কেটেছে, আজ ভাবলেও সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়, ঘুম আসে না কোনো কোনো দিন।

নুলিয়াটা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে, একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে, আর আমার মনে হচ্ছে যেন কত সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বালির ওপর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি নিষ্ফল ছোটাছুটি, নিজেরই অজ্ঞাতে কখন আমিও জলের কাছে এগিয়ে এসেছি......

একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে নুলিয়াটা, আর আমার মন বলছে, পারবে না, পৌঁছতে পারবে না নুলিয়াটা, গৌতমকে বাঁচানো যাবে না।

এক নিমেষের জন্যে গৌতমের শরীরের কালো বিন্দুটুকু একটা মাতাল ঢেউয়ের মাথায় উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমার পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠলো, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হলো, চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল, সমুদ্রের গর্জন আর স্নানার্থীদের চীৎকার কোলাহল একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে গেল.......আমি কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি কি কানে শুনতে পাবো না আর?.......বীভৎস একটা আতঙ্কে চীৎকার করে কেঁদে উঠতে চেষ্টা করলাম আমি, তারপর বোধ হয় বসে পড়লাম বালির ওপর, কিংবা পড়ে গেলাম; কিংবা......

কি যে হয়েছিলো আমি জানি না।

একটু একটু করে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলাম একরাশ লোক আমাকে ঘিরে আছে। মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে অচেনা এক ভদ্রমহিলা বাতাস করছেন আমাকে, আর নুলিয়াটা চোখের পাতা খুলতে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে বলছে, বাবুকে জান বাঁচায় দিয়েছি, দিদি, বাবু বাঁচ গেছে।

ধীরে ধীরে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম, পাশে বসে ক্লান্তিতে অবসন্নতায় গৌতম তখনো ধুঁকছে।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীর টানতে টানতে, নুলিয়াটার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরে এলাম। ফিরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঘুম, ঘুম, পরম তৃপ্তির ঘুম।

বিকেলের দিকে যখন হোটেলের সামনের বারান্দাটায় দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আমরা বসলাম, তখন আমার শরীরের ক্লান্তি দূর হয়েছে, কিন্তু গৌতমের সারা দেহে তখনো ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যের মতো শক্তিশালী অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পরাজিত সৈনিকের মতো ক্লান্ত আর লজ্জিত সে। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

ইতিমধ্যে গুজবটা রটে গিয়েছিলো সারা হোটেলে। সকলেই একবার করে এসে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছিলো, খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিলো গৌতম কেমন আছে, আর লজ্জায় অস্বস্তিতে আমি মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিলো, এই সমুদ্র ছেড়ে, এই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচি।

একসময় সাজুন্তি আর তার স্বামী এসে দাঁড়ালো পিছনে। — কেমন আছেন?

গৌতম অপ্রতিভ হাসি হেসে তাকালো, বললে, ভালো। তারপর মাথা নিচু করলে।

আর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল তাঁকে নুলিয়ার হাত ধরে স্নান করতে দেখে আমরা হেসেছিলাম। পাশাপাশি দুজনকে তুলনা করে গৌতমের দুঃসাহসের জন্যে গর্ববোধ করেছিলাম।

ওরা চলে গেল। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর তখনই চোখাচোখি হলো নুলিয়াটার সঙ্গে। সামনের রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে সে ফিরে তাকালো আমার দিকে, হাসলো, সেলাম করলো। তারপর চলে গেল নিজের কাজে। আর আমার সমস্ত মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো। ও না থাকলে আজ কি যে হতো! গৌতম বাঁচতো না, আমি বাঁচতাম না। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো বলবো তাকে। বিয়ের পর একটা মাসও যেতে না-যেতে যদি আমার বাইশ বছরের যৌবন থমকে থেমে যেতো তা হলে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কি বলবো!

নিজেরই অজান্তে কখন যে হাতের তিন ভরি সোনার বালা দুটোয় হাত দিয়েছি টের পাইনি।

সচেতন হতেই একটা খুশির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলাম, লোকটাকে এখনই ডেকে বালা দুটো দিয়ে দিলে হতো। ও আমার জন্যে যা করেছে, যা দিয়েছে তার কাছে এটুকু দান কত তুচ্ছ!

কিন্তু লোকটা তখন অনেক দূর চলে গেছে। তাই ভাবলাম, থাক, এত তাড়া কিসের, লোকটা তো আর চলে যাচ্ছে না, কাল সকালে যখন আবার আসবে তখনই দিয়ে দেবো।

পরের দিন সকালে গৌতম আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। গত কালের সেই লজ্জা আর অস্বস্তি যেন ঝেড়ে ফেলেছে।

বললে, চলো, বেড়াতে যাবে না?

বললাম, চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্রের পাড়ে, যেখানে অবিশ্রান্ত ঢেউ ফেটে পড়ছে তীরের ওপর, তা থেকে একটু দূরে। আগেকার মতো কাছে যেতে ইচ্ছে হলো না। না, ভয় নয়, কেমন একটা বিতৃষ্ণা।

হঠাৎ দেখলাম নুলিয়াটা আর একজনের সঙ্গে কাঁধে একটা লাঠিতে বিরাট জালটা ঝুলিয়ে যাচ্ছে আমাদেব পাশ দিয়ে। চোখাচোখি হলো। ও হাসলো। আমিও।

ভাবলাম, এখনই দিয়ে দেবো বালা দুটো? কিন্তু এই বালা দুটো নিয়ে কিই বা করবে ও? ওর কাছে এ বালা দুটোও যা, দুগাছি চুড়িও তাই। নিয়ে ওর বউকে পবতে দেবে হয়তো, বিক্রি তো করবে না। আর চুড়ি দুটোর দামই বা কম কি? দুটোয় এক ভরি সোনা তো আছেই। তা ছাড়া, কৃতজ্ঞতার দাম তো সোনা দিয়ে যাচাই হয় না। আর বালা দুটো ওকে দিয়ে দিলে মা বকবে না তো! বড় জা? বলবে হয়তো, 'দু দিনের জন্যে গেলি নতুন, গিযেই বালা জোড়া খুইয়ে এলি?' বলবে নিশ্চয়ই, কারণ বালার প্যাটার্নটা বড় জা-ব খুব পছন্দ হযেছিলো। তাব চেয়ে একজোড়া চুড়িই বরং দেওয়া যাবে নুলিয়াটাকে, ওব বউকে পরাতে বলবো।

কিন্তু এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে না পাবলে যেন শান্তি নেই। আমবা দুজনে এই সমুদ্রেব পাড়ে এসে দাঁডিয়েছি, অন্য সকলের মতো সমুদ্র দেখছি, কিংবা কিছুই দেখছি না। অথচ ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে যাবাই যাচ্ছে, ফিরে তাকাচ্ছে আমাদেব দিকে, আমাব দিকে। আব তাদেব সেই তীব্র দৃষ্টিতে আমি যেন উপহাস দেখতে পেলাম। যেন সকলেই হাসছে আমাদেব দেখে। যেন বলাবলি কবছে, যেমন বীবত্ব দেখাতে গিযেছিলো, উচিত শাস্তি হযেছে।

সাজুন্তিব চোখেও যেন এমনি এক উপহাস লুকিযে ছিলো। সেই দুটি টানা-টানা কৌতুকে চঞ্চল চোখ, যে চোখ প্রশংসার বিস্ময়ে বিস্ফাবিত হযে বলে উঠেছিলো, 'দেখো, দেখো, উনি কত দূব গেছেন!' সেই চোখজোড়া এখন যেন উপহাসে তীক্ষ্ণ।

আমি গৌতমকে বললাম, চলো, কাল সকালেই চলে যাই। আমাব আব ভালো লাগছে না।

গৌতম সায দিলো, তাই চলো।

কিন্তু যাওযা হলো না। স্টেশন থেকে ফিবে এসে গৌতম বলল, বার্থ পাওযা গেল না। তিন দিন পরে একটা ব্যবস্থা হবে।

পবেব পবেব দিন সকালে নিত্যদিনের মতোই সাজুক্তি আর তাব স্বামী নেমে গেল আমাব চোখের সামনে দিয়ে। তেমনি বুকের ওপব গোলাপী তোযালেটা বিছিয়ে, এক-পিঠ এলো চুলে একটা অকাবণ ঝাঁকুনি দিযে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমাদের ঘরের সামনে বউটি থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু স্নান কবতে যাবো কি না সে প্রশ্ন না করেই নেমে গেল। অর্থাৎ ওবা লক্ষ করেছে যে আমরা ঐ দুর্ঘটনার পর আর সমুদ্রে স্নান করতে যাইনি। শুধু কি লক্ষ্য করেছে? হযতো বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসিও।

বউটির ওপর অকারণেই চটে গেলাম আমি। থামলেই যদি আমার চোখের সামনে তা হলে একটাও কথা বললো না কেন? ভাবলাম, আমিও আর কথা বলবো না ওর সঙ্গে, উত্তর দেবো না কোনো প্রশ্নের।

'কিন্তু ওরা যখন স্নান সেরে ফিরছে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। আর হঠাৎ কথার ফোয়ারা হয়ে উঠলো বউটি। — শুনেছেন? আজ আবার একজন ডুবে যাচ্ছিলো, একটা বুড়ো। নুলিয়ারা গিয়ে বাঁচালো তাকে।.... কেউ ডুবে গেলে বাঁচানোর কাজ ওদের, নুলিয়াদের। শুনলাম গরমেণ্ট নাকি টাকা দেয় সেইজন্যে। সত্যি? নুলিয়ারা না থাকলে কি যে হতো।..... আর আজ কি সাংঘাতিক জোয়ার ছিলো, দেখলেন না তো!

অনর্গল কথা, অনেক কথা বলে গেল বউটি। আমি শুধু ম্লান হাসলাম একটু। আর বউটি চলে যেতেই আমি গৌতমকে বললাম, এই! নুলিয়ারা নাকি টাকা পায় গরমেণ্টের কাছে, কেউ ডুবে গেলে বাঁচাবে বলে?

— কই, শুনিনি তো! গৌতম বললে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ওপরতলার বউটি যে বললে। ওই সাজুন্তি।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি ঐ কথাই ভাবছিলাম, আর আনমনে চুড়ি দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। চুড়ির প্যাটার্নটা দিদি পছন্দ করেছিলো। দিদি! দিদির কথা মনে পড়লেই আমার এত ভালো লাগে। দিদির মতো আমাকে বোধ হয় আর কেউই ভালোবাসে না। গৌতমও নয়। বিয়ের যত ঝামেলা তো দিদিই মাথায় করে নিয়েছিলো। বাজার করা, ডেকোরেটর ডাকা, শ্বশুরবাড়ির লোকদের আদর-আপ্যায়ন। — বাবা বুড়ো মানুষ, কত দিক আর সামলাবেন? দাদাটা তো আড্ডা আর হকি-ক্রিকেট নিয়েই আছে।

দিদি বিয়ের পর একটা উপদেশ শুধু দিয়েছিলো, দেখ নমি, গায়ের গয়নাগুলো — বাবা যা দিয়েছেন তোকে-আমাকে, এগুলো লোক দেখাবার জন্যে নয়, সাজগোজের জন্যেও নয়। এগুলোই আমাদের ব্যাঙ্ক, আমাদের ভবিষ্যৎ। খেয়ালের বশে যেন এগুলো বিক্রি করিস না, হাজার অভাব-অনটন হলেও না।

আচ্ছা, অভাব-অনটন হলেও যা বিক্রি করতে নিষেধ করেছিলো দিদি, তা যদি নুলিয়াটাকে দিয়ে দিই তাহলে কি দিদি রাগ করবে? দিয়ে অবশ্য দেবো না। দিতে আমার নিজেরই তেমন ইচ্ছে এখন আর হচ্ছে না। কেন দেবো, সাজুন্তি যে বললে ওরা গরমেণ্টের কাছ থেকে টাকা পায়। ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ। তাছাড়া ডিঙি করে কত মাছ ধরে আনে ওরা, বিক্রি করে। নেহাত গরীবও ওরা নয়। এক-একজনকে স্নান করিয়ে দিতে দু আনা করে নেয়, তাতে কম টাকা রোজগার হয় নাকি ওদের! আমি অবশ্য অকৃতজ্ঞ নই। নুলিয়াটা সত্যিই তো গৌতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ও না থাকলে, আজ কি দশা হতো আমার? কোন মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম? তাছাড়া, সারা জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যেতো, এই বাইশ বছর বয়সে —। না, নুলিয়াটাকে কিছু একটা দিতেই হবে। আংটিটা দিলে কেমন হয়। আমার তো অনেকগুলো আংটি। চেনা-অচেনা অনেকেই তো আংটি দিয়েছে। মুক্তো-বসানো যেটা, সেটা অবশ্য দেবো না। আর জামাইবাবু যেটা দিয়েছে সেটা খুব সুন্দর দেখতে! ওটা রেখে দেবো। না রাখলে জামাইবাবু কি ভাববে? যদি কোন দিন পরতে বলে। ওটা দিয়েছি শুনলে জামাইবাবু খুব দুঃখ পাবে। জামাইবাবু সত্যি খুব ভালোবাসে আমাকে, খুব। এক-একসময় মনে হয় দিদিকেও যেন অত ভালোবাসে না। তা অবশ্য সত্যি নয়। বউয়ের চেয়ে কেউ কি আর শালীকে বেশী ভালোবাসতে পারে? মোটেই না। জামাইবাবুটা ভারি ফাজিল, আর ভারি দুষ্টু। ও ইচ্ছে করেই অমন ভাব করে। আমি কি আর বুঝি না! দিদিকে রাগাবার জন্যেই অমনি করে। রাগলে দিদিকে খুব সুন্দর দেখায় কিনা।

রাগলে দিদিকে যে খুব সুন্দর দেখায় — আমি কিন্তু কোনো দিন লক্ষ করিনি। গৌতমই প্রথম বলেছিলো। সেই যে দিদির বাড়ি গিয়ে সব মিষ্টিগুলো খেতে পারেনি গৌতম, আর দিদি তাই রেগে গিয়েছিলো — তারপরই বলেছিলো ও, বলেছিলো, তোমার দিদি রেগে গেলে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু ওঁকে।

গৌতম রেগে গেলে আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাই দু দিন পরে, যাবার আগের দিন বিকেলে ও যখন রুক্ষ গলায় বললে, জিনিসপত্তর গোছগাছ করছি না কেন, তখন আমার খারাপ লেগেছিলো। কই, বিয়ের পর থেকে একটা দিনও তো অমনভাবে কথা বলেনি ও। হঠাৎ এমন রাগ-রাগ ভাব কেন? আসলে ও বোধ হয় ভেবেছিলো আমার ফিরে

যেতে ইচ্ছে নেই। আর ও তখন পালাবার জন্যে অধীর। প্রতি মুহূর্তে বেচারার মনে অদ্ভুত এক লজ্জা। কিনা, সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলো লোকটা। ভাবলে আমার নিজের হাসি পায়। সত্যি, কি কাণ্ডটাই না করলো গৌতম। বড় জা বলেছিলো হনিমুন করে আসতে। ভালো হনিমুনই হলো বটে।

কিন্তু সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধ্যে কেমন গম্ভীর-গম্ভীর ভাব, সারা মুখ যেন থমথম কবছে গৌতমের। অপ্রয়োজনে একটা কথাও যেন বলতে নারাজ। ওর এই মুখের ভাব দেখে কথাটা বলতে সাহস হলো না, অথচ ওকে না বলে তো আংটিটা দেওয়া যায় না।

ভাবলাম, থাক, কাল সকালে নিশ্চয় মনটা ভালো থাকবে ওর, তখনই বলবো। আর নুলিয়াটাও তো কাল সকালেই আসবে, তখনই দেওয়া যাবে গৌতমকে জিগ্যেস করে।

গৌতমকে জিগ্যেস করে আংটিটা দিতাম ঠিকই। আর গৌতম নিশ্চযই আপত্তি করতো না, কিন্তু পরের দিন সকালে যে এত তাড়াহুড়ো হবে আমি কি ছাই জানতাম!

সকালে ঘুম থেকে উঠতে এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম টাইমপীসে, কিন্তু অ্যালার্মের দম দিয়ে রাখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই সেটাও বাজেনি, ঘুমও ভাঙেনি। যখন ঘুম-ভাঙলো তখন আর এক ঘণ্টাও সময় নেই।

গৌতম চা খেয়ে চলে গেল হোটেলের হিসাব মেটাতে। ফিরে এসে বিছানাপত্তর গোছগাছ করতে লেগে গেলাম দুজনে। সংসার ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলাম এ ক'দিন। টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলি তো নেহাত কম ছিলো না। আগের দিন কিছু কিছু বাঁধাছাঁদা হয়েই ছিলো, কিন্তু চিরুনি , টুথব্রাশ, পাউডাব, দাড়ি কামানোব সরঞ্জাম সব গুছিযে নিতে সময় লাগলো।

আব এসব কবতে গিযে নুলিযাটাব কথা ভুলেই গিযেছিলাম।

বাক্স-বেডিং সব বিকশায তুলে সবে বিকশাওযালা প্যাডেলে পা দিযেছে অমনি দেখি কি নুলিযাটা আসছে সামনেব বাস্তা ধবে হাঁটতে হাঁটতে।

রিক্শা চলতে শুরু কবেছে তখন। আমাদের দেখতে পেযে একমুখ খুশিব হাসি হাসলো নুলিযাটা, সেলাম করলে। সেলাম করলো বোধ হয বকশিশেব লোভেই।

ছি ছি, একেবাবে ভুলে গিযেছিলাম ওব কথা। এত খাবাপ লাগলো আমাব। বিকশাওযালাকে থামতে বললাম।

গৌতমকে বললাম, এই, দেখো তো তোমার ব্যাগটা, এব বকশিশটা দেওযা হযনি। গৌতম বললে, টাকা তো তোমার বটুয়াতে।

তাই তো। খেয়ালই ছিলো না। আমার হাতেই তো বটুযাটা। লাল ভেলভেটের ওপব সুন্দব নকশা-কবা বটুযাটা এখানেই কিনেছি — মন্দিবে যেদিন গিযেছিলাম সেই পাণ্ডাব ছড়িদারটার সঙ্গে, সেদিন।

বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ টাকার নোটই চাব-পাঁচখানা, খুচরো মাত্র দুটি টাকা আর কয়েক আনা পযসা।

কি করি, স্টেশনে পৌঁছেই তো বিকশার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পযসা দিতে হবে। সব খুচরোগুলো তো দিয়ে দেওয়া যায না।

তাই একটা এক টাকার নোট বের করে নুলিয়াটাব হাতে তুলে দিলাম। ও খুশী হয়ে সেলাম করলে। হাসলো। বললে, ফির আসবেন বাবু, সেলাম দিদি, সেলাম।

সেলাম জানিয়ে চলে গেল লোকটা। আর আমার এত ভালো লাগলো তাকে। এত ভালো।

ফিরে এসেই বড় জাকে বললাম, জানেন দিদি, নুলিয়াগুলো এত ভালোমানুষ, এমন চমৎকার!

বড় জা হাসলো। বললে, দেখিস নতুন, এত ভালো ভালো বলিস না, ঠাকুরপোর আবার হিংসে হবে।

আমি হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, ও মা — আসল কাণ্ডটার কথাই তো বলিনি, রীতিমতো একটা কাণ্ড।

— কি কাণ্ড? চোখ কপালে তুললো বড় জা।

আমি বললাম, আপনাব ঠাকুরপো আর একটু হলেই তো ডুবে যেতো। একটা নুলিয়া দেখতে পেয়েই সাঁতরে গিয়ে বাঁচালো। লোকটা নিজেই দেখতে পেয়েছিলো। ওরা তো সমুদ্রে চান করাতে দু আনা করে নেয়, আমি আসবার সময কিন্তু একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে হঠাৎ কেন জানি না একটু অন্যমনস্ক হযে পড়েছিলাম, সেদিনের সেই আতঙ্কেব দৃশ্যটুকু চোখেব সামনে ভেসে উঠেছিলো। বড় জা কি যেন বললে, আব আমাব তন্ময়তা ভেঙে গেল। ভাবলাম, সত্যিই কি বালা দুটো দেবো বলেছিলাম নুলিযাটাকে? বোধ হয় না। সে সময় আমাব কি মাথার ঠিক ছিলো? কি বলেছি, কি করেছি তা কি আব আমিই জানি! না, বালা-টালার কথা নিশ্চযই বলিনি। তাছাড়া আমাব বলা-কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা কবে ছিলো নাকি নুলিযাটা? কখনো না। আমি বলার আগেই হয়তো নুলিযাটা দেখতে পেয়েছিলো। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিযে পড়েছিলো। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।

পিতা

চাণক্য সেন

দিল্লীব একত্রিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে হবনাম সিংকে ক'জনেই বা চেনে, কিন্তু আমাব সঙ্গে তার পরিচয অনেকদিনেব, এবং গভীব। সে আমাব গাড়ি চালায, অতএব, তার দ্বাবা প্রতিদিন আমি চালিত হযে থাকি। ড্রাইভাব এবং গাড়ির মালিকদের মধ্যে এক ধবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গ'ড়ে ওঠে, অনেকে জানেন। তা ছাড়া মানুষ হিসেবে হবনাম সিংকে আমি শ্রদ্ধা করি। প্রথমত, তার ছ' ফুট দু'ইঞ্চি মেদহীন দেহের সোজা তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব, দ্বিতীযত, তাব মুখে অবিবাম হাসি, প্রাযই যা সবব এবং শিশুব মতো সবল, তৃতীয়ত, তাব স্বভাবেব আকর্ষণীয সততা, এবং প্রধানত, তাব জীবন-চেতনাব বলিষ্ঠ আশা প্রবণতা। হযতো একটু বাড়িয়েই বলছি, কারণ হবনাম সিংকে আমি অনেকাংশে এক অসাধাবণ মানুষ বলে মনে কবি।

কাবণ আছে। লোকটিব আনুগত্যে ফাঁক নেই। প্রয়োজনে, বিপদে সর্বদা এক পায়ে খাড়া। চুবি কাবচুপিব ধাব ধাবে না। টাকাব চেঞ্জ বেশিব ভাগ সময়ে ফেরত দেয। লোভ-লালচ কম। পাংচুযাল। গাড়িটাকে সত্যিকাবেব ভালোবাসে, যত্ন কবে। ভালো চালায়, সাবধানে, গা বাঁচিয়ে। আপনাব যদি ড্রাইভাব থাকে, হযতো আপনি ইতিমধ্যেই হিংসে কবছেন। হ্যাঁ, হবনাম সিংকে ভালোবাসাব কাবণ আছে।

ওকে নিযে যে গল্প লেখা যায, কখনও ভাবি নি। হঠাৎ দেখা গেল হবনাম সিং সাহিত্যেব সামগ্রী। অর্থাৎ ওব জীবনবেদে এমন কিছু ধবা পড়ল, যা যুগপৎ ভাস্বর ও ব্যথা-ম্লান। মধ্যাহ্নেব সূর্যের ওপব হঠাৎ বর্ষাব মেঘ নেমে আসে, দেখে থাকবেন। তেমনি।

"ছেলেটা চলে গেল," গাড়ি চালাতে চালাতে বলল হরনাম সিং। "ছেলেটা চলে গেল।" বলে উঁচু পর্দায় হেসে উঠল। চোখ দুটো জলে ভবে এল।

" যেতে দাও," বিজ্ঞের উপদেশ দিলাম আমি। "তুমি তো অনেক করেছ। এবাব দেখুক জীবনটা এমন সহজ নয়। দেখুক কত ধানে কত চাল।"

চোখেমুখে হেসে উঠল আবার হরনাম সিং। বলল, "চলে গেল, দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু এই হুজুর, লেখাপড়া করল না। ড্রাইভারের ছেলেই রয়ে গেল। ভদ্রলোক হল না। আদমি হল না।"

পাতিয়ালা রাজ্যের যে গ্রামে হরনাম সিং-এর জন্ম হয়েছিল তেতাল্লিশ বছর আগে, সেখানে থেকে চার ক্রোশ দূরে ছিল মিড্‌ল স্কুল, যেখানে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বালাকালে ও পড়েছিল। বাপও গরজ করে নি, নিজেরও মন ছিল না, তাই সেদিন স্কুল যাওয়া বন্ধ ক'রে বাপের পেছন পেছন মাঠে গিয়ে হাজির হল, কেউ অবাক হয় নি, তিরস্কার করে নি, দুঃখ পায় নি। মাঠের কাজেও মন বসল না হরনাম সিং-এর, তাই ষোলো বছর বয়সে একদিন হাজির হল পাতিয়ালা শহরে, কাজ পেয়ে গেল এক মোটর মেরামতের গ্যারেজে। তখন

সবেমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। গ্যারেজে কাজ করতে করতে শিখে নিল গাড়ি-চালনা। বছর খানেক পরে ভর্তি হল মিলিটারীতে। ট্রাক-ড্রাইভার। পাঁচ বছর ধরে অনবরত অসংখ্য গাড়ি চালাল হরনাম সিং— ভারী লরী, জীপ, এমনি গাড়ি, ভারতবর্ষে, বর্মায়, সিংহলে। যুদ্ধের পরও বছর দুই মিলিটারীতে কাজ করার পর, দেশ যখন ভাঙল এবং স্বাধীন হল, হরনাম সিং ছাড়া পেয়ে চলে এল দিল্লীতে, কাজ পেল ভারত সবকারের এমন এক বিভাগে যেখানে দিনে শ' দুই মাইল তাকে গাড়ি চালাতে হয়, কখনও রাত্রি আটটা থেকে ভোর চারটে, কখনও ভোর চারটা থেকে বেলা বারোটা, কখনও বারোটা থেকে রাত আটটা। অর্থাৎ সিফ্‌ট ডিউটি। এরই মধ্যে পার্ট-টাইম কারুর না কারুর ড্রাইভারীও সে ক'রে এসেছে। এখন বছর পাঁচেক ধরে লেগে আছে আমার সঙ্গে।

চমৎকার ইংরেজী বলে। ভাষাটা যেহেতু কষ্ট ক'রে শিখেছে, যুদ্ধের সময় গোরা সৈন্যদের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটিয়ে, তাই চর্চা রাখবার চেষ্টা প্রচুর, যাতে অব্যবহারে বিদ্যা হারিয়ে না যায়। অতএব, আমার ও আমাদের সঙ্গে বেশীর ভাগ কথা বলে ইংরেজীতে। অথবা হয়তো বুঝে নিয়েছে আমার হিন্দীজ্ঞান ওর, ইংরেজীর চেয়ে এমন কিছু প্রখর নয়। আমি যদি হিন্দী বলতে পারি, হরনাম সিং-ই বা কেন ইংরেজী বলবে না?

সুতবাং . "হোয়াই গো বিগ গ্যারেজ। অল চোরস্। আই নো ম্যান ইরউইন রোড। গুড মেকানিক। নো লেগ।"

"পাযের মে কেয়া হুয়া?"

"হী হ্যাস ভেরী ব্যাড্ অ্যাকসিডেন্ট। ট্যাক্সি হিট। ভেবী ব্যাড ট্যাক্সিম্যান। হী নো কনসাস। ট্যাক্সিম্যান কিপ হিম অন বেললাইন। ওয়ান লেগ গন। কাম বেলগাড়ি, সেকেণ্ড অ্যাকসিডেন্ট, টু লেগ গন। বাট ম্যান অ্যালাইভ। টুক্ টু হসপিতাল। গেট ওযেল। নাউ, বোথ আইরন লেগ। হী গুড মেকানিক অন ইরউইন রোড।"

"কাম কবতা পারতা হ্যায।"

"হোযাট ডু? গড্ ক্রুযেল, ম্যান মাস্ট লিভ। নো ম্যাবেজ নো বোথ লেগ, হোযাট ম্যাবেজ?"

"উসকো কোন শাদী কবেগা?"

"দ্যাট আই সে। নো গার্ল ম্যাব্বী ম্যান ট্যু লেগ গন। গুড মেকানিক।"

গরীবের জন্যে হরনাম সিংহেব প্রাণ সর্বদা দুর্বল। বড়ো কাবখানায গাড়ি মেবামতে ভীষণ আপত্তি। যদি বলি, কারখানায় কাজ ভালো, তা ছাড়া, ওদেব দাযিত্ব থাকে, নুক্স হলে আবাব গাড়ি নিযে যাওযা যায়, হরনাম সিং জবাব দেয় :

"দে রীচ। মোব রীচ মোর থীভ্। পুওর ম্যান মেক ট্যু পাইস।"

বলেইছি তো, লোকটা ভালো। হৃদয়বান। দরদ আছে।

সরল, সহজ। বাড়িতে ঢুকে সোজা শোবার ঘরে চলে আসে চাবির জন্যে। গিন্নী রাগ করেন। আমার কিছু বলতে সবম লাগে। হরনাম সিং-এর কুছ-পরোয়া নেই। খিদে পেলে সোজা বান্নাঘরে গিয়ে পাচকের কাছে খাবার চেয়ে নেয়। অনুমতির অপেক্ষা না করে, টেলিফোন ব্যবহার করে। বাজার কবতে দিলে উল্টো-পাল্টা করে আনে। বলেইছি তো, লোকটা সহজ, সরল। বাড়ি এসে প্রথমে খবরের কাগজ। কাগজখানা নিয়ে লাউঞ্জে, বেতের চেয়ারে বসবে। পকেট থেকে বার করবে চশমা। এটা আমাকেই কিনে দিতে হয়েছে। ইচ্ছে ছিল, যে ডাক্তার কুড়ি টাকা ফী নিয়ে আমার চোখ দেখে তার কাছে যাওয়ার। পাঠিয়েছিলাম সফদরজং হাসপাতালে।

"হসপিতাল ডক্টর নো গুড।" আপত্তি করেছিল হরনাম সিং।

"বহুত গুড় হ্যায়।" বলেছিলাম আমি।

"ডক্টর শেঠী ভেরী গুড।"

"বিশ রূপায়া লেতা হ্যায়।"

"হোয়াট্, ট্যুএন্টি রূপি ফর আই?"

অর্থাৎ কুড়ি টাকা বড়ো, না আমার চোখ?

কিন্তু হসপিটালেই যেতে হয়েছিল। চশমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে হাজির হল আমাদের জানাচেনা দোকানে। বিল দেখে অবাক্ হয়েছিলাম। বাইশ টাকা!

"আরে এতনা রূপায়াকা চশমা লিয়া?"

"অন্‌লি ট্যুএন্টিটু রূপি।"

সেই বাইশ টাকার চশমা চোখে চোখে লাগিয়ে হরনাম সিং কাগজ পড়ে। বেশ বড়ো গলায়। বানান ক'রে ক'রে। এবং টীকার সঙ্গে।

"দি প্রাইম মিনিস্টার টু ডে টোল্ড পার্লিয়ামেন্ট দ্যাট প্রাইসেস অব এ-এ-সে-স-ন-সিয়াল কমো-কমো-ডি-আই-টি-ই-এস উইল বি ক-ন্‌ট্রো-ল-ড। হোয়াট সে! প্রাইস গো আপ মর্নিং ইভিনিং, পটাটো এইটি পয়সা কিলো. পুত্তব পিপল হাংরি, হোয়াট প্রাইম মিনিস্টাব! সী টোল্ড দি লোক — সভা —।"

নেতাজী নগবে হবনাম সিং-এব সবকাবী ফ্ল্যাট। একতলায, দুখানা ঘর। পবিবাব ছোট, স্ত্রী, দুটি ছেলে। সহজ সরল জীবন, তাই দু'ঘবেব এক-খানাই যথেষ্ট, অন্যখানা হবনাম সিং ভাড়া দিযেছে, যেমন অনেকে দিয়ে থাকে, যদিও আইন-কানুনে বাধে। চাপ দিলে যত টাকা ভাড়া পেতে পাবত তাব চেযে বেশি নেয নি, কাবণ তাব লোভ-লালচ কম। সুখী পবিবাব। হরনাম সিং দিন বাত্রিব তিন ভাগ সময বাইবে, সংসাব চলে স্ত্রীর পরিশ্রমে, গোলগাল মেযেমানুষটি মুখবা নয়, শ্রমকাতর নয়, অপ্রযোজনে অর্থব্যযে অরুচি। ছোট ছেলে সংনাম মাব সঙ্গে সঙ্গে থাকে, স্কুলে যায়, পাড়াব ছেলেদেব সঙ্গে খেলে। বড় ছেলে নানক।

উনিশ বছবে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলেব দশম শ্রেণীব ছাত্র। বাপেব মতোই দীর্ঘ, বডশিব-ছিপ, মুখে কিন্তু হরনামী হাসি নেই, কেমন একটা কঠোব কাঠিন্য, তবে চোখ দুটি জলেব মতো তবল। নতুন দাড়ি-গোঁফে হঠাৎ একটু বেশী-বযস দেখায। ভালো ক'বে তাকালে অবশ্যি বোঝা যায় ওটা বাইবেব।

ছেলেকে নিযেই হবনাম সিং-এব যা কিছু সমস্যা। ছেলে নিয়ে সমস্যা নেই এমন বাপ কজন আছেন ভারতবর্ষে? অতএব, হরনাম সিং-এর পুত্র-প্রব্লেম এমন কিছু গল্পেব উপাদান নয। উপাদান এ জন্যে যে হবনাম সিং তাব সন্তান. প্রথম সন্তান এবং পুত্র, নানক সিংকে চেনে না।

"সাব্", একদিন হরনাম সিং বলেছিল আমায়, বছর দুই আগে "সাব্, একটা আর্জি আছে।"

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে, যোগ দিয়েছিল, "মাই সন।"

"কি ব্যাপার?"

"ডিফিকাল্ট বয় মাই সন।"

"সব 'সনই' ডিফিকল্ট।"

"হী গুড বয়। বাট নো রীড।"

"কোন ক্লাসে পড়ে?"

"ক্লাস এইট। একজামিন অল্ পাস। বাট নো ওয়ার্ক।"

"না পড়েই পাস করে? তাহলে তো বুদ্ধি আছে।"

"ওয়ার্ক অন্‌লি হোয়েন একজামিন নিয়ার।"

"সবাই তো তাই করে দেখি আজকাল।"

"নট অল সাব্। বাপীসাব (আমার ছেলে) অলওয়েজ ওয়ার্ক। রীড মেনি বুক।"

"স্কুলটা পাস করিয়ে দাও, তারপর একটা চাকরি —"

"নো সাব্", হঠাৎ অসম্ভব জোর দিয়ে বলে উঠেছিল হরনাম সিং। "আই ভেরী পুওর ম্যান। নো এডুকেশন, অন্‌লি ক্লাস ফাইভ। মাই অল রিস্তেদার নো এডুকেশন। আই ওয়ান্ট মাই সন গুড এডুকেশন। আপ টু বি এ.।"

সেদিন আমি হঠাৎ নতুন চেহারা দেখতে পেলাম হরনাম সিং-এর। লোকটা দিনরাত গাড়ি চালায়, পরিশ্রমের শেষ নেই। সবসুদ্ধ, মাইনে, বাড়ি ভাড়া, বাড়তি রোজগার নিয়ে, শ' দুই টাকা মাসিক উপার্জন। ছেলেকে বি.এ. পাশ করানো ওর একমাত্র দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। পাঞ্জাবী সর্দারের স্বপ্ন।

হরনাম্ সিং বলেছিল, "আই ভেরী পুওর ম্যান, সাব্। বাট ভেরী হ্যাপী। মাই ফ্যামিলি অল পীস। আই নো বরো মানি এনিবডি। সিম্‌প্‌ল্ লাইফ। খানা পরনা অল সিম্‌পল্। অন্‌লি বয় ভেরী ডিফিকাল্ট।"

"ডিফিকল্ট কিসে?"

"হী নো রীড, গুড বয়। বাট নো ওয়ার্ক। অলওয়েজ সিনেমা। অলওয়েজ নিড মানি। হোয়েয়ার আই গেট মানি?"

"ঠিক তো। চাইলেই ছেলেকে পয়সা দিতে হবে?"

" হোয়াট ডু সাব? নো গিভ্ মানি, মাচ্ ট্রাব্‌ল। হী নো ঈট, গো এওয়ে ফ্রম হোম, ফাইট উইথ মাদার।"

"তুমি শাসন করতে পারে না?"

"আই টেল হিম সাব। নো হীয়র। ভেরী ডিফিকাল্ট।"

একদিন যা কখনও ঘটে না তাই ঘটল। হরনাম সিং এল আধ ঘণ্টা লেট ক'রে। প্রচুর মাপ চেয়ে যা বলল তার মানে হ'ল : রেডিয়ো কিনতে চাঁদনীচক গিয়েছিল। এক সর্দার কমিশনে মারফি রেডিয়ো দেবে বলেছিল, তাই যেতে হ'ল চাঁদনীতে।

"রেডিয়ো কিনলে কেন হঠাৎ?"

"হোয়াট ডু সাব। বয় ওয়ান্ট রেডিয়ো। নো রেডিয়ো, নো রীড। নো গো স্কুল।"

রেডিয়ো না কিনে দিলে ছেলে স্কুলে যাবে না। তাই তিনশ' বারো টাকা দিয়ে হরনাম সিংকে রেডিয়ো কিনতে হ'ল।

"রেডিয়ো তো ভালো জিনিস। গান শুনবে, ভালো ভালো বক্তৃতা শুনবে।"

"হোয়াট গুড্ সাব? আই ভেরী পুওর ম্যান। নো লাইক রেডিয়ো। বাট বয় ওয়ান্ট। নো রেডিয়ো, নট গো স্কুল।"

এমনি ক'রে নানক সিং একদিন একজোড়া টেরিলিন শার্ট আদায় করল। পায়ের সঙ্গে কামড়ে লেগে থাকা ট্রাউজারও। "নো টেরিলিন শার্ট নো গো স্কুল।"

বাপকে স্কুলে না যাবার ভয় দেখিয়ে ছেলেটা দিব্যি সব কিছু বাগিয়ে নিচ্ছে। এ এক নতুন ধরনের ব্ল্যাক-মেল। একদিন বলতে হ'ল :

"ও যা চায় তাই যদি দাও, পড়াশোনা মাথায় উঠবে।"

"হোয়াট ডু সাব?"

"দেবে না।"

"দেন হী নট গো স্কুল।"

"বেশ তো, না পড়তে চায়, স্কুল ছাড়িয়ে দাও। তাগড়া জোয়ান ছেলে, কাজকর্ম শিখে রোজগার করুক।"

"নো সাব। ইন মাই ভিলেজ, নো গ্রাজুয়েট। নো রিস্তিদার এনি এড়ুকেশন। হী মাস্ট পাস বি.এ.।"

"এমনি ক'বে ক'দিন সামলাবে?"

"বয় ভেরী গুড, সাব। আফ্‌টার রেডিয়ো, হী রীড। গুড রেজাল্ট ইন ইনতিহান।"

"কি ক'রে জানলে? ছেলে বলেছে?"

"আই গো টু প্রিন্সিপাল। হী সে বয় গুড। বাট নো ওয়ার্ক।"

তারপর শুনলাম ছেলের জন্যে হরনাম সিং এক মাস্টার ঠিক করেছে, মাইনে মাসে ত্রিশ টাকা। অঙ্কে কাঁচা। প্রথম চেয়েছিল আমাব ছেলের কাছে এসে অঙ্ক শিখুক। নানক রাজী হয নি। অগত্যা গৃহশিক্ষক।

নানক এখন ক্লাস টেনে পডছে। প্রায়ই হরনাম সিং বলে, আব একটা বছব পরেই সে কলেজে যাবে। কোন কলেজে পাঠাবে জিজ্ঞেস করে। আমাব ছেলে সেন্ট স্টিফেন্‌স্-এ যায। নানক কি পড়তে পাববে ঐ কলেজে? অবশ্য যদি ভালো রেজাল্ট করে? খবচ কি অনেক বেশি? বেয়াদপি মাপ ক'রে কতো খরচ হয আমি কি বলবো? মাসে একশ' টাকা? মাই গড, অত টাকা কোথায পাবে হবনাথ সিং? বামজাস কলেজে কতো খরচ? বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কখনও আমাব ছেলেকে নিযে যায, হবনাম সিং এক একটা কলেজে ঘুবে বেড়ায। ভেতরে গিযে ক্লাসরুমেব বাইরে একটুক্ষণের জন্যে দাঁড়িযে থাকে। ছাত্রছাত্রীদেব দিকে প্রলুব্ধ বিস্ময়ে তাকায। তাদেব মধ্যে বোধ কবি দেখতে পায নিজেব ছেলেকেও।

"সাব, অল কলেজ বয স্মোক। ভেবী ব্যাড।"

আমাকে নীবব দেখে, "বয অ্যান্ড গার্ল অল-ওয়েজ একাঠঠা। ভেরী ব্যাড।"

"একসঙ্গে পড়ে যে।"

"বাট্ হোযাই ওযাক একাঠঠা অন বীজ্ঞ?"

আমি হেসে ফেললাম।

"নো লাফ্ সাব। বাপীসাব অলসো উইথ মেনি গার্ল।"

আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম।

"বাট্ বাপীসাব ভেরী গুড। পহলে পহলে কী স্মোক। আই নট টেল ইউ, বাট ইন দি কাব হী স্মোক।"

"জানি।"

"আই আস্ক হিম, হোয়াই স্মোক। সাব নট লাইক ইউ স্মোক। বাপীসাব সে আই টেল মাই ফাদার। হী নট অবজেক্ট।"

"ঠিক।"

"বাট নাউ হী নট স্মোক। নেভার। আই আস্ক, হোয়াই নট স্মোক। হী সে ফাদার নট লাইক সো আই নট স্মোক। উইথ মানি আই বাই বুক।"

"তোমার ছেলে তো স্মোক করবে না।"

· "উই শিখ নো স্মোক। বাট হী গো উইথ গার্ল।"

"ভালোই তো। নিজে বি.এ পাস করবে, বি.এ.পাস একটি মেয়েকে বিয়ে করবে।"

হরনাম সিং-এর মুখে এক গাল হাসি। যা বলল তার মানে হ'ল, সাহেব, দেশটা বদলে গেছে। কতো নতুন নতুন বাঁধ, কলকারখানা, স্কুল কলেজ তৈবি হচ্ছে। আমি চাই নানক নতুন আদমি হোক। নতুন জমানার নতুন আদমি। "আই নো এডুকেশন। বাট্ আই ভেরী

হ্যাপী। আই ওয়ান্ট নাথিং ফ্রম বয়। হী লিভ্ আপনা লাইফ। আই টেল, ইউ ডু নাথিং ফর মি। বাট্ বি গুড্ আদমি। নো এডুকেশন নো আদমি, নো আদমি অফ নিউ ইণ্ডিয়া।"

"তুমি তো এতোসব বলছ। তোমার ছেলে কি ভাবছে খবর রাখো?"

হরনাম সিং কথার মানে বুঝতে পারল না।

"ছেলেকে জিজ্ঞেস করো সে কি করতে চায়।"

"নো সাব। আই নট টক টু হিম।"

"সে কি? ছেলের সঙ্গে কথা বলো না?"

কি ক'রে বলবে? হরনাম সিং দিনরাতের তিনভাগ বাইরে। বাড়িতে কতোটুকু সময়ই বা কাটায়? ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎই বা কতোটুকু। তাছাড়া ছেলে প্রায়ই বলে হরনাম সিং কিচ্ছু বোঝে না।

"আই অন্‌লি ফিফ্‌থ ক্লাস, হী টেন ক্লাস। আই নো নাথিং হী সে। হাউ টক?"

সমস্যা কঠিন বটে।

"ছেলে বলে না কি করতে চায়?"

"কখনও বলে, ড্রাইভাবী শিখাও, চাকরি করবো। কখনও বলে ছবি আঁকবো।"

"ছবি আঁকবে?"

"হী গুড পিকচার মেক, সাব।"

একদিন নিয়ে এল ছেলের আঁকা একগুচ্ছ ছবি। অনেকগুলি পেন্সিল স্কেচ, কাঁচা-হাত হলেও লাইনের সূক্ষ্মতা আছে, এখানে-ওখানে এক আধটু মৌলিকতাব চিহ্নও বর্তমান। বাকীগুলি রং-এব নকশা। নানাবকম শাডিব পাড়েব, কার্পেটের ডিজাইন। রং চেনে ছোকরা।

"এসব কখন করে?"

"হী ডু দিস মেনি টাইম। নো রীড, অন্‌লি দিস।"

"কাজ তো ভালই কবে। আর্ট স্কুলে ভরতি ক'বে দাও না কেন?"

"হোযাট পিকচাব ব্রিং মানি সাব! হী গো টু আর্ট স্কুল, হী মেক সিনেমা স্টাব পিকচাব। নো গ্রাজুয়েট।"

স্কেচগুলির মধ্যে হঠাৎ একখানাব উপর চোখ পড়ল। একটি মেয়ে, ক্ষীণাঙ্গী, মুখখানা রুক্ষ হলেও চিবুকে ও ওষ্ঠাধরে লাবণ্য লেগে বয়েছে। চোখ দুটি ড্যাবডেবে, বাঁ গালে মস্ত এক তিল। সালোয়ার কামিজ পবনে, উড়নি বুকেব ওপর নয়, গলায় মোড খেয়ে পিঠে ঝুলছে।

"এটা কার ছবি?"

"ডোন্ট নো সাব। ফ্রম হিজ মাইণ্ড।"

মিথ্যা কথা বলতে পারে না হরনাম সিং। অস্বস্তি বোধ করে।

নড়েচড়ে বসল।

"ওয়ান আর্জি, সাব।"

"বলো।"

"ইউ স্পিক টু মাই বয়।"

"কি বলবো?"

"হী পেইন্ট বাট্ নো রীড। হী বি বি. এ."

"আমি বললেই হবে?"

"ইয়েস সাব।"

"আচ্ছা বলবো একদিন। নিয়ে এস আমার কাছে।"

"হী নট কাম, সাব। ইউ প্লীজ কাম মাই হোম।"

"আচ্ছা যাবো একদিন।"

যুদ্ধকালে টমীদের সঙ্গে থেকে থেকে হরনাম সিং কযেকটি বিশেষ শব্দ রপ্ত করেছে। একটা হ'ল, 'ক্যারী অন, জনি'। এটা রাস্তায় চলতে চলতে সে প্রায়ই ব্যবহার করে। অন্য কোনও গাড়িকে রাস্তা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে, 'ক্যারী অন, জনি।' আর একটা হ'ল, কয়েকটি ইংরেজী গানের কলি। যেমন, 'আই লভ ইউ মাই ইংলণ্ড।' 'ইংলণ্ড' শব্দটি সম্ভবত হরনাম সিং-এর নিজের সংযোগ। 'আই লাভ ইউ মাই লাভ' বলতে সরম হয়। তাই, 'ইংলণ্ড'। এ গানটা সে প্রায়ই করে, যখন বিশেষ ক'রে সপরিবারে আমরা দূরে কোথাও বেড়াতে যাই। আর একটা গানও মাঝে মধ্যে গেয়ে ওঠে। 'হোয়েন দি ফাওয়ার্স ব্লু', কথাটা নিশ্চয় 'ব্লুম,' কিন্তু 'ম' অনেকদিন ফুল থেকে ঝরে গেছে, ফুল এখন নীল।

আলোয়ারের রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে হরনাম সিং বার বার পেছন থেকে হর্ন বাজানো ড্রাইভারদের লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে উঠছিল, 'ক্যারী অন, জনি।' এক সময় গানও ধবেছিল . 'আই লাভ ইউ মাই ইংলণ্ড।'

টুটুল, আমার মেয়ে, প্রশ্ন ক'বে বসল, "হবনাম সিং, তুমি ইংলণ্ডকে ভালোবাসো?"

"ভেবী মাচ লাভ আই ইংলণ্ড।"

"চলে যাও না কেন?"

"হাউ গো, পুওর ম্যান।"

বাপী বলল, "অনেক পাঞ্জাবী তো চলে গেছে ও যাচ্ছে।"

"সামটাইম আই অলসো থিংক আই গো।"

"যাও না কেন?"

'টাইম কাম, আই গো।"

"কবে?"

"হোয়েন বয় পাস বি এ. আই গো।"

"বৌ আব ছোট ছেলে?"

"দে গো ভিলেজ।"

"খাবে কি?"

'আই হ্যাভ ল্যান্ড দেয়ার। দে নো হাংগার।"

"গিয়ে কি কববে?"

"বিগ সাহেব মোটরকার ড্রাইভ। রোল্স্রয়েস।"

"ফিরে আসবে না?"

"নো কাম ব্যাক। আই লাভ সী মেনি কানট্রি। ইয়োবোপ ভেরী গুড। ইণ্ডিয়া ভেরী ব্যাড। ভেরী পুওর। হিয়ার অল চোরস্।"

সেদিন আবার হরনাম সিংকে তাকিয়ে দেখলাম। "আই লাভ সী মেনি কানট্রি।"

মাস খানেক পর, একদিন সন্ধ্যায়, বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ হরনাম সিং বলে বসল : "সাব, বয় এগেন মাচ ট্রাবল্।"

"কি হ'ল আবার?"

হঠাৎ জবাব দিল না হরনাম সিং। আমারও উৎসাহ ছিল না একটুও।

একটু পরে বলে উঠল, "হী গো আফটার গার্ল।"

চমকে উঠলাম।

"হী গো আফটার গার্ল।"

"বয়স কতো?"

"উনিশ।"

"তবে ও মেয়েদের পেছনে ঘুরবে নাকি তুমি ঘুরবে?"

হো হো ক'রে হেসে উঠল হরনাম সিং।

"দেন নো ফিয়ার, সাব?"

"মেয়েটি কে?"

পড়শী কারুর মেয়ে।

"কতো বড়ো?"

"নট স্মল। গ্রো আপ গার্ল।"

"ছেলে কি করে?"

"গো আফটার শী।"

"বারণ ক'রে দিও।"

'নট হীয়র হোয়াট আই সে।"

"উনিশ বছরের ছেলে, একটু আধটু তো মেয়েদেব সঙ্গে মিশবেই। বাড়াবাড়ি কিছু না করলেই হ'ল।"

"নো সাব, নট দ্যাট থিং। বাট গো আউট হী অ্যাণ্ড শী।"

"বন্ধ ক'রে দিও। মেয়ের বাপকে বোলো।"

এর পরে ঘটনা ঘূর্ণিরূপ ধারণ করল। হঠাৎ এমন তেজে ঘুরল, না হরনাম সিং না আমি তার সঙ্গে তাল রাখতে পারলাম।

দিন দশেক পর একদিন হবনাম সিং দপ্তবে এসে হাজির। চোখেমুখে আর্ত ভয়ের চিহ্ন। লোকটা কেমন যেন দিশেহাবা মনে হ'ল।

"কি ব্যাপার?"

"ডেনজাব, সাব।"

"কি হয়েছে?"

"লড়কি কাম মাই হোম।"

কেমন যেন মেজাজ গরম হয়ে গেল আমার।

"ইংরেজী রাখো। বুঝিয়ে বলো। লড়কি? কোন লড়কি?"

যা বলল তা যেমন নাটকীয, তেমন সংকট-সংকুল। ছেলেটা অনেকদিন হ'ল সেই পড়শী মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এসেছে। স্কুল যাবাব নাম ক'রে দুজনে সারা দিন ঘুরে বেড়িয়েছে। সিনেমায় গেছে। পাড়ার সবাই এ নিয়ে অনেকদিন ধবে নানা রকম বলছে। হরনাম সিং-এর বৌ নালিশ করেছে কিন্তু সে বড় একটা কান দেয় নি। এখন, আজ, সেই মেয়ে এসে হাজির হয়েছে হরনাম সিং-এর বাড়ি। নিজের ঘরে সে যাবে না। ওখানেই থাকবে।

এমন ঘটনা সচরাচর আমাদের সমাজে ঘটে না। হঠাৎ যেন বড় অসম্ভব, বড্ড গল্পেটে মনে হ'ল।

কিন্তু গল্প তো নয়। একেবাবে বাস্তব ও সত্যি।

"হোয়াট ডু সাব?"

"তোমার ছেলে কি বলে?"

"হী ব্রিংগ গার্ল হোম —"

"হিন্দীতে বলো।"

বলল, "ছেলে মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। মাকে বলেছে, ও এখানেই থাকবে।"

"মেয়ের বাপ-মা কি বলে?"

"কিছু না। মেয়ের বাপের সাতটা বাচ্চা। নিজের বাড়িতে থাকতে চায় না মেয়েটা। যেতেও রাজী নয়। তারাও ডাকতে আসে নি।"

"খবর দিয়েছিলে?"

হরনাম সিং উত্তেজিত হয়ে হিন্দী ছেড়ে ইংরেজী ধরল "আই গো মাইসেল্‌ফ্‌ সাব। টু গার্লস ফাদাব। টেল, টেক ইওব ডটাব মাই হোম। হী সাইলেন্ট। নট সে এনিথিং।"

"এখন তুমি কি কববে?"

"কি করবো সাব তাইতো ভাবছি। আমাব জীবনটা এমন সুখেব ছিল। সব শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ছেলেটা সত্যনাশ ক'রে দিল।"

একটু পরেই : "এভরিথিং চেঞ্জ, সাব। হোয়াট ওযার্লড! বয ব্রিং গার্ল হোম। আই স্টে হিয়ার, শী সে। নট গো টু মাই হোম। ও মাই গড, হোয়াট ওযার্লড।"

হেসে উঠল হরনাম সিং।

পরের দিন আটটা বাজতে না বাজতে বাড়িতে এসে হাজির।

"কি ব্যাপার?"

"সাব, গাড়িটা একটু পেতে পাবি?"

এমন আর্জি এব আগে কখনও করে নি।

"গাড়ি? গাড়ি কেন?"

"সাব, এভবিবডি সে গিভ দেম ম্যারেজ।"

"বল কি? বিয়ে দিয়ে দেবে?"

"হোযাট ডু সাব? অল বডি সে গিভ দেম ম্যাবেজ।"

"তুমি রাজী হয়ে গেলে?"

"হোয়াট ডু সাব? ম্যাচ ট্রাব্‌ল! ভেরী ব্যাড।"

"ছেলে কি বলে?"

"বয় সে গিভ ম্যারেজ।"

"তোমার বৌ?"

"ওয়াইফ ভেবী সিম্‌প্‌ল। শী অন্‌লি ক্রাই।"

"তাহলে বিযেই দিচ্ছ?"

"হোয়াট ডু সাব?"

"কবে?"

"নাউ, সাব। অল গো টু গুরদ্বারা।"

"ছেলের লেখাপড়া কিন্তু উঠল।"

"নো সাব। বয সে গিভ্‌ ম্যাবেজ, আই গো স্কুল, পাস বি এ.। নো ম্যারেজ, আই লীভ হোম।"

"তাই তুমি রাজী হলে?"

"হোয়াট ডু সাব?"

একটু পরে : "কার টেক সাব ওয়ান আওযার?"

"না। ট্যাক্সী ক'রে বিয়ে দিতে যাও। গাড়ি দিতে পাবব না।"

গুরুদ্বারায নানক সিং-এর বিয়ে হ'ল। হরনাম সিং-এব খরচ হ'ল কুড়ি টাকা। মেয়েব বাপের এক টাকা পঁচিশ পয়সা। গুরুদ্বারার পুরোহিতেব দক্ষিণা। হবনাম সিং দশজন আত্মীয বন্ধুদেব ডেকে খাওযাল। ট্যাক্সীতে খরচ করল আট টাকা। বৌ-এর জন্যে নতুন শাড়ি কিনে

আনল। মেযেব বাপ ব্যয কবল না এক পয়সা। পার্টি দিল না। মেয়েকে একখানা শাড়ি-গযনা পর্যন্ত না। সম্পর্ক রাখল না।

সাতদিন পব হবনাম সিং-এর ধর্মপত্নী পুত্রবধূকে নিয়ে হাজির হ'ল করোলবাগের এক লেডী ডাক্তারের কাছে।

এ খবরটা পেলাম মাসখানেক পরে।

হরনাম সিং বলল, "বয় এগেন ডিফিকাল্ট, সাব। নট গো স্কুল।"

"স্কুল এবাব ছাড়ো। একটা কাজকর্মে ঢুকিয়ে দাও।"

"হোয়াট ওয়ার্ক হী ডু?"

"কোনও কাবখানায় —"

"আই নট ডু দ্যাট সাব। আই হোপ হী পাস বি.এ.। ইফ নট, হী গো টু হেল।"

"ছেলে বিগড়ে গেল কেন?"

"ব্যাড লাক, সাব হী অ্যাণ্ড গার্ল গো আউট অল ডে। কাম ব্যাক ইভিনিং।"

"তোমার ভাড়াটেকে তুলে দিয়েছ?"

"নট সাব।"

"সবাই এক ঘবে শোও?"

হরনাম সিং প্রশ্নটা বুঝল। বিষণ্ণ হেসে বলল, "হোয়াট ডু সাব? আই পুওর ম্যান। হোএয়ার গেট থার্টি রুপী?"

"কিন্তু —"

"নো, সাব। আই টেল ইউ অল থিং। গার্ল পেগ্নেন্ট। ওয়াইফ টেক হার করোলবাগ ফব ওযাশ। নো বাচ্চা সো স্যুন। বয় নট বীড।"

তিন সপ্তাহ পবে নানক সিং নববধূকে নিযে ঘবছাড়া হ'ল। ছোট একটি পরচি বেখে গেল বাপের জন্যে . "তোমাব সঙ্গে আব থাকব না। নিজে কাজ ক'বে খাব। পড়ব না। স্কুলে বলে দিও।"

গল্পটা দিন দশেক আগে শুরু কবেছিলাম। এই দশদিনে নতুন এক ঘটনা ঘটেছে। হবনাম সিং আর আমাব গাড়ি চালায় না।

হরনাম সিং এখন জেলে।

সহকর্মী ড্রাইভার অনন্ত সিং তাব নতুন বি. এ. পাস-কবা ছেলেকে নিয়ে এসেছিল দপ্তবে সবাইকে দেখাতে। হঠাৎ হরনাম সিং-এব সঙ্গে তা'র ঝগড়া বেধে গেল।

মাটি থেকে গাড়ি স্টার্ট দেবাব ডাণ্ডা তুলে হরনাম সিং তাকে মারতে গিয়েছিল।

অনন্ত সিং এব বদলে 'ডাণ্ডা' পড়েছিল তার ছেলের মাথায়।

হরনাম সিং-এর একমাস জেল হয়েছে।

স্তন

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্

আবু তালেব মোহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন সাহেব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করাটা পারিবারিক ফরজ হিসেবেই দেখেন। যতদিন দুনিযাদারীব কাজে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন ততদিন সে কর্তব্যটি ইচ্ছানুযায়ী পালন কবতে পাবেননি। আজ তাঁব দায়িত্বেব ভার অপেক্ষাকৃতভাবে লঘু হয়েছে বলে সে কর্তব্য পালনে বাধা-বিপত্তি কমেছে।

সালাহ্ উদ্দীন সাহেব যখন আত্মীয-স্বজনেব সঙ্গে দেখা কবতে যান তখন তার পূর্ব-আযোজনটি রীতিমত সফবের আযোজনেব মতই মনে হয়। বিনা খববে ঝট্ কবে কারো বাড়ীতে তিনি উপস্থিত হন না। দেখা করতে আসবেন বলে আগাম খবব পাঠান দিন কয়েক আগে। সময়-প্রহব জানান, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মবণ কবিযে দেন যে, তিনি চা-মিষ্টি কিছুই গ্রহণ কবেন না, পান-দোক্তা তামাকেব অভ্যাসও তাঁর নেই। তাছাড়া ডাক্তারেব কড়া নির্দেশে পথ্য কবেন বলে থানাব দাওয়াতও গ্রহণ কবেন না। বস্তুতঃ এক গ্লাস পানি ছাড়া অন্য কিছু তাঁকে দেওযা সম্ভব হয় না। তবু অসিদ্ধ পানিটা বোগ-ব্যাধির ভযে পান কবেন না বলে তা-ও ক্বচিৎ স্পর্শ করেন।

তাঁব আত্মীয-স্বজনের চক্রটি কম বড় নয়। শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত সে পরিবারের লোকসংখ্যা অগুণতি মনে হয়। তবু তাঁর বযসের জন্যে এবং তাঁর সমৃদ্ধিসম্পন্ন আর্থিক অবস্থার জন্যে তিনি নিজেকে তাদের সকলেরই মুরুব্বী বলে মনে কবেন এবং পদ্ধতিক্রমে বছবের মধ্যে একবার-দু'বার দেখা কবে আসেন তাদেব সঙ্গে। তবে আত্মীয-স্বজনের চক্রটি বৃহৎ বলে তাঁকে একটা সীমারেখা টানতেই হয়। যারা সে চক্রেব বহির্ভূত, নিযমিতভাবে তাদেব সাথে দেখা-সাক্ষাৎটা করেন না। সব কিছুতেই কোথাও না-কোথাও একটা সীমাবেখা টানতেই হয।

অতএব সেদিন অপবাহ্নে বিনা খবরে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব যখন দেখা-সাক্ষাতের চক্রের বহির্ভূত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কাদেবের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তখন ঘটনাটি নেহাতই বিস্ময়কব মনে হয়। তিন দিন আগে কাদেরের ষষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করে কয়েক ঘণ্টাব মধ্যেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে বলে তিনি যে দুঃখ প্রকাশেব নিমিত্তি এসেছেন তা মনে কবা সম্ভব হয না। সালাহ্ উদ্দীন সাহেব নিজেই গভীব শোকগ্রস্ত। প্রায় একই সময তিন দিন আগে প্রসবকালে তাঁব অতি আদরের ছোট মেয়ে খালেদার মৃত্যু ঘটে।

ক্ষুদ্র বৈঠকঘরে একমাত্র পিঠখাড়া চেযারে আসন গ্রহণ করে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব লাঠির মাথায় তাঁর হাত দুটো জড়ো করেন। একটু দূবে শীতলপাটি বিছানো চৌকিতে কাদেব মিয়া বসে। তার মুখে কৌতূহলের স্পর্শ। ঘরে কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিবাজ কবে।

অবশেষে উচ্চস্ববে গলা সাফ কবে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব একনজর তাকান কাদেবের দিকে। তারপব অল্পক্ষণের জন্যে তাঁব চোখ ক্ষুদ্র ঘরের চতুর্দিকে ঘুবে বেড়ায। স্বল্পবেতনের কেবানীমানুষ কাদেরের বাড়ীতে সর্বত্র দারিদ্র্যের ছাযা। ঘবে আসবাব বলতে নড়বড়ে চেয়াবটি

এবং চৌকিটি ছাড়া আর কিছু নেই। ছাতাপড়া দেওয়ালে শোভার খাতিরে একটি কেলেণ্ডার টাঙ্গানো। তাতে নদীর বুকে রক্তিম সূর্যাস্তের ছবি। তবে সেটি দু-বছরের পুরানো। অপরাহ্ণের সূর্যের তির্যক আলোয় তাতে জমে থাকা ধুলা নজরে পড়ে। ওপাশে, ভেতরের দরজার কাছে, মাটিতে বসে একটি বছব চারেকের মেয়ে বাটি থেকে মুড়ি খাওয়ায় রত। মুড়ি মুখে যতটা না যায় ততটা ছড়িয়ে পড়ে তার চারপাশে। গায়ে তাব একটি অপরিচ্ছন্ন ফ্রক। মুখেও সর্বত্র ময়লার স্পর্শ।

সালাহ্ উদ্দীন সাহেব যা দেখেন তাতে তিনি নারাজই হন। যে প্রস্তাবটি নিয়ে তিনি কাদেরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন সেটি উত্থাপন করা সমীচীন হবে কিনা সে বিষযে ক্ষণকালের জন্যে তাঁর মনে একটা সন্দেহ্ জাগে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, সেটি উত্থাপন না করে উপায় নেই।

আবার গলা সাফ করে সোজা তাকিয়ে এবার তিনি বলেন, আপনার কাছে একটি কথা নিয়ে এসেছি। আমার নাতিকে দুধ দেবার কেউ নেই।

এইটুকু বলেই তিনি থামেন। তাঁর কথাটির মর্মার্থ বুঝতে কাদেরের বিলম্ব হয় না। তবু সালাহ্ উদ্দীন সাহেব তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি বলে সে নীরবে অপেক্ষা করে।

প্রস্তাবটি খুলে বলতে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব সময় নেন। কাদেরের স্ত্রীকে তিনি কখনো দেখেননি। তবে শুনেছেন, সে বড়ই স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। পাঁচ ছেলেমেযের মা, তবু কখনো রোগ-ব্যাধিতে ভোগেনি। তাছাড়া বুকের দুধ দিয়েই সে পাঁচটি ছেলেমেয়েকে হাঁটাতে শিখেয়েছে, তাদের মুখে কথা ফুটিয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যও ভাল। দরজার কাছে বসে থাকা মেয়েটি অতিশয় নোংরা হলেও রোগা-পটকা নয়। তাছাড়া কাদেরের স্ত্রী সম্বন্ধে এ-কথাও শুনেছেন যে, সে নাকি অতিশয় দয়ালু মানুষ : পরের জন্য তার দয়া-মাযার শেষ নেই। এ সব অতি উত্তম কথা। তবু কাদের এবং তার স্ত্রীর বর্তমান শোকের কথা ভেবেই তিনি কথাটা খোলাখুলিভাবে বলতে দ্বিধা করেন। তবে সে দ্বিধা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

শুনেছি আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খোদার ফজলে ভালোই। ভাবছিলাম, আমার মা-হারা শিশু-নাতিকে তার বুকের দুধ দিতে রাজি হবেন কি? হলে বাচ্চাটিকে এখুনি নিয়ে আসি। সালাহ্ উদ্দীন সাহেব একবার চোখ বন্ধ করেন কেবল খুলবার জন্যেই। একটু হুকুমের কণ্ঠে বলেন, আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে আসবেন?

কাদের চলে গেলে লাঠির মাথায় হাত জড়ো করে বসেই তিনি মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে থাকেন। তবে প্রথমে আরেকবার ঘরটির চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করেন, নোংরা মেয়েটির দিকেও একবার ক্ষিপ্রভাবে তাকান। তাঁর মুখে আবার অসন্তুষ্টির ভাবটি জাগে। প্রস্তাবটি করে ভাল করেছেন কি? অনিশ্চয়তার একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস পেলেন তিনি। তবে তিনি বোঝেন, প্রস্তাবটি যখন একবার করেই ফেলেছেন, তখন সে কথা ভাবার কোন অর্থ নেই।

কাদের প্রত্যাবর্তন করলে তিনি উদ্বিগ্নভাবে তাকান তার দিকে। তার মুখের ভাব দেখে পবমুহূর্তেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। লাঠিটা মেঝেতে দু'-একবার ঠুকে তিনি উঠে দাঁড়ান। এ বয়সেও তাঁর পিঠ বিস্ময়করভাবে ঋজু।

দরজার নীচেই আধা পাকা রাস্তা। সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তিনি কি ভাবেন। তারপর যে ব্যাখ্যা প্রথমেই দেওয়া উচিত ছিল সে ব্যাখ্যাটি এখন দেন অযাচিতভাবে।

ডাক্তার অবশ্য বোতলের দুধ দিতে বলে। ওসব আধুনিক পন্থায় আমার বিশ্বাস্ নেই। দুধের শিশু বুকের দুধ খাবে, প্রকৃতির রীতিই তাই।

তারপর আচম্বিতে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করেন। গভীর শোকেও তিনি এমন সংযম দেখাতে পারেন, তার কারণ তাঁর দীর্ঘ জীবনের উপব

দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। তিনি একথা শিখেছেন যে, মানুষের জীবনে যখন নিদারুণ দুঃখকষ্ট নামে তখন মানুষকে তার কর্তব্যের কথাই প্রথমে ভাবতে হয। তখন ভেঙ্গে পড়লে চলে না।

এ-সময় জামাইর কথা মনে পড়তে তিনি ভ্রূকুটি করে ওঠেন। শোকে সে দুর্বল তৃণের মত ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি কী করেন? তাঁকেই সব কথা ভাবতে হয়, যা করবার তা করতে হয়।

গাড়ীতে চড়বার আগে বলেন, বাচ্চার সঙ্গে একটি দাই আসবে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সালহ্ উদ্দীন সাহেব তাঁর শিশু-নাতিকে নিয়ে আসেন। সঙ্গে দাই। দাই শিশুকে ভেতরে নিয়ে গেলে তিনি বৈঠক ঘরে বসে কান খাড়া করে রাখেন। কাদেরের স্ত্রীর মতটি ইতিমধ্যে বদলাযনি তো? শোকগ্রস্তা মেয়েমানুষের কথা বলা যায় না। তারপর একটু পরে দাই এসে ভেতরের দরজার পাশে নিঃশব্দে এক পাটি কাল দাঁত দেখিয়ে দাঁড়ালে তিনি বুঝতে পারেন, কাদেরের স্ত্রী শিশুকে প্রত্যাখ্যান করেনি। অবশ্য সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। দুধের শিশুকে কেউ কি ফেলতে পারে? যে মানুষ সদ্য সন্তান হারিয়ে শোকাপ্লুত, সে-ও পারে না।

গাড়ীতে চড়তে গিয়ে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব বলেন — আপনার স্ত্রীর ওষুধ-পথ্যের দরকার হলে ডাক্তার পাঠিয়ে দেব।

তাঁর কণ্ঠে গভীর তৃপ্তির আভাস। এত গভীর শোকের মধ্যেও একটু সার্থকতার, একটু আনন্দের, একটু সুকীর্তিজাত সন্তোষের অবকাশ আছে। সব খোদারই অসীম মেহেরবানী, তিনি ভাবেন।

গাড়ীতে চড়ে তিনি ঋজু হয়ে বসেন, দৃষ্টি সম্মুখ দিকে।

কাদেরের স্ত্রী মাজেদার সত্যিই উত্তম স্বাস্থ্য। মানুষটি ছোটখাট হলেও তার দেহ কোথাও অসম্পূর্ণ নয়। পাঁচ ছেলের মা বটে, তবু সে-দেহ আট-সাঁট, সামান্য মেদবহুল হলেও তাতে কোথাও ঢিলেঢালা ভাব নেই।

দাই ঘরে এলে মাজেদা প্রথমে নিস্তেজ দৃষ্টিতে দাই-এর কোলে কাপড়ের বাণ্ডিলের দিকে তাকায়। সে বাণ্ডিলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মুখ। শিশুর চোখ গভীর ঘুমে নিমীলিত। তমিস্রাময় গর্ভের নিদ্রা তার এখনো শেষ হয়নি। তারপর মাজেদার চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করে। হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে অধীরভাবে বলে, দাও, আমাকে দাও।

আজ সকাল থেকে মাজেদা বুঝতে পারে, তার স্তন যেন ভারী, স্ফীত হয়ে উঠেছে। তার সন্দেহ থাকে না যে কুচাগ্রের পশ্চাতে রহস্যময়ভাবে বিন্দু বিন্দু তরল পদার্থ জমছে নতুন এক জীবনের জন্য। তাই যে-শোকটা তিন দিনে কিছু স্তিমিত হযে এসেছিল, সে শোকটা আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কার জন্যে তার স্তন এমন ভারী হযে উঠেছে? তার গর্ভের সন্তানটি তো আর বেঁচে নেই। প্রকৃতি কি এতই অন্ধ? সে কি কিছুই দেখতে পায় না? শুধু তাই নয়, প্রকৃতি যেন শোকাপ্লুত মায়ের প্রতি বিদ্রূপ করছে। এক সময়ে তার মনে হয, এ অন্যায়, অতি নিষ্ঠুর। মনে হয সে তার দুধভারে স্ফীত স্তন যেন সহ্য করতে পারবে না। তারপর সালাহ্ উদ্দীন সাহেব প্রস্তাবটি নিয়ে এলে সহসা সে তার ভারী স্ফীত স্তনের মধ্যে একটি গুপ্ত নির্দেশ দেখতে পায়। না, প্রকৃতি খোদার সৃষ্টি বলে তার সহস্র চোখ, মানুষ যা দেখে না বোঝে না তাও সে দেখে, বোঝে।

বুকের কাছে ধরে মাজেদা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শিশুটির পানে, একটা অদম্য আবেগে তার সমগ্র দেহ কেঁপে ওঠে বার বার। শীঘ্র শিশুটি চিৎকার শুরু করে। প্রথমে মাজেদা চমকে ওঠে। বাণ্ডিলের শিশুটি যে কাঁদতে পারে সে কথা সে যেন ভাবে নাই। তার সন্তান একটু শব্দ না করেই যে অন্তহীন অন্ধকার থেকে সে এসেছিল, সে অন্ধকারেই

প্রত্যাবর্তন করেছিল। মাজেদা কি ভেবেছিল সে তার মৃত সন্তানকেই কোলে নিয়েছে? অদূরে মেঝেতে বসে দাই কোমরের কাপড়ের ভাঁজ থেকে পান-দোক্তা খুলে মুখে ভরে। সে বলে, — বাচ্চার ভুক লেগেছে। দুধ দাও।

মাজেদার চোখ আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে, মুখে অস্পষ্ট কোমল হাসির রেখা জাগে। হাঁ, সে দুধ দেবে বৈকি। তার উন্নত স্ফীত স্তনে ঝরণার মত আওয়াজ করেই যেন দুধ জমেছে। তার স্তনে সঞ্চিত দুধের বেদনা। সে বেদনা জীবনেরই বেদনা; বুকে যা জমেছে দৃষ্টির অন্তরালে তা স্নেহমমতার সুধা। মনে আছে তার অন্যান্য সন্তানের বেলায় যখনই শিশুর কান্না তার কানে পৌঁছুত, তখনই কুচাগ্র দিয়ে দুধ বেরিয়ে আসতো, পেটের নিচে কেমন সঙ্কোচন-প্রসারণ শুরু হতো। তার এখন মনে হয়, কোলের শিশুটির কান্নার আওয়াজে কুচাগ্র যেন তেমনি সিঞ্চিত হয়ে উঠেছে, তেমনি সঙ্কোচন-প্রসারণও শুরু হয়েছে পেটের তলে। শিশুটি যে তার নয়, তাতে বাধা পড়েনি।

দাই আবার বলে, — বাচ্চাটা কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে গেল। মা-হারা শিশুকে দুধ দেবে না?

এবার ক্ষিপ্রভঙ্গীতে জীর্ণ, কিছু ঘর্মাক্ত কড়া লাল রঙের ব্লাউজের বোতাম খুলে মাজেদা একটি স্তন উন্মুক্ত করে। কুচাগ্রটি ক্রন্দনরত শিশুটির কাছে ধরলে অধীরভাবে সে তা মুখে ধরে।

কিছুক্ষণ পর শিশুটি হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার শুরু করে। সে চীৎকার বঞ্চনা-নিষ্ফলতাই ঘোষণা করে। দাই ভ্রূকুটি করে মাজেদার দিকে তাকায়। যে দৃশ্যটি সে দেখে তাতে আর ভ্রূকুটি আরো গাঢ় হয়। মাজেদা সামনের দিকে তাকিয়ে কেমন নিস্পন্দ হয়ে বসে, কোলের শিশুটির কান্নায় তার কান নেই যেন।

কি হল? দাই প্রশ্ন করে।

মাজেদা সহসা উত্তর দেয় না। তারপর তার শুষ্ক ঠোঁট একটু কেঁপে ওঠে। ক্ষুদ্র কণ্ঠে সে বলে — দুধ জমে গেছে।

শিশুটি এক ফোঁটা দুধ পায়নি। মাজেদার মনে হয়, তার স্তন দুটি জমাদুধে হঠাৎ পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠেছে।

পরদিন ফজরের নামাজের পরই সালাহ্ উদ্দীন সাহেব খবর নিতে আসেন। কাদের বৈঠকখানায় এলে তিনি অন্যদিনের মত লাঠির মাথায় হাত জড়ো করে তার দিকে একবার তাকান, কিন্তু সরাসরি কোন প্রশ্ন করেন না। প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। শিশুটির ক্রন্দন শোনার জন্যে কান খাড়া করেন একবার। ভেতর থেকে কোন শব্দ না এলে নীরবতার অর্থ শিশুটির ভোজনতৃপ্তি হিসেবেই গ্রহণ করেন। কাদের তার স্ত্রীর দুধ দেবার ব্যাপারে অক্ষমতাটির কথা এখানো ভাল করে বোঝেনি বলে সে-ও কিছু বলে না!

সালাহ্ উদ্দীন সাহেব লাঠিটা একবার সশব্দে ঋজু করেন। আজ তিনি আর বসবেন না। উঠি-উঠি ভাব করে কাদেরের দিকে না তাকিয়ে বলেন, ফজরের নামাজের পর, ওজিফা খুলবো এমন সময় একটি কথা মনে হল। মুন্সীরহাটে আমার কিছু জমি আছে, ধান-ফসলের জমি। তার একটি অংশ আপনার স্ত্রীর নামে লিখে দিতে চাই। আশা করি তিনি গররাজি হবেন না।

কথাটা বলেই কাদেরকে কোন উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। রাস্তায় গাড়ীর ইঞ্জিন জীবন্ত হয়। শীঘ্র জ্বলা-পেট্রলের ঝাঁঝালো-মিষ্টি গন্ধে বৈঠকখানা ভরে যায়।

গাড়ীতে উঠবার আগে অকারণেই লাঠিটা আকাশের দিকে তুলে তিনি বলেন, কদিন মাছ-গোস্ত, শাক-সব্জীটা আমার বাড়ী থেকে আসবে। দাই ভালো রাঁধতে জানে।

অপরাহ্ণের দিকে ক্রন্দনরত শিশুকে নিয়ে দাই পিছনের সরু বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে, মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ। আজো বার বার চেষ্টা করেও মাজেদা শিশুকে দুধ দিতে সক্ষম হয়নি। আজ শিশুর চতুর্থ দিন। জন্ম হবার পর থেকে তার পেটে এক ফোঁটা দুধ পড়েনি। দাই তাকে চামচে করে পানি দিয়েছে কিছু, কিন্তু পানিতে ক্ষিধে যায় না। অবশ্য সে জানে, নবজাত শিশু না খেয়ে কয়েকদিন দিব্যি সুস্থ দেহেই বেঁচে থাকতে পারে। তবু চার দিনেও শিশুর মুখে একটু দুধ না পড়লে তা চিন্তারই কথা।

ভেতরে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে মাজেদা নিথর হয়ে থাকে। তার চোখ নিমীলিত , ঠোঁট শুষ্ক। একটু আগে শিশুকে আবার দুধ দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সে ব্লাউজের বোতাম দেয় নাই। উন্মুক্ত স্তন এখন তার কাছে পাথরের মত ভারী মনে হয়। এ বিষয়ে তার মনে এখন কোনই সন্দেহ নাই যে, স্ফীত স্তনে দুধ জমে গেছে বলেই কিছু নিঃসৃত হচ্ছে না। কিন্তু কেন তার স্তনের এই অবস্থা হয়েছে? এ কী সম্ভব যে, যে দুধ তার সন্তানের জন্যেই এসেছিল, তার সন্তানটি আর নেই বলে সে দুধ জমে গেছে?

কথাটি মনে হতেই তারই অজান্তে একটি বিজয়ের ভাব রক্তের মত তার ধমনীতে স্রোতশীল হয়। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যেই মাত্র। কথাটি যে অতিশয় নির্মম তা তার বুঝতে দেরী হয় না। তাই শীঘ্র একটি তীব্র অনুশোচনার জ্বালা সে বোধ করে। কি করে সে এমন নির্মম কথা ভাবতে পেরেছে? শিশুটি নিজের গর্ভের না হোক, তবু সে শিশু। তাছাড়া মা হারা অসহায় শিশু। এমন শিশুকে কেউ কখনো দুধ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। নিষ্ঠুর মানুষও পারে না। তাছাড়া কথাটি যে সত্য নয় তার প্রমাণ সে নিজেই দেখতে পায়। শিশুটিকে স্তন দেবার জন্যে সে মনে প্রাণে দেহে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে। সে আকাঙ্ক্ষা কি ভুল হতে পারে?

কিন্তু শক্ত কঠিন স্তন ভারী হয়ে থাকে। বাইরে শিশুটির কান্নাও শোনা যায়।

কেন তবে তার বুকে এমনভাবে দুধ জমে গেছে?

এবার আরেকটি আরো নির্মম আরো নিষ্ঠুর সম্ভাবনার কথা তার মনে জাগে। তার মনে হয়, শিশুটিকে স্তন পান করাবার জন্যে সে যে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে, সেটি আসল সত্যটি ঢাকবার জন্য তার মনেরই একটি কৌশল মাত্র। আসল সত্যটি এই যে, তার নিজের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে সে চায় না যে, পরের শিশু বেঁচে থাক। সে জন্যেই তার বুকভরা দুধ এমন জমে পাথর হয়ে গেছে।

কথাটি কিন্তু তার সমগ্র অন্তর তীক্ষ্ণভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, বুঝি শ্বাসরোধ হবে। একটি অদম্য কান্নার বেগে তার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে।

কাদের আপিস থেকে ফিরেছে কি অমনি বাইরে সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের গম্ভীর শব্দ শোনা যায়। আজ সে শব্দ কানে আসতেই একটা গভীর আতঙ্কে মাজেদার ক্লান্ত মন ভরে ওঠে। শিশুর কথা না ভেবে আজ সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের কথাই সে সর্বপ্রথম ভাবে। সে যে তাঁর শিশু নাতিকে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারে নাই, সে কথা তিনি এখনো জানেন না। দাই এখনো কথাটা প্রকাশ করেনি। কিন্তু সে কতক্ষণ আর কথাটা প্রকাশ না করে পারে? কাদের তার অক্ষমতার কথাটা এখন জানলেও সে-ও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু তার পক্ষেও বেশিক্ষণ নীরব থাকা সম্ভব নয়। কথাটা জানতে পেলে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব কী ভাববেন? তাছাড়া, তিনি যদি শিশুকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান তবে সে কি লজ্জায় মরে যাবে না?

ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বসে মাজেদা তার স্বামীকে ডাকে। গভীর উৎকণ্ঠায় তার মুখ বীভৎসভাবে রক্তশূন্য দেখায়। কাদের এলে সে রুদ্ধকণ্ঠে বলে, ওকে এখনো বলো না,

বুঝলে? শিশু আজ রাতেই দুধ পাবে। আমি জানি। বুকের ব্যথাটা বড় বেড়েছে, আর দেরী হবে না।

কাদের স্ত্রীর অনুরোধটি রক্ষা করে। তবে সে সালাহ্ উদ্দীন সাহেবকে বলে, মাজেদাকে একটু ডাক্তার দেখানো দরকার।

সালাহ্ উদ্দীন সাহেব ঈষৎ শঙ্কিত হন।

কেন?

তার শরীরটা তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।

সেদিন সন্ধ্যার পর মাজেদাকে পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার একটি অপ্রত্যাশিত খবর দেয়। সে বলে, মাজেদার দুধ এখনো আসেনি। সেটা নাকি বিচিত্র নয়। আকস্মিকভাবে গভীর আঘাত পেলে দুধ আসতে দেরী হয়। মাজেদার খেয়ালটার কোন ভিত্তি নাই। সে কথাও সে বলে। দুধ ব্যতীত স্তনের স্ফীতির কারণও ডাক্তার দুর্বোধ্য-প্রায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ডাক্তারের আবিষ্কার মাজেদাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। দুধ একেবারে আসেনি সেকথাটি দুধ জমে যাওয়ার চেয়েও অধিকতর ভীতিজনক মনে হয় তার কাছে।

ভীতির কারণ আছে বৈকি। এবার সে বুঝতে পারে, তার মনের নির্মম কথাটি সে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। এবার মনের প্রান্তে একটি নির্লজ্জ কণ্ঠধ্বনি স্পষ্টভাবেই সে শুনতে পায়। সে কণ্ঠ বিজয়ীর সুরে বলে, নিজের সন্তান মরে গেছে তো বুকে দুধ আর আসবে কেন।

অবশ্য কথাটি পূর্বের মত এবারও তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত করে। অবশেষে মাজেদাকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়। সে জানে তার সময় নেই। ডাক্তারের কথা শুনে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব আর দেরী করবেন না। এবার তাঁর শিশু-নাতিকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। মা-হারা অসহায় শিশুকে বুকের দুধের জন্যে তার কাছে এসেছিলেন কিন্তু তিনি নিরাশ হয়েই ফিরে যাবেন।

অবশ্য মাজেদা এবার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে যে, সবটাই তার জন্যে একটি পরীক্ষা মাত্র। তার সন্তানের মৃত্যু, সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের শিশু-নাতি নিয়ে আসা, এমন কি ডাক্তারের মত — সবই পরীক্ষা। এবার তার চোখে তার সন্তানের মৃত্যু অসত্য রূপ ধারণ করে, সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের আবির্ভাব গূঢ় উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত হয়, এবং ডাক্তারের মতটি ধোঁকাতে পরিণত হয়। ধোঁকা নয় তো কি? তার যে স্তনভরা দুধ, সে কথা কি সে জানে না? আজ সন্ধ্যায় তার স্তন আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। দুধ যেন আর ধরে রাখা যাবে না। তাছাড়া তার স্তন আর তেমন শক্ত কঠিন নয়। তাতে দুধ আর জমে নেই। বরঞ্চ তরল দুধে তার স্তন টলমল করছে।

তবে কুচাগ্রে কী যেন আটকে আছে বলে দুধটা সরছে না। বোতলের গলায় ছিপি আটকে গেলে যেমন কিছু সরে না, এও তেমনি হয়েছে।

মাজেদা হঠাৎ ধীরস্থিরভাবে উঠে বসে। তার মুখে একটি বিচিত্র শান্তির ভাব। সে জানে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তার মাতৃত্বের দাবী স্থাপিত হবে, তার মৃত সন্তানও ফিরে আসবে।

মাজেদা আর দেরী করে না। তার সময় নেই। দৃঢ় হাতে সে ব্লাউজের বোতাম খুলে প্রথম ডান স্তন তারপর বাম স্তন উন্মুক্ত করে। এবার বালিশের নীচে থেকে একটু হাতড়ে একটি সরু দীর্ঘ মাথার কাঁটা তুলে নেয়। তারপর নিষ্কম্প হাতে সে কাঁটাটি কুচাগ্রের মুখে ধরে হঠাৎ ক্ষিপ্রভাবে বসিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ একটি সুতীক্ষ্ণ ব্যথা তীরের মত ঝলক দিয়ে

ওঠে। সহসা চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয। তবে সে টু শব্দটি করে না। একটু অপেক্ষা করে পূর্ববৎ দৃঢ় নিষ্কম্প হাতে একবাব শুধু স্পর্শেব সাহায্যেই নিশানা ঠিক করে সে দ্বিতীয় কুচাগ্রেও কাঁটাটি বিদ্ধ করে। আবাব সে মর্মান্তিক ব্যথাটি জাগে। ক্ষণকালের জন্য তার মনে হয়, সে চেতনা হারাবে। কিন্তু অসীম শক্তিবলে সে নিজেকে সুস্থির করে। দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা বোধ করলেও সে বুঝতে পারে, তাব স্ফীত সুডৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝবতে শুরু করেছে। স্তনেব নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দূব হয়েছে। স্তন থেকে দুধ সরতে আর বাধা নেই।

বাইবে এবাব সালাহ্ উদ্দীন সাহেবেব গাড়ীব আওযাজ শুনা যায। মাজেদা সে আওযাজে এবাব আতঙ্ক বোধ করে না। তাব স্তন থেকে যখন ঝরতে শুরু করেছে তখন আতঙ্কেব আর অবকাশ নেই। তাব স্তন থেকে দুধ ঝরে, অশ্রান্তভাবে দুধ ঝরে। তবে সে দুধেব বর্ণ সাদা নয় লাল।

মুক্তামালা

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

দু মাস আগেও শ্রাবণ সংক্রান্তির মেলা কবে আসবে বলে বসে বসে দিন গুনেছে টগর।

আজ তার দিন গোনার কাল শেষ যদিও সে আকর্ষণ আব নেই মেলায়। দুপুরে যখন উদাস-করা মেঠো হাওয়া বয়ে আনে দক্ষিণের বসন্ত-সুরভি, যখন বউদি আব গীতা ঘুমিয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে, একা তখন জেগে থাকে টগর কাব কথা মনে কবে। মুক্তোব মালা না সেই মানুষটি, যে তার জন্য মালার পসবা সাজিয়ে বসে থাকবে মনোহাবী দোকানে।

তাই যাবে টগব মেলায়। তার ঘরেব মানুষকে আসতে বলে দিয়েছে মেলাব নাম কবে। সেও হয়ত আজই এসে যাবে এক সময়। এবাবে আর সঙ্গে বউদি বা গীতা নয়। এবাবে দুজনে যাবে মেলাতলায বেড়াতে।

অথচ এই মেলাতেই টগর পব পব দু বছব গিয়েছে ওদেব নিয়ে। প্রথম বাব গিয়েছিল নিতান্তই বউদিব পাল্লায পড়ে। সংসারেব টুকিটাকি জিনিস চাই। মেলায পাওযা যায সস্তায আর নেওযা যায দেখে-শুনে।

বুড়ী মাযেব বাযনা ছিল একখানা মুড়ি-ভাজা খোলার। বাড়িব কাছে কুমোববাড়ি। তা হবে না বুড়ীব। ওদেব খোলা নাকি ভেঙে যায তাড়াতাড়ি আব দামও দু'পযসা বেশি। দু চাবটে পযসা সুবিধাব জন্য দু মাইল বয়ে আনতে কোনদিন কষ্ট হযনি মা'ব। বাতে পঙ্গু না হ'লে হয়ত সেও যেত ওদেব সঙ্গে!

প্রতিবাবই মেলা বসে শ্রাবণ সংক্রান্তিব দিনে। এই দিনে পূজা হয না মনসাব। মনসাব ছোট্ট ভাঙা ঘবটায় সেদিন ফুল আব দুধ-গঙ্গাজলেব ঢেউ বয়ে যায। দু-চাব মাইল দূব থেকে মেয়ে-পুরুষ ভেঙে পড়ে এখানে। পুরুষেব চেয়ে ভিড় বেশি মেয়েদেব।

তবু এই ভিড় জেনেও গিয়েছিল সে বউদি আর বোনেব হাত ধরে। বোনেব চাই পুতুল আব বউদিব চাই কুলো, পাখা, চাকা-বেলুন এই সব আব কি? এগুলো দু'চক্ষে দেখতে পাবেনা টগব। কেবল বয়ে বেড়াও।

মুড়ি-ভাজা খোলাব সঙ্গে ঝাঁটা বাড়ন কয়েকটা নিয়ে এতটা পথ যেতে যে কি কষ্ট তা টগবও টেব পেয়েছে হাড়ে হাড়ে। বউদি বেশি বয়ে মবে। বাঁজা মেয়েমানুষ। তাই শক্তিও খুব। টগব দুবার বউদিব কষ্টের কথা ভেবে চেয়ে নিয়েছিল মুড়িব খোলা। পবদিন কাঁকালেব ব্যথায় মরে যায় আব কি।

মা-বউদির মত তার নিজেরও একটা শখ ছিল বৈকি। অন্য কিছুই নয, শুধু এক ছড়া মুক্তোর মালা। এব জন্যে টগব সমস্ত মেলাটা ঘুবেছিল বাব বার। বউদিব বকুনি খেয়ে আর ঐ মুড়ি-ভাজা খোলার বোঝা বয়েও নিবস্ত হয়নি। খুঁজছে আর খুঁজছে। শহবে গিয়ে কোন কলেজের মেয়ের গলায় দেখে এসেছিল মুক্তোব মালা। ভাবি পছন্দ টগরেব ঐ মালা। কি চমৎকার মানিয়েছিল মেয়েটিকে।

কাদায় কাদায় একাকার। মানুষেব পায়ে পায়ে একহাঁটু কাদা। তবু কাপড় তুলে কাদা ভেঙে টগর গিয়ে কেবলই খুঁজেছে মনোহারী দোকান। কোথায় সে দোকান? হাড়ি-কলসির দোকানের ভিড একদিকে। অন্যদিকে আম, লেবু, নারকেল, ফুল গাছেব দোকানের সারি। এ-ছাড়া মাছ ধরার সরঞ্জামে মেলাটা জমজমাট। বর্ষাকালেব মেলা তাই ছিপ-সুতো-বঁড়শি বার বিক্রিতে বোঝাই। নয়ত খাবারের দোকান। তেলেভাজা পাঁপডেব গন্ধে মেলা ভবপুর। পোডা ভেজাল তেলের গন্ধ পাওয়া যায় দূব থেকে।

—ও বউদি! তোমাব মুড়ি-ভাজার খোলা কিনতেই যে বেলা কাবাব। তাড়াতাড়ি কর না।

ছোট বোনটা কথা বলতে পাবছে না। সে পাঁপড় ভাজার দোকানেব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে।

—দিদি, পাঁপড় কিনবিনে? কেমন সোন্দব গন্ধ বেবিয়েছে।

—থাম্ মুখপুড়ি, কেবল খাই খাই।

খুঁজতে খুঁজতে শেষে ওরা হাজিব হযেছে মনোহাবী দোকানের সুমুখে। ইতিমধ্যে গীতার পাঁপড আর বউদির ঝাঁটা মুডিব খোলা কেনা সাবা। বউদি বেজায় খুশি। তাব মনের মত জিনিস পেয়েছে সে।

দু' দোকান ঘুবে শেষে বউদিব অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসে দাঁডিযেছে মনোহারী দোকানের সুমুখে। ছোট দোকান, ভিড় কমে এসেছে বেলা পড়ে আসাব জন্য।

—কি চাই? ছোকবা দোকানী উঠে এল ওদেব কাছে।

জিনিস চাইবে কি? টগবী দেখছে দোকানীকে। সুন্দব মুখ ছেলেটাব। সাধাবণ দোহাবা চেহাবাব মধ্যে একটা লাবণ্য আছে।

বউদিব কাঁখে মুড়ি ভাজা খোলাব বোঝা। বুঝি টন টন্ কবছে কোমব।

—কি নেবে নাওনা ঠাকুবঝি, দেবী কবছ কেন?

দোকানীব তৎপবতা ছিল বন্ধ। সেও এখন সচকিত।

—কি নেবে?

—পুঁথিব মালা আছে?

—আছে।

পছন্দ হযনা টগবেব কোনটাই। যে মালা সে দেখে এসেছিল শহবেব মেযেব গলায তার মত কোনটাই নয।

দোকানী একটি একটি করে পবম যত্নে তার বেসাতির সব কিছু খুঁজে এনেও মন পাযনা টগবেব।

—অন্য কিছু নেবে না?

—যা চাই তাই-ই নেই। আব কি নেবো?

—কিছু নেবে না। আলতা. সিঁদুব, টিপ, কুমকুম?

বউদি ততক্ষণে তার মুডিব খোলা নামিয়ে বেখে সহজ হয়েছে।

মুখ টিপে হেসে বলে—সিঁদুব নাও ঠাকুরঝি। আজ না হোক দুদিন পবেও তো লাগবে। দোকানেব সিঁদুরের বং লাগে বুঝি ঠাকুবঝিব গালে। দোকানীব দিকে চোখ তুলেই লজ্জায় নামিয়ে নেয় দৃষ্টি। দোকানীও হাসছে মুখ টিপে।

টগব অপ্রস্তুত হ'য়ে আবার একগাছা পুঁতিব মালা তুলে নেয় হাতে—এর চেয়ে ভাল মালা আনতে পার না? মুক্তোব মালা?

—ভাল মালা বিক্রি হয়না তো এসব মেলায়, তাই আনিনে।

দোকানটাব দিকে ভাল কবে চোখ বুলিযে দেখে নেয টগব। সত্যিই দোকানেব মাল কিছুই বিক্রি হয়নি মনে হয। পাশেব দোকানগুলো বড। তাদেব জিনিস অনেক খালি হয়েছে। শুধু এব দোকানে ভবা মাল।

—এ মালাটায কিন্তু মানাবে ভাল। এটা তো খাবাপ নয। মালাটা তুলে দিয়েছে ওব হাতে দোকানি।

বুঝি মাযা হয টগবেব। বেচাবিব বেচা-কেনা হযনি ভাল। কোথা থেকে এসেছে দুটো পয়সাব জন্য। ফিবে যাবে হতাশ হ'যে।

—নাও না ঠাকুবঝি, কি নেবে নাও তাডাতাডি।

কি নেবে বোঝেনা টগব। এ মালা সে নিতে পাববে না। অনেক কষ্টে মাযেব কাছে আদায় কবেছে মালাব পযসা। যা তা কিনে নিলে পবে আব পাববে না কিনতে। তাই ইতস্ততঃ কবে।

দোকানী কিন্তু গলদঘর্ম। তাব সাবা দোকানেব জিনিস এনে হাজিব কবেছে টগবেব সুমুখে। একটিব পব একটি জিনিস তুলে ধবেছে সে। কোনটা পছন্দ কববে খবিদ্দাব। অধীব আগ্রহে চেযে চেযে দেখছে টগবেব মুখেব দিকে। কোন জিনিসটা পেযে মুখে ফুটবে তাব হাসি।

কিন্তু এ সে মেযে নয। পযসা মাত্র কটা। যা দেখাচ্ছে তাব দোকান উজাড কবে তা সে কিনবে কি দিযে।

বউদি বিবক্ত আব অন্যমনস্ক। একটা কুমকুমেব শিশি তুলে দিযেছে দোকানী টগবেব হাতে। করুণ মিনতিতে তাব আঁখিদুটি ছলোছলো। মাযা লাগে টগবেব।

একটা কুমকুম কিনে নিযে ওবা মেলাব বাইবে এসে বসে। যাব যা জিনিস গুছিযে নেয। খিদে পেযেছে। এবাবে কিছু মুখে দিযে চলতে হবে দু'মাইল পথ। কিছু জিলিপি আব পাঁপড খাওযাব পব টগব উঠে পডে বলে—বস বউদি আমি আব একবাব দোকান থেকে ঘুবে আসি।

—কি কিনবে? তোমাব পছন্দসই জিনিস তো নেই।

—দেখি। তোমাদেব তো হযেছে।

—ও ঠাকুবঝি! বড বড চোখ কবে বলে এবাবে বউদি। বলি মানুষটাকে পছন্দ হযনি তো?

—যা:, তবে যাব না। যেতে যেতে দাঁডিযে পডে ও।

—যাও! যাও! ঠাট্টা কবলাম তাও বুঝি বোঝনা।

দোকানী নিবঞ্জন বুঝি খবিদ্দাবই খুঁজছিল এতক্ষণ। টগবকে আবাব ফিবে আসতে দেখে উৎসুক হ'যে ওঠে। অন্য একজন এক কৌটো সিঁদুব কিনেছে। টগব আবাব কি নেবে?

যদি কিছু নাও নেয তবু খুশি ওকে দেখে নিবঞ্জন—এসো, কি নেবে বল?

—কি আবাব নেব। কি আছে তোমাব দোকানে?

আবাব ঐ মালাগুলোই হাতে নিযে দেখে টগব ঘুবিযে ফিবিযে।

—একটাও কি ভাল জিনিস বাখতে নেই? দেখি অন্য দোকানে যাই।

—তুমি বস, আমি দেখছি।

নিজে দোকানদাব, ঠকবে না। টগবকে যদি ঠকিযে নেয। তা ছাডা দুটো পযসা লাভ কবতে হয় তো করবে সেই-ই।

—তুমি আমাব দোকান পাহাবা দাও। দুজনে চোখাচোখি হতে হাসে।

দু'গাছা মালা নিযে আসে নিবঞ্জন কিন্তু তাব একটাও পছন্দ নয টগবেব। সে মালাই নয।

অনেক আগ্রহে ওব মুখের দিকে চেয়েছিল নিরঞ্জন যদি খুশির ধমকে কালো চোখের তারাগুলো নেচে ওঠে। না, ভ্রূ দুটো আগের মতই কুঁচকে উঠেছে। ফুলের পাপড়ির মত পাতলা ঠোঁটটা অবহেলায় উল্টে যায় বুঝি।

মেলা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। সবই দূরেব লোক। সন্ধ্যা লাগবার আগেই ফিবছে বাড়িব দিকে। দু-এক দোকানে কাছের লোকদের আনাগোনা।

—আর কি আছে তোমার দোকানে?

—সবই তো দেখিয়েছি, বাকী চুড়ি।

চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে টগরের। ঠিক হয়েছে, চুড়িই পরবে কিন্তু পয়সা! যদি দাম বেশি লাগে। তার কাছে তো তিন আনা পযসা মাত্র। তাই ইতস্ততঃ করে। দোকানী নিরঞ্জন বুঝি ক্লান্ত আব বিষণ্ণ। এ কেমন মেয়ে। কেবল দেখে সব, কিনতে চাযনা কিছু। চুড়ি দেখেও হুমড়ি খেযে পড়ে না।

টগব একবাব আঁচলের খুঁট হাতড়ায় আব চুডির দিকে চায আড়চোখে।

নিবঞ্জন বুঝতে পারে পযসাব জন্য টগবের দোমনা ভাব। গ্রাহ্য কবে না। ক্ষতি তো হয়েছেই তাব। তাই তাড়াতাড়ি চুড়িব বাক্স খুলে প্রলুব্ধ করে টগবকে।

টগরের কেনা না কেনার দ্বন্দ্বের অবসান হয় এইভাবে। ঝুঁকে পড়ে চুড়িব ওপর। বং-বেব-এব নানা বকম চুডি। চাকচিক্য আব ঔজ্জ্বল্যে ঝকমকে।

বোন গীতার মত বযস কমে যায টগরের।

—দেখি দেখি, সত্যি কেমন সোন্দব এগুলো!

একটাব পব একটা হাতে তুলে নেয়। কাঁচেব চুডিব টুংটাং আওয়াজ ওঠে।

দুজোড়া চুড়ি বেছে নেয টগব।

—কত দাম?

—দামেব কথা থাক, পছন্দ হয়েছে তোমাব?

ঘাড় নাড়ে ও।

আরও একজোড়া ওর হাতে তুলে দেয় দোকানী।

—না না, আব নেব না।

—নাও না, আমি দিচ্ছি ভাল জিনিস।

এবার বসে পড়ে টগর। তার নিটোল হাত দুটি বাড়িয়ে ধরে দোকানীর সুমুখে।

—পরিযে দাও।

নিরঞ্জনের নিজের ইচ্ছা ছিল ঐ সুন্দব আর নরম হাত দুটিতে সে পবিয়ে দেবে কাঁচেব কঙ্কন একজোড়া। মকরমুখো কঙ্কনের মুখোমুখি দুটি মকরেব মুখ। ঠিক তেমনি করে দুটি মুখ সামনা-সামনি ঝুঁকে পড়েছে। মুখোমুখি বসে দুজনে। দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছে পবস্পব।

আত্মসমর্পণ কবেছে যেন টগর। হাতটাকে নিয়ে যেমন খুশি খেলা কবছে দোকানী নিরঞ্জন। ঘুরিযে ফিরিযে চুড়ি পরাচ্ছে, না দেখছে বোঝা যায় না। যেন নবম কাদার তৈরি একখানা হাত।

· এক একবার ছটফট করছে টগর। মুখ ঘুরিয়ে দেখছে আর ভাবছে বউদির কথা। বড় দেরি হয়ে গেল। তাড়া দিতে ইচ্ছা। কিন্তু নিপুণ শিল্পীর মত কোন ব্যথা না দিয়ে সন্তর্পণে যেভাবে চুড়ি পরাচ্ছে নিরঞ্জন তাতে যেন আরাম পাচ্ছে টগর। ধীরে ধীরে পরম যত্নে মানুষটা হাত বোলাচ্ছে আর তার মৃদু স্পর্শে শির-শির করছে টগরের সারা দেহ।

—হোলো? তাড়াতাড়ি কর না একটু।

মুখ না তুলেই জবাব দেয় দোকানী—এ সব কি তাড়াতাড়ির জিনিস!

—না না, আমার দেরি হয়ে গেল যে, বাড়ি যেতে হবে না! বউদি বকবে।

এক হাত ছেড়ে অন্য হাতটা টেনে নেয় নিরঞ্জন। যেন এ হাতের মালিক সাময়িকভাবে সেই-ই। সে কোন খরিদ্দারকে চুড়ি পরাচ্ছে না, পরাচ্ছে এমন একজনকে যার ওপর তার দাবি-দাওয়া অনেকখানি। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কোন কথা নেই। সে যেন পুতুল, তাকে মনের মাধুরী মিশিযে সে সাজিয়ে চলেছে। এ সময় অন্য কোন খরিদ্দার এলে সে যে তার দিকে মন দেবে এমন সম্ভাবনা নেই একটুও।

ওরা চুড়ি পরায় ব্যস্ত। কোন সময় বউদি এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে জানে না কেউ।

—ওমা! আমরা খুঁজে সারা। মেয়ের এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে চুড়ি পরা হচ্ছে।

যেন চোর ধরা পড়েছে এমনি মুখের ভাব টগরের।

—তা এতক্ষণ চুড়ি পরতে লাগে, আজ আব বুঝি বাড়ির কথা মনে নেই?

একটু নড়ে-চড়ে বসতে চায় টগর। নিরঞ্জন 'উঁহু' শব্দ কবে আবাব মন দেয় চুডি পরাতে।

—এই দেখ না বউদি, তাড়াতাড়ি করতে বলছি .. আটকে যায়। একটু থেমে বলে—দোকানদারের বা কি দোষ, আমার হাতের মুঠো এত শক্ত বুঝলে বউদি? এবার কৃত্রিম বাগে চোখ রাঙিয়ে ঘন ঘন ঘাড় নাড়ে বউদি—হুঁ তোমাব হাত বড় শক্ত নয ঠাকুবঝি, তাই বুঝি নরম হাতেব লোক নিয়ে এতক্ষণ ধরে চুড়ি পবছিলে?

আর বুঝি বসে থাকা যায় না। লজ্জা শুধু তাকেই স্পর্শ কবে না, দোকানীকেও বুঝি ছুঁযে যায় রঙেব হাওযা।

—চল বউদি, হয়ে গিযেছে, কত দাম?

কি বলবে ভেবে পায় না দোকানী। বউদি না থাকলে সে এক পযসাও হয়ত দাম নিতে পাবত না। এখন তা না নিলেই নয। তাই বলে—তিন আনা।

—ওমা! এত সস্তা এই কঙ্কন আব চুডিব দাম? সাঁঝ না লাগলে আমিও পবতাম।

—আব আমিও—গীতাব সুবে সুব মেলায বউদি।

এবাব ফেবাব পালা। উঠে পড়েছে টগব। বউদি শুরু কবেছে হাঁটতে মুডিব খোলা কাঁখে নিযে। সবাব পিছনে টগব।

—আসছে বাবে আমার ভাল মুক্তোর মালা চাই। আনবে তো?

—আনব। যেখানেই থাকি তোমাব জন্য দোকান নিযে আসব আব চমৎকাব মালা আনব।

—ঠিক তো, মনে থাকবে?

—থাকবে। তারপব দু পা এগিযে এসে গলাব সুর নামিযে বলে—তোমাব কথা কি ভুলতে পাবি?

হাসিমুখে বিদায নেয টগব। পায়ে পাযে পথ চলে আর চায ফিবে ফিবে। পা যেন চলে না। যে মেলায় পথ চলা ছিল দুষ্কর, মেয়ে-পুরুষেব গাদাগাদি, কোন ভেদাভেদ ছিল না, মেয়েদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে গেলেও উপায় ছিল না গায়ে গা না দিয়ে চলাব, সেই মেলাতলা ফাঁকা। কেবল দোকানীরা বসে দোকানে। বাতি জ্বেলেছে অনেকেই। গ্রামের কুকুরেরা এঁটো রসলাগা শালপাতা চাটছে একমনে। গ্রাম থেকে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে গ্রাম্য বধূদের ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনির আওয়াজ আসছে ভেসে।

তবু পথ চলতে টগরকে কে যেন টানছে পিছন দিকে।

—কি হোলো গো ঠাকুরঝি? না হয় থেকে যাও আজকের মত। কাল মালাবদল করেই না হয় বাড়ি যেও—খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ে বউদি।

অনেক দূরে গিয়েও টগব পিছন ফিরে দেখে দোকানী চেয়েই আছে তার যাওয়া পথের দিকে।

এবার আগে থেকেই বায়না ধরেছে টগর মেলায় যাবার। গতবারেও মুড়ির খোলা বইবার ভয়ে প্রথমে রাজী হয়নি ও। এবারে অন্য কোন কথা নেই, তাব শুধু মনে আছে একটি কথা। পুঁথির মালা আনবে দোকানী।

মেলার দিনে সেজেগুজে টগব বউদিকে আর গীতাকে নিয়ে মেলায় হাজির। মেলায ঢুকেই ব্রহ্মাণীব পূজা দেওযার ব্যাপাবটা সারতেই হয় প্রথমে। তারপব কেনাকাটা। বউদি আব বুড়ী মায়ের বায়না! সেগুলো মেলায ঢুকলেই মেলে। কিন্তু তারটা।

—কই বউদি, হোলো না তোমাব?

দাঁড়াও বাপু, অত তাড়া কিসের? দেখেশুনে নিতে হবে না। মাটিব জিনিস তো।

দেবি সয় না টগবের। মনোহারী দোকান মেলার শেষ প্রান্তে। এইটুকু যেতেই সময় লাগবে আধ ঘণ্টা।

এবারে মায়ের বাযনা বেশি। টুকিটাকি কত কি। বউদি কেনে আর টগর ছটফট করে।

বউদিব কেনা শেষ হলো তো শুরু গীতার। সে এবার নিজের পয়সা জমিয়ে এসেছে মেলায। তাব পুতুল চাই। এ দোকান ও দোকান। টগব তাড়া দেয় ওকে—যা নেবাব তাড়াতাড়ি নে না গীতা।

—অমন করছ কেন ঠাকুরঝি? বেচারি ছেলেমানুষ বলে কি পছন্দ-অপছন্দ নেই?

সকলেব সব কেনা শেষ করে এবাব চলে তাবা মনোহাবী দোকান পটিতে। তাড়াতাড়ি করে কিন্তু উপায নেই।

পিছল পথ। সকালে বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা। তাছাড়া লোকে লোকাবণ্য। সকলেই যেন তাদেব পথবোধ করে দাঁড়িযে।

অবশেষে অনেক কসরত করে দুবাব পিছলে পড়তে পড়তে শাড়িতে কাদা লাগিযে যখন হাজির হলো মনোহারী দোকানের পটিতে তখন এই দিকটায ভিড় কম। কিন্তু কই, কোথায় গেল তাব দোকানী? কোথায বসেছে সে?

তন্ন তন্ন করে প্রত্যেকটা দোকানেব সুমুখে দাঁড়িয়ে খোঁজে টগব নিরঞ্জনকেই।

—এই যে মা, কি নেবে?

—কি চাই খুকি?

—দেখুন না একবাব।

কে দেখবে? টগবের দৃষ্টি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রত্যেকটি দোকানদাবের মুখেব উপব দিযে। কোথায় তার সেই চেনা মুখ যাকে দেখবে বলে সে ছুটে আসছে দলবলকে পিছনে ফেলে উদভ্রান্তের মত।

মনোহাবী পটিব সব কটা দোকান দেখা সাবা। কোথাও নেই নিবঞ্জন। গত বছর সে যে যায়গায় দোকান পেতেছিল সেখানে নতুন লোক বসেছে দোকান নিয়ে।

—আচ্ছা, গেল বছরে যে লোকটা এসেছিল দোকান নিয়ে সে আসেনি?

— কে নিবঞ্জন? দোকানীব মুখে দেখা দেয় বিদ্রূপের হাসি। ভ্রূ কুঁচকে বলে—তাকে আর দোকান করতে হবে না। সে এখন মুনিশ খাটছে মাঠে!

লোকটার নির্মম বিদ্রূপে জ্বলে ওঠে টগর। কিন্তু পরক্ষণেই নিরঞ্জনের কথা মনে করে মুষড়ে পড়ে দুঃখে আর বেদনায়। অমন সুন্দর চেহারার মানুষটা রোদে পুড়ে জলে ভিজে কাজ করছে এখন মাঠে!

যে উৎসাহ নিয়ে মেলায় এসেছিল টগর তার দ্বিগুণ অবসাদে ভেঙে পড়ে। ভাল লাগে না মেলার ওই হাসি উৎসবকে। মনে হয় লোকটাকে যদি একবার সে পায় জিজ্ঞাসা করে কেমন করে উঠে গেল তার দোকান। আর কোনদিন সে আসবে না দোকান নিয়ে, আনবে না তার মুক্তার মালা? সে যে কথা দিয়েছিল মুক্তার মালা আনবে তার জন্য।

ধীরে ধীরে বাড়ি চলে। কোন আকর্ষণ নেই তার মেলায়।

—চোর, চোর! মার শালাকে!

বেজায় ভিড় জমেছে চোরকে ঘিরে। মেলার অর্ধেক লোক ভেঙে পড়েছে সেখানে।

—চোর ধরা পড়েছে! শালা যা মাব খেয়েছে সাংঘাতিক।

—কি চুরি করেছে গো?

—মেয়েলোকের গহনা নিয়ে পালাচ্ছিল।

চোরের কথা বলারও ক্ষমতা নেই। মারেব চোটে চোখ দুটো ফুলে কাপড় ছিঁড়ে কুটি কুটি। রক্ত গড়াচ্ছে ঠোঁটের পাশ দিয়ে অল্পস্বল্প।

যার গলার হার ছিঁড়ে নিয়েছে সেই মেয়েটি এসে হাজিব। চোরের পকেট হাৎড়িয়ে বাব হয় এক ছড়া মুক্তার মালা!

—এটা কি আপনার?

—না তো! মেয়েটি ঘাড় নাড়ে।

—তবে?

—সে বোধ হয় অন্য লোক! চোব পালাবাব সময় 'চোর চোর' বলতে বলতে পালিয়েছে। এ বেচারী সামনে পড়ে চোর বনে গিয়েছে।

—ছিঃ ছিঃ ভাবী অন্যায়! ঠিক হয়নি এমন কবে একটা ভাল লোককে মাবা।

—না মশাই, এই-ই চোর! দলের লোকের হাত দিয়ে পাচাব কবে দিয়েছে মাল।

—যাঃ! তাই কি হয়!

—তবে এ মুক্তোর মালা কাব?

ভিড দেখে কৌতূহলী হয়ে উঁকি মারে টগর। চমকে ওঠে হঠাৎ চোর দেখে। এ যে তাব দোকানী। চেনাই যায় না মানুষটাকে।

—মালা কোথায় পেয়েছ কত্তা, কাব মালা?

—আমাব। ভিড়ে ঠেলে একেবাবে চলে গিয়েছে টগর নিবঞ্জনেব কাছে। তাবপব হঠাৎ তার হাত ধবে টানতে টানতে ভিড ঠেলে বাইরে এসেছে ওকে নিযে। ভিড়েব চাপে ওব অত সাধেব মুক্তোর মালা ছিঁড়ে টুকবো টুকবো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।

—আমার মালা, মালা কি হলো? এতক্ষণ মার খেযেও কথা বলেনি নিবঞ্জন। হতভম্ব হয়ে সব সহ্য করেছে। সহ্য কবেছে টগরকে এই মেলায খুঁজে মুক্তোব মালা দিতে পাববে এই ভবসায।

এখন মালা ছিঁড়ে যাওয়াব বেদনায় আর্তনাদ কবে ওঠে ও।

ততক্ষণে টগব ওকে নিয়ে এসেছে মেলার বাইবে ফাঁকা মাঠে। গীতাব কেনা খেলাব ভাঁড়ে করে জল এনে ওর চোখেমুখে দিয়েছে ছিটিয়ে। হাওয়া কবেছে বাডিব জন্য কেনা পাখা দিয়ে।

—জানো, আমি অনেক কষ্টে তোমার জন্য মালাটা কিনেছিলাম! এত মার খেয়েও নিরঞ্জনের চোখে জল ঝরেনি, এবারে মরদ ব্যাটাছেলে কেঁদে ফেলে।

—ছিঃ কাঁদতে নেই। তুমি আবার দোকান কর। সামনের মেলায় দোকান নিয়ে এসো আর আমার জন্যে নিয়ে এসো এর চেয়েও ভাল মুক্তোর মালা।

—তুমি আসবে আবাব ও মেলায?

—আসবো! মালা না পাওয়া পর্যন্ত আমি আসবো। তুমি দোকান সাজিয়ে রাখবে আমাব জন্যে।

টগবেব উৎসাহে সেইদিনই খাড়া হয়ে দাঁড়ায় নিবঞ্জন। এক বছবের মধ্যে সে খেটেখুটে আবার দোকান নিয়ে আসে পবেব মেলায়। টগব অপেক্ষা করেছিল এক বছর ধবে মুক্তোব মালাব জন্য।

মেলায় এসেছে টগর। খুঁজে বাব করেছে নিরঞ্জনেব দোকান। আগের চেয়েও ভাল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখ।

—এসো, এসো।

এক মুখ হাসি নিয়ে নিবঞ্জন সাদব অভ্যর্থনা জানায় টগবকে।

—কই, আমাব মালা কই? বলেই নিরঞ্জনেব দেওয়াব অপেক্ষা না কবেই পুঁথিব মালা ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেয়ে যায় চমৎকাব একছড়া মুক্তোব মালা সযত্নে আলাদা কবে বাখা এক কৌটায়।

এতক্ষণ চোখ পড়েনি নিবঞ্জনেব টগবেব দিকে। হঠাৎ ওব মুখেব দিকে চেয়ে অবাক। এ তো সে টগব নয়। মাথায় তাব ঘোমটা, গা ভবা সোনাব গহনা, পবিপাটী কবে বাঁধা খোঁপা, মুখেব হাসিতে বাঁধভাঙা খুশিব বন্যা। কপালে কাঁচপোকাব বদলে সিঁদুবেব টিপ। সিঁথিতে জ্বল জ্বল কবছে বক্তেব বং। সঙ্গে না আছে বউদি, না বোন। এতক্ষণ পিছিয়ে থাকা সুবেশ যুবকটা দাঁড়িয়েছে পাশে এসে।

—দেখ, কেমন চমৎকাব মুক্তোব মালাটা।

নিবঞ্জনেব চোখেব সামনে ভেসে ওঠে এক বছবেব আগেব আসা টগবকে। নিবাভবণ দেহ, আধ ময়লা কাপড় পবনে, তেল চুকচুকে মুখ। তাব মাব খাওয়াব পব ব্যথা আব সহানুভূতিতে ছলছল দুটি করুণ চোখ, যে চোখে ছিল ববাভয়।

না, একে চেনে না নিবঞ্জন। এ ষড়ৈশ্বর্যময়ী হাস্যে লাস্যে ভবা স্বামীসোহাগিনী নাবীকে চেনে না সে তো।

—দেখি মালাটা? নিবঞ্জন হাত বাড়িয়েছে।

টগব এগিয়ে দেয় মালাটা।

—দেখুন আমি ভাবী দুঃখিত। এ মালাটা অনেক আগে বিক্রি হয়ে গিয়েছে, আমি ভুলে বিক্রিব জায়গায় বেখেছিলাম এটা।

—সে কি? এগিয়ে আসে যুবকটি। কত দাম চান বলুন না?

—না, এটা দাম দিলেও পাবেন না।

—ওঃ, বুঝেছি। বিশেষ কাবও জন্য, তাই বলুন? ভদ্রলোক নিজেব বসিকতায় হেসে ওঠেন হো হো কবে।

কিন্তু তাব পাশের যে মানুষটি এতক্ষণ হাসি আব উচ্ছলতায় খুশিব ফোয়াবা ছুটিয়েছিল সে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। তাব সুর্মা-টানা চোখেব কোণটা চিক্‌চিক্ কবে ওঠে অকাবণেই।

সাগিনা মাহাতো

গৌরকিশোর ঘোষ

বসন্দা, দিন্দা, করবীদি, শরৎদা — এদের কাহিনী তো দিব্যি বলতে পেবেছি। একটুও বাধেনি। তবে সাগিনাব কথা বলতে গিয়ে বার বাব হোঁচট খাচ্ছি কেন?

তিন বছর ধরে চেষ্টা করেছি সাগিনাব কাহিনী বলবাব কিন্তু কিছুতেই মনের মতো কবে বলতে পাবছিনে। অথচ সাগিনাকে বাদ দিলে চেনামুখেব উজ্জ্বল মুখটাই বাদ পড়ে যায়।

সাগিনাব কথা মনে হলেই ১৯৪৪ সালেব ডিসেম্বব মাসেব সেই হাড়কাঁপানো সকালটাব কথা আমাব মনে পড়ে।

জমাট কুয়াশায় হিমালয়ের পাদ স্টেশনটা ঢেকে গিয়েছিল সেদিন। দার্জিলিঙ মেলেব শার্সি তোলা ভ্যাপসা থার্ড ক্লাস কামরা থেকে প্ল্যাটফবমে নামাব সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হযেছিল, ঠাণ্ডা কবাত দিয়ে পা দুটো কে বুঝি কেটে নিল। শীত যে এমনভবে কামড়ায় সে ধাবণা আগে কখনো ছিল না।

জিনিসপত্র সামান্যই। সেগুলো হাতে নিযে সামনেই যে পাহাড়ী কুলিটাকে পেলাম তাকে জিজ্ঞাসা কবলাম, 'সাগিনাকে চেনো?'

সে আমাকে বেশ কবে দেখে নিলে, তারপব কথার জবাব না দিয়েই চলে গেল।

পকেটে পয়সাকড়ি প্রায় নেই। কাল দুপুবেব পর থেকে পেটেও বিশেষ কিছু পড়েনি। সারা রাত ট্রেনে তো প্রায় দাঁড়িযেই কেটেছে। তার উপব সকালের শীতেব এই অসহ্য বোঝা। মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি যদি গবম কিছু পেটে না পড়ে, যদি আগুনের তাতে হাত-পা সেঁকতে না পারি তো মরে যাব।

এই অচেনা নির্বান্ধব পুরীতে দু'জন লোককে জানি। এক কমরেড কাজিমন। সে আমাব বন্ধু। আব যাব কাছে এসেছি, সেই সাগিনা। এই বছবই এপ্রিল মাসে তাকে প্রথম দেখি। ঝরিয়াব শ্রমিক সম্মেলনে। কাজিমনই তাকে এনেছিল।

কাজিমনকে এখানে পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সে থাকে খার্সাং-এ। এখানে এক সাগিনাই আমাব ভরসা।

কিন্তু কোথায সাগিনা? যাকে শুধাই, সেই মুখ ফিরিযে চলে যায। স্টেশন ঘবে ঢুকে দু'একজন রেলবাবুকেও জিজ্ঞাসা করলাম। তাতে তাঁরা খেঁকিয়ে উঠলেন। কে সাগিনা? ও সাগিনা-ফাগিনা কাউকে চিনি না মশাই।

অগত্যা স্টেশন থেকে বেবিযে বাজাবে এলাম। সেখানে একটা ছোট চা-খানায় ঢুকে চা খেতে খেতে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, পাহাড়ী রেলের লোকো শেডটি কোথায়?

লোকটির কথায় জানলাম, একটু দূরেই হবে জায়গাটা। পাহাড়ী রেলের এই ছোট লাইন ধরে এগিয়ে যেতে হবে। একটা ছোট স্টেশন পড়বে। সেখান থেকে ডানহাতি মোড় ঘুরে একটা ছোট বাজার। বাজারের ভিতর আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেই লোকো শেড মিলবে। মহানন্দার কাছ বরাবর।

আকাশের গতিক দেখে মনে হলো, যে-কোন সময় বৃষ্টি নামবে। হাওযা দিচ্ছে এলোমেলো। পথ ধরে হাঁটছি। ধকস্ ধকস্ করতে করতে দুটো ইঞ্জিন খানকয়েক গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে গেল পাশ দিযে। শৈলাবাসে চলেছে। সামনের ইঞ্জিনেব বাফারের উপর দুটো পাহাড়ী বালি হাতে বসে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি বলছে তারা। কমলালেবুর পাহাড় তৈরি হয়েছে এখানে-ওখানে। চেঁচামেচি চলেছে বেজায। গোটা কযেক বাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রী ঠুসছে পেটে। হুস-হাস ট্রাক, মোটর-কার চালিয়ে বেবিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী ড্রাইভাব। আমার মন কাউকেই তেমন করে দেখছে না। যদি সাগিনাকে না পাই?

অনেকখানি হেঁটেছি। হাঁটতে ভাল লাগছে। ভিতবটা একটু গবমও হয়েছে। এই তো সেই স্টেশন। ঐ বুঝি সেই বাস্তা। হ্যাঁ, এই যে বাজাবটা।

দু-চার পা সেদিকে এগিযে যেতেই দেখি এক চা-খানার সামনে তুমুল হাঙ্গামা বেধে গেছে। একটা পাহাড়ী মেয়ে ঝাঁটা দিযে একটি লোককে দমাদম পিটছে। সেও মেয়েটাকে কিল ঘুষি লাথি চালাচ্ছে। লোক জমে গেছে চারিদিকে। মজা দেখছে সবাই। আমি তো ঘাবড়ে গেলাম। হঠাৎ হৈ-হৈ বেড়ে গেল। সিটি পড়তে লাগল সুঁই সুঁই। কি হলো, দেখতে গিয়েই আমি থ। ঝাঁটাব ঘাযে অস্থিব হযে লোকটা মেয়েটাব কাপড় ধবে মেরেছে এক টান। সেই টানে বিবস্ত্রা হযে বেকুব বনে গেছে মেযেটা। বিনা পযসায এমন জমাটী খেল দেখে জনতা আহ্লাদে সিটি বাজিযে চলেছে।

হঠাৎ কোত্থেকে সাগিনার আবির্ভাব হলো। মুহূর্তের মধ্যে সব তছনচ হযে গেল।

'শালে কুত্তাকে বাচ্চা' বলে সাগিনা লোকটাব ঘাড় ধবে শূন্যে তুলে ফেলল। মনে হলো একটা বাঘেব থাবায নেংটি ইঁদুব ঝুলছে। আবেকটা থাবা দিযে সাগিনা তাব গালে মাবলে চড। লোকটাব কশ বেযে কযেক ফোঁটা রক্ত বেবিযে পডল। তারপব সাগিনা তাকে ছেঁড়া বস্তাব মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল। জটলাব দিকে চেযে খ্যাপা গোবিলাব মতো হুঙ্কার ছাডল, 'ভাগো শালা সব।'

মুহূর্তেব মধ্যে তামাসা মাটি। জায়গা ফাঁকা হযে গেল।

চা-খানায ঢুকে মেয়েটা কাপড় পবে নিল। সাগিনা তাব পাশে গিযে বসল। লোকটাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে এল। আমিও একপাশে বসে পডলাম। আমাব মনে হলো, বাহাদুর-মার্কা ইংবাজি সিনেমাব একটা দৃশ্য যেন এইমাত্র দেখলাম।

সাগিনা আমাব দিকে ভ্রূকুটি করে চাইতেই বললাম, 'কমবেড সাগিনা, আমি কলকাতা থেকে আসছি।'

সাগিনা একবাব শুধু বলল, 'কলকাত্তেকে কামবেড? আচ্ছা, ঠিক হ্যায, পিছু বাত হোগা।'

তাবপব আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবে পাহাডী মেযেটিকে মোলাযেমভাবে জিজ্ঞাসা কবল, 'তুই কে?'

মেযেটি একটু হেসে বললে, 'ললিতা।'

এতক্ষণ পবে সাগিনার স্বভাব-রুক্ষ বিরাট চাকার মতো মুখখানা একটু যেন কোমল হযে উঠল, খপ করে ললিতার থুতনিটা ধরে ওর মুখটা একটু তুলে ধবলে, কিছুক্ষণ মুগ্ধ হযে চেয়ে থাকলে।

তাবপর বলল, 'বাঃ, তুই তো বেশ খুবসুরত।'

মেয়েটিখিলখিল করে হেসে উঠল। সত্যি, ভাল করে চেয়ে দেখলাম, ললিতা সুন্দরী বটে।

সাগিনা বলল, 'ও তোর কে হয়?'

ললিতা বলল, 'দুশমন।'

তারপর আবার খিলখিল করে গড়িয়ে পড়ল হেসে।

লোকটা এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

গর্জন করে বলে উঠল, 'ও আমার আওরাত। পালিয়ে এসেছে ঘর থেকে।'

ললিতার দিকে চেয়ে বলল, 'চল ঘরে। দুশমনি বার করব। জিন্দা পুঁতে ফেলব।'

রাগে অপমানে সেই পাহাড়ী মুখ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল। ললিতা সাগিনাব কাছ ঘেঁষে সরে বসল। তারপর লোকটার দিকে অবহেলার থুথু ছুঁড়ল। থুঃ।

সাগিনা ললিতার একটা হাত আলতোভাবে চেপে ধরল।

লোকটার দিকে কটমট করে চেয়ে বলল, 'আগর জান কি পরোয়া হ্যায় তো ভাগ হিঁয়াসে। জান থাকলে বহুৎ আওরৎ মিলবে।'

লোকটা বাঘের মতো চোখে একবার ললিতাকে, আরেকবার সাগিনাকে দেখে নিল। তারপর কোনো কথা না বলে চলে গেল।

সাগিনা ললিতার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'নে, হযেছে? গিযেছে তোর দুশমন? আখুন তুই কোথায় যাবি বল?'

ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, 'আমি কি জানি?'

মিটমিট করে হেসে সাগিনা বলল, 'তো যা তোর দুশমন তো ভেগেছে, এবার কোথায় যাবি চলে যা।'

ললিতা একটু অবাক হয়ে সাগিনাব দিকে চাইল। কিন্তু সে একটুক্ষণ, তারপরেই তাব মুখে কেমন এক দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল। হাসতে হাসতেই উঠে পড়ল। পোশাকটা ঠিকঠাক করে নিল। তারপর দরজার দিকে পা বাড়াল।

সাগিনা খপ কবে হাতটা ধরে বলল, 'বহুৎ আচ্ছা। খুব আচ্ছা জবাব দিযেছিস। চল, তোর একটা ঠিকানা করে দিই।'

সাগিনা উঠে পড়ে দেখে আমি ওকে বললাম, 'কমরেড সাগিনা, আমি কলকাতা থেকে আসছি। কমরেড মিত্র আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে।'

এতক্ষণ আমার কথা ওর মনেই ছিল না। যেন এইমাত্র আমাকে দেখল।

বলল, 'হাঁ হাঁ, কলকাতাব কমরেড, ঠিক হ্যায়। হবে, তোমার সঙ্গে বাতচিত হবে। পিছে হবে। দেখছ তো, আখুন ব্যস্ত আছি। কাল পরশু দেখা হবে।'

বলেই দরজার দিকে পা বাড়াল। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। খিদেয তখন আমাব পেটে পাক দিচ্ছে। ওকে খুঁজে বার করতেই তো দম বেরিয়ে গেছে। এখন বেলা দুপুব। দুপুরের পর বিকাল হবে। রাত আসবে। থাকব কোথায়? ওকে ছেড়ে দিলে আর কি ওব পাত্তা পাব?

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'দেখ কমরেড, ব্যাপারটা জরুবী, ইউনিয়নের কাজে এসেছি। এসেছি তোমার কাছে, থাকব কোথায়?'

সাগিনা এবার আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

'আরে বাহবা বাহবা। এর মতুন তুমাবো ঠিকানা নেই। তো ঠিক হ্যায, তুমভি চল হামারা সাথ। ফযসালা একটা হবেই হবে।'

এতক্ষণে বুঝতে শুরু করলাম, যে পাল্লায পড়েছি, সেটি নিতান্ত সোজা নয়। পার্টিব নির্দেশ, এরই সঙ্গে আমাকে এখন কাজ করতে হবে। কাজিমন রিপোর্ট দিয়েছিল, সাগিনা এ অঞ্চলে এক বিরাট শক্তি। ওর ক্ষমতা যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, তবে এ অঞ্চলে আমাদের পার্টির হবে একাধিপত্য অধিকার।

এখন সেই শক্তির খানিকটা নমুনা দেখলাম। আর দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

অথচ সাগিনাকে দেখবার আগে আমি মনে মনে কত খুশি হয়েছিলাম। এই প্রথম আমি সত্যিকার একজন শ্রমিকের আজ্ঞাবহ হতে চলেছি।

আমরা এদেশে যতই শ্রমিকের নেতৃত্ব বলে চেঁচাই না কেন, বরাবর দেখেছি, নেতৃত্বটি মধ্যজীবীদেরই হাতের মুঠোয় শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। আর মজদুর ভাইরা কলে কারখানায় যেমন মনিববাবুর হুকুম তামিল করে, তেমনি ইউনিয়নে তামিল করে কমরেডবাবুব হুকুম।

বই পড়ে কত কি শিখেছিলাম। সর্বহারাই পারে বিপ্লবকে ডেকে আনতে, কারণ সে মরিযা, তার হারাবার কিছু নেই। শ্রেণী-সংগ্রামের সেরা সৈনিক তাই মজদুর। ওদের নেতৃত্বেই একদিন সারা দুনিয়ায় পতপত উড়বে লাল ঝাণ্ডা।

কিন্তু লেবর ফ্রণ্টে কাজ করতে এসে দেখি নেতৃত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে শুধু মধ্যবিত্তের। যে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর আস্থা না রাখবারই তামিল পেয়ে এসেছি পার্টি সাহিত্যে — কারণ পাতি বুর্জোয়া নাকি সবচেয়ে সুবিধাবাদী, শিবির বদলাতে তারা মুহূর্তের বেশি সময় নেয় না, বিপ্লবকালে এরাই দল ত্যাগ করে মালিকের পা-চাটা গোলাম বনে যায় — যাদেবকে ঘৃণা করতে শিখেছি, এখন দেখি লেবর মুভমেণ্টের তাবৎ লীডার তাবাই।

আমি জন্মেছি মধ্যবিত্ত ঘবে। জন্মসূত্রে আমি সেই সুবিধাবাদী পাতি বুর্জোযাদেব শবিক। আর তাই আমার লজ্জা রাখার জায়গা ছিল না। মহাপবিত্র শ্রমিকবংশে কেন আমাব জন্ম হযনি, সে আফসোসে আমি মবমে মরে থাকতুম।

তাই তো প্রথম সুযোগেই আমি চলে এসেছিলুম সাগিনার কাছে। আমাব নিজেব জাযগায়। আমাব আপন ঘরে। মনে মনে ভেবেছিলাম আমাব জন্মেব ত্রুটি শুধরে নেব সাগিনাব কাছ থেকে তালিম নিযে।

আব সেই সাগিনাব কি এই রূপ? আমাব মধ্যবিত্ত মন বলছিল, শেষে কি একটা লম্পটেব পাল্লায় পড়লে!

এ-বস্তি সে-বস্তি পার হয়ে আমবা তিনজন চলেছিলাম। আগে আগে সাগিনা আর ললিতা। পিছু পিছু আমি। পিছন থেকে সাগিনাকে এক বিবাট দৈত্যবিশেষ লাগছিল।

সাগিনার চেহারাটি বিবাট। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। মাংসের একটা প্রকাণ্ড স্তূপ যেন চলেছে। ময়লা তেল-কালি মাখা ছেঁড়া এক বেলের কুর্তি গায়, পরনে টাইট পাহাড়ী প্যাণ্ট। পাশে ললিতার সুন্দব ছিপছিপে চেহারা। দু'জনে অনর্গল কথা বলছে, হাসছে। এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে মাঝে মাঝে।

লোকো শেড পেরিয়ে একটা জীর্ণ খোলার বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল।

সাগিনা কর্কশ গলায হাঁক পাড়ল, 'গুরুং, এ গুরুং।'

একটা বুড়ো পাহাড়ী বেরিয়ে এল।

সাগিনা বলল, 'দাইবুড়ি কো বোলাও।'

গুরুং ভেতরে গিয়ে এক বুড়িকে পাঠিয়ে দিল।

সাগিনা তাকে বলল, 'এ বুঢ়িয়া তুই এই ললিতাকে তোর কাছে বেখে দে। ডাগদাববাবুকে বলে হাসপাতালে ওকে একটা কাজ জুটিয়ে দিব।'

ললিতাকে বললে, 'থাক আখুন তুই এখানে। পবে দুসরি ব্যবস্থা হবে।'

ললিতা হাসতে হাসতে বুড়ির সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

ললিতার ব্যবস্থা হলো, এখন আমার একটা হিল্লে হয়তো করবে সাগিনা। এর মধ্যে আমি মনস্থির কবে ফেলেছি। আজ রাতটা কাটিযে কাল সকালেই রওনা দেব খার্সাং-এ। এ লোকের সঙ্গে পোষাবে বলে মনে হচ্ছে না। কাজিমনেব সঙ্গে পরামর্শ দরকার।

সাগিনা আমার দিকে চেয়ে বলল, 'এসো, আমার বস্তিতে যাই।'

সেটা আবার কোথায়? খিদে-পেটে কাঁহাতক ছোটাছুটি করা যায়?

বললাম, 'কমরেড কাজিমনকে ফোনে একটা খবর দিলে হয় না।'

সাগিনা আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কাজিমনকে চিনো?'

বললাম. 'হ্যাঁ, সে আমার দোস্ত।'

'আচ্ছা।' সাগিনা বলল, 'তবে চল টিশন। টেলিফুঁ আখুনই হয়ে যাবে।'

এতক্ষণে দেখি সাগিনা একটু নজর ফেলল আমার উপর। স্টেশনে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল দু-চারজন বড় বড় নেতার কথা।

'কামরেড মিত্রাকে জান?'

বললাম, 'হ্যাঁ, জানি।'

'আচ্ছা, কামরেড মুকুর্জি, ব্যানার্জি, সেন, মহম্মদ হুসেন — সবাইকে চিনো?'

বললাম, 'চিনি।'

সাগিনা আমার দিকে বেশ করে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। যেন ভাল করে আপাদমস্তক দেখে নিল আবার।

বলল, 'তব্ তো ঠিক আছে।'

স্টেশনে ঢুকতে সাগিনার যার সঙ্গে দেখা হয় এখন, সেই দেখি খানিকক্ষণ মাইডিযারি আলাপ কবে নেয়। অথচ এইখানে জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছি সাগিনার খবর। কেউ হদিস দেয়নি। বড় তাজ্জব ব্যাপার। কন্ট্রোল রুমে ঢুকতেই আধঘণ্টা কাবার হয়ে গেল।

দু'-একজন স্টেশনবাবু সাগিনাকে দেখে গম্ভীর হযে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সাগিনা গ্রাহ্যও করল না। সটান এক ফিরিঙ্গি সাহেবের কাছে এগিয়ে গেল।

বললে, 'আণ্টুনি সাহাব, সালাম।'

সাহেব বিরক্ত হয়ে বললে, 'ক্যাযা মতলব সাগিনা।'

সাগিনা হেসে বললে, 'সালাম দিচ্ছি সাহেব, তব্ ভি গোঁসা করছ কেন? তবিযত গড়বড় হযনি তো?'

সাহেব আরো চটে গেল, 'দিক কর না সাগিনা। মতলব কি তাই বলো।'

সাগিনা এবার গম্ভীর হয়ে গেল।

বলল, 'টেলিফুঁ করতে চাই। খার্সাং-এর লোকো অফিসের নম্বব লাগিযে দাও।'

সাহেব বললে, 'আবি ভাগো। হোগা নেই।'

পেছন থেকে কে মন্তব্য কবলে, 'অ্যাঁ, ব্যাটার বোয়াব দ্যাখ। বাপের জমিদাবি পেয়েছে যেন।'

সাগিনা বললে, 'সাহেব, টাইম আমারও কমতি আছে। কাম ভি জরুরী। হুজ্জৎ যদি না চাও, লাইন দাও জলদি।'

এবারে ঘরসুদ্ধ বাবুরা চটে গেল। কেউ বললে বেরিয়ে যাও, কেউ বললে নিকালো, কেউ বা বললে গেট আউট। একটা মিনিয়েল বাবুদের কাছে চোখ গরম করবে! ইয়ার্কি। রিপোর্ট কর উপরে। কোম্পানিও হয়েছে এমনি, এইসব গুণ্ডাদের জেলে না পাঠিয়ে লাই দিয়ে মাথায় তুলছে।

এক বাবু আমাকে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'এই ছোকরা, ভাগ এখান থেকে।'

সাগিনা সব গালাগাল নির্বিবাদে শুনল। ও সব কথায় সে একটুও বিচলিত হয়েছে বলে মনে হলো না। এগিয়ে গেল এন্টনি সাহেবের কাছে।

তারপর বললে, 'সাহাব, তোমরা ভারী অফসার আছো। তাই চটপট পুরানা বাত ভুলে যাও। বস্তিবাজার কা মামলা এতনা জলদি ভুলে গেলে? থাক, আমিও সে সব কথা তুলতে চাইনে।'

হঠাৎ বাইরে কাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'এ বাহাদুর, ইধাব আও।'

জানালা দিয়ে একটা পাহাড়ী মুখ উঁকি মারল।

সাগিনা বললে, 'তুমকো আদমি লোগ সব তৈয়ার হ্যায়?'

পাহাড়ী মুখ জবাব দিলে, 'বিলকুল তৈয়ার। কিঁউ ভাই?'

সাগিনা বললে, 'এক সাহাব আর তিন বাংগালী বাবুকো দুরস্ত করনে পড়েগা।'

পাহাড়ীটা একগাল হেসে বললে, 'বহুৎ আচ্ছা। কব্।'

সাগিনা এবার গোটা ঘরটায় চোখ বুলিযে বললে, 'সামকো আ যাও বস্তিবাজারমে। বাতা দুঙ্গা।'

'বহোৎ আচ্ছা।'

সাগিনা যেন নিজের মনেই বলে উঠল, 'আব কুছ্ কাম হোগা মালুম পড়তা হ্যায। কিঁউ সাহাব?'

ঘরের লোকগুলো সব যেন বোবা হয়ে গেছে। এণ্টনি সাহেব সাগিনার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

সাগিনা বললে, 'এবার তো লাইন মিলবে সাহাব?'

দ্বিতীয় কথা না খসিয়ে সাহেব ফোনটি তুললেন। একটু পরে 'হ্যালো খার্সাং, লোকো অফিস প্লিজ' বলেই ফোনটি সাগিনার হাতে তুলে দিলেন।

সাগিনা ফোন ধরে চেঁচাতে লাগল, 'হ্যালো কাজিমন সাহাব। হাঁ হাঁ সাগিনা। আরে কলকাত্তাকে চিডিয়া আয়া। বোলছে কি তুমাকে চিনে। হাঁ হাঁ, বাত কবো-না।'

ফোনটি আমাকে দিযে বললে, 'বাত করো।'

আমার গলা পেয়ে কাজিমন খুব খুশী। বললে, আপাতত সাগিনার ওখানে থাকো। পরশু আমি যাব। তখন কামকাজের বন্দোবস্ত হবে। তুমি এখন সাগিনাকে ফোনটি দাও।

সাগিনাকে বলতে শুনলাম, 'ঠিক হ্যায়। ওর জন্যে তুমি ভেবো না। পরশু রোজ তুম আ যাও, জরুর। আচ্ছা আচ্ছা। হাঃ হাঃ হাঃ। ফিকিব মত্ কবো ভাই। কৌন? জানরল ম্যানেজার। হাঃ হাঃ হাঃ। বড়ি আচ্ছি বাত। আরে দুনিয়া বদল জায়েগি। উয়ো বড়া সাহাব, ছোটা সাহাব — সব শালে কো বং জুল জাযগা। শবমায়দাবি চলেগা নেহি। আচ্ছা আচ্ছা,উযো সব বাত পিছে হোগা। কেযা? আওরাত? কৌন? ও হো হো। ভুখন কি বেওয়া? আবে ভাই, উয়ো তো ভাগ গয়ি। মেরা কলিজা কাটকে চলি গয়ি। দো মাহিনা হো চুকা। হাঁ। নেহি, নেহি, কসুব-উসুর কুছ নেহি থা। মাতোযালা হোকে এক বোজ ঘর পহুঁচা। সামনে পড় গিযা উও বেচারি, মারা দো চার ঝাপড়। তো সুবে উঠকে দেখা কি, পিঞ্জবা খালি। হায হায়। ক্যা আফসোস। ক্যা, দুসরি কো বাত? আবে ভাই, আবে ভাই শুনো তো। ম্যয় ক্যা মবদ নেহি হুঁ? তো? তো আওরাত ভি মিল জায়েগা। ও হাঃ হাঃ হাঃ। কামাল কিয়া ভাই, তুমনে কামাল কিয়া। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক হ্যায।'

. খটাস করে ফোনটি রেখে দিল সাগিনা। খুশিতে চোখমুখ ভরে উঠেছে।

'গুড্ মর্নিং সাহাব, হা গুড্ মর্নিং। চলো কামরেড।'

আমার পিঠে গন্দা হাতের একখানা থাপড় মেরে ঠেলতে ঠেলতে বাইবে নিয়ে এল।

সাগিনার সঙ্গে ওর কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে নানা কথা ভাবছিলাম। সাগিনা দেখলাম, সোজা পথের মানুষ। সাহেব যদি ফোন করতে না দিতে চায় তো বিচলিত হবার

কিছু নেই। ধরে পিটে দাও। মরদ হয়ে সে যখন জন্মেছে, তখন তাব আওরাত একজন চাই। একজন যদি চলে যায়, দুঃখ নেই, আরো কেউ জুটে যাবে।

যাবে কেন বলছি, জুটে তো গেছেই এর মধ্যে। সকালের ঘটনা মনে পড়ল। ললিতার স্বামীকে তাড়িয়ে সাগিনা তাকে রেখে এসেছে এক বুড়ির বাড়িতে।

এই লোককে নিয়ে পার্টি গড়তে হবে! বই-এ লেখা নীতিকথায় আমার কখনো বিশ্বাস ছিল না। সুনীতি দুর্নীতির মার্কসীয় ব্যাখাই আমি জানি। কিন্তু তবুও, এই লোকটার সংস্পর্শে এসে অবধি তার যা ক্রিয়াকাণ্ড সব দেখলাম তাতে আমার মনটা কেন যেন খচখচ কবতে লাগল।

সাগিনা একগাল হেসে বললে, 'কামরেড, এবার খানাপিনা কিছু করা যাক। তুমি যে এসেছ সেটা খুব খুশির কথা আছে।'

ঘর বলতে সাগিনার একটাই। কিন্তু সেটা এত কদর্য, আগে বুঝতে পারিনি। আমার বিছানাপত্র কিছু ছিল না। সাগিনাব বিছানাতেই শুযেছিলাম, সাগিনার পাশেই। ওরই বোঁটকা কম্বল মুড়ি দিয়ে।

শীতের ভয়ে সেই ছোট্ট ইঁটের খুপবিব একটামাত্র দরজা বন্ধ কবে দেওয়া হয়েছে। আব অন্য কোনো ফাঁক-ফোঁকর নেই। আমরা জনা পাঁচেক লোক সেই ঘরে। ঘরটি গরম রাখতে এককোণে একটা আগুনের মালসা জ্বলছে।

প্রচুর মদ খেয়েছে সাগিনা। ভক ভক কবে তাব প্রশ্বাসেব গন্ধ আমার নাকের উপব আছড়ে পড়ছে। এইসব গন্ধ, মালসাব ধোঁয়া, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস — কোনোটাই বেরুতে না পেবে সেই বন্ধ ঘবে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। ভ্যাপসা চরম পীড়াদাযক সেই আবহাওযায আমার মনে হলো, আমি দম বন্ধ হয়ে মারাই পড়ব বুঝি।

এও বুঝতে পাবছিলাম, আমার এ অস্বস্তি অন্যায়। পাতিবুর্জোযা বক্তেব নাক-উঁচু সংস্কাব। যতবাব কথাটা মনে হচ্ছিল ততবাবই যেন মবমে মবে যাচ্ছিলাম। এই আমাব আপন ঘব। খাঁটি এক মজুরের আস্তানা। এমন জায়গায় থাকবাব সুযোগ পাব বলেই না এখানে এসেছি। তবে কেন এই অস্বস্তি? তবে কেন আমি এত ছটফট করছি? ঘুমোতে পাবছি না কেন ঐ সাগিনাদের মতো নির্বিকার ভাবে। ছিঃ? মনকে ধমক দিলাম। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ সেই আবছা অন্ধকাবে দেখি সাগিনা উঠে বসল। তারপব দুই ধাক্কায় আমাকে ঠেলে তুলল।

'কামরেড,' আমার হাত দু'খানা চেপে ধরল সাগিনা। 'কামরেড, আমাকে মাফ করে দাও। ম্যয় পাপী হুঁ।

বুঝলাম, রাতদুপুরে মাতলামো চেপেছে সাগিনার। সেরেছে!

'সচ্ বলছি কামরেড, একটা বুরা কাম করতে গিয়েছিলাম। মাফ করে দাও।'

এতক্ষণে বিরক্ত হয়ে উঠেছি।

বললাম, 'কমরেড, কথা কাল হবে। আজ ঘুমাও।'

'ঠিক হ্যায। লেকিন শোনো কামরেড,' সাগিনা বললে, 'তোমাক যখুন প্রথম দেখি তখুন মনে করেছিলাম কি শালা টিকটিকি আছে। তখুন তয করলাম কি শালাকে জানে মেরে ইঞ্জিনের বয়লাটে ফেলে দিব।'

সর্বনাশ! আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ল। আঁতকে উঠলাম সাগিনার কথা শুনে।

'তারপর!'

'তারপর', সাগিনা বলল, 'দেখলাম তুমি কাজিমনের সাথে বাতচিত করলে। দেখলাম, হাঁ তোমাদের বেরাদরি পাক্কা। তখন আফসোস হলো কি তোমাকে আমি বিশোয়াস করিনি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও কামরেড।'

সত্যি বলছি, সে রাতটা খুব ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। যে সাগিনাকে চরম ভবসা বলে প্রথম রাত্তিরে নিশ্চিন্তে তার কাছ ঘেঁষে শুয়েছিলাম, এখন তাকেই সাক্ষাৎ শমন বলে মনে হতে লাগল।

সাগিনা ততক্ষণে ভোঁস ভোঁস ঘুম দিতে লেগেছে। যদিও ঘুমানোর আগে বার বাব ভরসা দিয়েছে যে তার ভুল ভেঙেছে। সে আমাকে কমবেড বলে মেনে নিযেছে। তবু আমার ভয যাযনি। সাবারাত যেন খাটের নিচে সাপ নিযে শুযে কাটালাম।

তারপর পুবো একটি বছব সাগিনার সঙ্গে কাটল। কাজিমন কিছু বাডিযে বলেনি। সাগিনাব প্রতাপ সে অঞ্চলে ছিল অপ্রতিহত। পাহাডী বেলেব মজদুররা সাগিনা ছাড়া আব কাউকে চেনে না। আব কাউকে মানে না।

বিদেশী মালিকের বহু অত্যাচার এই রেলপথের শ্রমিকদের সইতে হয়েছে। শীতেব দেশ। বর্ষার দেশ। কিন্তু কি সব ভাঙাচোরা কোযার্টাব। বর্ষায় ফুটো চাল দিয়ে জল পড়ছে প্রতি বছর, শীতে কনকনে বাতাস ঢুকছে। রোগে ভুগে কত মজদুর মারা গেছে। তবু কোম্পানির মালিকরা কোনো প্রতিকার কবেনি। আবেদন-নিবেদন, দরকার অজস্র বার কবা হযেছে। প্রতিবারই কোম্পানি তা নাকচ করে দিযেছে।

এমনি অবিচারের রাজত্ব বহুদিন যাবৎ চলেছিল। তাবপর আবির্ভাব হলো সাগিনার। সাগিনা মজদুরদের নিযে দল পাকাল। গোরা অফিসার, ফিরিঙ্গি অফিসারদের দাপট আব বাঙালী ক্লর্ক বাবুদেব শযতানি সাগিনার দলকে দিনের পর দিন শক্ত কবে তুলল।

এসব খবর শুনেছিলাম সাগিনাব বিভিন্ন আড্ডায। বিভিন্ন লোকেব মুখ থেকেই। সাগিনাব আড্ডাগুলোব বেশির ভাগই ছিল মদেব আড্ডা। ওগুলো যেন সাগিনার এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যেব বাজধানী। ওখানে বসে সাগিনাব মুখ থেকে যে হুকুম বেবোবে, পৃথিবীর কারও সাধ্য ছিল না তা বদ কবে। চন্দ্র সূর্য ওঠার মতোই সেগুলো তামিল হতো।

'আবে সাথী, কত বলব! ওসব শবম কি বাত আছে — শালে গোবা লোগ বহুত লাথ মেরেছে।'

বুড়ো গুরুং পুবানো ইতিহাস শোনাত। মদে ঢুলু ঢুলু হযে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে ধরত আমাব গলা। আদব করে গেলাসে মদ ঢেলে বলত, লো পিয়ো। তারপর গুরুং-এব মুখ ছুটত।

'হাঁ, লাথ মাবত। মর্দানাকে মারত। জেনানাকো ভি মাবত। কসুর থাকলে মাবত, না থাকলেও মারত। শালে লোগ দনাদ্দন দনাদ্দন জুতি চালাত। হাঁ। বহোৎ সাথী ঘাযেল হযেছে। তো কি করব, খালি লাথ খেযেছি। আব শালা অফসার লোগ বিবি বেটি সব বাংলোয় লিয়ে তুলেছে। ছোট ছোট অফসার — এই নিস্‌পেক্টর, টি টি সি লোগও ঐসে হারামি। ওরাও লিযেছে। তো কি করব, শালা লোগ গোরা আছে। রিপোর্ট করবে তো নোকবি থিকে ফৌবণ বরখাস্ত। তো কি করব। আচ্ছা বাবা, লাথ মাবো, লে যাও বিবি, বেটি, বহিন। নোকবি খেয়ো না। তো কি করব। কোনো লীডার তো ছিল না। ডবকে মাবে কেউ বাবা কোনো কথা বলতো না। হাঁ। গরিব আছি, মজদুব আছি, কুলি আছি। খালি লাথ মারছে। তো গোবা হতাম কি ফিবিঙ্গি, আমিও লাথ মারতাম। আব বাঙালী ক্লর্কবাবু হতাম তো জেব্ ভরতাম গবিবের পাকিট মেবে। আচ্ছা বাবা মারো। কোনো সংগঠন তো ছিল না, লীডার ভি না। তো কি করব। আজ আমাকে লাথ মারছে সাহাব তো উ শালা হাসি কবছে। কাল ওকে মাবছে তো আমি হাসি করছি। হাঁ সচ বাত। বিলকুল সচ। তো কি কবব। আমি একেলা কিছু বলব সাহাবকে তো সব শালা ভাগবে। কেউ মদত দিবে না। আমি শালাকে পাকড়াবে, সাহাব। দনাদ্দন দনাদ্দন পিটবে। নোকবি ভি ফৌবণ খতম।'

যখন ওদের এই অবস্থা রকম সেই সময় সাগিনা ওদের মধ্যে এল। এল একেবারে লীডার হয়ে। আর এসেই পিটতে শুরু করল। প্রথম দিকে মজদুরদেরই পিটেছিল।

'শালে কুত্তা কি বাচ্চে।'

এই ছিল সাগিনার প্রথম দিকের শ্লোগান। যে শালা সংগঠনে না আসবে, সাহেবদেব মার মুখ বুজে খাবে, সেই শালাকে আচ্ছা করে পেটো। আর যে শালা চুকলি খাবে তাকে জানে মেরে দাও। যে শালা তার বিবি, বেটি কি বহিনকে সাহেবের ঘরে যেতে দেবে, ফ্যালো সে শালাকে পাহাড়ের ওপর থেকে।

এইভাবে ঢুকল সাগিনা। বছর দুয়েকের মধ্যে সব মজদুর সাগিনার দলে ভিড়ে গেল। আর তারপর শুরু হলো উলটা খেল। 'হাঁ, সাথী', গুরুং গেলাস উপুড় করে মদ ঢেলে দিল গলায়। একটু দম নিলে।

তারপর বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, সাথী, বিলকুল উলটা খেল। সাহাব যদি লাথ্ মাববে তো আমিও মারব। তো কি করব, লীডারের হুকুম। মার শালে কো মার শালে কো। তো কি করবে সাহাব। নোকরি খাবে? হাঃ, আমার নোকরি যাবে তো সব মজদুর কাম বন্ধ করবে, তো কী করব, লীডারের হুকুম। আর চাক্কা বন্ধ তো কোম্পানি ভি ফুট! হাঃ হাঃ হাঃ। চাক্কা বন্ধ তো কোম্পানী ভি ফুট। শালা লোগ চার দফে নোকরি নিল আমার, বরখাস্ত কবল, তো কি হলো? চাক্কা বন্ধ। আর কি হলো? ফিন আমাকে নোকরি দিতে হলো। আর কি হলো? শালা মারপিট একদম বন্ধ হয়ে গেল। আর এসব কাবোয়াই সাগিনার। সাগিনা লীডার আছে। সর্দার।'

সঙ্গে সঙ্গে ক'জন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সাগিনা হৈ হৈ কবে ঢুকল সেই দোকানে।

গুরুং উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, 'আও আও আও, সাথী, পিয়ো পিয়ো পিযো।'

সাগিনা তার বিরাট দেহটা আমার পাশে দুম করে যেন আছড়ে ফেলল। আমাব পিঠে মারল এক থাপ্পড়।

বলল, 'আ কামরেড। পিতা হ্যায। হাঃ হাঃ। ইতো আব ঠিক সাথী বনে গিযেছে। লেকিন এক আফসোস। কামবেডেব জন্য একটা তো আওবাত চাই। মর্দানা হো, ইয়া নেহি? আচ্ছা, ফিকির নেহি। উও ভি মিলে যাবে।'

আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে এক পাহাড়ীকে ডেকে বলল, 'এ বাহাদুব, হ্যায কোই, আচ্ছা চীজ? কামরেডের জন্য দিতে পাবিস।'

বাহাদুরের ভোঁতা মুখ আমার দিকে হেসে উঠল।

বলল, 'কাম তো কিচ্ছু মুশকিলের না আছে।'

'তো ঠিক হ্যায়', সাগিনা হুকুম দিল, 'কামরেডের লিয়ে এবার পিযে নিই, আও।'

আগে যা ছিল 'সাগিনার গ্যাং', এই এক বছবে আমরা তাকে মজদুর ইউনিয়নে পবিণত করেছি। অফিস হয়েছে আমাদের। আমি অফিস সেক্রেটারি। সাগিনা ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট, কাজিমন সেক্রেটারি। একটা একজিকিউটিভ কমিটিও আছে। কিন্তু কার্যত সাগিনাই সব।

অতি কষ্টে কিছুটা শৃঙ্খলা আনা গেছে। ইউনিয়নকে কোম্পানি স্বীকৃতি দিয়েছে। মারপিট কমেছে। কথায় কথায় চাকা বন্ধও হচ্ছে না। প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারি আর অফিস সেক্রেটারিকে ফার্স্ট ক্লাস পাশ দিয়েছে কোম্পানি। হেডকোয়ার্টারে কোনো সিটিং হলে কোম্পানি হলটিং এলাউন্সও দিচ্ছে। সরকারীভাবে খাতির দেখাচ্ছে সাগিনাকে। সাগিনার মাইনেও বাড়াতে চেয়েছিল। সাগিনা মুখের উপর না বলে দিয়েছে।

বলেছে, আমারএকার মাইনে বাড়িয়ে তো ফায়দা কিছু হবে না, সকলের মাইনে বাড়াও।

আমরা দু' মাস আগে একটা দাবি সনদ পেশ করেছি কোম্পানির কাছে। তাতে অবিলম্বে মজুরদের জন্য নূতন কোয়ার্টার করতে বলেছি। বলেছি, পুরানো কোয়ার্টার সংস্কার করো। অবিলম্বে শতকরা ২৫ টাকা মূল বেতন ও মূল বেতনের অর্ধেক মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, ওভারটাইম, ছুটি, বদলি, পাশ, চিকিৎসার ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি দাবিও করা হয়েছে।

কোম্পানি এই ব্যাপারে নানা অছিলায় টালবাহানা করছে। খালি চিঠিপত্র চালাচালি হচ্ছে দু'পক্ষে। আমাদের অফিসে চিঠির পাহাড় দাঁড়িয়ে গেছে।

সাগিনা তা দেখে আর আমাদের ঠাট্টা করে। সে এইসব ব্যাপারে আদৌ বিশ্বাসী নয়।

বলে, 'বাঘকে যতই দুধ পিলাও খুন সে চুষবে। ও শালাদের দাওয়াই না দিলে ওরা আমাদের বাপ বলবে কেন?'

আমি ওকে ট্রেড ইউনিয়নের মূল তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করলে সাগিনা হাঃ হাঃ করে হাসে। বলে, 'এই তো ছ' মাহিনা কাবাব হলো। আমরা খেতে চেয়েছি কোম্পানির কাছে। লেকিন মিলল কি? চিঠ্‌ঠি এইসব!'

অবজ্ঞাভরে চিঠিপত্রের ফাইলগুলো উলটে দিলে।

বলল, 'দেখ কামরেড, এই পড়া-লিখা খেলায় কাম চলবে না। ছ' মাস ধবে খুটখুট চিঠি লিখছ, ভেষজ। ও শালারাও খুটখুট চিঠি লিখছে, ভেজছে। লেকিন ফায়দা কি হচ্ছে। তোমাদেব এই নযা তবিকায় এদেব কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে না। পুরানা রাস্তা ধবতে হবে। পিটতে হবে শালাদের, চাকা বন্ধ কবতে হবে। তখন দেখবে, শালারা এসে বাপ বলছে। মিটিং বোলাও।'

প্রথমে একজিকিউটিভ মিটিং, পবে জেনাবেল মিটিং। দুটো মিটিং-এই ঠিক হলো, একটা চবমপত্র দেওযা হোক কোম্পানিকে। এক মাসেব মধ্যে আমাদের দাবিগুলো যদি না মিটায় তো চবম পন্থা গ্রহণ কবা হবে।

আমরা যেদিন চরমপত্র পাঠালাম সেদিন কি উল্লাস সকলেব মধ্যে! ভাটিখানাটা ভরে গেল সাগিনাব সাঙ্গোপাঙ্গয়। অনেক বাত পর্যন্ত মদ খাওয়া চলল। হৈ-হুল্লোড়। ফুর্তি।

হঠাৎ সাগিনা আমাকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমি ইউনিয়নের অফিস হওয়া ইস্তক সেখানেই থাকতাম।

সাগিনা বলল, 'দেখ কামবেড, যাব ঘবে খানাপিনাব দানাপানি আছে তারা দেরি কবতে পাবে, ধৈর্যও ধবতে পাবে। কিন্তু ভুখা নাঙ্গা মজদুব ধৈর্য পাবে কোথায়! খেতে দাও, পবতে দাও, কাজ নাও। গোলমাল কেউ করবে না। কিন্তু দানাপানি দেবে না, খালি বাত, খালি ওযাদা, ওতে কাম চলে না। এবাব আখেবি লড়াই হবে। পিছু ফায়সালা। দোসবা বাস্তা আব নেই।'

বলতে বলতে অফিসে এলাম। দুটো ঘর। একটা অফিস আর একটা আমাব শোবাব ঘব। দেখি শোবার ঘরে আলো জ্বলছে।

সাগিনা আমাকে নিযে সেই ঘরে ঢুকেই বললে, 'লো, ক্যাযা পছন্দ আসছে?

উনিশ-কুড়ি বছবেব একটা মেয়েকে নিয়ে দেখি বাহাদুর আমাব বিছানায় বসে আছে। মেযেটি বেশ দেখতে। অনেকটা ললিতার মতো। মিচকি মিচকি আমার দিকে চেয়ে হাসছে। দেখেই আমার নেশা কেটে গেল। বুক ধড়ফড় করতে লাগল। কান মুখ গরম হয়ে উঠল।

বাহাদুর চোখ টিপে বললে, 'আচ্ছা হ্যায়।'

আমার হতভম্ব ভাব দেখে সাগিনা আর বাহাদুর হাঃ হাঃ করে হেসে ঘর যেন ফাটিয়ে ফেলতে লাগল। সে হাসির ছোঁয়াচ মেয়েটিরও লাগল। রিনরিনে গলায় হাসতে হাসতে সে যেন ঘরময় গান ছড়িয়ে দিতে লাগল।

মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেলাম। আমার গায়ে এক বছরে সর্বহারার যে পালিশটা পড়েছিল তা ভেতরকার সেই পাতিবুর্জোয়া ভূতটার গুঁতোয় ছিঁড়ে খানখান হয়ে গেল। ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই দেখি রাস্তা ধরে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেছি। একবার মনে হলো পিছনে সাগিনা আর বাহাদুর হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে তাড়া করেছে। মনে হলো, সেই মেয়েটির রিনবিনে হাসির সঙ্গীতও যেন আমাকে তাড়া করেছে। কামবেড, কামবেড — কারা যেন চেঁচিয়ে ডাকলও কয়েকবার।

সেই যে ছুটেছিলাম আর থামলাম এসে মহানন্দার ব্রিজের উপর। রেলিং ধরে হাঁফাতে লাগলাম। ঠাণ্ডা বাতাস চোখ মুখ কানকে অনেকটা আরাম দিল। দূরে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের এক উত্তুঙ্গ পিণ্ড। হিমালয়। সামনেও ঘন অন্ধকার। শুকনার ফরেস্ট। নিচে মহানন্দার রূপালী রেখা। উপরে তারাভরা আকাশ। আর অজস্র জোনাকি। ঝিঁঝির অফুরান সঙ্গীত। তার মধ্যে পাহাড়ী মেয়ের সেই সুন্দর সরল মুখখানি বার বার আমার চোখে ফুটে উঠতে লাগল।

হঠাৎ আমার মনে হলো, তাই তো, আমি এমনভাবে পালিয়ে এলাম কেন? মেয়েটার মুখ, তার সেই মিঠে হাসি আমাকে টানতে লাগল। সেই টানে ঘরের দিকে আবার যখন পা বাড়ালাম, তখন রাত শেষ হতে আর বাকী বিশেষ নেই। ঘরের দরজায় এসেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বুক যেন ফেটে যাবে, ধকধক এমন উত্তেজনা। তারপর সাহস করে, আলতো ভাবে দরজা খুলে দেখি ভেতরে কেউ নেই। হতাশা যেন বুকের মধ্যে কট করে কামড় বসাল ইঁদুরের মতো। আমি বোকা, আমি ভীতু, আমি পাতিবুর্জোয়া।

মনে পড়ল, আরেকবার এ রকম ব্যবহার করেছিলাম বলে সাগিনা আমাকে ধমকেছিল। বলেছিল, তুমাকে দিয়ে কুচ্ছু হবে না। তুমি আওরাত দেখেই ভাগো, কোম্পানির জাঁদরেল সাহেবদের মহড়া কি করে নেবে!

পরদিন বিকালেই খার্সাং থেকে কাজিমন এসে হাজির। আমাদের পার্টির ঐ অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার তখন খার্সাং-এ। কাজিমন স্থানীয় শাখার কর্তা।

কাজিমন বললে, 'একটু পরেই কলকাতার মেল, আর দেরি নয়, চটপট তৈরি হয়ে নাও, কলকাতায় যেতে হবে, জরুরী তলব।'

কাজিমনকে নিয়ে তক্ষুনি সাগিনার খোঁজে বের হলাম। সেই ভাটিখানায় গিয়ে দেখি তুমুল উত্তেজনা।

খার্সাং-এর ইউনিট সেক্রেটারি ওয়াংদি এসে গেছে। সে উত্তেজিতভাবে কি বলছে আর মন দিয়ে শুনছে সাগিনা।

ওয়াংদির কথা বুঝলাম, ঘটনা এবার পাকিয়ে উঠল। বার্ন বলে একটা বদমায়েশ অফিসারের বিরুদ্ধে আমরা অনেকদিন থেকে নালিশ পাঠাচ্ছিলাম। ব্যাটা ক্যারেজ শপের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান। ঘুষ নেয়, মজুরদের যত রকমে পারে জ্বালায়, মেয়েদেরকে উৎপাত করে। ওর বিরুদ্ধে আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নালিশ গেছে কোম্পানির কাছে। কোনো সুরাহা হয়নি। বদলি করার দাবি তুলেছি আমরা, পুনঃ পুনঃ বলেছি, লোকটার জন্যে হয়তো অশান্তি ঘনিয়ে উঠতে পারে। কোনো ভ্রূক্ষেপ করেনি কোম্পানি। তাই লোকটার স্পর্ধাও দিন দিন বেড়ে উঠেছে।

কাল রাতে নামগিল বলে একটা মজুরের নাইট ডিউটির সুযোগ নিয়ে বার্ন তার ঘরে ঢুকেছিল। নামগিল জানতে পেরে বাসায় ফিরে আসে। তারপর বৌয়ের বিছানায় সাহেবকে

উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বেদম ধোলাই দিয়েছে। প্রাণটা কোনোমতে আছে তার। তবে হাড়গোড় ভেঙ্গে একেবারে 'দ' হয়ে গেছে বার্নি সাহেব।

ওয়াংদি বললে, 'উসকে বাদ পুলিশ আয়া। নামগিল কো পাকাড় লিয়া, ফাটকমে ডালা। আব হামিলোগ কেয়া করে?'

'হরতাল করো। কাম বন্ধ করো। আউর কেয়া করেগা?'

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। সাগিনাও।

বলল, 'কাম বন্ধ করো। পিছু দেখা যায়েগা।'

কাজিমন বললে, 'কাজটা একটু বে-আইনি হচ্ছে সাগিনা। আমার মনে হয়, জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ব্যাপারটা জানিয়ে তার ভেজে দিই। বলে দিই, তদন্ত সাপেক্ষ নামগিলের উপর থেকে কেস উঠিয়ে নেওয়া হোক। ওকে এখন খালাস দেওয়া হোক।'

সাগিনা কাজিমনকে ধমকে উঠল।

বললে, 'রাখ সাথী, তুমি আদমি আচ্ছা আছ, পড়িলিখি ভি আছ, লেকিন বেওকুফ। জানরল মানজার কা পাস হামলোগকো যানে হোগা, কিঁউ? কি কসুর আমাদেব! এক জানোযার আমার ঘরেব ইজ্জৎ নষ্ট করেছে, আমি তাকে পিটেছি। কসুরটা কোথায়? তোমাব শালা পুলিশ আছে, তুমি আমাকে পাকড়ালে। আখুন আমাদেরও কিছু তাকত দেখাতে হবে। কাল কাম বন্ধ হবে তো জানবল মানজার নিজে আমাদের বাপও বলবে, ফায়সালাও করবে।'

কাজিমন সাগিনাকে অনেকভাবে বোঝালে। বললে, গাযেব জোরের দিন আজ আর নেই কামবেড। হযতো একটা দুটো লড়াই এভাবে জিততেও পার। কিন্তু আখেরি মামলা এভাবে জেতা যাবে না। তোমাকে ট্রেড ইউনিয়নের রীতিনীতি মেনেই লড়াই জিততে হবে।

সাগিনা বিদ্রূপ করল কাজিমনকে।

'ইয়ার, লড়াই কাগজ-কালিতে হয় না। হাতিযার লাগে। ছ' মাহিনা ধরে তোমাব কাগজ-কালির লড়াই দেখেছি। তার নতিজাও দেখেছি। আখুন তুমি আমার হাতিয়ারের লড়াই দেখো। আর তাব নতিজাও দেখো।'

সাগিনা তাবপব টেবিল চাপড়ে বললে, 'সাথীও, পেট ঔর ইজ্জৎ যে শালা কাটবে, তাকেও কাটতে হবে। কাল কাবেজ ডিপার্টকে কাম বন্ধ থাকবে। ফায়সালা যদি তাতেও না হয় পরশু থেকে পুরা লাইন বন্ধ হয়ে যাবে।'

সাগিনার কথা শুনে সবাই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। চকচক করে জ্বলে উঠল ওদের চোখ।

কাজিমন আব আমি বেবিযে এলাম। কাজিমন কিছুক্ষণ কথা বলল না। মুখ বুজে হাঁটতে লাগল।

তারপর বলল, 'এ অবস্থায় এখান থেকে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। চল, কলকাতায় তার করে দিই।'

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা খুবই ঘোরাল হয়ে উঠল। গোটা লাইনেই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল।

তখন পুরো যুদ্ধের সময়। শৈলাবাসে গোরা সৈন্যদের ছুটি কাটাবার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কোম্পানি প্রথমদিকে তারই সুযোগ নেবার চেষ্টা করল। সাগিনা-সমস্যার চির সমাধান করবার জন্য দমন নীতির আশ্রয় নিল। ইউনিয়ন বে-আইনী ঘোষিত হলো। আমাদেব নামে হুলিয়া বেরুল। সাগিনা আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে তার অনুচরদের নিয়ে গা ঢাকা দিল।

কিন্তু আশ্চর্য তার সংগঠনী প্রতিভা। আড়াল থেকে সে ধর্মঘট চালাতে লাগল। একটি মজদুরও কাজে যোগ দিলে না। কোম্পানি একখানি গাড়িও চালাতে পারল না।

এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের পার্টির উচ্চ মহলে ঘন ঘন বৈঠক বসল। সাগিনাব এই আকস্মিক ধর্মঘট আমাদের পার্টিকে একটু অসুবিধায় ফেলেছিল। আমাদের শাসকবর্গ ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ায় আমবা তাদেব সমর্থন করার নীতি নিয়েছিলাম। শ্রমিক আন্দোলনকেও আমরা সেই পথে পরিচালিত করছিলাম। গভর্নমেন্টকে চাপ দিচ্ছিলাম একটা প্রগতিশীল শ্রমিকনীতি গ্রহণ করার জন্য।

ঠিক সেই মুহূর্তে সাগিনা এই গণ্ডগোলটা পাকিয়ে তুললে। যদিও সাগিনা আমাদের পার্টি মেম্বার ছিল না, পার্টি-ফার্টি ও বুঝত না, বুঝতে চাইতও না, তবু কার্যত ওর ইউনিয়নকে আমরা আমাদের ইউনিয়ন বলেই চালাতাম।

সাগিনার এই কাজের জন্য পার্টি আমার আর কাজিমনের কাছে কৈফিয়ত তলব কবল। আমবা এ ব্যাপারটা ঘটতে দিয়েছি বলে গালাগাল খেলাম নেতাদের কাছ থেকে। জবাব আর কি দেব। আমি তবুও বলেছিলাম, এই বিশৃঙ্খলার জন্য প্রধানত কোম্পানিই দায়ী। ছ' মাস কঠোর পরিশ্রম করে আমি আর কাজিমন একটা সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নেব পবিবেশ গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু কোম্পানি সেটা বজায় রাখাব কোনো চেষ্টা কবেনি। যে অমানুষিক দুর্দশার মধ্যে ওখানকাব মজদুররা দিন কাটায় সে অবস্থার উন্নতি না হলে এ রকম বিশৃঙ্খলা আসা স্বাভাবিক। মজদুরবা খেতে চায়, তাদেব খাবার সংস্থান কবতে হবে। ভুখা মজদুব ধৈর্য পাবে কোথায়?

বুঝতে পারলাম, সাগিনার কথাই আবৃত্তি কবে চলেছি। এও বুঝলাম নেতাবা আদৌ সন্তুষ্ট হলেন না। দুনিয়াব মজদুবেব স্বাধীনতা যেখানে ফ্যাসিস্ট হামলায় বিপন্ন সেখানে সাগিনার অনুচররা খাচ্ছে কি না-খাচ্ছে সেটা তাঁদের চোখে গুবত্বপূর্ণ ব্যাপাবই নয়। আমবা আদর্শ নিয়ে লড়ছি। আব সাগিনাবা সেখানে খিদে, ইজ্জৎ এই সমস্ত স্থূল ব্যাপাবে বড্ড বেশী মাথা ঘামাচ্ছে। নেতাবা ক্রুদ্ধ হতেই পাবেন।

আমাদের পার্টিব গোপন মিটিং এ ঠিক হলো, ঐ ইউনিযনেব উপব পার্টিব কর্তৃত্ব স্থাপন কবতে হবে। তা না হলে পার্টিব পলিসি অনুসারে ওটাকে চালানো যাবে না। সিদ্ধান্তটা আমাকে যখন শোনানো হলো, আমি মনে মনে হাসলাম। সাগিনা ছাড়া ওখানে আব কাউকে দাঁত ফোটাতে হবে না।

কিন্তু পার্টি সত্যিই অসাধ্য সাধন কবল। কোম্পানি যখন শত চেষ্টাতেও গাড়ি চালাতে পাবলে না তখন আমাদেব পার্টিব শবণ নিল। পার্টি আব কোম্পানিব উচ্চ মহলে ঘন ঘন বৈঠক বসল। চুক্তিনামা তৈবী হলো। পার্টিব পবামর্শে কোম্পানি সব মামলা তুলে নিল। ইউনিয়নকে আবার স্বীকৃতি দিল।

তবে তার চেয়েও তাজ্জব ব্যাপাব, বড় মাইনেব একজন লেবাব ওয়েলফেযাব অফিসারেব পদ সৃষ্টি হলো। আব এই প্রথম কোনো সাহেব নয়, কোনো বাবু নয়, মজদুবদেব আস্থাভাজন একজন সত্যিকাবেব মজদুবকে সেই পদে বসাতে কোম্পানি স্বীকৃত হল। মজদুবদেব জয়জয়কাব পড়ে গেল।

আমার বুক ফুলে উঠল জযেব আনন্দে। সমস্ত শ্রদ্ধা লুটিয়ে পড়ল ব্যাবিস্টাব কমবেড বিজন দত্তের পায়ে। তিনিই এই চুক্তিনামার খসড়া তৈবি কবেছেন।

শ্রমিকদের যা কিছু কল্যাণ তা কোম্পানিকে কবতে হবে লেবাব ওয়েলফেয়াব অফিসারেব পরামর্শমতো। মজদুররা ভোট দিয়ে যাকে পাঠাবে সেই পাবে এই পদ। কোম্পানির কোনো কারচুপি এতে চলবে না।

বস্তিবাজারের ময়দানে মজদুরদের বিরাট সম্মেলন হয়েছিল। আমার চোখে সেদিনটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। কমরেড দত্ত ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি। তাঁব সঙ্গে এসেছিলেন

তাঁর বোন কমরেড বিশাখা দত্ত। আমাদের পার্টিতে এমন সুন্দরী কমরেড আর দ্বিতীয় ছিল না। মঞ্চ আলো করে তিনি বসেছিলেন। আর তাঁর পাশে ছিল সাগিনা। বিজয়ী বীরের মতো মাথা উঁচু করে বসেছিল সে। আর তার দিকে ঝুঁকে বিশাখা সারাক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। সাগিনাব স্ফূর্তি যেন উথলে পড়ছিল।

কমবেড দত্ত সভাপতির ভাষণ দিলেন দেড়ঘণ্টা ধরে। মজদুরদের অনমনীয় দৃঢ়তাব ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বার বার সাগিনার নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব, তাঁর কৌশল, তাঁব স্বার্থত্যাগেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। উল্লাসে, হাততালিতে মজদুরেরা মণ্ডপ ফাটিয়ে দিতে লাগল। "কমরেড সাগিনা জিন্দাবাদ।" "কমরেড সাগিনা কি জয়।" শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেল আমাদেব।

কমবেড দত্ত বললেন, 'এ জয় শুধু সাগিনাব একার জয় নয়। এটা মজদুরদের সংঘ-শক্তিবই জয়। এই রেলের মজদুর তার সংগঠন শক্তিব জোরে যা মালিকদেব কাছ থেকে আদায় করেছে ভারতের কোনো জায়গাব মজদুবই তা পারেনি। লেবার ওয়েলফেযাব অফিসার আব কোথায় এমন মজদুরদেব ভোটে নির্বাচিত হযেছে? আব কোথায একজন সাচ্চা মজদুরকে সেই পদে বসানো হয়েছে? কমবেডস, সেই পদের জন্য এইবাব আপনারা একজন আপনাব লোক ঠিক করুন।'

কমবেড দত্ত বসতে না-বসতে সব হৈ-চৈ মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। সুঁচ পড়লে শোনা যায় এমন স্তব্ধতা নেমে এল। মনে হলো কথাটা কেউ যেন ধরতে পারেনি। অমনি বিশাখা মঞ্চেব উপব উঠে দাঁড়ালেন। একটা জ্বলন্ত আলো যেন ঠিকবে পড়ল।

তাঁব মিহি সঙ্গীতময কণ্ঠ থেকে স্বব বেবল, 'সাগিনা। কমবেড সাগিনাই আমাব মতে এই পদেব সব থেকে যোগ্য।'

'সাগিনা। হাঁ হাঁ সাগিনা।'

সেই উত্তাল কলবোলে আবাব বাব বাব ধ্বনিত হলো, "কমবেড সাগিনা কি জয়।"

কমরেড বিশাখা দত্ত টেবিলেব উপব থেকে এক বিবাট মালা তুলে সাগিনাব গলায পবিয়ে দিলেন। হুড়মুড় করে বাহাদুব, ওযাংদি, নামগিল, গুরুং আবও যেন কাবা কাবা মঞ্চেব উপব উঠে গেল। সাগিনাকে নামিযে এনে কাঁধে তুলে নাচতে লাগল।

সারাদিন হুল্লোড় চলল। সন্ধ্যেব দিকে কমবেড বিজন দত্ত আব বিশাখা খার্সাং চলে গেলেন। যাবাব আগে সাগিনা আব আমাকে বলে গেলেন, পবদিন সকালেই যেন সেখানে চলে যাই। কাজিমন ওঁদেব সঙ্গেই গেল।

খার্সাং-এ আমরা কমরেড দত্তদেব বাড়িতেই উঠলাম। বিশাখা সাগিনাকে খুব খাতিব কবেই ভিতরে নিযে গেলেন। দুপুরে কাজিমনও এল। খাবার নেমন্তন্ন কবেছিলেন দত্তবা।

খাবার টেবিলে কাজের কথা উঠল। কমবেড দত্ত সাগিনাকে তাব পদের গুরুত্বেব কথা বোঝাতে লাগলেন। খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ এটা। মজদুবদেব তাবৎ মঙ্গল, কল্যাণ এখন সাগিনাব হাতে। সাগিনা বিরাট কোয়ার্টার পাবে। সাহেবদের মতো কোয়ার্টাব। মজদুববা সাহেবদেব তুলনায় কোনো অংশেই যে ছোট নয়, সেটা যেন সাগিনা একবার কোম্পানিকে বুঝিয়ে দেয়। সাগিনাকে একটি অফিসও চালাতে হবে। তবে তার জন্য সাগিনা যেন না ঘাবড়ায়, কমরেড দত্ত কলকাতা থেকে একটা ভাল সেক্রেটারি পাঠিয়ে দেবেন।

খাওয়া-দাওয়ার পব দেখি সাগিনা খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। ভাবছে খুব। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলল না।

জেনারেল ম্যানেজারের বেয়ারা এসে কমবেড দত্তকে একটা চিঠি দিল। চিঠিখানা পড়ে তিনি সাগিনাকে ডাকলেন।

বললেন, 'কমরেড, কাল বিকালে বড় সাহেবের কাছে যেতে হবে। তোমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হবে।'

সাগিনা অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে বলল, ''আচ্ছি বাত।'

কমরেড বিশাখা সেজেগুজে বেরোলেন তাঁর ঘর থেকে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কাজ চুকেছে? আমি একবার শৈলাবাসে যাব।'

কমরেড দত্ত বললেন, 'যাও।'

কমরেড বিশাখা অমনি সাগিনাকে বললেন, 'কমরেড, যাবে আমার সঙ্গে?'

দেখলাম সাগিনার মুখটা এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হেসে বলল, 'জরুর।'

রাত প্রায় ন'টা নাগাদ সাগিনারা ফিরে এল। আমি দেখে তো অবাক। সাগিনাকে সত্যিই চিনতে পারিনি। পরিষ্কার স্যুট পরেছে। টাই বেঁধেছে। নতুন জুতো দিয়েছে পায়ে। ওকে যে এত ভাল দেখতে তা এই এক বছরে কখনো তো টের পাইনি। কমরেড বিশাখার এক নতুন সৃষ্টি বলেই সাগিনাকে মনে হলো। দেখলাম দুপুরের সেই গুমোট ভাবটা কেটেছে সাগিনার। একটা নতুন ফুর্তির উদয় হয়েছে ওর মনে। চোখ-মুখ টলটল করছে।

বিশাখা বললে, 'দ্যাখো দাদা, আমাদের বীর কমরেড সাগিনাকে এইগুলো আমি প্রেজেন্ট করেছি। কাল যেন সাহেবের সামনে সমানভাবে দাঁড়াতে পারি।'

কমরেড দত্তও অবাক হয়েছিলেন একটু, কিন্তু তিনিও খুব খুশি হলেন সাগিনার এই পরিবর্তনে।

বললেন, 'সত্যিই কমরেডকে ভাল মানিয়েছে।'

বিশাখা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, সাগিনার অনভ্যস্ত টাইটা একটু টেনে ঠিক করে দিলেন।

খুশি হয়ে বললেন, 'একেবারে নতুন মানুষ। তাই না।'

হাঃ হাঃ হাঃ করে এই নতুন সাগিনা সেই পুরনো হাসি ছাড়ল। সেই তার ঘর-কাঁপানো হাসি।

সাগিনা লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার হবার পর দু'মাস আমি শিলিগুড়িতে ছিলাম। প্রথমদিকে ঘন ঘন শিলিগুড়ি আসত সে। সঙ্গে আনত কমরেড বিশাখাকে। বিশাখা তারপর থেকে কিছুদিন খার্সাং-এই থেকে গিয়েছিলেন। এতে সাগিনার লাভ হয়েছিল। উনিই তার সেক্রেটারির কাজ করে দিতেন। বোধকরি সহবতও শেখাতেন। তারপর শিলিগুড়ি আসা তার কমতে লাগল। কাজ হয়তো বেড়ে যাচ্ছিল।

আমাকে হঠাৎ শিলিগুড়ি থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো লালমণিরহাটে। আমি আসবার আগেই মজদুরদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার উপর ভিত্তি করে এক স্মারকলিপি সাগিনার অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সাগিনা সেই দাবিগুলো উশুল করবে বলে জানিয়েছিল।

তবে ভালভাবে কোনো কাজে মন দেবার আগেই সাগিনার ডাক পড়ল বিভিন্ন জায়গা থেকে। মুখে মুখে সর্বত্রই সাগিনার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। নানা কাহিনীও প্রচারিত হয়েছিল। আজ মাদ্রাজ, কাল গুজরাট, পরশু বিহার — এমনি করে তাকে ঘোরানো হচ্ছিল। কানপুর, ঝরিয়া, টাটানগর, আমেদাবাদে ঘটা করে সংবর্ধনা জানানো হলো ওকে। শুনেছি প্রায় প্রত্যেকটি জায়গাতেই বিশাখা ওর সঙ্গে ছিলেন। আমাদের নিখিল ভারত মজদুর ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হলো সাগিনাকে।

দেড়টি বছর সাগিনা শিলিগুড়ি-ছাড়া।

আর এই দেড় বছরের মধ্যে শিলিগুড়ির ইউনিয়নে দলাদলি শুরু হয়ে গেল। কাজিমনের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পেতাম। কাজিমন বড় বিব্রত বোধ করেছিল। সবাই

জানত ওয়েলফেয়াব অফিসার আমাদের লোক। মজদুরদেব অভিযোগ পুঞ্জীভূত জমে উঠেছিল। কোম্পানিকে কিছু বলার উপায নেই। সে সাগিনাব অফিস দেখিযে দেয। কিন্তু কোথায সাগিনা?

কাজিমন পার্টি অফিসে এ সম্পর্কে লিখে লিখে হদ্দ হযে গেল। পার্টি অফিস থেকে জবাব আসে, কমরেড সাগিনাকে পার্টিরই বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োগ কবা হয়েছে। সে সাবা ভারতের মজদুরকে সংগঠন করেছে।

শেষে এক ইউনিয়ন তিন ইউনিয়ন হয়ে গেল। তার একটা ইউনিযন অবশ্য কাজিমনেব দখলে থাকল। আর সেটা পুরোপুবি আমাদের পার্টিরই লেবাব ফ্রন্ট হয়ে দাঁড়াল। আব দুটো অংশ অন্য দুটি পার্টিব কবলে চলে গেল।

সাগিনার নামে নানা বদনাম বেরুতে লাগল। গুরুং, দলবাহাদুব, ওযাংদিরা পর্যন্ত সাগিনাব শত্রু হযে উঠল।

এদিকে ইউনিযনে ইউনিয়নে বেশ মাবামাবি দাঙ্গা চলতে লাগল।

অবস্থা ওখানে যখন এমনি চবম, তখন পার্টি আমাকে নির্দেশ দিলে, শিলিগুড়ি যাও। কাজিমন পার্টি ছেড়ে দিয়েছে। ইউনিযনে ফিফ্‌থ কলাম ঢুকেছে। ধর্মঘট কবাতে চায। সেটি প্রতিবোধ কবতে হবে।

শিলিগুড়ি ফিবে এসে ব্যাপাব দেখে আমাব তো চক্ষুস্থিব। অফিস উঠে গেছে। আমাদেব সমর্থক বলতে কেউই প্রায নেই। খার্সাং গেলাম। দেখি কাজিমন ভেঙে পড়েছে।

কাজিমন বলল, 'এখানকাব কাম খতম। বিলকুল খতম। সব টুকবো টুকবো হযে গেছে ভাই। জোড়া দিবে কি দিযে?'

বললাম, 'কেন, সাগিনা আছে। তাকে আনব। পাবলে সে-ই পাববে।'

কাজিমন হতাশ হযে বলল, 'একদিন সে পাবত। আজ সেও পাববে না। আমবা তাকে খতম করে দিযেছি।'

কাজিমনেব কথা বুঝতে পাবলাম না। আমবা খতম করেছি মানে কি?

মানে কাজিমন নিজেই বলল।

'দেড় বছর আগে শিলিগুড়িতে যে সম্মেলন হয, সেইখানেই খতম করেছি সাগিনাকে। কমবেড, তখন আমাব একটা খটকা লেগেছিল। কোম্পানি এত সহজে এ-বকম একটা দাবি মেনে নিচ্ছে, ব্যাপাব কি? তাবপব ভাবলাম, যুদ্ধেব সময আছে। সবকাব হয়তো চাপ দিযেছে তাই কোম্পানি মেনেছে এই দাবি। কিন্তু ক'মাস পবেই আমাব ভুল ভাঙল। তুমিও এখান থেকে চলে গেলে আব পার্টি আমাকে চাপ দিতে লাগল ইউনিযনকে পার্টির উইং কবে ফেল। ইউনিযনেব মেম্বাবদেব পার্টি মেম্বার কব। ওখানে পার্টিব শক্ত ঘাঁটি চাই — যত বলি — ইউনিযনকে পার্টি কবা যাবে না, ভেঙে যাবে ইউনিয়ন — মজদুরের সংহতিতে ফাট ধববে — মজদুবেব তাকত দুবলা হযে পড়বে — কিন্তু কে শোনে। একদিন কলকাতা থেকে তলব এল। গেলাম। কমরেড দত্ত কথায কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, সাগিনাব প্রভাব কমেছে না বেড়েছে! আমি তাঁব কথা ধরতে পারিনি। সবলভাবে বললাম, সাগিনাকে শিলিগুড়ি থেকে এতদিন বাইরে রাখা ঠিক হযনি। সাগিনার বিরুদ্ধে নানা প্রচাব চলেছে। তার ফলে প্রভাব তো কমবেই।'

কাজিমন বলল, 'কমরেড দত্ত কি বললেন জানো?'

আমার পাল্টা প্রশ্ন শোনবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কাজিমন।

তারপর বলল, 'কমরেড দত্ত বললেন, সাগিনা নয়, ওখানে থাকবে পার্টি। সেইটেই গড়ে তুলুন।'

কাজিমন আবার চুপ করল।

তারপর আপন মনে বলল, 'জেলে পাঠিয়ে যা না করা যেত, সাগিনাকে হিরো বানিয়ে তা করা গেল। কিন্তু ফায়দাটা হলো কি?'

কাজিমন আমার বন্ধু। খুব সত্যনিষ্ঠ কর্মী। কিন্তু সত্যি বলছি, সেদিন ওর কথা আমি বিশ্বাস করিনি। এ কি হতে পারে?

পাঁচদিন ধরে শিলিগুড়িতে ঘুরলাম। পুরনো বন্ধুরা সব জড় হলো সেই ভাটিখানায়, শুধু সাগিনা নেই। খবর পেয়েছি সে এখন বোম্বাইতে। তাকে আন্তর্জাতিক শ্রম সমাবেশে পাঠানো হয়েছে।

গুরুংকে বললাম, 'সাথী, সবাই একাঠ্ঠা না হলে ধর্মঘট করলে তো মরবে। তোমাদের ইউনিয়ন তো ভাঙা। লীডার কই?'

গুরুং মদ খেয়ে টং হয়ে ছিল।

বলল, 'তো কি করব? লীডার শালা তো ছিল, তো শালা দালাল বনে গেল। শালা সাহেব হয়ে গিয়েছে। বড় মকানে থাকে। বিবি নিয়ে রংবাজি কবে। তা কি করব। ভুখা মরব। জরুর চাক্কা বন্ধ হবে।'

'হাঁ হাঁ, হবে হবে।'

মাতালগুলো হিংস্র আক্রোশে চীৎকাব করতে লাগল।

পরদিন সকালে স্টেশনে গিয়েছি। দেখি সাগিনা। পুরোদস্তুব সাহেব।

আমাকে দেখে ডাকল, 'আরে কামবেড, তুম? তুমি কোথা থেকে?'

বললাম, 'লালমণিরহাট থাকি। এখানে এসেছি দিন দশ-বারো।'

বেস্টুরেন্ট ঘবে নিযে গেল আমাকে। সাগিনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খবব কি, কমরেড?'

ওকে এমন সময় এখানে দেখব আশা করিনি। মনে হলো যেন বিধি-প্রেরিত।

সাগিনা বলল, সে পালিয়ে এসেছে বোম্বাই থেকে।

বলল, 'ভাল লাগে না। কি মিটিন-ফিটিন। ফালতু ঝামেলা। এত বাত কবে কি কাম হবে? আরে সংগঠন বানাও। আপনা হাতমে পাওয়ার লে লো। তব্ শালা মালিক মজদুরকো বাপ বলবে। হ্যাঁ?'

'তারপব,' সাগিনা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি কাম এখানে?'

বললাম, 'তোমাদের রেলে স্ট্রাইক হবে, জান না?'

'স্ট্রাইক হবে!' সাগিনা বিস্মিত হলো। 'কবে?'

'আজ বিকালে তো বস্তিবাজারে মিটিং আছে। ঠিক হবে।'

'আচ্ছা?' অবাক হযে গেল সাগিনা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন, তুমি জান না কিছু?'

সাগিনা কি যেন ভাবছে।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি জান না?'

এবার সে বলল, 'এখানে কি থাকি যে জানব! ঘুরতে ঘুবতে সত্যনাশ হয়ে গেছে। তবে কারোয়াই ঠিক হচ্ছে। চাক্কা বন্ধ আর একবার হওয়া দরকার। শালা কোম্পানি এক নম্বব দাগাবাজ আছে। দেড় সাল পুরা হয়ে গেল শালার সিমিণ্ট মিলছে না। কোয়ার্টার করবে কুলিদের, কণ্টাক্টর মিলছে না। খালি ঘুরাচ্ছে। শালা ঝুট।'

সাগিনা ঝুঁকে পড়ল আমার সামনে।

বলল, 'দেখো কামরেড, আমার মালুম হচ্ছে কি, এইসব ওয়েলফয়ার উয়েলফেয়ার এসব বিলকুল ধোঁকাবাজি আছে। আমাকে দিয়ে এ কাম আর চলবে না সাথী। আরে আমি ভাল কোয়ার্টারে থাকব তো তামাম মজুরদের ভালাই হবে? ধুর। সব গলত বাত। আমার মতুন কোয়ার্টার সব কো দো, আচ্ছা খানা দো। পুরা কাম লো। কোই শালা হুজ্জৎ করবে না। আমি খাটতে খাটতে খুন পসিনা ঢেলে দিব আর উসকে বদলা তুমি শালা দিবে শুখা বাত আর ঝুঠা ওয়াদা। ইসব তো জিন্দগী ভর চলে না। ঠিক হ্যায়, চাক্কা বন্ধ করনা ঠিক হ্যায়। লেকিন করবে কে?'

সাগিনাকে বোঝালাম তখন অবস্থাটা। বিশদ বিবরণ দিলাম। বললাম, ইউনিয়ন নেই। নিজেদের মধ্যে মারামারি। এই অবস্থায় পাগলের মতো ওরা স্ট্রাইক করতে যাচ্ছে। সব খবর ওকে দিলাম। শুধু বললাম না কাজিমন যা বলেছিল, আর বললাম না গুরুংরা ওর সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে।

সব শুনে সাগিনা বলল, 'তবে তো আখুন চাক্কা বন্ধ চলবে না। আগে সংগঠন পাক্কা করতে হবে। ঠিক হ্যায় কামরেড, তুম ফিন হিঁয়া আ যাও। ঐসি ইউনিয়ন ফিন বানাতে হবে। আমিও আসব। এ শালার নোকরি হাম সে নেই চলেগা।'

শুনে খুব ভাল লাগল আমার।

বললাম, 'তবে চল, বস্তিবাজারে যাই, সেখানে মিটিং আছে। তুমি বলবে চল। তোমাকে পেলে আবার সব ঠিক হবে।'

'হাঁ হাঁ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার সে কমরেড কোথায় গেল?'

'কৌন?'

বললাম, 'কমরেড বিশাখা।'

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে সাগিনা বলল, 'আরে উও তো আউর জেন্টিলম্যান আছে। মজদুরের সাথে আর কতদিন থাকবে। উও ভি ছুট গিয়েছে। যেতে দাও। জিন্দগি থাকবে তো আউর ভি আওরাত মিলবে।'

কিন্তু সেইদিনই যে সাগিনার জীবন যাবে বুঝতে পারিনি।

বস্তিবাজারের সভায় গিয়ে বুঝলাম, কাজিমনের কথা কত সত্যি।

সাগিনা আমাকে বলেছিল, সে ঠিক সময়ে হাজির থাকবে মিটিং-এ। কিন্তু আমি সন্ধ্যের মুখোমুখি মিটিং এ গিয়ে যখন হাজির হলাম, তখনো সাগিনা সেখানে যায়নি। আমার মনে নতুন করে আশা জন্ম নিচ্ছিল। সাগিনা বুঝতে পেরেছে যখন, তার মোহ ভেঙেছে যখন, তখন আর ভয় নেই। সাগিনার ব্যক্তিত্ব সমস্ত বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাবে। এই টুটা-ফুটা সংগঠনকে আবার সে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করাবে।

জানি, আমার এ মনোভাব পার্টি বরদাস্ত করবে না। কিন্তু পার্টির নেতারা এই জায়গা চেনেন না, এই লোকগুলোকে জানেন না। তাই সাগিনাকে সরিয়ে নিয়ে একটা ভুল করেছেন। আমি সেই ভুল শুধরে দেব।

মিটিং শুরু হবার পর থেকেই একটা হট্টগোল চলছিল। উত্তেজনা বাড়ছিল। কোনো বিষয়েই নিজেরা একমত হতে পারছিল না। আর পারছিল না বলেই রাগ চড়ছিল ওদের। খালি গালাগালি করছিল ওরা।

হঠাৎ সাগিনা এসে পড়ল। প্যান্ট কোট টাই পরা সাগিনা। তবে ওব পোশাকের জলুস অনেক চটে গেছে। চোখমুখ দেখে মনে হলো, টেনে এসেছে বেশ। মাথার চুল এলোমেলো। বোধ হয় খুব ঘুরেছে সারাদিন।

আমি ওকে দেখে ওর দিকে এগিয়ে যাবার আগেই সাগিনা বক্তাদের টেবিলেব কাছে এগিয়ে গেল।

ওকে দেখে হট্টগোল থেমে গেল। সভাস্থল নিশ্চুপ।

সাগিনা গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল. 'কেয়া মামলা হ্যায়, সাথীও?'

সবাই চুপ।

'কিসকা মিটিং?'

হঠাৎ বাহাদুর চেঁচিয়ে উঠল, 'নিকালো শালে গদ্দাব। ভাগো হিঁয়াসে।'

কী সুতীব্র বিদ্বেষের জ্বালায যে বাহাদুবের চোখ দুটো জ্বলজ্বল কবে উঠল, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ও দুটো যেন ঘৃণার লিকলিকে ছুরি। আমি শিউরে উঠলাম। এই সেই বাহাদুর। সাগিনার সব থেকে অনুগত অনুচব। সাগিনাব কথায় আমার ঘবে একদিন একটা মেয়ে এনে হাজির করেছিল।

বাহাদুরেব কথা থামতে না থামতে ঘৃণা, বিদ্বেষ চারিদিক থেকে যেন মুঠো মুঠো কবে সবাই সাগিনাব মুখে ছুঁড়ে মাবতে লাগল। দেখলাম সাগিনা ভ্যাবাচাকা খেযে গেছে।

বুঝলাম, যা দেখেছে তা যেন বিশ্বাস কবতে পাবছে না। আমিও বিশ্বাস কবতে পাবছিলাম না।

'ভাগো ভাগো ভাগো। শালা দালাল। কুত্তিকা বাচ্চা আব সাহাব বন গিযা হ্যায।'

'দেখ শালে,' গুরুং কাঁপতে কাঁপতে এগিযে এল সাগিনার দিকে। বললে, 'দেখ শালে. ক্যায় হালত হুয়া হামলোগকা। না খানা মিলা, না পহেন্‌না। আউব তু বড়ে সাহাব বন গ্যযা। শালে কো মুহমে থুক ডাল।'

থুঃ করে থুথু ছুঁড়ল গুরুং।

সাগিনা চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাইও, সাথীও —'

তার গলা ডুবে গেল তুমুল কোলাহলে।

'মার ডাল শালাকো। পিটো।'

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। তারপব মুহূর্তেব মধ্যে উন্মত্ত জনতা ঝাঁপিযে পডল তাব উপর। কিল ঘুঁষি লাথির উত্তাল তবঙ্গে সাগিনা খাবি খেতে লাগল। কতবাব উঠতে চেষ্টা করলো, কতবার চেষ্টা কবল কথা বলতে। কিন্তু বৃথা। সেই প্রচণ্ড মাবেব বেগ ঠেলে সাগিনা না পারল মাথা তুলতে, না পারল টুঁ শব্দ কবতে।

ভয়ে আমার রক্ত শুকিয়ে উঠল যেন। ক্রোধের, ঘৃণার এমন উন্মত্ত রূপ আমি আব কখনো চোখে দেখিনি। আমি থরথর করে কাঁপছি তখন। সাগিনা হঠাৎ নিদারুণ আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনেব ভিতব কে যেন বলে উঠল, পালাও। আমি দিগ্বিদিক হারিয়ে দিলাম দৌড়।

ভাটিখানার মালিক নাকছেদি সাগিনাব অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে, আমি আর পাঁচ-সাতজন আমাদের দলের লোক নিয়ে যখন ফিরে এলাম বস্তিবাজারে, তখন রাত প্রায় নটা বেজেছে। হিমালয়ের পাদদেশের রাত, তাই মনে হচ্ছে যেন বারোটা। খোলা মাঠে চিত হয়ে পড়ে ছিল সাগিনা। একা। তার স্যুট টাই ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। নাক-মুখ ফুলে উঠেছে। মাথা ও-কপাল ফাটা। রক্ত চাপ চাপ হয়ে রয়েছে সারা গায়ে।

না, মরেনি। ধরাধরি করে ভাটিখানায় এনে তোলা হলো ওকে। দু'তিন ঘণ্টা পরে জ্ঞান হলো। উঃ আঃ কিচ্ছু করল না সাগিনা।

নাকছেদি ওকে মদ খেতে দিলে। ঢকঢক বোতলটা শেষ করে ফেলল। তারপব বসে বসে হাঁপাতে লাগল।

একটু পরে বলল, থেমে থেমে বলে চলল, 'আমাকে পিটেছে। খুব পিটেছে। কিন্তু ঠিক করেছে। বুঝতে পারছি, বেইমানি আমি করেছি। পুরা সমঝ গিয়া হ্যায় হাম।'

'লেকিন কামবেড,' আমাব হাত চেপে ধরল সাগিনা। বলল, 'এক ধোঁকাবাজিতে আমি ফেঁসে গিয়েছিলাম। আমি তা বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, মজদুরেব ভাল কবাব নাম করে আমি খালি মজা করে কাটিয়েছি। খালি বান্দবনাচ নেচেছি। কি আফসোস।'

সেই সাগিনার শেষ কথা। পবদিন শুকনা ফবেস্টে তার রেলে-কাটা দেহটা পাওয়া যায়। বেল লাইনেব পাশেই উপুড হয়ে পড়ে ছিল। কেউ বলে — সে খুন হয়েছে, কেউ বলে — আত্মহত্যা করেছে।

নন্দিতা

বাণী বসু

'শুনছো? শুনছো? ওঠো না গো একবার!' মাঝরাত্তিরে নন্দিতার ঠেলাঠেলিতে ঘুমটা একেবারে কাচের বাসনের মতো খানখান হয়ে গেল।

'হলটা কী?' ধড়ফড় করে উঠে বসল শুভেন্দু। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জানলাগুলো বেশির ভাগই বন্ধ। তা সত্ত্বেও ধারাবর্ষণের তুমুল শব্দ কাচ কাঠ সমস্ত অনায়াসে ভেদ করে ফেলছে।

ভোঁতা, ভারী শব্দ একটা। ভরা শ্রাবণের মধ্যরাত। জ্বালাময় মাঝ-বর্ষার দিনাবসান। ধরিত্রীরও। তার বুকে অবিরাম জীবন ধারণের লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত মানুষগুলিরও। অন্তত পক্ষে শুভেন্দুশেখরের তো বটেই! গতকাল সকালের ট্রেনেই ফিরেছে, তিনদিনের ঝটিকা ট্যুর সেরে, তারপর গেছে অফিস। সেখানে ট্যুর-ক্লান্ত বলে কোনও বিশেষ বিবেচনা স্বভাবতই মেলেনি। সন্ধের বাড়ি ফেরার লগ্ন থেকেই ঘুমটা আসছিল নেশার মতো। একটা চমৎকার আমেজ, তাকে আরও চমৎকারভাবে জমিয়ে দিল বেশি-করে গাওয়া ঘি-ঢালা নাতিগাঢ় মুগের ডালের খিচুড়ি আর পাটিসাপটার মতো কি জানি কিসের পুরভরা দুর্দান্ত ওমলেট। বর্ষারাতের সেই জমজমাট ঘুম এইভাবে কেউ ভাঙায়? ঠেলে, ঠেলে! অল্প ঠেলায় হল না দেখে ধাঁই ধাঁই করে রামধাক্কা মেরে?

'শুনতে পাচ্ছো না?' নন্দিতা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল।

'কী শুনতে পাবো?' ঘুমে ভারী, বিরক্ত গলায় শুভেন্দু বলল।

'কুকুরটা কী ভীষণ কাঁদছে!' অন্ধকারে মনে হল নন্দিতাও কাঁদছে। গলার স্বরটা যেন আধা-বিকৃত।

অবিরাম বর্ষণের ভারী আওয়াজ ভেদ করে এই সময়ে কোনও কাতর চতুষ্পদ প্রাণীর ডাক শুনতে পাওয়া গেল। করুণ সাইরেনের মতো ধাপে ধাপে সুরে চড়ল ডাকটা, তারপর আবার খাদে নেমে এলো। কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ অতঃপর ভিন্ন রাগিণীতে শুরু হল আলাপ।

'ঘুমোতে না পারো, একটা কাম্পোজ খেয়ে শুয়ে পড়ো,' শুভেন্দু আবার ঝুপ করে শুয়ে পড়ল।

'ঘুমোতে না পারার কথা হচ্ছে না'—নন্দিতা আর্ত গলায় বলে উঠল—'কুকুরটা যে ভয়ানক কাঁদছে। ওকে এই দারুণ বৃষ্টির মধ্যে ছাদে বেঁধে রেখে দিয়েছে। তা ছাড়া ..' নন্দিতার কথা শেষ হল না, শুভেন্দু প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'তো আমি কী করবো?' কথাগুলো কেটে কেটে প্রত্যেকটাতে বেশ খানিকটা রাগ ভরে ভরে সে বলল। কদিন ধরে এ এক মহা উৎপাত শুরু হয়েছে। তাদের দোতলা বাড়ির পরেই একটা ছোট জমি ঘেরা পড়ে আছে। তারপর এক পুলিস ইনসপেক্টরের বাড়ি। ভদ্রলোকের খুব জন্তু-জানোয়ারের শখ। খরগোশ, গিনিপিগ থেকে আরম্ভ করে ছাগল, গরু এমন কি বাঁদর পর্যন্ত পোষা হয়ে গেছে। তা পুষুন,

কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু পোষা প্রাণীগুলোর কোনও যত্নই ওঁরা করেন না। খরগোশ, গিনিপিগগুলোকে গুণ্ডাগুলো এসে এসে খতম করে গেল। ছাগলিটা যে কদিন দুধ দিল, দিল। তারপর ভদ্রলোক স্বহস্তে তাকে কেটে খেয়ে ফেললেন। গরুটা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে দিবারাত্র হাম্বা হাম্বা করত, গলার দড়ি কখনো খোলা হত না, তা কী গতি হল তাদের কারুরই জানা নেই। আর বাঁদরটার লক্ষ্য ছিল এ পাড়াব যতেক গৃহস্থ-বাড়ি। নিজের মালিকের কাছ থেকে যথেষ্ট খেতে পেত না কিনা কে জানে, কিন্তু পাড়ার হেন বাড়ি নেই যেখান থেকে সে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভোজ্য সংগ্রহ না কবেছে। ক্লাইম্যাক্স হল শুভেন্দুর শার্ট পাঞ্জাবিব বোতাম ভক্ষণ। কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। পুলিসের দারোগা, ওরে বাবা, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তবে ইদানীং ভদ্রলোক যা শুরু করেছেন সত্যিই সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটাব পব একটা দারুণ সুন্দর, দামী কুকুর আনছেন আর অযত্ন-অবহেলা দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই মেরে ফেলছেন। শুভেন্দু আর অতশত জানবে কোত্থেকে, নন্দিতাই জানায়। জানলায় দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ইশারা করে শুভেন্দুকে ডাকে— "দেখো দেখো দেখে যাও।" দারোগার বাড়ির উঠোনে একটা ছোট ডোল, তাতে গিন্নি এঁটো কাঁটা সব এনে ফেলে দিলেন, তারপরেই ডাক দিলেন, 'আঃ আঃ টমি, আঃ আঃ।' আপাদমস্তক টান-টান চব্বিশ পঁচিশ ইঞ্চি উঁচু একটা গ্রে-হাউন্ড অপরূপ ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো। ভদ্রমহিলা তাকে এঁটোকাঁটাগুলো খাওয়াবার জন্যে ক্রমাগত তাড়না করছেন, আর অভিজাত বংশীয় গ্রে-হাউন্ডটা ক্রমাগত তার লম্বা সরু চকচকে মুখটা ফিবিয়ে নিচ্ছে। গ্রে-হাউন্ডটা বোধহয মরে গেল তবু পাত-কুড়োনো মুখে দিল না, এবং কুকুরটা মরে গেল তবু তার মালিকবা তাকে তাব যোগ্য খাদ্য দিলেন না। একটা চমৎকার স্প্যানিয়েল গেল আপাদমস্তক ঘা হয়ে। চুলকোতে চুলকোতে কুকুরটা যেন ক্ষেপে যেত একেক সময়ে। সাবা শরীব থেকে খাবলা খাবলা লোম উঠে, দগদগে ঘা নিয়ে একদিন প্রচণ্ড লাফিয়ে উঠে সামনেব থাবায় মুখ দিয়ে শুয়ে পড়ল, উঠল না আর। কোথা থেকে ভদ্রলোক এতো সুন্দর সুন্দর পেডিগ্রি-ডগ জোগাড় কবেন কে জানে। পুলিসের লোক, কোথা থেকে আব! মিনি-মাগনা পায় বলেই বোধ হয় আবো এতো অচ্ছেদ্দা। কী জিনিস পেয়েছে জানেই না। লেটেস্ট হচ্ছে একটা ডালমেশিয়ান। অপরূপ কুকুর। নন্দিতা জানলার কাছ থেকে নড়েই না—'দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর ঘুবে বেড়াচ্ছে।' সাদার ওপর কালো কালো গোল গোল ছিট, আবাব ভালো চামড়াব কলাব, এবাব বোধহয দারোগার মক্কেল কলাব সুদ্ধুই উপহার দিয়েছে। কুকুরটা খুব সম্ভব পূর্ণবয়স্ক। পোষ মানতে চাইছে না। পোষ মানাবাব উপায় হিসেবে দাবোগাবাবু থার্ড ডিগ্রি প্রযোগ করছেন। 'টমি—কাম হিযাব।' ভদ্রলোকেব সব কুকুবই টমি। টমি আসছে না, লম্বা হিলহিলে চাবুকের বাতাস কাটার শব্দ সুইশ্‌শ্‌শ্‌। নন্দিতা কানে আঙুল চেপে বসে পড়ে। 'টমি, সিট ডাউন।' এবাবও টমি আসছে না, আবাবও চাবুক নামছে। এবার নন্দিতা জ্ঞানশূন্য হয়ে জানলার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ছে—'অ মেসোমশাই, মেসোমশাই' তার তীক্ষ্ণ সরু গলাও ভদ্রলোকের মোটা কানে পৌঁছতে দেবি হচ্ছে। অবশেষে অবাক হয়ে দারোগা মেসোমশাই মুখ তুলে তাকিয়েছেন। কস্মিনকালেও নন্দিতা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মাসি-বোনঝি সম্পর্ক পাতাযনি। অতএব অবাক।

'মারবেন না, প্লীজ, অমন করে মাববেন না!' আকুলি-বিকুলি করতে থাকে নন্দিতাব চোখের কোলে টলটলে জল। অতশত হয়ত দেখতে পাচ্ছেন না মেসো, কিন্তু কেমন হতবুদ্ধি হযেই হাতের বেতটা ফেলে দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। উঠোন ছেড়ে ভেতবে। ঘরেব আশ্রয়ে।

সেই অবাধ্য ডালমেশিয়ানেরই এখন এই দুর্গতি হয়েছে। দোতলাব ছাদে উপর্যুরন্ত বৃষ্টির তলায় আশ্রয়হীন। কোথাও ছুটে পালিয়ে যাবে তার উপায় নেই। বাঁধা। নন্দিতা

অনেক কষ্টে চোখের জল চাপতে চাপতে বলল, 'তুমি তো কদিন ছিলে না, জানো না। রোদে জলে ওকে একভাবে বেঁধে রেখে দ্যায়। নিজেরা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। আমরা ঘুমোতে পারছি না। খাবার মুখে রুচছে না। ওদের দেখো হেল-দোল নেই!' কেঁউ কেঁউ কেঁউ, আবার বৃষ্টি ছাপিয়ে কুকুরের ডাক ভেসে এলো। নন্দিতা বলল, 'ওর নিশ্চয় অসুখ করেছে, খুব কষ্ট হচ্ছে, ওগো যাও না একবার প্লীজ।'

শুভেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওদের পাড়ায় সবাই ভয় পায়, এড়িয়ে চলে, আমি মাঝখান থেকে কুকুর ডাকছে বলে এই রাত্তিরে গিয়ে কমপ্লেন করবো?'

'ওহ্ বুঝতে পারছো না, কুকুর ডাকছে বলে নয়!' নন্দিতাব গলা যেন রুদ্ধ হয়ে যাবে, 'কুকুরটা কষ্ট পাচ্ছে বলে! বৃষ্টিতে। রোগে! ...' সে আব কিছু বলতে পাবে না, ঝবঝব কবে কাঁদতে থাকে।

শুভেন্দু বলে, 'একটা কুকুর কষ্ট পাচ্ছে বলে, এই দুর্যোগের রাত্তিরে তুমি আমাকে বাড়ি-ছাড়া করবে? জানো কত জন্তু-জানোয়ার, জন্তু-জানোয়াব ছেড়ে কত মানুষ নিবাশ্রয় ঠিক এখন, এই মুহূর্তে। বৃষ্টিতে উড়ে গেছে কার খড়ো চাল, জল জমে ভেসে গেছে গেরস্থালি .'

শুভেন্দুর কথা শেষ হল না, হঠাৎ নন্দিতা দড়াম করে এক লাফ দিল বিছানা থেকে মাটিতে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দবজার খিল নামাল। তারপর বাইরে বেবিযে গেল।

অগত্যা শুভেন্দুকেও উঠতেই হয়। খোঁজ কোথায় টর্চ, কোথায় বর্ষাতি, কোথায ছাতা! নিচে নেমে সে অবাক হয়ে দেখল সদর দরজা খোলা। হু হু কবে বৃষ্টির ছাট ঢুকছে। নন্দিতা এই রাত্তির দেড়টায় জলেব মধ্যে একাই বেরিযে গেছে।

কোনক্রমে বর্ষাতি টর্চ আব ছাতা সামলাতে সামলাতে প্রতিবেশীব বাড়িব দবজায সে যখন পৌঁছল ততক্ষণে সে বাড়ির দরজাও খুলে গেছে। চৌকাঠের এপারে সোঁপাটে ভিজে নন্দিতা, ওপারে টর্চ হাতে লুঙ্গি-পরিহিত ভুঁড়িয়াল দাবোগা, 'দোহাই আপনাব, কিছু করুন, কিছু করুন মেসোমশায়, কুকুবটা যন্ত্রণায কাতবাচ্ছে, ভযানক কষ্ট হচ্ছে ওর, কিছু করুন।'

দারোগা বললেন, 'আপনি তো আচ্ছা জাঁহাবাজ মহিলা দেখছি। আমার স্ত্রী বলেন বটে জানলা থেকে যখন তখন স্পাইং করেন, আমার কুকুর, আমি মারি কাটি আপনাব কী? ইয়ার্কি পেয়েছেন?' শেষ কথাটা উনি শুভেন্দুর দিকে চেয়ে বললেন।

শুভেন্দুব ভেতরটা বাগে জ্বলে যাচ্ছে নন্দিতার ওপরও, দাবোগাব ওপরও। সে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বলল, 'আসলে কী জানেন, আমার স্ত্রী কুকুব ভীষণ ভালোবাসে, একটু দেখুনই না! এতো করে বলছে যখন!'

কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে দারোগা হাঁক দিলেন—'হারু, হারু, ট্যাপলা! ছাতা নিযে একবার ওপরে যা দিকিনি, দ্যাখ তো টমিটা কেন এতো চেঁচাচ্ছে!' দুটো ছাযামূর্তি ছাতা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে দেখা গেল। দারোগা বললেন, 'দেখুন মশাই, এক পাড়াতে থাকি, বিপদে-আপদে নিশ্চয একে অপরেব সহায। কিন্তু পরেব ব্যাপাবে খামোখা এভাবে নাক গলালে মেয়েছেলে বলে মান রাখতে পারবো না। আসুন আপনাবা! আসুন এবার .. ।' গলাটা শেষের দিকে আরও কড়া।

এই সময়ে একটা ছায়ামূর্তি টর্চের আলোর বৃত্তের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে পরম সন্তোষের সঙ্গে বলল, 'বাবা, টমি আর চেঁচাচ্ছে না, কেমন দাপাচ্ছিল, কাটা পাঁঠার মতো, এখন চুপ করে শুয়ে পড়েছে।'

নন্দিতা ফিসফিস করে বলল, 'মরে গেছে।' সে স্খলিত পায়ে পেছন ফিরে বাড়ির দিকে চলতে লাগল। বৃষ্টিতে ভিজে শাড়ি পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দড়াম করে আছাড় খেল

একটা। শুভেন্দু তাকে তুলে ধরে, কোনমতে বাড়ি নিয়ে আসে, সেই রাতে গরম জল করে ব্র্যান্ডি দিয়ে খাওয়ায়, পরদিন সকাল না হতেই টেট-ভ্যাকের খোঁজে ছোটে। হাঁটুর কাছে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। দুটো স্টিচ। সে এক কাণ্ড।

নন্দিতা ডাকসাইটে কুকুর-প্রেমিক বলেই যে এমনটা ঘটল তা কিন্তু নয়। নন্দিতা কুকুর দেখতে ভালোবাসে, পুষতে মোটেই নয়। সে কোনও জন্তু-জানোয়ার পাখি-টাখি পোষবার আদৌ পক্ষপাতী নয়। ওসব আবদার তার নেই। বলতে গেলে কোনও আবদারই তার নেই। আপন খেয়ালে বই পত্তর, ক্যাসেট-ফিল্ম নিয়ে থাকে, ভালো ভালো রান্না করে, করে দু পক্ষের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ায়। খুব মিশুক। যেখানে যায় হেসে, গল্প করে, মজা করে একগাদা বন্ধু বানিয়ে ফেলবে। এরকম একটা স্টীমার-পার্টির জমায়েতে হাসি-খুশি উচ্ছল স্বভাবের প্রাণবন্ত মেয়েটিকে মাস্তুল ধরে পাক খেতে খেতে একটার পর একটা কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেই একেবারে ঘাড়মোড় ভেঙে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল শুভেন্দু। আর বিয়ের পর তো নন্দিতা একটা অভিজ্ঞতা! এতো স্বতঃস্ফূর্ত তার আবেগ! ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এমন জমকালো! এমন হৃদয়ের দু কূল ভাসিয়ে নেওয়া প্লাবনের মতো উত্তাল। যে শুভেন্দু মনে মনে গোপনে জানে এমনটা বোধহয় আর হয় না। এবং সে অতি ভাগ্যবান। বিশেষত সে মা-বাপ মরা, মামার বাড়িতে এবং পরে হোস্টেলে মানুষ। স্নেহ-ভালোবাসা-আদরের জন্য কতটা কাঙাল সে ছিল, বিয়ের পর নন্দিতার প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে যেতে ভালো করেই বুঝতে পারে। ওই এক দোষ, একে কী বলবে শুভেন্দু বুঝতে পারে না। খামখেয়ালি। না সেন্টিমেন্টাল। না ওই পরের ব্যাপারে নাক-গলানোর আদিখ্যেতা! কী বলবে একে সে সত্যিই জানে না।

রোজই অফিস থেকে ফেরবার সময়ে এক বুক আনন্দ নিয়ে ফেরে শুভেন্দু। সে জানে যতই কলিগের সঙ্গে মনোমালিন্য হোক, ডিরেক্টর যতই বাঁকা চোখে তাকাক, গুচ্ছের নীরস অর্থহীন কাজের জন্যে তাকে যতই ছোটাছুটি করাক এরা, বাড়িতে তার জন্যে অসাধারণ কিছু অপেক্ষা করে আছে। দরজা খুললেই চমকে উঠবে হলুদ শাড়ি, শ্যাওলা সবুজ চুলের সেই মেয়ে কাজলবিহীন কাজলা চোখে এমন চাওয়া চাইবে, দাঁত ঝিকিয়ে এমন হাসি হাসবে যে সহস্র মানুষের সহস্র রকম দুর্ব্যবহার, হাজারখানা সমস্যার উদ্যত মুখ সব বাঁশির নাচনে সাপের ফণার মতো নুয়ে পড়বে। তারপর বেতের হালকা চেয়ারে মুখোমুখি বসে চা-খাওয়া, ঝুপঝুপ সন্ধে নামছে, আলো জ্বলছে। সারাদিনের জমা কথা ফুটছে টুকটাক, দু একটা গানের কলি, একটা ধূপ জ্বেলে দেওয়া। ঘাড় ফিরিয়ে একটু ভ্রূভঙ্গি—শুনতে এইটুকু কিন্তু এরই মধ্যে যে কী অসামান্য রস ভরা থাকে তা শুভেন্দু ছাড়া কেউ কি জানবে?

কিন্তু কোনও একদিন ওইরকম প্রত্যাশার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যদি হাসির চমক না দেখে? সারা শরীরে শোকের ছাপ, যেমন-তেমন মলিন শাড়ি, বিকীর্ণ মূর্ধজা, মেঘে-ভরা আকাশের মতো বর্ষণোন্মুখ চোখ!

'কী হয়েছে নন্দিতা?'

'কিছু না। এসো।'

চা খাওয়া হয়, চায়ের সুগন্ধের সঙ্গে ফিলটার-সিগারেটের গন্ধ মিশতে থাকে। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। যন্ত্রচালিত দুটো হাত ধূপ জ্বেলে দেয়। হাতের মধ্যে যেন কোনও আগ্রহ নেই। রাত্তির হয়, খাবার বাড়া হয়। কথা-বার্তা, হাসি-ঠাট্টা, চোখের-আঙুলের-ঠোঁটের আদর ছাড়া খাবার বিস্বাদ মনে হয়. কিন্তু বারবার জিজ্ঞেস করে করেও উত্তর পাওয়া যায় না।

'কী আবার হবে? কিছু না।'

রাত্রে বোঝে নন্দিতা জেগে আছে। কিন্তু কোনও গভীর শোকে সে অনমনীয়, তাকে এখন ছোঁয়া যাবে না।

পরদিন খবর জানল রাস্তায় বেরিয়ে। দু তিন বাড়ি পরে থাকে অভিলাষদা, তার স্কুল-পড়ুয়া ন' দশ বছরের ছেলেটি মারা গেছে। একেবারে হঠাৎ। স্কুলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বাবাকে তার অফিসে খবর দেওয়া হয়েছিল, বাবা আসতে আসতেই সব শেষ। কেন, কী বৃত্তান্ত ভালো বোঝাই যাচ্ছে না।

ক' দিন পরে শুভেন্দু বলে—'চলো নন্দিতা, উট্রাম ঘাট থেকে ঘুরে আসি।' উট্রাম ঘাটে যেতে, জেটির ওপর দাঁড়িয়ে আঁচল ওড়াতে, গোল রেস্তোরাঁয় খেতে নন্দিতা ভীষণ ভালোবাসে।

কিন্তু নন্দিতা শূন্য চোখে চেয়ে বলে—'কী লাভ?'

'কিসের কী লাভ?'

'এ ভাবে কোথাও বেড়াতে গিয়ে? বা কিছু সে যাই হোক না কেন, করে? কী লাভ? টুবলুর মতো একটা কচি ছেলে যদি এভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ... তো কী লাভ? তুমিই বলো?'

রাত্তিরে নন্দিতা গভীর শোকে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে, যেন তার নিজেরই সন্তান গেছে।

আস্তে আস্তে মেঘ কাটতে থাকে, নন্দিতা স্বাভাবিক হয়, যদিও বৎসহারা জননীর এক গভীর, গভীরতর অসুখ সে যেন তার জীবনযাপনের ভেতরে চিরকালই বহন করে যাবে বলে মনে হয়। সবচেয়ে ভয় এবং আশ্চর্যের কথা, এরও বেশ কয়েক মাস পরে শুভেন্দুর মাসতুত বোনের বিয়েতে নেমন্তন্নে গিয়ে, খাওয়া-দাওয়া হবার আগেই সে শুভেন্দুর হাত ধরে এসে,—'চলো, এক্ষুনি চলে যাবো।'

'কেন? কী হল?' সুন্দর সিল্কের শাড়ি পরা অলঙ্কৃতা বউয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু।

'শুনতে পাচ্ছো না সানাই বাজছে?'

'বিয়ে-বাড়িতে তো সানাই বাজবেই।'

'আমি সইতে পারি না যে। টুবলু যেদিন চলে গেল, সেদিন সারা দিন সারা রাত দূর থেকে সানাইয়ের সুর ভেসে এসেছিল। আমার ... আমি সইতে পারি না।'

টুবলুর মৃত্যু খুবই মর্মান্তিক। একশবার। কিন্তু টুবলুদের সঙ্গে নন্দিতার কোনও যাওয়া-আসাই ছিল না। টুবলুর সঙ্গে সে জীবনে দুবার কথা বলেছে কি না সন্দেহ।

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে, নন্দিতাকে আগে থেকে কিচ্ছু না বলে বাড়ি পাল্টে ফেলার ব্যবস্থা করে শুভেন্দু। একটু শহরতলির দিকে। মস্তানি-ফস্তানি আছে নাকি একটু আধটু। কিন্তু চার ফ্ল্যাটের নতুন দোতলা বাড়ি। গেটে, নন্দিতার পছন্দের মাধবীলতা থোকা থোকা দুলছে। নির্মল আকাশ দেখা যায়। রেল লাইনের ধারে সাঁঝের বাজার বসে। সেখানে হরেক রকম টাটকা মাছ, সবজি পাওয়া যায়। একেবারে হাতের কাছে।

নন্দিতা প্রথমে গুঁই গাঁই করেছিল। তার আবার পুরনো বাড়ি, উঁচু উঁচু সীলিং, রাশি রাশি জানলা-দরজা, এ সব ভালো লাগে। সে ছাদে উঠে গনগনে রোদে কাপড় শুকোতে দেবে, আবার কালবৈশাখী এলে ঝড়ের হাওয়ায় উথালপাথাল হতে হতে কাপড় তুলে আনবে। দুমদাম দরজা জানলার আওয়াজ, ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখির বাসা, পাঁচিলের ফাটলে অশথগাছ, এ সবই তার ভারি পছন্দের জিনিস। কিন্তু শুভেন্দুর এক গোঁ। সে এ বাড়ি ছাড়বেই। বউয়ের খামখেয়ালের জন্যে নতুন বাড়িতে থাকতে পাবে না নাকি সে তাই বলে?

আচ্ছা বউ তো তার! তখন নন্দিতা অগত্যা হেসে ফেলে। দৌড়োদৌড়ি করে সব গুছিয়ে তুলতে থাকে। কী ফেলে যাবে, কী নেবে, কী নতুন কিনবে তার হিসেব-নিকেশ করতে করতে একটা শালিখনী কি চড়ুইনীর মতোই মহা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে শুভেন্দুর বুকের ভেতরটা আনন্দে শিরশির করতে থাকে। 'নন্দিতা, আ-নন্দিতা, অ-নন্দিতা' সে গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে।

আগেকার পছন্দটাকে আঁকড়ে ধরে নতুনের সব কিছু বরবাদ করে দেবে এমন মেয়েই নয় নন্দিতা। নতুন বাড়িটা তার ভারি ভালো লেগে যায়। ফিকে লাইল্যাক রঙের দেয়ালে যামিনী রায়ের গণেশ-জননী টাঙাতে টাঙাতে সে দুদ্দাড় করে ছোটে প্লেনের আওয়াজ শুনে, জানলার গ্রিল ধরে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে, বলে, 'ভালোই হল বলো। আজকাল এয়ারপোর্টে ঢুকতে যা খরচ, এতো কাছ থেকে বেশ নিখরচায় প্লেন দেখা যাবে! কী আওয়াজ! যেন আমাদের বাড়িতেই নেমে পড়বে মনে হয়।' শুভেন্দু পায়ের ওপর পা তুলে মৃদু-মৃদু হাসে। বিজয়ীর মতো।

'তুমি আর বড় বড় কথা বলো না! আসতেই তো চাইছিলে না!'

'তা অবশ্য সত্যি গো!' নন্দিতা কাঁচুমাচু মুখে অকপটে স্বীকার করে, 'আগের বাড়িটা আমার ভীষণ মায়াবী বাড়ি ছিল গো! পুরনো বলে আমি কেমন খারাপ বাসতে পারি না। অন্যে পছন্দ করছে না দেখলে আমার যেন আরও মায়া বসে যায়। এ বাড়িটা একটু নিচুও। কিন্তু দেয়ালগুলো? সাটিনের মতো! আর জানলা দিয়ে মাধবীলতার ভিউটা দা-রুণ।' অতএব সে খুব চটপট নতুন বাড়ি মনের মতো করে গুছিয়ে ফেলে। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, হেসে কুটোপাটি হয়ে, বরের গাল চটকে, কান কামড়ে। খুব তাড়াতাড়ি বাকি তিন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ-টালাপও সেরে ফেলে। সন্ধেবেলায় উৎসাহের চোখে দু চার সিঁড়ি টপকে টপকে উঠতে উঠতে শুভেন্দু আহ্লাদে আটখানা হয়ে শোনে তার বাড়ির জানলা দিয়ে নির্ভুল ভাবে গান ভেসে আসছে— 'পিয়া বিন রয়না নহী জায়।' সে বেল বাজিয়ে দরজা খুলতে না খুলতেই বলে ওঠে, 'পিয়া বিনা রয়না যাবার কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই। পিয়া হাজির।'

কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক নন্দিতামিটা তার বউ এখানেই করে ফেলল। এগুলোকে আজকাল শুভেন্দু নন্দিতামি বলে, আর কোনও নাম বা সংজ্ঞা খুঁজে না পেয়ে। সন্ধের শোয়ে এসপ্লানেড পাড়ায় ছবি দেখতে গিয়েছিল। একেবারে খেয়ে বাড়ি ফিরছে। দুজনেরই খুব মেজাজ খুশ। সারা রাস্তা বাসে বসে বসে ফিলম্‌টার পিণ্ডি চটকেছে দুজনে আর হেসে খুন হয়েছে। তাদের বাড়ি যেতে হলে একটা পাক খাওয়া গলি পড়ে। গলিটা এড়িয়েও যাওয়া যায়, তবে তাতে ভীষণ ঘুর হয়ে যায়। গলিপথে কিছুটা এগোবার পর একটা চাপা বচসার আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা, তারপরেই সামনে যেখানে মোড়, গলিটা দুভাগ হয়ে ডাইনে বাঁয়ে চলে গেছে সেইখানে টিমটিমে আলোয় একটা জটলা, কয়েকটা তীক্ষ্ণ গালাগাল তারপর একটা ছোরা ঝলসাতে দেখল ওরা। শুভেন্দু কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্যা-মুক্ত তীর কিংবা বলা উচিত বুলেটের মতো বেগে নন্দিতা তার পাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। শুভেন্দু দেখতে পেল উদ্যত ছোরা হাতে এক বিশাল চেহারার ঝাঁকড়া চুলো মস্তান, তার পেছনে আরও কিছু দলা পাকানো লোক, অপর দিকে মাথা নিচু করে এক হাত ওপরে তুলে আঘাত এড়াবার ভঙ্গিতে এক ছোকরা। উভয়ের মাঝখানে লাল শাড়ি পরা নন্দিতা একটা ছোট্ট হাইফেনের মতো, কিংবা ছোট্ট একটা ফুলকির মতো। 'না, না, খবর্দার না' সে চিৎকার করে বলছে, 'খবর্দার মারতে পারেন না।' নিমেষের মধ্যে ছোকরা ডান দিকের গলি দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে গেল, মস্তানের চোখে আগুন, ছোরা নেমে আসছে। ব্যস শুভেন্দু আর কিছু দেখেনি, জানে না। তার সামনে নিকষ আঁধার। যখন আবার দেখল, দেখতে পেল

গলির মোড় শূন্য, সে বসে পড়েছে, নন্দিতা বলছে, 'কী হল তোমার? ওঠো। শিগগির বাড়ি চলো!' শুভেন্দু অবাক হয়ে দেখল তার বউ অক্ষত আছে।

কোনওক্রমে বাড়ি ফিরে, দরজায় ভেতর থেকে একটা তালা লাগাল শুভেন্দু। ভারী একটা কৌচ এনে দরজায় ঠেস দিয়ে রাখল। নন্দিতা বলল, 'কী করছো?'

শুভেন্দু গম্ভীব ভাবে বলল, 'এতে কিস্যুই হবে না। দু চারখানা লাথিতেই ভেঙে পড়বে। তবু ডুবন্ত মানুষ তো কুটোগাছটাও আঁকড়ে ধরে!'

'তার মানে? কে লাথি মারবে?'

'কেন? ওই যাদের নোংরা কাজিয়ার মধ্যে তুমি তোমার নির্বোধ নাকটি গলিয়েছিলে? খুব ভাগ্য ভালো যে তোমাকেই খুন করেনি বা ...'

নন্দিতা বলল—'তাই বলে, আমার চোখের সামনে মানুষ মানুষকে খুন কববে আব আমি কিছু বলব না তা তো হয না, হতে পারে না!'

'আর যদি আক্রোশে তোমাকেই খুন কবত!'

'খুন হয়ে যেতাম, কেউ না বাঁচালে।'

'আর যদি রেপ করত?'

'রেপই হয়ে যেতাম। নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে বা কেউ না রক্ষা কবলে! তবে এসব ভাবিনি তখন, দেখেছিলাম দুটো মানুষ, একজনের হাতের ছুবি অন্যজনেব ওপরে নেমে আসছে, মাঝখানে দু আড়াই ফুটের মতো ফাঁকা জায়গা, ওইটুকু ছাডা আব কিচ্ছু দেখিনি, কিচ্ছু ভাবিওনি।'

কী ভয়ানক! কী ভয়ঙ্কর ভয়ানক! এ মেয়েটা ভাবে না পর্যন্ত! শুভেন্দু ভাবল, এবং ভাবতেই থাকল, ভাবতেই থাকল। অফিস যাবার সময়ে বেরোতে ভাবে, বাডি ফেববাব সময়ে ফিরতে ভাবে। গলিতে কদাচ নয়। তথাপি ভয়। আর কিছু না হোক বাড়ি গিযে কী দেখবে এই ভেবে ভয়। যার জন্য এতো ভয়-ভাবনা সেই নন্দিতা কিন্তু একদম স্বাভাবিক। দোকান-বাজার যাচ্ছে, দরজা হাট করে খোলা রেখে বাসনওয়ালীব সঙ্গে গল্প জুড়ে দিযেছে, হাসি গান গল্প। দিব্যি আছে।

কদিন পরে শ্যামবাজারেব মোড় থেকে বাসে উঠছে, হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা ভাবী হাত পড়ল। একেবারে চমকে উঠেছে শুভেন্দু।

'কী রে শুভ?'

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে শুভেন্দু খুশিতে ফেটে পড়ল, 'আরে রমেন না?'

'চিনতে পেরেছিস তাহলে!'

ভিড়ের মধ্যে থেকে সন্তর্পণে তাকে বার করে আনতে আনতে রমেন বলল।

'তোকে কখন থেকে ডাকছি, গাড়ির মধ্যে থেকে, শুনতেই পাচ্ছিস না! অনেকক্ষণ থেকে তোকে ফলো করতে করতে আসছি। চল, ওই দিকে গাড়িটা পার্ক করেছি।' শুভেন্দু একমুখ হেসে বলল—'কবে ফিরলি?'

'বছর খানেক। যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউয়ের মুখে চেম্বাব করেছি। আয় না, দেখে যাবি। আমি অবশ্য এখন চেম্বার বন্ধ করে বেরোচ্ছি।'

শুভেন্দু বলল, 'ঠিকানাটা দে, অন্য একদিন যাবো। আজ না। বউ বাড়িতে একা রয়েছে। জায়গাটা ভালো না।'

'বিয়ে করেছিস? কবে?' রমেন উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'বছর তিনেক হল।'

'তো চল, তোর বউ দেখে আসি। নেমন্তন্নটা তো একেবারেই মিস করে গেছি দেখছি।'

'যাবি? খুব ভালো হয় তাহলে।'

রমেন তার ক্রিম রঙের মারুতি ভ্যানের দরজা সরিয়ে দিল। তারপর বলল—

'আমি পিঠে হাত রাখতে ও রকম ঘাবড়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলি কেন রে?'

'ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলুম বুঝি?'

'হ্যাঁ, একেবারে চমকে উঠলি।'

'আর বলিস না, এই বউটা আমার মাথা খাবাপ করে ছাড়বে।'

'কী ব্যাপাব?'

গাড়িতে যেতে যেতে শুভেন্দু তখন ব্যাপাবটা বলল। শুনে বমেন হাসতে লাগল।

অন্যদিন শুভেন্দুর ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। আজ বমেনের গাড়িতে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। দরজা খুলে দিল বাসনমাজার মেয়েটি। 'কে রে?' নন্দিতার গলা শোনা গেল। মেয়েটি চেঁচিয়ে বললে—'দাদাবাবু।'

'ওমা, তুমি এতো সকালে!' বলতে বলতে শোঁ-ও-ও করে নন্দিতা এসে হাজির হল। পরনে চুড়িদার-কুর্তা, ওড়নাটা কষে কোমবের সঙ্গে বাঁধা। আঁটসাঁট কবে একটা বিনুনি বেঁধেছে। পাযে রোলার স্কেট। এ বাড়িতে কোথাও চৌকাঠ নেই, বোলার স্কেট পাযে চড়িযে নন্দিতা ঘব থেকে ঘবান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একবার শোঁ কবে পেছনে গড়িয়ে আরেকবাব দ্বিগুণ শোঁ কবে সামনে গড়িয়ে এসে নন্দিতা বাজকীয় সালাম জানাল বোলাব স্কেটের ওপব থেকে, 'আইয়ে জানাব।' পবক্ষণেই পেছনে অপরিচিত মুখ দেখে ভড়কে গিয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিতে নিতে তার পশ্চাদপসরণ। একেবাবে রান্নাঘবেব মধ্যে 'ক্‌কী কাণ্ড!' একটু পবে খালি পাযে ওড়না দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে সে বলল। মুখে লাজুক-লাজুক হাসি।

রমেন বলল, 'কেন, বেশ তো ছিলেন. বাহনের ওপর থেকে নেমে এলেন কেন?'

নন্দিতা মুখ ঢেকে হেসে উঠল।

শুভেন্দু বলল, 'এই হল আমাদের রমেন। বমেন দা গ্রেট।'

'বাস? ওইটুকুইতেই ইনট্রোডাকশন হয়ে গেল?' রমেন বলল।

'এব চেয়ে এক পয়সাও বেশি বলতে হবে না বুঝলেন?' নন্দিতার হাসি-হাসি মুখ, 'আপনি প্রায়ই আমাদেব দুজনেব মাঝখানে বসে থাকেন, তা জানেন?'

'সুদূর লন্ডনে বাস করে আপনাদের মাঝখানে... আমি কি ভূত-টুত নাকি?'

'আরে, ও বলতে চাইছে তোকে নিয়ে আমাদের মধ্যে গল্প-সল্প হয়। এই আর কি।'

'তাই নাকি, বাঃ।' রমেন খুব খুশি হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নন্দিতা দশভুজা হয়ে উঠল। প্রথমেই এক দফা চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। চা-টা শেষ হতে না হতেই কিসের বড়া গরম গরম ভেজে এনেছে, তার সঙ্গে আবার চা। তার পরে ছানার পুডিং হাজির করল, সেটা শেষ হলে বলল—'মুখটা মিষ্টিয়ে গেল না কি? কুচো নিমকি খাবেন?' রমেন বলল, 'তাই বলি শুভটা রোগা-প্যাংলা ছিল বরাবর, এমন গায়ে-গতরে হয়ে উঠল কী করে? এই-ই তার সিক্রেট?'

নন্দিতা বলল—'ওসব বললে শুনছি না, আপনি আজ খেয়ে যাচ্ছেন।'

রমেনের সমস্ত আপত্তি হাওয়ায় উড়িয়ে দিল নন্দিতা। তারপর সে এই সদর দরজা খুলে ছুটে যাচ্ছে সম্ভবত বাজারে, এই আবার প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে, রান্নাঘরে যাচ্ছে একবার, পরক্ষণেই এসে বসছে, গল্পে যোগ দিচ্ছে। এমনি করে রাত নটা নাগাদ সে গা-ফা ধুয়ে একটা জমকালো পোশাকি শাড়ি পরে, কপালে টিপ, পুরো চুল খোলা খেতে ডাকল ওদেব। হাত বাড়িয়ে

বিরিয়ানি দিচ্ছে ওদের প্লেটে, তখনই শুভেন্দু এবং রমেনও লক্ষ করল জিনিসটা। ডান হাতের তলার দিকে আড়াআড়ি একটা চওড়া লালচে দাগ।

—'ওটা কী? কী হয়েছে?' শুভেন্দু শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলো।

হাত উল্টে নন্দিতা দাগটা দেখল, একটু অবাক হয়ে বলল, 'তাই জ্বালা-জ্বালা করছিল। ও কিছু না।'

কিছুতেই সে আর কিচ্ছু বলল না।

'দারুণ খেলাম' রমেন হাত ধুতে ধুতে বলল।

'আবার যাতে আসেন তাই চেষ্টা-চরিত্র করে ভালো খাওয়ালাম।' নন্দিতার জবাব, 'বিরিয়ানি রাঁধলাম, জামদানি পরলাম আপনার অনারে, আর এই নিন?' সে মুঠোভর্তি কাঁটালি-চাঁপা ফুল রমেনের দুহাতে উপুড় করে দিল। ফুলগুলো নিয়ে যাবার জন্যে একটা পলিথিনের প্যাকেটও এনে দিল রাবার ব্যান্ড সুদ্ধু।

রমেন বলল, 'রোলার স্কেট না পরেই তো আপনি হানড্রেড় মাইল স্পীডে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দেখলুম। ওটার দরকার হয়েছিল কেন?'

নন্দিতা চারদিকে কেমন বিহ্বল চোখে চেয়ে মৃদু হাসল, বলল—'কেন জানেন না? শোনেন নি, সেই

"জলের কলে টিপ্ টিপ্
টিপ্ টিপ
আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।
নদী বলেছিল যাবে
সমুদ্রে।
আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।
আমরা যাবো।"

বলতে বলতে মুখটা উলসে উঠল তার।

নিচে গিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে রমেন বলল—'দারুণ কাটল রে সন্ধেটা। চলি। আবাব দেখা হবে। 'তারপর স্টিয়ারিঙে হাত রেখে হেসে বলল—'তোর বউটা একটা পাগলি।'

কী বলতে চাইল রমেন? শুভেন্দু ওপরে উঠতে উঠতে ভাবতে লাগল। তারপর থেকে প্রতিদিনই কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাথার মধ্যে কথাটা তাকে আঘাত করে যায়—'পাগলি, তোর বউটা একটা পাগলি।' কেন এ কথা বলল রমেন? পাগলি কথাটা লোকে আদর করে বলে আপনজনকে। 'দূর পাগলি!' আবার বিরক্ত হলে বলে 'কী পাগলামি করছো?' কিন্তু 'তোর বউটা একটা পাগলি!' কী প্রকৃত মানে এই কথার? শুভেন্দু তার বউ নিয়ে গর্বিত। তিন ঘণ্টার মধ্যে লাফ-ঝাঁপ করে বানিয়ে দিল, বিরিয়ানি, ফিশ তনদুর, ফ্রায়েড চিকেন। নিজেই বাজার গেল, এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে কী মাল মশলা সংগ্রহ করল কে জানে, কিন্তু বানিয়ে তো দিল! অরেঞ্জ-চকলেট রঙের ওই শাড়িটা পরে কপালে লম্বা টিপ, আধ কোঁকড়া চুল খুলে যখন খাবার টেবিলে পরিবেশন করছিল? সম্রাজ্ঞীর মতো। ম্যাজিশিয়ানের মতো যখন হাতের মুঠো থেকে কাঁটালি-চাঁপাগুলো বার করল? কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ঠিক কথা বলার মতো করে বলে উঠে একটা চমৎকার ছোটগল্পের মতো শেষ করল শুভেন্দুর বাড়িতে রমেনের প্রথম আসার দিনটা!

অথচ প্রতিক্রিয়ায় 'তোর বউটা একটা পাগলি!' এ কথা কেন বললি রমেন? কী ভেবে বললি? হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো শুভেন্দুর মনে পড়ে যায় নন্দিতার ডান হাতের সেই চওড়া কালশিটের দাগ, কদিন আগে যা লাল ছিল, মনে পড়ে যায় বৃষ্টির রাতে ছুটে যাওয়া, 'কুকুরটা কী ভয়ানক কাঁদছে গো।' মনে পড়ে যায় মস্তানের উদ্যত ছুরির তলায় লাল শাড়ি পরা স্ফুলিঙ্গর মতো নন্দিতাকে, সানাই ভালো লাগে না যার, সানাই শুনলে যে বিষাদের অতলান্তে তলিয়ে যায় সেই নন্দিতাকে। শুভেন্দু আর দেরি করে না।

অফিসে আজ খুবই দেরি হয়ে গেছে। তবু সে শ্যামবাজারের মোড় থেকে চট করে বাস ধরে না। চলে যায় যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ। ডক্টর রমেন বাগচির চেম্বার।

নিজের নাম পাঠিয়ে দিয়ে ওয়েটিং রুমে বসে শুভেন্দু। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি লাল-চোখ তরুণকে নিয়ে বসে আছেন। ছেলেটি যেন ঘুমঘোরে রয়েছে। ঘোর ভাঙলেই সে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে ফেলবে। আরও দুজন সঙ্গী রয়েছেন ভদ্রলোকের। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাঝে মাঝে এসে চুপি চুপি কথা বলে চলে যাচ্ছেন। শুভেন্দুর পাশেই বসে আরেক জন, শুভেন্দুর থেকে বড় হলেও যুবকই। তাঁর সঙ্গে একটি খুব সুন্দরী বউ। এতো সুন্দর, কিন্তু যেন বিষাদপ্রতিমা। দেখলে মনে হয় নৈরাশ্যের সিন্ধু থেকে উঠে এলো বুঝি। শুভেন্দুর বাঁ পাশে একট অল্পবয়সী ছেলে। চোখে চশমা। ধারালো মুখ। সে শুভেন্দুর সঙ্গে যেচে আলাপ করল।—'কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনি কার জন্যে এসেছেন?'

শুভেন্দু কী বলবে ভেবে পেল না। সে কি সত্যি-সত্যিই নন্দিতার জন্যে এসেছে? নন্দিতা কি .

'এসেছি এক নিকট আত্মীয়ার ব্যাপারে' ধবি-মাছ না ছুঁই পানি করে বলল শুভেন্দু, 'আপনি?'

'আমার নিজেরই জন্যে।' ছেলেটি খুব সুন্দর হেসে বলল, 'অনেকের ধারণা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে খালি মনোরোগীরাই আসে। ধারণাটি ঠিক নয়। অনেক রকম ডিজঅর্ডার আছে জানেন তো? আমার কথাই ধরুন না কেন। দু বার ডাবলু বি সি এস দিয়েছি। র‍্যাংক ভালো আসেনি তাই আবার দিচ্ছি। এবার বুঝলেন ... হয় এসপার নয় ওসপার। তো যা-ই পড়তে যাই মনের মধ্যে ঝমঝম করে কবিতা বাজে, এখান থেকে এক লাইন ওখান থেকে এক লাইন, ধরুন "দাওযায় বসে জটলা করে পূর্বপুরুষেরা" কি তোমায় "আজি রেখে এলেম ঈশ্বরেব হাতে" কি

"অবর্তমান তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে
আমায় গভীর রাত্রে ডাকে।

ও নিরুপম, ও নিরুপম ও নিরুপম ..." বলতে বলতে ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে উঠল। সটান উঠে দাঁড়িয়ে ভাবগম্ভীর গলায় আবৃত্তি করতে শুরু করে দিল, যেন এটা মঞ্চ:

মন্দ ভালো নেইকো কিছুই, আকাশ মাথায়
বাউল-বাউলি দাঁড়িয়ে থাকায়,
নিম ঘোড়ানিম আকাশ ফুঁড়ে কৃষ্ণ-কিরিচ ফাঁসিয়ে রাখায়,
থই থই থই সমুদ্র জল তাথৈ তাথায়,

ওপর নিচে ডাইনে বামে আমার থেকেই আমায় ভাগায় ... আমায় ভাগায় ... আমায় ভাগায় ...

শুভেন্দু আশেপাশে তাকাল। সবাই ভয়ের চোখে ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছে। সুন্দবী মেয়েটির চোখ ভর্তি জল। লালচোখ ছেলেটি লম্বা সীটের ওপর শুয়ে পড়ছে। রমেনের

অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি এসে ডাকল 'কৌস্তভ সেনগুপ্ত!' কবি ছেলেটি তাড়াতাড়ি চেম্বারে ঢুকে গেল। শুভেন্দুর হঠাৎ ভয় করতে লাগল। ভীষণ ভয়। এ সব যেন তাব চেনা। এ লাল চোখ সে দেখছে 'খবর্দার মারতে পারবেন না' বলে যখন ঝলসে উঠেছিল। ওই বিষাদ-প্রতিমা, নয়ন-ভরা জল, দিনে রাতে দেখতে দেখতে এক সময়ে সে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। আর এই রকম মিঠে হাসি, চোখ দুটো হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া, এই বকম .. ঠিক এইরকম ... ঠিক। ভয়ে অধীর হয়ে উঠল সে। উঃ। কখন তাকে ডাকবে রমেন?

অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি একটা ছোট্ট নোট পেপারে লেখা একটা চিঠি এনে দিল।

'শুভ, একটু বোস ভাই। পেশেন্টদের ছেড়ে দিয়েই তোর সঙ্গে বেবোব।'

বমেন, রমেন তুই জানিস না, শুভ তোর সঙ্গে মজা মারতে, ইয়ার্কি দিতে আসেনি। তার বাড়িতে ভীষণ বিপদ। খুব বিপন্ন একজনেব জন্যেই আজ সে তোর কাছে ছুটে এসেছে।

ঠিক এক ঘণ্টা বারো মিনিটের মাথায় শেষ রোগীটি বেরিয়ে গেলে, শুভেন্দুব ডাক পড়ল।

'কী ব্যাপার বল? চা খাবি তো? না কফি, মায়া একটু কফি বানাও ভাই!' অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রমেন বলল।

'আরে দূর তোর কফি' শুভেন্দু বলল, 'আমি ভীষণ সমস্যায় পড়ে এসেছি।'

'তোর আবার কী সমস্যা? ফাস্ট ক্লাস আছিস!' রমেন পাত্তাই দিল না।

শুভেন্দু বলল 'তোকে পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করছি রমেন, নন্দিতা, আমার বউ কি অস্বাভাবিক মানে আবনর্ম্যাল?'

রমেন ঝুঁকে বসে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কী? একথা কেন বলছিস?'

শুভেন্দু বলল—'সেদিন ওর ডান হাতে একটা লাল দাগ দেখেছিলি, মনে আছে? সেটা কী জানিস? স্কেলের বাড়ি। আমাদের নিচের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা মেরেছেন।'

'বলিস কী রে? এফ. আই. আর. কর, এফ আই. আর কব। ডেঞ্জাবাস মহিলা তো!'

'আরে, আগে সবটা তো শোন!'

'বল, আ'য়্যাম অল ইয়ার্স।'

'নিচের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার একটি হাবাগোবা ছেলে আছে। বছর-বছব ক্লাসে ফেল করে। তা করবে না তো কী? ইডিযট তো! পেনসিল পেন খাতা-বই এ সবেবও শ্রাদ্ধ কবে ছেলেটা।'

'করবেই! তার কী সেন্স আছে।'

'সেটাই। তো ভদ্রমহিলা ছেলেটাকে এরকম কিছু ঘটলেই আচ্ছা কবে পেটান। তুই যেদিন গেলি সেদিন সকালে নাকি নন্দিতার ভাষায় অমানুষিক পেটাচ্ছিলেন। ছেলেটাব চিৎকাব শুনতে পেয়ে ও ছুটে যায়, দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রহারে বাধা দেবার চেষ্টা করে, স্কেলের বাড়িটা ছেলের ওপরই নামছিল, নন্দিতার হাতেব ওপর পড়ে।'

'তাই বল।' স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলে রমেন বলল।

শুভেন্দু বলল, 'ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা আমার কাছে গম্ভীব মুখে নালিশ করে গেছেন, আমার স্ত্রী ওদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে বলে। যখন নালিশ জানাচ্ছিলেন, তখন নন্দিতা বাজার গেছিল। ফিরে এসেছে, ওঁরা দেখতে পাননি। নন্দিতা চোখ গরম কবে বলল, 'আপনারা যদি টুটুকে পেটানো বন্ধ না করেন আমি পুলিসে খবর দেবো, হাতে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব, জেনে রাখবেন।' সে কী চেহারা রে, যেন বাঘিনী।

রমেন হাসতে হাসতে বলল—'তো কী। ভালোই করেছে তো। সন্তানের দ্বারা বাবা-মাকে ডিভোর্স করার আইনটা পাশ হয়ে গেলে ভালোই হয়।'

শুভেন্দু বলল, 'আরও শোন', সে পূর্বাপর আজ অবধি যা ঘটে গেছে সবগুলো বলে গেল, তারপরে অভিযোগের স্বরে বলল, 'তুইও তো প্রথম আলাপেই আমার বউটাকে পাগলি বললি। বলিস নি।'

—'বলেছিলুম বুঝি।' রমেন হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল,

'তা তোর কী বলার আছে বল!'

'বলবার আর কী আছে? আমি তোর কাছ থেকে প্রফেশন্যাল ওপিনিযন চাইছি। অ্যাডভাইসও।

রমেন হাতের আঙুলগুলো মন্দিরের মতো চুড়ো করতে করতে বলল, 'দ্যাখ, শুভ, আমাদের শাস্ত্রে বলে সেন্ট পার্সেন্টি নর্ম্যাল লোক খুব কম। আসল হল ব্যালান্স। মানে ভারসাম্য। এই ভারসাম্যটা যদি এদিক ওদিক হেলে একটু কমবেশি হয়ে যায় তো ... মানে বুঝেছিস? এক চুলের তফাত।'

আতঙ্কিত চোখে তার দিকে চেয়ে শুভেন্দু বলল—'তা হলে?'

'ধুর—ঘাবড়াচ্ছিস কেন?' হালকা গলায় হেসে উঠল রমেন, 'ঘাবড়াবার আছেটা কী? মেডিক্যাল সায়েন্স যে এত উন্নতি করল, প্রযুক্তি বিজ্ঞান যে আজ কোন চুড়োয় উঠে গেছে, এ সব কি ঘাবড়াবার জন্যে? ম্যান ইজ অলমোস্ট গড নাউ। সামান্য খুব সামান্য একটু মেডিকেট করলেই নন্দিতা ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোকে বেস্ট ওষুধ দিচ্ছি আমার সাম্পল থেকে।' সে খসখস করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখল, তারপর ড্রয়ার খুলে বেছে বেছে কয়েক পাতা ওষুধ বার করে দিল। দু রকম ওষুধ। খাওয়াবার নিয়মটা বলে দিল। তার পর বলল, 'তিন বছর বিয়ে হয়েছে বললি, না? এবার একটা বাচ্চা বানিয়ে ফ্যাল। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অবাক চোখে চেয়ে নন্দিতা বলল—'ওষুধ? ওষুধ খাবো কেন?'

'আরে খাওই না। আমি তো তোমার স্বামী, না শত্রু? বিষ ফিস দেবো?'

'না, তা নয়। তবে কনট্রাসেপটিভ পিল ফিল আমি আর খাচ্ছি না।'

'সে তো নয়ই। এবার মেটার্নিটি হোম, কাঁথা, ভ্যাকসিনেশন, ওঁয়া ওঁয়া শুরু হয়ে যাবে, আমার দুঃখের দিন এলো বলে।'

নন্দিতা হেসে ফেলে—'বাঃ বাঃ, কী হিংসুক!'

'এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওষুধটা খেয়ে নাও দিকি।'

'কিসের ওষুধ, বলবে তো?'

'নার্ভের, বাবা নার্ভের, নার্ভ শান্ত রাখবে। মন ঠাণ্ডা থাকবে, হবু জননীর আদর্শ মানসিক অবস্থার সূচনা হবে।'

'সত্যি? কই দাও।' অনাবিল বিশ্বাসে নন্দিতা হাত বাড়ায়। সকালে, বিকেলে, রাত্রে। সকালে, বিকেলে রাত্রে। সকালে, বিকেলে, রাত্রে।

তৃতীয় দিন অফিস থেকে ফোন করল রমেনকে।

'কেমন আছে রে, নন্দিতা?'

'পার্ফেক্ট। থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ ভেরি মাচ।'

'নিজেকেই থ্যাংকসটা দে। তোর ডায়গনোসিস, আমার প্রেসক্রিপশন', রমেন বলে, 'ঠিক আছে, চালিযে যা এখন কিছু দিন।'

সন্ধেবেলায় অফিস থেকে ফিরলে দরজা খুলে দেয় পরিষ্কার ফিটফাট নন্দিতা। দুজনে চা আর ডালমুট নিয়ে গল্প করে।

'জানো আজকে নন্দীকে খুব দিয়েছি।'

'তাই?'

'সোজা বললুম — আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে জানেন না, আগে শিখুন, তারপরে বলবেন।'

'ওমা!'

'একেবারে চুপসে গেল, জানো? প্রোমোশনের চিঠি আমার হাতে। কী বলবে আর!'

'ঠিকই।'

'এবার বোসকেও ধরব। যত্ত রদ্দি মার্কা টুর সব আমাকেই করতে হবে। বললেই বলবে ঠেসে টি এ বিল দেবেন কম্প্যানিকে। ভালোই তো!' যেন আমি ফল্‌স্ টি. এ বিলের এক্সপার্ট। আমার ফ্যামিলি লাইফ বলে, প্রাইভেট লাইফ বলে কিছু থাকতে নেই। সব অপমানের শোধ এবার তুলব।'

'দাঁড়াও, প্রেশারের তিনটে হুইশ্‌ল্ হয়ে গেল' নন্দিতা চলে যায়। অনেকক্ষণ আসে না আর।

সান্ধ্য চান সারতে সারতে শুভেন্দুর হঠাৎ মনে হয় নন্দিতা তো কই 'নন্দীকে খুব দেওয়া'র প্রসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠল না! বলল না তো—'আহা, ওরকম রূঢ়ভাবে বললে কেন?' জিজ্ঞেসও তো করল না কিসের প্রোমোশন। কেন প্রমোশন।

কাজের মেয়েটি চলে গেলেই গোটা ফ্ল্যাটটাতে তারা একা। সেই সময়ে নন্দিতা কোন কোন দিন এসে তার কোলের ওপর ঝুপ করে বসে পড়ে, গলা ধরে দোল খায়। বলে—'জানো, তোমার ঘামে একটা কাটা ফলের মতো গন্ধ বেরোয়। প্লীজ আরেকটু পরে চান কোরো।' কাঁধের ওপর মুখ রাখে নন্দিতা। 'দেখো, ভিড় বাসে মেয়েদের সীটের সামনে দাঁড়ালেও, কখনও কোনও মেয়ে তোমার দিকে নাক কুঁচকে তাকাবে না। মেয়েদের আসলে নাকটাই খুব, বোধহয় সবচেয়ে জোরালো। বুঝলে?' তারপর শুভেন্দুর নাকে নিজের নাকটা ঠেকিয়ে বলে—'তাই বলে যেন তুমি আবার বাসের মেয়েদের কাছে এটা পরীক্ষা করতে যেও না। খবর্দার।' চোখ পাকিয়ে তর্জনী তোলে নন্দিতা।

তা সেসব তো কই কিছুই হয় না। স্নাত শুভেন্দু পত্র-পত্রিকা নিয়ে স্পোর্টস চ্যানেল খুলে বসে থাকে। সাহেবরা অক্লান্ত গল্‌ফ খেলে যায়। গল্‌ফ খেলে যায়। সামনে দিয়ে নানান কাজে যাতায়াত করে নন্দিতা। কখনও কুশনের ওয়াড় পাল্টাচ্ছে, কখনও টেবিল মুছছে। টি. ভি.র গায়ে চুম্বক লাগানো ছোট্ট মূর্তিটা ওপরের দিকে ছিল, নিচে সরিয়ে দিল। হেঁকে বলল একবার—'গান শুনবে? চালাব কিছু?' কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটার সময়ে টেবিলে ধোঁয়া ওঠা গরম খাবার। তারপর একটু টি. ভি. দেখা। নিবিড় ঘুম। রাতে কোনও দিন হয়ত 'বলো হরি, হরিবোল' যায়। বাড়ি কেঁপে ওঠে হরিধ্বনির চোটে। শুভেন্দু জেগে যায়। এই বুঝি নন্দিতা ঝপাং করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাঃ। নন্দিতা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কোন দিন মাঝ রাত্তিরে রেল লাইনের ধারে দু দলের বোমবাজির শব্দে রাত যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নন্দিতা কাছে এসে কাতর গলায় বলে না—'ইস্‌স্‌— দেশটা দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছে, কতগুলো টাটকা তাজা ছেলে এভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।' নন্দিতার স্নায়ু খুব শক্ত শান্ত হয়ে গেছে। সে নিবিড় ঘুম ঘুমোচ্ছে।

এমন কি, অফিস যাওয়ার সময়ে খেতে বসে অনেক সময়ে শুভেন্দু টুটুর তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পায়। ডাক্তার বলে দিয়েছে ওর মস্তিষ্ক অপরিণত, ও পারবে না। তবু ওর মা ওকে ঠেঙাচ্ছে। শুভেন্দু উৎকর্ণ হয়ে থাকে। টুটুর জন্যে ততটা নয় যতটা নন্দিতার জন্যে। তার ভাব লক্ষ করে নন্দিতা নিঃশব্দে পাতে আর একটু ভাত তুলে দেয়, বলে, 'খেয়ে নাও। শুনে কী করবে? করতে তো পারবে না কিছু। ওদের ছেলে ওরা বুঝবে।'

কাছেই কারো বাড়ি বিয়ে, সকাল থেকে সানাই বাজছে, ভয়ে ভয়ে অফিস যায়, অফিস থেকে ফেরে শুভেন্দু। চোখের সামনে সেই সুন্দরী মেয়েটির ছবি ভাসছে। বিষাদ-প্রতিমা, নয়ন-ভরা জল। ভয়ে ভয়ে দরজায় বেল দেয়। সর্বনাশ, কেদারা ধরেছে এবার। কেদারা। কেদারা সইতে পারে না নন্দিতা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, বলে 'টুবুল, আমার টুবলু চলে গেল, উঃ, ওকে তোমরা নিয়ে যেও না, নিয়ে যেও না। ফিরিয়ে দাও।' দরজা খুলে যায়। নন্দিতা। শুভেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, 'কী হল তোমার? শবীর খারাপ করছে? ভেতরে এসো। যা গুমোট চলছে!'

শরবৎ এনে দেয়। ভিজে গামছা দিয়ে কপাল, ঘাড়, হাত পা সব মুছিয়ে দ্যায়। ফ্যানটা পুরোদমে চালিয়ে দিয়ে সামনে বসে থাকে। 'কী গো? ঠিক আছো তো? না ডাক্তার বলবো!'

ওদিকে মনপ্রাণ নিঙড়িয়ে কেদারের সুর ওঠে নামে। নন্দিতা যেন বধিব হয়ে গেছে।

রমেন ফোন ধরেছে—'হালো, হালো। শুভ? বউ ঠিক আছে তো?'—'একদম ঠিক ভাই, একদম।'

'তো এইবার একটা ... বুঝলি তো? শুধুই দুজন কবির কূজন আর নয় ...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ঠিক আছে, বুঝেছি, বুঝেছি।'

চাঁদনি রাত। শ্রাবণের চাঁদ। যদি দেখা গেল না তো গেলই না। কিন্তু যদি দেখা গেল তো সে তার রুপোলি মদ দিয়ে তোমাকে মাতাল করে দেবে একেবারে। তখনই বোঝা যাবে এ চাঁদ নীল আর্মস্ট্রং-এর নয়, এ চাঁদ সুকান্ত ভট্টাচার্যেরও নয়। এ সেই আদি অকৃত্রিম কবি-মহাকবিদের রাকা শশী। চাঁদনি। হেনার উগ্র সুবাস সঙ্গে নিয়ে সেই চাঁদনি ঘরের মধ্যে ঢুকছে। একটা ফিকে রঙের ফ্রিল দেওয়া দেওয়া রাতজামা, যেন ওই চাঁদেরই ফেনা। নন্দিতা ঘুমোচ্ছে। মাতোয়ালা শুভেন্দু মৃদু মথিত মন্ত্র স্বরে ডাকছে—'নন্দিতা, নন্দিতা, কই এসো।' নন্দিতা কি জাগবে না? এমন ডাকেও জাগবে না? আবার ডাকে শুভেন্দু, আবার, আবার।

নন্দিতা জাগছে। খুলে গেছে তাব চোখের পাপড়ি।

নন্দিতা আসছে। কিন্তু ও কী?

আসছে আহত জন্তুর মতো। গুঁড়ি মেরে। নিজেকে টেনে টেনে।

শিঙালের রাত-চেরা আকাঙ্ক্ষার ডাকে হরিণীর ঠ্যাঙের তুরুকে নয়। এবং সে আসায় কন্টকিত হয়ে উঠছে না তো কই আশরীর হরিৎঘাসের রোম। নিবে গেল বুঝি পৃথিবীর কোটরের সৃজনী আগুন। বাঁধের মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে দুর্দান্ত নদী। না চাইতেই দু কূল ভরে আর দেবে না। দেবে না আর প্রেমের উপচিতি দিয়ে আত্মপরভোলা সবেদন শুশ্রূষা। তার পুরুষের বুকের তলায় নন্দিতা যান্ত্রিক, উদাস, অসাড় হয়ে থাকে। অবিকল এই পৃথিবীরই মতো।

ষষ্ঠ ঋতু

সমরেশ বসু

মেয়েমানুষটি দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে।

সামনের রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। সরু রাস্তা, দু-পাশে ঘিঞ্জি বাড়ি। রাস্তাব ধারে পানবিড়ির দোকানপাট। দক্ষিণে জেলেপাড়া, উত্তরে মালিপাড়া। মালিপাড়ায় মালি আর নেই। এখন নামটি বেঁচে আছে। ভাল কথায় লোকে বলে খারাপ পাড়া। মফস্বলেব ছোট শহর হলেও বেচা-কেনা হাট-বাজার—বেশ জমজমাট শহর।

মেয়েমানুষটি যে-বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল, ওইখান থেকে মালিপাড়ার শুরু বলা যায়।

পৌষের দুপুর। দেখতে-দেখতে রোদ কাত হয়ে গেছে কখন। পাড়াটার পুবের বাড়ির চালাগুলি পেরিয়ে কোঠাবাড়ির মাথায় ঠেকেছে রোদ।

মেয়েমানুষটির দরজার মাথায় একটি ছোট সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে। লেখা আছে 'শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসী, কীর্তন-গায়িকা। ভিতরে অনুসন্ধান করুন।'

দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণভামিনী নিজেই। মাজা-মাজা রঙ, দোহারা গড়ন। মধ্যঋতু আশ্বিনের নিস্তরঙ্গ ঢলো-ঢালা শরীর। বয়সটা অবশ্য গিয়ে ঠেকেছে তলে-তলে আর-একটু দূরে। দিনের হিসেবে আশ্বিনের দিন কাবার হয়ে অগ্রহায়ণের একটু শীত ধরেছে সেখানে। একটু রাশভারী, দলমলে কৃষ্ণভামিনী। কপালের সামনে পাতা পেড়ে চুল এগিয়ে দিয়েছে। সিঁথিব সিঁদুর সামান্য। ডাগর চোখে এখনও সজাগ চাহনি, খরতা-ও আছে। কালো শাড়ি পরনে, গায়ে জামা নেই।.

মুখে পান টিপে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে দক্ষিণে। চোখে ঠোঁটে রাগ-রাগ ভাব। নাকছাবিটিও নড়েচড়ে উঠছে নাকের পাটায়।

পুব কোলের কোঠাবাড়ির বারান্দা থেকে একটি মেয়ে জিগ্যেস করল, 'দাঁড়িয়ে আছ যে, কেষ্টদিদি!'

কৃষ্ণভামিনী সেদিকে না-তাকিয়ে বলল, 'দেখছি।'

—'কাকে?'

—'মরণকে।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'বুঝিছি। তোমার খোলঞ্চিকে তো? তা সে-মিনসেকে তো দেখলাম, একটু আগে ভেঁপু ফুঁকতে-ফুঁকতে রিকশা চালিয়ে একটা লোক নিয়ে গেল পাড়ার মধ্যে।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই হর্ন বাজিয়ে একটা সাইকেল রিকশা এসে দাঁড়াল কৃষ্ণভামিনীর দরজায়। রিকশায় যাত্রী নেই। রিকশাওয়ালা নেমে একটু অপ্রতিভ মুখে হাসল কৃষ্ণভামিনীর দিকে চেয়ে।

কালো মানুষ। পেটা-পেটা শক্ত চেহারা। বাবরি চুলও কালো। গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখ। এসব মানুষ একটু বয়সচোরা হয়। ধরা যায় না কিছু। কালো মুখে ধুলো লেগে রুক্ষ

দেখাচ্ছে। সদ্য রিকশা চালিয়ে ফুলে উঠেছে হাত পায়ের পেশী। অপ্রতিভ হয়ে হাসলে তাকে বোকাবোকা দেখায়।

ভ্রূ বাঁকিয়ে গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করল কৃষ্ণভামিনী, 'কটা বেজেছে?'

সে বলল, 'এট্টুস দেরি হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণভামিনীর রাগ চড়ল তার কথা শুনে। বলল, 'রিকশা চালিয়ে খাবে, ওই চালিয়ে মববে। ভগবান তোমার হাতে কেন শ্রীখোল দিয়েছিল, বলতে পারো?'

অন্য মেয়েটির কথানুযায়ী বোঝা গেল, লোকটি কৃষ্ণভামিনীর খোলুঞ্চি অর্থাৎ খোলবাজিয়ে। নাম গগন। হেসে বলল, 'ভগবানের বিষয় বলে কথা! কে যে কী হয়, কেউ জানে? পয়সার কাজটা আমাকে করতে হবে তো। না, কী বলো গো?'

বলে পুবের বারান্দার মেয়েটির দিকে তাকাল। কৃষ্ণভামিনীর কৃষ্ণচোখেব তাবা জ্বলে উঠল দপ-দপ করে। চতুর্থ ঋতু অগ্রহায়ণেও বৈশাখের বিদ্যুৎবহ্নি। তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, 'ও আবাব কী বলবে? আমিই বলছি, না-পোষায় ছেড়ে দিলেই পারো। আমাব কি শ্রীখোলবাজিয়েব অভাব হবে, না তোমাকে পয়সা আমি দিতে চাইনি! বাস্তায় দাঁড়িযে সাক্ষী মানছ লোককে, ন্যাকামো করে তবে মরতে আসা কেন এখানে?'

বলতে-বলতে ভিতরে ঢুকে গেল কৃষ্ণভামিনী। দাঁড়িয়েছিল বানীর মতো, ফিবে গেল ক্রুদ্ধা রাজেন্দ্রানীব মতো। দরজাটির পাল্লা নেই। নইলে বন্ধ কবে দিযে যেত।

বিমর্ষ হেসে গগন ফিবে তাকাল পুবের বারান্দাব দিকে। সে-মেয়েটি, গগনকে নয়, কৃষ্ণভামিনীকে ভেংচে চলে গেল।

বাড়ির দবজাটি বড়। সেকেলে বড়লোকের বাড়ি ছিল এটা। বাড়িটা নেই। পার্টিশান আব দরজাব মাথাটা রয়ে গেছে। রিকশাটা ঢুকিযে দিল গগন উঠোনে।

ভিতবে তখন কৃষ্ণভামিনী হাঁক দিয়েছে, 'বাধি, ও রাধা, কোথায গেলি?'

বাধা ছুটে এল ঘরে। ডাগরসাগর রাধা, কটা বঙ। ছোট-ছোট চোখে ডাগর চোখের ঢুলুনি। ঠোঁটদুটি বড় লাল, একটু স্থূল। কৃষ্ণভামিনী বলল, 'নে, হারমোনিয়ামটা টেনে নে।'

রাধা বলল, 'খোলুঞ্চিখুড়ো এল না মাসি?'

কৃষ্ণভামিনী দেযালেব পেরেক থেকে খঞ্জনি-জোড়া পেড়ে ধমকে উঠল, 'তুই বোস্ দিকিনি। শ্রীখোল ছাড়াই হবে। পোষমাসের আর কটা দিন মাত্তর বাকি। নবদ্বীপ থেকে বাবাজিব চিঠি এসে পড়েছে। দোসবা মাঘ বেরুতেই হবে। আমার কাজ আছে।' রাধা চোরাচোখে মাসির মুখ দেখে আর কথা বাড়াল না। ওই মুখের কাছে মুখ বাড়ানো যায় না।

প্রতিবছর মাঘমাসেই কৃষ্ণভামিনী নবদ্বীপে যায়। মাঘ মাস ভোর-ভোর সকাল নবদ্বীপের আখড়ায়-আখড়ায়, মন্দিরে-মন্দিরে কীর্তনের আসর বসে। নবদ্বীপের চেহারা বদলে যায়। স্বয়ং বিষ্ণু অবতরণ করেন। লোকে মাঘে যায় প্রয়াগে, বৃন্দাবনে, মথুরায়। ত্রিবেণীতে কল্পবাস করে। আর নবদ্বীপে আসেন নামকবা মহাজনেরা, মহাশয়-বৈষ্ণবেরা। ত্রৈলোক্য আচার্য, কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য, মোহিনীমোহন মল্লিক এইসব বড়-বড় পণ্ডিত, লেখাপড়া-জানা বৈষ্ণব-গায়কেরা আসেন। পদ বচনা করেন, ভাঙেন-গড়েন, পুঁথি নিয়ে বসেন বড়-বড়। আসর হয়, এক-একদিন এক-এক আখড়ায়। সে-আসরে স্কুল-কলেজের ছাত্র-মাস্টারমশাইরাও ভিড় করেন এসে। ওইসব আসরে কৃষ্ণভামিনীর বড় আদর। মহাশয়েরা স্নেহ করেন মেয়ের মতো। বাবাজিরা তাকিয়ে থাকেন সতৃষ্ণ নয়নে। ভক্ত-অভক্ত জনতার রক্তেও আখরার দোলা লাগে।

পানটি নেশার জিনিস। নবদ্বীপেও ভোরবেলা স্নান করে পানটি মুখে দেয় কৃষ্ণভামিনী। ঠোঁট রক্তরেখায় বেঁকে ওঠে। ধোয়া নীলাম্বরী পরে আঙুল তুলে গায় ঃ

'বঁধু, তোমার দেওয়া গরবে,
তোমার গরব টুটাব হে।'

নবদ্বীপ না-গিয়ে পারে না কৃষ্ণভামিনী। আজকাল শহরে বাজারে আর তাদেব বড়-একটা ডাক পড়ে না। বায়স্কোপ-থিয়েটার, রেডিও-রেকর্ডে অনেক কীর্তন শোনে লোকে। যত-শত মিঠে গলায় বাহারে পদের গান। তা ছাড়া দিন গেছে বদলে। কৃষ্ণভামিনীর দেহ ও বয়সের ধারায় যুগটা পাশ কাটিয়ে গেছে অন্যদিকে। পাড়াতে তাদের ডাকতেও নাকি অসম্মান। সাইনবোর্ডটা ঝোলানো আছে এক-যুগ ধরে। ওইটি দেখে কোনও দিন কেউ ডাকতে আসেনি তাকে। সাইনবোর্ডটির বয়স বেড়ে গিয়ে টিন বেরিয়ে পড়েছে।

তাই নবদ্বীপ যেতে হয়। সেইখানে কিছু বায়না পাওয়া যায়। এখনও দূব জেলা থেকে ডাক আসে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, আরও তলায় মেদিনীপুর, উঁচুতে মানভূম—প্রবাসের বাঙালিরা ডাকেন কখনও সখনও। কীর্তনের খোঁজে সবাই নবদ্বীপেই আসেন এখনও। কৃষ্ণভামিনী কাছে না-থাকলেও বাবাজিরা ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় এখানে। না-গিয়ে উপায় কী।

বছর-দুয়েক আগে, রাধামাধব আখড়ার রাখহরি বাবাজি একদিন গানের শেষে এসে বলেছিল, 'কেষ্ট, আচায্যি মশাই বলেছিলেন, এবার তোমার আখেরটা একটু দেখতে হয।'

ধক্ করে উঠেছিল, কৃষ্ণভামিনীর বুক—'কেন বাবাজি? গান জমেনি?'

বাবাজি বলেছিল, 'রাধেমাধব! এমনটি আর কার জমে গো? আচায্যি বলছিলেন, কেষ্টর বয়স হল। আখেরের কিছু না-করলে শেষ বযসটা ...' একটু থেমেই আবার বলেছিল, 'তোমাব কথা সবাই ভাবেন। তাই বলছিলাম, সব গুটিয়েসুটিয়ে একবারে নবদ্বীপেই চলে এসো। শেষ বয়সটা রাধামাধবের সেবা করে—'

ধকধকানিটা থেমেছিল, বুকের যন্ত্রণাটা কমেনি কৃষ্ণভামিনীর। শেষ বয়স। যে-কথাটি অনেকবার তার রক্তস্রোত বলে গেছে কানে-কানে, আজ সকলে মিলে বলছে সেই কথা। সময় হয়ে এসেছে। বেলা যায়, বেলা যায়। কৃষ্ণভামিনী বুঝেছিল শুধু তার রূপ নয়, আবও কিছু আছে। বিলাপের দুই জায়গায় স্বর ছিঁড়ে গিয়েছিল। বুক ভরে দম নিয়ে, গলাব শির ফুলিয়েও শেষরক্ষে হয়নি।

বাবাজি আরও বলেছিল, 'গলার আর দোষ কী বলো? যেখানে আছ, সেখানে থাকলে অনাচার তো একটু হবেই।'

অনাচার অর্থে নেশা-ভাঙ আর শরীর-পীড়নের ইঙ্গিত করেছিল বাবাজি। একেবাবে মিছে বলেনি। কিন্তু নবদ্বীপে এসে থাকলে কি সে-সবের কিছু কমতি হবে? একে তো সে-আশ্রয় হবে পরের আশ্রয়। কৃষ্ণভামিনীর তাতে বড় ঘৃণা। আর, রাখহরি বাবাজি যখন ভালবাসবে, তখন? অমন ঢুলঢুল চোখ বাবাজির, কেষ্টকে ভাল না-বেসে তার উপায় কী।

সে-ভালবাসার আশ্রয় তো সইবে না তার।

তবে আখেরের ব্যবস্থা করেছিল কৃষ্ণভামিনী। মালিপাড়ার মেয়ে সে, নিজের জীবন তাকে শিখিয়েছে অনেককিছু। রাধাকে পেয়েছিল সে আটবছর বয়স থেকে। আরও বারোবছর খাইয়ে-পরিয়ে বড় করেছে, গান গেয়ে, দেহ পণ্য করে। কীর্তনে দীক্ষাও দিয়েছে অনেকদিন। মালিপাড়ার কারবার ছেড়ে দেয়নি পুরোপুরি। মেয়েটার রং-ঢং আছে। গলাটি একটু খর, তবে মন্দ নয়। কিন্তু বড় মাথামোটা। দিন-রাত্রিই সেজেগুজে আছে। সন্ধ্যা হলেই উঁকিঝুঁকি মারবে এদিক-ওদিকে। মালিপাড়ার মন্ত্র পড়ছে তো কানে দিবানিশি। এখন রক্তের জ্বালা।

প্রথমদিকে শেখাবার অতটা চেষ্টা ছিল না কৃষ্ণভামিনীর। গত দু-বছর থেকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে সে রাধাকে। তালিম দিচ্ছে চুলের মুঠি ধরে। গতবছর নবদ্বীপের জায়গায়-জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল তাকে।

আখেরের ব্যবস্থা করেছে সে। কাউকে বলে দিতে হয়নি। তার গান, গায়িকা কৃষ্ণভামিনী, তারও যে আখের আছে, সে-কথা ভেবে কেন মন পোড়ে।

'বঁধু পীরিতি করিয়া রাখিলে যদি,
অভিসার নিশি কাটে কেন।
না রাখিতে নিশি কাটে না যেন।'

খঞ্জনিতে দু-বার ঝুনঝুন করে কৃষ্ণভামিনী বলল, 'নে, মানের গানটা ধর।'

রাধা উসখুস করছে। এ-বাড়িতে আরও তিনঘর মেয়ে আছে। এ-সময়ে তাদের কাছে বসে বাধা তাদের বাসরলীলার কাহিনী শোনে। বলল, 'কোনটা?'

—'কালকে যেটা হয়েছে।'

ভয়ে বলল, 'আমাব মনে পড়ছে না মাসি।'

কৃষ্ণভামিনী রাগে জ্বলে উঠল। বলল, 'তা তো তোর মনে পড়বে না। চিরকাল বারোভাতারি তোর কপালে আছে, খণ্ডাবে কে!'

তারপর এক-মুহূর্ত চুপ করে থেকে গুন-গুন করে উঠল সে—

'তুমি সুনাগরী রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান।
সখির বচনে কমলনয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান।'

বাধা গান ধরতে-না-ধরতেই গগন এসে ঢুকল। কৃষ্ণভামিনী চেয়েও দেখল না। রাধার ভ্রূ-দুটি নেচে উঠল শুধু।

এ-আসবে সে নিতান্ত বেমানান। ময়লা হাফশার্ট গায়ে, তালিমাবা ফাটা ফুলপ্যান্ট-পরা রিকশাওয়ালাব সঙ্গে কোনও মিল নেই এ-ঘরের। এ-ঘরের সাজানো-গোছানো অল্পসল্প জিনিস, পরিষ্কাব যুগলশয্যা, সবকিছুতেই বিপবীত।

দেয়াল থেকে খোলটি পেড়ে, কপালে ঠেকিয়ে একটু দূরেই বসল সে। কৃষ্ণভামিনীর চোখের পাতা নড়ল না। কিন্তু খঞ্জনির রিনিঠিনি খোলের বোলে একাত্ম হয়ে গেল। রাধারও গলা ছাড়ল।

গগন লোকটি এ-তল্লাটের নয়। বছর দশেক আগে, বর্ধমানের এক গ্রাম থেকে চলে এসেছে কৃষ্ণভামিনীর পিছনে-পিছনে। কৃষ্ণভামিনী গাইতে গিয়েছিল সেখানে।

লোকটির পিছু-নেওয়া নজরে ছিল তার। দেখেই বুঝেছিল অন্তঃসারশূন্য গেঁয়ো বাউণ্ডুলে। ঘর-বউ জোটেনি কপালে। রেস্ত থাকলে একটু আশকারা দিত হয়তো কৃষ্ণভামিনী। মাগনা পিরিতে মন দূরের কথা, শখও ছিল না একটু।

লোকটি কয়েকদিন এ-দিক-সে-দিক করে হঠাৎ এসে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে এট্টুস খোল বাজাব ভাই।'

আজকে যেমন অপরাধীর মতো হেসে দাঁড়াল, সে-দিনও তেমনি করে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন কৃষ্ণভামিনীর দেহে শ্রাবণের খরস্রোত, আশ্বিনের ঢল বয়সের হিসেবে। চোখের পাতার নিঃশব্দ ঝাপটাতেই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, পারেনি। ও-দিকে আবার গগনের একটু চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা ছিল। বলেছিল, 'আমার রং কালা, ট্যাঁকও কালা, একটু বাজাতে চাই খালি।'

বাজিয়েছিল। বাজিয়ে নিয়েছিল কৃষ্ণভামিনী। তেওড়ার ঢঙে দুঠুকি বাজাতে-বাজাতে গোলাপি নেশার মতো ঢুলছিল গগন। আর চোখ দিয়ে যেন চাটছিল কৃষ্ণভামিনীকে। দেখেশুনে ভামিনী রং ফিরিয়ে কালেংড়া সুরে গেয়ে উঠেছিল—

"মতলবে তোর মন ঠাসা,
ঘরের ভাত কাগেব আশা।
নাগর পথ দেখ হে।।"

গগন দমেনি। এক মুহূর্তে তাল চড়িয়ে দিয়েছিল আড়-খেমটার। এমন বাজিয়েছিল, পথ দেখানো যাযনি একেবারে গগনকে।

তারপর বছর চলে গেছে। নানান কাজ করে গগন রিকশা কিনে বসেছে এখানে। সারাদিন দুটি কাজ এখন। রিকশা চালানো, ওইটি পেটের। কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে খোল বাজানো, ওইটি শুধু শখ, না আর কিছু টের পাওয়া যায়নি দশবছর ধরে। এখন কৃষ্ণভামিনীর দরকার হয়ে পড়েছে তাকে। তবে গগনের ওই লালা-ঝরা চোখদুটিকে কোনও আশকাবা দেযনি সে। রিকশাওয়ালার কাছে কীর্তনগায়িকা কৃষ্ণভামিনী বেচতে পাবে না নিজেকে। মাগনা মানিনী নয়, কৃষ্ণভামিনীর মান আছে।

মালিপাড়াব মেয়েরা ফুসলায় গগনকে, 'কী আশায় আছ? না-হয রিকশাই চালাও, আব মেযেমানুষ নেই এ-সোমসারে!'

আছে। কার ঘরে যাতায়াত নেই! তাব বিকশাওয়ালা-বন্ধুবা বলে, 'ওবে শালা, কেষ্টভামিনীর মধু যে চলে যাচ্ছে বছরে-বছরে। যারা খাওযাব তাবা খেযে নিল। তোকে ব্যাটা পাকাচুল বাছতে হবে ভামিনীর।'

গগন বলে, 'তা জানি। চাকে মধু না-থাক, মোম তো থাকবে। ভামিনীব পাকাচুল, সে-ও যে অনেক ভাগ্য।'

—'এই মরেছে, শালা কুত্তা নাকি রে!'

গগন হাসে। মাথা গুঁজে সোযারি বয। তখন বোঝা যায়, তারও বযসে শীতেব বেলা লেগেছে।

কৃষ্ণভামিনী তাব চোখের দিকে তাকিযে বলে, 'মরণ! বিকশাওযালা হলেই অমন নোলা হয!'

কথায কথায় গগন দু-একবার ভামিনীর বাড়িতে থাকবার প্রস্তাব কবেছে। খাওযাটা-থাকাটি যদি এখানেই ব্যবস্থা হত, মন্দ হত না। ভামিনী উগ্রচণ্ডী মূর্তি নিয়ে তেড়ে এসেছে, 'বেরো, বেবো, বেরো!'

রাধার ঠেকে-ঠেকে যাচ্ছে। ভামিনী খঞ্জনির খুন-খুন শব্দ থামিয়ে বলে, 'হল না। মুখপুড়ি, একটু হেসে গা! হারমনিয়া ছাড়, খালি গলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে গা। আগে বল—'

বলে নিজেই বলে, 'সখি, আমার মন নেই, কাকে বলো! আমার চোখ নেই, কাকে দেখাও! আমি বধির, শুনতে পাইনে সই। তবুও ওইখেনে কে দেখা দেয়? কে ও! ..

'সখি, কেন কুঞ্জের ধারে দাঁড়িয়ে কালা,
ফিরে যেতে বল।'

এদিকে গগনের হাত যেন অবশ। খোলে চাঁটি নেই। হাঁ করে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণভামিনীর দিকে। রুখে উঠল কৃষ্ণভামিনী, 'আ মরণ!'

মরবার আগেই ঘিচ-ঘিচ করে খোল কথা বলে উঠল, 'ফিরে যেতে বল।'

রাধা হাসে মিটমিট করে। জোরে হাসতে ভয় পায়। মাসি গলায় পা দেবে যে!

আশ্চর্য! রাধা চোরা-চোখে বিজলী হানে গগনকে। তার কটারঙের শরীরের রেখায় বড় খাঁজ। নেশা করার মতো স্থূল টকটকে ঠোঁটদুটিতে যেন মনে-মনে কী বলে। দেখে-শুনে ঘেন্না করে কৃষ্ণভামিনীর। ছুঁড়ির রুচি বলে কিছু নেই। গগনের রকমসকমও তেমনি। রাধার হাসিতে ঢুলে-ঢুলে খোল বাজায়।

বেলা গেল। পৌষের বেলা, এল কখন, গেল কখন, কে জানে। এর মধ্যেই ঘরের মধ্যে মশার সানাই বাজছে। স্থির হয়ে বসতে দেয় না একদণ্ড। ঘরে-ঘরে ধোয়াপোছা, সাজগোজ চলছে। বাতি জ্বলছে বার-বাসরে।

গান শেখানো শেষ হল। গগন উঠতে যাবে। কৃষ্ণভামিনী বলল, 'বাধি, রিকশাওয়ালাকে জিগ্যেস কর, ওর খোল বাজাবার কত চাই।'

গগন বলল, 'খুব বেগে গেছ বাপু। দশবছর যখন দেওনি, থাক। সবটা একসঙ্গেই দিয়ো না-হয়।'

কৃষ্ণভামিনী বলল, 'বাকি-বকেয়া আমি ভালবাসিনে।' টান মেরে আঁচল নামিয়ে চাবির গোছা খুলতে খুলতে বলল, 'আব, রাস্তার মানুষেব সামনে ছোটলোকেব মুখে ছোট কথাও শুনতে চাইনে।'

কালো মুখে, হলদে চোখে গগনকে বোবা অসহায় জানোয়াবেব মতো মনে হয়। মুহূর্ত নির্বাক থেকে বলল, 'আচ্ছা বাপু, আর-কোনওদিন কিছু বলব না। এবার থেকে সময়মতো আসব।'

বলে না-দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। বিকশা বাব কবতে যাবে। দবজাব পাশ থেকে বাধা বলল, 'চললে, খোলুঞ্চিখুড়ো?'

গগন বলল, 'হাঁ লো! তোর মাসিব যা রাগ!'

বাধা বলল ঠোঁট ফুলিয়ে, 'তা বলে আমি তো আর রাগ কবিনি।'

গগন বলল হেসে, 'কববি কেন। তুই তো আর কেষ্টভামিনী নোস। তা, হ্যাঁরে, রাতে কেউ আসবে নাকি তোর মাসিব গান শুনতে?'

—'আজ? হ্যাঁ, ওপারেব মথুব ভটচায আসবে বাত দশটায়।'

—'থাকবে বুঝি বাত্রে?'

—'কী জানি। তুমি আসবে?'

সে-কথাব কোনও জবাব না-দিযে রিকশা নিয়ে বেবিযে গেল গগন। রাস্তার উপর থেকে কে-একজন শিস্ দিয়ে উঠল বাধার দিকে চেয়ে। রাধা হাসল। মালিপাড়া জমে উঠেছে শীতেব সন্ধ্যায়।

জুড়িয়ে এল রাত দশটাতেই। শীতে আপাদমস্তক ঢেকে কোঁকাতে-কোঁকাতে এল মথুব ভট্টাচার্য। তাব পিছনে-পিছনে গগন।

কৃষ্ণভামিনী সেজেছে। শান্তিপুবের নীলাম্বরী তার বড় প্রিয়। বংটি মাজা-মাজা হলেও মানায়। মুখে স্নো-পাউডার মেখেছে, জামার গলাটি একটু বেশি কাটা। চওড়া ঘাড়ে ও গলায় বয়সের ঢেউ পড়েছে। ঢাকা পড়েছে একটু চওড়া বিছেহার। পান-রাঙানো ঠোঁট, পায়ে আলতা। ভট্টাচার্যকে দেখে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন ভটচাযমশাই।'

মথুর বলল, বুড়োটে গলায়, 'অ্যাঁ? আসব? তা আসব। কিন্তু তোমার সেই মেযেটি, কী নাম তার? রাধা, হ্যাঁ, রাধা! আজ তার মুখে একটু ভাব-সম্মিলনের গান শুনব। তোমাব গান তো অনেক শুনেছি, কেষ্টভামিনী।'

চকিত ছায়ায় এক-মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণভামিনীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। অনেক শোনা হয়েছে, অনেক। গান শুনবে লোক, কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর দিন বুঝি আর নেই। ভাব-সম্মিলনের

মিলন-কোলাকুলির রস উপচে পড়বে না বুঝি আর তার গানে। পর মুহূর্তেই হাসল। পঞ্চম ঋতুতে শীতার্ত শুষ্ক হাসি যেন। ভাল, ভালই তো। সে আসল, রাধা যে তার সুদ। তারই গান শুনুক লোকে। বলল, 'বেশ তো, শুনবেন, বসেন।'

মথুর বসল। ভূতের মতো বেমানান, তালি-মারা প্যান্টটা পরে হাঁ করে বোকা-চোখে গগন তাকিয়ে ছিল ভামিনীর দিকে। চোখে চোখ পড়তে, চমকে খোল নামাল সে।

রাধা তখন অন্য ঘরে। ভামিনী বলল, 'বসুন ডেকে নিয়ে আসি।' রাধাকে নিয়ে তখন অন্য ঘরে টানাটানি। ছাড়িয়ে নিয়ে এল ভামিনী। মথুর বলল, 'এসো এসো।'

পৌষসংক্রান্তি গেল। উত্তরায়ণে বাঁক নিল সূর্য। সোনার মতো রোদে ছায়া বেঁকে গেল একটু দক্ষিণে। দিনের ঘোমটা খুলতে লাগল একটু-একটু করে।

দোসরা মাঘ রাধাকে নিয়ে রওনা হল ভামিনী। গগনও এসে ঢাকা বারান্দায় তুলে দিল রিকশা। শ্রীখোল নিল কাঁধে। সে-ও যায়। না-গিয়ে পারে না। বাজাবার বড় সাধ। দশবছর ধরে নবদ্বীপে সে-ও চেনা হয়ে গেছে। 'কেষ্টভামিনীর খোলবাবাজি' তার নাম হয়েছে। গগন বড় খুশি। আর আজকাল অপরে খোল ধরলে একটু বাধো-বাধো লাগে ভামিনীর। গগনের সেখানে বেশ নাম। তবে, বেশিদিন থাকতে পাবে না। পেট চালাতে হবে তো। দু-চারদিন বাদেই ফিরে এসে রিকশা নামায়।

মালিপাড়ার মেয়ে-পুরুষেরা বলে, 'কেষ্ট খেতে দিলে না বুঝি?'

গগন বলে, 'আমি কেন খাব?'

রওনা হল তারা। পাড়ার মেয়েরা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'মাগীর ঠ্যাকার দেখলে গা জ্বালা করে।' স্টেশনে গিয়ে ভামিনী দুটি টিকিটের টাকা দিল গগনের হাতে। গগন তিনটি টিকিট কেটে নিয়ে এল।

নবদ্বীপে আসর জমে উঠেছে সংক্রান্তির দিন থেকেই। সকলেই অভ্যর্থনা কবল কৃষ্ণভামিনীকে। আখড়ায়, মন্দিরে, চেনাশোনা বাড়িতে। রাধাকে গতবছরই সবাই দেখেছে। গতবছর রাধা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তবে, রাধার কাছ-ঘেঁষাঘেঁষির জন্যে সকলে বড় ঠেলাঠেলি করেছে। গগন-খোলুঞ্চিকেও চেনে সকলে। রাখহরি বাবাজিব আখডাতেই আস্তানা নিল ভামিনী।

মহাজন মশাইয়েরা এসে ঠাঁই নিয়েছেন এক-এক জায়গায়। আসরে দেখা হয় সকলেব সঙ্গে। সকলেই ডেকে কুশল জিগ্যেস করলেন ভামিনীর।

পবদিনই গানের আসরে বসল ভামিনীর। লোকাবণ্য হল সেই আসর। প্রথমদিন। সে কৃষ্ণরাধা ভজল, খোল-করতাল ভজল, মান্যগণ্য মহাজন-গুরুজন ভজল। তারপর ধরল ঃ

'প্রভু না বাঁধিয়ে টানো,
কী যে টানে টানো
আমারে জনম ভরিয়ে টানো।
পীরিতি রশিতে বাঁধিয়া টানো।
টানো হে!
ধূলায় পড়ে, কাঁটায় ফুটে
রক্ত ঝরে, জ্বালায় পুড়ে,
মরিব, তবু টানো হে নাথ।'

অনেকক্ষণ গাইল ভামিনী। কিন্তু তেমন সাড়া-শব্দ পড়ল না। নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগল ভামিনীর। ঠোঁট শুকিয়ে উঠতে লাগল। চোখের কটাক্ষে সেই রং ফুটছে না। সুরের দোলায়-দোলায় হাত উঠছে না তেমন করে।

এক-ফাঁকে বাইরে এল। রাখহরি বলল, 'কী হয়েছে তোমার, কেষ্ট?'

—'কেন?'

—'গলায় যে তোমার বয়সা ধরেছে।'

—'বয়সা?' হেসে উঠল ভামিনী। বলল, 'এ-বয়সে আবার বয়সা কী বাবাজি? সে তো ছেলেমানুষের ধরে।'

রাখহরি বলল, 'এ-বয়সেও ধরে গো! গলায় তোমার দো-আঁশলা জট পাকাচ্ছে কেন?'

দো-আঁশলা জট! আচমকা শীতের কাঁপ ধরে গেল যেন ভামিনীর বুকে। হেসে বলল, 'একটু চা খেয়ে নিতে হবে।'

রাখহরি ভামিনীর আপদামস্তক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে হঠাৎ মিষ্টি হেসে বলল, 'থাক না। এবাব না-হয় থাক। তোমার রাধাকে গাইতে দাও। দেখা যাক, কেমন শিখেছে।' রাখহরির চোখের দিকে তাকিয়ে ভামিনীর রাঙা শুকনো ঠোঁটও বেঁকে উঠল। কিন্তু গাইতে বলল রাধাকেই।

রাধা ভ্রূ তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে গাইল ঃ

'আমাবে, অবলা পেযে বুঝিয়ে সুঝিয়ে
বাঁধিলে পীরিতি ফান্দে!
অতি অভাগিনী কূট নাহি জানি
ফান্দ খোলে কি ছান্দে।'

গলা একটু খরো। কিন্তু কাঁচা গলাব চড়া সুরে, আর কাঁচা বযসের কিশোরী ঠমকে আসর গুনগুন কবে উঠল। কোথায় ছিল আসরের এই হাসি ও আনন্দাশ্রু?

অন্ধকাব চেপে আসছে কৃষ্ণভামিনীর মুখে। তবু হাসছে। শীত, বড় শীত গুর-গুর করে কেঁপে উঠছে বুকেব মধ্যে। কেন? চুলের মুঠি ধবে যাকে শিখিয়েছে, সেই রাধার গুণে বলিহারি যাচ্ছে সব। তার সুদের ঐশ্বর্য।

স্বযং মোহিনী মল্লিক মহাজন আশীর্বাদ করলেন ভামিনীকে, 'বাঃ বেশ। শুধু আখেরের স্বার্থে এমনটি শিখুনো যায় না, মা। তুমি সত্যিকারের আখেরেব কাজ করেছ।'

বড় সুখ, তবু মুচড়ে মুচড়ে ওঠে বুক। কীর্তন-গায়িকা কৃষ্ণভামিনী আর নেই, আখেবের কাজ আছে। এমন মহাজন কেন হল না ভামিনী, যে সুদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

কেবল দুটো দিন গগন চুপচাপ খোল বাজাল। আর অপলক চোখে চেয়ে দেখল ভামিনীকে। যতবাব চোখাচোখি হল, তার হ্যাংলামো দেখে ভামিনী বিরক্ত হয়ে ফিরিয়ে নিল মুখ। মরলে ওকে হাড় ক-খানা চিবোতে দিয়ে যাবে।

দু-দিন পবে গগন বিদায় নিল। বলে গেল আবার আসবে মাঘেই।

ভামিনী মনে-মনে বলল, পাছ ছাড়লে বাঁচি।

তারপর গান চলল আখড়ায়-আখড়ায়। রাধা এবার ভাসিয়ে দিল নবদ্বীপ। যা গায়, সবই মানিয়ে যায়। একদিন কৃষ্ণভামিনীরও যেত। যা করত, যা বলত, যা গাইত, তা-ই ভাল লাগত লোকের। খরস্রোতা কৃষ্ণভামিনীকে দেখছে সে বাধার মধ্যে। সবাই রাধাব পিছনে-পিছনে।

রাত্রে রাধাকে বুকে নিয়ে আদর করল ভামিনী। বলল, 'রাধি, আমার মান রেখেছিস তুই, মান রেখেছিস।'

বলতে-বলতে চোখ ফেটে জল এল। রাধা অবাক হল। একটু বিবক্তও। বলল, 'এ আবার তুমি কী শুরু করলে বাপু। ঘুমোতে দাও।'

ঘুমোতে দিল তাকে। নিজের হাতে ভাল করে কম্বল ঢেকে দিল। হয়, এমনটি হয়। এত জনে-জনে, মহাজনে, সবাই মিলে চোখে-মুখে তাকে বন্দনা করছে—হবে না. একসময় কৃষ্ণভামিনীরও যে হয়েছিল।

আসরে আর ভাল করে ভামিনীকে কেউ সাধেও না। রোজ গাওয়াও হয় না তার। তবু আসরে-আসরে থাকতে হয়, বসতে হয়।

বায়না পাওয়া গেছে কয়েকটি। বায়নার শর্ত রাধা, তবে কৃষ্ণভামিনীকেও চাই। চাই বৈকি! সুদকে একলা ছাড়বে কী করে সে!

মাঘের শেষে এল আবাব গগন। এসে দেখল, ভামিনীর চোখের কোলে কালি। মুখখানি শুকনো। চলতে-ফিরতে পিঠে ব্যথা। যেন এতদিনে সত্যিই বুড়ি হয়ে গেছে সে। পা ছড়িয়ে বসে। তেমন সাজাগোজা নেই। যেন মালিপাড়ার সুকিমাসি।

গগন বলল, 'শরীলটা তোমার খারাপ দেখছি যে।'

মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল ভামিনী, 'শরীলটা ছাড়া বুঝি আব-কিছু দেখতে পাও না ওই মরাখেগো চোখে?'

গগন বলল, 'তা-ও দেখতে পাই।'

—'কী দেখতে পাও?'

—'তোমার দুঃখু।'

—'মবে যাই আর কী। উনি এলেন আমাব দুঃখু দেখতে, হুঁ!'

তারপর হঠাৎ কী হল ভামিনীর। ভীষণ ক্ষেপে উঠল, বলল, 'গতরখেগো মিনসে, আব কবে ছাড়বে পেছন? মলে? তবে আগে মরি, তাবপর ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ো।'

গগন একবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে, তুমি চুপ করো এখন।'

বলে সবে পড়ল।

মাঘ-মাসের শেষ কটা-দিন কাটিযে যাত্রা শুরু হল। গুটি-সাতেক বায়না আছে। কৃষ্ণনগবে, চোতখণ্ডে, রামপুরহাট, ধানবাদ, গোটা দেশটায় প্রায়।

সব জায়গাতেই সবাই ছুটে এল কৃষ্ণভামিনীর নাম শুনে। মুঠি ভবে পযসা আর বাহবা দিয়ে গেল রাধাকে। তবে কৃষ্ণভামিনীকেও বাহবা দিয়েছে সবাই। সে নইলে এমন মেয়ে-শাগরেদ আর কার হয়।

চোতখণ্ড অবধি সঙ্গে রইল গগন। ওখানেই কাছাকাছি তার জন্মভূমি। সে বিদায় চাইলে ভামিনী বলল, 'আগে বলোনি কেন? আমার খোল বাজাবে কে?'

গগন বলল, 'পেটের ব্যবস্থা দেখতে হবে তো আমাকে। ট্যাঁক যে ফাঁক!'

ভামিনী বিরক্ত হয়ে বলল, 'না-হয় খেতেই দেব।'

হলদে চোখ অন্যদিকে তাকিয়ে বলল গগন, 'তা পারব না বাপু আমি। খোল-বাজিযে যোগাড় করে দিয়ে যাচ্ছি।'

সেইদিনই বর্ধমান শহর থেকে জুটিয়ে দিয়ে গেল একজনকে। ভামিনী ঠোঁট উল্টে বলল, 'মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান। আপদ কোথাকার! ও আবার খাবে খোল বাজিয়ে!'

পয়লা বৈশাখ ফিরে এল কৃষ্ণভামিনী আর রাধা। রোজগারে একটু ভাঁটা পড়েছিল কয়েক বছর। এবার সুদসুদ্ধ আদায় করে নিযে এসেছে ভামিনী। কিন্তু বুকের কাঁটার মতো একটা লোক পেছন নিয়েছে বর্ধমান থেকে। যত জায়গায় তারা গেছে, সব জায়গায় গেছে লোকটা। ভাবও হয়েছে খুব রাধার সঙ্গে। রাধার আশকারাতেই এখানেও ছুটে এসেছে।

বুকে বড় ধুকুপুকু ভামিনীর। গগনের মতো হলেও ভাল ছিল, কিন্তু লোকটি অল্পবয়সী পয়সাওয়ালা উগ্রক্ষত্রিয় ঘরের ছেলে। সহজে ছাড়বে না। ভাব জমাবার চেষ্টা করেছে ভামিনীর সঙ্গে। রাধার সঙ্গে পিরিত হয়েছে। একেবারে দুর-দুর করতে পারেনি।

ফিরে এসে রাধা বলল, 'মাসি, লোকটা কিন্তু দু-দিন থাকবে এখানে।'

ভামিনী গম্ভীর গলায় বলল, 'না।'

রাধা ফুঁসে উঠল, 'হ্যাঁ, থাকবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণভামিনী। কিন্তু সে-তেজ নেই তার আর। নিস্তেজ গলায় বলল, 'মুখপুড়ি, বেশি অত্যাচার কবলে গলাটা যে যাবে!'

রাধা হুকুমের সুবে বলল, 'যাক। গলার জন্যে কি কারুব ঘরে লোক আসা বাদ ছিল!'

অন্ধকার মুখে চুপ করে রইল ভামিনী। বুকের মধ্যটা পুড়তে লাগল চাপা আগুনে। চোখের মণিতে সে-আগুন নেই, অঙ্গুলি-সংকেতের সেই নির্দেশ নেই। রাজেন্দ্রানী কৃষ্ণভামিনী নেই।

সারা বাড়ি মজা দেখল। বাধা আব তার লোকটিকে নিযে গুলজাব করল সবাই। মালিপাড়ার বুড়ি-ছুঁড়ি সবাই বলল, 'মাগীর তেজ একটু কমেছে।'

কীসের তেজ! কেন, তেজ তো কোনওদিন ভামিনী দেখায়নি কাউকে। সে যা, তা-ই তো সকলেব কাছে তেজ।

গগন এল যথাপূর্বং। আসতে লাগল বোজ আগের মতোই। রাধার লোকটি বিদায় নিযেছে। সব সময ভামিনীব কথা মানে না বাধা। তবু ঝগড়া কবে, টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে বসে ভামিনী। গান হয। খোল বাজায় গগন।

রাধাকে দেখাতে গিয়ে গলা খুলতেও লজ্জা করে কেন-যেন ভামিনীর।

সপ্তমে বাঁধা রাধাব গলা টং-টং করে বাজে। ভামিনীর গলা বেসুরো ঢ্যাবঢেবে শোনায় সেখানে। অপ্রতিভ হয়ে খ্যাঁকারি দেয, আবার তোলে গলা। বলে, 'নে বল—'

রাধা বলে, 'থাক বাবু, তুমি বরং একটু শুয়ে থাকোগে।'

বলে উঠে যায়। কথা সরে না ভামিনীর মুখে। শুধু বসে থাকে চুপ করে। হঠাৎ একসময়ে খেযাল হয, মুখোমুখি খোল কোলে করে বসে আছে গগন। ভ্রূ কুঁচকে বলে, 'বসে আছ যে?'

গগন বলে অপ্রতিভ হেসে, 'যদি এট্টু গাও, তা হলে বাজিয়ে যাই।'

—'কে, আমি? বস যে প্রাণে ধরে না দেখছি। গাইব এ-বার ঘাটে গিয়ে, পালাও, পালাও।'

আরও একটি বছর গেল এমনি। রাধাব সেই পিরিতের ছেলেটি এসেছে মাসে একবার করে। এ-বছরও ঘুরেছে সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গে মালিপাড়ায়ও এসেছে। এ-বার ফিরে এসে রাধা দু-দিন বাদেই বলল, 'মাসি, আমি চলে যাব।'

ধক্ করে উঠল কৃষ্ণভামিনীর বুকের মধ্যে। চারবছর আগে রাখহরির কথায় এমনি ধক্ করে উঠেছিল। গানের গলা নেই, আজ কথা বলবারও গলা নেই ভামিনীর। হাঁ করে তাকিয়ে রইল রাধার নির্বিকার দৃঢ় মুখের দিকে। খানিকক্ষণ পর বলল, 'কোথায় যাবি?'

—'ওর সঙ্গে।'

ওর, মানে সেই পিরিতের লোকটির সঙ্গে। বুকের মধ্যে কন-কন করছে কৃষ্ণভামিনীর। পঞ্চম ঋতুর দারুণ শীতে নেমেছে হিমপ্রবাহ। গলা গেছে, গান গেছে, ধমকটমক গেছে। সুদ যাচ্ছে আজ, আসল খেয়ে গেছে কবে। মথুর ভটচাযরা কবেই ছেড়ে গেছে। টাকা-পয়সা সোনাদানা ও কিছু রানীর ঐশ্বর্যও নেই। এ-বয়সে আর কীসের বেসাতি করবে। কে আসবে এ-ঘরে?

ভামিনী বলল, ভীত করুণ চোখে তাকিয়ে বলল কীর্তন-গায়িকা কৃষ্ণভামিনী, 'যাবি মানে? তোকে খাইয়ে-পরিয়ে বড় করলাম, শেখালাম-পড়ালাম, আমাকে কোথায় রেখে যাবি?'

রাধা বলল কটকট করে, 'খাইয়েছ-পরিয়েছ বলে, আইন নেই যে, তুমি আমাকে চিরদিন ধরে রাখবে। মন চাইছে যাকে, তার সঙ্গে চলে যাব।'

মন চেয়েছে! এ বুঝি ভালবাসা। থিয়েটার-বায়স্কোপে এমনি পিরিতের আজকাল নাকি বড় ছড়াছড়ি। কিন্তু দু-দিনে যে তেজ ভেঙে যাবে। ঘরের বউ না, কুলটা। তোকেও যে একদিন এমনি করে এক রাধাকে খাওয়াতে-পরাতে হবে।

গম্ভীর গলায় বলল ভামিনী, 'যা।'

এমন আচমকা আর নির্বিকারভাবে বলল ভামিনী যে, রাধাও এক-মুহূর্ত থমকে রইল। কুঁকড়ে উঠল ঠোঁটদুটি।

ভামিনী বাইরের দরজার কাছে গিয়ে দক্ষিণ দিকে দেখল। একটা রিকশাওয়ালা যাচ্ছিল, তাকে বলে দিল, 'তোমাদের গগন-রিকশাওয়ালাকে একটু ডেকে দিয়ো তো।'

ও-দিকে যাবার তাড়া লেগেছে। আর তিন ঘরের মেয়েরা সবাই হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। খবর রটেছে সারা মালিপাড়ায়। সবাই একবার করে দেখতে আসছে রাধা আর তার নাগরকে। রাত দশটায় চলে যাবে ওরা।

ভামিনী বসে ছিল বাতি জ্বালিয়ে। মনটা বড় গান করতে চাইছে, পারছে না ওদের কথার ফিস-ফিস খিল-খিল হাসিতে।

একটু পরেই এল গগন। বলল, 'তুমি নাকি ডেকেছ?'

ভামিনী বলল, 'হ্যাঁ। বলছিলাম, আমার একটা লোক দরকার। রোজগেরে লোক। আমাকে রাখতে পারে এইরকম।'

কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে রইল গগন। বৈশাখ মাস। সারা গায়ে ধুলো-বালি গগনের। কালো মুখে ঘাম। তারপর হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে হাসল গগন। অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'তা আমাকে যদি বলো, এখনও রিকশাটা চালাই, রোজগারও হয়। আমি তোমার কাছে থাকতে পারি।'

ভামিনী বলল, 'তোমার যদি মন চায়। থাকা তো নয়, আমাকে রাখাও বটে।'

গগন বলল, 'তা তো বটেই। তবে আজকের রাত থেকেই থাকি?'

কৃষ্ণভামিনীর চোখে যন্ত্রণা ও ঘৃণা। বলল, 'এসো।'

—'খাওয়াটাও আজ থেকে তা হলে এখানেই হবে?'

—'তা-ই হবে।'

গগন বেরিয়ে গেল। ঘন্টাখানেক পর ফিরে এল। একটু খাটো হলেও কোঁচা দিয়ে আজ ধুতি পরে এসেছে গগন। গায়ে ক্ষারের কাচা জামা, গলায় একখানি সুতির চাদর। পায়ে অবশ্য টায়ার-কাটা স্যান্ডেলটিই আছে।

এই বেশে তাকে রিকশা চালিয়ে আসতে দেখে সবাই হইচই করে উঠল। ভামিনীর বাড়ির মেয়েরাও হেসে কুটিপাটি—'ওমা! এ কী খোলুঞ্চিখুড়ো!'

ও-দিকে যাবার সময় হল। বিদায় নিল রাধা, গগন-ভামিনীর কাছ থেকে। ভামিনী নীরব। গগন বলল, 'সুখে থাকিস, বুঝে চলিস।'

চলে গেল ওরা। তারপর সবাই উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল ভামিনীর ঘরে।

ভামিনী রান্না শেষ করল। চোখ না-তুলে মাটির দিকে চেয়ে আসন পেতে খেতে দিল গগনকে। খাওয়া হলে, গা ধুয়ে ধোয়া-কাপড় পরে গগনের সামনে এসে দাঁড়াল। হাসবার

চেষ্টা করছে না। বুকটা বড় ধড়ফর করছে। ঠাঁট-বাট করতে হবে। কিন্তু রক্তে সে-দোলা নেই। বয়সের ভারে অচল।

তবুও হেসে তাকাল। চোখের চারপাশে কোঁচ পড়েছে। সেই চোখে অসহায় ইঙ্গিত। গগন হেসে মাথা নামাল।

দরজা বন্ধ করল ভামিনী। জানালা বন্ধ করল। বাতিটা কমাল, কিন্তু জ্বলতেই লাগল। সামান্য অস্পষ্টতা। তারপর কাছে এসে হাত ধরল গগনের।

গগন চমকে উঠে বলল, 'কই, হারমনিয়া পাড়লে না?'

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল ভামিনী, 'কেন?'

—'গাইবে না?'

কৃষ্ণভামিনী বলল, 'শোবে না?'

তেমনি অপ্রস্তুতভাবে হাসতে গিয়ে আজ প্রথম গগনের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। বলল, 'কেষ্টভামিনী, ওইটির জন্য তোমার কাছে আসিনি। তুমি যা দেবে, সব নেব। কিন্তু কেষ্টভামিনী—' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ঢোক গিলে বলল, 'তোমার কাছে থেকে বাজাব, তা-ই চাইছি এতকাল ধরে।'

বিস্মিত সংশয়ে ফিরে তাকাল কৃষ্ণভামিনী। পরমুহূর্তে চোখে জল এসে পড়ল তার। রুদ্ধগলায় বলল, 'কেন?'

গগন বলল, 'বাবারে। সব ভুলে গেলাম কেত্তনগায়িকা কেষ্টভামিনীর গান শুনে, সে কি ভুলতে পারি? আজ যদি ডাকলে, এট্টু বাজাতে বলো আমাকে।'

কে বলবে। কে কথা বলবে। হৃদয়ের সব গান আজ আর-এক গানের রসে যে গলা বুজিয়ে দিয়েছে।

হারমোনিয়াম পেড়ে নিল গগন। শ্রীখোলটিতে কপাল ঠেকিয়ে কোলে নিয়ে বসল। বলল, 'গাও।'

হারমোনিয়ামে সুর উঠল। কৃষ্ণভামিনী সুর দিল। সুর উঠল, স্বর উঠল। সেই স্বরে পঞ্চম ঋতু পেরিয়ে ষষ্ঠ ঋতুর বাতাস লাগল।

সারা মালিপাড়াটা প্রেতিনীর মতো ফিসফিস করে হাসতে লাগল, 'কেষ্টভামিনী আবার গাইছে গো।'

জীবন ও জীবিকা

ছবি বসু

রাধা আর সরমা।

তা নাই নাই করে একটানা চারবছর রয়েছে পাশাপাশি ঘবে। আত্মীয়তা নেই, এমনকি একদেশের সীমারেখাও দুজনের নয়, তবু কোথায় যেন অচ্ছেদ্য বন্ধন।

রাধা পূর্ববাঙলার বরিশালের মেয়ে, বালবিধবা, বাবা মা আব ছোট ভাইকে নিয়ে কলকাতা এসেছিল দেশ ভাগাভাগির পর; এধার ওধাব বাঁধভাঙা জলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর মাটি মিলেছে, নেতাজী কলোনীতে ছোট স্কুল গড়ে তুলেছিলেন বাবা, সেখানে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে রাধা। ইতিমধ্যে বাবা মারা গেছেন। ভাইটা বখে গেছে। সবকারী স্বাস্থ্যদপ্তরে চাকরি পেয়ে মা আব ভাইকে নিযে বেলেঘাটার এই ঘর দুখানায সংসার পেতেছে রাধা।

আর সরমা!

ওর দেশ বীরভূম। বাবা ছিলেন ডাক্তার, ছোটবেলা থেকেই ওব নাকি স্বাস্থ্য খারাপ। মানে হার্ট দুর্বল। মা নেই। এক পিসী মানুষ করেছে তাকে। পিসী বলতেন—মেয়েমানুষের আবার হার্ট। দাদা নিজে ডাক্তার তাই মেয়ে নিয়ে যত আদিখ্যেতা, আরে বাবা মেয়েমানুষেব জীবন—জীবন নয়, যন্ত্রণার ভোগ।

আসলে যার জন্য সরমার বিয়ে হল না সেটা অন্য কথা। এক গণৎকার হাত দেখে বললেন—সরমার হাতে টানা বৈধব্য-রেখা, বিয়ের বছর ঘুরবেও না ব্যস।

পিসীমা তারস্বরে চ্যাঁচালেন—হারামজাদা গণৎকার, বেরোও আমার বাড়ি থেকে। তিনদিন উপোস করে শিবের মাথায় জল ঢালতে হল সরমাকে। শেষপর্যন্ত সরমাই ধনুর্ভাঙা পণ করলে বিয়ে কখনই নয়। বেহুলার মত মনের জোব আব তেজ তাব নেই। সরমার বিয়ে-পর্ব তাই ওখানেই ইতি।

বাবা মারা যাবার পর পিসীকে নিয়ে সরমা এল কলকাতায়। লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি, তার ওপর রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত রেডিও-সেট বানাবার একটা দিশী কারখানায় কাজ পেল সরমা।

সেই থেকে পিসীকে নিয়ে রাধার পাশের ঘরে তার সংসার শুরু। আর ওদের দুজনের একজনের মা আর একজনের পিসী ভাবেন পায়ের কাছে খড়কুটোও মিলেছে, এখন ঠাকুব মুখে তুলে চাইলে হয়ত সংসারটা যাহোক করে দাঁড়িয়ে যাবে।

সরমা কারখানার ডিউটিতে বেরুবার পর কলাইয়ের বাটি করে সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি নিয়ে ওর পিসী যান রাধার মার ঘরে, নয়ত রাধার মা এক বাটি শুকতো নিয়ে আসেন সরমাদের ঘরে। দুজনেই দুজনের মেয়ের প্রশংসায় মুখর।

. আপিসে মুখ তোলার এক মিনিট সময় পায় না মেয়েটা, শুধু কাজ আর কাজ। শুনছি ত সামনের মাসেই প্রমোশন, তা হবে না বলুন! ধর্ম ত আছে। মেযেটার খাটুনির মূল্য দেবে

না! রাধার মার কথায় জবাব দেন সরমার পিসী—যা বলেছেন, আমিও বলি মুখের রক্ত তুলে ওভারটাইম খাটার তোর কি দরকার বাপু! দুজন মানুষের সংসার, যাহোক করে চলে যাচ্ছে। তবু দেখুন না টাকার নেশা আর এদের কাটে না; রাধার মা নিঃশ্বাস ছাড়েন—ছেলেটা যদি মানুষ হত তাহলে কি আর ওকে এত খাটতে দিতাম!

—আর ঐ মুখপোড়া গণৎকার। কি যে মাথায় ঢোকালে, নইলে এতদিনে মা আমাব সাত ছেলেব মা হত। কি বল দিদি, হত না?

কথাটা দুই মেয়ের কানেও কোন সময় ওঠে। আর ওরা পরস্পরের মুখেব দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে।

সরমা ক্ষযা-ঘষা ছোট্ট মানুষটি। এখনও বয়সের ভাব মুখে নামেনি। রাধা ওর সলজ্জ মুখের দিকে চেয়ে বলে—হ্যাঁরে সত্যি, সম্বন্ধ করব নাকি? আমাদের সেক্‌শনে অনেক আইবুড়ো ছেলে আছে। ওদের সবার সঙ্গে আমার ভাব, মনে হয় কথা কেউ ফেলতে নাও পারে।

—অত ভাব ত নিজে বিয়ে কবলেই পার। চোদ্দ বছর বয়সে মানুষ আবার বিধবা হয নাকি?

রাধা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। কথাটা সেও যে আগে না ভেবেছে এমন নয কিন্তু একটা পরিণত বয়সে নতুন ঝুঁকি নিতে...

রাধা বলে—জানিস সেদিন আপিসেব সেই পিক্‌নিক পার্টিতে হঠাৎ যেন অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেললাম।

—যেমন?

রাধার পুরুষালি ঠোঁট বাঁকা বিদ্রূপে কঠিন হয়।—অফিসে যাদেব চোখে নেহাতই সাদামাটা বলে মনে হয়েছে তাদেরই এক-এক জোড়া মেয়ে-পুরুষ জলের ধাবে, ঝোপেঝাড়ের আশেপাশে কেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করছে। ঠিক যেন বাযস্কোপ দেখছি মনে হচ্ছিল।

—কি রকম বোকা বোকা লাগে তাই না? সবমা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আসন্ন সন্ধ্যায় অফিস কাবখানা ফেরত দুজনেই বাবান্দায বসে গল্প করে। দু পেয়ালা চা নিয়ে ওদের সারাদিনের যত কথা, যত ঘটনা পরস্পবকে জানান চাই।

দুজনের মা নয়ত পিসী কাপড় ছাড়বার কথা বলে বলে আর পাবেন না। ব্যাগ, ছাতা, মেজেব ওপব এধাব ওধাব ছড়ান। সাবাদিনের পর এ সময়টা ওদেব স্বপ্ন দেখার অবসর। সরমা ফস করে বলে—এ ধরনের রোমাঞ্চ তুমি ঠিক অনুভব করতে পারবে না রাধাদি, ঠিক প্রেমে পড়ার মত ভালবাসা। নিজেব হাতে গড়ছি আস্ত একটা যন্ত্রকে, সেটা মানুষের ঘরে ঘরে কোন্ সুদূবে চলে যাবে যেখানে আমাকে কেউ চেনে না কিন্তু আমার সৃষ্টিতে আনন্দ পাবে। সাত ছেলেকে জন্ম দেবার চেয়ে এর আনন্দ যে মোটেও কম নয় সে কথা পিসীমাকে বোঝাই কি করে। রাধা গম্ভীরভাবে বলে—কারখানার যন্ত্র নিয়ে আর আদিখ্যেতা কোর না। নিত্যি ওখানে গণ্ডগোল লেগেই আছে। মালিকের মাটিতে তোমাদের রুজি রুটি, আর যন্ত্র নিয়ে অত বড়াই করছিস, আমবা মানুষ হযে যন্ত্রের বাড়া খাটছি, নিজের টেবিলের ফাইল ক্লিয়ার কর তারপর ফিল্‌ডে ছোট। জিপে চেপে সারাদিন ধুলো কাদা মেখে মুখ্যু লোকগুলোকে বোঝাও কেন কলেরা বসন্তের ইন্‌জেকশন দেওয়া দরকার। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ব্যথা হয়ে যায়, নিজের দিকে কি আর নজর আছে?

—নিজের আবার কি হল?

সরমাব প্রশ্নে রাধা খিঁচড়ে যায়—ভাইটা পাড়ায মস্তানি করে বেড়াচ্ছে। কিছু বললে মা কাঁদতে বসবে।

—একটু বিশ্রামের দরকার তোমার। সরমা চাপা গলায় বলে।

—সে আর হয়েছে। ছুটির কথা বললে সেক্‌শন-ইনচার্জ বাঁড়ুজ্যে ত হৈ হৈ করে উঠবেন। তাঁর ধারণা রাধাকে ছাড়া অফিস চলবেই না।

—কথাটা মিথ্যে নয়। অফিস না হলেও তাঁর ত চলবেই না।

—ফের ফাজলামি, আমি তোমার চেয়ে বড় নয়?

রাধার কপট রাগে সরমার হাসি বরফের কুচির মত ছড়িয়ে পড়ে।

পরমুহূর্তে গাঢ় গলায় সরমা বলে— ছোটবেলায় সেতার বাজাতে কী ভাল লাগত জান রাধাদি? আমাদেব সেকেলে পরিবার, বাবা যা গোঁড়া জানই ত। কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে ছোটকাকা একজন মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন, নাম মৈনাক সেন।

—ওরে বাবা, নামটা যে উপন্যাসের নায়কের মত। মনের মধ্যে মখমলের কৌটোয় লুকিয়ে রাখা যায়।

রাধা সরমার গলাটায টোকা মারে। সরমার চোখের তারা মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়। তারপব বেদম কাশতে থাকে সে, কাশি থামলে বলে—শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত ভবনের উনি ছাত্র ছিলেন, কিন্তু যা বলছিলাম ঃ তখন বাজাতাম তারের মন্ত্র, এখন গড়ছি যন্ত্র। বাঁ হাতের আঙুলের কড়া মিলিয়ে গিয়ে ডান হাতে লেগেছে।

আঙুল দুটো গভীর আবেগে গালের ওপর চেপে ধরে সরমা।

—জান রাধাদি, কী ভীষণ হুঁশিয়ার হয়ে যে আমাদের কাজ করতে হয় তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। একটু এদিক ওদিক অন্যমনস্ক হয়েছ কি সব কাজটাই ভেস্তে যাবে। এ তোমাদের রিপোর্ট তৈরী নয় কি ফাইলে টিক মাবা নয় দশবার পেন্সিল চিবিযে পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছের লাল চাঁদোয়ায় দৃষ্টিটা তোমরা যতক্ষণ খুশি আট্‌কে রাখতে পার, কিন্তু আমাদের? অন্যমনস্ক হয়েছ কি নিজেকে, সেই সঙ্গে দশজনকে, বিপদে জড়িয়ে ফেল্‌লে।

বাধা বিরক্ত হয়—শুধু নিজের কাজে ডগমগ আর সবাই এমনি বসে মাইনে খায়। আমাদেব একটা কবে যোগে ভুল হলে হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হয় না? ছেড়ে দেবে অফিস এমনি এমনি?

সরমা আহত হয়ে বলে—বেশ, আর বলব না তুমি রাগ করলে, বোঝাতে চাইছিলাম কি তোমাদের অফিস দপ্তরের চেয়ে আমাদের কারখানার পরিশ্রমটা অনেক বেশি।

—তা হবে। রাধা ক্ষুব্ধ গলায় গুম মেরে যায়।

আবার কখনও লঘু গলায় দুজনে দুজনকার মনের কথা বলে—কী বিপদেই যে পড়েছি রাধাদি। আমাদের মিঃ ব্যানার্জী একেবারে নাছোড়বান্দা—

—কি নিয়ে রে? কৌতুকে রাধা চোখ বড় করে।

—এই দেখ না সামনের মাসে দিল্লীতে যে শিল্পপ্রদর্শনী হবে সেখানে আমাদের তৈরী সেটের একটা স্টল থাকবে, আমাকে নাকি সেখানে মিঃ ব্যানর্জীর সঙ্গে থাকতে হবে। এইটুকু বলেই সরমা কাশতে থাকে। কাশির দমকে মনে হয় ওব বুকটা বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে।

পিসীমা বলেন—ওরে সরমা, কাজ কাজ করে যে এবার মারা পড়বি। এবার কদিন ছুটি নিয়ে শরীটাকে একটু সারিয়ে নে।

সেদিন রাধার ভাই বলে—জান সরমাদি, দিদিরাও পুরী বেড়াতে যাচ্ছে।

দেখা হতে সরমা বলে— বেশ চুপি চুপি চেঞ্জে যাবার প্ল্যান করছ। আমাকে বললে কি বাগড়া দিতাম?

রাধার গলায় অপ্রসন্নতা—দূর, অফিসের কজনের ওসব প্ল্যান, তাতে আমার কী? আমার কী আর ছুটি মিলবে? সারা জীবন খেটেই মরলাম, কলকাতার বাইরে দুপা বাড়াবার বরাত আর হল কই?

—একটা সিক-লিভ নিয়ে নাও।

—দূর, সিক-লিভ আর অফিসের ডাক্তার দেবে না। সমুদ্র পাহাড় আর এ জন্মে দেখা হবে না।

—বালাই ষাট, দেখা হবে না কেন? এখন থেকে টাকা জমাও, রিটায়ার করে পুরীতে একটা বাড়ি কোরো রাধাদি। আমার ত এই স্বাস্থ্য। তোমার আশ্রয়েই হয়ত শেষ বয়সে যেতে হবে। রাধার চোখে স্বপ্নের ছোঁয়া লাগে। আত্মগতভাবে বলে—

—বাড়ি করলে পাহাড়েই করব রে সরমা। উঁচু টিলার ওপর কাঠের একটা ছোট্ট কটেজ। পাহাড়ী লতা জড়িয়ে থাকবে, বনমোরগ ডাকতে শুরু করবে ..

সরমা বলে, বাড়ির ডিজাইন কিন্তু আমি করব রাধাদি, বেশ কাচের জানালা দিয়ে বসে দেখব বরফের চুড়ো, ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের স্বপ্ন যে আমার ছোটবয়স থেকে। তারপর কল্পনাব রাশ টেনে বলে—আমাদের কাজ কমলে তোমাদের অফিসটা একবাব দেখে আসব রাধাদি। খোকা বলছিল সাততলার তোমার ঘরে নাকি লিফ্‌টে উঠতে হয়।

—বেশত যাস'খন। আমিও একদিন তোদের কারখানায় যাব, তবে কাজেব যা চাপ, ফুবসত কবে মিলবে জানি না, সরমার গলায় তখন একটু ত্রস্ত ভাব—দেখবে বৈকি। তবে দিল্লীর এই প্রদর্শনীটা হয়ে যাক। এখন ত মরবারও ফুরসত নেই। একটু অবসব পাব তখন। সব ডিপার্টমেন্টই বেশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাকে দেখাব'খন।

এই ভাবে রোজ সন্ধ্যায় রোয়াকে তক্তপোশে গা এলিযে দুটি অবসন্ন মেয়ে অফিস কাবখানার গল্প কবে, কখনও কখনও নিজেদের ছোটখাট অনুরাগ বা আশার কথা উঠলেও শেষ পর্যন্ত ওদের কর্মজীবনটাই যেন সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় সব কিছু লুপ্ত করে দেয়। তার জন্য ওদের ক্ষোভ নেই। মনে হয় জীবন আব জীবিকা ওদের মিলেমিশে গেছে।

সবমা মনে প্রাণে জানে—রাধার অভাবে ওদের অফিস একদিনও চলবে না। সব ফাঁকিবাজ, কাজ কবে না, কেবল রাধার নিয়মানুবর্তিতায সমস্ত অফিস তটস্থ। ওরা শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেয় রাধাদিকে। গর্বে ও সুখে সরমার বুক ভরে যায়।

আর রাধা ভাবে—যত কথাই বলুক না কেন সরমাটা সত্যি পাগলের মত খাটে। শুধু শুধু কি আর একা ওকে ডেকেছে প্রদর্শনীতে? যোগ্যতা আছে বলেই না?

তারপর একদিন রিক্‌সা করে পাড়াব ছেলেরা সরমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। বাস থেকে নামবার সময় সে এক গঙ্গা বমি করেছে। বমি ত নয়, শুধু রক্ত।

রাধাও অফিস থেকে বাড়ি আসছিল। খবর পেযে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে। ওর মাথাটা কোলে তুলে নেয়। ঘনায়মান সন্ধ্যায় ভাঙাচোরা তক্তপোশের ওপর দুই বন্ধু—

ধরা গলায় রাধা বলে—কতদিন বলেছি ছুটি নিতে। এবারে কি হবে? জীবনে উন্নতি করবার একটা চান্স পেয়েছিলি, ভেস্তে গেল ত।

বালিশে মুখ গুঁজে কান্না চাপে সরমা, তারপর ফিসফিস করে বলে— তুমি সেই পাহাড়েব কোথায় বাড়ি করবে বলেছিলে না? এতদিন যদি করতে হয়ত একটা চেঞ্জ হত তাহলে।

ম্লান হাসে রাধা। অন্ধকারে ওর যন্ত্রণাকাতর মুখটা চোখে পড়ে না সরমাব—আমার ওপব যে সাস্‌পেনশন অর্ডার জানিস না? এতকাল তোকে লুকিয়েছি কিন্তু আব পাবি না।

—কেন কী কারণ?

—কেন সেই বারজন কর্মচারীর একজন যে আমি?

সরমা মনে মনে হিসেব করে দেখে ঠিক সাড়ে তিন মাস সাস্‌পেনশন অর্ডার পেয়েছে রাধা, তবে এই ত সেদিন সে বলেছিল সামনেই নাকি তার মস্ত লিফ্‌ট হয়ে যাবে। তবে?

রাধা নিজের কান্নাটা গিলে ফেলে সরমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—কদিন একটু খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর। ভাল ডাক্তার ডাকিয়ে চেকআপ কর। দিল্লীতে হয়ত যেতেও পারিস, ঠাণ্ডায় শরীরটা একটু সারবে।

সরমা চাদরে-ঢাকা ওর কান্না-ভেজা মুখটা এবার বাড়িয়ে দেয়, তারপর স্থির গলায় বলে—দিল্লীর প্রদর্শনীতে আমাকে পাঠাবে কেন ওরা? ওটা যে একদম মিথ্যে কথা রাধাদি। গত সাতদিন ধরে আমাদের লক-আউট চলছে জান না বুঝি? সাতদিন ধরে আমরা গেটের সামনে বসে থাকছি ....

রাধা ভাবে ওরা কেউই মিথ্যে কথা বলেনি পরস্পরকে। এতকাল যে সব গল্পের অবতারণা করেছে সেটা ওদের আশার কথা, ভাল লাগার কথা কেউ কাউকে ঠকিয়ে ত মন্দ করেনি।

দুজনে দুজনেব ঘামে ভেজা জবজবে হাত ধরে চুপচাপ বসে থাকে।

অব্যক্ত

তৃপ্তি মিত্র

—'আপনি এতদিন এখানে এসেছেন, একদিনও সাঁতার কাটতে নামলেন না তো?' বারান্দার এক কোণে একটা বেতের চেয়ারে ম্লান ক্লান্ত চোখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসেছিল যে মেয়েটি কিংবা মহিলা, তাকে চমকে দিয়ে এই স্বাস্থ্যে ভরপুর আর খুশীতে উজ্জ্বল যুবকটি প্রশ্ন করে বসল।

—'ওঃ, আপনি! সাঁতার খুব একটা ভাল জানি না।'

—'খুব একটু কম ভাল জানেন তো!'

—'তা জানি।'

—'তবে ভয়টা কিসের?'

—'ভয় না, সঙ্কোচ।'

—'কিসের?'

—'শাড়ী পরে ঐ একটু ডুবই দেওয়া যায়, তার বেশী—'

—'কসটিউম আনেননি?'

—'হ্যাঁ। না মানে ভাবছিলাম—'

—'পোশাক এনেছেন অথচ—'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল যুবক।

—'ঠাট্টা করছেন নাকি?'

—'নাঃ একেবারেই না। ভাবছি নিজেকে কি বঞ্চিতই করছেন।'

—'একলা এসেছি—মানে তাই খুব—না একটু সঙ্কোচ।'

—'চলুন না এই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর। বীচ একদম ফাঁকা থাকবে।'

—'আমাকে ভাল করে শিখিয়ে দেবেন তো?'

—'শেখাব।'

স্থানটা ধরা যাক পুরীর সমুদ্রপারের কোন হোটেল। আর সময় এই বেলা দশটা কিম্বা এগারটা।

—'আপনি খুব ভাল সাঁতার কাটেন। আপনি যখন ব্রেকার পার হয়ে চলে যান—সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়।'

—'আপনি?'

—'বাঃ রে। আমিও তো সবার মধ্যেই!'

—'আপনার ব্রেকার পার হতে ইচ্ছে করে?'

—'খুব, কিন্তু—'

—'কি, কিন্তু?'

—'আমি যতটুকু সাঁতার জানি—তাতে কোনদিনই তো সম্ভব হবে না!'

—'এই যে বললেন আমার কাছে শিখবেন?'

—'এতটা কি শিখতে পারব যে এত বড় বড় ঢেউ পেরিয়ে—'

—'আমি কেমন সাঁতার কাটি?'

—'বললাম তো এখুনি।'

—'তাহলে হয়তো শেখাতেও পারব ভাল। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

—'আমি কেমন ছাত্রী তা তো জানি না।'

—'দেখা যাক! আপনার নাম?'

—'পার্বতী—পার্বতী সরকার।'

—'আমার—সতীন্দ্র সোম।'

দুপুরের রোদে সমুদ্রপারের বালি এমন তেতেছে পা ফেলা দায়। ওরা দুজনে দাঁড়াল এসে, যেন স্কুল পালিয়ে এসেছে। আকাশের ঠিক মাঝখানে সূর্য তখন। সমুদ্রের ধারে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই।

—'আশা করি, শাড়ীর নীচে সাঁতারের পোশাকটা পরে এসেছেন?'

—'হ্যাঁ।' পার্বতী লজ্জিত হল।

—'আমি সমুদ্রে নামছি। আপনি শাড়ীটারিগুলো পুঁটুলি পাকিযে এই চালাটার কাছে রেখে চলে আসুন। ভয় নেই, কেউ নেবে না।'

জোয়ারের সময়। পূর্ণিমাও খুব কাছে এসে গেছে নিশ্চযই। তাই ঢেউগুলো যখন প্রায একতলা সমান উঁচু হয়ে ছুটে আসছে, পার্বতী অনেক আগে থেকেই চোখ বন্ধ কবে ফেলছে। সতীন্দ্র পার্বতীর ভয় দেখে হাসছে। তারপর হাত ধরে একসঙ্গে ডুব দিচ্ছে। ঢেউ ওদেব ওপর দিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে বালির ওপব।

—'ওঃ, আপনি ডগ সুইমিং ছাড়া কিছুই জানেন না!'

—'তাহলে তখন কি বললাম আপনাকে!' লজ্জিত হয়ে উত্তর দিল পার্বতী।

—'এই দেখুন আমি কেমন করে সাঁতার কাটছি। লক্ষ্য করুন ভাল কবে।'

—'ঢেউ এসে গেছে যে!'

—'ডুব দিন তাহলে।'

জল থেকে মাথা তুলে পার্বতী বললে—'নাঃ আমার দ্বারা হবে না।'

—'সত্যি হবে না, এত ভয পেলে কিছু হয়? নিন্ আমাব হাত ধরে চেষ্টা করুন।'

চলল চেষ্টা। সূর্য হেলেছে পশ্চিম দিকে, আকাশের দিকে তাকিয়ে পার্বতী বলল,—'চলুন এবার। এক্ষুনি তো একে একে টুরিস্টদের ভিড় শুরু হযে যাবে।'

—'যান আপনি উঠুন আগে। ঐ শাড়ী-টারিগুলো জড়িয়ে নিন, আমি আসছি।'

পার্বতী যখন উঠে এল সেই চালাটার কাছে তখনও সমুদ্রতীর প্রায তেমনি নির্জন, সমুদ্র তেমনি উদাসীন। অনেক দূরে দু-একজন নুলিয়াকে দেখা যাচ্ছে। ভাল লাগছে পার্বতীর, খুব ভাল লাগছে। অবগাহন স্নান। মুক্ত স্নান। সত্যি ভাল সাঁতার না জানলে যেন সমুদ্রকে ভালবাসা যায় না। সমুদ্রকেই তো কতদিন ধরে ভালবাসতে চেয়েছে পার্বতী।

—'চলুন!' পেছন থেকে বলে উঠল সতীন্দ্র; অবশ্য দুজনকে যে একসঙ্গেই ফিরতে হবে হোটেলে এমন কোন কথা নেই।

—'বরং না ফেরাই ভাল।' বললে পার্বতী।

—'ভয় করছে কে কি বলবে?'

—'সত্যি! এখানে কেউ আমাকে চেনে না, আমিও কাউকে চিনি না। এ আজ আসছে কাল চলে যাচ্ছে। আমিও তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাব। তবু দেখুন এত ভয়!'

—'বাঙালী মেয়ের বিশেষত্ব। একলা এসেছেন কেন?' একটু কি চটে উঠল সতীন্দ্র?

—'আজ বিকেলে আর সাঁতার কাটতে আসবেন না?' প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল পার্বতী।

—'আপনি হোটেলে ফিরে যান, আমি বিকেলের সাঁতারটা সেরে একেবারে ফিরব।'

ফিরে চলল সতীন্দ্র সমুদ্রে।

ডাইনিং রুমের একেবারে একটা কোণে বোজ একলাই খেতে বসে পার্বতী। আজও এসে বসল। এর আগে ওর সঙ্গে কেউ আলাপ করতে আসেনি। সাতদিন ও এসেছে এখানে, বযস হল ত্রিশ-বত্রিশ। আব ও যে এ্যাট্রাকটিভ নয সে কথা ওর চেয়ে বেশী আর কে জানে? তাই কেউ আলাপ কবতে আসেনি বলে ও আশ্চর্যও হয়নি। আর নিজে তো পাবেই না কারো সঙ্গে আলাপ করতে। ও একা এসেছে, একা ছাড়া ওর উপায় ছিল না। একা আসা ওর দরকাব ছিল। ডাইনিং রুমে এসে কোন দিকে তাকায়ও না কোনদিন। আজ চারদিকে চেয়ে ও সতীন্দ্রকে খুঁজল। না, কোন টেবিলে সতীন্দ্র নেই। তবু ঢোকবার সময বা বেরুবার সময যেটুকু দেখেছে ঐ উল্টোদিকের কোণের টেবিলটাতেই তো দেখেছে। এখনও আসেনি বোধহয়। অনেক লোক খাওয়া শেষ কবে চলে গেল। অনেক নতুন লোক এল। অনেক বিদেশীও আছে এর মধ্যে, তারা ভারতবর্ষের এই বিখ্যাত বীচ দেখতে এসেছে। আব এসেছে কোনাবকের মন্দির ইত্যাদি দেখতে। আবাব কিছু লোক আসে হযতো কেবল মদ খাবাব জাযগা বদলাতে। সামনেব ঐ দুটো লোককে তো পার্বতী যখনই দেখেছে মদের গ্লাস ছাড়া দেখেনি। পার্বতীব খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। কই, সতীন্দ্র এখনও এল না তো! ক্রমে ডাইনিং রুম ফাঁকা হতে লাগল। বাত ন'টা বেজে গেছে, খাওয়া শেষ কবে পার্বতী তবু বসে বইল। শেষ দু'চাবজন যাবা ছিল তাবাও উঠল। মাতাল দুজনও। পার্বতী উঠে পডল।

সতীন্দ্র সারা সন্ধ্যেটা ঘরে বসে রইল, একটু মদ খেল, চিঠি লিখল দেবলীনাকে। লিখেছিল পার্বতীব কথা। কেমন একটা মেয়ে—সতীন্দ্রর চেয়ে হয়তো সামান্য বড়ই হবে বযসে, কেমন বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকত লাউঞ্জে। সমুদ্রের ধারে কেমন অদ্ভুতভাবে শাড়ী জড়িযে জডিয়ে পরে বিষণ্ণ হযে বসে অন্যের সাঁতাব কাটা দেখত। তাকে আজ সতীন্দ্র জোব কবে সমুদ্রে নিযে গিযে কেমন বদলে দিযেছে প্রায়। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল সতীন্দ্র। এমনি আবার চিঠি লিখল। সাঁতাব কাটতে গিযে, বিছানায় শুযে, ডাইনিং কমে খেতে খেতে কখন না মনে পড়ে দেবলীনাকে? আজ দেবলীনার যে চিঠিটা পেয়েছে, খুব মিষ্টি চিঠি। দেবলীনাব ঠোঁটেব মত। মাকেও একটা চিঠি লিখল সতীন্দ্র। মাযের দেবলীনাকে পছন্দ নয। বড্ড বেশী সুন্দবী, বড্ড বেশী কথা বলে আর বড্ড বেশী সিগারেট খায়। মাকে মানবে না। এখন মা যদি প্রি-হিস্টবিক যুগে পড়ে থাকতে চায় আই কান্ট হেল্প—ভাবল সতীন্দ্র। দেবলীনাকে কেন্দ্র কবেই মা আব সতীন্দ্রব বন্ধুত্বে একটা চিড় খেযেছে। মাকে ভালবাসে ও, বাড়িতে থাকলেই সব সময মায়েব বিষণ্ণ মুখ দেখতে হবে। তাই অফিস ছুটি নিযেছে। যদিও ওর পজিশনের অফিসারেব ছুটি নেওয়া মুস্কিল ছিল। মাকে একটা অজুহাত দেখিয়ে এখানে চলে এসেছে সতীন্দ্র। মাকেও লিখতে গেল পার্বতীর কথা, লিখল না। লিখল—

মামণি,

'দেখ দেবলীনা খুব খারাপ বউ হবে না। মামণি, দোহাই তোমার, তুমি খুশী হও।'

তারপর বেয়ারাকে ডেকে ঘরেই খাবার দিতে বলল। আর খেতে খেতে ভাবল পার্বতীকে। এমনি কেমন জড়ভরত লাগে পার্বতীকে। সাঁতারের পোশাকে কিন্তু মোটেই সেরকম লাগছিল না। অমন বিশ্রীভাবে থাকে কেন মেয়েটা?

—'কি, কি ভাবছেন একলা বসে বসে? আরে ব্বাস। গলায় একটা মাফলার জড়িয়েছেন কেন?' আজও প্রায় পার্বতীকে চমকে দিয়েই জিজ্ঞাসা করল সতীন্দ্র। আজও বাবান্দার কোণে সেই বেতের চেয়ারটায় গুটিশুটি হয়ে বসেছিল পার্বতী।

—'একটু সর্দি-সর্দি লাগছে।'

—'প্রথম দিনের পক্ষে খুব বেশীক্ষণ জলে ছিলেন তো, তাই ওরকম মনে হচ্ছে। আজ দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। দুপুরে আসছেন তো?'

—'আসব?'

—'বাঃ, তা নইলে যা শিখেছেন সব তো ভুলে যাবেন।'

—'কাল আপনাকে ডাইনিংরুমে দেখলাম না।'

—'ঘবে বসেই ডিনার সেরে নিলাম। তাছাড়া দুটো দবকারী চিঠি লেখবার ছিল।'

—'বাড়িতে?'

—'হ্যাঁ।'

পার্বতী আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। হোটেল ঝেঁটিয়ে সবাই গেছে বেলাভূমিতে। হয়তো কিছু মাতাল এখনও ঘুমিয়ে সমুদ্র-স্বাদ অনুভব করছে। কে জানে? দূরে বেয়ারারা ব্রেকফাস্টের জন্য টেবিল সাজাচ্ছে। সতীন্দ্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে বইল।

—'আপনি আজ সকালে সাঁতার কাটতে গেলেন না?' অবশেষে বলল পার্বতী।

—'নাঃ, কাল চিঠি লিখতে দেরি হল, তাই খেতে দেরি, ঘুমুতে দেরি, আর আজ উঠতে দেরি। যাকগে দুপুরে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।'

—'ওখানে সকলে আপনাকে মিস করবে। অনেকেই আপনার ব্রেকার পার হওয়া দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে।'

—'কেন? অনেকেই তো পার হয়।'

—'কজন আর? বিশেষ করে আপনার মত বোজ রোজ?'

—'তাহলে আজ বিকেলে দুটো ব্রেকার পাব হব!'

পার্বতী সতীন্দ্রর মুখেব দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপব বললে—'আপনাব পক্ষে মোটেই শক্ত নয়।'

—'কত ভোবে উঠেছেন? সূর্যোদয় দেখেছেন?'

—'না, আজ দেখিনি।'

—'এসেই গোড়াব দিকে খুব দেখে নিযেছেন বুঝি? সকলেই তাই করে অবশ্য। প্রথমে যে উৎসাহটা থাকে—'

—'না, আরও অনেকদিন আগে, অনেকবার অন্য সমুদ্রের মাঝখান থেকে।'

—'অন্য সমুদ্র।'

—'আরব উপসাগর।'

—'কোথায়?'

—'বম্বেতে।'

—'বম্বেতে বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

—'না, ওখানে থাকি, মানে .'

—'আশ্চর্য তো, আপনি বম্বে থেকে বেড়াতে এসেছেন এখানে। অথচ আশে-পাশে যে সমস্ত দ্রষ্টব্য আছে সে-সবও তো একদিন দেখতে গেলেন না।'

পার্বতী হাসল।

—'চিঠিগুলো পোস্ট করবেন না?'

—'ওঃ হ্যাঁ, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছেন তো। যাই বাক্সে ফেলে দিয়ে আসি। ভুলে গেলে ওদিকে আবার ...।' সতীন্দ্র দ্রুত চলে যায়।

মেঘে সূর্যটা ঢাকা পড়েছে। সমুদ্রের জল কালো মেয়ের কালো চোখের মত গহীন কালো আব অর্থবহ হয়ে উঠেছে যেন।

—'মাত্র চারদিনে এতটা উন্নতি হবে ভাবিনি কিন্তু আমি।' বললে সতীন্দ্র।

ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে সতীন্দ্র ভেজা বালির উপর। পার্বতীও ক্লান্ত, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওরও। কিন্তু কেমন দেখাবে? তাই জোর করেই দুই হাত দিয়ে দুটো হাঁটুকে বুকের কাছে চেপে ধরে বসে আছে ও। মুখ তুলে বললে—'সবটাই আপনার কৃতিত্ব।'

—'কাল গোড়াতে এসেই আপনাকে ব্রেকার পার করাব।'

—'পারব?'

—'সব সময় এত ভয় পান কেন বলুন তো? এত ভয পেয়ে পেযে এত বড়টা হলেন কি করে ভাবছি।'

—'বলুন এমন বুড়ীটি হলেন কি করে—'

—'ফেব যদি আপনি নিজেকে বুড়ী বলেন, তবে—'

হাসল পার্বতী।

—'বম্বেতে থাকেন তো জুহুতে গিয়ে সাঁতার শেখেননি কেন?'

—'অসুবিধে ছিল।'

—'ও! মা-বাবা পছন্দ করেন না?'

—'ঐ বকম সব আব কি!'

এবার ঢেউটা এসে প্রায় ওদের গায়ের ওপর ভেঙে পড়ল।

—'আমাদের আব একটু পেছিয়ে বসতে হবে বোধহয। নইলে এব পরের ঢেউটা এসে হিড় হিড কবে টেনে নিযে যাবে সমুদ্দুরে।' বললে পার্বতী।

সতীন্দ্র উঠে বসল। মেঘ আরও কালো হয়ে এসেছে। সমুদ্রও। পার্বতী চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। সতীন্দ্র পার্বতীর দিকে। কিন্তু ভাবছে দেবলীনার কথা। দেবলীনাব চিঠিব কথা। অদ্ভুত মেয়ে এই দেবলীনা। লিখেছে,

'সেদিন মিসেস সোম-এব সঙ্গে একটা পার্টিতে—' আমাব মাকে এখনও দেবলীনা মিসেস সোম বলে কেন? ভাবল সতীন্দ্র। 'মিসেস মল্লিকেব সঙ্গেই কথা বলছিলেন অবশ্য—মেয়েদের সিগারেট খাওয়া নিয়ে ছোটখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। বুঝতেই পাবছ, আসল লক্ষ্য ছিলাম আমি। সনু, আমি তোমাকে বলছি এসব আমার ভাল লাগে না। আমি স্ট্রেট ব্যবহাব ভালবাসি। আর সেইজন্যই আমার মনোভাব আমি তোমাকে খুলে বললাম। ডার্লিং তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পাবব না। সিগারেট ছাড়াও। সনু ডার্লিং, যেদিন আমাকে তুমি তোমার ভালবাসাব কথা প্রথম বলেছিলে মনে পড়ে? সেদিনও সিগারেটেব ধোঁয়ার মাঝখানেই তোমার কথা শুনে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। ...'

সেদিন ছিল টুসকীব জন্মদিনেব পার্টি। টুসকী দেবলীনার ছোট বোন। দেবলীনা কেমন কবে একবার সতীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে উঠে গিয়েছিল ছাতে। আর তখনই জীবনেব একটা পরম প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা হয়েছিল, ওপরে ছিল তারা আর একফালি চাঁদ। দেবলীনাব গায়ে ছিল বিলিতি সেন্টের গন্ধ। বাতাসে দামী সিগারেটের ধোঁয়া। সব মিলিয়ে অদ্ভুত মাদকতাব সৃষ্টি হয়েছিল। সত্যি তো, সেদিন একটুও খারাপ লাগেনি দেবলীনাকে। বরং ..। তবে? মা, মা তোমাকে মেনে নিতে হবে। ভাবল সতীন্দ্র।

পার্বতীর মা কলকাতা থেকে চিঠি দিয়েছেন।—'পারু, তোর ডিভোর্স নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। দীপনারায়ণ একতরফা ডিগ্রী পেয়েছে। আমি বলি, এ ভালই হল। জানি এমনিতে তোর মন খারাপ হবে না। তবু যখন সব ভেঙে যায় মেয়েদের, হাজার হলেও একবার মন খারাপ হবেই হবে। একটু কাঁদবেই কাঁদবে। তুই জেদ করে চলে গেলি বেড়াতে। তাই মাঝে মাঝে একটু ভয় করছে। কাল-পরশুর মধ্যে রওনা হয়ে চলে আয় কলকাতায়। দীপনারায়ণ কি কাজে কলকাতায় আসছে লিখেছে। তোকে কিছু টাকা দিতে চায়। এখন টাকার কিরকম দরকার বুঝিস তো! গোঁয়ার্তুমি করে টাকাটা নিবি না বলিস না যেন। হ্যাঁ, তোর বড় মাসী তোর একটা চাকরি ঠিক করেছে। ওদেরই কিণ্ডারগার্টেন সেক্সনে পড়াতে হবে। ভাল করে খাচ্ছিস তো?'

সতীন্দ্রর মা লিখেছে ... 'সাঁতার তোর নেশা। কিন্তু লক্ষ্মী সনু, বেশী দূরে যাস না জানি। তুই সাবালক। নিজে রোজগার করছিস। দুদিন পরে বিয়ে করবি। তবু আমার কাছে তুই ছোট্ট সনু।' ... ওঃ মাগো, দয়া করে আমাকে আর ছোট্ট করে রেখো না মা ..

—'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।' আবৃত্তির ভঙ্গীতে বলে উঠল সতীন্দ্র।

পার্বতী চমকে জিজ্ঞাসা করল—'কি হল?'

—'উচ্ছ্বাস!' হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল সতীন্দ্র।

খিলখিল করে হেসে উঠে পার্বতী বললে—'অভিনব উচ্ছ্বাস। নির্জন সমুদ্রের ধারে বসে রবীন্দ্রনাথের আর কোন কবিতার লাইন খুঁজে পেলেন না।'

—'স্কুলের কমপিটিশনে ঐ একটা কবিতাই মুখস্থ করেছিলাম যে, তাই সমুদ্রে পাহাড়ে জঙ্গলে ঐটেই সম্বল।'

একটা ঢেউ এসে ওদের উপর ভেঙে পড়ে হিড়হিড় করে ওদের খানিক টেনে নিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে— হেসে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে। সরে এল পারের দিকে।

—'চলুন ফেরা যাক।' বললে সতীন্দ্র।

—'আর একটু বসি না।' বললে পার্বতী।

—'বসবেন? ঢেউগুলো কি রকম উঁচু হয়ে আসছে দেখেছেন? আজ কি পূর্ণিমা?'

—'না, কাল পূর্ণিমা হয়ে গেছে।'

—'আজও তাহলে খুব চাঁদের আলো থাকবে।'

—'আসবেন ডিনারের পর?'

—'আজ চাঁদের আলোতে হোটেলসুদ্ধ লোক উপস্থিত থাকবে কিন্তু এখানে।'

—'থাকুকগে!'

—'পাছে লোকে কিছু বলে—ওটার কি হবে?'

হাসল পার্বতী।

বৃষ্টি শুরু হোল টিপটিপ করে, সমুদ্র হোল ঝাপসা।

—'রাতে চাঁদ উঠবে তো?' বলল সতীন্দ্র।

—'এ মেঘ কেটে যাবে মনে হয়।'

—'যাই, হোটেলে চিঠি লেখার পর্বটা শেষ করে ফেলিগে তাহলে বেলাবেলি।'

—'আপনি কি রোজই চিঠি লেখেন?'

—'রোজই।'

—'কাকে এত লেখেন?'

—'একজনকে কথা দিয়ে এসেছি যে রোজই চিঠি দেব।'

—'ওঃ।'

—'একদিন চিঠি না দিলে হয়তো এমন কাণ্ড করে বসবে।'

—'ওঃ।'

—'ভয় যখন কেটেছে, আসুন না ডিনারটা একসঙ্গে সারা যাক দুজনে।'

—'বেশ তো।'

—'আমি তাহলে এগোই—'

—'আসুন—আমিও উঠব এখনই—।'

—'আমি আপনাকে আপনার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাব খাবার আগে—' যেতে যেতে বলল সতীন্দ্র।

আবার একবাব সমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে হল পার্বতীর। আর একবার অবগাহন করি, ভাবল ও?

একটু সাজল পার্বতী। আইব্রাও পেন্সিলে চোখ আব ভুরু আঁকল। ভুরুটা বড্ড পাতলা সত্যি। লিপস্টিক লাগাল ঠোঁটে। হাল্কা নীলের ওপব লাল সুতোর এমব্রয়ডারী করা শাড়ি পবল। সঙ্গে হাতকাটা একটু গাঢ় নীল ব্লাউজ। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজেকে দেখতে লাগল পার্বতী। আসছে না কেন সতীন্দ্র এখনও?

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সতীন্দ্র খাটেব ওপর। দুই কবতলেব ওপর রাখল মাথা। পবেছে ক্রীম বং-এর প্যান্ট। গায়ে মেরুন রং-এর শার্ট। যদিও সমুদ্রস্নানে একটু কালো হযেছে তবু মেরুন রং-এর পাশে ওর ফর্সা রং উজ্জ্বল হয়েই জানান দিচ্ছে। সেজেগুজে বের হবাব মুখেই কি মনে করে শুয়ে পড়ল। তাকিয়ে রইল খাটের পাশে ছোট্ট টেবিলে রাখা দেবলীনাব ছবিটাব দিকে। আসবাব সময় ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেবলীনাই ছবিটা দিয়ে দিয়েছিল সতীন্দ্রকে। সতীন্দ্র ভাবল, এ কি করছি। এতটা কি ঠিক হচ্ছে? পার্বতী যদি অন্য কোন আশা পোষণ করে থাকে? কিন্তু কেনই বা করবে? আজ পর্যন্ত এমন কোন ব্যবহার আমি করিনি যাতে করে কোনরকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে! এক নং—মিস সরকার ছাড়া অন্য কিছু বলে ডাকিনি। দুই নং—ভুলেও তুমি বলিনি। সেদিন যখন স্ট্রোকটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পাবছিল না তখন তো মনে হয়েছিল একবাব বলি, তোমার দ্বাবা কিছু হবে না। তুমি কেটে পড়।—তখনও মুখে বলেছিলাম, আপনাব মত মাথামোটাব দ্বারা কিস্‌সু হবে না, তুমি বলিনি। তিন নং—দরকার ছাড়া একবারও হাত ধরিনি বা ছুঁইনি। চার নং—এমন কথা বলিনি—চলুন না শহবে দোকানে গিযে কিছু কেনাকাটা কবি। পাঁচ নং—দোকান থেকে কিনে এনে একটা জিনিসও উপহার দিইনি। অথচ এর মধ্যে আমি চার-পাঁচবার দোকানে গেছি, ঘুরে ঘুবে দেখেছি। মায়ের জন্য, দেবলীনাব জন্য, এমন কি বাড়ির বাচ্চা চাকরটার জন্যও বেশ কয়েকটা জিনিস কিনেছি। তবে শো-কেসে এদেশী একটা তাঁতের মালটিকালার শাড়ী দেখে মনে হয়েছিল যে শাড়িটাতে পার্বতীকে মানাবে ভাল। এই মাত্র। তবে? আমার মন পরিষ্কার। অস্ফুটে বলে উঠল সতীন্দ্র। ভালই হযেছে, ফিরে এসেই দেখা হয়েছিল ছেলেবেলার বন্ধু সমর-এর সঙ্গে। এসেছে ভুবনেশ্বরে, অফিসের কি একটা কাজে। সেখান থেকে বেড়াতে এসেছে পুরীতে। অফিসেরই কার সঙ্গে যেন, আছে টুরিস্ট লজে। জোর করে কথা আদায় কবে নিয়েছে সমর, কাল সমরের সঙ্গে যাবে কোনারক দেখতে। সেইমত ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। কই, পার্বতীকে ছেড়ে যেতে হবে বলে একটুও কষ্ট হচ্ছে না তো! তবে?

মায়ের চিঠিটা আবার পড়তে বসল পার্বতী। দীপনারায়ণ আসছে কলকাতায়, দীপনারায়ণ শাঠে। পার্বতীর বাবা গিয়েছিল সপরিবারে বম্বেতে। অফিসেরই কাজ উপলক্ষ্যে। ঐ অফিসেরই এক ক্ষুদে অফিসার ছিল তখন দীপনারায়ণ, আলাপ হল। জুহুবীচে বেড়ানো, দীপনারায়ণ হল পার্বতীর দীপ। দীপ! তারপর বিয়ে। জুহুতেই ছিল ওদের বাড়ি। দীপ আর সমুদ্র, সমুদ্র আর দীপ দুই-ই হয়ে উঠল পার্বতীর নেশা, দীপ চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করল। বাড়তে লাগল ব্যবসা। প্রায় প্রত্যেক রবিবার বম্বে থেকে দীপের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন আসত সমুদ্রস্নানেব জন্য। পার্বতীকে রাঁধতে হোত। কতরকম রান্নাই শিখেছিল পার্বতী। একদিন দীপের বন্ধুবান্ধবই জোর করেছিল ওদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে হবে বলে। সাঁতারের পোশাক পরে গিয়েছিল সমুদ্রে। সেদিন খুব ভাল লেগেছিল ওর। ওরা সবাই সন্ধ্যেবেলা বিদেয় হবার পর দীপ বলেছিল, 'ঐ পোশাক তুমি না পরলেই পার! ঐবকম সরু সরু পায়ে ভাল লাগে না তোমাকে।' লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল পার্বতীর। সত্যি, বসন্ত-র বউ উষা বা বিজয়েব বোন সুমিত্রার মত অত ভাল গড়ন তো পার্বতীর নয়। তাই পার্বতী বালুর ওপর বসে ওদের চান দেখত। আর দেখত সমুদ্র। দীপনারায়ণের বিজনেস বাড়ল। সমুদ্র দেখা কমল। তাই একলাই বসে বসে সমুদ্র দেখত পার্বতী। আর ভালবাসত। ঢেউগুলোকে ভালবাসত। চিঠিটা পড়ে রয়েছে সামনে। একতরফা ডিগ্রী হয়েছে। পার্বতীব নামেই এ্যাডালটারীর কেস এনেছিল দীপনারায়ণ। হায রে! পার্বতী কথা দিয়েছিল কোর্টে উপস্থিত হবে না। হয় নি। আজ পার্বতীর মুক্তি। মা লিখেছে, ও কাঁদবে। না, একটুও কান্না পাচ্ছে না তো! বরং ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে। মুক্তিব স্বাদটা চেখে চেখে দেখতে ইচ্ছে করছে। এখুনি আর একবার সমুদ্রে ঝাঁপিযে পড়তে পাবে সে। কিন্তু সতীন্দ্র আসছে না কেন? আটটা বেজে গেল। অনেক আগেই চাঁদ উঠে গেছে। ঢেউগুলো ভাঙছে আর চাঁদের আলোতে চিক চিক করছে নিশ্চয়ই। সতীন্দ্র সাঁতাব কাটলে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, সেই প্রথম দিন থেকেই। সতীন্দ্র কাকে এত চিঠি লেখে? প্রেমিকা? হবেই বা না কেন? যাকগে। হোটেলের ম্যানেজারকে বলেছে, কাল বা পরশুর মধ্যে কলকাতা ফিরে যাবার টিকিট কবে দিতে। সতীন্দ্র কি ভয পেয়েছে? কি আশ্চর্য! কাল বা পবশু তো চলেই যাচ্ছি আমি। নাঃ, ওব ভযটা ভেঙে দেওযা উচিত। আমার কোন কুমতলব নেই রে বাবা!

উঠে পড়ল পার্বতী।

—'কাম ইন, শুয়ে শুয়েই বলল সতীন্দ্র। আর পার্বতীকে দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়ে বলল—'আরে আপনি!'

—'বেশ লোক তো আপনি!' বললেন আমাকে ডেকে নিযে ডিনাব খেতে যাবেন, আর—'

—'এই তো যাচ্ছিলাম।' নিজের ছেড়ে রাখা আণ্ডারঅয়ার ইত্যাদি তোয়ালে দিয়ে চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সতীন্দ্র।

—'কার ছবি ওটা?'

—'ওই যাকে রোজ চিঠি লিখতে হয়।'

—'খুব সুন্দর দেখতে তো?'

—'তা ঠিক।'

—'আপনি ভাগ্যবান।'

—'তা ঠিক। চলুন।'

খাওয়ার শেষে সিগারেট ধরাতে গিয়ে কি মনে করে সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিল সতীন্দ্র পার্বতীর দিকে।

—'ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাই না।'

—'ওঃ। কিন্তু খান না কেন?'

—'খাইনি কোনদিন। আর মেয়েরা মানে আমাদেব দেশের মেয়েরা সিগাবেট খাচ্ছে আমার কেমন ভাবতে ভাল লাগে না।'

—'এটা তো একটা কুসংস্কাব।'

—'ভাল কুসংস্কাব।'

—'তার মানে যে সব মেয়েবা সিগারেট খায় আপনি তাদেব খাবাপ বলবেন!' রেগে উঠে বলে সতীন্দ্র।

—'হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন? আমি কি তাদেব খাবাপ বলেছি? আপনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন খাই না, তাই আমাব ধাবণাব কথাটা আপনাকে বললাম। বম্বেতে অনেক মেয়েকে আমি সিগাবেট খেতে দেখেছি। তাদেব মধ্যে অনেকেরই গলা কেমন হোর্স হয়ে গেছে।'

—'অনেকেরই, সকলেবই যে ওরকম হবে তাব কোন মানে নেই।'

—'তা অবিশ্যি নেই।'

—'আপনাব বিয়েব পব আপনার স্বামী যদি চান আপনি তাঁব সঙ্গে ড্রিঙ্ক করুন, সিগারেট খান, তাহলে আপনি তা কববেন না?'

—'বড্ড মুস্কিলেই ফেললেন দেখছি, কি উত্তর দিই বলুন তো আপনাকে? মানে—আমি—মানে আব বিয়ে কবব না ঠিক কবেছি।'

—'আর—মানে? বয়স হয়ে গেছে ভাবছেন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে পার্বতী বললে—'আপনাব বৌকে যে আপনি সিগারেট আব মদ ধরাবেন সে বিষয়ে এ্যাটলিস্ট কোন সন্দেহ নেই।' হাসল পার্বতী।—'দেখছেন ডাইনিং-রুম ফাঁকা হয়ে গেছে, সবাই সমুদ্র দেখতে চলে গেছে।'

—'আমাদেরও তো যাবার কথা ছিল।' বলল সতীন্দ্র।

—'তাহলে এবকম বাজে ব্যাপাব নিয়ে ঝগড়া না কবে চলুন তাড়াতাড়ি।'

—'চলুন। আপনি কিন্তু এই ক'দিনেই খুব স্মার্ট হয়ে গেছেন। তা গোড়াব দিকে অমন দুঃখী-দুঃখী ভাব কবে বসে থাকতেন কেন?'

পার্বতী হাসল।

সমুদ্রেব ধারে এল দুজনে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত লোকই দেখছে চাঁদ আব সমুদ্র। কত বয়সেব কত বকম লোক। হাঁটতে হাঁটতে একটু দূবেই চলে এল ওরা।

—'কাল আপনাকে নিয়ে ব্রেকার পাব হবাব কথা ছিল। কিন্তু—' ইতস্ততঃ কবলে সতীন্দ্র।

—'কিন্তু কি?'

—'ফিবে দেখি আমাব অনেকদিনের বন্ধু এসেছে। টুরিস্ট লজে উঠেছে। সে ধরেছে আমাকে নিয়ে কোনাবক যাবেই যাবে। তাই কালকের দিনটা ছুটি চাই। ব্যাপারটা অন্যবকম ভাবে নেবেন না কিন্তু আপনি!'

—'না না, তা কেন নেব। ভালই হল, আমিও বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে। কাল আমিও বোধহয় আসতে পারব না। কলকাতায় ফিরতে হবে। ম্যানেজাবকে বলেছি কালই যেন একটা বার্থ রিজার্ভ কবে দেয়।'

—'তার মানে? আমি ফিবে আসবাব আগেই আপনি চলে যাবেন নাকি?'

—'অগত্যা। অবশ্য যদি টিকিট পাই।'

—'তার মানে, ব্রেকার পার হওয়া আপনি শিখবেন না?'

—'কই আর হল শেখা।'

—'না তা হয় না।'

—'কি হয় না?'

—'কোন জিনিসই অর্ধেক শিখে ফেলে বাখা উচিত নয়।'

—'সমুদ্রের ধারে জীবনে হযতো আর আসাই হবে না।'

—'বম্বে? জুহু?'

—'বম্বেতে আর যাচ্ছি না।'

—'কোথায় যাবেন?'

—'আপাততঃ কলকাতাতেই থাকব।'

—'আর দুদিন বেশী এখানে থাকতে আপত্তি কি?'

—'সত্যি কথা বলি আপনাকে। কেমন একটা জেদ নিয়ে এখানে এসেছিলাম। হয়তো আর মাত্র দুদিনের হোটেলভাড়াই আছে আমার কাছে।'

—'আমার কাছে টাকা আছে, ধার নিন।'

—'শোধ দেব কি করে?'

—'নাই বা দিলেন?'

—'কলকাতায় আমাকে তাড়াতাড়ি যেতেই হবে। আমাকে একজন কিছু টাকা দিতে আসবে।'

—'কে? কত টাকা?' বলেই লজ্জিত হল সতীন্দ্র। বড় বেশী কৌতূহল প্রকাশ হযে গেল যেন।

—'আমার এক্স-হাসব্যাণ্ড। আন্দাজ করছি দশ হাজার দেবে অন্ততঃ।'

আর কথা নেই। চুপচাপ হাঁটছে দুজনে। হঠাৎ পার্বতীর মনে হল, মিথ্যে মামলায় জিতেছে বলে বিবেক-দংশনে দীপ টাকা দিতে চাইছে। আর সতীন্দ্রর কাছে সবটাই বেসুরো হয়ে গেল কি? কিন্তু কেন? সত্যিই তো, আলাপটা কোনদিনই এমন জায়গায় যায়নি তো যে এতখানি ব্যক্তিগত কথা উঠতে পারে? আর তাই তো দেবলীনার ছবি দেখাব পব পার্বতী কোন কৌতূহলই প্রকাশ করেনি। কিন্তু তবু সতীন্দ্রব কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে কেন? হাঁটছে, কিন্তু সব ভাবনার ওপর দিয়ে বার বার একটা কথাই কানে বাজছে—'আমাব এক্স-হাসব্যাণ্ড।'

—'কি হল, কথা বলছেন না যে? ডিভোর্স করা মেয়েদেব কি আপনি খারাপ ভাবেন?'

—'ওঃ, তখন সেই সিগারেট খাওয়া মেয়েদের কথাটা ফিরিয়ে দিলেন বুঝি? নাঃ তা নয়, আমার কেমন মনে হত আপনার বিয়েই হয়নি। বম্বেতে বুঝি তিনি থাকেন। মানে আপনিও থাকতেন?'

—'হ্যাঁ জুহুতে। একেবারে সমুদ্রের ধারে সেই বাড়ি। চলুন হোটেলে ফেরা যাক।'

—'চলুন। তাহলে সত্যি ব্রেকার পার হওয়া হল না আপনাব। এ কিরকম হল জানেন? টেস্টে এ্যালাউ হবার পর পরীক্ষা না দেওয়া আর কি।'

সহজ হতে চাইল সতীন্দ্র।

—'টেস্টে এ্যালউ হয়েছিলাম?'

—'নিশ্চয়ই। কলকাতার ঠিকানাটা কিন্তু আমাকে দিয়ে যাবেন।'

—'কেন? বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করবেন?'

—'যদি বিয়ে করি।'

—'যদি মানে? ছবিটা?'

—'ওঃ হ্যাঁ!'

রাত অনেক হয়েছে। তবু চিঠি লিখতে বসল সতীন্দ্র।

.... 'লীনা, একটা ম্যাগাজিনে পড়লাম সিগারেট খাওয়া মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়। গলা হোর্স হয়ে যায়। আমার বৌ-এর গলা ছেলেদের মত শোনাবে'—এই পর্যন্ত লিখে থামল সতীন্দ্র। তারপর ছিঁড়ে ফেলল চিঠিটা। মিথ্যে কথা কেন লিখতে হয়? আমার চাইতে দেবলীনা অনেক ফ্র্যাঙ্ক। নাঃ দরকার নেই লিখে—একদিন চিঠি না লিখলে আর কি হবে?

ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে গেল সতীন্দ্র সমর-এর সঙ্গে।

লাউঞ্জে তন্ময় হয়ে বসে সমুদ্রের ঢেউ-এর ওঠা-পড়া দেখছিল পার্বতী। এই রকম এক সমুদ্রের ধারেই আলাপ হয়েছিল দীপনারায়ণের সঙ্গে। সে আজ কতদূরে পিছিয়ে গেছে। তবু কিছু ছবি কি স্পষ্ট হয়েই না সামনে আসে। আবার এই সমুদ্রের ধারেই আলাপ হল সতীন্দ্রর সঙ্গে। কিন্তু কত তফাত। 'এ ক'দিনেই কিন্তু আপনি অনেক স্মার্ট হয়ে গেছেন।' সত্যি, এত মুক্ত এর আগে কোনদিন মনে হয়নি নিজেকে। দীপকে ভালবাসতাম খুবই, ভযও করতাম। নিজের শরীর নিজেব অসাবলীলতা নিয়ে হীনমন্যতা যেন কিছুতেই কাটতে চাইত না। সতীন্দ্রর সামনে কখনও ওই হীনমন্যতা ভাবটা আসে না তো। সতীন্দ্র ওকে অনেকটা বদলে দিয়েছে একথা মানতেই হবে। আর এক জীবনসংগ্রামে নামার আগে এই বদলটাও ওর খুব দরকার ছিল।

ম্যানেজাব এসে বললে—'আজ হল না, কালকের টিকিট পাওয়া গেছে। বার্থ রিজার্ভ কবে দিযেছি।'

—'ধন্যবাদ।' বলল পার্বতী। একটু হাসল। মনটা হঠাৎ বলে উঠল, 'টিকিটটা না পাওয়া গেলেই কি চলত না! সতীন্দ্র যদি আজ না আসে? এমনও তো অনেকে করে, ঐ কোনারকেই থেকে যায় বাত্তিরটা, চাঁদের আলোতে মন্দির দেখবে বলে? না, অন্য কিছু না, একটা ধন্যবাদও দেওয়া উচিত তো?' সমুদ্রের দিকে চেয়ে কত কথাই যেন ভাবতে লাগল পার্বতী। নাঃ, যাই, শেষবাবের মত সাঁতাব কেটে আসি একবার।

সমুদ্রের ধারে এসে দেখল একটু দূরে দুটো নুলিয়া বসে বিড়ি খাচ্ছে। কি আশ্চর্য, এ সময তো কেউই থাকে না। একটু বিবক্ত হল পার্বতী। তারপর ওদের অগ্রাহ্য আর অবজ্ঞা করেই ঝাঁপিয়ে পডল সমুদ্রে।

সতীন্দ্র আর সমবেব কোনারক দেখা চলল। এক সময় সমর বলল—'কলকাতা থেকে হঠাৎ পালিয়ে এলি কেন?'

—'ওসব কথা ছাড় তো!'

একটু চুপচাপ আবাব হাঁটল ওবা। সমর আবার শুরু করল—'গত বোববারে পার্থদেব ডায়মণ্ডহারবার রোডের বাড়িটায একটা পিকনিক গোছের ছিল। জানিস তো, আজকাল ড্রিংকস ছাড়া আমাদের মত উচ্চ মধ্যবিত্ত অথবা বলতে পারিস মধ্য উচ্চবিত্তদের পার্টি জমে না। দেবলীনা একটু ড্রিংক করেছিল। তারপর গাছে কে চড়তে পারে না পারে এই নিয়ে কথা হতে হতে দেবলীনা জেদ করে গাছে চড়তে গিয়ে পা মুচকে ফেলেছে। বুঝতেই পারিস, সবাই কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঐ সময় সব দেখে মনে হল—মানে, ইয়ে—পার্থর দেবলীনাকে বড্ড বেশী ভাল লাগে।—আর—'

—'কারা করেছিল এমন মন্দির আর এমন সব মূর্তি?' সতীন্দ্র বলল।

—'এড়িয়ে যাসনে কথা, তোর এই প্রশ্নের উত্তর দু'চারখানা বই পড়লেই পাবি। আমার কথা শোন, অনেক মেয়ে থাকে তারা ঐ জলের মত আব কি। যখন যে পাত্রতে থাকে, সেই রকম রং ধারণ করে। তুই সেখানে নেই, পার্থ একটু চেষ্টা করলেই পার্থব রং ও ধারণ করতে পারে। তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। দেবলীনা ভাল মেয়ে, এখনও সরল। কেবল একটু ব্যক্তিত্ব কম। তবে যাই বলিস, স্ত্রীদের একটু ব্যক্তিত্ব কম থাকলে বিবাহিত জীবন সুখের হয়। মীরাকে সবাই বলে বোকা, কিন্তু মীরা আমার বউ হয়েছে বলে আমি খুব সুখে আছি। কিরে, একলা আমিই যে বকে যাচ্ছি, একটা হাঁ হুঁ দিবি তো!'

—'হ্যাঁ, বিয়ে করাটা দরকার।' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সতীন্দ্র।

এখন দুপুর, ঘড়ির দিকে তাকাল সতীন্দ্র। এই সময় পার্বতীকে নিয়ে ব্রেকার পার হবাব কথা ছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল সতীন্দ্র। একদল বিদেশী টুরিস্টদের দিকে চোখ পড়ল। স্ত্রী-পুরুষের একটি এরটিক মূর্তির দিকে কেমন লোভীর মত তাকিয়ে আছে। অবশ্য কি এদেশী কি বিদেশী সবাই তাই করে আর এটা তো এক্সপেক্টেড। দেয়ালেব একটা জায়গায় দৃষ্টি পড়ল ওর। ছোট্ট করে খোদাই করা—এক চাষা, তার বৌ, মাথায বোঝা নিয়ে ছোট ছেলের হাত ধরে যাচ্ছে যেন।

—'দেখ সমর, এইটে দ্যাখ, কেমন ভাল লাগছে, নারে।' এইবার ওরা এই ধবনেব অনেক ছোট ছোট খোদাই-কবা জিনিস দেখতে শুরু করল। কোথাও একটা লোক হাঁটুতে কনুই রেখে হাতের মুঠির ওপর চিবুক রেখে চিন্তায় মগ্ন। কোথাও শাশুড়ী বৌকে ধবে মাবছে। এরকম আরও কত।

—'কত সমস্ত বই লেখে এই মন্দির নিয়ে। এই ছবিগুলোর কথা কোথাও লেখে না রে!' বলল সতীন্দ্র।

—'হয়তো লেখে। আমরা আব কটা বই পড়ি বল।' সমব বলল।

—'তা ঠিক।' চিন্তায় মগ্ন সতীন্দ্র, পার্বতী কি টিকিট পেয়েছে? কি যেন একটা কথা পার্বতীকে বলতে ইচ্ছে কবছে। আমি পৌঁছবার আগেই কি বেরিয়ে যাবে পার্বতী? এই বে, কলকাতার ঠিকানা নেওয়া হয়নি তো!

—'এই দ্যাখ সতীন, এই দিকটার এই রিলিফের কাজটা দ্যাখ।'

—'চল ফেরা যাক।' হঠাৎই বলে উঠল সতীন্দ্র।

—'কি হল?' অবাক হল সমব।

—'সেই একই রকম সব মূর্তি, একই প্যাটার্ন দেখতে আর ভাল লাগছে না।'

—'হঠাৎ হল কি?'

—'শরীরটা ভাল লাগছে না, চল।'

—'লাঞ্চটা সেরে যাবি তো, না কি?'

খাওয়া-দাওয়া সেরে ওবা গাড়ীতে উঠল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। সমর আর না পেরে বলে উঠল—'আমি বুঝতে পাবিনি সতীন, পার্থর দেবলীনাকে ভাল লাগে শুনে তোর এতটা খারাপ লাগবে। তুই একটা ছেলেমানুষ।'

—'এক্ষুণি আমি দেবলীনাব কথা ভাবছিলাম না।' উত্তব দিল সতীন্দ্র।

—'তবে কি ভাবছিস অমন মুখ গোমরা কবে?'

—'মানুষের মন বড় বিচিত্র!'

—'তুই কি এখন ফিলজফি আওড়াবি নাকি?'

—'ড্রাইভারটাকে বল না, আর একটু স্পীড দিতে।'

—'মনে হচ্ছে তুই গিয়েই কলকাতার টিকিট কাটবি? তুই যে এতটা জেলাস হতে পারিস, তোকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। আমাব ধারণা ছিল তুই আমাদের থেকে অন্য রকম।'

—'বাজে বকিসনি, হোটেলে আমাব একটা দরকারী কাজ আছে।'

গাড়ি চলেছে। কখনো রাস্তাটা উঁচু হয়েছে, কখনও নীচু। কখনো দুপাশে ফাঁকা মাঠ। কখনো জঙ্গল। কখনো বা গ্রাম, আর কখনো দুপাশের বড় বড গাছের ডালগুলো মিলে গিয়ে মাথাব ওপর খিলান সৃষ্টি কবেছে যেন। অন্য সময় সতীন্দ্র এসব লক্ষ্য কবত। এ নিয়ে দুটো কথাও বলত, কিন্তু এখন—দেবলীনা কবে চিঠি লিখেছে? সোমবার। কই, পার্থব বাগানের পিকনিকের কথা তো কিছু লেখেনি। দোষ কি? তুমিও তো পার্বতীর কথা কিছু উল্লেখ করোনি। কিন্তু দেবলীনা সবসময় বলে, সে ফ্র্যাঙ্ক। আমার কোন প্রিটেনশন নেই। যদি, যদি আজকের টিকিট পেয়ে থাকে পার্বতী তবে দেখা হবে না। নাঃ, কিছুতেই কলকাতার ট্রেন ছাড়বার আগে পৌঁছতে পারবে না ওবা। কলকাতার হাজাব হাজাব অট্টালিকা, শ' শ' বাস্তা গলি আর লাখ লাখ মানুষের মধ্যে ঠিকানা না জানলে কি কোন মানুষকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কাগজে ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপন দেব তাহলে। একটা কথা পার্বতীকে দেখা হলে বলতেই হবে—'আপনি যা ভাবেন আপনি তা নন। আমি বলছি আপনি দেখতে খুব সুন্দর।' এটুকু বললে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হবে না। গাড়ি ছুটে চলেছে। অন্ধকার হয়ে গেল। আজও চাঁদ উঠবে। কিন্তু একটু দেরি হবে। পার্বতীকে বলতেই হবে, 'আপনি ডিভোর্স-করা মেয়ে বলেই আপনি বাতিল হয়ে যাননি। আপনার সৌন্দর্য পবিত্র। অনেক সুন্দরী আপনার পাশে দাঁড়ালে ম্লান হযে যাবে।' আচ্ছা, কি সমস্ত আবোল-তাবোল ভাবছি!

—'একটা সিগারেট দে তো সমব।'

সমর সিগাবেট কেসটা এগিযে দেয। পুরী শহরে গাডি ঢুকছে, সতীন্দ্রেব খেয়াল হল যেন এতক্ষণে।

—'সমর, তোকে তো ভুবনেশ্বব যেতে হবে, তাই না?'

—'ধ্যান ভেঙেছে? হ্যাঁ, তোকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ফিবব।'

—'না, আমাকে তুই এই বাজারের মুখটায নামিয়ে দে।'

গাডি থামল। সমব বলল—'সতীন, তুই এত সেন্টিমেন্টাল ভাবিনি কখনও। তাহলে পার্থব বাগানেব কথা তুলতামই না। এই সমাজে এতটুকুর জন্য কেউ এত আঘাত পায় তোকে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে বিযেটা সেরে ফেল, অনেস্টলি বলছি।'

সতীন্দ্র হাসল। সমরের গাড়ি চলে গেল। সতীন্দ্র দ্রুত এগিযে চলল সেই শাড়ির দোকানটির দিকে। সেই মালটি-কালাব শাডিটা কিনল সতীন্দ্র। তাবপর একটা সাইকেল-রিক্সা ভাড়া করে চলল হোটেলে।

লাউঞ্জে ভীড়। থমথম করছে যেন আবহাওয়াটা।

—'কি হয়েছে?' একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল সতীন্দ্র।

'একশ দশ নম্বরের মেমসাহেব দুপুরে সমুদ্রে স্নান কবতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল। নুলিয়ারা অনেক চেষ্টা কবে এক-দেড় ঘণ্টা আগে দেহটা তুলে এনেছে।'

আরও জানল সতীন্দ্র, ব্রেকার পার হতে গিয়েছিল পার্বতী। দুটো নুলিয়া দেখেছে। খানিকক্ষণ না দেখতে পেয়েই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমুদ্রে। মিস সরকারের মাসীব বাড়িতে ট্রাঙ্ককল করা হয়েছে। কাল সকালেই ওঁব মা ইত্যাদি এসে যাবেন। পুলিশ এসেছে, মর্গে নিয়ে যাবে দেহ।

একটু আগে পর্যন্ত পার্বতীর ভীতু-ভীতু ভাব কাটিয়ে দিয়েছে বলে সতীন্দ্র গর্ববোধ করেছিল মনে মনে, ভেবেছিল সম্পর্ক সহজ হলে বলবে—'ভাগ্যিস আমাদের আলাপ হল, তোমার তাই না খোলসটা ঘুচে গেল। তুমি যে কত সহজ আর স্মার্ট হতে পার তা বোধহয় তুমিও জানতে না, আমিও জানতাম না।'

আর এখন সতীন্দ্রর সারা মনটা হাহাকার করে বলতে লাগল—ভুল হয়ে গেছে, পার্বতী, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আমার কি দরকার বা অধিকার ছিল তোমাকে এইভাবে হনন করবাব। আমি দায়ী, তোমার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী পার্বতী। মনে পড়ল,—'সব সময় এত ভয় পান কেন বলুন তো? এত ভয় পেয়ে পেয়ে এত বড়টা হলেন কি করে?' তুমি ঐ ঢেউ দেখে একটু ভয় পেলে না কেন পার্বতী? তোমার সেই ভীতু-ভীতু নিড়বিড়ে ভাবটা ভাল লেগেছিল বলেই তো তোমাকে ভালবেসেছিলাম পার্বতী। হ্যাঁ, এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তখন তোমাকে ভালবেসেছিলাম। আসলে এই কথাটাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। এই কথাটাই বলবার দরকার ছিল। খুব দরকার ছিল।

পুলিশের গাড়ি পার্বতীকে নিয়ে চলে গেল। শাড়িটা কোলে নিয়ে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে রইল সতীন্দ্র। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষেব তৃতীয়াব চাঁদ আর উদাসীন সমুদ্র গর্জন করে চলেছে সমানে। ঢেউগুলো বালির ওপর আছড়ে পড়ছে—আবার পড়ছে—আবার আবার।

আতশী

শাহেদ আলী

কথা আছে, আজলেব লিখা নাকি পালটানো যায় না। কথাটাব সত্যতা আবাব নূতন করে প্রমাণিত হল মালেকাব বেলায়। দ্বিতীয়বারেব স্বামীও তাকে একদিন ঘব থেকে বেব কবে দিল তালাক দিয়ে। আবার সে ভেসে পডে বিপুল সংসাবেব বিপুলতব অনিশ্চযতাব মধ্যে।

এজন্য অবশ্য বিশেষ কোন ভাবনা নেই মালেকাব। যার কিছুই নেই, সমস্ত সংসাবটাই যে তার, মালেকা এ কথা বিশ্বাস করে বলে অনেকেব ধাবণা। নেহায়েৎ কচি বযেস মালেকা তার বাপ-মাকে হাবায়। এক ভাই ছিল বেঁচে, সেও বছব চাবেক হল, দুনিযাব দেনা পাওনা সব চুকিয়ে দিযে জান্নাতবাসী হয়েছে। যে কযেক কেযার জমিজমা ছিল তাও ঋণের বদলে গাঁয়ের মুসলমান মহাজন গিলে ফেলেছে। সুতবাং মালেকার আব কিছুই নেই এ সংসারে। নাবীর অনিশ্চিত জীবনে মাথা গুঁজবাব একটু ঠাঁই থেকেও বঞ্চিত হযেছে অনেক দিন।

চৌদ্দ বছর বযেস—যৌবনেব পানি দেহেব কিনাবায ফুলে ফেঁপে উঠতে চাইছে—ঠিক এমনি সময়ে প্রথম শাদি হল মালেকাব। বড ভাই লতিফ এক কেতাব-পডা মুন্সীকে ডেকে এনে 'দানে' শাদি দিল মালেকাব, হাতে তাগা বেঁধে মুন্সীব সঙ্গে মালেকাব জীবনধারাকে যুক্ত কবে দেযা হল এক শুভ মুহূর্তে।

কালো নয়, ফরসাও নয় মালেকা—মাঝামাঝি রকমেব রঙ তার গায। স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল দেহ, স্থিব-ধীব রাশভাবি মেয়ে, কথা বলে একেবারেই কম। বহস্যেব স্বাপ্নিকতায প্রথম প্রথম কিছুদিন ভালই কাটে মুন্সীর—কিন্তু ধীবে ধীরে সহজ সমতলে বিবোধেব পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

শিশুকালে মুন্সীর মা-বাবাব মানৎ ছিল বেঁচে থাকলে কখনো সে লাঙলেব মুঠো ধরবে না; এর মানে এ নয় যে, জান কবজ হবাব পর সে শুধু লাঙলই ঠেলবে কেয়ামত তক্। মুন্সী তাই চাষীর ফবজন্দ হযেও চাষবাস কবে না। কিছু আরবী পারসী পড়েছিল, তাবই বদৌলতে সে বাড়ী বাডী মৌলুদ আর খতম পড়ে বেড়ায়, বিমারিব জানের বদলে সদকা-দেয়া বকরিটা মুবগিটা পাকড়াও কবে নিয়ে আসে, আর অবসর সময়ে বসে বসে খালি তাবিজ লেখে। সে তাবিজ যে কত রকমের তার হিসেব দিতে গেলে কেতাব বেড়ে যাবে। পৃথিবীর সমস্ত গাছকে কলম এবং সবগুলি সমুদ্রের পানিকে কালি করলেও নাকি আল্লার সিফত লিখে শেষ করা যাবে না। মুন্সীর বাংলা ছুলেমানী কেতাবখানির প্রত্যেকটি হরফের ফজিলত বয়ান করেই কি শেষ করা সম্ভব? বিমার আজারি দূর করা, দুশমনকে তাবে করা, আশেক মাশুককে মিলিয়ে দেয়া—এমন কোন কাজ নেই যা এই পুঁথির দৌলতে মুন্সী পারে না। নেক ছায়েত দেখে সে পুঁথিখানি খুলে বসে, সাদা কাগজে নানা রকম নকশা তুলে তাবিজ লিখে, আর জরুরৎ বুঝে শির্নি আদায় করে—সোয়া পাঁচ আনা থেকে পাঁচ সিকে।

একদিন সন্ধ্যের সময় মুন্সী বাড়ী ফিরল একটা লাল মোরগ আর কয়েক আনা পয়সা নিয়ে। প্রায় রোজই মোরগটা না হাঁসটা নিয়ে আসে মুন্সী, এ নিয়ে মালেকা কোন ঔৎসুক্য

প্রকাশ করেনি কোনদিন। আজ কী মনে কবে সে ধীবে ধীবে প্রশ্ন করে বসে—কত দিয়া আনছো মোবগটা?

—মোরগ বুঝি আবার কিনা আনতে অয় নাকি?—মুন্সী বিস্ময় বোধ কবে,—বড় বাড়ীর একটা মাইয়া বিমারে ভুগছে অনেক দিন, তারি লাইগা ছদ্‌কা দিছে।

—ছদ্‌কা?—মালেকাব সাবা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, আর মোরগটা হাত থেকে দলা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়,—এ আমি কাটতে পারব না,—মালেকা দা রেখে হঠাৎ উঠে পড়ে।

—বানতে পাববি না? বিস্ময়ের সঙ্গে বিবক্তি মিশে মুন্সীর গলাব আওয়াজটা ঝাঁ ঝাঁ কবে ওঠে।

—তোমার হাত পাও নাই? কাজ করতা পার না? চলে যেতে যেতে পেছনে না তাকিযেই ঠোঁট ফুলিযে ফুলিয়ে বলে মালেকা—পরের ময়লা খাইয়া ওফা অইবো না কোনদিন।

মুন্সী এবার চটে আগুন হয়ে ওঠে,—আমি কাজ করতে পারি না। ভাত-কাপড় বুঝি এমনি জুটে, না? মালেকা এ কথাব কোন সাড়া না দেয়ায় মুন্সীব আহত বিক্ষুব্ধ পৌরুষ গর্জে ওঠে। প্রথমে সে মালেকাব জটপাকান চুলের মুঠায় ধরে এক চোট কিলমোড়া দিয়ে নেয়, তারপব একটা লতান কঞ্চি নিয়ে বেদম তাব পিঠে বসাতে থাকে। কিন্তু এত কবেও মালেকার স্থিব অচঞ্চলতায় ঢেউ তোলা বড় কঠিন ব্যাপার, একটু আর্তনাদ পর্যন্ত সে করল না, ঠায দাঁড়িয়ে নীববে হজম করে গেল সব। শুধু দু-একবাব ভোতা নিস্পৃহ মুখ তুলে ভীরু দৃষ্টিতে স্বামীব মুখের দিকে তাকাল—এই পর্যন্ত।

মেজাজ চড়ে-যাওযা মুন্সী তাপ বিকীবণ কবে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এক সময। কিন্তু মোবগেব স্বাদু গোশত আব পেটে গেল না আজ, আ-কাটা মোরগ যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকল সারা রাত। শুধু ভাত নিজে বেড়ে নিযে নাকে-মুখে কিছুটা গুঁজে দেয় মুন্সী, তাবপব মুখ ভোতা কবে পড়ে থাকে বাবান্দায। মালেকার সঙ্গে তাব আড়ি, অন্যায ব্যবহাবের জন্য যতদিন না মালেকা মাফ চেযেছে, ততদিন আর মুন্সী এক বিছানায় ঘুমোবে না মালেকাব সঙ্গে।

মুন্সী তাব আড়ি নিযে আছে—এদিকে, পরদিন সকাল থেকেই ভাত বাঁধা বন্ধ কবে দিল মালেকা। নিজে উপোষ দিতে শুরু করে, কাজেব মধ্যে ঘব-দোবটা একটু ঝাঁট দেয়, বাটি-বাসনগুলো ধুয়ে বার বার সাফ করে, তারপর যেখানে সেখানে নিজেকে একেবারে ঢেলে দিয়ে বসে থাকে বটগাছের মত শক্ত হযে, অর্থহীন উদাস দৃষ্টিব ঘোলাটে ধূসবতায় মৃত্যুর নিরর্থকতা যেন ছায়া ফেলে।

মালেকার মাথা খারাপ নাকি!—মুন্সী একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ে। দু-একটি কথাও যদি মালেকা বলত, মুন্সী কিছু বুঝতে পারত হয়ত। কিন্তু ও একেবারে নির্বিকার নিস্পন্দ। নিরুপায় হয়ে নিজেই রান্না চড়ায মুন্সী।

কিন্তু পুরুষ মানুষের রান্না। কত যে হ্যাঙ্গাম আব ফেসাদ তাতে। হাড়ে হাড়ে তেতো-বিরক্ত হয়ে ওঠে মুন্সী। তৃতীয় দিন সকাল বেলা ভাতের মাড় খসাতে গিয়ে মুন্সী তার ডান হাতের আঙুল পুড়িয়ে ফেলল। সেই পোড়া আঙুল নিযে সে ছুটে যায় মালেকার কাছে। মালেকা তখন নির্জীবের মত পিঠ বাঁকিয়ে হাতনেয় বসে অলস তন্দ্রায় ঢুলছে; তার মুখের কাছে আঙুলটা তুলে ধরে মুন্সী বললে—দেখ্‌তো, হাতটা কী অইছে? মুন্সীর স্বর অসহায় মিনতিতে প্রায় কান্নার মত বেজে ওঠে—আমার না-অয় একটা ভুলই অইছে। তারি লাইগা, সারা জিন্দেগী এইটা মনে রাখবি তুই? এমন কইরাই বুঝি দিন আম্‌রার যাইব?

বন্ধ্যা দৃষ্টিতে ঢিলে দিয়ে মালেকা মুন্সীর হাতের দিকে তাকায়; তারপর, চোখ দুটো ছোট করে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলে ওঠে—এই হাতে না তাবিজ লিখ, বাঁচাইতা পারলা না?

মালেকা আবার নিজেব অন্ধকার নীরবতায় হারিয়ে যায়। তিনদিন পরে শান্ত সমুদ্রে কিছুটা বুদবুদ উঠে আবার মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

মুন্সীর সারা গায়ে জ্বালা ধরে যায়। তিন দিনের মধ্যে মালেকা এই প্রথম কথা বলল, তাও তার সারা জিন্দেগীর পাক-পেশাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে। গোস্বায় সে বাঁ হাতে চুলেব মুঠো ধবে, ডান হাতে পিঁজা দিয়ে ধরে মালেকার মুখে—হারামজাদি,—বদমায়েশ,—জাহিল,—আল্লার কালাম মুখে আইয়ে না,—আর তার বেইজ্জত করবার বেলা ফবফরাস্।

চোখ উলটিয়ে মালেকাব দৃষ্টি আসমানের দিকে প্রসাবিত হয়। আরো কিছু চড় কিল দিয়ে মুন্সী এবার ছেড়ে দিল মালেকাকে। মালেকা থুথু ফেলে আর তাবি সঙ্গে বেরিয়ে আসে লাল টকটকে তাজা লোহু, একটুক্ষণে মিলিয়ে-যাওয়া হাসিতে মালেকাব ভাবনাহীন নিষ্প্রভ মুখখানি মুহূর্তে আরো করুণ হয়ে ওঠে। আল্লার কালাম যে মুখে আসে না, পিঁজা দিলে সে মুখ থেকেও কিন্তু তাজা লোহু ছুটে আসে দর্‌দব্ করে।

অদ্ভুত ব্যাপাব এই যে, বিকেল বেলা থেকে আবাব বান্নাবান্নায় মন দেয মালেকা। স্বামীব জন্য দুটো ভাত ফুটোয়, বাডী নামার বিছড়া থেকে কলমি কুড়িয়ে আনে, মোবগগুলোকে কুড়ো খাওযায, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কেঁচো খেতে দেয হাঁসেব বাচ্চা ক'টাকে। আর শোবাব সময়, শুয়ে পড়ে গিযে একেবারে মুন্সীব কাছটিতে।

মুন্সী মনে মনে হাসে—ওষুধে ঠিক ধরেছে, যেমন কুকুব তেমন মুগুব। কিন্তু মাবতো আরো কতদিন মেবেছে। মালেকা তো কখনো অমন পোষা কুকুবেব মত তাব পায়েব কাছে লুটিযে পডেনি। মুন্সীব আক্কেল এবাব একেবাবেই ঘুলিযে যায, তবু এই নির্জীব মাংসপিণ্ডটাব ওপব করুণা হয মুন্সীব, একটুখানি মমতাও। মুন্সীই যে মালেকাব পবম আশ্রয, এ কথা মালেকা তার সর্বদেহেব নিবিড এলায়িত সমর্পণে ঘোষণা কবছে আজ। মুন্সী তাব মুখেব দিকে অনেকক্ষণ চেযে থাকে, তাবপব তার গাযেব উপব একটা হাত বেখে কোন কথা না পেযেই যেন বলে—তুই আমাবে পিযাব কবস্, না?

—হুঁউ—মালেকা নাকেব ভেতব দিযে আওযাজ কবে।

—খুব পিযার কবস্ বুঝি? বীতিমত কৌতুক বোধ কবে মুন্সী।

—হুঁম্— পেযাবাব মতোন,—ঘবেব ধন্নার দিকে চেযে থেকে মালেকা জবাব দেয, বোবা দৃষ্টিতে তাব কী যেন বিশেষ অর্থ ফুটে উঠল—মুন্সী তাব কিছুই বুঝল না, সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সে তাকিযে থাকে মালেকাব মুখেব দিকে।

ধন্না থেকে দৃষ্টি টেনে এনে মালেকা এবাব আরো ঘেঁসে আসে মুন্সীব বুকেব কাছে। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—আমারে তোমার সহ্যি অযনা, না?

প্রশ্নটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে মুন্সীব কাছে। একটু হেসে সে জবাব দেয—আমি কেনে? দুনিয়ায অমন কোন মরদ নাই যে তোরে নিযা ঘব কবতে পাবে।

—তা অইলে, তুমি কেনে তালাক দেওনা গো আমারে? মুন্সীর মুখেব কাছে মুখ নিযে মালেকা বলে, আর দু'হাত দিয়ে আদর করার ভঙ্গীতে চেপে ধরে তার গলায়।

মুন্সী জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নেয় মালেকাব হাত থেকে,—বিস্মিত দৃষ্টি মেলে মালেকার মুখের দিকে তাকায়। বুদ্ধি তার আচ্ছন্ন হয়ে যায় মালেকার ব্যবহাবে। মালেকার দু'চোখ বেয়ে আঁসু গড়িয়ে পড়ছে, ঠোঁটে তার একটা অদ্ভুত বিমর্ষ হাসি, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে—আর কেমন যেন একটা গোপন দুরভিসন্ধিতে সে উষ্ণ নিঃশ্বাস পাকিযে পাকিয়ে উঠছে।

এবার মুন্সীর বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে ক্রোধ ঠেলে ওঠে। এ মেয়ে তো সাধারণ মেয়ে নয়। শাদির পর থেকেই শরীর কেন ভাল যাচ্ছে না, মুন্সী এবার তার হদিস পেয়ে যায়! এবং এবার সে দু'হাতে জোর করে মালেকার গলা টিপে ধরে।

হাত পা ছুঁড়ে গোঁ গোঁ কবতে থাকে মালেকা। এক সময়ে তার দূষিত নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। মালেকাব গলা ছেড়ে দিয়ে মুন্সী থর থর কাঁপতে থাকে। মালেকা বুঝি মরে গেল! বিড় বিড় করে কলেমা কালাম পড়ে মুন্সী ফুঁ দেয় মালেকার চোখে মুখে। হয়ত, কালামের ফজিলতেই এবার চোখ মেলে চায় মালেকা। মুন্সীর ঈমান আরো শক্ত হয়।

পরদিন থেকে মুন্সী আলাদা বিছানা করে। মালেকার দূষিত নিঃশ্বাসের অশুভ সংক্রামক হাওয়া তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। আগের মতই থোম্ ধরে থাকে মালেকা, অতি প্রয়োজনেও দু'একটার বেশী কথা তার কাছ থেকে আদায় করা যায় না। মুন্সী মাঝে মাঝে ভাবে—মালেকাব ওপর জিন-পরীর আছর হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই, সে ছুলেমানী কেতাব খুলে মালেকাকে তাবিজ দেয়, আর মালেকা সেই তাবিজ আগুনে পুড়িয়ে হাসি-কান্নায করুণ হযে ওঠে। তালাকের ভয দেখাবাব সাহসও মুন্সী আজকাল পায় না,—পারলে মালেকা নিজেই মুন্সীকে তালাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। তা ছাড়া বিয়ে কবাটাও তো এত সোজা নয় যে, একটা বউকে ঘব থেকে বার করে দিলেই আবেকটা সোজাসুজি চলে আসবে। নিজে বান্নাবান্না করার কী যে ফেসাদ তার প্রমাণ এখনো পাওযা যাবে তাব পোড়া হাতটিতে। অথচ প্রতিটি মুহূর্তেই নিরুত্তাপ নীববতা সহ্যেব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

একদিন মুন্সী খতম পড়ে বাড়ী ফিবে দেখে—তাব ছনের ঘরটিতে আগুন লেগে গেছে। বুন্দা পাকিয়ে পাকিয়ে আগুনের শিখা কৃষ্ণাভ লাল নিশানেব মত নেচে নেচে আসমানেব দিকে ধাওয়া কবছে, কাপড়েব খুট ধবে মালেকা দাঁড়িযে আছে আগুনেব দিকে চেয়ে—নীবব নিথব—বিস্ময়েব যেন অবধি নেই তার। একটা কিছু জিনিষও মালেকা ঘব থেকে বাব কবেনি, আগুন নেভানোব জন্য পাড়ার লোকদের চীৎকাব কবে ডাকাবও প্রয়োজন বোধ কবেনি মালেকা—যাবা এসেছে, তাবা আগুন দেখে এমনি ছুটে এসেছে, আব মালেকা দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীব হয়ে। আগুনের আঁচ এসে লাগছে নাকে-মুখে, চুল উড়ছে, আগুনেব এই ঝড়েব মধ্যে কোন্ আতশী স্বপ্নে সে মশগুল হয়ে আছে—কে জানে?

সেই দিনই মালেকাব প্রথম বাসা ভাঙলো। পাড়ার লোকের সবাবই বিশ্বাস, এবং মুন্সীবও তাই, মালেকাই আগুন দিয়েছে ঘবে। সুতরাং এবার আগুন লাগে মালেকাব কপালে। পবিত্যক্ত মালেকা মুন্সীর ঘব থেকে বাব হয়ে আসে নির্বান্ধব সংসাবে।

বহু দূব-সম্পর্কেব এক মামাব আশ্রয়ে মাস চারেক থাকার পর সেই মামাবই চেষ্টায, মালেকা দ্বিতীয় বাবেব মত কনে সেজে আবার ঘর কবতে যায মুনাওয়াবেব সঙ্গে।

একাব সংসাব মুনাওযাবেবও। পাশেব ঘরে থাকে তার এক বড় বোন ও বোনের সোয়ামী, দখ্নের হিস্বা তার ভগ্নিপতির বড় ভায়ের। কালো মোষেব মত বঙ, চওড়া বুকের পাটা, মুনাওযাব বলিষ্ঠ যুবক। সামান্য কিছু জমি আছে, তা-ই চাষ কবে,—কিন্তু তাতে সারা বছর চলে না, কাজেই দিন গুজবানের নতুন নতুন পন্থা তাকে অবলম্বন কবতে হয।

বউ দেখে প্রথম খুশীই হল মুনাওয়ার। রঙটা মন্দ নয়, তা ছাড়া, ঢলঢলে যৌবনের প্রসাদে ঢিলা ঢালা গায়ে তার স্বাস্থ্যের জৌলুষ কম নয়। শরতের আসমানের মত বৈচিত্র্যহীন দৃষ্টি মেলে সে যখন মুনাওয়ারের দিকে চেয়ে থাকে—সত্যি, মমতা হয় মুনাওয়ারেব। কিন্তু বহু কষ্ট করেও যখন বউকে হাসাতে পারল না—তাজ্জবও কম হয় না মুনাওয়ার।

পাড়ার বেড়িয়ে-বেড়ানো মেয়েরা ভাব জমাতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায। কারো সঙ্গেই মালেকা বড় একটা কথা বলে না, আর বললেও এমন ভাবে বলে যে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেই কারো কারো সন্দেহ হয়। কেউ কেউ মনে করে, মেয়েটা বড় দেমাগী—আবার কেউ কেউ তার পয়লা স্বামীর মতই সন্দেহ করে, মালেকার উপর জিন-পরীর আছর হওয়াও অসম্ভব নয়।

আগে মুনাওয়ার জমিটা ভাগে চাষ করতে দিয়ে নিজে চাকুরী কবত। কিন্তু এখন আর চাকুরী করে না; কী করে যে তার দিন গুজরান চলে, গাঁর লোকেব কাছে তা রীতিমত গবেষণার ব্যাপার। দিনের বেলা সে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, পাটুনী পাড়ায় তাসের আসরে বসে তাস খেলে, নাচগানেব মজলিসে বসে হাততালি আব বাহ্‌বা দিয়ে সে প্রমাণ করে, তাব মত সমঝদাব লোক আর নেই। কখনো কখনো সে বোজ-কামলা হিসেবেও কাজ করে, প্রায রাতই বিছানা ছেড়ে কোথায চলে যায মুনাওয়ার; এটা ওটা নিয়ে সে যখন চুপি চুপি বাড়ী ফিরে তখন গভীর নিশুতি রাত! মালেকা কিছু বলে না, চোখ বুজে পড়ে থাকে বিছানায়, আর গভীর ঘুমে তার শবীবেব প্রত্যেকটি গেবো যেন ঢিলে হয়ে খুলে যায়। মুহূর্তের দুঃস্বপ্নেব মতই মুছে যায় তার মন থেকে।

আবেগহীন নিরুত্তাপ মালেকাব গাম্ভীর্য পাথবেব মতই ঠাণ্ডা আব কঠিন। তবু, এ নতুন বউ-এব স্বাভাবিক লজ্জা ছাড়া আব কী? মুনাওয়ার তাকে আদব কববার চেষ্টা করে— হৃদযেব উত্তাপ পেলে এ বরফ ভেঙে যে ধারা বয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহই নেই মুনাওয়ারের।

ধীবে ধীরে বোবা মেয়েটির বোবা চাহনীও কিন্তু অর্থপূর্ণ হযে ওঠে, গভীর নিশুতি বাতে মুনাওযার যখন এটা ওটা নিয়ে বাড়ী ফিবে, মালেকাব সন্দেহ-ভবা দৃষ্টির সামনে দাঁড়িযে তখন জবাবদিহি করতে হয, "এসব জুয়োর পয়সা দিয়ে কেনা" অথবা "চিঠি-খেলাব দানে" পেযেছে। মালেকা এসব স্পর্শ কবে না, মুনাওযার যেখানে রাখে সেখানেই পড়ে থাকে। সুতবাং বাধ্য হযে মুনাওযাবকেই এসব সামলাতে হয়।

এ নিয়ে ক্রমেই অসন্তোষের মেঘ জমা হযে ওঠে মুনাওযাবেব মনেব আসমানে। স্বামীব জীবন বিপন্ন করে আনা জিনিষ শুধু একটু যত্ন কবে তুলে বাখবে, তা-ও মালেকাকে দিযে হয না।

একদিন দুপুর বেলা তাসের আড্ডা থেকে ফিবে মুনাওয়াব দেখতে পায—বাতেব বেলা যে পুবানো থালা-বাসন আব কাপড়-চোপডগুলো এনেছিল, তাব সবগুলোই এখনো চুলো-মুখে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি কবে সে জিনিষগুলো বেখে দেয ধানেব বড় ডোল্‌টাব মধ্যে। চওডা বুকের পাটার ভেতর যেন তুফান শুরু হযে যায মুনাওয়াবেব—বিয়ে-কবা বউ-এব এত দেমাগ আব হিম্মত!

বাবান্দায বসে, বেড়ায হেলান দিযে মালেকা ঝিমুচ্ছে, চুলে টান পডায সন্ত্রস্ত হযে সে তাকায সামনেব দিকে—মূর্তিমান আজরাইলের মত মুনাওযার দাঁড়িয়ে। রাগে তার নাক আর ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে। ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে সে বললে—জব্বব তো দেমাগ অইছে হাবামজাদিব। জিনিষপাতি সামলাইয়া বাখবি, তা-ও যদি না পাবস্‌, গলায দড়ি দিয়া মবতে পাবস্‌ না?

মালেকা থোম্‌ ধরে বোবার মত চেয়ে থাকে মুনাওযাবের দিকে। চুলটা ছাডাবাব পর্যন্ত চেষ্টা করে না সে। শুধু অকারণ কৌতুকে চোখ দু'টো তার বড় হযে ওঠে।

—এই শয়তানী—কথা ক'স না কেনে? মুনাওযার এবার চাপা ক্রোধে গর্জন কবে ওঠে; তার ভারী হাতের চড় আব কিল অবিরাম পডতে থাকে মালেকার পিঠেব ওপব। মালেকা কাঁদে না, শুধু একেকবার গোঁ গোঁ করে ওঠে যন্ত্রণায়।

শেষ পর্যন্ত মুনাওয়ারের বোন মাজেদা এসে মালেকাকে উদ্ধাব কবে। সহানুভূতিতে গলে গিয়ে সে বলে—মা-গো মা—কেমন পাষাণী, দেখ চা-ই! একবাব নি একটু কান্‌ল—একটুঁ উহ্‌ নি করল। একি মানুষ না আর কিচ্ছু?

মালেকা পরনের কাপড়টা সামলে নিয়ে ধপ করে বসে পড়ে বারান্দায়, এলোমেলো তেল-না-পাওয়া চুল মুখের উপর ঝুলে পড়ে মালেকার মুখটাকে প্রায় ঢেকে ফেলে; চুলের ফাঁকে ফাঁকে সবার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মালেকা মাথা নীচু করে বসে থাকে— এক হাত বুকে চেপে দ্রুত শ্বাসপতনকে রোধ করবার প্রয়াস পায়—নিঃশ্বাসের চাপে ফুসফুস যেন ফেটে যাচ্ছে তার।

ঘরের এক কোণে কাঁথা বিছিয়ে মালেকা মাটিতে পড়ে থাকে অবশ হয়ে। যন্ত্রণায় সারা দেহ ছটফট করে। বিকেলে আসে প্রবল জ্বর। পানির পিয়াসে ছাতি যেন ফেটে যায় মালেকার— কোন রকমে টল্‌তে টল্‌তে ঠনার কাছে যায়, কলস থেকে ডোগ্‌লায় পানি ঢেলে ঢক্‌ঢক্ করে গিলে ফেলে।

মুনাওযার মালেকাকে ডেকে এনে ভাত বেঁধে দিতে বলে। মালেকার যে জ্বর হয়েছে এ কথা যেন বিশ্বাসও কবতে চায় না মুনাওযাব। মেয়েলোকের অমন ভর-ধরার সাথে খুবই পবিচিত সে। অমন বজ্জাত মেযেব সঙ্গে আর সে কথাই বলবে না কোনদিন।

দু'দিন গেল—তবু জ্বব ছাড়ে না মালেকাব। জ্বর নিযেই মাঝে মাঝে উঠে কাঁথা-কাপড়গুলো শুকোতে দেয়, ডোগ্‌লা ভবে ভবে পানি খায়, আর হাতনেয় বসে বসে ঝিমোয়।

কিন্তু মাজেদা আব ক'দিনই বা বান্না-বাড়া কবে দেবে মুনাওযাবকে? মুনাওয়ারকে সে বলে দিয়েছে—আমাব ঠেকা লাগছে আব কি! বউরে আরো মার্‌গা গিয়া—ভাত-সালুন এমনি অইব তখন। সুতবাং মুনাওযাব অসুবিধায পড়ে এবার। বাধ্য হযে তাকে মালেকাব কাছে যেতে হয়, মালেকাব গাযে হাত দিয়ে তার জ্বব পবখ কববাব চেষ্টা করে। মালেকা অনাসক্ত দৃষ্টিতে মিব্‌মিবিযে চায় মুনাওয়ারের দিকে, শিথিল উদাসীন দৃষ্টিব মধ্যে কিছুই যেন খুঁজে পায না মুনাওযার। জ্বর নেই মালেকাব গায। মুনাওযার বলে ঃ এ্যাই উঠ্‌ না। দুইটা ভাত রাঁধ গিযা—আমার ভাবী খিদা লাগছে।

মালেকা কিছু না বলেই উঠে পড়ে—তাবপব, চুলোব ওপবে হাঁড়ি চডিযে দেয়।

খেতে বসে মুনাওযাব জিগ্‌গেস কবে—তুই থোম্ ধইয়া থাকস্ কেনে, অসুখ-বিসুখ করছে নাকি?

দড়মের ওপাশে চুপ করে বসে থাকে মালেকা—কোন জবাব দেয় না।

মুনাওয়ার আবাব জিগ্‌গাসু হয—রা করস্ না কেনে? অসুখ-বিসুখ করল নাকি তোব?

এবারও কোন সাড়া আসে না দড়মের ওপাশ থেকে। ভাত বেখে উঠে পড়ে মুনাওযার, হাত না ধুয়েই সে এগিয়ে যায় চুলো মুখের দিকে, সারা শবীর তার রি-রি করে ওঠে রাগে—এত দরদ, এত আন্তরিকতায়ও মুনাওয়ার পাত্তা পেল না মালেকার কাছে! তবু বাগের ভাবটা সে ঢেকে রাখে—মালেকার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায প্রশ্ন করে—কী, গোঙা অইয়া গেলে নাকি। জিগাইছি, অসুখ-টসুখ করল কিনা! অসুখ করলে ওষুধ আনন লাগত না?

চুলোর প্রায নিভন্ত আগুনে ঘরেব অন্ধকার ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠেছে। প্রায়ান্ধকারের মধ্যে চুলোর আগুনের দিকে চেয়ে বসে আছে মালেকা, এবার সে চোখ দুটো বড় বড় করে মুনাওয়ারের দিকে তাকায়; কতকটা জমাট অন্ধকারের মত সে দাঁড়িয়ে আছে মালেকার সামনে। মালেকা ধীরে অথচ গম্ভীরভাবে বললে—তোমার হাত দুইটারে জিগাইতে পার না? আবার নিঃশব্দের গহন অন্ধকারে মরে যায় মালেকা। অন্ধকারের অতল থেকে শব্দের ক্ষীণ বুদবুদ উঠে আবাব অন্ধকারেই হারিয়ে যায়।

মুনাওয়ার ক্রোধে অধীর হয়ে ওঠে—তবু আজ সে চূড়ান্ত সংযমের পরিচয় দেয়। বিমারীর ওপর হাত তোলাটা ঠিক হবে না। হাত ধুয়ে নিজেই তামাক সেজে কয়েকটা টান দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তবু, তাদের সংসার চলে যায় এক রকম। নানা প্রশ্ন করেও মুনাওয়ার যখন কোন জবাব পায় না, ত্যক্ত হয়ে সে মারপিট করে মালেকাকে। মালেকা আবার থোম্ ধরে বসে থাকে—গায়ে জ্বর তোলে, এবং কয়েক দিন পর নতুন করে আবার সংসারের কাজে লেগে যায়। মুনাওয়ার কী করবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না।

শীতকাল—জাল ও ফাঁদ পেতে বুনো হাঁস ধরার মওসুম। দু'একদিন পরপর দুটো চারটে হাঁস নিয়ে শেষরাতে বাড়ী ফিরে মুনাওয়ার, অনেক ঠেলাঠেলি করে ঘুম ভাঙ্গায় মালেকার, হাঁসগুলোকে জিইয়ে না রেখে তখন তখুনি জবেহ্ করে ফেলে—কেটেকুটে রাত থাকতে থাকতেই সেগুলো পাকাতে হবে মালেকাকে। অন্ধকার রাত। দোর এঁটে ছেঁড়া কাঁথাগুলো জড়িয়ে বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে আছে মালেকা। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। চোখ কচলাতে কচলাতে বিছানার ওপর সে উঠে বসে, তুষের আগুনে পাটখড়ি গুঁজে আগুন ধরাচ্ছে মুনাওয়ার, মালেকা আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

—ঘুমাইয়া পড়লি যে,—আগুন ধরিয়ে প্রশ্ন করে মুনাওয়ার। হাঁসটা রাইন্ধা ফেলা জলদি—সকালে আবার বাজারে যাওন আছে। মালেকা কোন সাড়া দেয় না।

—ঘুমাইয়া পড়লি? মুনাওয়ারের গলার আওয়াজে বিরক্তি যেন ছাপিয়ে ওঠে।

—হুঁ, চোখ বুজে থেকেই মুখ ফুলিয়ে জবাব দেয় মালেকা, রানতে পারব না আমি।

—পারবি না? মালেকার সাহসে বিস্ময় প্রকাশ করে মুনাওয়ার।

—রোজ রোজ তুমি মান্‌ষের জাল থনি পক্ষি লইয়া আইবা, আমার বুঝি আর ঘুমানি লাগে না?—মালেকার বলার ভঙ্গীটা আশ্চর্য রকমের জোরাল হয়ে ওঠে।

মুনাওয়ার তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে—হারামজাদি! রাত্রির নীরবতার বুক ফাটিয়ে সে বীভৎস আওয়াজে গর্জন করে ওঠে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে সাপটে ধরে মালেকার ময়লা জটপাকানো চুলের মুঠোয়।

মালেকা উঠে বসে—ধীরে ধীরে আজ যেন শক্তি সঞ্চারিত হয় তার শিরায়।—চুল ছাড়ো,—অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে মালেকা—না অইলে, চিল্লাইয়া আইজ সব জানাইয়া দিবাম মান্‌ষেরে। মালেকা হাঁপিয়ে ওঠে, জীবনে এই প্রথম তার সমস্ত সত্তা দিয়ে সে প্রতিবাদ করলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

মুনাওয়ার তখনো তার চুলের মুঠো ধরে আছে—কী জানাইয়া দিবি? ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গর্জন করে ওঠে মুনাওয়ার—হারামজাদী, বদমায়েশ,—কমজাতের নাড়ি—ক'না দেখি, কী জানাইয়া দিবি?

চুল ধরে মুনাওয়ার এক রকম শূন্যে ঝুলিয়ে ফেলে মালেকাকে। মালেকা সোজা দাঁড়িয়ে যায়, মুনাওয়ারের মুখোমুখি হয়। তারপর কপাল কুঞ্চিত করে ঘন ঘন দম নিতে নিতে বলে—তুমি চোর—তুমি শয় .. তা . .

মালেকা তার কথা শেষ করতে পারে না— লোহার মত শক্ত হাত দিয়ে মুনাওয়ার চেপে ধরে তার মুখে, আর হড়হড় করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে তাজা লোহু বেরিয়ে আসতে থাকে। মুনাওয়ার তার মুখ ছেড়ে দিয়ে চুল ধরে ঠোঁট কামড়াতে থাকে আক্রোশে। মালেকা মাথাটা একটু নীচু করে নাকে মুখে আজলা পেতে ধরে,—রক্তময় থুথু কুলি করার মত ঢেলে দেয় মুনাওয়ারের মুখের ওপর, হঠাৎ ক্ষেপার মত অট্টহাস্য করে আঁজলাভরা লোহু মাখিয়ে দেয় তার গালে আর কপালে।

মুনাওয়ার এবার মালেকাকে ছেড়ে দেয়। ভাগ্যিস জেগে নেই কেউ—মালেকার ওপর আর জুলুম করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। রেগেমেগে যদি আরো জোরে জোরে চীৎকার

শুরু করে দেয়, মুনাওয়ারের কপাল ভাঙবে। গাঁর লোকেরা অনেকদিন তার গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দিহান; গত ক'মাসের মধ্যে গাঁয়ে যে ক'টা চুরি হয়েছে, মুনাওয়ার তাব প্রত্যেকটাতেই জড়িত আছে বলে অনেকের ধারণা। তাদেব এই ধাবণাই সত্যি হবে, যদি তারা মালেকার কথা শুনতে পায়,—ভালা চাস্, চুপ কইরা থাক কইলাম—না অইলে কাইটা গাঙে ভাসাইয়া দিবাম,—চাপা গলায় মুনাওয়ার বলে আর জবেহ্ করা হাঁসটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায।

মাঝে মাঝে এটা ওটা নিয়ে এমনি কিলমোড়া মালেকার কপালে জুটেই। দিনে দু'তিনবাব কবে নিজেই নিজের মাথায় পানি ঢালে, নতুন হাড়ি পাতিল ভেঙে নিধালায় বসে করমড় কবে চাবা খায আর রান্নার সময় পড়ে পড়ে ঘুম দেয়।

একদিন মুনাওযার বললে—বাতদিন খালি ঘুমাইলেই চলবো নাকি। রান্ধা বাড়া বুঝি করন্ লাগে না?

দলামুচি হযে মালেকা বিছানায় পড়ে থাকে— কোন সাড়াই দেয না।

মুনাওয়ার এবার সজোরে ধাক্কা দেয় মালেকাকে— এ্যাই, বাতদিন যে খালি ঘুমাস, কী অইছে তোর। কাজকর্ম নাই বুঝি?

সেই অর্থহীন ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে মালেকা মুনাওযাবেব দিকে তাকায়, মুনাওযাব কি বলেছে তাই বুঝবার চেষ্টা কবে অনেকক্ষণ, তারপর একবার পেটেব কাপড়টা একটু সবিয়ে নিয়ে ডান হাতটা পেটেব ওপর রেখে ধীরে ধীরে বলে—কী অইছে, জানো না বুঝি?— চোখেব তাবায এবার শ্বাপদ-আক্রোশ জ্বলজ্বল কবে ওঠে—চোখ নাই? দেখ না কী অইছে?

মুনাওযাব বোবার মত চেয়ে থাকে। কিছুই যেন সে বুঝে উঠতে পাবছে না। হঠাৎ একঝলক আনন্দে তাব সমগ্র সত্তা ঝলমলিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আসে সীমাহীন বিস্ময। সে সন্তানের পিতা হতে চলেছে! মুনাওযাব কিছু বলতে পাবে না, মালেকাব ফ্যাকাসে মুখটাব দিকে চুপ কবে চেযে থাকে, এ মুখও আজ তাব কাছে সুন্দর লাগছে।

আস্তে আস্তে মালেকা উঠে বসে—আজবাইল! অভিযোগ মুখব হযে ওঠে মালেকাব কণ্ঠে—ঘুমাইলেই অখন গা জ্বলে তোমার। কেন তুমি আমার এই সর্বনাশ কবলা? আমি আব বাঁচবাম্ বুঝি? মালেকা দস্তুব মত হাঁপিয়ে ওঠে, এতগুলো কথা এক সঙ্গে আব কোনদিন সে বলেছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ মালেকা ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদতে শুরু কবে দেয়, বহুদিন পর বাঁধ ভেঙেছে, প্রবাহ যেন এবাব থামবে না।

মালেকাকে মুনাওয়ার কাঁদতে দেখেনি কখনো। সন্তানেব মা হবে মালেকা, কান্নাব কী আছে, মুনাওযাব ভেবে পায না। আস্তা পাগল! আস্তা পাগল!! একে নিযে কি আব ঘব-সংসাব করা যায?

কয়েকমাস পব এক মেযে এল মালেকাব শূন্য কোল জুড়ে। মেযেকে কোলে নিযে মালেকা আকুল বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে চেযে থাকে, আব টপটপ কবে পডে তাব চোখেব পানি।

মুনাওয়ার কিন্তু বিবক্ত হযে ওঠে মালেকাকে নিযে। সাবাদিন মেযেকে নিযে পড়ে পড়ে ঘুমোয—রান্নাবাড়ার কাজ থেকে অই মেয়ে যেন তাকে মুক্তি দিয়েছে চিবদিনেব জন্য। তা ছাড়া, রাতের বেলা মালেকা আজকাল পাহারা দেয মুনাওয়াবকে, কোথাও সে যেতে পাববে না, গেলে চীৎকাব কবে পাড়া-পড়শীকে ডেকে সব জানিয়ে দেবে। মালেকা এবাব রীতিমত মুখব হয়ে উঠেছে—একবকম তিরস্কারের ভংগীতেই সে বলে—সাত বাঘেও তো খাইযা ফুবাইতে পারবে না। মানষের বাড়ীও যদি কাজ কব, আম্রার দুইটা পেট চল্‌বোই।

মেয়েটা এসে সাত সাগরের ব্যবধান রচনা করে দেয় মালেকা আর মুনাওয়াবেব মধ্যে। পরের বাড়ীতে চাকরী করা—সে হবে না মুনাওয়ারকে দিয়ে। ছোটকাল থেকেই সে চাকরী

করেছে—সে জানে তাব খুন-ঝরানো জ্বালা কোথায়! তাহলে, মালেকাকে নিয়ে তার আর ঘর কবা হল না। অমন অলস, নিষ্কর্মা, নোঙরা মেয়েকে যত শিগগীর তাড়ান যায় ততই ভাল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। উঠেনে বসে মুনাওয়াব চাটাই বুনছে। হঠাৎ তার ছনের ঘবের চুলোব ওপর দিক্‌কার অংশটুকু হতে একটা আগুনেব শিখা লক্‌লকিয়ে ওঠে সন্ধ্যাব আসমানে। মুনাওযাব ছুটে যায় ঘরেব ভেতর, ঘরেব পেছনে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে মালেকা, মেয়েটা বুকেব উপর, আর মালেকাব দৃষ্টি আগুনের শিখাটার দিকে। সেই আগুনেই মুনাওয়ার দেখতে পায—অবাক বিস্ময়ে মালেকাব ঠোঁট দুটো আলগা হয়ে আছে; আর কৃষ্ণাভ লাল শিখার মতই একটা করুণ হাসিব অস্পষ্ট আভাস তার মুখে।

মুনাওযাব তাব ঘরটিকে রক্ষে করতে পারলে না, মাজেদা এবং তার ভাসুবদের ঘরও ছাই হয়ে যায় এক সঙ্গে। সবাই বললে, আগুন মালেকাই দিয়েছে।

দ্বিতীয়বারেব মত মালেকার কপালে আগুন লাগে। ঘবপোড়া ছাই নাকে মুখে মাখিযে, মেয়েটিকে কেড়ে রেখে, তালাকের অধিকাব খাটিযে মুনাওয়ার তাকে ঘব থেকে বার করে দেয়।

যাব ঘব নেই—পথই ডেকে নেয তাকে।

অন্ধকাব রাত। বাড়ীব নামার গো-পাটটা ধবে মালেকা বেরিয়ে পড়ে। কেমন যেন হালকা বোধ হচ্ছে তাব। গাঁব একেবাবে দক্ষিণেব বাড়ীতে গিযে বাতেব মত আশ্রয নেয সে। পবদিন সে সেই বাড়ীতেই থেকে যায়, অন্য কোন সুরাহা না হওযা পর্যন্ত সে ওদেব কাজকর্ম কববে, ওদেব বাড়ীতেই থাকবে। ওবা ততদিন খোবপোষ জোগাবে মালেকাব।

মালেকা যন্ত্রেব মত কাজ কবে যায—কখন কোন কাজটা কববে, তা জেনে নেবাব জন্য মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলে। একটা অতল স্তব্ধতায তাব সাবা অস্তিত্ব মৌন-গম্ভীব হয়ে থাকে। দুই স্তন যখন দুধে ভবে যন্ত্রণায টন্‌টন্ কবে ওঠে তখনি মেযেটিব জ্বালাময স্মৃতি তাব মনে জাগে, আব দু'হাতে দুধ টিপে বেব কবে দিযে নিষ্কৃতি পায সে যন্ত্রণাব হাত থেকে।

ভবিষ্যতের ভাবনা এলোমেলো ভাবেও মালেকাব মনে আসে না। ভবিষ্যতই যেন অচল হয়ে বর্তমানের বুক চেপে বসে আছে।

তবু, পাড়ায বেবোলেই নানা জনে তাকে নানা প্রশ্ন কবে, টিটকাবী দেয়, মালেকা এসব গাযে মাখে না। পারৎপক্ষে কাবো জবাব দেবারই প্রযোজন বোধ করে না মালেকা। যখন কথা বলে, সেও অমন ভাবে বলে যে, অন্যেরা তাকে পাগল ঠাওরায়, আমোদ বোধ করে।

একদিন গোসল কবতে গিযে ঘাট-ভর্তি মেযেদেব এক রসালো গবেষণার সম্মুখীন হল মালেকা। গবেষণাব বিষয়, মালেকার তিন নম্ববটা কখন জুটছে তাই নিযে।

মালেকাই একবাব বলল—বৈশাখী ফসল লইযা সবাই বেস্ত। জষ্ঠি-আষাঢ লাগাৎ জুটব আব কি?

মেয়েদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে যায় মালেকার কথায়। মালেকা কোন কথা না বলে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে।

এমনি করে মালেকাকে নিয়ে যেখানে সেখানে নানা বকম রস গাঁজিযে ওঠে, মালেকা প্রায় সত্যি বলেছিল—আষাঢ়ের শেষ দিকে আবাব পযগাম এল নিকার। পাটা-বুকার রশিদ মোড়লেব তিন নম্বরের বিবি হয়ে মালেকা একদিন মুনাওয়ারের গাঁ ছেড়ে চলে যায়।

এবারের পরিবেশটা মালেকার কাছে একেবারেই নতুন।

বেশ বড় সংসার। দু'সতীন এবং দু'সতীনের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। তাছাড়া চাকর-বাকর আছে। দেনা-পাওয়া, হিসেব-নিকেশ ও লাভ-লোকসানের কোলাহলে মুখর

হয়ে আছে মোড়লের সংসার। এই নতুন পরিবেশে মালেকা যেন নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলে।

বুড়ো মোড়ল সখ করে মালেকাকে নিকে করেনি। ঘরে দু'টো স্ত্রী আছে বটে, কিন্তু ছেলেমেয়ে নিয়েই তারা ব্যস্ত। তা ছাড়া বড় স্ত্রী আকলিমা মেদ জমিয়ে জমিয়ে মাংসের পাহাড় হয়ে উঠেছে, নড়াচড়া করাই তার পক্ষে দায়, সংসারের কাজকর্ম চলে না। ছোট দিলারা সূতিকায় ভুগে ভুগে একেবারেই সারা, কাজেই সে এখন খবচের কোঠায়। দায়ে পড়েই মোড়ল আবার নিকে করে মালেকাকে।

এত কাজ মালেকার জীবনে কখনো ছিল না। আকলিমা থেকে শুরু করে, একপাল ছেলেমেয়ে, মায় চাকর-বাকরদের ফরমায়েশ পর্যন্ত তাকে খাটতে হয়। কাজে কিছু ত্রুটি হলে কিংবা সময় মত কাজটুকু আদায় করতে না পাবলে সবাব কাছেই সে বকুনি খায়। বকুনি খেয়েও বা করে না মালেকা, কাজেব মধ্যে ডুবে থাকে আব আপন মনে কাজ করে যায়। আকলিমা তাকে উদারি বলে ডাকে, অর্থাৎ মালেকাব মত বোকা মেযে আব নেই। ছেলেমেযেরা তাকে 'বটি' সম্বোধন করে। শুধু দিলাবাই মাঝে মাঝে তাকে ডেকে সান্ত্বনা দেয়, দু'একটা হৃদ্যতাপূর্ণ কথা বলে। কিন্তু সে সান্ত্বনায় উৎসাহের কোন দীপ্তি দেখা যায় না মালেকাব মধ্যে, শুধু বোবা দৃষ্টি মেলে রোগজীর্ণ দিলাবার কাতর মুখের দিকে তাকায, আব কেমন যেন একটা অদ্ভুত মমতা বোধ করে সে।

মোড়লের সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না মালেকাব। ধান দিয়ে ভাঁড়ার ভববে, টাকায সিন্ধুক ভর্তি কববে—এই দুই পরম ভাবনায় খণ্ডিত টুকরো টুকরো হয়ে মোডল তার হাঁকডাকেব সংসারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মালেকার দিকে চাইবার তাব ফুরসৎ কোথায? তবু মোড়লের কাছে মাঝে মাঝে মালেকাব ডাক পড়ে এটা ওটা কবার জন্যে, মালেকা মাথা নীচু করে কাজ করে যায়, আর সুযোগ পেলে ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে মোডলেব শাদা দাড়ি ও চুলেব দিকে তাকায়।

কাজ সেরে মালেকা ঘরের পেছনের বারান্দায় গালে হাত দিয়ে চুপ কবে বসে থাকে। কখনো বা গিয়ে বসে শয্যা-নেয়া দিলারাব কাছে, আব তার হাজারো বকমের কাহিনী শোনে। আকলিমা মনে মনে জ্বালা বোধ কবে।

একরাতে তামাক সেজে দিচ্ছে মালেকা। হুকোটা হাতে নিযে মোড়ল বললে—খালি নাকি বইয়ে থাকস্ হামেশা? কাজ-কামে গাফেলতি করলে তো চলবো না।

মালেকা পাযের দিকে চেয়ে চুপ কবে দাঁড়িযে থাকে।

—দ্যাখ, এত বড় সংসার— মোড়ল আবাব আরম্ভ করে, কাজ-কাম চলে না— তাইতো দুই দুইটা বিবি ঘরে রাইখা ফিরা নিকা কবলাম তোরে। না অইলে আমাব কি বিয়ার বয়েস আছে?

মালেকার উদাস দৃষ্টি আরো এলোমেলো হয়ে পড়ে, একবার সে বলে বসে—আমার বুঝি বিয়ার বয়েস নাই? বান্দী আনলে কাজ চলত না তোমার সংসারের?

—বাহ, বান্দী কোনদিন আপন অয় নাকি? মোড়ল হেসে ফেলে—নিজের ভাইবা ঘরের কাজ-কাম বউই করে।

মালেকা বেড়ায় হেলান দিয়ে দরজার ফাঁক দিয়া আসমানের দিকে চায়, কপালের উপরিভাগটা তার কিঞ্চিত কুঞ্চিত হয়ে ওঠে—অনাবশ্যক একটু হাসির আভাস মিলিয়ে যায় তার ঠোঁটের কোণে।

আকলিমার ছোট ছেলেকে খাওয়াতে গিয়ে মালেকা একদিন একটা চিনির বাটি ভেঙে ফেলে। এ নিয়ে আকলিমা তাকে মারধোর করল, টানা-হেঁচড়া কবে ছিঁড়ে দিলে তাব নাক-কান-চুল। কয়েকদিন পব আকলিমার মেজ ছেলে ঠিক সময়ে পা ধোয়ার পানি না দেযার অপরাধে ডান হাতে বাঁ হাতে চড় বসায় মালেকার দু'গালে। গালে হাত বুলোতে বুলোতে চোখ দু'টো বড় বড় করে মালেকা বোবা আসমানের দিকে তাকায, তাবপর আবার নিজের কাজে মনোযোগ দেয়।

দিলারা পবামর্শ দেয়—বুড়ার কাছে তুই নালিশ কর না ভইন, বুড়া লোক অতো খারাপ না।

কিন্তু নালিশ? সে কি মালেকাকে দিয়ে হয়!

একদিন দিলারাই মালেকাব হয়ে মোড়লেব কাছে নালিশ জানায়—হুনছো, বড়-বু আর তার ছেলেমেয়েরা মালেকারে যে মারধোর করে দেখো না বুঝি?

—তা বড় বু-ই যখন তোমরার—একটু হেসে মোড়ল জবাব দেয়, শাসন তো একটু করতেই পারে। আব অবোঝ ছেলে-মাইযারা যদি একটা চড়-খামচা দিযাই ফ্যালায় তারে মাবধোর কইবো, তাব মধ্যে মান্‌যাতি আছে নাকি!

—বুঝছি গো, বুঝছি। একটা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী করে দিলারা থেমে যায। বড় বিবি খান্দানী ঘরের মেয়ে, শাদিব সময় অনেক জায়গা জমি লিখে দেওয়া হযেছিল তার কাবিনে। তাই তাব এত তোযাজ।—আকলিমাব সামনে এলেই মোডল যেন নেহাৎ ভিজেবেড়াল হযে যায়।

উঠতে বসতে সবাই মালেকাকে ফিঙের মত টেল্‌লাতে শুরু কবে, তবু মালেকাব পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ ওঠে না।

একদিন আকলিমাব পাযে ধবে কাঁদতে কাঁদতে মালেকা বললে—খোযাব দেখছি বু—আমি আব বাঁচতাম না এখানে থাকলে।—তুমি আমারে বাঁচাও বু।

আকলিমা আমোদ বোধ কবে, মালেকা তাব পায়ে ধবেছে, এব আনন্দ তো কম নয়, তবুও সে পা ছাড়িযে নেয আর কোণা কু'চে কবে বলে—উদারীও আবাব খোয়াব দেখে! তা বাঁচন না থাকলে মবণ তো আছে লো উদারী?

মালেকা এবার হঠাৎ পাগলের মত উচ্চ হাসিতে ভেঙে পড়ে—ঠিক কইচো বু, বাঁচন না থাকলে মরণ তো আছেই। মবণেই নেউক আমারে। হো হো কবে হাসতে লাগল মালেকা, আব তার দু'চোখ থেকে নেমে এল ঝবণার অঝোর ধারা। আকলিমার মনে হল কী একটা যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে মালেকাব মাথায়।

কিছুদিন পর। মোডলের কাছে শুয়ে আছে মালেকা। হঠাৎ থুথু ফেলতে ফেলতে, দু'নাক কাপড় দিয়ে বন্ধ করে উঠে পড়ে মালেকা—তারপর বমি কবার ভংগীতে গলায় আওয়াজ করতে থাকে এবং সত্যি একবার বমি করে ফেলে।

মোড়লের ঝানু মগজও যেন খেই হারিয়ে ফেলে—বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করে বলে—কী অইছে তোর?

—সুদ খাইও আবো বেশী কইরা। মুখটারে যেন টাট্টি বানাইয়া রাখছে, ঘেন্না এবং বিতৃষ্ণা দুই যেন এক সঙ্গে ঠেলে ওঠে মালেকার হৃদয়পিণ্ড উল্‌টিয়ে।

মালেকার মুখেব দিকে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে মোড়ল। সেই থমথমে গম্ভীর মুখ আর অর্থহীন চাহনীর দিকে চেয়ে মোড়লের সারা শরীরে আগুনের জ্বালা ধরে যায়।—এতো বড় অপমান!—মোড়ল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে—হারামজাদি—বেতমিজির আব

জায়গা পাইলে না বুঝি?—তারপর ধুম্ ধুম্ করে কিলাতে শুরু করে, কিলিয়েও যখন হাতের সুখ মিটল না, খড়ম দিয়ে ঠাস্ ঠাস্ মারতে থাকে মালেকার মাথায—বজ্জাত বদ্‌মায়েশ, আজ তোরি একদিন কি আমারি একদিন।

মালেকা মাটিতে পড়ে গোঙাতে থাকে যন্ত্রণায়—তবু মোড়ল তাকে ছাড়ে না, দু'হাত বাড়িয়ে মালেকা এবার সজোরে আঁকড়ে ধরে মোড়লের পায়, আর করুণায় মোড়লের হৃদয় কাণায় কাণায় ভরে ওঠে।—আহা, উদারা মেয়েটি,—দুঃখ হয় ওকে দেখলে!

কিন্তু করুণা প্রকাশ করবার সুযোগও পেলে না মোড়ল। তার ডান পায়ের গোড়ালি শক্ত করে ধরে সজোরে আকর্ষণ করে মালেকা; মোড়ল ধপ্ করে পড়ে যায় মেঝের ওপর। আর নড়াচড়া নেই মোড়লের—বেহুস, বেকারার!

এবার মালেকার ঠোটে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে মোড়লের মুখের দিকে তাকায়, একটা অদ্ভুত অনুভূতি আসে তার মনে, হয়ত করুণা—হয়ত বা শক্তির উপলব্ধি। বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ যারা মালেকার দুর্দশা উপভোগ কবছিল, তারা সবাই এবার আত্মপ্রকাশ করে এপাশে। তারপর, একটা ভীষণ বোল পডে যায় বাড়ীতে। দিলারা ঘুমিয়েছিল, আক্‌লিমার চীৎকাবে সেও ছুটে এল তার দুধের বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে।

বুকে, মাজা ও মাথায় অনেকক্ষণ পানি ঢালার পর হুশ ফিরে এল মোড়লেব।

তক্ষুণি, নাক-চুল কেটে মালেকাকে বিদেয় দেবাব জনা পরামর্শ দিলে অনেকে। অথচ, সবাইকে বিস্ময়ে অবাক করে দিয়ে মোড়ল মাফ করে দিলে মালেকাকে, বললে— সে অমনি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, মালেকার কোন দোষ নেই।

এরপর থেকেই মালেকার কদর বেড়ে যায় মোড়লের কাছে। কিন্তু মালেকা তাতে উত্তপ্ত হয না, কোন উৎসাহও বোধ কবে না। আগের মতই ভূত-মেরে থেকে সে যন্ত্রেব মত কাজ করে যায়।

একদিন আচমকা আগুন লেগে যায় মোড়লের বাড়ীতে। মালেকা আগুনের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। চারদিক থেকে চীৎকার করে ছুটে আসে মানুষ। হঠাৎ এক অদ্ভুত হাসিতে মালেকার সারা মুখ অসহায় করুণ হয়ে ওঠে। কেউ না দেখে মত সে চুপি চুপি ছুটে যায় ভাঁড়াব ঘরে, কেরোসিন টিন থেকে বোতল ভরে ভবে ঢালতে থাকে সারা গায়। তারপর ....

আগুন নেভাতে-ব্যস্ত একজন লোককে চীৎকার করে বলতে শোনা গেল—সর্বনাশ অইয়া গেছে গো, সর্বনাশ অইয়া গেছে—ছোট বিবি পইড়া গেছে আগুনের মাঝে।

মোড়ল ছুটাছুটি কবে ঘর থেকে এটা-ওটা বার করছে। লোকটির চীৎকার শুনে একবাড়ী লোকের মধ্যেই মাথা থাবড়িয়ে হায় হায় করে ওঠে মোড়ল—হায় হায়রে—কী সর্বনাশ অইলোরে আমার। দুই-দুইডা পরাণরে নষ্ট করলো পাগলী। মোড়ল যেন সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছে আজ। কিন্তু কী-ইবা সে করতে পারে? দাউ দাউ করে আগুন উঠছে আসমানের দিকে; দুটো ঘর ছাড়া আর সবগুলোতেই লেগেছে আগুন, পাড়ার লোকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেগুলো রক্ষা করবার জন্য।

সর্বনেশে আগুনের দিকে চেয়ে মোড়ল ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে।

খড়ম

মুনীর চৌধুরী

মস্‌জিদেব সামনে একজোড়া খড়ম। বাত্রির অন্ধকারে এশার নামাজের পর একে একে সবাই চলে গেছে, সবার শেষে গেছে সবচেয়ে পরহেজগার ফজু ব্যাপারী। মজবুত খড়ম জোড়া তাবই। সারাদিন পায়ে থাকে। অজু কবা দেহ মাটির স্পর্শ পায় শুধু এই এশার নামাজের পব। রাত্রির অন্ধকারে একবার মাত্র খড়ম থেকে পৃথিবীতে নামে ফজু ব্যাপারী। সমস্ত দিনের মধ্যে নোংরা মাটি অজু নষ্ট করবার মত সুযোগ পায় এই প্রথম।

সাড়ে চার টাকা দরে ধানেব মণ কিনে সওয়া চার টাকা দবে বিক্রি করেও নেকবখত আলেম ফজু ব্যাপারীর মণপ্রতি চার আনা লাভ থাকে। সাধারণেব কাছে এ রহস্যেব সমাধান অসম্ভব। এমন কি গ্রামের মাতব্বববরাও কোনদিন এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করতে সাহসী হযনি। খোদাব যে প্রিয় বান্দা, খোদাব রহমতে তার ভাগ্য অনেক রকমেই খুলতে পাবে। গ্রামবাসীবাও তাই বিশ্বাস করত। পাক শবীরে, পাক মনে হালাল রোজগারের চেষ্টা করলে খোদা তাব উন্নতি না করেই পাবেন না। সমস্ত দিনের মধ্যেই সব সময়ে পাক থাকতেও তাবা দেখেছে ঐ একমাত্র ফজু ব্যাপাবীকেই। চালের বস্তার পাশে চৌকিব ওপর পাল্লা সামনে সাবাদিনই তো ফজু ব্যাপারী ওখানে বসে থাকে। অথচ অজু নেই, এমন কথা কোন ক্রেতাই কখনও বলতে পারবে না। যদিই বা এক আধবাব পায়খানা-পেসাব করবাব জন্য তাকে উঠতে হয় তবু আবাব দোকানে এসে বসবাব আগেই অজু করে এসে বসা চাই। মেটে রংয়ের পবিচ্ছন্ন খালি গায়ে ফর্সা লুংগি পরে, মাথায় বাঁশের পরিচ্ছন্ন টুপী পরে হ্যাঁচকা এক টানে তুলে ধরে দাঁড়িপাল্লা। হাঁ কবে ক্রেতাব দল দেখে কি করে অবলীলাক্রমে এক হাতেব টানে পাল্লাটা উপরে উঠে যাচ্ছে। একদিকে আধমণি বাটখারা, অন্যদিকে আধমণ ওজনের ধান। একটুও হাত কাঁপছে না, নড়ছে না। সাদা দাড়িগুলো ফেঁপে উঠেছে, কাঁধে পিঠের পেটানো মাংসপেশীগুলো থরে থরে ফুলে শক্ত হয়ে স্থির হয়ে যায়, পেছনের সুসজ্জিত চালেব বস্তার খয়েবী পাহাড়েব মত। পঞ্চাশ বছরেও অস্থিমাংসের এই অদ্ভুত বলিষ্ঠতা, এ শুধু খোদার হুকুমেই সম্ভবপর। পাক, নেক লোকই এ শক্তিব অধিকারী হতে পারে। কেউ কেউ তাই চালের বস্তা নিয়ে যাবার আগে ভক্তিব আবেগে কদমবুছিও করে ফেলে। ঘুণাক্ষরেও ফজু ব্যাপারীকে সন্দেহ করার মত পাপচিন্তা ওরা মনের মধ্যে ঢুকতে দেয়নি। কোনদিন চালের বস্তা দ্বিতীয়বার ওজন করে তার ওজনের পরিমাপ পরীক্ষা করে দেখবার অসম্ভব কল্পনা ওদের মনে জাগেনি। আর যদিই বা দেখত, যদিই বা সে মাপে কম ধরা পড়ত— তখন ওরা হয়ত নিজেদের চোখকে অবিশ্বাস করত—কিন্তু ফজু ব্যাপারীকে—!

হাটখোলার মধ্যিখানে বিরাট একটা বটগাছ। কচি সবুজ পাতা ভোরের কাঁচা আলোতে ঝলমল করছে। সাদা, ঠাণ্ডা, আটাল মাটিতে গতদিনের হাটের ভাঙ্গা গুড়ের হাঁড়ির টুকরো, বারীদের ফেলে যাওয়া হলদে শুকনো কলাপাতা, শিশিরে ভেজা খড়ের দলা—এমনি আরো বহু ছোটখাট ময়লা এখানে সেখানে জড় হয়ে রয়েছে। সূর্য তখনও পুরোপুরি ওঠেনি। মতি

ডাক্তারের ডাক্তাবখানাব দরজা বন্ধ। উল্টো দিকের বেনে দোকানের মালিক বসির উল্লা কাবী শুধু তার দোকানের সামনের জাযগাটুকু ঝাড় দিয়ে ঘরেব ঝাপি তুলে, শুপুরি গাছের তক্তার মাচায় বসে সুর করে কোরান শবীফ পড়ছে। পাকা বটফলের গোটা খেয়ে বটঘুঘুর ঝাঁক তখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। স্বল্প সূর্যের আলোয় ওদের নরম পাখা তেতে উঠে। পত্ পত্ করে হলুদ মাখান ছাই রংগা পাখীগুলো ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

কাঠের পুলের উপর দিয়ে খড়ম ঠুকে খালের ওপাব থেকে ফজু ব্যাপারী আসছে। পুলের মধ্যিখানে একবার থেকে নিয়মিত গলায় জিজ্ঞেস করল—

ঃ কৌগা হাইলি আইজ?

ঃ অনতাই ছৌগা।

পুলের নীচ থেকে উত্তর দিল কালা মাঝি। মাথার উপর লুংগি জড়ানো, উলঙ্গ বলিষ্ঠ দেহ নাভি পর্যন্ত পানির মধ্যে, দু'হাত দিয়ে কাঁটাঝোপ সরিযে একটা বাঁশের 'আন্তা' তুলছে। আর তার মধ্যে একটা এক বিঘত লম্বা শ্যাওলাপড়া পুষ্ট চিংড়িমাছ ছপ্ছপ্ করে লাফাচ্ছে। মনে মনে কালা একবার ব্যাপারীকে ছালাম করল। নেক লোককে দেখলেও ববাত ফেরে। বাকী 'আন্তা'টা দেখে ঠিক করে কালা লুংগি জড়িয়ে উঠে পড়ে। আটটা চিংড়ি হযেছে। কিন্তু শুধু চিংড়িমাছ দিয়ে কি হবে? অসুখে পড়া মেয়েটা কি খাবে? আগুনে পুড়িয়ে মবিচ দিয়ে সে নিজে না হয় এক বেলা চালিয়ে দেবে, কিন্তু মেয়েটা? একটা চিংড়ি হঠাৎ তার মৃতপ্রায় লম্বা ঠ্যাংয়ের চিমটি দিয়ে কালার হাতের গোশত কেটে বসিযে দেয।

মেয়েটার ক্ষুধার চীৎকার ভোবরাতে তার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে। বৌকে সে তাই লাথি মেবে ঘব থেকে বেবিয়েছে। বেবিয়েই মনে হয়েছে, লাথিটা তার নিজের গায়েই মাবা উচিত ছিল। বুকে দুধ থাকলে আবফানী মেযেটাকে খাওয়াতে পারে। কিন্তু না থাকলে? মাযের গোশত মেযে খেলে, বোধ হয তাও পাবতো। কালা শিউবে উঠে। আবফানীব বিয়ে হযেছে মাত্র বছরচাবেক হবে, কিন্তু ওব বুকের দিকে চাইলে কালার নিজের বুকই কেঁপে উঠে। কেমন যে বাদুড়ের মত কুঁকড়ে চেপ্টে আছে।

ঃ বেগগুন কি ইছা নিরে?

ডাক্তারখানা থেকে বেরিযে প্রশ্ন করল মতি ডাক্তার। কালা মাথা নাড়ল, বোজকাব মত ভয়ে ভযে। মতি ডাক্তার কি বলবে তা সে জানত, শুনতে শুনতে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। চিংড়িমাছ নাকি পানির পোকা, ওতে রক্ত নেই। চিংড়িমাছ ক্রমাগত বেশী খেলে নাকি বক্ত সাদা হয়ে যায়, রক্তে পোকা হয়—কিন্তু তাব ঐ 'আন্তায়' এ সময়ে খালে যে চিংড়ি ছাড়া আব কিছুই উঠে না। সে কি করবে?

ঃ কাইল যে তোর মাইয়ার লাই কুইনাইন মিক্চার দিলাম হেইডাব হৈযসা কৈরে কালা?

বলতে বলতে মতি ডাক্তার ওর হাতের খলুই থেকে গোটা চারেক বাছাই-করা বড় চিংড়ি তুলে নিয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে মাছগুলোকে নিরীক্ষণ কবে সে বলতে থাকে—

ঃ একছার গুড় গুড়া এনা। তা'আ কাইল আরও চাইরগা দিছ, হেইলেই সইরব।

বলে ডাক্তারখানার মধ্যে পা বাড়ায। কালা কোন রকমে উচ্চারণ করে—

ঃ ডাগদর সাব, আঁর মাইয়া বাঁইচব ত?

ডাক্তার মুখ খিঁচিয়ে উঠে—

ঃ বাঁইচত ন' ক্যা? বাঁইচব। খোদা বাঁচাইলে বাঁইচত ন' ক্যা।

কালা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

ঃ হাক্করি চাই রইছত ক্যা? খাওয়া, খাওয়া। খাওয়াইলেই মানুষ বাঁচে, বুঝ্যত? তোর মাইয়া বাঁইচব।

কালার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে। সে টলতে টলতে সরে যায়। ডাক্তাব তখনও গর গর করছে—

ঃ বাঁইচত ন' ক্যা? বাঁচে কিন্তু ক্যাল আঁর কুইনাইনের হানি আর ইছা খাই বাঁচে না।

দু'হাত দিয়ে কালা দু'কান চেপে ধরে। শেষেরটুকু সে শুনতে চায় না। নিজে জানলেও ডাক্তারের মুখে সে কথা সে শুনতে চায় না। একবার ইচ্ছা হয় এমন কথা বলবার আগে বাকী চিংড়ী ক'টাও ছুঁড়ে মারে ডাক্তারের মুখে। চিংড়িগুলো সে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবে না। বৌকে সে আজ খেতে দেবে, মেয়েকে সে আজ খাওয়াবে—সাদা চিংড়ি নয়, সাদা চাল, সাদা দুধ। যা খেলে মানুষ বাঁচে, রক্ত লাল হয়।

হঠাৎ ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের দিকে চোখ পড়তেই সে আঁৎকে উঠল। কেবোসিন টিনের দোকানের কালো বেড়ার উপর চুন দিয়ে লেখা—"এখানে মওতের কাপড় বিক্রি হয়।" ছোট কালের বাড়ীর পাঠশালায় শেখা বিদ্যার উপর ও যথেষ্ট নির্ভর করতে পাবে না। ফজু ব্যাপারীর চালের আড়তে মওতের কাপড় অর্থাৎ কাফনের কাপড়—কবর দেয়াব আগে যে কাপড়—

ভেতব থেকে দেখতে পেয়ে ফজু ব্যাপারী জিজ্ঞেস করে—

ঃ চাই রইছস্ ক্যা? লইগব নাকি কোনডা?

ঃ না, না।

কালা কোন বকমে চীৎকার করে উঠে।

ঃ তোব মাইযা ভালা নিবে আইজ্?

ঃ আইন্যেগো দোয়া, আইন্যেগো দোয়া—বলতে বলতে কালা ছুটে হাটখোলা থেকে বেবিযে যায। যাদেব স্বাস্থ্য সুন্দর, যাদের পবণের কাপড পবিষ্কার, যাদেব দেহ্ 'অজুতে' পাক—তাদের কাছ থেকে কালা পালিয়ে বাঁচতে চায। ফজু ব্যাপাবীর মুখে তাব মেযেব অসুখেব খোঁজ থেকে সে ত্রাণ পেতে চায়।

চাল না নিযে আজ সে বাড়ী ফিরবে না—এ সমস্যাব সমাধান হল মুন্সী বাড়ীর বৈঠকখানায়। আধখানি জমি যদি সে নিড়াতে পারে তবে দেড় টাকা পাবে। তাও খোবাকী ছাড়া। কালা বাজী।

সকাল গড়িয়ে দুপুরেব রোদ মাথাব উপব তেতে উঠে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে, প্রায় হাঁটুজল ময়লা গাঁজাল পানিতে দাঁড়িয়ে কালা আগাছা উপড়ে চলেছে। রোদে পুডে পিঠের চামড়া চড় করছে। হাতের টানে এক আধ ফোঁটা পানি তাই গায়ে পড়লে সারা গা শিব শিব করে উঠে। মনে হয় যেন জ্বর আসছে, কাঁপুনি দিয়ে।

দু'দিনেব অভুক্ত পেট। দু'রাত চালের দুঃস্বপ্ন-দেখা চোখ ঘোলাটে হযে আসে। কচি ধানের সবুজ আর ঘাসের তামাটে সবুজ সব ওলট-পালট হয়ে যায়। ঘাস টানতে ধানেব গোছা উপড়ে ফেলছে। দু'হাতে রগ টিপে কালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখ মেলে দেখে সামনের সীমাহীন বাকী জমিটুকু। সবুজ জল-ফড়িংগুলো নাড়া পেলেই লাফাচ্ছে।

হঠাৎ ওর মনে হয় আজ না জুম্মার দিন? জুম্মার নামাজ তো সে কখনও বাদ দেযনি। আজ সে নামাজ পড়বে, আজ তার জীবনে উৎসব। আজ সে টাকা দিয়ে চাল কিনবে, দুধ কিনবে। রাস্তার উপরে এসে কালা আচমকা থেমে পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠে। নিজের ভুলে নিজেই ও হেসে ফেটে পড়তে চায়। বাড়তি লুংগি তার শেষ হয়েছে যেদিন থেকে সরকারের পেয়াদা এসে তার কেরায়া নৌকা পঁচিশ টাকা আর ভবিষ্যতেব

অনেক প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পরনে লুংগিটা পরেছে একাধারে হপ্তাতিনেক ধরে। লুংগি পাক থাকবে কি করে? সেত আর ফেরেস্তা নয়? আর বৌয়ের সঙ্গে সেত ল্যাংটা হয়ে সংসার করতে পারে না যে রোজ ভোরে গোসল সেরে পাক লুংগি পরে সে ঘর থেকে বেরুবে? হাসতে হাসতে মুখ নীল হয়ে উঠে। আরো কালো হয়ে উঠে যখন অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেল তার বৌ আরফানী চীৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে আসছে। পেছন ছুটতে ছুটতে আসছে ফজু ব্যাপারী আর গ্রামের দু'চারজন গণ্যমান্য লোক। আরফানীর কাপড়ের বাঁধনে না আছে ইজ্জত, না আছে আব্রু। কালা মাঝির চোখের সামনে সমস্ত দিগন্ত জুড়ে হা হা করে, কানফাটা আর্তনাদ করে ছুটে আসছে।

কিছুই হয়নি। দিন চার ধরে অনবরত কেবল কয়েক ফোঁটা করে কুইনিন মিক্‌শ্চারে বেঁচে থেকে এই ভোরবেলা কালার মেয়েটা ছটফট করে মরে গেছে।

ঘরের দাওয়ায় কালা গুম হয়ে বসে আছে। দু'হাতে মাথা গুঁজে পায়ের দিকে মরা চোখে চেয়ে দেখে সেখানে একটা জোঁক অনেকক্ষণ ধরে রক্ত চুষে পেট ফুলে উল্টে পড়ে আছে। সেই একটুখানি ক্ষীণ রক্তস্রোতের চারপাশেব চামড়া পচা পানিতে ভিজে কেমন যেন সাদা আর ছ্যাকড়া-ছ্যাকড়া। ঘরের ভেতর থেকে আরফানী থেকে থেকে গোংগায়—

ঃ আঁই ভাত খাইয়ুম। আঁই মইত্তামন, আঁই মইত্তামন, আঁই ভাত খাইয়ুম।

কালা পা'টা একবার নাড়ে। দেখে নড়ে কিনা, মাববাব জোর আছে কিনা। ফজু ব্যাপারী চলে গেছে। ফজু ব্যাপারীই দয়া কবে সব করে গেছে। মায নিজের দোকান থেকে কাফনেব কাপড়টুকু অবধি ধার দিয়েছে। যাবাব সময শুধু আবফানীকে বলে গেছে—কাফনেব কাপড় বাকী বাখা গুনাহ্। ওতে মুর্দার রূহ কষ্ট পায। কাফনের বাবদ বাকী তিনটাকা তাই যেমন করেই হোক কাল ভোরেই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আরফানী আবার কাতরাচ্ছে।

ঃ আঁই মইত্তামন, আঁই মইত্তামন, আঁই মইল্লে আঁরও কাফনের কাপড়ের দাম বাকী থাইকব। আঁই—

কালাব পা মাথা সব ভারী হয়ে আসছে। কিছুই আর নড়তে চায় না। কানের কাছে আরফানীর অসংলগ্ন বিলাপ ওর স্নায়ুতন্ত্রীকে ঠাণ্ডা করে আনতে চায়। কোন রকমে দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে একবার ঘরের দুয়াব অবধি আসে, তাবপব সন্ধ্যার আবছা আঁধারে পথ হাতড়ে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে কালা চলতে শুরু করে দেয। দু'চোখ আটাল হয়ে বুঁজে আসে একটা অদ্ভুত, ক্লান্ত, শ্লথ ঘুমে।

বৃষ্টির ছাট লেগে যখন চোখ মেললে তখন দেখে চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। খালপাড়ের মরা তালগাছটার গোড়ায় মাথা দিয়ে সে শুয়ে। চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। শুয়ে শুয়েই সে সব কথা মনে করতে পারল। হাত পা সব ব্যথায় টন টন করছে।

মস্‌জিদেব কাছে এসে হঠাৎ কি মনে করে তার সামনে বসে পড়ল। তক্তাব আর মাটি সিঁড়ির সামনে। এশার নামাজও তখন শেষ হয়ে গেছে, সকলে চলে গেছে। সামনের সিঁড়ির ওপর একজোড়া খড়ম। শক্ত। বড়। ফজু ব্যাপারীর বলিষ্ঠ পায়ের দাগ। মসৃণ কাঠের উপর আরো কালো হয়ে ছাপ পড়েছে। পানি আব চামড়ার ঘষায় সে সুস্পষ্ট দাগের গর্ত থেকে আঙ্গুলগুলো স্পষ্ট গোণা যায়। গুণতে গুণতে কালা মাঝির চোখ জ্বল জ্বল করে উঠে। বিড় বিড় করে উঠে ঃ আঁই মইত্তামন, আঁই মইত্তামন।

নিঝুম রাত্রির আঁধারে পা টিপে কালা মাঝি ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের পিছন দিকের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা টিন নিঃশব্দে টিপে দেখছে কতখানি মজবুত। সড়াৎ করে সে হাতটা সরিয়ে নিল। ভেতরে যেন কারা আছে। কারা যেন নড়ছে। কালা কান পেতে টিনের সাথে চেপে ধরে, ধানের রোঁয়া রোঁয়া গন্ধ এসে কালার স্নায়ু বিবশ করে দিচ্ছে, আর ভেতর থেকে দ্রুত নিঃশ্বাসস্পন্দিত শব্দ।

ঃ আহ! করস্ কি, এমুই সরি আয়। কাফনেব উপর হুচ্ছত ক্যা? এমুই কাইত্যাই আয়।

খিল খিল করে একটা মেয়ে হেসে উঠে—

ঃ কাফনের কাপড় হি-হি-হি-হি—বাঃ হেমুই যে আবার তঁর চাইলের বস্তা। আঁই ইয়ানেই হুইত্তুম, চাইলের বস্তার লগে ঠেস দিলে আর ডর কইত্ত, না, হি-হি-হি-হি।

আরফানীর বিকৃত হাসির কাকলিকে নিষ্পেষিত করে গর্জন করে উঠে ফজু ব্যাপারীর স্ফীত নাসার তপ্ত প্রশ্বাস।

পরের দিন ভোরের বেলায় বটঘুঘুর ঝাঁক যখন বোদের আঁচ পাওযা মাত্র উড়ে চলে গেছে, যখন সদ্যস্নাত শান্ত সৌম্য ফজু ব্যাপারী তার দোকানে এসে বসেছে, তখন ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল কালা মাঝি। কোমব থেকে একটা দশ টাকার নোট বেব কবে ফজু ব্যাপারীর সামনে রাখল। পরিচিত নোটের ভাঁজে সস্নেহে হাত বুলিয়ে ফজু ব্যাপারী প্রশ্ন করল—

ঃ কাফনের বাকী দিতে আইলা বুঝি বাবা।

ঃ জি!

ঃ আর কি দিউম? কিছু চাইল?

ঃ না, বাকী ট্যায়া দিয়া কাফনেব কাপড় দেন।

চমকে উঠল ফজু ব্যাপারী।

ঃ কাফনের কাপড়! কার লাই?

ঃ আরফানীর লাই।

চমকে উঠেছিল শুধু এক মুহূর্তের জন্য,—তারপই ফজু ব্যাপারী পরিচ্ছন্ন হাতে কাপড কাটতে শুরু করে। সাদা কাপড, প্রমাণ মাপেব স্ত্রীমুর্দাকে আগাগোড়া মুড়ি দেবার জন্য যতখানি দরকাব।

ভাতুয়া

মহাশ্বেতা দেবী

এবার ছিল দুরন্ত খবা, খেত-মাঠ জ্বলে গিয়েছিল। ধান তো হয়ই নি বলতে গেলে। কিন্তু কালী গরায়ের জমিগুলিতে পাকা ধানের শোভা দেখতে দেখতে কালীর ভাতুযা পবনেব মনে হল মনিব তার ডাং-পিশাচসিদ্ধ বা হবে। নইলে খাল নেই, বড় নদী নেই, এই খরা! আকাল এলো বলে—একা তার মনিবের খেতে এত ধান হল কেমন করে? মনিবের খেতে এত ধান! টাহালগুলি এবার ভরে যাবে। পবন টাহাল কেড়ে নিকিয়ে রেখেছে সেই কবে। পৌষে মনিব্যান টাহাল পুজো করে রেখেছে। ধান উঠলে নবান্ হবে, তখন নোট বাঁধা হবে।

আর নবান্! আকাল বুঝি এল। বড়ান্ মায়ের অঙ্গ ফেটে বক্ত ঝরছে, নিশিন্দা বুড়ি দেখে এসেছে মায়ের ফাটা অঙ্গে লাল পিঁপড়ে বাইছে। গ্রামলক্ষ্মী দেবী তো, আকাল এলে জানিয়ে দেন।

এ সব কথা শুনলে পবনেব স্কুলে বিত্তি-পড়া ছেলে ভগীবথ বলে, হাঃ! জানাযে দেয। আকালের কথা জানায তো আকালের উপায কিসে তা জানায না কেনে?

পবন বলে, মায়ের বঙ্গে লাল চুটি বায়। জানিস?

পিঁপড়ার বাসা কি চারিদিকে। তুমার মনিব মায়ের থানে দুধ ঢালে, তাতে ভি পিঁপড়া বায়।

তু সব জানিস?

পিঁপড়া সরাব। দেখ কেনে?

কি করবি?

"লাও মা জনুনী" বল্যে মায়ের মাথায় কেরাচিনি ঢেলে দিব। দেখি পিঁপড়া থাকে কেমুন?

পবন এ কথায় মাথা নেড়ে বলেছিল, সকল কেরাচিনি মনিবেব ঘরে। উ পঞ্চায়েতে সামিল হচ্ছে, খাতিরেব মানুষরে দেয়। তু কুথা পাবি কেরাচিনি?

উ কুথা হতে পেল? মোরাদেব তরে কেরাচিনি, রসিদ দেখায হপ্তা পিছু দিতেছে, কিন্তুক কারো একবার মাসে, কারো দশবার, উর ঠেঙ্গে লিব।

উর সাথ বিবাদ কর্যে না ভগীরথ!

বড় কাতর শোনায় পবনের গলা, বড় আর্ত। দু চোখে ওব ভয় চমকায়, দুই ঘোলা চোখে। একবেলা জল খাই, একবেলা ভাত আর বছরে একশো বিশ টাকার কড়ারে যে ভাতুয়া খাটে কালী গড়ায়ের বাড়ি, সেই ভাতুয়ার মনে 'মনিব' শব্দটি সম্পর্কে এমন ভয় থাকে বটে।

ভগীরথের বুকে ওই লোকটার জন্যে দুঃখ আর লোকটার চোখে ভয় দেখে রাগ একই সঙ্গে ফোঁসে। ভগীরথ ঘরের জীর্ণ ঝনকাঠটি চেপে ধরে নিজেকে সামলায় ও বলে, না না বাবা, বিবাদ করব কেনে? কথার কথা বললাম বই তো লয়। আর—একটু হেসে পরিস্থিতিটি

হালকা করে বলে, তুমার উ বড়াম মা মরুক কেনে পিঁপড়া কামড়ে? আমার কি? আমি উবে দেখতে যাব?

ই-ভি তু আগে বলিস নাই, এখুন বলিস। জামু গ্রামের জনুনী উ বড়াম মা। বান এলে উনি থামাবে, খরা এলে রঙ্গে টেনে নিবে—

উ তুমি যা শুন্যে বড় হল্যে, তাই বল বাবা। আমি ভি যা শুনছি তাই মেনে গিছি এতকাল—

এখুন মান না কেনে বাপ?

মন ল্যেয় না।

উ অধর বাবু তুমারে লাচায়। উব কথায় ল্যেচে না, অ মোর বাপ, এতকাল সবারে লাচাল, লকসালীতে জেহেল গেল বুঢা বয়সে—তার বেত্তান্ত জানে না কে? এখুন ভি ঘরে বয না। ছাইকেল লয়ে ঘুবে বুঢ়াদেব ধরে এনে পড়াতেছে—উরে ডরে মনিব।

ডব্যে ডর্যে তু কি পোকপতংবে ভি ডর খাও বাবা। অধর বাবুরে ডব্য কেনে? কুনো মন্দ কাজ্জ কবে না সে, নিজ্জ ঘবের ছামুতে মানুষজনরে পঢ়তে শিখায়, আইন বুঝায়।

বই হাতে ঘুর্যে কেনে? তখুন উর ঘরে বই দেখলে দারোগা কত লাচত মনে নাই?

বাবা! ই সকল গোরমেনের বই। আইনেব বই। বর্গাদারের হকটো বুঝি নিতে পারে আইন জানলে— খেত মজুরটো হক বুঝি নিতে পারে আইন জানলে— মোরা কিছু জানি না বাবা।

মোরা বর্গাদার লই ভগীরথ! খেত মজুব লই—ভাতুযাব তবে কুনো আইন নাই।

আমি শুধাব তবে?

আজ, মাচায় বসে মনিবের পাকা ধান পাহাবা দিতে দিতে পবনের সব-কথা আবার মনে পড়ল। নিঃশ্বাস ফেলল ও। ভাতুয়া কি মানুষ না কি? বর্গাদার বা খেতমজুর নয়—তাই তাকে বাঁচাতে কোন আইন থাকে না। ভাতুযা আছে, ভাতুয়া থাকে, কিন্তু ভাতুযার কথা কোন সরকার ভাবে না। ভাতুয়া থাকতে আছে, সমাজে স্বীকার করতে নেই তার অস্তিত্ব।

একটা মানুষ কিছু জানে না, সে ছোট ছেলে। তার বাপ গরাইদের ঠেঙে আটশো টাকা ধাব নিল। না নিলে তার জমি বাঁচে না। আটশো টাকা সে শুধতে পারবে না, ছোট ছেলেকে কবে দিল ভাতুয়া। বলল একবেলা ভাত দিবেন বাবু, একবেলা জল খাই। আর বছবে একশত বিশ টাকা মাইনা।

বাবুরা বলল, সাত বছবের ছেলে তোমার। এখন ছাগল চরাবে, হাঁস চরাবে, বাড়ির কাছে। এখন মাইনে হয় না। এখন ওকে দিয়ে ক পয়সার মজুরি পাব?

বাপ বলল, ভাতে-জলপানে থাকুক। বারো বছর হল্যে মাইনা দিবেন মশায়। হাতে দিবেন না। উ টাকা কাটান দিবেন ধার হতে।

তাই হল। টিপছাপ দে।

সে আদ্যিকালের কথা। ছাগল চরাত পবন, হাঁস চরাত। দিনে ভাত খেত, রাত হলে কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে ঘরে ফিরত।

পবন কাঁদত। বলত, মাবে বাবু! দুপার যেয়ে বিকাল হয়। তখুন ভাত দিবে। খিদা লাগলে কিছু দেয় না, চড় মাবে, লাথ মারে। আমি রব না হোথা।

বাপ প্রবোধ দিত, ক-বছর বাপ? তোর বয়স এক কুড়ি না হতে টাকা শুধে যাবে। বাস ঘরের ছেলা ঘরে রবি।

বাপ হিসেব করে নিয়েছিল অধর বাবুর বাপের কাছে। অধর বাবুর বাবা বলেছিল, বারো বছর বয়েস থেকে উনিশ বছর বয়েস অব্দি সাত বছরে আসল টাকা শোধ হবে গো। মজুরিতে সুদ কেটে যাবে। যদি ওরা শর্ত মানে।

উনিশ কেন, আজ পবনের বয়েস বিয়াল্লিশ হল। তিরিশ বছরে রাতদিন খেটে সেই আটশো টাকা শোধ হয়নি। পবনের বিয়ের সময়ে দুশো টাকা ধার নিতে হয বাইশ বছর আগে। তাতে না কি সুদে আসলে অসাগর টাকা জমে গেছে। পবন মাইনের টাকাও হাতে পায় নি, বাপের সে জমিও গরাই বাবুদের পেটেই গেছে। বউটা গরাই বাবুদের বাড়িতেই গোয়াল কাড়ে। বাইরের পাটকাজ করে। আর খেত গুড়োয়। ঝরে-পড়া ধান গুড়োয়। মনিব্যান অনেক বলে দেখেছে, বউ ভাতুয়া হতে রাজী হয় নি।

ভাতুয়া হব নাই। গুলাম করে রেখ্যে দিবে গ! ভগীরথেব বাপ মোরে জনম দুখ দিল।

খরখর করে বউ। খর দড় গতিতে কাজ করে। বউই অধর বাবুর কাছে হেঁটে হেঁটে তাঁর পা ধরে ভগীবথকে প্রাথমিক স্কুলে ঢুকিয়েছিল। মনিব তাতে রেগে যায়। কিন্তু অধব বাবুর বাবাও ছিল স্বদেশী-করা মানুষ, ছেলেও তাই। ওর বাড়িতে ভগীরথ ভাতও খেত। স্কুলে ঢোকার সময়ে ভগীরথের বয়স দশ। অধরবাবু বলল, তুমি বাপু স্কুলঘব রোজ ঝাঁটপাট দেবে, কাজ হল তোমার। পড়বে. আর হ্যাঁ, আমার বাড়িতেই খাবে।

স্কুলও অধববাবুর তৈরি। তাঁরই বাড়িতে। আর পোড়োদেব জমির ধানের ভাত খাইযে ছাত্র ধরে রাখার পরিকল্পনাও তাঁর। তাঁর অশৈল কাণ্ড-কারখানায তিতবিবক্ত হয়ে বউ অনেক দিন ধরেই বাপের বাড়ি প্রবাসী। অধরবাবু জেলে থাকতে থাকতেই বউ মবে গেল।

ভগীরথেব মত অনেক ছেলেই ওই স্কুলে এল গেল। কিন্তু ভগীবথটা যেন ওঁব চেলা হযে গেছে। অধরবাবুকে মুরুব্বি ধরে কি হবে কে জানে? উনি বললে কি ভগীবথেব কোন কাজকর্ম হবে কোথাও? এখন না কি ওকে টিকে ইঞ্জেকশান দিতে শেখাবেন সদবে পাঠিযে।

অধরবাবু ভগীবথেব মানামান্যিব লোক। অধববাবু সকলকে আইন বোঝাচ্ছেন, পড়তে শেখাচ্ছেন, 'হকটো বুঝি নিতে পাবে' যাতে। ভাল। খুব ভাল। কিন্তু অধববাবুও পাবে না সব কিছু। ভাতুযা পবনের জীবনেব দাসত্ব ঘোচাতে পাবে না অধববাবু।

মাচায় বসে পবন মাথা নাড়ল বাব বাব। আঃ। কত ধান! চোখটা কেমন করে যেন, তাই সোনালী ধান মনে হয সোনার নাচন্ত সাগর যেন। অধরবাবু অনেক পাবত এক সময়ে। গ্রামেই থাকত না তখন। কোথায় কি কবে বেড়াত কে জানে। কিন্তু গ্রামে এসে যখন মনিবকে বলল, কালীবাবু! সময় খুব মন্দ। ধান কাটাচ্ছ, বেশ কবছ, সবাবে সবকারী হিসাবে মজুরী দিবে। নয তো ধান গোলায উঠবে না।

পবন ভয়ে চোখ বুজেছিল। বাপ রে! মনিবকে অমন তেড়ে শাসিয়ে কথা বলা? কিন্তু মনিব মেনে নিয়েছিল সব। তিন বছর মনিব খুব ভাল হয়ে গিয়েছিল। পবনকেও খেতমজুরদেব সঙ্গে দুপুরে ছুটি দিত। জলখাই দিত গবম ভাত।

এ সব সাহসেব কাজ অধববাবু পেরেছিল। কিন্তু ভাতুয়াটো, গুলামটো করি দিছে বাপ— ভাতুযা জীবন হতে বাহার করি আনতে তুমি ভি পার না গ অধরবাবু। পুব আকাশ লাল হতে মনিব বাড়ি আসব আব বিহানের জলপান 'শালা কামচোর ভাতুয়া' গাল! আর পুবা দিন রাত অবধি খাটব গ। লাথ খাব, গাল খাব, ই হতে বাহার করি আনতে পার না গ অধরবাবু।

এখুন চক্ষে ভাল দিশি না সি বলতে ভি ডরো যাই। এত আইন দেখতেছ ভাতুয়ার তরে আইন নাই? ধান পওরা দিতে দিতে— মনিবের ধান পওরা দিতে দিতে—আমি কত হিসাব কষি।

সুদের হিসাব নয়। ভাতের হিসাব। ধানটো তো ভাতই হল, না কি বল? তা ভাতের সাগর পওরা দেই।

কত ভাত। কত ভাত—আর ই সব জমিনের মাঝে তো বাপেব তিন কুড়া ভি সামিল আছে—তা এত ভাত দুনিয়াতে—ভাতের তরে ভাতুয়া তবে কেনে পবন? কেনে এমুন বেহিসাব ই হিসাবটো? অধরবাবু! ভগীরথ মোর বেটা। তুমার কথা চিন্তো মোর বুকে ভি বান ডাকে—কিন্তুক। চক্ষে দিশে না ভাল—আব ভাতুযা হয্যে কোমরটো ভাঙি গিছে, তাতে সব বুঝাতে পারি না। ডব্যে যাই। নিজেরে ডর খাই। ই কি। ভাতুয়া এত কথা চিন্তে কেনে? মনিব জানলে কাঁচা কঞ্চিতে চাম ছিঁড়ি দিবে যি?

আঃ! ধান দেখলে পবনের এত কথা মনে হয়। মাচায় বসে বসে ও ভাবে আব ভাবে।

২.

অধরবাবু বললেন, ভগীবথ, তোমাকে যেন চিন্তিত দেখছি ভীষণ। কেন বল ত?

ওরা হাঁটছিলেন। বনেব পথ ধবে। জামু গ্রামটি খুবই ভিতরে ঢোকানো। বেলে নদীর এ-পার ও-পাব জুড়ে এখনো জঙ্গল আছে। বনেব পথে চলাফেবা করাই সুবিধেব। ব্লক আপিস, বড় স্কুল, পঞ্চায়েত আপিস, সবই বেলেগ্রামে। বেলে আর গ্রাম নয়, গঞ্জ এখন। থানাও ওখানে। ওঁবা বেলে থেকেই ফিরছিলেন। অধববাবু হাঁটাহাঁটি কবছেন যাতে এ বছর জামুর মত অরাজনীতিক, পিছিয়ে-থাকা জাযগায সবকাবী খেতমজুব শিবির হয়, সে জন্যে। সেটলমেণ্ট অপিসে। ভগীরথ ওঁব সঙ্গেই থাকে। অধরবাবুর প্রশ্নে ভগীরথ চমকে উঠল না। অপ্রতিভ হেসে বলল, বাবাব কথাটো ভাবি।

কি ভাব?

অনেক কথা মনে উঠি গিছে।

কি হযেছে পবনেব?

আপনি তো আমাদেব হক লযে লড—

কি ব্যাপাব, বল তো?

আগে আপনাব মুখে এত আইন বুঝাবাব কথা শুনি নাই। পড়া শিখাবাব কথা শুনি নাই—

এখন কেন শোন। তাই তো?

হ্যাঁ মাশায, তুমি বল, আমি শুনি।

চল, নদীব পাড়ে বসি।

ঘরে চল আপনি। বাতাসটো হিম জোড়া এখুন।

চল। তবু তো এখানে ঠাণ্ডা পডছে। ঠাণ্ডা পড়বে। কিন্তু শহবে ঠাণ্ডা নেই, জল না হইলে ঠাণ্ডা পড়ে?

হিম জাড়ায় দিনমানে বোদ সেঁকি। সাঁঝে কাঠলতা জ্বালি, আর গবাই বাবুবা শীতে সাজন কবে কত। বাবারে কুনো দিন শুধায় না, হ্যাঁ পবন, গাযে দিতে কিছু আছে? ছিঁড়া পিঁজা লেপ একটো চেয়েছিল বাবা, বলল, কিনে লে।

ওরা বন পেবিয়ে জামু ঢুকল। ভগীরথ বলল, আপনি আগাও, আমি মায়েবে কেরাচিনটো দিয়ে আসি। না, ই ঠিক হছে নাই, কালী গরাই বড় মাতববী করতেছে। কেরাচিনি দেয় না কেনে?

ওব বা কি দোষ বল? চিবকালেব বড় চাষী, চিরকালের মাতব্বর কেমন সুড়সুড়িয়ে ঢুকল পঞ্চায়েতে—অ্যাঁ? পার্টির দিলীপ, রাজেনবাবু সব জেনেও কেমন মেনে নিল। আব তোমরা কি দেখলে? এ সরকাবের আগেও কালী গরাই ছিল মাতব্বব। এখনো সেই মাতব্বব।

ভোটে ইরাই জিতবে। না জিতলেও কালীবাবুই মাতব্বর র'ত হেথা। উ জামু গ্রামের সুরুজ। উয়ারে না দেখে মোরাদের উপায় নাই। সরকার বদল, পার্টি বদল, কালীবাবুর রবরবা একোই থাকে।

গম্ভীর হয়ে গেলেন অধরবাবু। বললেন, বলেও এসেছি। হাঁটছিও অনেক। কালীকে বলব না আমি, তাহলেই বলে, আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কেরোসিন এখনি। বাপরে, আপনি নিজে এলেন কেন?

ডব খায়। ভাবে তখন লকসালী উঠেছিল, মৌজা কাঁপায়ে দিচ্ছিল, এখুন ভি আর আর মৌজা গরম, জঙ্গল মহালে বাস। তাই তখুন তো পলায়ে গিছিল সেই হাওড়া।

ভগীবথ বাড়ির দিকে গেল। অধর নিজের বাড়ি ঢুকলেন। বাড়িব সামনের ঘরে স্কুল। পিছনের ঘরে ওঁর আর ভগীরথের বাস। পৈতৃক ধানজমি উনি বহুকাল হল মাহিন্দারদের দিয়ে রেখেছেন। ওরাই ওঁকে খোরাকী ধান দিয়ে যায়। পুবনো মাহিন্দার গোকুলের বউই রাঁধে। ওঁর, ভগীরথের ও পোড়োদের ফ্যানভাত। স্কুলেব মঞ্জুরি মিলেছে, এখন মাষ্টারের মাইনেও সরকার দেয়। মাষ্টারটি গরাই বাড়ি থাকে ও ও-বাড়িব ছেলেদের পড়ায়। অধরের গর্ব, মাষ্টারও একদিন এ স্কুলে পড়ত।

ভগীরথ ফিরে এল, দুজনে খেলেন ওবেলার ভাত ও কাঁচকলার তরকাবি। কাঁচকলা, পেঁপে, এগুলি ভগীরথের চেষ্টায় ও শ্রমে বাড়িতেই হয়।

বিড়ি ধরিয়ে অধরবাবু বললেন, তুমি তখন বললে ভগীরথ, কথাটা এই বকম—তখন আন্দোলন করাতে গিয়ে এটা বুঝেছি—কোন্ কোন্ হকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে তা তাকে বুঝতে হবে। আইনটুকু বাংলায় লেখা, সেটা পড়ার মত লেখাপড়া শিখতে হবে। যাদের লড়াই তারাই লড়াইয়ের কারণ-টারণ বুঝে নিক। নিজেরা লড়তে পারবে। খেতমজুরদেব কথাই ধর না কেন—

আইনের পথে বিশ্বাস যেছ যদি, ভোটটা মানি নিছ না কেনে?

ভোট দিযে কিছু হবে বলে বিশ্বাস কবি না ভগীবথ। ভোটে যে জিতুক, তোমাদেব হক তো বুঝে নেবে?

হাঁ, তা বুঝছি।

আইন-টাইন জানার জন্যে পড়তে শিখুক না। পডতে শিখলে পড়ার জিনিস আরো আছে।

তা তো জানি মশায়। পড়তে জানি নাই বলে তো মোরা মালিকের হাতে মরি, আদালত যেয়ে ভি মরি।

তবে আর কি। বুঝলে তো!

আমি শুধাই বাবাটোর কথা।

কি কথা?

খেতমজুর, বর্গাদাব—হাঁ হক মিলে নাই বটে, তবে নামে চিনা যায় ই জন কারা। আর আইন ভি হচ্ছে। কিন্তুক মাশায— ভাতুয়াটো, সেও তো আছে? ভাতুয়া করি বাখে যেমুন গোলাম করি রাখে। ভাতুযার দিনরাত খবিদ করি লেয়। ভাতুযাটোর কথা ভি স্বীকার যেছে না কেনে গোরমেন? আইন কবি দিছে না একটো? নাই কেনে আইন?

কি বললে? আবার বল?

আইন ব'লে ভি হক মিলে না। খেতমজুরের মিলে না। হাঁ সাচাই কথা, কিন্তুক আইন তো করছিল? বর্গাদার লয়ে তো আকাশ ফাটায়ে দিল, ভাতুয়াগুলান কি মানুষ লয়?

ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ তুমি ভগীরথ।

ভাতুয়া লিয়মটো কলঙ্ক। তা লয়ে তো তুমরা ভি লকসালী উঠাও নাই? ভাতুয়া যি, সি জনাও তো জমি খুয়ায়ে করজের দাদে ভাতুয়া বনে, লয়? জমিন-জীয়া মানুষ সি জনা। খেতমজুর যেমুন জমিন-জীয়া। তা ভাতুয়া লয়ে কেনে আগুন জ্বলে নাই? গোলাম করতেছে মানুষরে?

দাঁড়াও, দাঁড়াও ভগীরথ—

অধরবাবু উত্তেজনায় ঘুরতে শুরু করলেন ঘরে, কি যেন একটা, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। দাসপ্রথা এটা, এখনো চলছে। পশ্চিমবঙ্গে চলছে, ঠিক বলেছ। দাঁড়াও আইন ... দাসপ্রথা যদি হয় ... ভগীরথ! আমি সদর থেকে জেনে আসব। আমার মনে হচ্ছে, অথচ মনে হচ্ছে না—জেলে বসে কথা কয়েছিল কে যেন ... নিশ্চয়। কে হয় খেতমজুব, কে হয় ভাতুয়া—।

—আর ঋণমকুবী আইন ভি তো হচ্ছে। ঋণের লেগে মানুষটো গোলাম বনি যাবে? বাবা সাত বছর হতে ভাতুয়া। দুই কুড়ি পাব করল সবে, চক্ষু যায় যায়, শালো নিজে দেখাবে নাই, আমি নিব সদরে হাসপাতালে সি ছুটি ভি দিবে নাই—আর কি হিসাব কবি রাখছে, টাকা আর শুধে না। ই পিশাচ কালীবাবুরে পার্টিব বাবুরা মদত দিল, পঞ্চায়েত উঠাল। সুদখিয়া মহাজন মালিক ছাড়া সি সরকারের পঞ্চায়েত চলে নাই, ই সবকাবের ভি চলে না, ইয়ার জমিতে বর্গাদার নাই, সবারে টুপি পরাল। ই ঘরে গোলাম পুষে বাহারে ফরন্ট মারায়।

দেখছি আমি, দেখছি।

তুমার কথা কে মানবে?

দেখছি। সদবে যেতে হবে।

আমারে লযে চল।

চল। পবনকে নিযে যাব।

কুথা?

কেন? হাসপাতালে?

কালীবাবু ছুটি দিবে নাই।

কালীব ঘাড দেবে।

ভগীবথ এবাব নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিযে পড়ল। অধববাবুর ওপর ওর অপার বিশ্বাস। অধরবাবুর ঘুম চলে গেল কোথায়। ভগীরথ ওঁর বুকে ঘা মেবে চোখ খুলে দিয়েছে। ভাতুয়া। দাসপ্রথা। জমি খুইয়ে হোক বা ঋণেব কাবণে হোক, ভাতুয়া হয মানুষ নিরুপায় হযে। দেশেব মাটিতে দাসপ্রথা চলে যদি, সে কথা সর্বহারাব হকেব জন্যে শপথবদ্ধ পার্টি জানবে না? তিনি জানবেন না?

জানবেন না কেন, জানতেন। কিন্তু এখন তিনি ভারতের মাটিতে জন্মাবার ভয়ঙ্করতা দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বিপ্লবী। তিনি জীবন দিতেই প্রস্তুত। কিন্তু তাঁব কাছেও 'ভাতুযা' এক স্বীকৃত, প্রচলিত প্রথা বলে এটি থাকা যে বর্বরতা, তা তিনিও ভাবেন নি। ভাতুযা তো থাকেই, দেশে ঘবে কতই থাকে। ভগীরথ বুঝিযে দিল, ভাতুয়া থাকতে পারে। আছে বলেই তাদেব কথাও হিসাবে রাখো। খেতমজুববা ন্যূনতম মজুরি পেল কিনা শুধু তাই নিযে লড়াই কোর না। সরকার তো ভাতুয়া প্রথার কথা ভাববেই না। ভাতুয়ারা সংখ্যায় কতজন বা। জীবিকাভিত্তিক শ্রেণীতে ওরা তো সরকারী ভাষায় 'অসংগঠিত' অংশের লোক। লক্ষ লক্ষ বর্গাদার নয় যে একটা 'অপারেশন' চালিয়েই হইচই তোলা যাবে, ভোট কেনা যাবে। খেতমজুরও নয়। তাদের কথাও সরকার মাঝেমধ্যে ভাবে। ভয়, নইলে এবার নেতাদের চেষ্টায় নয়, নিজেদের তাগিদে ওরা ক্রমে নকসাল বনতে পারে। হকের জন্মে হেঁসো ধরলেই তো আজকাল সরকাবী অভিধানে সে হয় 'নকসাল'। নকসাল সংজ্ঞার বেলা সব সরকার একই অভিধান অনুসরণ করে চলে। 'তিনিই ভারত তিনি ভারতমাতা'র প্রদর্শিত পথ এটি।

ভাতুয়া মানে দাস। ঋণের দায়ে বাঁধাপড়া দাস। 'গোলামটো'—ভগীরথ বলেছে।

৩

পবনকে আনতে কোন বেগ পেতে হয়নি অধরবাবুকে। কালীকৃষ্ণ বলেছিল বটে, কি হইছে উয়ার, যি সদরে যেয়ে চোখ দেখাবে? হাটে যায়, হাটে কত অষুদ বিচে, চক্ষে দিলে আরাম হয় না?

অধরবাবু বলেছিলেন, নিজেও ব্যবস্থা করবে না—অপরকেও করতে দেবে না? তোমাব ঘরে তো চিরকাল গোলাম খাটছে তা চোখ দুটো গেলে কি তুমি দেবে? গরু-মোষটার ব্যামো হলেও তো বদ্যি ডাকে, একে একবার সদরে নিয়ে চোখ দেখানো উচিত ছিল না তোমার?

কৃষকসভার নিত্য আর সন্তোষ কি কাজে এসেছিল কালীকৃষ্ণের কাছে। তারাও বলল, নিশ্চয় যাবে। অধরদা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, এব পরে আর কথা কি?

যাক না, যাক—কালীকৃষ্ণ অগত্যা বলেছিল।

সদর শহর জামু গ্রাম থেকে মাত্রই তিন ঘণ্টার পথ, এটুকু পথও পবনের আসা হয় না কখনো. শহর দেখে এমন উত্তেজিত হল ও যে চোখের কষ্টের কথাও ভুলে গেল যেন।

ভগীরথ বিব্রত হচ্ছিল, আবাব মমতাও হচ্ছিল ওব।

উ দেখ ভগীবথ, হোথা কত বড় বাড়িটো। উঃ। দালান বটে, উঁচা কত? পাঁচিলটো?

অধরবাবু মুচকি হেসে বললেন, ওটা জেলখানা। ওখানেই ছিলাম কিছুদিন।

আঁ? জেলখানা? আর ই দালানটো?

ওটা সিনেমা।

—ই দেখ ভগীবথ, কত ফলের দোকান দিছে। বল্ দেখি ওগুলান্ কি? লাল কত?

—আপেল, বাবা।

হাঁ হাঁ, নামটো ভুলি যাই, বাবু আনে তো। পউষ মাসে এত ফলে ঘব ভবি দিবে। এ-ত!

ভগীরথেব বুকেব নিচে কোথায ব্যথা করছিল। ফলের দোকান দেখে বাবাব হাসিভবা মুখটা দেখে বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল ব্যথায। ধুলোপড়া ঘেযো বিবর্ণ ফল। তা দেখেও বাবা খুশী কত। চোখ দুটি যেন ঘোলাটে। বাবাব চেহারা দেখে মনে হয কবেকাব মানুষ যেন, কোথা থেকে এসেছে সদর শহবে। যেন সুদূব ও ধূসব অতীত থেকে উঠে এসেছে ও বিশ শতকেব ধুলোটে ও অবহেলিত সদর শহব দেখে এমন অপরিচয়েব বিস্ময ওব চোখে।

ঠিক একইকথাই মনে হয অধববাবুবও, অত্যন্ত অস্বস্তি হয তাঁব। ফাটাচটা পা, চ্যাটালো আর ফাটা চটা হাতেব থাবা, গলায উড়নি, রুক্ষ চুল, পবনকে দেখে কেন মনে হচ্ছে ও অন্য শতকের মানুষ! দাস বলে? কোথা থেকে আসছে ও? বল্লালসেনী বাংলা থেকে? শশাঙ্কেব বাংলা থেকে? যে সময গঙ্গারিডই নাম ছিল, সে সময়েব গহ্বর থেকে? যখন দাসবা রচনা করত সভ্যতা? অতীতেব বাংলাব কিছুই অপরিবর্তিত টিকে নেই, আজকেব পশ্চিমবঙ্গে। একা পবন কালজয় কবে টিকে আছে. যা ছিল নিষ্কর, তা টাকা হয. জমিব্যবস্থাব পবিভাষা পালটায়, রূপনাবায়ণ স্রোতোপথ বদলায, তাম্রলিপ্ত হয তমলুক—কিন্তু হ্যাঁ, পাবনটো পবন থাকি যায় তা দেখলে অধরবাবু, কালী গরাইটো কালী গরাই থাকি যায় তা দেখলে নাই? উ ভি আছে, আমু ভি আছি। উ নইলে আমু এলম কুথা হতে? ভাতটো, বুঝলে অধরবাবু, বড় দুঃখ দিতেছে ভাতটো শত-শত-হাজা-র বৎসর ধরি। বড় দুখ! এখুন চক্ষে সব ধুমা বন্ন দেখি। জানি আগুন লাগি জ্বলে কি বা, এ-ই ধুমা বাতাসে-এ-ই ধুমা আকাশে—ধুমাকার রদ্দুর—যা দেখি সকল ধুমাবন্ন, আগুন তাতে লাচতেছে।

অধরবাবুর এক পুরনো ছাত্র এখানে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বেচে। জীর্ণ ও গরিব দোকান। তার বাসায় উঠলেন ওঁরা। হোটেলে ভাত খেলেন। অধরবাবু ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

চোখের ডাক্তারের কাছে পবনকে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার বাড়ীতে রোগী দেখে। ডাক্তারকে পবন ওই কথাই বলল।

চক্ষে সব ধুমাবন্ন দেখি বাবু। যেমন ধুমা উঠতেছে আগুন তাতে। স-ব ধুমাকার। আব এই লাচে, এই চমকায়। ধানটো, মাচানটো, ভগীরথের মুখটো যেন আগুন তাতে বাতাস জ্বলে, পিথিমি লাচতেছে। চমকাতেছে।

ডাক্তার অধরবাবুকে বলল, মনে হচ্ছে গ্লুকোমাব পরীক্ষা করতে হবে। সে তো সময লাগবে।

তাই করুন।

অতক্ষণ বসবেন আপনি?

না, আমার কাজ আছে।

পবনকে রেখে অধববাবু ও ভগীবথ বেরিয়ে এলেন, ভগীবথ বলল, চক্ষু সারবে?

দেখা যাক।

অধরের মনে কালীকৃষ্ণেব ওপর প্রজ্বলন্ত বাগ। চোখের এমন অবস্থা লোকটার তো একদিনে হয় নি। দিনে দিনে—"দিনে দিনে" শব্দ দুটি যেন এক সাবানের বিজ্ঞাপনকে মনে কবিয়ে দেয। দিনে দিনে, একটু একটু কবে পবনেব চোখের আলো ক্ষীণ হয়েছে। ভাতুযা মহাজনেব কাজ কবতে কবতে অন্ধ হযে যেতে পাবে। কিন্তু ভাতুযাব চোখের চিকিৎসা কবাবার জন্যে ভাতুযাকে ছুটি না-দেবাব অধিকাব মহাজন বাখে। দাস। ক্রীতদাস।

অধব ভগীবথকে নিযে আদিবাসী-কল্যাণ আপিসে গেলেন। জেলাটিতে আদিবাসী অনেক। আর অধববাবুবা সত্তবেব দশক পডতে আদিবাসীদের নিযে ধানখেতে নেমেছিলেন। আদিবাসীকল্যাণ দপ্তব এখানে আপিস বেখেছে। ভগীবথ বলল, হেথা এলাম কেনে?

জানলে এ জানবে।

পলুস মুর্মু শিক্ষিত, চটপটে যুবক। সে বলল, ভাতুযা বলুন, মাহিন্দাব বলুন, ব্যাপাবটা একই দাঁডায। একটা লোকেব সঙ্গে সমযসাপেক্ষে, বাৎসরিক একটা টাকার কড়ারে, ভাত ও জলপান দেবার শর্তে চুক্তি কবা হল। কার্যকালে সে মনিববাড়িব চব্বিশ ঘণ্টার গোলাম হল। ক্ষেত্রবিশেষ এই শ্রমিকেব নিজস্ব কিছু জমি থাকতেও পাবে। তা অবশ্য কম।

এখানে ঋণেব ব্যাপাব।

বুঝলাম। ঋণ নিল একজন। সে নিজে অথবা তাব আপনজন কেউ ভাতুয়া হল। বছবে এত টাকা, দৈনিক ভাত ও জলপান।

ঋণমুক্তি তো হয না।

হবে কি কবে? ভাতুয়া বা মাহিন্দাব হচ্ছে নিরন্ন ও নিরক্ষব লোক। সেই মুহূর্তে বাঁচাব জন্যে সে নিজেব দাসখতে টিপছাপ দিচ্ছে। আপনি বুঝছেন না, কি হওযা উচিত ছিল?

আপনি বলুন।

পলুস মুর্মুর মুখে একটা হাসি লেগে থাকে। হাসিটা ধবে রেখেই সে বলল, ঋণগ্রহীতাকে জেনে নিতে হত সে কি ভাবে ছাড়ান পাবে। ধরুন পাঁচ বছরের জন্যে চুক্তি হল, ধার ছিল এক হাজার টাকা। পাঁচ বছব সে কি কাজ করবে এবং কি হারে তার দৈনিক বা মাসিক মজুরি ধরা হবে? যদি দিন দু টাকা মজুরি হয়, তাহলে মাসে ষাট টাকা কাটান যাচ্ছে। বছবে তিনশো ষাট টাকা। পাঁচ বছরে তো মালিক আঠারোশো টাকা তুলে নিল।

বুঝলাম।

না বোঝেন নি।— হাসি লেগে থাকল পলুস মুর্মুর মুখে, গলাটা ধারালো হল, বোঝা কি অতই সহজ? কাজটা যদি খেতমজুরী হয়, তাহলে একভাবে হিসেব করা চলে। খেতমজুরের

একটা মজুরি রেট আছে বটে—পাক, বা না পাক। কিন্তু ক্ষেতমজুর তো খাটবে আট ঘণ্টা—ভাতুয়া চৌপর দিনের গোলাম। কাজ যদি হয় বাগান সাফ, কাঠ কাটা, গোয়ালের কাজ, তার মজুরি কি?

তাহলে?

সে সব হিসেব এ লোকটির আছে?

না বাবু। কুন্‌-অ হিসাব নাই।

হিসেব-টিসেব করলে মালিককেই টাকা ফেরত দিতে হবে হয়তো। আমি যা বুঝি বলল্যম। দেখুন, কি বোঝেন।

খেতমজুরদের তো তবু কোন রেট হয়েছে। আর কোন কোন জায়গায় তাবা এখন তবু পাচ্ছে। পুরো না হোক, কাছাকাছি। অথচ খেতমজুবরা—

শুনতে তো পাই, অনেক আন্দোলন হয়েছে তাতে এতটুকু পাচ্ছে। আপনিই ভাল জানবেন।

হ্যাঁ। আমরা আন্দোলন করেছিলাম।—অধরবাবু চোখ তুললেন। মনেব নিচে জবাব পাচ্ছেন। ভাতুয়াদের জন্যও—অধরবাবু বললেন, কিন্তু এরা তো ...

এরা শ্রমিক হিসেবে আমাদের ভাষায় 'অসংগঠিত অংশে' পড়ে, তাই তো? ক্ষেতমজুরও তাই। আন্‌অর্গানাইজড্ সেকটর।

খেতমজুরদের চেনা সোজা।

এদের চিনে বের করা কঠিন।

এদের কোন আইনেব আওতায় ফেলা চলে না।

চলে বই কি।

চলে?

পলুস মুর্মুর হাসিতে শাণ পড়ছে, ফুলকি উড়ছে। সে বলল, এরা বনডেড লেবাব। বাঁধা শ্রমিক। দাস।

বনডেড লেবার! পশ্চিমবঙ্গে?

নয় কেন? দেখুন না, এখানে পরিষ্কার লেখা আছে, 'পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত চেহারাব দাসত্ব অনুপস্থিত। বাৎসবিক চুক্তি-মাফিক শ্রমিক নিয়োগ এই নামের ছদ্মবেশে বনডেড লেবার প্রথা চলে।' নয় কেন অধরবাবু? বনডেড লেবার অ্যাক্ট পড়ে দেখুন—যে যে কারণে বনডেড লেবার হয় মানুষ, সেই কারণে মানুষ হয় ভাতুযা।

আইন আছে, আছে বাবু? ভগীরথ বলে।

আছেও বটে, নেইও বটে। পশ্চিমবঙ্গে বনডেড লেবার প্রথা আছে বলে তো সবকার বলছে না। কিন্তু ভাতুয়া প্রথাই হল গে সেই প্রথা।

তাহলে?

আমি জানি না ভাই। তুমি ওঁর কাছে জেনে নিও। ভাতুয়া আর বনডেড লেবার এক, তা প্রমাণ করবে কে? প্রমাণ করে প্রথা উচ্ছেদ করবে কারা? বিহারে এমন হামেশা ঘটছে, বনডেড লেবারকে মুক্ত করা হল রামের খপ্পর থেকে। অভাব, জমিহীনতার কারণে, সামাজিক প্রয়োজনে সে ঋণ নিল শ্যামের কাছ থেকে এবং তার বনডেড লেবার হয়ে গেল। ঠেকাবে কি করে? ভাতুয়ারাই হয়তো মারতে উঠবে, আপত্তি জানাবে।

বনডেড লেবার অ্যাক্টটা পাই কি করে?

'আপনি মশাই মার্কামারা হয়ে গেছেন। সাহায্য করাও মুশকিল।

মানতে পারলাম না।

শুনুন জিগ্যেস করলে অস্বীকার করব 'দিয়েছি' বলে—কিন্তু ছোট অ্যাক্‌ট, একটা কপি আপনাকে দিয়ে দেব কোন সময়ে। নিয়ে করবেন কি? সাজিয়ে রাখবেন?

বলুন, বলুন। ভগীরথ বলছে, আপনি বলুন, শুনতেই হবে। আর যাকে নিয়ে প্রশ্ন তিনি চোখ দুটি প্রায় খুইয়ে বসে আছেন। তোমাকেও বলি ভগীবথ, আগে তো দেখবে?

পলুস মুর্মুর হাসিতে যেন জ্বলন্ত রোদে ইস্পাতের ছুরি ঝলকে উঠল, সে কি? আপনাব চেনাজানার মধ্যে একজনই 'ভাতুয়া' না কি? 'যাকে নিযে প্রশ্ন' বলছেন? আচ্ছা, আবেকজন প্রাক্তন ভাতুয়ার খোঁজ দিচ্ছি! শিবচাঁদ মুর্মু. গ্রাম সলপাড়া. তাবও চোখ অন্ধ। আমার কাকা। নিন, চা খান, চা এসে গেছে।

ভগীরথ অভিভূত হয়ে তাকাল। পলুস মুর্মু বলল, হ্যাঁ, হে। ভাতুযাবা বসন্তরোগে গ্লুকোমায়, এতে-তাতে অন্ধ হয। অন্ধ হযে তবে কাকা খালাস পেয়েছিল।

অধববাবু বললেন, যুগলের বাবা।

হ্যাঁ। জানেন দেখছি।

চা খেয়ে ওঁবা উঠে পড়লেন। অধববাবুব মাথায নানা প্রশ্ন, যুগলেব স্ত্রী?

গ্রামেই আছে।

যুগলটা!

ভগীবথ বলল, মারি দিছিল তাবে, লয? হাঁ, আমি জানি, আমি শুনছি।

পলুস মুর্মু সে কথার জবাব দিল না। অধববাবুকে বলল, বযস্কদেব লিখতে-পড়তে শেখাচ্ছেন—এই বইগুলো একজন দিযেছিল পাঠিযে, নিয়ে যাবেন।

ঘাড় হেলিয়ে অধববাবু বেরিযে এলেন। এখন বিকেল হয-হয। সব ধুলোটে বিবর্ণ। ভগীরথ বলল, এখুন ইরা খুব সিধাসাফা বাত কবে।

তা করে!—সদুঃখে হাসলেন অধববাবু। ক্ষমতা এদের বড় কম, বড় কম।

দপ্তবটো রাখি দিছে কেনে?

বাখতে হয়। এ সবকার এ জেলায চেষ্টা করছে, কিন্তু ক্ষমতা বড কম এদের।

কি বুঝলে বাবু?

পবে ভগীবথ, পবে।

ডাক্তার বলল, কাল আবার আসুক। পবন, তুমি বাবান্দায় যেয়ে বোস। আমি এঁর সঙ্গে কথা বলি।

পবন বলল, অধববাবু! মোরে চশমা দিবে মশায হাঁ! চশমা লিলে স—ব স্পষ্ট দেখব যেমন। উঃ! জল খাওয়াছে আব চক্ষু দেখছে সি কত রকমে!

ভগীরথ বাবাকে নিয়ে বাইরে এসে বসল। বারান্দাটি উঁচু। পবন বলল, ফিবব কখুন, আঁ ভগীরথ? নাঢা কুচাতে আছে, ঘসির মাচাংটো বাঁধতে বলছিল—

এখানে বস। নাও, বিড়ি খাবে?

পবন সলজ্জ হেসে বলল, একটো ছিগারেট আন্‌ কেনে, উ দোকানে যা? কখুনো খেয়ে দেখলম না—

দেয়ালে পিঠ রাখি বস কেনে, আমি লয়ে আসি। বিস্কুট খাবে? বিস্কুট?

ডাক্তার অধরবাবুকে বলল, অনেক কথা বলে লাভ নেই মশাই। কে হয় আপনার? গাঁয়ের লোক?

হ্যাঁ। বলুন না।

গ্লুকোমা ভয়ানক এগিয়ে গেছে। নার্ভগুলো ... ডাক্তার সংক্ষেপে বোঝাতে থাকল। মনে হয় প্রাইমারি টাইপের গ্লুকোমা, আর প্রাইমারি টাইপের গ্লুকোমা হবার কোন জানিত কারণ

নেই। চোখের স্নায়ুমণ্ডলী-ক্ষয়িষ্ণু পবনের। পবনের কি বহুমূত্র আছে? অধরবাবু জানেন না। অ্যাট্রোফি বা ক্ষয়িষ্ণুতার এই কারণ দীর্ঘদিনের পুষ্টিহীনতা। পবন রোজ কি খায়? অধরবাবু জানেন না, আন্দাজ করতে পারেন। নন্‌কো-অপারেটিভ টাইপ। চিকিৎসায় কাজ হওয়া দুষ্কর।

অপারেশন তো হয় গ্লুকোমায়?

সে কথা ভেবে দেখুন।

তাতে বিপদ আছে? মানে ...

দেখুন, বছর পাঁচেকের পুরনো ব্যাপার। প্রথম দিকে যদি আসত ..

কি করবেন?

কলকাতায় নিয়ে দেখাতে পারেন।

লাভ হবে?

মনে হয় না।

তাহলে?

আপাতত চশমা দিয়ে দিই।

অন্ধত্ব আটকানো যাবে না?

পাঁচ বছর আগে হলে অপারেশন চলত।

আজ থাকতে বললেন?

আজ তো হবে না। কাল সকালে ব্লাডসুগারটা খালি পেটে, খাবার পর, দুবার করান। পেচ্ছাপটাও দেখিয়ে নিন। বহুমূত্র থাকলে তার চিকিৎসা চালান। ওষুধ খাক। তাতে চোখটা আর ক দিন থাকবে।

আপনার টাকাটা?

অধর বাবুর দিকে তাকাল ডাক্তার। অধর মাইতিদের জন্যে একসময় না কি ডাক্তাররা দক্ষিণা কমাতে বাধ্য হয়েছিল। শোনা কথা। এখন লোকটি ভেঙে পড়েছে। খাকি, গলা ছেঁড়া সোয়েটার, ধুতিটা আধময়লা, মোটা চটি—গ্রামের লোকদের দেখে অবশ্য টাকা আছে কি নেই, বোঝা যায় না। তবু, এ তো গরিব—সবাই বলে। গরিব হও যদি, ডাক্তারকে রুগী এনে দেখাও কেন? হাসপাতালে যাও না কেন?

তিরিশ টাকা দিন।

টাকা দিল অধরবাবু। জীর্ণ ব্যাগটি চিমসে হয়ে গেল তিনটে নোট বেরোতে।

চশমা করতে কত লাগবে?

পঞ্চাশ রেকসুর।

আচ্ছা।

অধরবাবু মনে মনে আশ্বস্ত হন। হাতঘড়িটা এখনো আছে। ভগীরথই তখন সামলে রেখেছিল। অধরবাবুর বাবার হাতঘড়ি। ওষুধ-বেচা ছাত্রটি নিশ্চয় ব্যবস্থা করে দেবে।

ছাত্রটি বলল, রক্ত আর পেচ্ছাপ হাসপাতালে পরীক্ষা করিয়ে দিই। খরচ কম লাগবে।

তাই কর।

দুদিন থাকতে হল আরো। বহুমূত্র নেই পবনের। চশমা তৈরির ফরমাস দিয়ে ওরা বাসে চাপলেন। অধরবাবু বললেন, আবার নিয়ে আসব ক দিন বাদে।

কেনে, বাবু?

চশমা পরে দেখে নিতে হয়।

চশমাতে বিস্তর টাকা লাগবে, লয়?

সে হয়ে যাবে।

ঘড়িটো তুমার—

হয়ে যাবে।

কে শুধবে বাবু এত টাকা? কত খরচ করলা?

ভগীরথ বলল, আমি। ইবার চুপ যাবে?

হ্যাঁ। চুপ গেলম।

আর, আর তুমি গরাই বাড়ি যাবে না।

যাব নাই!

না।

কি বুঝল পবন, কে জানে। ভগীরথের কণ্ঠের ক্ষোভে ও বাগে কি ছিল? ও একবার ছেলের দিকে চাইল। একবার অধরবাবুর দিকে, তাবপর ওর বুক ঠেলে কান্না উঠে এল।

বলল, ই কথা আজ তুই বলিস কেনে?

বললাম।

কেনে?

না। গরাই বাবু তুমারে বেআইনে খাটাছে, মজুরি ভি হিসাবে কাটে নাই, উর করজ দশ দফা শুধে গিছে, বুঝলা? দশবার শুধছ তুমি?

বাবু! অধববাবু! ভগীবথ কি বলে?

ঠিক বলে পবন হ্যাঁ, ঠিক বলে।

শুধে গিছে?

সমগ্র পবিস্থিতিব নির্মমতায় ভগীবথ এখন নিষ্ঠুর, ক্রুদ্ধ। আইনেব কথা যা বুঝেছে, তাতে ওব বুকে এখন রক্তেব জোযাব। ভগীরথ বলল, আর কখুনো যাবে না, কুনো দিন নয।

বাবু পঞ্চায়েতী, হাতে অনেক ছেলা। মারে যদি? কতদিন তো মারছে।

অধরবাবু বললেন, কেউ কিছু বলবে না।

কেনে? কেনে আমাব হয়ে বলবে? কেনে বাবুব সাথে বিবাদ উঠাবে? বল? বলবা না? বুঝি পারছি আমি অধরবাবু। বুঝি পাবছি আমি ভগীরথ। আমার চক্ষু আর ভাল হবে না— সি কথা বলবি তুবা। বলবি তুমাব কাজে পবনটো কানা হই গেল, আর সি তুমার হয়ে খাটবে না। বুঝি গিছি আমি বাবু গো! আমার আর বুঝতে বাকি নাই!

পবন হো হো করে কাঁদে ও ভগীবথ তার মাথা সাপটে কাঁধে টেনে নেয়। ভগীরথও নীরবে কাঁদে ও জাপটে ধবে রাখে বাপকে। অধব বাবুর মনে চেনা-পৃথিবী ভেঙে যেতে থাকে। প্রজ্বলন্ত ক্রোধ। ভাতুযা কতজন? কি হিসেবে কাজ করে? ভাতুযাই বনডেড লেবাব এবং তাঁর পকেটেব বাদামী কাগজটি বলে দিচ্ছে, ১৯৭৬ সালের (দি বনডেড লেবার সিস্টেম অ্যাবোলিশন) অ্যাকুট-এর আওতায় ভাতুযাকেও ফেলা যায এক বিশেষ উপধারা প্রয়োগে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বনডেড লেবার প্রথা নেই, আছে কনট্রাক্ট লেবার। সামনে অনেক কাজ। সংগ্রাম ফুরায় না।

পবন চোখ মুছল, মাথা তুলল। নাক ঝেড়ে, জামায় মুছে বাইরের দিকে তাকাল। সব ধোঁযা ধোঁয়া। যেন আগুন জ্বলছে কোথায়, ধোঁয়ায় ধূমল বাতাস। সব দেখাচ্ছে ধোঁয়াবর্ণ, সব যেন চমকাচ্ছে, হল্‌কাচ্ছে, আগুন-তাতে বাতাস কাঁপে যেমন। এত আগুন লেগে গেছে, কই পবন তো বোঝেনি আগে?

আর গেল না পবন গবাইবাড়ি, একবারের জন্যেও নয়। অধরবাবু কি বললেন কৃষকসভায় নিত্য আব সন্তোষকে, কার সঙ্গে কি কথা হল তা পবন জানল না। তবে ওর বউয়ের মুখে সব কথাই শুনল। অধরবাবু নাকি নিত্যদের ডেকে রীতিমত আলোচনা করেছে। সরকারী কাগজ পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। গ্রামের ছেলে তোমরা, পার্টিব ছেলেও বটে। মানুষকে দাস বানিয়ে ব্যবহার চলছে, তা তোমরা দেখবে না? কেমন লোককে রেখেছ পঞ্চায়েতে? পবনের চোখ দুটো যে চলে যাচ্ছে, মালিক কোনদিন পবনকে চিকিৎসা করিয়েছে? তোমাদের চেনাজানা চিরকালের মানুষ না পবন?

ছেলেরা গ্রামেরই ছেলে। তারাও আলোচনা করে থাকবে। তারা টাকা এনে দিযেছে অধরবাবুকে। বলেছে, গরাইয়ের ঘাড় ভেঙে আমরা পরে তুলে নেব।

সব শুনেও পবন চঞ্চল হয়নি। শহর থেকে ঘুরে এসে ও সেই যে ঘবে বসেছে, বসেই আছে। এত কথা, এমন কাণ্ড, তাতেও এতটুকু বিচলিত হয়নি। বলেছে, উয়াবা টাকা দিল? ভাল।

হা তুমার চেত-ভেত নাই? যা বলি সব শুনি বসি থাক?

কি কবব? লাচব?

হা, কিছু তো কবে?

ভাবি বউ। কত খাটলম, বর্ষায আল ভাঙলে বান্‌তাম, তাতেব কালে গবাইবাবুব মাথে ছাতা ধবে দৌড়াতাম। পাযে ঘা হই গিছে ইটাপাথব বেজে।

লাও, খ্যাড়ের দড়িটো পাকাও বসি।

পারি না বউ।

অত ভাব কেনে? একটো বকনা নিব পালনি। সি হতে দেখবে সুসার হবে।

নিবি? নিস। বকনা ভি মাঙছিলাম একটো, দেয নাই। বর্ষায় মাথাল দিল, বলে, লিখে রাখলাম। ইয়ার দাম দু টাকা। কিছু দিল না কখুনো। খালি গতরটো মাটি কবি দিল, চখ দুটা—

বউ ভগীরথকে বলল, ই কেমুন হয়ে যেছেরে ভগীরথ? আমি তো ভাল বুঝি না। এত কাজেব মানুষ, এমন কালিমাড়া মুখে কি ভাবে? আঁ?

ভগীরথ বলল, কি ভাব বাবা?

হিসাব ভাবি।

কিসেব?

দেনাটো শুধল কবে, আমি বা কত পাব। অনেক কথা মনে উঠে ভগীবথ বে। মনিব ভি বলছে তু বিনা কাম হবার লয, আমি ভি জাহান দিযা কাম উঠাছি। এখুন দেখ্‌, সি ধান ভি কাটা হবে, সকল কাম হবে, তা আমাব চখদুটো নিল কেনে?

ভগীরথ বলল, তালপাতা ডেগো লয়ে পাখা বান্ধা শিখবে? আমি ভি কব্নি, তুমি ভি কর, চালান দিবে গোকুল দলুই, কিনে লিবে নগদে?

না রে। সি কামটা দেখ্‌, কানাতেও করে। এখুনো চক্ষু আছে, টুনি দেখে লই?

'কানা-কানা' বল কেনে? কলকাতা লয়ে তোমার চক্ষু দেখাবে অধরবাবু।

পবন মাথা নাড়ল। বলল, কুথা হতে? কি করে? না ভগীরথ, সি জানা অনেক করছে। আর ঋণ বাড়াস না। চক্ষে কিছু হবার লয় রে, সকল ধুমবন্ন দেখি। যেমুন ধুমা উঠতেছে বাতাসে।

সদরে চশমাটো পরি দেখবে, চক্ষে ভাল দেখ। শুন বাবা, ভাল দেখবে।

না তোরে দেখছি কুনোদিন, না তোর মা-রে। বিহান কাড়তে ছুটি চলি গিছি, আব অসাগর কাম। কেনে বা লয়ে যাই নাই তোবে, তু গাঁদাটো ছিলি, মেলায় যাবি বলে কানছিলি কত। হা!

বাবা। চেটাই বুন, পাখা বাঁধ, ঘরে বসে বা রবে কেনে? কামে ব'লে ভাল রবে মন।

ধুর। কানা হই করব।

অধরবাবুর কাছে গেল ভগীরথ। অধরবাবু সব শুনে বললেন, প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছে। চোখের ব্যাপারটা মেনে নিতে পাবছে না। চশমাটা নিয়ে আসি ওকে নিয়ে।

চশমা পরে পবন বলল, হাঁ ধুমা-ধুমা বটে! নাচতেছে, ললকাতেছে, কিন্তুক, স্পষ্ট দেখি।

চশমা পরে পবন বড়াম মাযের থানে ঘুবে এল। অধরবাবুকে বলল, ভগীরথটো সাচাই বলছিল গ। মায়ের থানে লাল চুটির বাসা। তাতেই মায়ের বঙ্গে লাল চুটি বায়। গবাই বলছিল মায়ের দেহ ফাটি চুটি বাইতেছে গ।

এই তো সব ঠিক-ঠিক দেখছ।

সি কথাটোর কি হল বাবু?

কি কথাটার পবন?

আমাবে বেআইনী খাটাছে উ?

সে কথাও হবে, জবাব দিতে হবে ওকে। আমি হিসেবটা কবে নিই?

হিসেব করতে কবতে দিন গেল অনেক। বহু বছবের হিসেব। এব মধ্যে পাশেব গ্রামে ধানকাটা মজুবি নিযে হাংগামা বাধল। মজুববা খেত-মজুবি নেবে, জমিমালিক দেবে না। চেনা হাংগামা। মালিক বাইরেব মজুব আনবে। চেনা নিযম। যাবা মজুবি চাইছে তাদেব ক জনাকে ধববে? চেনা পদ্ধতি।

অধববাবু সেখানে গেলেন। এক সমযে মহল্লাটিতে ধানের নাম বক্তে লেখা হযেছিল, বারবাব। এখন নির্বাচনেব আগে ধানকাটা নিযে হাংগামা বাঁধলেই আবার পুলিশ ঢুকবে গ্রামজীবনে। পঞ্চাযেতকর্মী ছেলেরা সঙ্গে গেল।

পবন বলল, ভগীরথ? তু যাস না কেনে? অধরবাবু একা, লয?

ভগীবথ গেল।

আব পবন গেল গবাইবাবুব বর্ণশালী ধানেব ক্ষেতে। ওই তো তাব হাতে বাঁধা মাচা। ওই টঙে বসে ও খেত পাহারা দিত। ধান কাটছে, পালা দিচ্ছে পতিত, সাগর, নিবারণরা। খেতমজুর সব। আঃ! অসাগর ধান গো, অসাগব ধান। এই সব কাজ তো সেও কবেছে এক সমযে। এখন চশমা পরে সব দেখতে পাচ্ছে পবন স্পষ্ট।

তুই হেথা কেনে, পবন?—গবাইবাবু ধানকাটাব কালে দেখতে আসে, পবনেব খেযাল ছিল না।

দেখতেছি বাবু।—ভয কবছে গো, ভয কবছে। এতদিনের অভ্যেস কি যায়? গরাইবাবুকে ভয় করা পবনের অভ্যেস। ভয করছে।

এঃ! অধর মাইতি চশমা করি দিছে, তা পরি দেখতেছ শালো। দেখতেছ না চুরাবাব তালে আছ, বুঝি নাই? বোকাটো ভাবিস, আঁ?

চুরি? আমি?

লয় তো কে? শালো মুরুব্বি হল উ অধর মাইতি, সি মোরে আইন দেখায়, হিসাব দেখায়। কি করবে সি? ধানটো ভানায়ে লই, তা বাদে যেয়ে তুমার নাম আমি থানায দিব।

কেনে?

চুরির লালিশ দিব শালো। তুমি মোর মুখ হাসাছ, তুমারে আমি ছাড়ব?

কি চুরি করছি আমি বাবু?

থানায় বলবে।

আমি তুমার মুখটো হাসা করাছি?

হাঁ।

আজ দেড় কুড়ি বছর খাটি, তুমার সি আটসৎ টাকা উঠল নাই, আমার কড়ারের টাকা ভি দিলানা কুনো দিন—তুমি, তুমি এখুন আমারে টাকা দিবে তা জান?

কে বলছে? অধর মাইতি?

দিবে। বে আইনে খাটায়ে নিছ বাবু। চক্ষু চলি যায়, কুনো বেবস্তা কর নাই।

চক্ষু যায় নাই, জেহেলে বসি কাঁদি কাঁদি ইবার যাবে। তুমার গরম বড় বাড়ছে পবন।

চোর! চোর যদি হতে পারতাম বাবু। মনিব্যানের হারটো কে খুঁজি দেয়? একটো টাকা দিছিলা তারপর? তুমার টাকার ব্যাগ আমি নাই কুড়ায়ে? হাটে যখুন হারাযে যায়? চোর যদি পবন হবে বাবু, তবে তার উপর ঘর ছাড়ি পালায়েছিলে লকসালী কালে কেমন করি। চোর আমি? চোর?

হেই, হেই পবন, ইকি?

চোর আমি?

মারা করবি?

গরাই পেছন ফেরে ও আধা দৌড়ে চলে যায়। পবন রাগে রুদ্ধ ক্ষোভে কাঁপে। কাটা ধানের পাঁজা এখন চমকায়, ঝিলিক মারে।

ধান কাটা হতে না হতে আকাশে মেঘ জমেছিল। ধান এবার সবার খেতে হয়নি, বড় খরা গিয়েছে। যে ধান উঠেছে তাও বুঝি জলে নষ্ট হয়। কাটা চলছিল, ঘরে তোলা হচ্ছিল ধান।

পবন আকাশ দেখছিল। তার হাতের মেরামত করা টালে গরাই বাবুর ধান সুরক্ষিত থাকবে। এক ফোঁটা জল লাগছে না, তা পবন জানত। এও জানত, গরাইবাবুর জান ওই ধান। আকাল আসছে। ধান কর্জ দেবে গরাইবাবু, বহু জনকে বাঁধবে ঋণের দায়ে। ধানের বলে ওর বল।

রাতে দুর্যোগ নেমেছিল।

আকাশে বিদ্যুৎ, প্রবল বৃষ্টি, দুরন্ত হাওয়া। পবন ওর দা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। চেনা, সব ওর রক্তে রক্তে চেনা। এমন দুর্যোগে কেউ বেরোবে না। গরাই বাবুরা সবাই লেপেব ওমে ঘুমোবে। ওরা ভাত খায়। তপ্ত ভাতের ভারে ঘুম ঢেলে আসে চোখে।

পবন কোন বোকামি করে নি। খুব সুকৌশলে ও টালের চাল বেয়ে উঠেছিল। তারপর ধারালো দায়ের কোপে ও টালের বেড়ার ঝাঁপের ঘন আঁটসাঁট চালা কেটে ফেলে দেয়। দুটি টালেরই। ধান ভিজতে থাকে। তখন ও টালের ঘের কাটতে থাকে ও হিঁচড়ে নামাতে থাকে। তাতেও হয়তো কারো কানে যেত না। টিনের ঘর গরাইবাবুর। ঝমঝম করে জলের শব্দ হচ্ছিল।

কিন্তু এখন পবন চেঁচাতে থাকে।

—হেই গেল তুমার ধান।

—ইবার কি করজ দিবে?

—কুন বাঁধনে বাঁধবে গ?

হড়হড়িয়ে ধান পড়ছিল। পবন লাথি মেবে ধান ফেলছিল।

তখন গরাইবাবুদের ঘুম ভাঙ্গে।

পবনকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। পবনের গায়ে কেউ হাত দেয় নি। হাতে দা ছিল ওর। চোখ ছিল লাল। অসীম, অপার ক্ষমতায় দুটি টালের বহু ধান নষ্ট করে পবন যখন অবসন্ন হয়, তখনি ওকে ধরা গেল। তার আগে নয়।

আশ্চর্য, পবন কোন বাধা দিল না। ওকে ধরতে দিল। সবাই নীরবে সভয়ে দেখছিল পবন একা কি করে এত বড় সর্বনাশ করেছে।

ধানের ছড়াছড়ি মাটিতে। বৃষ্টিতে ভিজে গোবর। গরাইবাবু মাথায় হাত রেখে কাঁদছিল।

বর্ণশালী ধান মাড়িয়ে যেতে যেতে পবন চোখ তুলে ভগীরথকে দেখল। পবনের চোখ ঘোলাটে, তবুও বুঝল, ভগীরথের চোখে আজ পিতার বিপন্ন অসহায়তার কারণে দুঃখ নেই। অন্য কিছু বলছে ভগীরথের চোখ। অন্য কোন জরুরী খবর জানাচ্ছে। ভগীরথ মাথা নেড়ে "হ্যাঁ" জানাল। বাবার আচরণে ওর সম্মতি।

পবন বলল, লইলে গ্রামটো ধান বাড়ি দিয়া বাঁধি ফেলি দিত ভগীরথ।

হ্যাঁ বাবা।

উর জাহান উ করজ দিয়া কামে। বাস্, কোমর ভাঙি দিছি।

জানি বাবা।

ইরাদের বুঝাস।

পবন আব একবারও পেছনে না চেয়ে মাথা উঁচু করে হেঁটে চলে গেল জামু গ্রাম থেকে।

পেয়ারা

মানবেন্দ্র পাল

বাড়িটি কোনো অভিজাত পাড়ায় তো নয়ই—বরঞ্চ এমন জায়গায় যেখানে কোনো ভদ্রলোক অসামাজিক প্রলোভনেও যেতে ইচ্ছে করে না। টিনের ছাউনি দু'খানি ঘর। সামনে খানিকটা উঠোন। ভাড়া দশ টাকা—এবং মাসের প্রথম সপ্তাহে দিতে না পারলেই উঠে যাবার নোটিশ।

চেষ্টা করলে ঐ টাকাতেই অন্য কোথাও যে অমনি একখানি ঘর পাওযা একেবাবেই যায় না, তা নয়। শচী বিশ্বাস খোঁজও পেয়েছিল, কিন্তু সরোজিনী নড়তে চাযনি। তার যে এ ভুতুড়ে জায়গার ওপর কিসের এত দম তা সেই জানে।

শচী বিশ্বাস যে একেবারেই কিছু অনুমান করতে পাবত না তা নয, কিন্তু স্ত্রীর ঐ ছেলেমানুষি প্রশ্রয় দিতে চাইত না। অথচ বলবারও কিছু নেই। কিছু বলতে গেলেই এখুনি অশান্তি বাধবে, ঝগড়া লাগবে—বিশেষ সে যুক্তি দেখাবে—গাছ-গাছ কবি সে কি তোমাব কিছুই আয় দেয় না? বড়ো বড়ো ডাঁসা পেয়াবাগুলো যখন—

হ্যাঁ তা সত্যি কথা। গাছটায ফল দেয় আশ্চর্য রকম। এই বড়ো বড়ো পেযাবা—বসে ভরা! কোথায় লাগে কাশীর পেযারা! এক-একটা পেয়ারা এক-এক আনা দবেও হু হু কবে উঠে গেছে। উঠোনের কোণে ঐ পেযারা গাছটাই এ বাড়ির একমাত্র লাভের সম্পত্তি।

কিন্তু লাভের দিকে তাকিয়েই যে সরোজিনী গাছটিকে এত যত্ন কবে তা নয। ওটা তাব তর্কের অস্ত্র। আসলে পেয়ারা সে খুব ভালোবাসে। শত দারিদ্র্যের মধ্যে—অনাহাবে অর্ধাহাবে থেকেও শুধু উঠোনের কোণের ঐ পেযাবা গাছটিব দিকে তাকিয়ে সে একটু হাসতে পাবে। পৃথিবীর রঙ যখন সর্বত্রই তার কাছে মরুবালুকার মতো জ্বলে, তখন কেবল একটুখানি সবুজ ঐ পেয়ারার কচি পাতায়। বৈশাখ মাস থেকে সে চেয়ে থাকে—দারুণ খরায় গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, বুকের ভিতরটা ধু ধু করে জ্বলে ওঠে—গাছটা বাঁচবে তো? তারপর একদিন জালি ধরে, তখন কি আনন্দ! তাহলে এবারও পেয়ারা হবে—বড়ো বড়ো রসালো পেযাবা।

এদিক দিয়ে সরোজিনীর খুব ভাব ছেলেব সঙ্গে। এক এক ছুটির দিনে—যেদিন গোপালকে ইস্কুলে যেতে হয় না আর গৃহকর্তা যখন খেয়েদেয়ে ফতুয়া কাঁধে ফেলে, হাতে লণ্ঠন নিয়ে দোকানে বেরিয়ে যায় তখন ঐ পেয়ারা গাছতলায় মা আর ছেলের বসে গোপন সভা। সে সভার আলোচ্য বিষয় পেয়ারা। এ বছর কত পেয়ারা হবে, প্রথম ফল ধরলে কাকে কাকে দেওয়া হবে।

সরোজিনী দেবার লোক খুঁজে পায় না। এ নির্জন বনবাসে আর প্রতিবেশী কই? চাল বাড়ন্ত হলে একমুঠো চাল দিয়ে সাহায্য করার কেউ নেই। তবু নিজের গাছের ফল-বিতরণের আনন্দ চাই! কিন্তু সামান্য ক'টি পেয়ারা কোন্ বাড়ি গিয়ে কার হাতে তুলে দেবে?

আষাঢ় মাস পড়েছে। গাছভর্তি বড়ো বড়ো পেয়ারা। এ বছরের নতুন ফল। শচী রোজই গাছের দিকে লক্ষ্য রাখছে, কেউ পাড়ছে কিনা। দেরি সইছে না। এবার বেচে দিলে হয়।

এই সময়ে একদিন দুপুরে ঐ পেয়ারা গাছতলায় সভা বসল।

সরোজিনী বললে, তোর ইস্কুলের বন্ধুদের দিবি না?

গোপাল ভেবে বললে, দিলে হয়। পেয়ারা তো সবাই ভালোবাসে, কিন্তু সবাইকে তো দেওয়া যাবে না। বাবা শুনলে—

সরোজিনী ম্লান হাসল।

—তবে তোদের মাস্টারদের? সব মাস্টার নয়। ঐ যে-মাস্টারের কথা বলিস—খুব ভালোবাসে তোকে?

গোপাল চিন্তা করে বললে, থাক্ মা, কাউকে দিয়ে দরকার নেই। সেবার এই পেয়ারা নিয়ে বাবা কি রকম অশান্তিটা করলে মনে আছে তো?

হঠাৎ সরোজিনীর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। আজ ছেলের মুখে সেইদিনের কথা উঠতেই তার যেন নতুন করে লজ্জা হল। সরোজিনী মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি।

সামান্য পেয়াবা—কিন্তু অসামান্য আকর্ষণ তাদের দুজনের। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুজনেব আকর্ষণ দু'রকমের।

শচী বিশ্বাস বাজাবে একটা মুদিখানার দোকানে কাজ করে। সামান্য মাইনে। এ মাইনেতে এ বাজারে সংসাব চলে না। এ নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করছে কর্তার কাছে। কর্তা স্তোকবাক্য দিয়েছেন—সুদিন আসুক. দোকান বেশ চালু হোক. মাইনে বাড়াব বৈকি। এখনি মাইনে না বাড়াবাব পক্ষে তিনি আরও যুক্তি দেখিয়েছেন, ভোলার দিকে চেয়ে দেখো দিকি। ও-ও তো তোমার সমানই কাজ কবে।—তবু তোমাব চেয়ে ওর মাইনে কম। ও সংসার চালায় কি করে?

শচীর মুখে উত্তর আসছিল, কিন্তু সামলে নিযেছিল। বলতে চেয়েছিল—তার সঙ্গে ভোলার তুলনা হয় না। ভোলাব একার ঘাড়ে সংসার নেই। তার বাবা নিজে হাতে লাঙ্গল ঠেলে—কিছু জমি আছে। আব সবচেয়ে বড়ো কথা ভোলা ছেলেমানুষ—তারই গোপালের সময়বসী, ভবিষ্যৎও আছে।

এমন উত্তর সে মনে মনে সর্বদাই আলোচনা কবে, কিন্তু মুখ ফুটে বলে না। জানে, বলে কিছু লাভ নেই। শুধু শুধু মালিককে চটানো।

শচী বিশ্বাস অনেক সময়ে ভেবেছে, চাকবি ছাড়া আরও কিছু করে। কিন্তু সময় কই? সকাল সাতটার মধ্যে তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে, ফিরবে দেড়টা-দুটোর সময়। তাবপর নেয়ে-খেযেই আবার তিনটের মধ্যে বেরোতে হবে, ফিরতে রাত নটা। সে যে কিছু চিন্তা কববে এ অবসরও নেই। শুধু একা একা যখন সে খররৌদ্রে বিবর্ণ ছাতাটি মাথায় দিযে, কাঁধে ফতুয়া ফেলে, ছেঁড়া কেড্‌সের অসহযোগিতা উপেক্ষা কবে ক্লান্ত শরীরটা টানতে টানতে বাড়ি ফেরে, কিম্বা রাত্রি নটার পর হারিকেন হাতে ছাতা দিয়ে পথ ঠুকতে ঠুকতে ঘরমুখো হাঁটে তখনই যা একটু নিজের কথা ভাববার সুযোগ পায়। তার জীবনের এত দুঃখ তার গায় লাগত না যদি সে একটা মনের মতো স্ত্রী পেত। অর্থাৎ এমন স্ত্রী—যার কাছে দুঃখের কথা নিঃসংকোচে বলে ফেলে লাঘব হতে পাবত, হয়তো স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু সুপরামর্শও পেত। কিন্তু সরোজিনী সে জাতেব স্ত্রী নয। এতে বয়েস হল তবু তার ছেলেমানুষি আর অভিমান যায না। শচী লক্ষ্য করে দেখেছে সংসারে সরোজিনীর দুটি আকর্ষণ—একটি ঐ পেয়ারা গাছ, কবে পেয়াবা ফলবে আর ঐ গোপাল, কবে সে লেখাপড়া শিখে 'মানুষ' হবে! ঝাড়ু মারো লেখাপড়ার মাথায়। তার চেয়ে ছোঁড়াটাকে যদি কোথাও কোনো দোকানে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পাবত তাহলে দু'পয়সা আসত। আব ঐ পেয়ারা? হ্যাঁ, ফলুক—তবে তোমাদের সেবার আর বিলোবার জন্যে নয়; ফলনটা ভালোই হয়—বড়ো বড়ো সাইজ—ঠিক যেন কাশীর পেয়ারা—তা এক একটা দু'পয়সা না হোক পাঁচ পয়সায় কাটবেই।

কিন্তু পয়সা উপায়ের এই দুটি সহজ উপায় কিছুতেই সরোজিনী হতে দেবে না। সাহাদের কাপড়ের দোকানে একটা ছেলে যাচ্ছিল, সুসংবাদটা দেবার জন্যে শচী সেদিন একটু বেশি উৎসাহেই কথাটা সরোজিনীর কাছে পেড়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য—সরোজিনী কথার তো কোনো উত্তর দেয়ই-নি—উপরন্তু কেঁদে কেটে উপোস করে যা-তা কাণ্ড করেছিল।

একটা ক্রূর হাসি হেসেছিল সেদিন শচী বিশ্বাস। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে 'মানুষ' করে তুলবেন উনি!

শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা জেদ বজায় রাখতে পেরেছিল। ছেলের পড়া ছাড়াতে পারে নি বটে, কিন্তু ছেলেকে দিয়ে পেয়ারা বিক্রি করতে পাঠিয়েছিল। গোপাল পেয়ারার ঝাঁকা নিয়ে কিছুতেই বাজারে বসতে পারে নি। ট্রেনে ফেরি করেছে। সেটা বরঞ্চ তার পক্ষে সহজ—আর কিছুটা আনন্দও আছে। ট্রেনে চড়ার আনন্দ—বিনা ভাড়ায়। কাটোয়া লাইনে বিকেলের ডাউন ট্রেনে ওঠে। আবার পরের আপ ট্রেনে ঝুড়ি খালি করে ফেরে। স্টেশন অনেক দূর— সেখানে চেনা-শোনা বন্ধুবান্ধব কেউ যায় না, তবুও গোপাল ঘুরপথে স্টেশনে যায়। সরোজিনী খুব যত্ন করে ঝুড়িটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় যাতে রাস্তায় কেউ দেখতে না পায়। ট্রেনে উঠে একটা স্টেশন পার হলে গোপাল সরু মিঠেগলায় কোনো রকমে হাঁকে— পেয়ারা চাই—ভালো পেয়ারা।

আষাঢ়ের শেষ থেকে শ্রাবণের শেষ পর্যন্ত এমনি করে তাকে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরতে হয় বিকেলে।

শচী খুশি হল। এখন থেকে তারও দৃষ্টি ঐ পেয়ারা গাছটার দিকে। বৈশাখের রোদে যখন গাছগুলো ঝলসে যায় তখন সরোজিনীর মতো সেও চিন্তিত হয়। সরোজিনীর দেখাদেখি স্নানের সময়ে কোনো কোনো দিন সেও গাছের গোড়ায় জল ঢালে, জীর্ণ পাতার জঞ্জাল ঝুড়ি করে ফেলে দেয়। আর লুব্ধদৃষ্টিতে তাকায়—কবে পেয়ারা ফলবে। এক একটা পেয়ারা ছ'পয়সা। মনে মনে শচী হিসেব করে।

দেখতে দেখতে জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে যায়। পেয়ারা গাছে কালি ধরেছে। দুজনেই উৎসুকভাবে তাকায়, কিন্তু দুজনের দৃষ্টিতে ভিন্ন রকমের ভাষা। তারপর আষাঢ়ে প্রথম বৃষ্টির দিনে যখন সরোজিনীকে দেখে গোপালের সঙ্গে মনের আনন্দে পেয়ারাতলায় ভিজছে, তখন শচীরও ইচ্ছে করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু পারে না। ভয় করে, যদি নতুন বর্ষার জলে জ্বর হয়ে যায়। ঘরে বসেই তখন সে কল্পনা করে—এ বছরও তাহলে তার গাছে পেয়ারা হবে, বেশ বড়ো বড়ো পেয়ারা। আঃ, এরকম যদি আর দুটো গাছ থাকত!

শচীর কিন্তু আর তর সয় না। পেয়ারাগুলো সবে একটু বড়ো হয়েছে, তখনই বেচাবার জন্যে মন উস্‌খুস্ করে। কিন্তু পারে না। সরোজিনী বাধা দেয়—প্রচণ্ড বাধা। বলে, বিক্রি করবে করো, কিন্তু দোহাই তোমার, একটু ডাগর হতে দাও।

শচী বিরক্ত হয়ে বলে, আঃ কী মুশকিল! ডাগর হতে হতে কী এগুলো আর থাকবে! ছেলের দল টের পেলে গাছকে গাছ শেষ করে দেবে।—বোধ হয় অনেক বিবেচনা করেই নিজের ছেলে আর মায়ের কথা উল্লেখ করল না। কল্পিত ছেলের দলের ঘাড়েই দোষটা চাপিয়ে দিলে।

কিন্তু সরোজিনীকে বোঝানো গেল না। সে শুধু একই কথা বলে, সব জিনিসের একটা সময় আছে।

অগত্যা শচীকে অপেক্ষা করতেই হয়। ওরা মা আর ছেলে একদিকে। বিগড়ে গেলে হয়তো আর পেয়ারা নিয়ে বেরোবেই না।

এরই মধ্যে একদিন ঘটল সেই অপমানকর ঘটনাটা।

অনেক কষ্টে স্বামীর লুব্ধ কঠোর হাতের নাগাল থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পেয়ারাগুলিকে বড়ো করেছিল। কিন্তু নিজের হাতের অতি যত্নের পেয়ারা সে কি কাউকে না দিয়ে খাওয়া যায়, না বেচা যায়। সরোজিনী গামছায় করে অনেকগুলি পেয়ারা গোপালের হাতে দিয়েছিল তার বন্ধুদের দেবার জন্যে। বাবা বাড়ি ফেরবার আগেই চুপি চুপি গোপাল বেরিয়ে গিয়েছিল। কী জানি বাবা যদি কিছু বলে।

শচী কিন্তু সেদিন একটু অসময়েই—অর্থাৎ যথাসময়ের আগেই ফিরেছিল। মুখটা থম থম করছিল—কপালের শিরগুলো ফুলে উঠেছে। যদিও কোনো দিনই বাড়ি ঢুকে সরোজিনীর সঙ্গে মধুর আলাপ হয় না, তবু শচীর সেদিনের মুখের অবস্থা দেখে সরোজিনী কেমন যেন ভয় পেল। তার যেন মনে হল, নিশ্চয় গোপালকে পেয়াবা নিয়ে যেতে দেখে ফেলেছে।

খেতে বসে শচীই প্রথম কথা বললে।

—ওখানে আর কাজ করা পোষাবে না।

সরোজিনী পাখা হাতে বাতাস করছিল। কৌতূহলী দুই চোখ মেলে তাকালো।

শচী শুকনো ভাত শাক দিয়ে মাখতে মাখতে বললে, বোজ রোজ খিট্ খিট্ করে, কাহাতক পাবা যায়। তাই রাগ করে চলে এলাম। বললাম, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

শচী একটু থামল। তারপর বললে, ও বেলা আব যাচ্ছি নে। একলা ঐ ছোঁড়াটাকে দিয়ে ঠেকাক দোকান। দেখি কেমন পাবে।

সবোজিনী এবাবও কোনো কথা বললে না। সে জানে তাব কোনো কথা বলা নিবর্থক।

খেযে উঠে শচী বললে, গোপলা কোথায়?

সবোজিনী প্রমাদ গুনল।

—ইস্কুলে গেছেন নাকি? শচী যেন বিদ্রূপেব সুবে বললে।

এবার সবোজিনী চুপ কবে থাকতে পাবল না। গম্ভীবভাবে শুধু বললে, আজ রবিবার।

শচী বললে, আজ গাড়িতে বেবোবে তো?

সবোজিনী কোনো বকমে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

শচী তামাক সাজতে সাজতে বললে, পেয়ারাগুলো সব খোলামেলা কবে রাখা আছে তো?

—হ্যাঁ।

—ওগুলো বেছে ফেলতে হবে। ছ'পযসা আব চার পযসা। চলো তো এখনই বেছে ফেলি।

এই বলে শচী নিজেই ঘবে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু ঘবে ঢুকতেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। আজ ভোববেলায় কাজে বেরোবার আগে নিজে হাতে পেয়ারাগুলি সে মাটিতে ঢেলে রেখে গিযেছিল। দেখল এরই মধ্যে মাত্র অর্ধেক পড়ে রয়েছে।

শচীর মাথায় যেন খুন চেপে গেল। চিৎকার কবে বললে, পেযারা কোথায গেল? বড়ো বড়ো পেয়ারাগুলো?

একটা ছায়ামূর্তির মতো সরোজিনী দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালো।

শচী চিৎকার করে উঠল—কোথায় পেয়ারাগুলো?

সরোজিনী অস্ফুটকণ্ঠে বললে, গোপাল কয়েকটা নিয়ে গেল ওর বন্ধুদের জন্যে।

—কয়েকটা! শয়তান! তোমরা মা আর ছেলেতে মিলে আমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।

বলেই শচী তখনই বাড়ি থেকে বেরিযে গেল।

কিন্তু গোপালের নাগাল পায় নি। সেইটেই ভাগ্য। নইলে হয়তো তার বন্ধুদের সামনেই পেয়ারাগুলো কেড়ে নিয়ে আসত।

তবু চরম লজ্জার ব্যাপারটা ঘটল পরে। ব্যর্থ ক্রোধে শচী বাড়ি ঢুকেই অন্যত্র পেয়ারা সন্ধান করতে লাগল। তার চেয়ে ঢের বেশি পেয়ারা নিশ্চয় কোথাও লুকানো আছে। লুকিয়ে বেখেছে সরোজিনী নিজে খাওয়ার জন্যে।

খোঁজ আরম্ভ হল। শেষে সত্যিই রান্নাঘরের একপাশে কতকগুলো পেয়াবা পাওযা গেল। সেগুলো যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, তারও অকাট্য প্রমাণ মিলল। সেগুলো ঝুড়ি চাপা দেওয়া ছিল।

ক্রোধে আত্মহারা হয়ে শচী সেই পেয়ারাগুলো দু'হাতে ভরে নিয়ে সরোজিনীর সামনে এসে বললে, এত লোভ! বলেই ছুটে গিয়ে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সরোজিনী শক্ত কাঠের মতো দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে তার লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগল।

তবু এ ব্যাপার ততখানি মর্মান্তিক হত না যদি না গোপাল এটা দেখে ফেলত। সে তখন সবেমাত্র বন্ধুদের পেয়ারা বিলিয়ে বাড়ি এসে পৌঁচেছে। ছেলেমানুষ—মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, আমি অন্য জায়গা থেকে অনেক পেয়ারা তোমার জন্যে এনে দেব। বাবা টেরও পাবে না।

...সেই ঘটনাটাই আজ গোপাল মনে করিয়ে দিল। সরোজিনী মাথা তুলে বললে, হোক অশান্তি। আমি বলছি, তুই পেয়াবা নিয়ে যা।

সরোজিনী জানে ইস্কুলের ঐ বন্ধুবা—ঐ মাস্টারমশাই গোপালকে শুধু ভালোই বাসে না, বই দিয়ে পড়া বুঝিযে অনেক সাহায্য করে। বিনিময়ে তো অন্য কিছু দেবার ক্ষমতা নেই। ভগবান করুন, গোপাল যদি কোনো দিন লেখাপড়া শিখে মানুষ হয় তাহলে—ভাবতে ভাবতে সহসা সরোজিনীব দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

শচী বিশ্বাসের চাকরিটি গেল।

অবশ্য এব জন্যে তাব মালিককে খুব দোষ দেওযা যায না। হঠাৎ বাজার থেকে সরষেব তেল উপে গেল, কেরোসিন তেল দুষ্প্রাপ্য, খোলা বাজাবে চাল বিক্রি নিষিদ্ধ হল। এছাড়া চিনি নেই, সুজি নেই, আটা নেই। দোকানেব মালিক বললে, কি নিযে দোকান করব বিশ্বাসমশাই, বলুন। আমি দোকান তুলে দেব।

শচী বিশ্বাস কোনো কথা বলতে পাবে নি। শুধু কেমন এক বকম অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে ছিল।

দোকান অবশ্য একেবারেই তুলে দেওযা হয়নি। শুধু দুজন কর্মচাবীব জাযগায একজন রাখা হল। ভোলা থাকল—শচী বিশ্বাস গেল।

এই অবস্থাতেও যে কী করে ঐ তিনটি মানুষের জীবন যাপন সম্ভব হয়ে চলেছে সে খবর জানা নেই। তবু এখনো দেখতে পাই তিনটি প্রাণী ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে আছে। আব তাবই মধ্যে মাঝে মাঝে গোপালের ক্ষীণ স্বর শোনা যায—পড়া মুখস্থ কবছে। সন্ধ্যেব অন্ধকাবে সরোজিনীকে দেখলে প্রেতচ্ছায়া বলে মনে হয়—চুপি চুপি কাপড় চাপা দিযে কোন্ উৎসবের বাড়ি থেকে উচ্ছিষ্ট নিয়ে আসছে। শচী বিশ্বাসকে দেখলে মনে হয়— যেন জীবন্ত কংকাল! সারারাত ঘুম নেই—উঠোনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। আর গোপাল—সে যেন শেকড়-কাটা চারা গাছ—পাতা শুকিয়ে আসছে

তবু সে বছরেও আষাঢ় এল। এবং বর্ষার জল পেয়ে সে বছরে পেয়ারার ফলনও হল প্রচুর। কচি কচি ছোটো ছোটো পেয়ারা। সবুজ এবং তাজা। শচী এবং সরোজিনীর নষ্টস্বাস্থ্যের সঙ্গে পাল্লা লাগিয়ে এবার যেন পেয়ারাগুলো বেশি পবিপুষ্ট এবং রসালো হয়ে ফলছে।

শচী আর সরোজিনী দুজনেই পেয়ারাগুলোর দিকে তাকালো। এখনই এমনি—ডাগর হলে এরা না যেন কেমন হবে! কিন্তু—কিন্তু ততদিন তারা বাঁচবে তো! আজ ক'দিন ভাতেব মুখ দেখে নি—শুধু শাকপাতা—শুধু—!

এমনি সময়ে শচীর সেই দশ টাকা ভাড়ার টিনের ঘরের জীর্ণ দ্বাবে কে যেন শেকল নাড়ল।

—বিশ্বেসমশাই, বাড়ি আছেন?

শচী বিশ্বাস দবজা খুলে দিলে।

—সাহামশাই পাঠালেন।

—সাহামশাই! একটা অবিশ্বাস্য আশায় শচী বিশ্বাসের ঘোলাটে চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্ কবে উঠল।

আগন্তুক বললে, একবার আসুন না।

গায়ে ফতুয়া চড়িয়ে শচী বিশ্বাস তখনি বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে এল।

না, তার চাকরি নয়, গোপালের। এমনি একটি ছোট ছেলের দরকাব তাঁব কাপড়ের দোকানে।

এ কথা শুনে সবোজিনী অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

জোঁক

আবু ইসহাক

সেদ্ধ মিষ্টি আলুর কয়েক টুকরো পেটে জামিন দেয় ওসমান। ভাতের অভাবে অন্য কিছু দিয়ে উদরপূর্তির নাম চাষী-মজুরের ভাষায় পেটে জামিন দেয়া। চাল যখন দুর্মূল্য তখন এ ছাড়া উপায় কি?

ওসমান হুক্কা নিয়ে বসে। মাজু বিবি নিয়ে আসে রয়নার তেলের বোতল, হাতের তেলোয় ঢেলে সে স্বামীর পিঠে মালিশ করতে শুরু করে।

ছ'বছরের মেয়ে টুনি জিজ্ঞেস করে—এই তেল মালিশ করলে কি অয় মা?

—পানিতে কামড়াইতে পারে না। উত্তর দেয় মাজু বিবি।

—পানিতে কামড়ায়! পানির কি দাঁত আছে নি?

—আছে না আবার। ওসমান হাসে।—দাঁত না থাকলে 'কামড়ায়' ক্যামনে?

টুনি হয়ত বিশ্বাস করত। কিন্তু মাজু বিবি বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে—ঘাস-লতা-পাতা, কচু-ঘেচু পইচ্যা বিলের পানি খারাপ অইয়া যায়। অই পানি গতরে লাগলে কুটকুট করে। ওরেই কয় পানিতে কামড়ায়।

ওসমান হুক্কা রেখে হাঁক দেয়—কই গেলি তোতা? তামুকের ডিব্বা আর আগুনের মালশা লইয়া নায় যা। আমি আইতে আছি।

তেল নিয়ে এবার ওসমান নিজেই শুরু করে। পা থেকে গলা পর্যন্ত ভাল করে মালিশ করে। মাথা আর মুখে মাখে সর্ষের তেল। তারপর কাস্তে আর হুক্কা নিয়ে সে নৌকায় ওঠে।

. তেরোহাতি ডিঙিটাকে বেয়ে চলে দশ বছরের ছেলে তোতা। ওসমান পায়ের চটচটে তেল মালিশ করতে করতে চারদিকে চোখ বুলায়।

শ্রাবণ মাসের শেষ। বর্ষার ভরা যৌবন এখন। খামখেয়ালী বর্ষণ বৃষ্টির। আউশ ধান উঠে যাওয়ায় আমন ধানের গাছগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সতেজ ডগা চিকচিক করছে ভোরের রোদে।

দেখতে দেখতে পাটক্ষেতে এসে যায় নৌকা। পাটগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ওসমানের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। যেমন মোটা হয়েছে, লম্বাও হয়েছে প্রায় দুই মানুষ সমান। তার খাটুনি সার্থক হয়েছে। সে কি যেমন-তেমন খাটুনি! রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে ক্ষেত চষোরে—ঢেলা ভাঙ্গোরে—'উড়া' বাছোরে—তারপর বৃষ্টি হলে আর এক চাষ দিয়ে বীজ বোন। পাটের চারা বড় হয়ে উঠলে আবার ঘাস বাছো, 'বাছট' করো। 'বাছট' করে খাটো চিকন গাছগুলোকে তুলে না ফেললে সবগুলোই টিঙটিঙে থেকে যায়। কোষ্টাই আর পাওয়া যায় না মোটেই।

এত পরিশ্রমের ফসল কিন্তু তার একার নয়। সে-ত শুধু ভাগচাষী। জমির মালিক 'ওয়াজেদ চৌধুরী ঢাকায় বড় চাকরী করেন। দেশে গোমস্তা রেখেছেন। সে কড়ায় গণ্ডায় অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেয়। মরশুমের সময় তাঁর ছেলে ইউসুফ ঢাকা থেকে আসে। ধান

পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার ঢাকা চলে যায়। গত বছর বাইনের সময় ও একবার এসেছিল। এসে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়ে গেছে ভাগচাষীদের। এর আগে জমির বিলি ব্যবস্থা মুখেমুখেই চলত।

দীর্ঘ সুপুষ্ট পাটগাছ দেখে যে আনন্দ হয়েছিল ওসমানের, তার অনেকটা নিভে যায় এসব চিন্তায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ভাবে—আহা, তার মেহনতের ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত।

ওসমান লুঙ্গিটাকে কাছা মেরে নেয়। জোঁকের ভয়ে শক্ত করেই কাছা মারতে হয়। ফাঁক পেলে জোঁক নাকি মলদ্বার দিয়ে পেটের মধ্যে গিয়ে নাড়ী কেটে দেয়।

ওসমান পানিতে নামে। পচাপানি কবরেজি পাচনের মত দেখতে। গত দু'বছরের মত বন্যা হয়নি এবার। তবু বুক-সমান পানি পাটক্ষেতে। এ পাট না ডুবিয়ে কাটবার উপায় নেই।

কতকগুলো পাটগাছ একত্র করে দড়ি দিয়ে বাঁধে ওসমান। ছাতার মত যে ছাউনিটা হয় তার নিচে হুক্কা, তামাকের ডিবা, আগুনের মালশা ঝুলিয়ে রাখে সে 'টাঙনা' দিয়ে।

নৌকা থেকে কাস্তেটা তুলে নিয়ে একবার সে বলে, তুই নাও লইয়া যা গা। ইস্কুলতন তাড়াতাড়ি আইসা পড়বি।

—ইস্কুল তো চাইট্টার সময় ছুট্টি অইব।

—তুই ছুট্টি লইয়া আগে চইলা আইস্।

—ছুট্টি দিতে চায় না যে মাস্টার সাব।

—কামের সময় ছুট্টি দিতে পারব না, কেমুন কথা। ছুট্টি না দিলে জিগাইস্, আমার পাটগুলা জাগ দিয়া দিতে পারবনি তোর মাস্টার।

তোতা নৌকা বেযে চলে যায়। ওসমান ডুবের পর ডুব দিযে চলে। লোহাকর দোকান থেকে সদ্য আল কাটিয়ে আনা ধাবাল কাস্তে দিয়ে সে পাটের গোড়া কাটে। কিন্তু চার-পাঁচটার বেশী পাট কাটতে পাবে না একডুবে। এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লেগে যায়। একেব পর এক দশ-বারো ডুব দিয়ে হাঁপিযে-ওঠা দমটাকে তাজা করবাব জন্যে জিবোবার দরকাব হয়। কিন্তু এই জিরোবাব সময়টুকুও বৃথা নষ্ট করবার উপায় নেই। কাস্তেটা মুখ দিয়ে কামড়ে ধবে হাতা বাঁধতে হয এ সময়। প্রথম দিকে দশ ডুবে তিন হাতা কেটে জিবানো দরকার হয। কিন্তু ডুবের এই হাব বেশীক্ষণ থাকে না। ক্রমে আট ডুব, ছয় ডুব, চার ডুব, দুই ডুব এমন কি এক ডুবেব পবেও জিরানো দরকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ডুবপ্রতি কাটা পাটেব পরিমাণও কমতে থাকে। শুরুতে যে এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লাগে তা কাটতে শেষের দিকে লেগে যায় সাত-আট ডুব।

পেটের জামিনেব মেয়াদ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কাজ ভালই হয। মাঝে মাঝে তামাক টেনে একটু গরম কবে নিতে হয় শরীরটাকে, এই যা। বেলা ঠিকের ওপর উঠবার আগেই পেটের মধ্যেব ক্ষুধা-রাক্ষস খাম খাম শুরু করে দেয়। ওসমান আমল দেয় না প্রথম দিকে। পাট কেটেই চলে ডুব দিযে দিযে। কিন্তু আমল দিতে হয় যখন মোচড়ানি শুরু হয় নাড়ী ভুঁড়িব মধ্যে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে, হাত-পাগুলো নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে।

ওসমান একবার ভাবে ঘরে যাওয়ার কথা। ডাকবে নাকি সে ছেলেকে নৌকা নিযে আসবার জন্যে? কিন্তু কাজ যে অর্ধেকও হয়নি এখনো। আশি হাতা পাট কাটাব সঙ্কল্প নিয়ে সে জমিতে এসেছে।

পরক্ষণেই আবার সে ভাবে—তোতা তো এখনো ইস্কুল থেকেই ফেরেনি। আর ঘরে এত সকালে রান্না হওয়ার কথাও তো নয়।

পাশেই কিছুদূরে একটা শালুক ফুল দেখতে পায় ওসমান। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পেটের জামিন দেয়ার এত সহজ উপায়টা মনে না থাকার জন্য নিজের ওপর বিরক্ত হয় সে। এদিক ওদিক থেকে ডুব দিয়ে সে শালুক তোলে গোটা দশ-বারো। ক্ষুধার জ্বালায় বিকট গন্ধ উপেক্ষা করে কাঁচাই খেয়ে ফেলে তার কয়েকটা। বাকীগুলো মালশার আগুনে পুড়িয়ে খেযে নেয়।

ওসমান আবার শুরু করে—সেই ডুব দেযা, পাটেব গোড়া কাটা, হাতা বাঁধা।

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। প্রত্যেক ডুবের পর জিরোতে হয় এখন। পাটও একটা দু'টোর বেশী কাটা যায় না এক ডুবে। অনেকক্ষণ পানিতে থাকার দরুন শরীরে মালিশ-করা তেল ধুয়ে গেছে। পানির কামড়ানি শুরু হযে গেছে এখন। ওসমানের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে গালাগাল দিয়ে ওঠে, আমরা না খাইয়া শুকাইয়া মরি, আর এই শালাব পাটগুলা মোট্টা অইছে কত। কাচিতে ধরে না। ক্যান্, চিক্কন চিক্কন অইতে দোষ আছিল কি? হে আইলে এক পোচে দিতাম সাবাড় কইরা।

ওসমান তামাক খেতে গিযে দেখে মালশার আগুন নিভে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল এক পশলা। পাটগাছের ছাউনি বৃষ্টি ঠেকাতে পারেনি।

ওসমান এবার ক্ষেপে যায়। গা চুলকাতে চুলকাতে সে একচোট গালাগাল ছাড়ে বৃষ্টি আর পচা পানির উদ্দেশে। তারপর হঠাৎ জমিব মালিকের ওপর গিয়ে পড়ে তার বাগ। সে বিড়বিড় করে বলে, ব্যাডা তো ঢাকার শহরে ফটো বাবু অইয়া বইসা আছে। থাবাডা দিযা আধাড়া ভাগ লইয়া যাইব। ব্যাডাবে একদিন পচা পানিব কামড় খাওয়াইতে পারতাম।

ওসমান আজ আর কাজ করবে না। সিদ্ধান্ত করবার সাথে সাথে সে জোবে ডাক দেয়, তোতারে—উ—

দুই ডাকের পর ওদিক থেকে সাড়া আসে, আহি—অ—

—আয়, তোর আহিডা বাইর করমু হনে।

পাটের হাতাগুলো এক জায়গায় জড় করতে করতে গজগজ কবে ওসমান, আমি বুইড়্যা খাইট্যা মরি আর ওরা একপাল আছে বইসা গিলবার।

তোতা নৌকা নিয়ে আসে। এত সকালে তার আসাব কথা নয়। তবুও ওসমান ফেটে পড়ে, এতক্ষণ কি করছিলি, অ্যাঁ? তোরে না কইছিলাম ছুট্টি লইয়া আগে আইতে? ছুট্টি না দিলে পলাইয়া আইতে পারস্ নাই?

—আগেই আইছিলাম। মাই কইছিল—আর একটু দেরী কর। ভাত অইলে ফ্যানডা লইয়া যাইস।

তোতা মাটির খোরাটা এগিয়ে দেয়।

লবণ মেশান এক খোরা ফেন। ওসমান পানির মধ্যে দাঁড়িয়েই চুমুক দেয়। সবটা শেষ করে অস্ফুট স্বরে বলে, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্।

ফেনটুকু পাঠিয়েছে এজন্যে স্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানায় তার অন্তরের ভাষা। ঐ রকম খাটুনির পর এ ফেনটুকু পেটে না দিলে সে পানি থেকে উঠতেই পারে না নৌকার ওপর। এবার আউশ ধান কাটার সময় থেকেই এ দশা হয়েছে। অথচ কতই-বা আর তার বয়স। চল্লিশ হয়েছে কি হয়নি।

ওসমান পাটের হাতাগুলো তুলে ধরে। তোতা সেগুলো টেনে তোলে নৌকায়। গুণে গুণে সাজিয়ে রাখে। পাট তুলতে তুলতে ওসমান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে, কি রান্‌ছে রে তোর মা?

—ট্যাংরা মাছ আর কলমী শাক।

—মাছ পাইল কই?

—বড়শী দিয়া ধরছিল মায়।

ওসমান খুশী হয়।

পাট সব তোলা হয়ে গেলে ওসমান নৌকায় ওঠে। নৌকার কাণিতে দুই হাতের ভব রেখে অতি কষ্টে তাকে উঠতে হয়।

—তোমার পায়ে কালা উইডা কী বাজান? তোতা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে।

—কই?

—উই যে! জোঁক না জানি কী! আঙ্গুল দিয়ে দেখায় তোতা।

—হ, জোঁকই তো রে! এইডা আবার কোনসুম লাগল? শিগগীর কাচিটা দে।

তোতা কাস্তেটা এগিয়ে দেয়। ভয়ে তার শরীরের সমস্ত রোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ডান পায়েব হাঁটুর একটু ওপবেই ধরেছে জোঁকটা। প্রায় বিঘতখানেক লম্বা। করাতে জোঁক। বক্ত খেয়ে ধুমসে উঠেছে।

ওসমান কাস্তেটা জোঁকেব বুকেব তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এবার একটা শক্ত কাঠি দিয়ে জোঁকটা কাস্তের সাথে চেপে ধবে পোচ মাবে সে। জোঁকটা দু'টুকবো হয়ে যায়। রক্ত ঝরাতে ঝবাতে খসে পড়ে পা থেকে।

—আঃ, বাঁচলাম রে! ওসমান স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলে।

—ইস্, কত বক্ত! তোতা শিউবে ওঠে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ওসমান তাড়া দেয়, নে এইবাব লগি মাব তাড়াতাড়ি।

তোতা পাটবোঝাই নৌকাটা বেয়ে নিয়ে চলে।

জোঁক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝবছে। সে দিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান কেমুন কইর‍্যা জোঁকে ধরল তোমাবে, টেব পাও নাই?

—না রে বাজান, এগুলো কেমুন কইর‍্যা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টেব পাইলে কি আব বক্ত খাইতে পাবে!

—জোঁকটা কত বড়, বাপপুসরে—

—দুও বোকা! এইডা আব এমুন কী জোঁক! এবচে' বড জোঁকও আছে।

জমি থেকে পাট কেটে ফেলাব পরেও ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক। জাগ দেয়া, কোষ্টা ছাড়ান, কোষ্টা ধুয়ে পরিষ্কার করা, রোদে শুকানো—এ কাজগুলোও কম মেহনতের নয়।

পাট শুকাতে না শুকাতেই চৌধুরীদের গোমস্তা আসে। একজন কয়াল ও দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে সে নৌকা ভিড়ায় ওসমানের বাড়ীব ঘাটে।

বাপ-বেটায় শুকনো পাট এনে বাখে উঠানে। মেপে মেপে তিন ভাগ কবে কয়াল।

ওসমান ভাবে, তবে কি তে-ভাগা আইন পাশ হয়ে গেছে? তার মনে খুশী ঝলক দিয়ে ওঠে।

গোমস্তা হাঁক দেয়, কই ওসমান, দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দ্যাও।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—আরে মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? যাও।

—আমারে কি এক ভাগ দিলেন নি?

—হ।

—ক্যান?

—ক্যান আবার! নতুন আইন অইছে জান না? তে-ভাগা আইন।

—তে-ভাগা আইন! আমি তো হে অইলে দুই ভাগ পাইমু।

—হ, দিব হনে তোমারে দুই ভাগ। যাও ছোড হুজুরের কাছে।

—হ এহনই যাইমু।

—আইচ্ছা যাইও যহন ইচ্ছা। এহন পাট দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দিয়া কথা কও।

—না, দিমু না পাট। জিগাইয়া আহি।

—আরে আমার লগে রাগ করলে কি অইব? যদি হুজুর ফিরাইয়া দিতে কন তহন না হয় কানে আইট্যা ফিরত দিয়া যাইমু।

ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ বৈঠকখানায় বারান্দায় বসে সিগারেট ফুঁকছে। ওসমান তার কাছে এগিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। তার পেছনে তোতা।

—হুজুর, ব্যাপারডা কিছু বুঝতে পারলাম না। ওসমান বলে।

—কী ব্যাপার? সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ইউসুফ।

—হুজুর, তিন ভাগ কইর‍্যা এক ভাগ দিছে আমারে।

—হ্যাঁ, ঠিকই তো দিয়েছে।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—বুঝতে পারলে না? লাঙ্গল-গরু কেনার জন্যে টাকা নিয়েছিলে যে পাঁচশ'।

ওসমান যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—আমি টাকা নিছি? কবে নিলাম হুজুর?

—হ্যাঁ, এখন তো মনে থাকবেই না। গত বছর কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলে, মনে পড়ে? গরু-লাঙ্গল কেনার জন্যে টাকা দিয়েছি। তাই আমরা পাব দু'ভাগ, তোমবা পাবে একভাগ। তে-ভাগা আইন পাশ হয়ে গেলে আধা-আধা সেই আগের মত পাবে।

—আমি টাকা নেই নাই। এই রকম জুলুম খোদাও সহ্য কবব না।

—যা-যা ব্যাটা, বেরো। বেশী তেড়িবেড়ি করলে এক কড়া জমি দেব না কোন ব্যাটারে।

ওসমান টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ছেলের হাত ধরে।

ইউসুফ ক্রূর হাসি হেসে বলে, তে-ভাগা। তে-ভাগা আইন পাশ হওয়ার আগে থেকেই রিহার্সাল দিয়ে রাখছি।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার সে বলে, আইন। আইন করে কি আর আমাদের আটকাতে পারে। আমরা সুচের ফুটো দিয়ে আসি আর যাই। হোকনা আইন। কিন্তু আমরা জানি, কেমন করে আইনকে 'বাইপাস' করতে হয়। হুঁহ্ হুঁ।

শেষের কথাগুলো ইউসুফের নিজের নয়। পিতার কথাগুলোই ছেলে বলে পিতার অনুকরণে।

গত বছরের কথা। প্রস্তাবিত তে-ভাগা আইনের খবর কাগজে পড়ে ওয়াজেদ চৌধুরী এমনি করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন কথাগুলো।

আইনের একটা ধারায় ছিল—"জমির মালিক লাঙ্গল-গরু সরবরাহ করিলে বা ঐ উদ্দেশ্যে টাকা দিলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পাইবেন।" এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের জন্যে তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে কাগজে কাগজে টিপসই আনিয়েছিলেন ভাগ-চাষীদের।

ফেরবার পথে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান কেমুন কইর‍্যা লেইখ্যা রাখছিল? টিপ দেওনের সময় টের পাও নাই?

ছেলের প্রশ্নের উত্তর দেয় না ওসমান। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হয়—আহ্-হা-রে।

তোতা চমকে তাকায় পিতার মুখের দিকে। পিতার এমন চেহারা সে আর কখনো দেখেনি।

চৌধুরীবাড়ির সীমানা পার হতেই ওসমান দেখে—করিম গাজী, নবু খাঁ ও আরো দশ-বারোজন ভাগচাষী এদিকেই আসছে।

করিম গাজী ডাক দেয়, কি মিয়া, শেখের পো? যাও কই?

—গেছিলাম এই বড় বাড়ী। ওসমান উত্তর দেয়।

—আমারে মিয়া মাইর‍্যা ফালাইছে একেরে। আমি বোলে টাকা নিছিলাম পাঁচশ'।

কথা শেষ না হতেই নবু খাঁ বলে, ও, তুমিও টিপ দিছিলা কাগজে?

—হ ভাই, কেমুন কইর‍্যা যে কলমের খোঁচায় কি লেইখ্যা থুইছিল কিছুই টের পাই নাই। টের পাইলে কি আর এমুনডা অয়। টিপ নেওনের সময় গোমস্তা কইছিল, ''জমি বর্গা নিবা তার একটা দলিল থাকা তো দরকার।''

—হ, বেবাক মাইনষেরেই এমবায় ঠকাইছে। করিম গাজী বলে, আরে মিয়া, এমুন কারবারডা অইল আর তুমি ফির‍্যা চলছো?

—কি করমু তয়?

—কি কববা! খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী, চল আমাগ লগে দেখি, কি করতে পারি।

করিম গাজী তাড়া দেয়, কি মিযা, চাইয়া রইছ ক্যান? আরে এমনেও মরছি অমনেও মবছি। একটা কিছু না কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু?

ওসমান তোতাকে ঠেলে দিযে বলে, তুই বাড়ী যা গা।

তার ঝিমিয়ে-পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে—হ, চল। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।

আজ কাল পরশু

মিহির আচার্য

Capitalism violates the world as a senile old man violates a young, healthy woman whom he is impotent to impregnate with anything besides the diseases of senility. —*Gorky*

মাসাধিককাল ধরে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন সত্যেনকে উৎপীড়িত কবছে। স্বপ্নের চেহাবাটা এইরকম ঃ একটি জরদ্গব বৃদ্ধ যুবতীকে ধর্ষণ করছে।

এবং আরো আশ্চর্য, সত্যেন এই স্বপ্নদৃশ্যটি প্রত্যক্ষদর্শীর মতন হুবহু বর্ণনা কবতে পাবছে। অথচ ধর্ষণ সে দেখে নি, সে সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতাই তাব নেই। অবশ্য পিকাসোব ক্লাসিক ছবি 'বেপ' সে এক ধনী বন্ধুর বাড়িতে দেখেছে। তাব সঙ্গে ওব স্বপ্ন-দর্শনের কোনো মিল নেই।

এই তো এখন চোখ বন্ধ করে ঘবে শুযে আছে, আব সেই সুযোগে সমস্ত দৃশ্যটা সে আনুপূর্বিক দেখতে পাচ্ছে।

বৃদ্ধের দন্তহীন মুখ থেকে লালা বার হচ্ছে, ঠোঁটেব কিনারে জমা থুতু, অক্ষিগোলক যেন ঠিকবে বেরুচ্ছে, সমস্ত শরীর গ্রীষ্মের কুকুরেব মত ভযাবহ ওঠা-নামা করছে, আব দেহ-গলা ঘাম, ঘামের নদী।

বুকের তলায় যুবতী মেয়েটি, নগ্নদেহ, বৃদ্ধের স্বেদে জবজবে বাসী ভিজে জবাফুলেব গন্ধ, ঈষৎ বিস্ফারিত অধব, নিশ্বাস নিযমিত পড়ছে কিনা বোঝা যায় না। আশ্চর্য যৌবনসমৃদ্ধ শবীর, কঠিন স্তনচূড়া, বিবৃত জঙ্ঘাপ্রদেশ, ভাবি নিতম্ব, ঈষৎ স্ফীত নাভিমূল।

এই বিচিত্র দৃশ্যটি সত্যেনকে অহবহ প্রেতের মতন তাড়া কবছে। অথচ এ-স্বপ্নেব কোনো ব্যাখ্যা নিজের কাছে খুঁজে পাচ্ছে না। তার নির্জ্ঞান মনের কোনো বঞ্চিত কামনাব ছবি বলেও সে মনে করে না।

কারণ সত্যেন প্রথমত বৃদ্ধ নয়, ত্রিশের শিক্ষিত রুচিশীল যুবক। যদিও সে এখনো অবিবাহিত তাব কাবণ সময়াভাব। একটা গবেষণার কাজে সে গভীরভাবে নিযুক্ত।

তার পরিচিত দু'একজনকে এ-দৃশ্যটা সে বলবে ভেবেছে, কিন্তু পারে নি। ভাবতে গেলে সমূহ বিষয়টা এত কুৎসিত যে রুচিবোধে আটকেছে।

এতদিন মনে কবছিল সময়ে এই বিশ্রী ঘটনার ব্যাপারটা সে ভুলে যেতে পারবে। কিন্তু চেষ্টা করেও সে ভুলতে পারল না। বরং বিষয়টা ক্রমশ জটিল হতে লাগল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সত্যেন স্পষ্ট মনে কবতে লাগল ঃ এই বৃদ্ধকে সে দেখেছে। এবং কযেকশ' বছর ধবে দেখছে। নিজের ব্যক্তিগত কাজকর্মে ডুবে থাকার জন্যে সব সময় মনে থাকে নি। 'কয়েকশ' বছর ধরে' কথাটা কেমন তার নিজের কানেই বেসুরো

শোনাল। না, নিজেকে সে জাতিস্মর ভাবে না। তবে সে বুদ্ধিমান যুবক, একটা যুক্তি উদ্ভাবন করতে পারে। যেমন ঃ একেকজনকে দেখলে মনে হয় যেন কতযুগের চেনা!

এই বৃদ্ধ তার তেমনি স্পষ্ট পরিচিত।

এর একদিন যৌবন ছিল, যেমন সব মানুষের থাকে। এবং সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্যস্বরূপ এই মহিলা তার অনেকগুলি সন্তানেব গর্ভধারিণী।

এই ভদ্রলোক সেদিন অযুত বাহুবলের সাহায্যে নিজস্ব একটি ভুবন গড়ে তুলেছিল। এই পৃথিবীকে যেই দেখেছে সৃষ্টিকর্তার তারিফ করেছে; তার বিপুল ঐশ্বর্যের ভাঁড়ারের চাবি ছিল তার হাতে।

সত্যেন বেশ স্পষ্ট মনে করতে পেরে উৎসাহিত হচ্ছে।

তাবপব বোধহয শক্তির নেশায ঘুন ধরল। ওই ভদ্রলোকের তখন মধ্যবয়স।

এবপরের ঘটনা আশ্চর্য জলদ্‌গতিতে বদলে গেল।

একদিন দেখা গেল লোকটি কেবল শয্যায় নিদ্রাসুখ দিচ্ছে, মার্জাবেব মতন ঝিমোচ্ছে। এবং কখন একদা তাব সঞ্চিত শক্তিরাশি দেউলে হযে গেছে।

সেই সময়ই এই চূড়ান্ত দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল।

এক গভীব রাত্রিতে তার ভাঁডারেব চাবি চুবি গেল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখল ভাঁড়াবের সমস্ত চুরি গেছে।

পর পর বউ মরল। পটপট করে ছেলেমেয়েরা মরল। আব ওই লোকটা পাগল বনে গেল।

তার ভাঁড়াবেব ঐশ্বর্য নিযে তস্করেবা কোথায় গেল? সেই দস্যুদলেব গতিবিধি অনুসবণ কবেছে সত্যেন। দূরে বহুদূরে তাবা আকাশের তলায় শিবির পেতেছে। অসুরের মতন একদল মানুষ খাটছে। উঁচু উঁচু ঢেউতোলা ছাউনি রচনা করেছে, আর ছাউনি ফুঁড়ে নলেব মতো দাঁড়ানো হাঁ-করা মুখ। সে-মুখ ড্রাগনেব মতন অগ্নি উদগার কবেছে। আগুনের কালো ধোঁযায় আকাশ মসীমাখা।

ছাউনিব কিছু দূবে মৃত্তিকা, তাব মুখ বিদীর্ণ, আর মুখ থেকে টেনে বাব করা হচ্ছে রাত্রিব মতন কালো অন্ধকার। আর একটা বেরুচ্ছে পুঁজের মতন তরল পদার্থ।

দস্যুরা ওই লোকটির ভাঁড়ার চুরি কবে এই সমস্ত রাজসূযের আয়োজন কবেছে।

তারপর ওই লোকটি একদিন দেখল কাতারে কাতাবে মানুষ বন্যায় ভেসে যাওয়া কুটোর মতন কোথায় ছুটছে। তার ভুবন বিজয়ার মণ্ডপের মতন খাঁ খাঁ কবছে।

উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারার মতন একদিন সেও জনস্রোতে ভেসে এল।

দেখল সেই ছাউনি, সেই অগ্নিবমনকারী আকাশস্পর্শী নল। সেই মৃত্তিকাগর্ভেব অঙ্গার, আর তরল পুঁজ। এগুলি যে তারই ঐশ্বর্য থেকে ছিনিয়ে নেয়া, বুঝতে পাবল না।

মধ্যবয়স এবং অভিজ্ঞ দেখে দস্যুবা তাকে কাজকর্মেব তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করল। লোকটা পরের সম্পত্তিকে নিজের বলে মনে করে রক্ষণা-বেক্ষণ করতে লাগল।

এখানেও এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠেছে। নতুন নতুন বসতি। নতুন নতুন মানুষ। পাকা মজবুত ইমারত গড়ে উঠল। ইমাবত ছাড়িয়ে একটু দূবে ব্যাবাকের সঙ্গে ভাটিখানা। ভাটিখানাব গাযে ছেনাল মেযেমানুষ। যেন দিনান্তের খাটনিব পর কালোকোলো মানুষগুলো একটু বিশ্রাম পায়, সন্তোষ পায। কিন্তু পাপকে তো উলঙ্গ করে দিলে চলবে না। তাই ত্রিশূলমার্কা গম্বুজ ধরনের বাড়ি বানাতে হল। সেখানে সারা সপ্তাহের পাপ ধুয়ে ওরা আবার পরেব সপ্তাহের জন্যে পাপে নোংরা হতে পারবে। আর যারা নাচ গান ভালোবাসে তাদের জন্যে মৃদঙ্গ-শ্রীখোলেরও বন্দোবস্ত রইল।

একদিন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। লোকগুলো ভাটিখানায় গেলনা, কী-এক দুর্বোধ্য গান গাইতে গাইতে দলবদ্ধ পা ফেলে ছাউনিতে এসে ঢুকল, আর তালাগুলি দিল বন্ধ করে।

কী ব্যাপাব? ছুটে এল লোকটি।

ওরা বললে ঃ চাকা আর ঘুরবে না।

কেন, কেন?

রোটি দাও। চারখানা রোটিতে পেট ভরে না মশায়।

লোকটি চিৎকার করে বলল ঃ অধম্ম হবে। ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না তোদের। নে, হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরেব কাছে মার্জনা ভিক্ষে কর।

ওরা ঘোঁত ঘোঁত করে বললে ঃ ঈশ্বর ব্যাটা কটা রোটি খায়?

চুপ, চুপ অভিশাপ লাগবে, মূর্খের দল—

আমাদের মূর্খতার ওপরে তোমবা টিকে আছ।

চুপ চুপ।

হাটে গম নেই।

আকাশে বৃষ্টি নেই।

আমাদের ঘবে আগুন নেই।

কযলা বাড়ন্ত।

তোমবা দশ জাহাজ গম কযলা নিয়ে মাঝগাঙে গেছ। জাহাজের খালাসীবা ফিরে এসে বলেছে তোমরা গম কয়লা গাঙে ঢেলে দিয়েছ।

কে? কে বললে? তাব জিভ খসে পড়বে।

চাকা ঘুরবে না। ঘুরবে না।

তত্ত্বাবধায়ক ছুটল গলফক্লাবে যেখানে ওরা খেলছিল। হুজুর, বিপদ। ওরা চাকা বন্ধ করে দিয়েছে।

দিক।

দিক! আশ্চর্য হল লোকটা।

আমাদের স্টোরে অঢেল মাল। আমরা চালিয়ে যেতে পারব। ওবা পাববে না। রুজিতে টান পড়বে, পেট জ্বলবে। আবার নিজেরাই ওরা চাকা ঘোরাবে।

কিন্তু চাকা ঘুবল না।

এরা অবাক ঃ ওরা ক্ষুধা জয় কবেছে।

তাহলে চাকায় একটু তেল দিয়ে দাও। পিছল হবে।

তেল!

হ্যাঁঃ সাড়ে চারখানা রুটি, আর এক টুকরো কয়লা।

চাকা ঘুরল।

তারপর একদিন মানুষগুলো দেখল আর একটা লোহার ইমারত গড়ে উঠল। আর, লোহার শিরস্ত্রাণ-পরা একদল সিপাহী দিনরাত কুচকাওয়াজ করতে লাগল।

এরা কী করবে?

অধার্মিক ইবলিসদের সৎপথে ফেরাবে।

লোকটির তন্‌খা বেড়ে গেল।

সত্যেন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল ঃ লোকটা ক্রমশ তার সম্পদ-হারানোর দুঃখ ভুলে গেল! এবং বর্তমান কাজটাকেই সে একমাত্র ধ্রুব বলে জ্ঞান করল।

একসময়ে সে হুজুরের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকেও অভিন্ন বলে চিনতে শিখল। সে যে পরের বাগান পাহারা দিচ্ছে এ চেতনাও তার রইল না। লোকটিকে ওরা খাতিরযত্ন করে, শুধু খাতির নয়, তন্‌খার পরিমাণও বাড়ে। লোকটি শৌখিন হয়, গোঁফে সুগন্ধি মাখে, হাতে ফুলছড়ি, আর বার্ডস-আই খায়। অবশ্যই এই সৌভাগ্যকে সে তার যোগ্যতাব পুরস্কার বলে ভাবে।

সত্যেন এক যুগ ধবে এই সকল পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করেছে। তাব নোটবইয়ে লিখে রেখেছে।

আর সবচেয়ে বিস্ময় জেগেছে ওই লোকটিকে দেখে। কেমন বয়সটাকে মধ্যসীমায় আটকে রেখেছে! বাইরে থেকে কেউ ওকে বুঝতে পারে না ওর আসল বয়স কত। ঝুনো নারকেলের মতো নির্দিষ্ট আকৃতিতে শক্ত হয়ে দানা বেঁধে গেছে।

লোকটা বার্ডস-আই খায়, ফুলছড়ি নিয়ে হাঁটে। কানে-গোঁজা তুলোয় আতরের গন্ধ।

ওর বউ মরেছে, ছেলে নেই, সে-সব স্মৃতি আর তার মনে দাগ কাটে না। বরং সে এখন বিশ্বাস কবে ঃ ওদের এই আত্মত্যাগ সার্বিক মঙ্গলের জন্যে। এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ কবে নি, সেটাও আর-এক ধরনের ত্যাগব্রত বইকি। সে এখন একটা ব্যক্তিমানুষ, ছোটোখাটো সুখদুঃখ সে জাগতিক হিতের কারণে বলি দিয়েছে। এবং সে আশা করে জগৎ তার এই আদর্শ গ্রহণ করবে।

মাঝে মাঝে তাকে বক্তৃতা দিতেও যেতে হয়। ফোটোগ্রাফাব হরেক পোজে ছবি তোলে। কাগজে সে সব ছবি বেবোয। একথা সে বুঝেছে বোজই একটা-না-একটা অজুহাতে তার ছবি কাগজে বের করতে হবে। যাতে সাধারণের সামনে তার উপস্থিতিটা অভ্যাসে পরিণত হয। এটা বড় দবকাবি।

এ সকল ব্যাপাবের সমন্বয় কবতে-করতে সে অদ্ভুত এক আজাদীব স্বাদ পায। এবং কী কবে নিজেব শক্তিকে অত্যন্ত বৃহৎভাবে অনুভব কবে।

সত্যেন বেশ মনে করতে পাবে। এই সকল সন্ধান-সূত্র সে তাব নোট-বইয়ে পরিশ্রম করে টুকে রেখেছে।

তারপর যুগসন্ধিক্ষণে এক গোধূলিলগ্নে হঠাৎ আকাশটা লাল হযে উঠল! দিগন্তে বারুদের গন্ধ। সমুদ্রের নীল জল উথাল-পাথাল।

একটা প্রকাণ্ড-শবীর ঈগল হঠাৎ ডানার পাখসাটে সমস্ত বায়ুস্তবকে মথিত করে উঠল।

আর, দ্যাখো দ্যাখো, সেই গানের আওয়াজে সমুদ্রেব জল তাণ্ডবনৃত্য করতে-কবতে ধেয়ে এল। অরণ্যের পাইনগুলো পায়েব শিকল ভেঙে ঊর্ধ্বে বাহু মেলে এগিযে এল। বিরাট পাহাড় তার জলপ্রপাত বুকে নিযে গুঁড়ি মেবে এগিয়ে এল।

উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম চারদিক থেকে প্রাচীর তুলে একযোগে ওরা ধেয়ে এল।

প্রত্যূষে উঠে ওরা দেখল প্রাচীরের চাপে তাদেব ইমারতগুলো আর্তনাদ তুলে কাঁপছে। লোহার শিরস্ত্রাণ ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল। আর গম্বুজের ত্রিশূলের ধার ঘেঁষে বিরাট ফাটল।

ইমারতের কক্ষে ডাক পড়ল তত্ত্বাবধাযকের।

ওরা বলল ঃ আমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে এই শিবিব।

লোকটি বললে ঃ হুজুর তাহলে এদের কি হবে? এদের ভার কে নেবে?

ওরা বললে ঃ সব ভার তোমার ওপর দিযে যাব। ওরা তোমাকে চেনে। চেষ্টা কবলে তুমি 'ওদেব লোক' হতে পারবে।

লোকটি বললে ঃ ওরা আমাকে মানবে কেন?

মানবে। এই নাও আমাদের বেটন। আমাদের সাধের বেটন তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। কিন্তু মনে রেখো, যে সমস্ত ব্যবস্থা আমরা এতদিন পাকা করে রেখেছি তা যেন ঠিক থাকে। রদবদল করবাব চেষ্টা কোরো না। কারণ এটা জেনো তোমার শক্তি আমরাই, ওই কালোকোলো মানুষগুলো নয়।

এক মধ্যরাত্রির অন্ধকারে লোকটির হাতে স্টোরের চাবি দিয়ে ওরা ডুবো জাহাজে করে পাড়ি দিল।

পরদিন স্টোবের চাবি খুলে লোকটি দেখল ঃ শূন্য ভাণ্ডার। কতিপয় ধাড়ি ইঁদুর মেঝেতে দাপাদাপি করছে। কেবল একটি রুম থেকে বেরুল স্তূপাকার কিছু অব্যবহৃত সম্পদ।

রাইফেল ৩০ হাজার. ১০,০০,০০০ কার্তুজ, ১০,০০০ হাতকড়া, ৫০০ টিয়ার গ্যাসেব শেল, ৭০০০ লোহার শিরস্ত্রাণ। আরও কিছু রাবার গুডস—গোল্ডডলার, গোল্ডকয়েন, থ্রি নাইটস্।

উত্তরাধিকারসূত্রে এই সম্পদগুলি অর্জন করল লোকটি।

তারপর পূর্ণোদ্যমে চাকা ঘুরতে লাগল।

এবং যাতে কালো লোকগুলো কাজে প্রচুর উৎসাহ পায় মাইকে গানের ব্যবস্থা হল। উচ্চাঙ্গের গান, বামধূন জাতীয়। অনর্গল বক্তৃতার টেপ রেকর্ডিং ওদেব কানেব কাছে বাজতে লাগল। 'দোস্ত. বন্ধুগণ—কর্মই নাবাযণ, কর্মেব চেয়ে পবিত্র বস্তু আব কিছু নেই। দেখ বন্ধুগণ, জমানা বদলেছে, আগেব দিনেব মতন চাকা বন্ধ কবা চলবে না। এখন তোমাদেব শ্রম মানেই দেশেব সম্পদবৃদ্ধি। দেশ মাটি নয়, মানুষ। এখন গঠনমূলক কাজ কবতে হবে, দেশকে গড়তে হবে। ভাঁড়াব শূন্য। লক্ষ্মীকে আবার ফিবিয়ে আনতে হবে।'

চাকা বন্‌বন্ কবে ঘুবতে লাগল।

দীর্ঘ বিশ বছব ধরে কাঁচামালে দেশ ছেয়ে গেল।

দু'একজন নিন্দুক গুনগুন কবে উঠল ঃ এত কাঁচামালে কী হবে? এগুলোকে শিল্পে রূপ দেয়া দরকার।

লোকটি নিন্দা শুনে চমকে উঠল। ইমাবতে ফিবে নাকে চশমা দিয়ে আবাব চুক্তিপত্রটা আলোয় তুলে ধবল। সর্বনাশ! শিল্প মানেই দেশেব সমূহ ক্ষতি। আমাদের আরো, আবো কাঁচা মাল উৎপন্ন কবতে হবে।

কাঁচামাল কোথায যাবে? ভিন্‌দেশে। অবশ্য আবার ফিবে আসবে শিল্পের উজ্জ্বল আকাবে ঝলমল হয়ে।

'বন্ধুগণ জেনো শ্রমেব বিভাগ আছে। কোনো শ্রমই ছোটো নয। আমবা ক্রমাগত কাঁচামাল তৈবি কবে ভিন্‌দেশে পাঠাব। পরিবর্তে ঘবে বসে তৈবি শিল্প পেয়ে যাব।'

এবং—

'ভুলে যেওনা, আমাদেব দেশ কাঁচামালেব বাজার। আমবা এর জন্যে গর্বিত, আমাদেব চিরন্তন ঐতিহ্য।'

লোকটি চুক্তিপত্রেব চাব নম্বর অনুচ্ছেদটি আবার পড়ল।

ইদানিং লোকটির কাজ বাড়ল। দৈনিক পাঁচটা উদ্বোধন, বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার, সংবাদপত্রেব প্রতিনিধি, রেডিও ভাষণ।

প্রবলবেগে দেশ এগোতে লাগল।

আর দেশের শোভাও বাড়তে লাগল। মাঠকোঠাগুলোকে ঢেকে ফেলে আকাশচুম্বী দালান উঠল। চওড়া মসৃণ রাজপথ। আলোর প্রপাত।

যে দেখল সে-ই স্বীকার কবল ঃ নিঃশব্দ রক্তপাতহীন বিপ্লবই বটে।

এবপব একদিন ঘুম থেকে উঠে আয়নায় দাঁড়িয়ে লোকটি আবিষ্কাব কবল সে বুড়ো হয়ে গেছে। চুল শনের মতন শাদা, দাঁত পড়েছে, গায়েব চামড়া শ্লথ, চোখে ছানি।

এত শীঘ্র কী করে সে বৃদ্ধ হয়ে গেল। রোজ ভোরে একটা আস্ত কাঁচা বেল খায়। আগে আস্ত দুটো মুরগিব বোস্ট খেত। কিছুদিন ডাক্তাবি পবামর্শে আমিষ বাদ দিয়েছে। ফলমূল তার আহাব। আব ছাগিদুগ্ধ সারা দিনে সের দুয়েক মাত্র।

অথচ কত কাজ বাকি। কতকগুলি যোজনার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্টোরের দিকে এগিয়ে এল লোকটি। ভেতরে পা দিতেই অবাক।

এ কী! ওদের ফেলে-রাখা সেই সম্পদগুলি কোথায়!

স্টোবকীপাব বললে ঃ সার্, ওগুলো তো ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্যবহাব কবা হয়েছে!

এত বাইফেল, কার্তুজ, টিয়াবগ্যাস, হাতকড়া, রাবাব-গুডস্ সব ব্যবহার কবা হযেছে!

হ্যাঁ সাব্। আপনাব নির্দেশমত কাজ হয়েছে। গড়ে আমবা দৈনিক ছ'জন করে লোককে শাসন কবেছি, দৈনিক ত্রিশটা করে কার্তুজ ব্যবহার করেছি, হাতকড়াও দুডজন কবে কাজে লাগানো হযেছে।

আব, আব এই রাবার-গুডস্?

আপনার প্রয়োজনেই লেগেছে দশ প্যাকেট। বাকি অজ্ঞ লোকদেব ব্যবহাব কবতে বাধ্য কবেছি।

স্টোবরুম থেকে দ্রুত ফিবে এল লোকটি।

আপনকক্ষে অনেকক্ষণ গুম হযে বসল। এখন তাকে গম্ভীব চিন্তাশীল দেখাল। অনেকক্ষণ সে চিন্তা কবল, কিন্তু কী যে চিন্তা কবল নিজেই মনে কবতে পাবলনা।

বাইরে প্রচণ্ড নিদাঘ। লু বইছে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণটি কিছুক্ষণ আগে যান্ত্রিক গোলযোগে বিকল হযে গেছে।

লোকটি বিবস্ত্র হযে বাথ-টবে গিযে বসল। গাযে ঠাণ্ডা জল ছুঁড়ল। শবীব শীতল হয় না। সাবা শবীব বৈশাখেব প্রান্তরের মতন জ্বলছে। অস্বচ্ছ চোখে মনে হল দিগন্তে ধোঁয়া পাক খেযে খেযে আকাশে উড়ছে। মস্তিষ্কেব ভেতরে কী বকম হু হু বাতাস, হৃৎপিণ্ড ওঠানামা কবছে।

কাপতে কাঁপতে লোকটি উঠে দাঁড়াল। আপাদমস্তক জল ঝবছে, যেন সদ্য জল থেকে তোলা একটা বাঘব বোয়াল।

লোকটি উচ্চকণ্ঠে হাঁকল ঃ কে আছিস?

খাস ভৃত্য ছুটে এল।—হুজুব।

লোকটি বললে ঃ আমার বাঁশি নিয়ে আয়। আমি এই যমুনাপুলিনে বাঁশি বাজাব।

ভৃত্য বাঁশি এনে দিল।

লোকটি চিৎকার কবে উঠল ঃ বেতমিজ। উল্লুক।

হুজুব।

এ বাঁশি শোনাব কাব কাছে। এই বিপিন যমুনাপুলিনে—

ভৃত্য দ্রুত প্রস্থান করল।

দবজায পদশব্দ।

এসো, এসো সখি। বাঁশি ধরো, মালা পবো।

কষ্টিপাথর ছেনে একটি শক্ত কঠিন মূর্তি। নিতম্ব আবৃত কালো চুলের বন্যায়। কঠিন ত্রিশূলের মত ঈষৎ স্তোকনম্র স্তনচুড়া, স্ফীত উচ্ছ্রিত নাভিদেশ, কৃশ কটি এবং প্রশস্ত শ্রোণীদেশ।

কী নাম তোমার?

সীতা।

সীতা! সে তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। আর এতো পঞ্চবটী বন নয়, এ যমুনাপুলিন। তুমি আমার দুবন্ত রাধা।

আমি সীতা।

লোকটি চোখের সামনে দেখল মেয়েটার শরীবটা একটা উঁচু দেয়ালের মতন ওর দৃষ্টিকে আটকে দিয়েছে। তাবপর মনে হল দেয়াল নয়, প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখা আর গুচ্ছগুচ্ছ মুকুলে ছাওয়া একটা বৃক্ষের মতন মন্দমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। আব, তীক্ষ্ণ বর্শাব মতন অসংখ্য সূর্যকিরণ ওর অঙ্গে ঝলসাচ্ছে।

মেয়েটি বলল ঃ সাহেব তুমি আমাব বাপ।

লোকটি বললে ঃ তোর ছেলের বাপ হতে ইচ্ছে করি। আমাব উত্তবাধিকার নেই, আমাব শোণিতেব ধাবা আমি তোর মধ্যে বহন কবে দিতে চাই।

মেয়েটি বলল ঃ সাহেব তুমি তা পারবে না। তুমি বুড়ো হযে গেছ।

তাবপবই স্বপ্ন-দৃশ্যটি সত্যেনেব চোখে আন্দোলিত হযে উঠল।

সে দেখল বৃদ্ধ লোকটিব বাঁধানো দাঁত-জোড়া মেঝেতে ছিটকে পড়েছে। দন্তহীন মাড়ি থেকে লালাস্রাব, ঘন আঠালো থুতু। মেয়েটিব মুখ গলা বুক লালায় থুতুতে ভরে উঠেছে। অস্বচ্ছ কোটবে-ঢোকা বৃদ্ধের অক্ষিগোলক গোল হযে বেবিযে আসছে, হাপবেব মতন বুকটা ওঠানামা কবছে। আব, ঘামের নদীতে ভাসছে।

এবপবই স্বপ্ন-দৃশ্যটি ছিঁড়ে গেছে। সত্যেন আব স্বপ্নটাকে বিশদ কবতে পাবে নি।

একশো-কি দুশো বছব পর অশনি নামে আর এক যুবক স্বপ্ন-দৃশ্যেব একটি ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিল। অবশ্য তখন দৃশ্যটি স্বপ্ন ছিল না, নিকট বাস্তবে পবিণত হয়েছে।

এখনো শহবেব মধ্যিখানে চৌবাস্তাব মোড়ে উঁচু একটা মঞ্চে সেই বৃদ্ধকে তাবা ঝুলিয়ে বেখেছে। বাসাযনিক প্রক্রিযায় তার শবীব পচে যায়নি। বোদেজলে কেবল গাযেব চামড়া হলদে আব কুঁচকে গেছে। ক্লান্ত পাখিবা কখনো কখনো ওব মাথায এসে বসে। মুখটাকে নোংবা কবে দেব।

কালোকালো লোকগুলো যখন ইমাবত থেকে ওব উলঙ্গ শবীবটাকে তুলে নিয়ে এল তখনো তাব প্রাণবায়ু নিঃশেষ হযে যায় নি। কিন্তু লোকটা কেবল ধূসব চোখে চেয়ে থাকে, কথা বলতে পাবে না।

ওবা ওকে দীর্ঘদিন মঞ্চের খুঁটিব গায়ে ঝুলে থাকতে দেখেছে। অনেক দিন সে বেঁচেছিল।

দযাল কেউ কেউ বলেছিল ঃ ওকে ছেড়ে দাও।

অন্যেবা বাজি হয নি। তাহলে ওকে চোখের আড়ালে বাখতে হবে। চোখেব আড়ালে গেলে ওকে আমবা ভুলে যাব। ও যে একদিন ছিল এই স্মৃতিকে আমাদের জাগ্রত রাখতে হবে, শুধু আমাদেব জন্যেই নয়, আমাদেব পরে যারা আসবে, তাদের জন্যেও। কাবণ চেতনা মূল্যবান সম্পদ, তাকে পবিত্র বহ্নিব মতন সতর্ক হয়ে বক্ষা কবতে হয়।

রৌদ্রদীপ্ত

মৃণাল চৌধুরী

অবশেষে সোনা-দীপেনের ঘরখানা ভাড়া দেওয়া স্থির হয়েছে।

ভাড়াটেরা আসবে আগামী মাসের দোসরা। পয়লা নয়। কেননা সেদিন শনিবার, তায় কৃষ্ণা-চতুর্দশী। জেনেশুনে কোনো মতেই আধুনিক একটি বাঙালী পরিবার ও-দিন 'ঠাঁই নড়া' হতে পারে না। দোসরা হতে ক'টা দিন মাত্র বাকী। ঘরটা পরিষ্কার করা দরকার। কলি ফেরাতে হবে। প্রথমে স্থির হয়েছিল—রান্নার একটা ঘর, অর্থাৎ চিলতে একটা খালি জায়গা ঘিরে দিয়ে, সারা বাড়ির কলি ফিরিয়ে দিতে হবে। অনেককাল তো কলি-ফেরানো হয়নি। এই উপলক্ষে হবে শুনে সবাই খুশি। বিশেষ করে এ বাড়ির বড় বৌ শেফালী। কিন্তু বাড়ির বড় ছেলে নরেন, দু'দিন পর ভাবনা-চিন্তা করে জানালো—আপাতত ভাড়া দেওয়ার ঘরটার জন্য যা প্রয়োজন তাই করা হবে। কথা শুনে শেফালীর মুখ গোমড়া হলো। হেতু আছে। তার ঘরখানির অবস্থা কহতব্য নয়। লোকজন এলে সে খুব লজ্জায় পড়ে। নরেন ফাঁপরে পড়ে। শেফালী এগিয়ে না এলে বাড়িতে কোনো কাজ হতে পারে না। এক সকালে অফিস যাবার আগে সে বললো—কাল মিস্ত্রিরা আসবে। ও ঘরের ঝিটিমিটি যা রাখবে, সেটা তো সরিয়ে নিতে হয়। এখনো গা করছ না!

—আমাকে নাচতে হবে নাকি?

প্রশ্নটার ঝাঁঝ গায়ে না মেখে, হাসিমুখে নরেন বললো—নাচবে? তাহলে অফিস নাই-বা গেলাম।

—গা জ্বালানো কথা বলো না তো!

কথাগুলো ঝংকার দিয়ে বললেও শেফালীর গোমড়াভাব হালকা হলো। ফালি একটু হাসিও ফুটল। নরেন সিগারেট ধরিয়ে অফিস যাত্রা করল। অফিসযাত্রী নরেনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শেফালী দেখল—বাড়ির কাজের মেয়ে যশো'র মা বসে বসে পান চিবুচ্ছে।

—যশো'র মা, একবার এদিকে এসো তো।

যশো'র মা আসে।—কি গো বৌদিদিমনি?

—ছোট দাদাবাবুর ঘরটা পরিষ্কার করতে হবে।

—অ্যাতো বেলায়! রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে।

—থাক। এ কাজের জন্য আলাদা পয়সা পাবে।

—একখান ঘর সাফাই করতি কম টাইম যাবি?

—এসো একবার কাজ দেখে যাও। দরকার হলে অন্যলোক ডাকবে। তাকেও পয়সা দেবো।

—আর কেউ বলতি তো যশোর বাপ! সে পোড়ারমুখো এ্যাতক্ষণে—ইয়ের দোকানে গিয়ে ঝিম মেরে বসে আছে—কথাগুলো বিড় বিড় করে বলতে বলতে যশো'র মা ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ায়। শেফালী দরজা খোলে। থানা থেকে আসা তল্লাশী-বাহিনী যেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তেমন ভাবে পরিদর্শন করে যশো'র মা। ঘরের এককোণে রয়েছে একটি তক্তপোশ। ও-খানা বড়ই সুনজরে দেখে যশো'র মা।

—এ্যাই চৌকিখানি তোমাদেব কুন কাজে লাগবি?

আচমকা, যশো'ব মাব তাচ্ছিল্যভবা প্রশ্নের জবাব দিতে দেবি হয শেফালীর।

—বাড়িতেই থাকবে। কখন কাজে লাগে।

—আমি টানতে পারবনি।

—তোমার একা টানতে হবে কেন? কয়েকজনে ধবাধরি কবে নিযে যাবে। কেন জানি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যশো'ব মা।

খানিক পরে বলে—ওটার যা দশা! তোমাদের কুনো কাজে লাগবে না। দেখি, সারায়ে সুবাযে যদি দু'চারদিন শোয়া যায। বাতের বেথা, মাটিতে শুতে পাবি না।

তক্তপোশটি অনেক দিনেব পুবনো। তবে এখনো বেশ জববদস্ত। হাতছাড়া কবতে ইচ্ছে হয না শেফালীব, ভাবে—ভাড়াটেরা এলে এ-ঘর থেকে নিয়ে কোথায় বাখা হবে সে এক সমস্যা। জিনিসটা নষ্টই হবে। যশো'র মাকে দিলে ক্ষতি নেই। তবু গালে হাত বুলোতে বুলোতে শেফালী মতলব ভাঁজে।

—তক্তপোশ যদি নাও তাহলে পযসাকড়ি পাবে না।

—সে তোমার খুশি। দিলে দেবে, না হয় না দেবে।

খানিকপর একজন লোকসহ যশো'ব বাপ আসে। তক্তপোশ নিযে যায। যশো'র মা ঘব ঝেঁটিযে পবিষ্কার করে। দবজা বন্ধ কবতে এসে শেফালী দেখে—ঘরেব দুই দেওযালেব চাবটে থাক জুড়ে বোঝাই হযে আছে বইপত্তব আর পত্রিকা।

—তাকগুলোয় হাত দাওনি?

—অতো ওপরে আমি কি নাগাল পাই? পুরানা কাগজওলা ডেকে ওগুলো বেচে দিও। আমি এসবো। ঝাঁটাযে দেবো। কথাগুলো বলে যশো'ব মা দ্রুতপাযে চলে যায। তাব কথাগুলো মনঃপূত হয না শেফালীব। মেজ-বৌ অমিতাকে গিযে বলে—গাদা গাদা বই আব কিছু ঝিটিনিটি আছে। আমবাই সবিযে দেবো। কি বলিস অমু?

মেজ-বৌ অমিতাব মুখে হাসি লেগেই থাকে। হাসিমুখেই সে বলে—খুব পাবব।

দুপুব গড়ায। সোমা-দীপেন-এব ঘবেব দবজা খুললো শেফালী। তাব পেছনে দাঁড়িযে আছে অমিতা। ঘবটা গত তিন বছব থেকেই বন্ধ। ইদানীং সম্ভাব্য ভাড়াটেকে দেখানোব সুবাদে বার বাব খুলতে হযেছে। কোনোবাব শেফালী, কোনোবাব অমিতা খুলেছে। এখন আর বদ্ধ হাওযাব দমকা বেরিযে আসে না। তথাপি তালা খুলে থমকে দাঁড়ায শেফালী। স্বভাব-কৌতূহলী অমিতা, যাব মুখে সর্বদা হাসি লেগেই থাকে, তাব মুখখানিও থমথমে। ঘবখানিব শূন্যতা বহুগুণ বাড়িযে দিযেছে তক্তপোশ সবানো দৃশ্য। আর দিন কযেকের মধ্যেই অন্য এক দম্পতি এসে বাস করবে এটা যেন তারই মহড়া। ওদেব দুজনেব অবচেতন মহাশূন্যতার এক আদল গড়ে তোলে। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেফালী। অমিতা চোখ মোছে।

তাক থেকে এক গোছা বই টানতেই শেফালীর হাত থেকে একটা চিঠি লেখাব প্যাড খোলা অবস্থায মেঝেতে ছিটকে পড়ে। তিনটি পাতা যেন ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িযে আছে। কুড়িয়ে তোলে শেফালী। সুন্দব হস্তাক্ষরে লেখাগুলোব মাঝখানে উঁকি দেয় সোমাব মিষ্টি-মধুব মুখচ্ছবি। জানালায হেলান দিয়ে চিঠি পড়ে শেফালী ...

"... কলম থামল। মনে পড়ছে ববীন্দ্রনাথের এক নাযিকাব কথা। সেই ভদ্রমহিলা স্বামীকে চিঠি লিখবার সুযোগ পাননি। আমাকেও তুমি চিঠি লিখবাব অবকাশ দাওনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছর থেকে আমরা কতটুকু সময় বিচ্ছিন্ন থেকেছি? আমি ভেবে পাই না। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ—মত, পথ, কর্ম, দুঃখ-বেদনা, সুখ-শান্তি এক ডোরে বাঁধা ছিল। ববীন্দ্রনাথের নায়িকার সঙ্গে আমার অমিল এখানে।

"ববীন্দ্রনাথের নায়িকা স্বামীকে ছেড়ে, সমুদ্র-সৈকতে পৌঁছে চিঠি লিখল। বিনাবিচারে বন্দী করবাব 'সুসভ্য' আইন জাবী করে শাসক তোমাকে আমাব কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বোধহয় আমাকে পত্র-লেখিকা বানাবাব জন্যই অতটা কষ্ট স্বীকাব করেছেন সবকাব বাহাদুর। ভাবছি, সরকাবকে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাব।

"মাত্র তিনটে পয়সাব অভাবে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বালিগঞ্জ বেল লাইন পেবিয়ে প্রতিদিন নিত্যবাবুর কাছে যেতে হচ্ছে। একটি গার্লস স্কুলের টিচাব করে দেবেন বলেছেন তিনি। অতএব এখন এটা আমাব নিত্য যাওয়া-আসা।

"তোমাকে হিংসা কবতে ইচ্ছে হয়। খোলা কাবাগাব থেকে তুমি নিরাপদ দূবত্বে। বাজাব জামাইয়েব সোহাগ যত্নে বয়েছ। আব আমি খুচবো, খেলো অথচ জীবন অতিষ্ঠকারী সমস্যার খানাডোবায ডুবে আছি। হিংসে কবছি বলে আবাব মুখখানা তোলো হাঁড়ি করে তুলো না। তুমি কি আবার দাড়ি বাখতে আবম্ভ করেছ? তবে যত্ন নিও। উড়ু-ঘুরু করে রেখো না। নিত্যবাবু কাজটা পাইয়ে দিলে, একমাস পর একবার আমি যাব, গরাদের এপাশে-ওপাশে দাঁড়াব। কারোই মনোবেদনা বিন্দুমাত্র কমবে না। তবু চোখেব দেখাটুকু মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। তুমি কিন্তু মানা করবে না। যাতায়াতেব ধকল সইতে পারব।

"তোমার বাবা আর কতদিন বাঁচবেন, বলা যায় না। দেশের নিরাপত্তার জন্য যদি দীর্ঘদিন কিংবা দু-এক বছব তোমাকে আটকে বাখে, তাহলে তাঁকে আব দেখতে পাবে না। মা দিনবাত খিটিমিটি বাধিয়ে তুলছেন। মা যে এমনধাবা হবেন, দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।

"তোমার কলেজ থেকে নিযমিত মাইনেব টাকা আসছে না। অনেক খোঁচাখুঁচি কবে মাঝে-মধ্যে আদায করে আনছি। ভাবলাম, তোমাব আমাব ঘবটা ভাড়া দিয়ে দেব, মায়েব কাছে শোব। মা বললেন— তোমার কষ্ট হলে বাপেব বাড়ি চলে যাও। নীরবে শুনলাম। উনি ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। নিজেব ঘবে এসে আমিও কাঁদলাম খানিক সময়। বড়দা, বড়দি, মেজদা মেজদিব কাছে প্রস্তাবটা বাখলাম। বড়দা বললেন—ব্যবস্থাটা কবলে সংসাবেব কিছুটা সুরাহা হয়। সকলেই তাব কথাটা মানলেন। কিন্তু ঘব-ভাড়া দিতে গেলে বান্নাব জাযগা কবে দিতে হবে, কলি ফেবাতে হবে। ক'দিন কাটল। ভাবলাম আবাব কথাটা তুলব। একদিন মেজদি আমাব ঘবে এসে বসল। পা দোলাতে লাগল। জানই তো মেজদি কেমন হাসিখুশি। তখন কিন্তু সে গম্ভীর। বললো—ছোট, তুই আব ঘর-ভাড়াব ব্যাপাবে থাকবি না। কোনো কথায থাকবি না।

—"কেন?"

—"বড়দি বলছেন, তুই লেখাপড়া-জানা মেয়ে। তোব পেটে জিলিপির প্যাঁচ। মা তো আজকাল বাবাব ঘবেই থাকেন দিনবাত। মাব ঘবটা তোব দখল হয়ে যাবে। তোব নিজেব ঘরটা ভাড়া দিয়ে টাকা জমাবি। ফাঁকতালে দু'টো ঘবই তোব হয়ে যাবে।

"অতএব প্রস্তাবটি ঢোক গিলে নিয়েছি। এদিকে বড়দা-বড়দি আখের দেখতে চাইছেন। সংসাবে টাকাব অঙ্ক কমিয়ে দিয়েছেন। মেজদা-মেজদির ওপব চাপ সৃষ্টি কবছেন। মতলব—বেশি বোজগেবে মেজদা বাড়ি থেকে বেরুলে তিনখানা ঘব ভাড়া দেওয়া যাবে। মেজদা সংসারে বেশি টাকা দেবেন না। অফিস-কোয়ার্টার্সে চলে যেতে পাবেন। বাবা বেঁচে থাকতেই এ কাজ সেরে নেওয়াব ভীষণ তাগিদ বোধ করছেন বড়দা। এখন আর উনি অফিস থেকে এসে তাসের আড্ডায় যান না। তবে মতলব হাসিল করা দুরূহ ব্যাপাব। কেননা যশোর মা দু'পক্ষেরই উকিল। সব কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। মা সব শুনছেন। কপালে কবাঘাত করছেন। সকলকে পরামর্শ দিচ্ছেন—মারা যেতে। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন—দীপুটা যদি এ

সময়ে—! মায়ের শেষ কথায় আমার সায় আছে। তুমি থাকলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না। আমি চেষ্টা করিনি তা নয়। কারো ভাবনায় প্রভাব ফেলবার ক্ষমতা আমার নেই। কোথায় যেন মৌলিক ত্রুটি রয়ে গেছে। নইলে এমন সহজ কথাগুলো, মিলেজুলে বাঁচবার কথাগুলো, কাউকে গ্রাহ্য করাতে পারছি না। ঠেকে শিখলাম, কোলে চড়ে বসলেই আপন হওয়া যায় না।

"সুবীর, তোমার ভাইপো, পরম আদরে গড়া সে। বয়ঃসন্ধির সীমানা পেরনোর আগেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের পাণ্ডাদের ভাষায়—জীবনযন্ত্রণায় ভুগছে। কলেজে যায় কি যায় না, ও জানে। যা সব শুনছি তাতে দিশেহারা বোধ করছি। আমাদের মতো রাজনীতি কিংবা সমাজবোধের পোকা ওর মাথায় নেই। অথচ বিশেষ এক ধরনের রাজনীতির পাণ্ডাদেব সাকরেদ হয়েছে। সেদিন রাত তখন সাড়ে দশটা (ওটাই তার বাড়ি ফেবার প্রভাতলগ্ন), ঘরে এসেই সজোরে, সগৌরবে ঘোষণা করল— সে প্রেমে পড়েছে। প্রেমে পড়তেই পাবে। ভুবনময় প্রেমের ফাঁদ পাতা। বড়দা মিনমিন কবে বললেন—বিয়ে করলে খাওয়াবি কি?

"বিয়ে করার কথাই উঠছে না। যখন উঠবে তখন দেখা যাবে। কথাগুলোর চাইতে সুবীরের বলার ভঙ্গিটাই চমকে দেবাব মতো। তোমরা যেমন কথা বলতে বলতে, সিগাবেটেব ছাই আনমনে হেলায় ঝেড়ে ফেলো, তেমনি ভঙ্গি।

"মেজদা তিরিক্ষি হয়ে বলেন—তাহলে এমন পবিত্র সংবাদটি সকলকে শোনাবাব কি দরকার ছিল?

"না জানালেও পাবতাম। জানিয়ে দিলাম—বাড়ি ফেবাব দেবি হলে গ্যাজব গ্যাজব করা, ট্যাক ট্যাক করে কথা শোনানো বন্ধ হবে। যদি কোনোদিন বৈশাখী এ বাড়িতে আসে সে অপমানিত হবে না। ...

"সুবীবকে কথা শেষ কবতে না দিয়েই বড়দা গর্জে ওঠেন—এ বাড়িতে ঢুকলে, ঠ্যাং ভেঙে দেব। মেজদিব কনুই-এব ঠেলা খেযে মেজদা তড়াক কবে উঠে বসেন। বড়দাকে লক্ষ্য কবে বলেন—কথাটা মনে রেখো। এ বাড়িব মান-ইজ্জতে টান পড়লে কাউকে ছাড়া হবে না। তখন আবাব বাৎসল্যে ধৃতরাষ্ট্র হযে যেযো না। বাড়ি-ছাড়া কবব সকলকে।

"—তেমন পবিস্থিতি আসুক। আগেই তড়পাস কেন? কথা ক'টা বলে বড়দা ছাদে উঠে গেলেন।

"বড়দি ফুঁসে উঠলেন—বাড়ি ছাড়তে বলাব তুমি কে ঠাকুব-পো?

"মেজদা কি বলতে চাইলেন বোঝা গেল না। শোনা গেল না। কেননা সুবীবটা শব্দেব চাইতে আওয়াজ জোবালো করে কুৎসিত কথার ঝড় বইযে দিল। মেজদা বণেভঙ্গ দিলেন।

"মা আদবেব নাতিকে নিযে ঘবে গেলেন। দুই বণ বঙ্গিনীকে বেখে আমি ঘবের দোব এঁটে দিলাম।

"তবু রেহাই পেলাম না। দু'দিন পরে শুনলাম—বড়দি সুবীরেব ব্যাপাবটাব জন্য তোমাকে আমাকে সরাসরি দায়ী করেছেন। এ বাড়িতে বিয়েব চল ছিল। কিন্তু ভাব-ভালবাসার (ওনাব ভাষায় ঢলানির) বিয়ে হয়নি। সে রেওয়াজ আমরা আমদানি করেছি। আমি রা কাড়িনি। কিন্তু যখন বড়দি বললেন—তুমি কীসব বই-পত্তর পড়িয়ে, শিখিয়ে ওর কচি মাথা খেয়েছ, নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না।

"—দোহাই বড়দি, অন্তত আপনার ঠাকুরপোকে সুবীরের স্তরে নামাবেন না।

"আগুন-ঝরানো চোখে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

"—গুছিয়ে কথা বলতে পারিস, তাই ভেবেছিস তোকে চিনতে পারিনি? আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? অমিতার ছেলেমেয়ে হয়নি। ডাক্তার বলেছে হবেও না। সুবীরকে জেলে

পাঠিয়ে দাগী আসামী বানালি। পাট্টি কবিস—ওকে ছাড়িয়ে আনতে পারলি না? তা যাবি কেন? ঐ ছেলেটা গেলেই তো এ বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না। বাবা-মা তো তোর হাতের পুতুল। সব লুটেপুটে খাবি। কালসাপ হয়ে ঢুকেছিলি ..

''আর একটা কথাও শুনিনি। ছুটে চলে এলাম ঘরে। খিল লাগিয়ে শুয়ে থাকলাম। ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। জাগলাম। আলো জ্বালিয়ে দেখি হাত ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা। দরজা খুলে দেখি সারা বাড়ি নিঃশব্দ, গভীব রাত। প্রথমেই মনে হলো আজ সারাদিন খাওয়া হলো না। এক বাড়িভরা লোকের কারো মনে হলো না কথাটা। ভাবলাম রাত পোহালেই বাপের বাড়ি চলে যাব। পরক্ষণেই চোখের সামনে ভেসে উঠল তোমাব মুখ। লজ্জায় সে মুখ কালো হয়েছে। না, পালাব না।

''পবদিন গেলাম বৈশাখীদের বাড়ি। ঠিকানা দিয়েছেন মেজদি। মেয়েটি বসতেও বললো না। ওর পোশাক, কথার ভঙ্গি-ভাষা ভালো লাগল না।

''তবু বললাম—জানই তো সুবীব লেখাপড়া শিখছে না। কোনো কাজ শেখেনি। আমাদেব বাড়িতে কোনো ঘরও নেই। এ অবস্থায তোমবা ঘব বাঁধবে কি কবে?

''ডান চোখ কুঁচকে, বাঁ চোখে তেবছা ভাবে তাকাল বৈশাখী নামেব মেয়েটি, যাব নাবী হিসেবে সম্বল পুষ্ট দেহ। ঠোঁট ওলটালো।

''তাবপব বললো—ঘর বসাতে কোনো শালা হেলপ করে না। বসাতে হয়। আব একটা কথাও না বলে বেরিয়ে এলাম। বৈশাখী পাড়া-জানানোর মতো গলা চড়িযে বললো—আমাব আব সুবীবেব ব্যাপাবে নাক না গলিযে, যা কবে বেড়াচ্ছেন, তাই করুন গে।

''কথাগুলো পিঠ দিযে ঠেকালাম। মুখ না ফিবিযে জোবে হাঁটতে থাকলাম।

''বাত এখন গভীবতব। তুমি ঘুমিযে পড়েছ? জানি, তুমি ঘুমোতে পাবনি। দিন গড়িযে গড়িযে মাস, বছরও পেবিযে গেছে। কতদিন যে যাবে! চিঠি লিখছি। জানিনা চিঠি পাঠালে তুমি পাবে কিনা। পেলেও কতটা জখম হওযা চিঠি পাবে তাব ঠিক নেই। আমলাদেব হাতে হেনস্তা হবে তোমাকে লেখা আমাব চিঠি— তা আমাব সইবে না। ডাকে ফেলব না। থাকবে আমাব কাছে। চিঠি লিখব। অনেক, অনেক চিঠি। চিঠি লিখতে বসলে অনুভব কবি তুমি আমাকে ঘিবে বযেছ। হাসিভবা গালে টোলপড়া, তোমাব নিঃশ্বাসেব হাওযাটুকু আজ আব লিখব না গো। ঘুম পাযনি। তবু চেষ্টা কবব। নিত্যবাবু ছ'টাব আগে যেতে বলেছেন কাল কাজটা পেযে যাব।

সোমা
নভেম্বর, ১৯৪৮''

রবীন্দ্রনাথ নামটিতে শেফালীব আপ্লুত হওযার কোনো ব্যাপাব নেই। নামটি তার চোখেব সামনে ভাসিযে আনে এক ঋষির মুখচ্ছবি। মনে পড়ে, ছেলেবেলায ঘাড় দুলিযে মুখস্থ-কবা গুটিকযেক কবিতাব ছত্র। আপাতত তাব মনে পড়ে—

''আমাদের ছোটো নদী চলে এঁকে বেঁকে
বৈশাখ মাসে তাব হাঁটুজল থাকে।''

রবীন্দ্রনাথেব ''স্ত্রীর পত্র'' গল্পেব নাযিকা সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ জানে না শেফালী। সোমাকে সে জানে। চিঠির মর্ম বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। একা সে কখনো বাঁচতে চায়নি। প্রবলভাবে সকলকে নিযে বাঁচতে চেয়েছিল।

মনের অগোচর পাপ নেই। শেফালী তাকে আপন করে নিতে পাবেনি। এই মুহূর্তে সোমা, তার হৃদয়ের বড় কাছের মানুষ মনে হয। ওরা লড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সে লড়াই শেফালীদের জন্যও। তার মর্যাদাটুকু দিতে পারেনি সে।

—বড়দি, কি ওটা?

—সোমার চিঠি। এই নে।

অমিতা চিঠিখানা হাতে নেয়। শেফালী দ্বিতীয়খানার ভাঁজ খোলে ...

"... সকালে উঠতেই কান্না শুনলাম। বড়দির ব্যাকুল কান্না। কারণ বুঝলাম না। বড়দি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মেজদি—ছোট, চলে আয়। সবই তো জানা ছিল। এখন ন্যাকামি করে লাভ।

"বড়দির কাছে বসে রইলাম। মেজদি, বুঝলে বাইরেই হাসিখুশি। মনটা বড় ছোট। পরিবারের এতবড় অসম্মান—পেটের ছেলে নয় বলেই গায়ে লাগবে না!

"আসল খবর শোনো। সুবীর গত রাতে হাতেনাতে ধরা পড়েছে, মুখুজ্জেদের ছোট বৌ-এর গলা থেকে হার ছিনতাই করতে গিয়ে। ওরা পুলিসে দিয়েছে। এখন হাজতে আছে।

"এক সময় বড়দির কান্না থামে। চোখ মুছতে মুছতে আমাকে দেখেন। কর্কশ গলায় বলেন—কাটা ঘায়ে নুন ছেটাতে এলি?

"—কি বলছেন, মেজদি?

"—ঠিকই বলছি, এ সংসারে এসেই আমার হাতেগড়া ঠাকুরপোকে পর করে দিলি—(ইচ্ছে হলো বলি, সে কাজটা বিয়ের আগেই করে নিয়েছি)। বললাম না। আবো বললেন—তোমার বাবা-মা নাকিআমার হাতের পুতুল। মেজদি নিঃসন্তান। সুবীরকে শেষ করে সব লুটেপুটে নেবো। দেরি না করে এসো, জমিদারী অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। আমি গড়ছি।

"ঝগড়া করবার, দুটো ঝাঁঝাল কথা বলবার ইচ্ছের টুঁটি টিপে বাইরে গেলাম। চারুদিদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ঘরে এসে শুলাম। খেয়ে এসেছি গীতাদের বাড়ি থেকে।

"নিত্যবাবু কথা রেখেছেন। আজ থেকে আমি বামাসুন্দরী বিদ্যালয়ের প্রাতঃবিভাগের শিক্ষিকা। যে টাকা সই করব তার চাইতে মাইনে কম পাব। হোক। বাবার চিকিৎসা চালিয়েও সংসারকে কিছু দিতে পারব।

"বহরমপুর জেলে রাজবন্দীদের উপর লাঠি-চার্জ করা হয়েছে। আমাকে এড়িয়ে শোভন রায় রাণীদিকে বললেন—তোমরা জেলে অনশন করছ। আড়ি না পেতেও কানে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে সত্যমিথ্যা জানিয়ে দিও লক্ষ্মীটি। চরম একটা কিছু না ঘটলে তোমাদের কথা তো সংবাদপত্রে উঠবে না। তোমাদের অস্তিত্ব, বাস্তব পরিস্থিতি প্রচার করবার জন্য তো ওরা কাগজ ছাপে না।

"অমানবিক দম্ভ আর বন্দুকে-বারুদে জনঅসন্তোষ দমনের চেষ্টায় জনজীবন অতিষ্ঠ। পর পর তিনদিন ছাত্রদের উপর সশস্ত্র হামলা হয়ে গেল। আইনের টেকনিক্যাল মর্যাদা রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি তরুণ তাজাপ্রাণ বলি হলো।

"পারিবারিক শোচনীয় দুর্দিন সঙ্গে নিয়ে ইতিহাসের যাত্রাপথ থেকে পিছিয়ে পড়িনি। আমি কিন্তু এখন আর দেশের রামা-শ্যামার মতো নই। অনন্যা, কেউকেটা। পথে বেরুলে কিংবা ঘরের কোণে, পেছনে থাকে কারো না কারো সদা-সতর্ক দৃষ্টি। কোনো এক সুপ্রভাতে দেখবে, আমাকে তোমার পাশে হাজির করেছে। মনে হয় না ওরা অতটা করুণাময় হবে।

"সারাটা দিন বড় ধকল গেছে। চোখে জুড়ে আসছে ঘুমে . "

এরপর বোধহয় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল সোমা। চিঠিখানা অসমাপ্ত। শেফালীর বুকের মধ্যে দুঃখ-দহন-জ্বালা এমন প্রবল হয়, মনে হয় এখনই দমবন্ধ হয়ে যাবে। ভাবে—ধকল, সারা জীবনভর ধকল ছাড়া আর কি রয়েছে সোমা-দীপেন?

বধূবরণ করেছিল শেফালী। সোমার মুখখানি, মুখের সেই মধুর হাসি এখনো জ্বলজ্বল করে। চোখের উপর ভেসে ওঠে তার টানাটানা কাজল-কালো দুটো চোখ। কান-ভাঙানো,

ঝগড়া করা, কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার—এজাতীয় কোনো ঘটনা ঘটায়নি সোমা। অথচ তার সঙ্গেই চরম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে শেফালী। অনুতাপের জ্বালায় জ্বলে সে। শেষ দিকে অমন কাজল-কালো বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটি বিবর্ণ আব নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছিল। শ্যামলা দেহত্বক কর্কশ কালো হয়েছিল। মানুষের কত পরিশ্রম সহ্য হয়! স্কুলে পড়ানো, রাতদিন সভা-সমিতি-প্রতিবাদেব মিছিল—এই নিযে মেতেছিল সোমা। শেফালীব দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। ইচ্ছে করে, যে-শক্ররা এমন মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয।

—দেখি ওখানা, অমিতা হাত বাড়ায়।

শেফালী তৃতীয়খানার ভাঁজ খোলে। এ-খানার দু'পিঠে লেখা। এক পিঠে গুটি কয়েক লাইন। শেফালী পড়ে ..

" . আমাদেব ঘরখানা বাস্তামুখো। ঘরেব কাগজ দিয়ে যায জানালা গলিযে। প্রতিদিনের মতো আজকেও দিয়েছে। ঘুমভাঙা চোখে দেখলাম বড হবফে লেখা জেলে অনশনবত তিন রাজবন্দী নিহত। সংঘর্ষে পুলিস গুলি চালাতে বাধ্য হয। নিহতদের মধ্যে আছেন দীপেন সান্যাল—পরের নামটি চোখেব সামনে থেকে সরে সবে যায।"

তারপর আর কিছু লেখেনি সোমা। দৃশ্যটা চোখেব সামনে ভাসে শেফালীর। ছুটতে ছুটতে এলো যশোব মা। বললো—বৌদিদি. শীগগিব এসো দেখিনি। ছোট বৌদিদি খপরেব কাগজ খিমছে ধবে কেমনভাবে খাটে হেলান দিযে রয়েছে—বুকটা ধড়াস করে উঠল . একবারটি চলো । শেফালী ছুটে যায। সাবা বাড়িব চেহারা বদলে যায। পরিচর্যা চলে সোমার। শোকে মুহ্যমান বাড়িটা ভরে যায অসংখ্য লোকে। সোমাব আত্মীযস্বজন, পার্টিব নেতা ও কর্মীরা আসে।

শেফালী সে দৃশ্য ভুলতে চায়। বলা উচিত ভুলে যায়। এতক্ষণ কোনোমতে সে লেখাগুলো পড়েছে। আর পড়তে পাবে না। চোখের জল বাঁধ মানে না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে. অমি, তুই পড়। বাকীটুকু পড়। অমিতা হাত বাড়িযে কাগজখানা নেয়।

''তখন ভরসন্ধ্যে। আলো জ্বালিনি। গতকাল সকাল থেকে অচেতন হয়ে ছিলাম গভীব বাত অবধি। আমাকে আমাব মতো একা থাকতে দিতে বলে গেছেন ডাক্তারবাবু। তাই বযেছি। তোমাতে বিলীন আমাব সত্তা, অস্তিত্ব। মৃত্যুব চাইতে তুমি বড়। আমাব জীবনে তুমি কেবলমাত্র দীর্ঘশ্বাস নও। তাই বাস্তবেব নিবেট দেওযাল বাব বার ধ্বসে যাচ্ছে। মনে পড়ছে তোমাব সঙ্গে প্রথম দেখা তারপর ফিবে ফিরে দেখা . এক গোধূলিবেলায পরস্পবের কাছে পবস্পবেব ধবা পড়ে যাওযা . .

''দবজাব কাছে পা ফেলাব আওযাজ। উঠলাম। আলো জ্বাললাম। সুকোমল। বড বড স্বপ্নালু চোখঅলা সুকোমল। চিন্তায গম্ভীব, দরদে গভীব। ঝাঁকড়াচুলো, যাকে তুমি বলতে জাতকবি, সেই সুকোমল আর ঝকঝকে নেই। তাকে চিনতে কষ্ট হয়। ওর নামে 'হুলিয়া' ঝুলছে। কোথায় থাকে ঠিকঠিকানা নেই। খায কি খায না, ঠিক নেই। তবু এসেছে। না এসে পারেনি। অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে এসেছে। কোনো কথা না বলে চেযাবটায বসে থাকল সুকোমল। সময কাটতে লাগল নীরবে।

''—বসো। খাবার নিযে আসি—ওব শুকনো মুখ দেখে বললাম। তবু ও নির্বাক। আমার মুখের দিকে তাকাল না।

''যশো'র মা খাবার নিয়ে এলো। আমাব দিকে অভিমানী চোখে তাকাল। কোনো কথা না বলে খেয়ে নিল। ও কি বোবা হয়ে গেছে!

''ব্যথায় কবিকেই তো মুখ খুলতে হবে। ভাষা দিতে হবে রুদ্ধ আবেগের। কিন্তু . . পর পর দুটো বিড়ি টানল ও। তাবপর বললো—যাই। চিন্তা করো না সোমাদি। দীপেনবাবুর

কিছু হয়নি। আমি খবর নিয়েছি। দমকা হাওয়াব মতো বেরিয়ে গেল সে। ফিবে ডাকলাম। বুঝলাম, আমার বেদনা কমিয়ে দিতে কবি মিথ্যে কথা বলছে। ও কেন ভুলে গেছে—সংবাদপত্রের পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে তোমার নাম—আবো দু'জনের সঙ্গে। আর কোনোদিন তোমবা তো সংবাদ ছিলে না জাতীয়তাবাদী পত্রিকায়। কিন্তু এখন তো রক্তের স্বাক্ষরে অন্যদিন।

"এমন বীভৎস অন্যায় অবিচারে স্তম্ভিত সারাদেশ। থমথমে আবহাওয়া। আগামীকাল প্রতিবাদ জমায়েত আর বিক্ষোভ মিছিল। তার প্রস্তুতিতে সারাক্ষণ কাটিয়েছি দুপুবের পর থেকে। চারুদিরা আমাকে ফিবিয়ে দিতে পাবেননি। অনেক চেষ্টা করেছেন। অনেকেই ভুলে যান—তুমি আর আমি পরস্পরের কাছে এসেছিলাম ২১ নভেম্বরেব প্রতিবাদ-মুখর, সাম্রাজ্যবাদী শাসক-নিক্ষিপ্ত গুলিবেঁধা ধর্মতলার মোড়ে! . ."

অমিতাব চোখ ঝাপসা হয। চোখের জল মোছে। আজ তারা ঘর খালি করছে—ভাড়াটেরা আসবে। বছর তিনেক আগে এক দুপুরে জেলেবন্দী দীপেন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছে। তাব দুদিন পর কলকাতাব পথে গুলিবিদ্ধ হযে প্রাণ দিয়েছে সোমা। ঘব তো খালি হযে গেছে—সেদিনই। বড় বেদনার মতো সেই স্মৃতিব ভাব এই মুহূর্তে ব্যাকুল করে তোলে অমিতাকে।

নীববে কাটে খানিক সময়।

শেফালী বলে—ঠিক সর্বনাশেব আগের বাতে হতভাগিনী এখানা লিখেছিল। ঘাড কাত কবে সায দেয অমিতা। তারপব শেষ অংশ পড়ে ভেজা গলায

" . তুমি নেই। এই মহাশূন্যতা আমাকে গ্রাস কবতে চায। আমি মানব না। আমাব সত্তা, আমাব অস্তিত্ব, তোমাব সঙ্গেই মিশে থাকবে। মানুষকে ভালোবেসেছিলে তুমি। ভালোবেসেছিলে শ্যামল বাংলা তথা ভাবতেব শোষিত মানুষকে এবং তাব এক 'শ্যামলা' মেযেকে। তোমার শত্রুব সঙ্গে লডাই কবে, আমৃত্যু তোমাব এ ভালোবাসাব মর্যাদা আমি বাখবই কমরেড .."

কমরেড

ঋত্বিক ঘটক

পাড়েব দোকানের মোড়টা ঘুরছে ঝাব্বু।

চট্‌ করে গাছের আড়ালে চলে গেলাম। ও যেন আমাকে দেখতে না পায। ও হন্‌ হন্‌ কবে হেঁটে চলে আসছে চারিদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করে। একবার ক্ষণতরে দাঁড়াল, একটা হাত তুলে ঘাড়টা মুছে নিল। এতদূর থেকেও আমার মনে হয়, তার হাতটা কাঁপছে। ... ও চলে এলো এদিকে, আমার অন্তরালের গাছটিকে অতিক্রম করে গিয়ে উঠল বস্তির সামনের বাঁধানো চাতালটিতে। বস্তির বেশীব ভাগ দরজাই বন্ধ, লোকগুলো সব মুষড়ে নিরুৎসুকভাবে ঘবেব মধ্যে পড়ে আছে, অনেকে চলেও গেছে। ছেলেপুলের কান্না শোনা যায় না, নেড়ী কুকুরগুলো পর্যন্ত অন্যত্র জীবিকাব সন্ধানে বওনা দিয়েছে। মানুষ থেকেও নীরব, অন্ধকাব, পরিত্যক্ত মনে হয সমস্ত মহল্লাটাকে।

আমাব পবমবন্ধু ঝাব্বু। আমার জঙ্গী ইউনিযনের প্রিয় নায়ক ঝাব্বু। কতদিনকার সুখ-দুঃখের সাথী ঝাব্বু—সে চকিত চাহনিতে দেখে বস্তিটাকে, তারপর দ্রুতপদে গিয়ে ঢোকে তাব ঘরে। দরজা বন্ধ করাব শব্দ নীরব সন্ধ্যায় আমাব কানে এসে বাজে।

আমি বেরোলাম গাছের আড়াল থেকে। হাতে এখনো কাপড়ের পোঁটলাটা। আমার সাধের পাগড়ি, বৌ-এর জঙ্গলা শাড়ি, আবও কী কী যেন ধরে দিয়েছে বৌ। বিক্রি কবতে চলেছিলাম সদববাজারেব লখিম মাড়োযাবীর ঘরে, হঠাৎ ওকে দূর থেকে দেখে আমার যাওযা আব হলো না।

ও ঢুকছিল কলেব মালিক শ্রীবাস্তবেব নতুন বড বাড়িব খিড়কিব দবজা দিযে। সঙ্গে আব যে দুজন ছিল, তাদেব আমি চিনি। একজন নযা তাঁবেদাব ইউনিযনেব নতুন আসা গুণ্ডাটা, আব একজন ম্যানেজাবেব পেটোযা চুকলিখোব নন্দ মিস্ত্রী, শিকাযেৎ করার এক নম্বব ওস্তাদ। প্রথমে আমাব ভযই লেগেছিল, দোকান ছাড়িযে ওদের দিকে এগিযেছিলাম যদি কোন সাহায্য লাগে ঝাব্বুব, তারই জন্যে। ওবা কেন নিযে যাচ্ছে ওকে? কিন্তু গিযে দেখি ঝাব্বু হাসছে, ভীষণ আনন্দিত মুখে হাসছে। তখনই আমি দৌড়ে চলে এসেছি সোজা মহল্লাতে। মাথাব মধ্যে সব কেন জানি বেহিসেবী হযে গিযেছিল। থেকে থেকে প্রাণেব ভেতবটা চমকে চমকে উঠছিল।

আমিও গিযে চড়লাম চাতালে। ওব ঘবেব দিকে অগ্রসর হলাম। বস্তিব সামনেটা আব দবজাগুলো দেখলে কান্না পায। গত একচল্লিশ দিন ধরে কলে লক আউট, দুর্দশাটা একেবারে চবমে এসে উপস্থিত হযেছে। মজুরদেব এই সংঘবদ্ধ প্রতিবোধে ভাঙ্গন ধবানোব জন্যে কত চেষ্টাই তো কবল মালিকপক্ষ, কিছুতেই কিছু হযনি। কত মজুব দেশে চলে গেছে, বহু সংসারে নেমে এসেছে মহা বুভুক্ষাব ছাযা, কত মজুরকে এরই মধ্যে তাব সব সম্বল বিক্রি করে ফেলে একবেলা আধপেটা খেযে থাকতে হচ্ছে, তবু জনসংহতি অচল বিদ্রোহে উঁচু হযে থেকেছে। নয়া ইউনিযনেব মুষ্টিমেয সভ্যকে দিযে টিম টিম কবে কাজ চালু বাখাব

ব্যবস্থা কবা হয়েছিল, তারা নিজেরাই ভয় পেযে রাজী হয়নি। মালিক নাকি বলেছে, তাব টাকার আর দরকার নেই, কল সে বন্ধ করেই দেবে বেশী ঝামেলা হলে। অথবা বিলাসপুর না কোথা থেকে নতুন মজুর আমদানী করে কল চালাবে। গুণ্ডা লাগিযে ঝগড়া বাধাবারও চেষ্টা করেছিল একবার। সব কিছুকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে আমবা অনমনীয় থেকে গেছি।

কিন্তু কষ্ট হয়। এইসব তিল তিল কবে মবা শহীদদেব অবর্ণনীয় কৃচ্ছ্রসাধন মনকে বিচলিত করে তোলে। এদের সহিষ্ণুতার তুলনা কোথায? চোখেব সামনে অল্পে অল্পে জীবনীশক্তি নিভে আসছে প্রিয়জনের, এ দেখেও যাদের মুখ ফেবাতে হয়, চোখেব জলকে দাবিয়ে দিয়ে দিবারাত্র লড়াই-এর প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর কবে তুলতে হয, সেই জঙ্গী ফৌজেব থেকে বড় কী আছে?

ঝাব্বুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বন্ধ দরজা। মানুষ যেন ওব ওদিকে থাকে না, এমনি শব্দহীন ঘরটা। আলো নেই, আলোব বিলাসিতা কবাব সুযোগ কার আছে? ঝাব্বুর গলা পাই না .. ঠক্ ঠক্ করে দবজায ঘা দেই।

দরজার ওপাশে কার পায়েব আওয়াজ জেগে ওঠে। দরজাব খিল খোলাব শব্দ হয। ঝাব্বু পাল্লা খুলে দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত সকলেব নেতা ঝাব্বু। শোষিত-শ্রেণীব সংগ্রামী সৈনিক ঝাব্বু।

আমাকে দেখে ছাই-এব মতো যার মুখ হযে গেল, সে কি সেই ঝাব্বু? হতে পাবে না। আমি সর্বহাবা ভুখা মজুব, আমাকে দেখে ওব মুখ ছাই হবে কেন?

হাসার চেষ্টা করে ও। "এসো লালবাহাদুব, বোসো। তারপর, কী মনে কবে?" আনন্দ এবং উৎসাহেব অভাব ওর গলা দিয়ে যেন ঝরে ঝবে পডছে। একটা হাত পাল্লা থেকে সরিয়ে কোণের তেলচিটে বিছানাটা দেখিয়ে দেয়।

ধূসর অন্ধকাব ঘবটাতে ভ্যাপসা গন্ধ। অভাব যেন হা-হা কবে এসে মুখে সজোবে চড মাবে। ও বলে,—"দাঁড়াও, বাতিটা জ্বালি। জানো তো, ওপাট চুকিযেই ফেলেছি প্রায।"

আমি বাধা দেই—"থাক ভাই। আলোর দবকার নেই। এসো বসি।" আমি বসলাম বিছানার ওপব হাতের পোঁটলাটা পাশে বেখে। ও বসে কমিজেব পকেট হাতায়, যেন একটা কিছু না কবে ও স্থিব থাকতে পাবছে না।

—"বিড়ি খাবে?"

—"দাও।"

বিড়িটা মুখে নিযে মাথাটা নীচু কবি। দেশলাই বের কবে নিজেবটা ধবায়, তাবপব আমার মুখের কাছে জ্বলন্ত কাঠিটা অগ্রসব করে দেয়। ধবাতে ধরাতে ওব চোখেব দিকে তাকাই। দুটো শিখা জ্বলছে ওব চোখের তাবা দুটোতে, চোখ কিন্তু নিষ্প্রভ, ভগ্নাশায ভর্তি। আমার ধরানো হযে গেলেও মুখ ঝুঁকিযেই তাকিযে থাকি। ও কেমন অস্বস্তি বোধ কবে, চোখটা সরে যায় অন্যদিকে। আবার আমাব মুখের ওপর আসে। আবার আমার মাথাব ওপরের জানালা দিয়ে বাইবে ন্যস্ত হয।

মুখ তুলে আমি বলি—"বিডি কেনাব পযসা এখনো আছে তোমার?"

—"না।" ও কাঠিটা ফেলে দেয--"হঠাৎ ভয়ংকব ইচ্ছে হলো বিডি খাবার। তাই কিনে নিলাম দু'পয়সাব। থাকতে পারলাম না।"

—"বেশ।" একমুখ ধোঁয়া ছাড়ি আমি—"জক কোথায় তোমাব? ছেলেপুলে কারো তো গলা পাচ্ছি না আমি।"

—"ওদের সব আজ সকালেই ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। কদিন এমন থাকবে কে জানে বলো! সেখানে তাও দুমুঠো খেতে পাবে দুবেলা। তুমি তো গত কযদিন এদিকে আস না, আজ হঠাৎ?"

"বলছি"—মনে মনে হিসেব কবি আমি। তাহলে আর বিকেলেব ঘটনাই প্রথম নয়, অন্তত দু' তিনদিন ধরে শলা-পরামর্শ চলছে। ... ছোট ছেলেটা হবার পর থেকে ঝাব্বু নরম হয়ে পড়েছিল, বৌ-ছেলে পার করে দিয়েছে গণ্ডগোল আশঙ্কা করে।

মুখে বলি—"কাল আমেদ সাহেবের আসার কথা আছে। আজই সকালে আপিসে খবরটা এসেছে। তুমি দু'তিনদিন ধরে ওপথই মাড়াওনি, অথচ ব্যবস্থা করা দরকার—"

ও ইতস্তত করে—"মানে শরীরটা বড় খারাপ যাচ্ছে ক'দিন থেকে। কোথাও যাচ্ছি না। খালি সকালে ইস্টিশনে ওদের তুলে দিতে গিয়েছিলাম। জানো, বাসনকোসন বেচে তবে ওদের যাবার পয়সা জোগাড় করতে হয়েছে। আর পথে বেরোলেই তো পযসা।"

আমি বলি—"তবে ঘরে কামিজ পবে বসে কী কবছ?"

—"উ"—চিন্তাপূর্ণ চোখে ও আমার দিকে চায়—"এমনি। বেরোব ভাবছিলাম। একা ঘরে যেন দম আটকে আসছিল।"

—"ওঃ", আমার কৌতূহল যেন নিবৃত্ত হয়—"কিন্তু বিড়ি কিনলে কখন ভাই?" চমকে উঠল ঝাব্বু। সোজা হযে বসল।

"সকালে, বৌকে উঠিয়ে দেখার সময। এসব প্রশ্ন কেন করছ ভাই বলতো?"

উত্তব দিই না। চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। ও রূঢ় হবাব মতো সাহসটুকুও সঞ্চয কবতে পারল না। হঠাৎ উঠে ঘরের অন্ধকাব কোণ হাতড়ে কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ঢেলে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নেয়। আমি বিড়িটাকে মেঝেতে দাবিযে দাবিয়ে নিভিয়ে দিই। ও ঘুবে আসে।

বলি—"হ্যাঁ, যে জন্যে আসা। আমেদ সাহেব এলে কালকে একটা জমাযেতের আয়োজন কবতে হবে। এ কাজ তুমি ছাড়া—"

—"জমায়েত?" প্রশ্ন কবে সে।

—"হ্যাঁ, জমাযেত তো ডাকতে হবে। দেখ।"

হঠাৎ ও ঝুঁকে পড়ে আমার কাছে—"লালবাহাদুর, একটা কথা বলব?"

—"হ্যাঁ, বলবে বৈকি। লড়াই-এব এই নতুন ধাপে, যখন মানুষেব মনের বল পেটের ভুখ নবম করে দিচ্ছে, তখন ঝাব্বু ছাড়া আর কারো কথায় তো কোন ফল হবে না ভাই।"

ঝাব্বু উদ্যত ভাবটা সংবরণ করে নেয়। খানিক চুপ করে থাকে। আমি বলি—"কী বলতে যাচ্ছিলে?"

ঝাব্বু মুখ না ঘুরিয়ে আড়চোখে আমাকে লক্ষ্য করতে থাকে। তাবপব শান্ত গলায় বলে—"লালবাহাদুর, তুমি আমার সবচেয়ে বড় দোস্ত। কিন্তু সে সম্পর্ক ভুলে একবার সাধারণ মজুর হিসেবে আমার গোটাকয় কথা মন দিয়ে শোন।"

কথা বললাম না। একটু চুপ থেকে আবার ধরে ও—"আমার ওপর মজুবদের বিশ্বাস আছে। আমার কথাগুলো মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা তারা নিশ্চয়ই করবে, আর মানবে।"

সেই-ই আমার ভয়। সেই আমার গৌরবও। হঠাৎ ঘরের মধ্যে তেরছা হয়ে একঝলক আলো এসে লুটিয়ে পড়ে, সামনের দোতলাটায় কে যেন আলো জ্বেলেছে।

ঝাব্বু বলে চলে। আমাব কানে ওর উদগ্রীব, প্রায় মিনতি-ভরা গলাটা কেমন বিশ্রী লাগে।

ও বলে—"দেখ, এই ধাওড়া,—এ মহল্লার সব কটা ধাওড়া আমি ঘুরে দেখলাম। এটা কী অবস্থা হযেছে! .... মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা আছে!"

—"তুমি কী বলতে চাও?" নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করি আমি।

—"আমি বলি, এভাবে চলবে না। চলতে পারে না। মানুষগুলোকে এ যন্ত্রণার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবার আমার কোনো অধিকার নেই। আমিই ডাক দিয়েছিলাম, তাই কল বন্ধ হয়েছিল। এত লোকের দায়িত্বভার আমি আর বইতে পারছি না। তাই বলছি, আমাদের দাবী সম্বন্ধে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে একটা ফয়সালা করে ফেলা যাক।"

জানলার টুক্‌রো আলো ওর গালে পড়েছে। কত উঁচু হয়ে গেছে হাড়টা। মুখ ভাঙ্গা, চোখ কোটরে। ঝাব্বু কত রোগা হয়ে গেছে। ....

প্রশ্ন করি—"ফয়সালা? আপস বলো। তুমি বলছ এ কথা?" চুপ করে ভ্রূকুটি করে। নিজের কানে নিজের গলাই একটা দূরাগত বাজের ডাকের মতো হয়ে এলো।

ঝাব্বু ব্যগ্রভাবে বলে—"কথাটা ওভাবে নিও না। আমার মনে হয়, আমি জানি—আমাদের কিছু কিছু দাবী ওরা মেনে নেবে। তবে তো এ লড়াই করার কোনো মানে থাকে না।"

বলি আমি—"দাবী মানবে? ... তুমি কী করে জানলে কথাটা?" দ্রুত বলে যাই শেষ বাক্যটা সোজা ওর দিকে তাকিয়ে।

ও জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। তারপর বলে—"আমার মনে হয়।" গলাটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওর।

জিজ্ঞাসা করি—"পর্‌কাশ ভাইয়াদের যে ছাঁটাই করেছিল, তাদের বহাল করবে ফের? তন্‌খা বাড়িয়ে দেবে কারিগরদের? সব মানবে?"

কিছুক্ষণ ধরে ভাবল কথাটা। তারপর বললো—"চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমার মনে হয়, কিছু কিছু মানবে ওরা।"

—"কিছু কিছু!" আমার কথা বলার ইচ্ছেটা ক্রমেই কমে আসে।

ও বলে—"কিন্তু তবু দেখ, এভাবে তিলে তিলে মরা আর দেখা যায় না। কাল আমেদ সাহেব এলে তাঁকেও বলব, জমায়েতকেও জানাব আমার সিদ্ধান্তের কথা। আমাদের ফের যোগ দেওয়া উচিত।"

হঠাৎ ক্ষেপে উঠি। উত্তেজিত কণ্ঠে বলি—"একেবারে পথটা নষ্ট করে দিতে চাও? এতদিন জানের খুন দিয়ে যে সংহত শক্তি জমে উঠেছে, তার মূলে আঘাত করবে?"

ও বোঝায়—"ভুল করছ। আবার লড়াই হবে, আবার হবে। একটু সামলে উঠতে দাও। অল্প ত্যাগ করে এখন এতগুলো লোকের প্রাণ তো বাঁচাই।"

ওর দৃষ্টি আমার চোখের ওপর পড়ে। চোখ দুটো বোধহয় আগুনের ভাঁটা হয়ে উঠেছিল। বলে করুণভাবে—"আমার পরম বন্ধু হয়ে তুমি এ কী সুরে কথা বলছ লালবাহাদুর? এতদিনের বুকঢালা ভালোবাসা—"

—ভালবাসা। .... চীৎকার করতে ইচ্ছে করে। আমার সঙ্গী ঝাব্বু। আমাদের সবচেয়ে বড় গৌরবের বস্তু জঙ্গী সিপাহী। ... তাই-ই এই মুহূর্ত পর্যন্ত আছে সমস্ত মজুরের চোখে। আমার নবলব্ধ-জ্ঞান এখনও অংশীদার পায়নি। ঝাব্বুর নামে এখনও সব পাগল।

ঝাব্বু বোধহয় আমার চোখকে নরম হতে দেখেছিল। গায়ে হাত দেয়। ঘাড়টা শির্‌ শির্‌ করে ওঠে। হাতটাকে সরিয়ে দিই না। বলে—"ভাই, আমার অনুরোধ, ভালো করে বুঝে দেখ ..."

ওর গলাটা আমার কানে ছোট হয়ে আসে। মনে পড়ে কতদিনকার কত কথা। কতবার দেখেছি, নিষ্পেষণের যন্ত্র চালু হলেই ঝাব্বুর গলা বজ্রকণ্ঠে রণহুংকার দিয়ে উঠেছে। ওর চোখের দিকে চেয়ে সে সময় আমরা সব ভুলে যেতাম। সত্যিকারের অগ্নিহোত্রী। কোনোদিন কোনোখানে পাপের সঙ্গে সন্ধি করে নি।

আজ এত নরম হলো কী করে? পুরনো বহু পোড়-খাওয়া যোদ্ধা আজ তার পৌরুষ হারিয়ে ফেলেছে। কেন? অর্থের কাছে শেষটা বিক্রি হয়ে গেল? এতই বড় পতন হলো ওর!

আমার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ওর দুহাত মুঠোয় নেই—"মাথা তোমার খাবাপ হযে গেছে। কি ভালো, কি মন্দ, তা বোঝাব জ্ঞানও কি তোমার লোপ পেল? বিচার করে দেখ, আপন মানে মৃত্যু। এ চেষ্টা ছেড়ে দাও। সবাই কী বলবে?"

—"সবাই?" আমার মুখের থেকে ঘন অন্ধকারের দিকে চোখ ঘোরাল সে। মুখে অপরিসীম দৃঢ়তার ভাব। "আপস কবতে হবে .. এতদিনকার নেতা আমি তোমাদের, আমার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।"

নেতা! চাবুক এসে পড়ল আমার মুখে। ঝাব্বু নেতা, সেই কথা তার শেষ যুক্তি! আমি ভাবতে পারছি না। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভালো লাগে না, হাঁপ ধবে আসে যেন বুকে। এ কী নতুন প্রকাশ, কল্পনা কবলেও মনে হয পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। অন্ধকাবটা যেন দুলে দুলে ওঠে। আমাব মনে যে আশঙ্কা জাগছিল বিকেলবেলা সদরবাজারে ওকে দেখার পব থেকে, সেটা সত্যে পরিণত হলো। সত্যি! কী ঘৃণ্য, জঘন্য বাস্তব।

ঝাব্বু কথা বলছে। কি বলছে কে জানে? কে তোয়াক্কা বাখে। মরা মানুষের ভুতুড়ে কথা। আমার খালি মনে হচ্ছে, সেবাব হাঙ্গামায সে মবল না কেন? গত বছরেব আগেব বছব যে গোল বেধেছিল মালিকের সঙ্গে, তখন সে এগিয়ে গিযেছিল অত্যাচারের বুলেটের মুখে। একটা গুলি এসে কেন ওকে শেষ করে দেয় নি? কেন ও বেঁচে থাকল?

অমঙ্গল চিন্তা করছি না। ওব সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা চিন্তা কবা এখনও আমার পক্ষে অসম্ভব। ও চলে গেলে বেঁচে যেত! আমরা ওর শব কাঁধে করে মিছিল করতাম, দু'চোখ বেযে আমাদের জল ঝরত, ঝাব্বু বেঁচে থাকত তাব প্রতিটি ফোঁটায়, জলকে আগুন করে দিতে সে পারত। বেঁচে থাকত আমাদের আশায়, আমাদের নৈবাশ্যে, আমাদের শেষ অবশ্যম্ভাবী পরম জযে। আমাদের শোকে সান্ত্বনা পেতাম তার কথা ভেবে, লড়াই-এ বল পেতাম তার কাছ থেকে, মৃত্যুকে তুচ্ছ কবতাম সে মুখ স্মরণ করে। তাকে মনে পড়িয়ে দিযে ডাকতাম নবীন দলকে, প্রতিশোধেব আগুনে তাদের ধরিয়ে নিতাম মশালের মতো, সেই হতো প্রেবণা।.. তাবপব, সমস্ত ঘটনার পর, নয়া দুনিয়ার বনেদ গাড়তাম যখন, তাব স্মৃতি হাওযা হযে আমাদের চুলে নাড়া দিয়ে যেত। সমস্ত মজুর-কিষাণ জমায়েতে তাব হাসিমুখ জেগে উঠত। সেদিন সবচেয়ে বড় হয়ে বাঁচত সে।

সারাজীবন সংগ্রাম কবা সেই তো আমাদের ঝাব্বু!—এ লোকটা কে? নেতা। আমাদেব কেউ নয়, অন্যজাত। এর চোখে রয়েছে ভীতি, বুকে রযেছে লাভের লোভ, আর কামিজের জেবে রয়েছে টাকা। লোকটার চোয়ালটা ব্যগ্রভাবে নির্লজ্জ হয়ে বেশ্যাবৃত্তির বেসাতির কাজ হাসিল করে যাচ্ছে, তাতে বাইরের টুকরো আলো পড়ে তেল্‌তেলে চক্‌চকে লাগছে আর খালি নড়ছে। ওব মতো বেইমান এ তল্লাটে আর একটি নেই। একে আমি চিনি না।.... আমার পয়লা নম্বর দুশমন, আমার ঝাব্বুর সারাজীবনের ঘোর শত্রু, হাজারো ভুখা মজুরের রক্তচোষা ভাড়াটে নেতা।

হাত নেড়ে ও খুব বোঝাচ্ছে। এতক্ষণ স্থানুর মতো বসেছিলাম, এবার নড়ি। পাশের পোঁটলা থেকে আমার সাধের মখমলের নরম পাগড়িটা বের করতে থাকে আমার হাত।...

না। ও আমার বন্ধু। আমার সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু। কতবার ওর নেতৃত্বে আমাদের দুঃখদুর্দশার জন্যে লড়েছি, কতবার কতভাবে ওর কাছে ঋণী হয়েছি। দুর্বল লাগে নিজেকে, এ আমার

সাধ্যাতীত। পালিয়ে যাই বরঞ্চ, কেন এলাম আমি? তলের ঠোঁটটা আমার অবরুদ্ধ কান্নাকে রুখতে গিয়ে থর্ থর্ করে কাঁপে, মাথার পেছনটায় চাপ ধরে আসে।

তারপর ওর কথা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। রাত্রি গভীর হলো।

আমি প্রাণপণ শক্তিতে পেঁচিয়ে দিযেছিলাম কাপড়টা। ওর মুখটা আমার খুব কাছে চলে এসেছিল। জিভ বেরিয়ে গেছে, কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা, চোখ রক্তাভ। ভালো করে কাপড়টা আর একবার মুঠিয়ে নিয়ে জোর দিলাম। হাতপাগুলো ছড়িয়ে পড়ে, একটা হাত আমার জামাকে খাম্চে ধরে টানতে থাকে, পড়্পড়্ শব্দে খানিকটা ছিঁড়ে যায়। সব আমি লক্ষ্য করি লালচে-কালো একটা পর্দার ভেতর দিযে যেন। আব আমি যেন সমস্ত ঘটনাটাব একজন দর্শক, এমনি ঠাণ্ডা-নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেছে মনের ভেতবটা।

ছট্ফট্ করতে করতে ও নেতিয়ে পড়ল। ক্রমে ওর হাত-পা-এব আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে এলো। .... ছেড়ে দিলাম।

গড়িয়ে আমার কোলের ওপর ওর মাথাটা এসে পড়ে। জানলা দিয়ে আসা বাইরের আলো এবার ওর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখের বীভৎস সঙ্কোচন কমতে কমতে থেমে এলো। ওর হাতটা আমার বুকের কাছে ছেঁড়া জামা ধরেই থাকে। এক টানে কাপড়টা খুলে নেই গলার প্যাঁচ থেকে।

ওর কপালে কয়গোছা চুল এসে পড়েছে দেখছি তখন থেকেই। আর চওড়া কপালময বড় বড় স্বেদবিন্দু। কেমন ধীর, কেমন তৃপ্ত দেখতে লাগছে ওকে, ঘুমের প্রশান্তি যেন ওকে ঘিরে নেমে এসেছে। চোখ দুটো ধীরে আনমিত করে বন্ধ কবে দেই।

তখন থেকে দেখছি ঝুঁকে পড়ে, জলে ভেসে যাচ্ছে আমার সারা মুখ। তাবপব কম্পিত মৃদুহাতে ওর গুচ্ছ গুচ্ছ চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিতে থাকি সযত্নে।